ISSN 0976-9463

তবুএকলব্য

৩৬

ভাষা-সাহিত্য-সংস্কৃতি বিষয়ক গবেষণা পত্রিকা

১৪ বর্ষ ১ম সংখ্যা • জানুয়ারি ২০১৯

TABU EKALABYA

An International Peer Reviewed Refereed Research Journal on
Language, Literature, Culture & Human Sciences

ম ঙ্গা ল কাব্য

বিশেষ সংখ্যা

আমন্ত্রিত সম্পাদক ॥ সনৎকুমার নস্কর

সম্পাদক ॥ দীপঙ্কর মল্লিক

দি গৌরী কালচারাল এন্ড এডুকেশনাল অ্যাসোসিয়েশন

হৃদয়পুর, নিবেদিতা পার্ক, কলকাতা ১২৭

সম্পর্ক : ৯৮৩০৪৪৪১৮/২৮

TABU EKOLABYA
An International peer reviewed Research Journal on Language
Literature & Human Sciences.

ISSUE : 14, Vol. 36, Jamuary 2019

ISSN : 0976-9463

TABU EKOLABYA
An International peer reviewed Research Journal on Language
Literature & Human Sciences.

Chief Editor : Dipankar Mallik

Executive Editor : Debarati Mallik & Tapas Pal.

Printed & Published by *Debarati Mallik* on behalf of
TABU EKOLABYA, Kolkata- 700009, West Bengal, India.
Contact No. : 9836733383 / 9836733393
e-mail : tabuekalabya@gmail.com
facebook : Tabu Ekalabya
Website : www.gouriculture.com

প্রাপ্তিস্থান : দে'জ, দিয়া, দে বুক স্টোর (দীপু), পাতিরাম, ধ্যানবিন্দু, পাতা বাহার।

মূল্য ৪০০৲ টাকা

সভাপতি
বিপ্লব মাজী

মুখ্য উপদেষ্টা
স্বামী শাস্ত্রজ্ঞানন্দ
রামকুমার মুখোপাধ্যায়

সম্পাদক
দীপঙ্কর মল্লিক

যুগ্ম সম্পাদক
তপন মণ্ডল

কার্যকরী সম্পাদক
দেবারতি মল্লিক
তাপস পাল

সহ-সম্পাদক
দিব্যেন্দু পালধি

আহ্বায়ক
রামকৃষ্ণ মণ্ডল

উপদেষ্টামণ্ডলী : অধ্যাপক ও গবেষক

পবিত্র সরকার, সুমিতা চক্রবর্তী, তপোধীর ভট্টাচার্য, বরুণকুমার চক্রবর্তী, রবীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, ব্রততী চক্রবর্তী, হাবিব আর রহমান, বারিদ বরণ ঘোষ, শ্রুতিনাথ চক্রবর্তী, দীপক রায়, বিকাশ রায়

উপদেষ্টামণ্ডলী : কবি ও লেখক

সেলিনা হোসেন, অমিত্রসূদন ভট্টাচার্য, ইয়াং জংজে, জ্যামি প্রোক্টর-খু, ট্রান্ কোয়াঙ কুই, জারকো মিলেনিক সমীর রক্ষিত, অমর মিত্র, সাধন চট্টোপাধ্যায়, জয়া মিত্র, শুভময় মণ্ডল

সম্পাদকমণ্ডলী

সত্যবতী গিরি, শহীদ ইকবাল, সোনালি মুখার্জি, মুনমুন গঙ্গোপাধ্যায়, উদয়চাঁদ দাশ, রেজাউল করিম, হোসনে আরা জলি, বরেন্দু মণ্ডল, শ্যামাচরণ মণ্ডল, বিদিশা সিনহা, রাধেশ্যাম সাহা, সুব্রত ঘোষ, স্বপন কুমার আশ, সুবীর সেন, প্রিয়ব্রত ঘোষাল, শুভঙ্কর রায়, অর্ণব সাধুখাঁ, প্রসেনজিৎ বিশ্বাস, আশিষ রায়, মণিশঙ্কর মণ্ডল

কার্যকরী কমিটি

পুষ্পেন্দু মজুমদার, দীপক কুমার ঘোষ, অরুণাভ চক্রবর্তী, মধুসূদন সাহা, বাপ্পা প্রামাণিক, সুস্মিতা মণ্ডল

সূচি

সামগ্রিক পরিচয় : দেশ-কাল-চরিত্র-পরিবেশ

মঙ্গালকাব্যে দেব-দেবীর স্বরূপ ১
সত্যরঞ্জন বিশ্বাস
মঙ্গালগান ১৮
সুশান্তকুমার সামন্ত
মঙ্গালকাব্য পাঠে রবীন্দ্রনাথ ২৮
সনৎকুমার নস্কর
বাংলা মঙ্গালকাব্য : নারীর স্বাধিকার প্রতিষ্ঠার কাহিনি ৪৭
জয়ন্তী সাহা (রায়)
মঙ্গালকাব্যের যুগশৈলী ৫৩
অভিজিৎ মজুমদার
মঙ্গালকাব্যে হাস্যরস ৭৬
অনির্বাণ মান্না
স্মার্তব্যবস্থা ও বাঙালির জীবনশিল্প মঙ্গালকাব্য ৮৭
অর্জুনদেব সেনশর্মা
বাংলা মঙ্গালকাব্যে বৈষ্ণব-প্রভাব ১২৭
কাননবিহারী গোস্বামী
বাংলা মঙ্গালকাব্যে বাণিজ্যিক পরিবেশ ১৫৩
তপনকুমার বিশ্বাস
পশ্চিমি গঠনতত্ত্বের আলোকে বাংলা মঙ্গালকাব্য ১৬৩
পিন্টু রায়চৌধুরী
মঙ্গালকাব্যে ভণিতা : কবি মনোভাব ও সমাজ পরিচয় ১৯০
প্রভাস সামন্ত
মঙ্গালকাব্যে মিথ ২০২
অরিন্দম সরকার
মঙ্গালকাব্য : 'রূপসী বাংলা'র কবি ও কয়েকজন ২০৭

অনিলকুমার রায়

লোকায়ত পাঠ : নিম্নবর্গের বিচিত্র জীবনের সন্ধানে

বাংলা মঙ্গালকাব্যে লোকজ উপাদান ২১৫
বরুণকুমার চক্রবর্তী
মঙ্গালকাব্যে নিম্নবর্গের শ্রমজীবী নারীরা ২২৮
কামরুজ্জামান
অন্ত্যজ মানুষের পরিবার-বৃত্ত : মঙ্গালকাব্যের দর্পণে ২৪২
গার্গী বন্দ্যোপাধ্যায়

মনসামঙ্গাল : প্রতিবাদ-প্রতিরোধ-প্রতিস্পর্ধায়

ক্ষেমানন্দের মনসামঙ্গালে লৌকিক উপাদান ২৫০
মুনমুন গঙ্গোপাধ্যায়
বিজয় গুপ্তের মনসা : আত্মপ্রতিষ্ঠার ইতিবৃত্ত ২৭০
অন্তরা মিত্র
বিজয়গুপ্তের বেহুলা : প্রতিবাদে, প্রতিরোধে, প্রতিস্পর্ধায় ২৮৩
দীপঙ্কর মল্লিক
বিজয় গুপ্তের 'মনসা' : স্বাতন্ত্র্যের সন্ধানে ৩০০
কৌশিক ঘোষ
মনসামঙ্গালে সমাজ ও সংস্কৃতির রূপ ৩০৭
বিজনকান্তি নন্দী
জগজ্জীবনের মনসামঙ্গাল কাব্যে দিনাজপুরের প্রভাব ৩১১
সমিতকুমার সাহা
জাপানে মনসামঙ্গালের বিষয়বস্তু ৩১৬
শংকররঞ্জন মজুমদার

চণ্ডীমঙ্গাল : শাঠ্যে, ষড়যন্ত্রে, ছলনার বিচিত্র জালে

গৌড়ীয় চণ্ডীমঙ্গাল কাব্যে গৌড়বঙ্গের সমাজ ও পরিবার জীবন ৩২০
আদিত্যকুমার লালা
অন্য মুকুন্দের সন্ধানে : চণ্ডীমঙ্গালের দাম্পত্যবৃত্ত ও জীবনরসের ভাষ্যান্তর ৩২৯
ছন্দা রায়
কমলে-কামিনী : দেবী-কল্পনা ৩৪৫
গৌরীশংকর দে

মধ্যযুগের নগর-রাষ্ট্র : মুকুন্দরামের গুজরাট-নগর ৩৫২
রাধেশ্যাম সাহা
মুকুন্দ চক্রবর্তী ও রামানন্দ যতির 'চণ্ডীমঙ্গাল কাব্য' : প্রসঙ্গা সামাজিক স্তরবিন্যাস ও গোষ্ঠীজীবন ৩৭০
বর্ণালী প্রামাণিক

ধর্মমঙ্গাল : বীরত্ব-সংকল্প-মহাকাব্যিক বিন্যাস

রূপরাম চক্রবর্তীর অনাদ্যমঙ্গাল—অর্থনীতির সূত্র সন্ধান ৩৮০
অন্তরা মিত্র
রূপরামের ধর্মমঙ্গাল কাব্যে লৌকিক উপাদান ৩৯৩
বিজনকুমার মণ্ডল
ঘনরামের ধর্মমঙ্গাল কাব্যের বীরঙ্গানা নারীরা : পরবর্তী কালের সাহিত্যদর্পণে ৩৯৯
পিয়ালী খাঁ

শিবায়ন : যাযাবর জীবন, কৃষিজীবন, শিল্পজীবন

'শিবায়ন' : লোকায়ত জীবন-ভাবনা ও লোকসংস্কৃতির উপাদান ৪০৯
কাননবিহারী গোস্বামী
শিব ঠাকুরের আদি-অন্ত এবং শিবায়ন ওরফে শিবমঙ্গাল ৪২৩
পল্লব সেনগুপ্ত
রামেশ্বরের শিবায়ন-এ নিম্নবর্গের সমাজচিত্র ৪২৮
বিপ্লব মাজী
রামেশ্বর ভট্টাচার্যের শিবায়ন কাব্যে কৃষি-নির্ভর বাঙালি জীবনের আলো-আঁধারের নানান বর্ণময় চিত্র ৪৩৬
আদিত্যকুমার লালা
শিবকথা : রামেশ্বর ও ভারতচন্দ্র ৪৪৫
ড. শ্যামাচরণ মণ্ডল
রামেশ্বরের শিবায়নে শঙ্খশিল্প প্রসঙ্গা ৪৫১
সৌগত চট্টোপাধ্যায়
শিবায়ন : চাষপালা ৪৬০
দীপঙ্কর মল্লিক

অন্নদামঙ্গাল : দুধে ভাতের স্বপ্ন

'অন্নদামঙ্গাল' কাব্যের ব্যাসদেব : যুগান্তের বার্তাবহ ৪৬৮
তরুণ মুখোপাধ্যায়
অন্নদা-আখ্যানের অন্দরমহল : পুরাণেতিহাস ও কল্পব্যাখ্যানের
বিন্যাসবিধির সন্ধানে ৪৭৫
দিব্যতনু দাশগুপ্ত
'অন্নদামঙ্গাল' : 'নৌতুন মঙ্গাল' ৪৮৯
দেবারতি মল্লিক

অপ্রধান মঙ্গালকাব্য : মানুষই দেবতা গড়ে

কবি কৃষ্ণরামের রায়মঙ্গাল : সম্প্রীতির সন্ধান ৪৯৭
জয়িতা দত্ত

সামগ্রিক পরিচয়
দেশ-কাল-চরিত্র-পরিবেশ

মঙ্গালকাব্যে দেব-দেবীর স্বরূপ

সত্যরঞ্জন বিশ্বাস

মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্য মঙ্গালকাব্যের আলোয় আলোকিত। পঞ্চদশ থেকে অষ্টাদশ শতাব্দী পর্যন্ত প্রায় চারশো বছর ধরে এই কাব্যগুলির রচনাধারা সচল থাকলেও মূলত মধ্যযুগেই মঙ্গালকাব্যের উৎকর্ষ সাধিত হয়েছে। বাংলাদেশের লৌকিক ও বহিরাগত ধর্ম এবং অন্যান্য ধর্মমতের সংমিশ্রণে নবোদ্ভূত দেব-দেবীর বাঙালি সমাজে প্রতিষ্ঠা ও পূজা প্রচারের কাহিনিই মঙ্গালকাব্যের উপজীব্য বিষয়। বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন প্রকার কল্পিত বিপর্যয় ঘটিয়ে লৌকিক দেব-দেবীরা মর্ত্যের বিশিষ্ট মানুষদের কাছ থেকে পূজা আদায়ের চেষ্টা চালিয়েছেন। কখনো কখনো ন্যায়-নীতিকে বিসর্জন দিয়েও মঙ্গালকাব্যের দেব-দেবীরা আত্মপ্রতিষ্ঠার সোপান তৈরি করে নিয়েছেন। সে ক্ষেত্রে চরম নিষ্ঠুরতাকে অস্ত্র হিসাবে ব্যবহার করতেও তাঁরা দ্বিধাবোধ করেননি। মর্ত্যে পূজা প্রচলন ও নিজেদের প্রতিপত্তি বিস্তারকল্পে দেব-দেবীরা স্বর্গের কোনো দেবকুমার বা নর্তকীকে অভিশাপ দিয়ে নরলোকে পাঠাতেন। তারা মর্ত্যলোকে কোনো পরিবারে মানবরূপে জন্মগ্রহণ করত। মানবকায়া ধারণ করে ধীরে ধীরে তারা হয়ে উঠত মানব সমাজের একজন। ভুলে যেত বিগত জন্মের স্বর্গবাসের স্মৃতি। তারপর দেব-দেবীরা সেই স্বর্গচ্যুত নরনারীদের স্বপ্নাদেশ বা প্রত্যাদেশের মাধ্যমে মর্ত্যে পূজা প্রচলনের নির্দেশ দিতেন এবং সে ক্ষেত্রে যে কোনো ধরনের কৌশল তাঁরা প্রয়োগ করতেন। দেবচরিত্রের কোমলতা, কারুণ্য, মমত্ববোধ প্রভৃতি মহৎ ভাবের সন্ধান মঙ্গালকাব্যের দেব-দেবীদের মধ্যে তেমনভাবে পাওয়া যায়নি। বরং কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যে পৌঁছাতে অপকৌশল প্রয়োগে কখনো কখনো তাঁরা কঠোরতর হয়ে উঠেছেন। মনসামঙ্গাল কাব্যে বাসরঘরে লখিন্দরের সর্পদংশন, চাঁদ সদাগরের মণিমাণিক্যপূর্ণ নৌবহরডুবি প্রভৃতি সেই কঠোরতারই নিদর্শন।

মঙ্গালকাব্যের অধিকাংশ দেব-দেবীই লৌকিক এবং অনার্যসম্ভূত। এই সমস্ত দেব-দেবীর উদ্ভবের পিছনে যেমন বিভিন্ন যুগের বিভিন্ন সম্প্রদায়ের সংস্কার-সংস্কৃতি, আচার-আচরণ, ধর্মবিশ্বাস, লোকায়ত ভাব-ভাবনার ভূমিকা রয়েছে, তেমনি বৌদ্ধধর্মের অমোঘ গতিরোধের প্রসঙ্গও অমূলক নয়। যখন বৌদ্ধধর্মের প্রসার কিছুতেই রোধ করা যাচ্ছে না তখন হিন্দুদের

স্বর্গবিহারী দেব-দেবীদের বিভিন্ন মূর্তিতে, বিভিন্ন বিষয়ের অধিষ্ঠাত্রী দেব-দেবী হিসাবে মর্ত্যে স্থান দেওয়া হয়েছে। তাছাড়া বাংলাদেশের প্রকৃতিও এই সমস্ত দেব-দেবীর উদ্ভবের প্রেক্ষাপট হিসাবে যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকাপালন করেছে। আর্দ্রভূমির দেশ বাংলা। এখানে জল-জঙ্গাল, নদী-নালা, খাল-বিলে বাস করা হিংস্র সাপ, বাঘ, কুমিরের হাত থেকে রেহাই পাওয়ার উপায় হিসাবে বিভিন্ন দেব-দেবীকে বন্দনা করতে শুরু করেছিল সাধারণ মানুষ। এক একটি হিংস্র প্রাণীর অধিষ্ঠাত্রী দেবী বা দেবতা হিসাবে কোনো স্বর্গবিহারী দেবী বা দেবতাকে চিহ্নিত করে, পূজার মাধ্যমে তাঁদেরকে সন্তুষ্ট করে, বিপদসঙ্কুল জীবনযাত্রায় কিছুটা স্বস্তির বাতাবরণ আনতে চেয়েছিলেন তাঁরা। দ্রাবিড়, অস্ট্রিক, মোঙ্গালীয় গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত কৃষিসমাজ ও জলে-জঙ্গালে খেটে খাওয়া জেলে, বাগদী, দুলে, কাহার, হাড়ি, ডোম প্রভৃতি অশিক্ষিত মানুষেরা বিশ্বাস করেছিল মনসাদেবী সন্তুষ্ট হলে সর্পাঘাত থেকে রেহাই পাওয়া যাবে, দক্ষিণরায়-কালুরায় প্রভৃতি দেবতাদের পূজা করলে বাঘ, কুমিরের হাত থেকে রক্ষা পাওয়া যাবে, মা চণ্ডীর পূজা করলে সমস্ত আপদ কেটে যাবে। মঙ্গালকাব্যের দেব-দেবীর উদ্ভব এই সমস্ত আর্যেতর গ্রামীণ এবং লৌকিক দেবসংস্কার ও জীবনবোধের হাত ধরে। ভয়ে হোক আর ভক্তিতেই হোক ভাবকল্পনাবর্জিত এক গ্রামীণ আদর্শ মঙ্গালকাব্যে ফুটে উঠেছে অনার্য সম্প্রদায়ের মানুষের দেববন্দনার মধ্য দিয়ে। তবে এই সমস্ত দেব-দেবীর পূজা নরলোকে মসৃণভাবে প্রচারিত হয়নি। প্রধান দুই দেবী মনসা ও চণ্ডীর দেবত্বে প্রতিষ্ঠিত হতে বেশ কসরৎ করতে হয়েছে। অন্ত্যজ শ্রেণির মানুষের কাছে মা মনসা খুব তাড়াতাড়ি প্রভাব বিস্তার করলেও বণিক শিরোমণি চাঁদ সদাগরকে বশে আনতে তাঁকে দীর্ঘ বিরোধে অবতীর্ণ হতে হয়েছে। দেবমহিমায় নয়, ষড়যন্ত্রের আশ্রয় নিয়েই মনসাকে চাঁদ বণিকের কাছ থেকে পূজা আদায় করতে হয়েছে। তবে মনসার কাহিনির মধ্যে যে অনাবৃত আদিম বলিষ্ঠতা আছে, দেবী চণ্ডীকে তার মুখোমুখি হতে হয়নি। অন্যদিকে মঙ্গালকাব্যের প্রধান দেবতা ধর্মঠাকুর শুরু থেকেই দেবমহিমায় মহিমান্বিত। ভক্ত লাউসেনকে রক্ষা করার মধ্যেই তিনি পরমানন্দ খুঁজে পেয়েছেন। ভক্তের প্রতি দেবতার বাৎসল্যভাব প্রকাশ ধর্মমঙ্গালেই কিছুটা ধরা পড়েছে। এ ছাড়া মঙ্গালকাব্যের প্রধান কিছু দেব-দেবীর মধ্যে যে রুক্ষ্মতা, স্বার্থপরতা, অমানবিকতা ও দম্ভের প্রকাশ পাওয়া গেছে তা কখনো কখনো পাশবিক মনে হয়েছে। বরং মঙ্গালকাব্যের মানব চরিত্রগুলির মধ্যে অনেক সদ্‌গুণের সন্ধান মিলেছে।

অনার্য প্রাণশক্তির অমার্জিত ও অসংস্কৃত এবং লৌকিক চেতনাপুষ্ট ও লৌকিক জীবনাশ্রয়ী হলেও পৌরাণিক দেব-দেবীর ভাবকল্পনা থেকে মঙ্গাল কাব্যের দেব-দেবীরা একেবারে বিচ্ছিন্ন নন। যদিও আত্মবিশ্বাস এবং আত্মজ্ঞানের অভাবেই অনার্য সম্প্রদায়ের প্রত্যন্ত শ্রেণির মানুষ তাদের আধিদৈবিক ও আধিভৌতিক বিপত্তি থেকে আত্মরক্ষার তাগিদে এই সমস্ত দেব-দেবীর পরিকল্পনা করেছিল, তবুও পুরাণের প্রেরণা থেকেই যে মঙ্গালকাব্যের জন্ম সে বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ নেই। কিন্তু পৌরাণিক দেব-দেবীর লক্ষণাক্রান্ত হলেও লৌকিক আদর্শ পুরোমাত্রায় মঙ্গালকাব্যের দেব-দেবীর মধ্যে বিদ্যমান। তাই মহাভারতের জরুৎকারু অত্যন্ত সহজেই মঙ্গালকাব্যে দেবী মনসাতে পরিণত হয়েছেন। দেবাদিদেব

মহাদেব 'ভিখারী শিবে' পরিণত হয়ে বাঙালি ঘরের সাধারণ মানুষের প্রতিরূপ হয়ে উঠেছেন। বাঙালিরা নিজেদের দাম্পত্য-জীবনের ছায়াতলে শিব-দুর্গার দাম্পত্য-জীবনের অবিকল ছবি খুঁজে চলেছে। লোকজীবনের আলোয় ধরা পড়েছে শিবের দাম্পত্য কলহ, কোচ, রমণীদের সঙ্গে অবৈধ সম্পর্ক, সংসারের যাঁতাকলে বিপর্যস্ত দিন আনা দিন খাওয়া এক সাধারণ বাঙালির দৈনন্দিন চলমানতার প্রতিচ্ছবি। শিবমঙ্গলে তিনি একজন কৃষক। ত্রিশূল ভেঙে জোয়াল তৈরি করে তিনি ভূমি কর্ষণে প্রবৃত্ত হয়েছেন। হয়ে উঠেছেন 'কৃষিদেবতা শিব'। পৌরাণিক কাহিনিগুলিতে এ ধরনের কোনো নজির নেই। সেখানে দেবমাহাত্ম্যের মধ্যে কোনো প্রকার মানবিক আচরণের প্রবেশ ঘটেনি। সেখানে শুধু অলৌকিকতার মোহময় মসৃণ বিস্তার। অন্যদিকে মঙ্গলকাব্যের লৌকিক কাহিনিগুলি অলৌকিকতাবর্জিত মানবিক কাহিনি মাত্র। সেখানে সমাজের সাধারণ মানুষের জয়গানই ধ্বনিত হয়েছে। কারণ মঙ্গলকাব্যের উদ্ভবের পিছনে বাংলাদেশে হিন্দু ও মুসলমান সমাজের সংঘর্ষজনিত প্রতিক্রিয়ার প্রভাব রয়েছে। সেন রাজবংশের পতনের পর ইসলামি ধর্মমতের সঙ্গে স্থানীয় লৌকিক ধর্মমতগুলির আদর্শগত বিরোধ এত চরমে পৌঁছাল যে আপামর হিন্দু জনসাধারণ ভীষণভাবে অসহায়তা বোধ করতে লাগল। তখন সান্ত্বনালাভের উপায় হিসাবে মঙ্গলকাব্যের লৌকিক কাহিনিগুলির মধ্যে কিছুটা অলৌকিকতার প্রলেপ দেওয়ার চেষ্টা চলতে লাগল। মুসলমান আক্রমণে দিশেহারা ও অত্যাচারে জর্জরিত সাধারণ মানুষ এমন দেবতার আশ্রয় খুঁজতে লাগলেন যিনি সমস্ত বিপদ-আপদের অব্যর্থ ত্রাণকর্তা হবেন। রাজনৈতিক বিশৃঙ্খলা তাদের আত্মনির্ভরতায় ঘুণ ধরিয়ে দৈব-নির্ভরতার দিকে ঠেলে দিয়েছে। এদিকে পুরাণের দেবতাদের শান্ত সমহিত ভাব তাদেরকে আর সন্তুষ্টি বিধান করতে পারেনি। বরং মনসা বা চণ্ডীর মতো ক্রূর, প্রতিহিংসা পরায়ণ দেব-দেবীর মধ্যেই তারা নিজেদের ধর্মরক্ষা ও নিত্য নির্ভরতার রসদ খুঁজে পেয়েছিলেন। এ সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের মন্তব্য—'তখন সমাজের মধ্যে যে উপদ্রব-পীড়ন, আকস্মিক উৎপাত, যে অন্যায়, যে অনিশ্চয়তা ছিল, মঙ্গলকাব্যে তাহাকেই দেবমর্যাদা দিয়া সমস্ত দুঃখ অবমাননাকে ভীষণ দেবতার অনিয়ন্ত্রিত ইচ্ছার সহিত সংযুক্ত করিয়া কথঞ্চিৎ সান্ত্বনা লাভ করিতেছিল এবং দুঃখ-ক্লেশকে ভাঙাইয়া ভক্তির স্বর্ণমুদ্রা গড়িতেছিল।'[১] তিনি আরো বলেছেন, 'বস্তুত সাংসারিক সুখ-দুঃখ বিপদ সম্পদের দ্বারা নিজের ইষ্টদেবতার বিচার করিতে গেলে, সেই অনিশ্চয়তার কালে শিবের পূজা টিকিতে পারে না। অনিয়ন্ত্রিত ইচ্ছার তরঙ্গ যখন চারিদিকে জাগিয়া উঠিয়াছে, তখন যে দেবতা ইচ্ছা সংযমের আদর্শ তাঁহাকে সাংসারিক উন্নতির উপায় বলিয়া গ্রহণ করা যায় না। দুর্গতি হইলেই মনে হয়, আমার নিশ্চেষ্ট দেবতা আমার জন্য কিছুই করিতেছেন না, ভোলানাথ সমস্ত কিছু ভুলিয়া বসিয়া আছেন। চণ্ডীর উপাসকেরাই কি সকল দুর্গতি এড়াইয়া উন্নতি লাভ করিতেছিলেন? অবশ্যই নহে। কিন্তু শক্তিকে দেবতা করিলে সকল অবস্থাতেই আপনাকে ভুলাইবার উপায় থাকে। শক্তি অনুভব করিয়া কৃতজ্ঞ হইয়া থাকে। আমারই প্রতি বিশেষ অকৃপা ইহার ভয় যেমন আত্যন্তিক, আমারই প্রতি বিশেষ দয়া, ইহার আনন্দও তেমনি অতিশয়।... সংসার মুখে যাহাই বলুক, মুক্তি চায় না, ধনজনমান চায়।'[২]

সামাজিক স্তর থেকে মঙ্গালকাব্যের সমস্ত দেব-দেবীর উদ্ভব ঘটলেও কালক্রমে তাঁদের সঙ্গো পৌরাণিক দেবকাহিনির মিশ্রণ ঘটতে শুরু হয়। মঙ্গালকাব্যের কবিগণ নির্বিচারে লৌকিক দেব-দেবীকে পৌরাণিক মহিমায় মহিমান্বিত করবার উদ্যোগ গ্রহণ করেছিলেন। পৌরাণিক দেব-দেবীর সঙ্গো এই সমস্ত লৌকিক দেব-দেবীকে এক পঙ্ক্তিতে অধিষ্ঠিত করবার প্রচেষ্টাও কবিদের মধ্যে লক্ষ করা গেছে। এমনকি একাত্ম করবার প্রয়াসও প্রচ্ছন্ন থাকেনি। কিন্তু পুরাণ ও মঙ্গালকাব্যের মধ্যে বিস্তর ব্যবধান। পুরাণের দেবমাহাত্ম্য মূলত অলৌকিকতার ওপর নির্ভরশীল এবং উদ্ভবের কাল থেকেই তাঁরা দেবমহিমায় বিরাজমান। কিন্তু মঙ্গালকাব্যের দেব-দেবীরা বাস্তব জীবনাশ্রয়ী এবং তাঁদেরকে রীতিমত প্রতিকূলতার সঙ্গো লড়াই করে দেবত্বের স্বীকৃতি আদায় করতে হয়েছে। সাধারণ মানুষের দৈনন্দিন জীবনযাত্রার মধ্যে বাস্তবসম্মত কাহিনির মাধ্যমে দেবত্ব স্থাপনই ছিল মঙ্গালকাব্যের দেব-দেবীদের প্রধান উদ্দেশ্য। এ কাব্যগুলির নায়ক-নায়িকা প্রত্যন্ত শ্রেণির অসহায় মানব মানবী। যারা জীবন সংগ্রামে বার বার বিধ্বস্ত হয়ে শেষ পর্যন্ত কোনো দেবতাকে আঁকড়ে ধরে কিছুটা স্বস্তি খুঁজে ফিরেছে। কারণ মানুষের প্রতি মানুষের বিশ্বাস তখন আর অটুট ছিল না। কিন্তু পুরাণের আশ্রয় শুধুমাত্র দৈব আচরণ-নির্ভর দেবতা। মর্ত্যচারী মানুষের সেখানে কোনো ভূমিকা নেই। নিজেদের পূজা প্রচলনের ক্ষেত্রে অলৌকিকতাই তাঁদের প্রধান হাতিয়ার। তাঁদের দেবমাহাত্ম আনুপূর্বিক দৈব উপায়েই সুপ্রতিষ্ঠিত। কখনো কোনো প্রতিকূলতার আবর্তে তাঁদেরকে নাস্তানাবুদ হতে হয়নি কিংবা কারো সাহায্য গ্রহণ করে দেবত্বে প্রতিষ্ঠিত হতে হয়নি। কিন্তু মঙ্গালকাব্যের দেব-দেবীদের আত্মপ্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে মর্ত্যধাম এবং মর্ত্যের মানুষের ভূমিকাই মুখ্য। স্বর্গভ্রষ্ট মানুষেরাই মর্ত্যে মানবিক আচরণের মধ্য দিয়েই লৌকিক দেব-দেবীর প্রতিষ্ঠার প্রেক্ষাপট তৈরি করেছে। মর্ত্যের মানুষের অবিশ্বাসকে জয় করেই তাঁদের দেবতা হয়ে উঠতে হয়েছে। মানুষের স্বীকৃতিতেই দেবতা স্বীকৃত হয়েছেন। আর সে সমস্ত মানুষ মূলত সমাজের প্রত্যন্ত শ্রেণির জনসাধারণ। আর্যেতর দেবতা বলেই তাঁরা ব্যাধ, ডোম, কাহার, দুলে, বাগদিদের মতো অন্ত্যজ শ্রেণির নিম্নবর্ণের মানুষের পূজায় সন্তুষ্ট থেকেছেন।

যতদূর জানা যায়, সভ্যতার আদিতেও দেব-দেবীর উদ্ভবের পিছনে ‘ভয়’ নামক আদিম বৃত্তিটির বিশেষ ভূমিকা রয়েছে। বাংলাদেশের অতি প্রাচীনকালের দেব-পরিকল্পনার ক্ষেত্রেও প্রাগৈতিহাসিক আদিম সমাজের এই প্রবৃত্তিটির যথেষ্ট গুরুত্ব দেওয়া হয়েছিল বলে অনেকে মনে করেন। মঙ্গালকাব্যের দেব-দেবীরা মর্ত্যের মানুষের মধ্যে ধর্মবিশ্বাস সৃষ্টিতে যতটা সফল হয়েছিলেন, তার চেয়ে বেশি সফলতা লাভ করেছিলেন তাদের মধ্যে ভয় সৃষ্টিতে। তাই একনিষ্ঠ ধর্মবিশ্বাস বা অগাধ ভক্তিস্রোতে অবগাহন করে কেউ এঁদের চরণাশ্রিত হয়েছেন এমন দৃষ্টান্ত মঙ্গালকাব্যে খুব একটা নেই। বরং, আপন শক্তিবলে তাঁরা মর্ত্যবাসীকে ভীত-সন্ত্রস্ত করে তুলেছেন, স্বপ্নাদেশে বিচলিত করে তুলেছেন, বিত্ত-সম্পত্তি, সন্তান-সন্ততি ধ্বংস করে দিয়েছেন শুধুমাত্র আত্মপ্রতিষ্ঠার নেশায় মত্ত হয়ে। কারো সামান্যতম অবমাননা তাঁরা মেনে নেননি; অত্যন্ত নিষ্ঠুরভাবে তার প্রতিশোধ নিয়েছেন।

নিরপরাধ চাঁদ সদাগরের প্রতি মনসার নিষ্ঠুরতার মতো বহু দৃষ্টান্ত মঙ্গালকাব্যগুলিতে ছড়িয়ে আছে। এ প্রসঙ্গে ড. আশুতোষ ভট্টাচার্যের মন্তব্য প্রণিধানযোগ্য। তিনি বলেছেন—'মঙ্গালকাব্যের দেবতাগণ নীচ, স্বার্থপর, ক্রুর, প্রতিহিংসা পরায়ণা, অকৃতজ্ঞ ও ছলনাময়। তাঁহাদের প্রতি শ্রদ্ধায় ভক্তের মাথা নত হইয়া আসে না, শুধু তাহাদের অকারণ নিগ্রহের আক্রমণ হইতে আত্মরক্ষা করিয়া থাকিবার জন্য ভয়ে তাঁহাদের নামোচ্চারণ করে মাত্র। ...মঙ্গালকাব্যের প্রত্যেক দেবতাই একান্ত অনিচ্ছুক ভক্তের নিকট হইতে একপ্রকার জোর করিয়া পূজা আদায় করিয়া তারপর ছাড়িয়াছেন—স্বেচ্ছায় ভক্তিপরায়ণ হইয়া কেহই বড়ো তাঁহাদের পূজা করে নাই। শক্তির যথেচ্ছ প্রয়োগ দ্বারা সমাজকে ভীত ও সন্ত্রস্ত করিয়া, স্বপ্নদ্বারা নির্যাতনের হুমকি দেখাইয়া, নানা চক্রান্তে সমুদ্যত দণ্ড হস্তে তাঁহারা নিজেদের পূজা আদায় করিয়াছেন। কিন্তু এই শক্তিদ্বারা আর কিছু করিতে পারা গেলেও অন্ততঃ সমাজের হৃদয় জয় করিতে পারা যায় না। বিভীষিকার আতঙ্ক ক্ষণস্থায়ী, কিন্তু স্বভাবত ভক্তি চিরস্থিরা। মঙ্গালকাব্যের দেবতাদিগের প্রতি নব-সংস্কার-দীক্ষিত হিন্দু সমাজের এই ভয়ের অস্তিত্ব থাকিলেও কোন কালেই শ্রদ্ধার লেশমাত্রও যে ছিল না, তাহা নিঃসন্দেহে বলিতে পারা যায়। শ্রদ্ধা গুণটি মানবের উচ্চতর বৃত্তি-সম্ভূত, কিন্তু যে স্তরের সমাজ-মন হইতে মঙ্গালকাব্যের দেব-পরিকল্পনা সম্ভব হইয়াছিল, তাহার মধ্যে শ্রদ্ধার মত উচ্চতর চরিত্রগুণের অস্তিত্ব থাকিবার কথা নহে।'[৩] মনসামঙ্গাল, চণ্ডীমঙ্গাল ও ধর্মমঙ্গাল এই তিন প্রধান ও বৃহদায়তন এবং শীতলামঙ্গাল, রায়মঙ্গাল, সূর্যের পাঁচালি, শনির পাঁচালি, সত্যপীরের পাঁচালি, শিবায়ন প্রভৃতি মঙ্গালকাব্যগুলিতে দেব-দেবীর উক্ত বৈশিষ্ট্য ধরা পড়লেও, মসৃণভাবে স্বমহিমায় প্রতিষ্ঠিত কিছু দেব দেবীরও সন্ধান মিলেছে। সেখানে দেবতার সাথে নায়কের কোনো বিরোধ নেই, বরং দেবতার আশীর্বাদে ও অকুণ্ঠ সহায়তায় নায়ক জীবনে সফলতা লাভ করেছে। অবশ্য সে মঙ্গালকাব্যগুলি সংস্কৃত পুরাণনির্ভর লোক-চেতনাবর্জিত। যেমন, দেবীমঙ্গাল, গৌরীমঙ্গাল, গঙ্গামঙ্গাল, ষষ্ঠীমঙ্গাল, সারদামঙ্গাল, তীর্থমঙ্গাল, পঞ্চাননমঙ্গাল, সুবচনীমঙ্গাল প্রভৃতি। যদিও এ মঙ্গালকাব্যগুলি জনমানসে তেমন প্রভাব বিস্তার করতে পারেনি।

মঙ্গালকাব্যের কবিগণ লৌকিক দেব-দেবীকে মহিমান্বিত করতে গিয়ে পুরাণ-নির্ভর অলৌকিকতার আশ্রয় নিয়েছেন। কিন্তু কেন? আর্যেতর লৌকিক-চেতনায় এই দেব-পরিকল্পনা করা যেত না কি? হয়তো বা যেত, কিন্তু হিন্দুর পৌরাণিক দেব-মহিমার সঙ্গো এই সমস্ত লৌকিক দেবতাদের অন্তত কিছুটা সংযুক্তিতে তাঁদের দেবত্ব সুপ্রতিষ্ঠিত হবে না এবং নিম্নবর্ণের মানুষদের মধ্যেও আত্মতুষ্টি সাধিত হবে না। সুতরাং যুগের দাবিকে শিরোধার্য করে এবং নিম্নশ্রেণির দেবতাদের সমাজে সুপ্রতিষ্ঠিত করতে লৌকিক চেতনাপুষ্ট এবং লৌকিক জীবনাশ্রয়ী দেবকুলকে কিছুটা পৌরাণিক ভাব-ভাবনায় উন্নীত করতে হয়েছিল। এছাড়া মঙ্গালকাব্যের জনসাধারণ মূলত অনার্য সম্প্রদায়ভুক্ত। এই অনার্যদের আশা-আকাঙ্ক্ষা, বিশ্বাস-সংস্কার, জীবনাচরণ, জাদুবিশ্বাস প্রভৃতিকে কেন্দ্র করেই মঙ্গালকাব্যের দেব-দেবীদের আবর্তন, এঁরা অনার্য শ্রেণির লোকসমাজেরই আরাধ্য। এই অনার্য দেব-দেবীরা ধীরে ধীরে

আর্য সংস্কৃতির অঙ্গীভূত হয়েছেন ঠিকই, কিন্তু সামাজিক নানা বিপর্যয়, নানা পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে সেই অন্তর্ভুক্তি ঘটেছে। পণ্ডিতেরা মনে করেন, বাংলাদেশে সর্বপ্রথম অস্ট্রিকগোষ্ঠী বসবাস শুরু করে। দ্রাবিড়দের আগমন ঘটেছিল তার কিছুকাল পরে। এই দুই জাতির রক্তগত এবং সাংস্কৃতিক মিশ্রণে বাংলাদেশে এক মিশ্র সংস্কৃতি গড়ে উঠেছিল। মোঙ্গল গোষ্ঠীরও সংযুক্তি ঘটেছিল এই মিশ্র সংস্কৃতির সঙ্গে। পরবর্তীকালে আর্যজাতি এদেশে এসে অস্ট্রিক, দ্রাবিড় ও মোঙ্গলদের সঙ্গে বসবাস শুরু করে এবং বাঙালি সভ্যতা-সংস্কৃতিতে আর্যীকরণ শুরু হয়। গুপ্ত যুগই এই আর্যীকরণের সুবর্ণ যুগ হিসাবে চিহ্নিত। স্বভাবতই বাঙালি সভ্যতা ও সংস্কৃতিতে পূর্বোক্ত জাতির উপাদান মিশ্রিত হয়েছে। অনার্য এবং আর্যের এই সুসংবন্ধ মেলবন্ধনের ফলে অনার্য দেব-দেবীরা আর্য সভ্যতার স্বীকৃতি পেয়েছেন। এছাড়া যুদ্ধে পরাস্ত অনার্য রমণীদের বিবাহ করে আর্যরা তাদের সমাজে নিয়ে এসেছেন। সেই সমস্ত রমণীদের সাথে সাথে তাদের আরাধ্য দেব-দেবীরাও আর্যসমাজে প্রবেশ লাভ করেছে। লোকায়ত জীবনের সংস্কারবশত হোক আর ভক্তিতে হোক সেই রমণীরা প্রাণপণ চেষ্টা চালিয়েছেন সেই সমস্ত লৌকিক দেব-দেবীকে প্রতিষ্ঠা করবার জন্য। কিন্তু আর্যসমাজ খুব সহজে এই সমস্ত লৌকিক দেবতাদের অনুপ্রবেশকে মেনে নেয়নি। বহু সামাজিক সংঘর্ষ, উত্থান-পতনের ইতিহাসকে সাক্ষী হতে হয়েছে এই আর্যীকরণের সম্পূর্ণতা পেতে। এই আর্যীকরণের ফলশ্রুতিতে জরুৎকারু (মনসা) মহাদেবের কন্যায় রূপান্তরিত হয়েছেন। অনার্য ব্যাধের দেবী চণ্ডী শিব-পত্নী উমার সঙ্গে একাত্ম হয়ে গেছেন। ধর্মঠাকুর শিবের মাহাত্ম্যে উন্নীত হয়ে পৌরাণিক দেবতার অনুরূপ মহিমায় প্রতিভাত হয়েছেন।

অনার্য-সম্ভূত এবং লৌকিক চেতনা পুষ্ট মঙ্গলকাব্যের দেব-দেবীর স্বরূপ উদ্ঘাটন করতে গেলে দেখতে হবে পৌরাণিক দেব-কাহিনির সঙ্গে এঁদের উদ্ভব ও বিকাশের কাহিনির কীরূপ সাদৃশ্য বা বৈসাদৃশ্য আছে। তাঁরা কীভাবে পুরাণাশ্রিত হয়েছেন, আর পুরাণাশ্রিত না হয়ে লৌকিক জীবনাশ্রিত হলে তাদের দেবতা হয়ে ওঠার ক্ষেত্রে কীরূপ প্রতিবন্ধকতার সম্মুখীন হতে হত কিংবা আত্মশক্তিতে আস্থাহীন বাঙালি জনমানসে তাঁদের স্বরূপের যথার্থ প্রতিফলন ঘটত কিনা। পুরাণের সমস্ত লক্ষণের সঙ্গে মঙ্গলকাব্যের সাদৃশ্য খুঁজতে গেলে তেমন ফল মিলবে না। তবে কিছু কিছু ক্ষেত্রে পুরাণের সঙ্গে ঈষৎ সাদৃশ্য রেখে মঙ্গলকাব্যের কায়া নির্মিত হয়েছে। যেমন, সৃষ্টিতত্ত্ব পুরাণ ও মঙ্গলকাব্য উভয় ক্ষেত্রেই বিদ্যমান। তবে মঙ্গলকাব্যের সৃষ্টিতত্ত্বে কোথাও কোথাও কল্পনার আশ্রয় নেওয়া হয়েছে। দেবমহিমা উভয় ক্ষেত্রেই কীর্তিত। পুরাণে যেখানে কোনো উচ্চ রাজবংশকে তুলে ধরা হয়েছে, মঙ্গলকাব্যে সেক্ষেত্রে কোনো মর্ত্যচারী সাধারণ মানুষের জীবনকথা বর্ণিত। মঙ্গলকাব্যে বর্ণিত 'বন্দনা' অংশে উদ্দিষ্ট দেবতাকে স্তব-স্তুতি করবার সাথে সাথে অন্যান্য দেবতাদেরও প্রশস্তি করা হয়েছে। পুরাণের 'দেবকীর্তি' অংশেও অন্য দেবমহিমা কীর্তনের প্রসঙ্গ আছে। পুরাণের 'মোক্ষ নিরূপণে'র সঙ্গে মঙ্গলকাব্যে অভিশপ্ত স্বর্গীয় দম্পতির শাপমুক্তির সাদৃশ্য লক্ষণীয়। কিন্তু মনে রাখতে হবে পুরাণের দেব-দেবীর অবিকল অনুসরণ

মঙ্গলকাব্যের দেব-দেবীর মধ্যে কোথাও ঘটেনি। পুরাণের ছাঁচে হয়তো এঁদের খানিকটা ঢালাই করার প্রচেষ্টা হয়েছে, কিন্তু কখনো তা লৌকিক জীবন বর্জিত-হয়নি। পুরাণে রমণীর পাতিব্রত্য যেমন একটি বিশেষত্ব লাভ করেছে, মঙ্গালকাব্যেও তার নিদর্শন আছে। মনসামঙ্গালে বেহুলার পাতিব্রত্য অতুলনীয়, চণ্ডীমঙ্গালে ফুল্লরাও এই গুণে প্রশংসনীয়। পুরাণের বীরপূজার প্রসঙ্গা মনে পড়লে মনসামঙ্গালের চাঁদ সদাগরের পুরুষকার আমাদের কাছে জীবন্ত হয়ে ওঠে। ধর্মমঙ্গালে লাউসেনও বীরদর্পে তার প্রভাব বিস্তার করেছে। সুতরাং পুরাণের প্রেরণা থেকেই যে মঙ্গালকাব্যের জন্ম সে কথা অনস্বীকার্য। তবে যেহেতু মঙ্গালকাব্যের প্রধান উপজীব্য বিষয় মর্ত্যের নরনারী, আপামর সাধারণ মানুষ, তাই মঙ্গালকাব্য পুরাণের স্তর অতিক্রম করে কাব্যের স্তরে উন্নীত হয়েছে।

এবার আলোচনা করা যাক মঙ্গালকাব্যের কিছু দেব-দেবীর উদ্ভব ও বিকাশ সম্পর্কে এবং পৌরাণিক আবহাওয়া ও আর্যসভ্যতার সংস্পর্শে এসে তাঁরা কীভাবে পরিপুষ্টি লাভ করেছেন সে সম্পর্কে। মনসামঙ্গালে সর্পের অধিষ্ঠাত্রীদেবী হিসাবে মনসাদেবী স্বীকৃতি পেয়েছেন। কিন্তু বৈদিক কাল থেকে শুরু করে মহাভারতের কাল কিংবা বৌদ্ধ সাহিত্যেও কোথাও সর্পদেবীর উল্লেখ পাওয়া যায় না। ভারতবর্ষে সর্পপূজার উৎপত্তি সম্পর্কে পণ্ডিতদের মধ্যে ভিন্ন ভিন্ন মতের সন্ধান পাওয়া যায়। পাশ্চাত্য পণ্ডিত জে. ফার্গুসন তুরানীয় জাতি থেকে সর্পপূজার উৎপত্তি হয়েছে বলে মনে করেন। তুরানীয় জাতি ভারতবর্ষে এসে আর্যদের মধ্যে এই পূজা প্রবর্তন করেন বলে তিনি তাঁর 'Tree and Serpent worship' গ্রন্থে জানিয়েছেন। আর এক পাশ্চাত্য পণ্ডিত W. D. Hambly -ও এই মতের সমর্থক। মহাভারতে 'নাগ' নামক একটি জাতির সন্ধান পাওয়া যায়। 'নাগ' শব্দটি 'সর্প' শব্দের সমার্থক হওয়ায় নাগজাতির সঙ্গো সর্পপূজার যোগ সম্ভব বলে অনেকে মনে করেন। কিন্তু নাগজাতির সঙ্গো আর্যজাতির বিরোধ সর্বজনবিদিত। সুতরাং আর্যজাতি থেকে সর্পপূজাকে নাগ জাতি গ্রহণ করেছিল একথা বলা যায় না। বরং আর্যেতর কোনো সমাজ থেকে সর্পপূজার ধারাটি কালক্রমে নাগজাতির ঐতিহ্যের সঙ্গো মিশে যেতে পারে। আর তার ফলেই হয়তো সমাজে নাগপূজা প্রবর্তিত হয়েছে। নাগরাজ বাসুকি সর্পরাজরূপে পূজিত হতেন মহাভারতের যুগে। অনেকের মতে ভারতের উত্তর-পশ্চিম অঞ্চলে নাগ নামে যে জাতি বাস করত তারা সর্পফণাকে জীবক (Totem) হিসাবে ব্যবহার করত। মহাভারতের নাগজাতির সঙ্গো এদের সাদৃশ্য থাকা অসম্ভব নয়।

ভারতবর্ষে প্রাচীনকালে গিরিগুহায় জীবন্ত সর্পকে আবন্ধ রেখে অত্যন্ত ভক্তি সহকারে পূজা করা হত। দাক্ষিণাত্যের কোনো কোনো জায়গায় এখনো জীবিত সর্পপূজার রীতি প্রচলিত আছে। মেসোপটেমিয়ায় আবিষ্কৃত একটি প্রাচীন মূর্তির দুটি বাহুতে ও গলায় সর্পের হার দেখে মনে হয় সেখানেও সর্পপূজার প্রচলন ছিল। ভারতের আদিম জাতি হিসাবে পরিচিত সাঁওতাল, ওরাওঁ, শবর, মুণ্ডা প্রভৃতি আদি-অস্ত্রাল বা প্রোটো-অস্ট্রালয়েড জাতির মধ্যে আবার সর্পকে খাদ্য হিসাবে ব্যবহার করা হয়। তারা দেবতা হিসাবে সর্পকে কখনো শ্রদ্ধা করেনি। আবার ভারতের মোঙ্গালীয় জাতির অন্তর্ভুক্ত খাসি সম্প্রদায়ের মধ্যে

সর্পপূজার প্রচলন দেখা যায়। মধ্যযুগীয় অসমীয় ভাস্কর্যে সর্পদেবতার প্রভাব দেখা যায় আসামের বোড়ো ও মিস্‌মি জাতির মধ্যে। যজু এবং অথর্ববেদে সর্প নামের উল্লেখ থাকলেও সর্পদেবতা বা সর্পপূজার কোনো উল্লেখ নেই। ঋগ্বেদে 'অহির্বুধ্ন্য' নামে যে জীবের সন্ধান মেলে তার সঙ্গো ইন্দ্রের অহি বা বৃত্রের তুলনা করে কেউ কেউ তাকে সর্প বলে চিহ্নিত করেছেন। কিন্তু সে বিষয়েও সঠিক প্রমাণ কিছু পাওয়া যায়নি।

সর্পপূজার উৎপত্তিস্থল ভারতবর্ষ। এ সম্পর্কে ড. আশুতোষ ভট্টাচার্য তাঁর 'বাংলা মঙ্গালকাব্যের ইতিহাস' গ্রন্থে যুক্তি দেখিয়েছেন যে, সর্প গ্রীষ্মপ্রধান দেশের জীব। ভারতবর্ষ ও আফ্রিকা মহাদেশেই সর্পের অধিক দেখা মেলে। ভারতবর্ষে যত প্রজাতির সর্পের সন্ধান মেলে, পৃথিবীর অন্য কোনো দেশে এত সর্প দেখা যায় না। তাই এই ভয়ঙ্কর জীবটির প্রতি ভয়বশত তাকে সন্তুষ্ট করতে এদেশে জীবিত সর্পপূজার প্রচলন ঘটেছিল। তিনি আরো বলেছেন— 'সর্পপূজা দ্রাবিড়-সংস্কৃতিরই একটি বিশিষ্ট অঙ্গা ছিল। ইহার ব্যাপক প্রভাববশত পরবর্তীকালে আর্যসমাজও ইহা নিজ সভ্যতার মধ্যে বহুলাংশে গ্রহণ করিতে বাধ্য হইয়াছে। আর্যসভ্যতার প্রাচীনতম যে নিদর্শন পাওয়া যায়, তাহার মধ্যে সর্পপূজার কোন ইঙ্গিত পাওয়া না গেলেও আর্যজাতির আগমনের অনতিকাল ব্যবধানে রচিত সাহিত্যিক নিদর্শনের মধ্যেই এই সর্পপূজার ব্যাপক পরিচয় প্রকাশ পাইয়াছিল। এই জন্যই মনে হয়, আর্যগণ ভারতবর্ষে প্রবেশ করিয়া অনতিকালের মধ্যেই সর্পপূজক দ্রাবিড়ভাষী জাতির সংস্পর্শে আসিয়া তাহার নিকট হইতে এই নূতন সংস্কারে দীক্ষা লাভ করে।'[৪]

প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্যে সর্প বা সর্পদেবতার উল্লেখ থাকলেও বৈদিক কাল থেকে শুরু করে মহাভারত, এমনকি বৌদ্ধসাহিত্যেও সর্পদেবী হিসাবে মনসার নাম কোথাও উল্লেখিত হয়নি। মহাভারতে জরুৎকারুর পরিচয় পাওয়া যায় নাগরাজ বাসুকির ভগ্নী হিসাবে। কিন্তু মঙ্গালকাব্যে যে জরুৎকারু মনসা নামে পর্যবসিত হয়ে সর্পের অধিষ্ঠাত্রী দেবী হিসাবে বাংলাদেশে গণ্য হলেন, তার সামান্যতম ইঙ্গিতও মহাভারতে নেই। মনসা পূজার সঙ্গো বৃক্ষপূজার প্রচ্ছন্ন সম্পর্ক আছে। উর্বরতাবাদের ধারণাকে কেন্দ্র করে বৃক্ষপূজা এদেশে বহু কালাবধি প্রচলিত। বাংলাদেশে স্নুহীবৃক্ষ বা সীজবৃক্ষের সঙ্গো মনসার অঙ্গাঙ্গী সম্পর্ক আছে। এই বৃক্ষ সর্পের বাসস্থান হিসাবে গণ্য হয়ে মনসার সাথে একইভাবে পূজা পেয়ে থাকে। আসামের কিছু কিছু অনার্য প্রজাতির মধ্যে এই সীজবৃক্ষের পূজার প্রচলন আছে। এই বৃক্ষপূজা বা সর্পপূজা কীভাবে দেবীমূর্তি মনসায় ক্রমবিকশিত হয়েছে সে সম্পর্কে ড. আশুতোষ ভট্টাচার্য বলেছেন, 'পৌরাণিক যুগে যখন বৈদিক নৈসর্গিক দেব-দেবীগণ নর-নারীর প্রত্যক্ষ মূর্তি লাভ করিতে আরম্ভ করিলেন, তখনই আর্য সমাজ বহির্ভূত অঞ্চল হইতে আগত পশুদেবতাগণও তাঁহাদেরই অনুকরণে নানা প্রকার বিচিত্র দেব-দেবীর রূপ লাভ করিতে আরম্ভ করিল। সিদ্ধিদাতা গণেশ ইহার একটি প্রকৃষ্ট উদাহরণ। পৌরাণিক যুগে দেবতার নর-নারী আকৃতির মূর্তি গঠনই যখন দেব-পূজার প্রধান অঙ্গা হইয়া উঠিল, তখন অনার্য দেবতাগণও এই আর্দশের প্রভাব মুক্ত হইতে পারিলেন না। সেইজন্য সর্পমূর্তির পরিবর্তে এইবার ইহাদের নরাকৃতি দেবতা ও সর্পের অধিষ্ঠাত্রী নারীরূপী

দেবীতে পরিকল্পনা হইতে লাগিল।'[৫] মনসার উৎস সন্ধান করতে গিয়ে পণ্ডিতেরা ভিন্ন ভিন্ন সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন। পূর্বভারতীয় তান্ত্রিক বৌদ্ধসম্প্রদায়ের মধ্যে 'জাঙ্গুলি' বা 'জাঙ্গালীতারা' নামে এক দেবীর সন্ধান পাওয়া যায়। 'সাধনমালা' গ্রন্থে এই দেবীর পূজা প্রকরণ, মন্ত্রসহ বিস্তৃত বিবরণ আছে। জাঙ্গুলিদেবীর সঙ্গো মনসার মৌলিক সম্পর্ক খুঁজে পেয়েছেন অনেকে। ড. আশুতোষ ভট্টাচার্য জাঙ্গুলিদেবীকে 'প্রাচীন সর্পদেবী' বলে উল্লেখ করেছেন। বিষহরির একটি ধ্যানমন্ত্র বিশ্লেষণ করে তিনি নিশ্চিত হয়েছেন যে হংসারূঢ়া জাঙ্গুলিই আসলে মনসা। তিনি মনে করেন, জাঙ্গুলিদেবীই 'অথর্ব বেদোক্ত সর্পবিষনাশিনী কিরাত-কন্যা, বৈদিক সরস্বতীর প্রাথমিক পরিকল্পনার সঙ্গো অভিন্ন হইয়া তিনি পরে পূর্বভারতীয় মহাযান বৌদ্ধ সম্প্রদায়কে অবলম্বন করিয়া জাঙ্গুলি নামে পূজিতা হইতেন এবং আরও পরবর্তীকালে বৌদ্ধধর্ম বিলোপের সঙ্গো সঙ্গো বাংলাদেশে মনসা দেবী নামে পরিচিতা হইয়াছেন।' এ দেশের বৌদ্ধরাজত্বের যখন অবসান ঘটতে শুরু করে এবং হিন্দু সংস্কৃতির প্রতিষ্ঠা হতে থাকে তখন বৌদ্ধদেবী জাঙ্গুলি মনসায় পরিবর্তিত হয়ে যান। চতুর্দশ শতাব্দীতে মুসলমানদের অত্যাচারে যখন বৌদ্ধপণ্ডিতেরা দলে দলে দেশ ছাড়তে লাগলেন তখন জাঙ্গুলি পুরোপুরি মনসাতে পর্যবসিত হন। প্রাচীন কোনো সংস্কৃত অভিধানে, পাণিনির ব্যাকরণে, প্রাচীন পুরাণে কোথাও মনসা নামের উল্লেখ পাওয়া না গেলেও অর্বাচীন পুরাণ-অভিধানে মনসা নামের সন্ধান পাওয়া যায়। কোনো কোনো অর্বাচীন উপ-পুরাণে এবং সংস্কৃত অভিধানে কশ্যপ ঋষির 'মন' থেকে সৃষ্টি বলেই 'মনসা' এই দেবী আখ্যায়িত হয়েছেন বলে উল্লেখ আছে। এই উপপুরাণগুলির মধ্যে পদ্মপুরাণ, দেবীভাগবত, ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণ প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। গ্রিক উপাখ্যানে মেডুসা নামে যে দানবীর সন্ধান পাওয়া যায়, তার কেশগুচ্ছে এবং মেখলায় সর্প জড়িত অবস্থায় থাকতে দেখা যেত। এই 'মেডুসা' মনসা নামের পূর্বসূরিও হতে পারে। বাংলার বাইরে বিহার, পাঞ্জাব, উত্তর প্রদেশ ও দক্ষিণভারতের কিছু কিছু স্থানে যে স্ত্রী-সর্পদেবতার পূজা প্রচলিত আছে, মনসা তার মধ্যে প্রধান। দক্ষিণ ভারতে সর্বাধিক প্রচলিত সর্পদেবীর নাম 'মনে মঞ্চামা'। ক্ষিতিমোহন সেন তাঁর 'বাংলার মনসাপূজা' প্রবন্ধে উল্লেখ করেছেন যে 'মঞ্চামা' শব্দটি থেকেই মনসা নামের উৎপত্তি হয়েছে। এই মতের সমর্থনেই কেউ কেউ সিদ্ধান্ত করেছেন বাঙালি সাপুড়েরা যখন সারা ভারতবর্ষব্যাপী সাপ ধরা এবং খেলা দেখানোকেই তাদের জীবিকা নির্বাহের উপায় হিসাবে বেছে নিয়েছিল তখন তাদের মারফতই দক্ষিণভারত থেকে এই নামটি বাংলাদেশে এসে বাংলা ভাষায় এইরূপে পরিবর্তিত হয়েছিল। বিহারের রাঁচীতে এখনও মনসামন্দিরে মুরগি বলি দেওয়ার প্রথা আছে। তবে যেভাবেই বিবর্তিত এবং বিকশিত হোক বা কেন দ্রাবিড়রাই এদেশে মনসাদেবীর পূজা প্রচলন করেছিল এবং এদেশে এসে পরবর্তীকালের অন্যান্য জাতির সংস্পর্শে এসে কিছু পরিবর্তন এবং পরিবর্ধন সাধিত হয়ে বৌদ্ধসমাজ কর্তৃক এ পূজার আর্যীকরণ শুরু হয়েছিল। কারণ 'সাধনমালা'য় দেখা যায় মনসার তিন প্রকার মূর্তি প্রচলিত ছিল—জাঙ্গালি, মনসা ও পদ্মাবতী। এই পার্থক্য থেকে অনুমেয়, বাইরের কোনো উৎস থেকে তান্ত্রিক বৌদ্ধধর্মে এ পূজার প্রবেশ ঘটেছিল

এবং সে উৎস দ্রাবিড়। পূর্বভারতের মনসাপূজাও বৌদ্ধদের দ্বারা স্বীকৃত।

আর্যসমাজ ছিল মূলত পিতৃতান্ত্রিক। সেখানে স্ত্রী দেবতার উদ্ভব ঘটেছে অপেক্ষাকৃত পরে। বৈদিক দেব-দেবীর মধ্যে চণ্ডী নামে কোনো দেবীর উল্লেখ নেই। রামায়ণ, মহাভারত, প্রাচীন পুরাণ, প্রাচীন সংস্কৃত অভিধানে কোথাও চণ্ডীদেবীর সন্ধান মেলে না। মহাভারতে কালী, কপালী, মহাকালীর পরিচয় আছে। বৌদ্ধশাস্ত্রে উগ্রা, মহোগ্রা, বজ্রা, কামেশ্বরী, ভদ্রকালী প্রভৃতি দেবীর কথা বর্ণিত হয়েছে। জৈন ধর্মাবলম্বীরা সরস্বতীকে শক্তিরূপিণী বলে শ্রদ্ধা করেন। বেদে ভুবনেশ্বরী, অম্বিকা, রুদ্রপত্নী, কাত্যায়নীএবং অন্যান্য গ্রন্থে ভদ্রকালী, ভবানীদেবীর উল্লেখ থাকলেও চণ্ডী নামের দেবী সেখানে অনুপস্থিত। যে সমস্ত উপপুরাণে চণ্ডীদেবীর উল্লেখ পাওয়া যায় তার মধ্যে ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণ, বৃহদ্ধর্মপুরাণ, মার্কণ্ডেয় পুরাণ, স্কন্দপুরাণ, হরিবংশ, দেবীপুরাণ প্রভৃতি অন্যতম। মার্কণ্ডেয় পুরাণেই চণ্ডীদেবীর প্রসঙ্গ বিশেষভাবে আলোচিত হয়েছে। তবে প্রাচীন কাল থেকেই যে এদেশে শক্তিপূজার প্রচলন ছিল সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। ‘মহাবস্তু অবদানে’ অভয়া নামে যে দেবীর কথা পাওয়া যায় কবিকঙ্কণের অভয়ামঙ্গালের সঙ্গো তার যথেষ্ট সাদৃশ্য আছে। ছোটোনাগপুরের ওরাওঁ নামক দ্রাবিড় ভাষাভাষী উপজাতির মধ্যে ‘চাণ্ডী’ নামে এক দেবীর সন্ধান পাওয়া যায়। উচ্চারণভেদে চণ্ডীকেই ‘চাণ্ডী’ বলে ডাকা হত কিনা তা বিচার্য বিষয়। চিহ্নবর্জিত ইংরাজি অক্ষরে লেখা chandi নামের সন্ধান বহু উপজাতি গ্রন্থে পাওয়া গেছে। নৃতত্ত্ববিদ শরৎচন্দ্র রায় ওরাওঁদের চণ্ডীর সঙ্গো হিন্দুদের চণ্ডীর সাদৃশ্য খুঁজে পেয়েছেন। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে প্রকাশিত দ্বিজ মাধব রচিত ‘মঙ্গালচণ্ডীর গীত’ গ্রন্থের ভূমিকাংশে সম্পাদক উল্লেখ করেছেন : ‘আমরা অনুসন্ধান করিয়া যতদূর জানিতে পারিয়াছি, তাহাতে বিহার, উড়িষ্যা এবং দিনাজপুর ও মালদহ অঞ্চলের ওরাওঁগণ চান্দী নামে এক দেবীর পূজা করে বটে, কিন্তু চাণ্ডী উচ্চারিত দেবী তাহাদের অজ্ঞাত। চিহ্ন বর্জিত ইংরেজি অক্ষরে চান্দীকে লেখা হয় chandi; ইহাকে চাণ্ডী পড়া যাইতে পারে। এইভাবেই চাণ্ডীর উদ্ভব হইয়াছে বলিয়া মনে হয়।’ কিন্তু যতদূর জানা যায় ওই অঞ্চলে ‘চান্দো’ নামক দেবতার সন্ধান পাওয়া গেলেও ‘চান্দী’ নামে কোনো দেবতা নেই। ঋগ্বেদে উল্লেখিত অরণ্যানী দেবীকে অনেকে বাংলা চণ্ডীমঙ্গালের উৎস হিসাবে দেখেছেন। পশুজননী অরণ্যানীর সঙ্গো ব্যাধের দেবীর চণ্ডীর বেশ কিছু সাদৃশ্য আছে। ড. সুকুমার সেন তাঁর ‘বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস’ গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন, ‘অরণ্যানীই বহু শত শতাব্দীর পথ বাহিয়া নানা কবি-কল্পনার রঙে ডুবিয়া ও নানা লোকভাবনার পাকে জড়াইয়া পুরানো বাঙ্গালা সাহিত্যে চণ্ডীমঙ্গালের অধিদেবী মঙ্গালচণ্ডীরূপে দেখা দিয়াছিলেন।’ কিন্তু এ তথ্য প্রতিষ্ঠিত করবার মতো যথেষ্ট প্রমাণ এখনো পাওয়া যায়নি। বরং চাণ্ডী দেবীর বৃত্তান্তে দেখা যায়, ওরাওঁ গোষ্ঠীর অবিবাহিত যুবকেরা পশু-শিকারে কৃতিত্ব লাভ ও যুদ্ধে জয়লাভ করবার জন্য এই দেবীর অর্চনা করত। মঙ্গালকাব্যের চণ্ডীদেবীও ব্যাধকুলের কাছে এই কারণেই পূজিতা হন। সুতরাং এক্ষেত্রে দুই দেবীর মধ্যে বিশেষ সাদৃশ্য বর্তমান। তাছাড়া ছোটোনাগপুরের ওরাওঁ জাতি বহুকাল যাবৎ হিন্দু সমাজের প্রতিবেশী হিসাবে বসবাস

করায় দুই জাতির ধর্মাচরণে ও সংস্কৃতিতে মিশ্রণ ঘটাও অসম্ভব নয়। ছোটোনাগপুরের বীরহোড় জাতির মধ্যে মৃগয়ার অধিষ্ঠাত্রী দেবীরূপে চাণ্ডী বা চাণ্ডীবোঙ্গা নামে এক দেবীর পূজা প্রচলিত আছে। মৃগয়াজীবী বীরহোড়েরা শিকারের সাফল্যের জন্য এই দেবীর কাছে মোরগ বলি দেয়। এই চাণ্ডীকে চণ্ডীদেবীর পূর্বসূরি বলে অনেকের ধারণা। তবে ওরাওঁদের চাণ্ডীর সঙ্গেই দেবী চণ্ডীর সাদৃশ্য খুঁজে পাওয়া গেছে অধিক পরিমাণে। ওরাওঁদের চাণ্ডী বহুরূপধারিণী ও মৃগয়ার দেবতা। দেবী চণ্ডীও চণ্ডীমঙ্গলে কখনো 'গোধিকা', কখনো 'দশভুজা', কখনো 'কমলে-কামিনী' রূপ পরিগ্রহ করেছেন এবং পশুকুলকে রক্ষা করেছেন। জাপানের প্রাচীন বৌদ্ধদেবী চলন্থী থেকে চণ্ডী নামের উৎপত্তিকেও কেউ কেউ গুরুত্ব দিয়েছেন। আবার চণ্ডীদেবীর পরিকল্পনা, বৌদ্ধদেবী বজ্রধাত্বেশ্বরী থেকে শক্তির দেবী বাসুলীর উদ্ভবের প্রেক্ষাপটেও হতে পারে।

'চণ্ডী' শব্দটি মূলত সংস্কৃত নয়, বলা যায় অর্বাচীন সংস্কৃত শব্দ। দ্রাবিড়, অস্ট্রিক কিংবা নিষাদ এই ধরনের কোনো অনার্য শব্দ থেকে পরবর্তীকালে সংস্কৃতে এসে প্রবেশ করেছে। পণ্ডিত চিন্তাহরণ চক্রবর্তী অনার্যজাতির তান্ত্রিক আচারের অনুরূপ আচার থেকে চণ্ডীর উদ্ভবকে স্বীকৃতি দিয়েছেন। এসব সমালোচনা ছাড়া আর একটি বিষয় দেখা দরকার যে পৌরাণিক চণ্ডীর সঙ্গে মঙ্গলকাব্যের চণ্ডীর মূলগত পার্থক্য কী এবং আদৌ পার্থক্য আছে কি না। মার্কণ্ডেয় পুরাণের চণ্ডী বিষ্ণুমায়া। এই চণ্ডীর আরাধনা করে বিষ্ণুর যোগনিদ্রা ভঙ্গ করতে সমর্থ হয়েছিলেন ব্রহ্মা। শুম্ভ-নিশুম্ভ-মহিষাসুরকে বধ করেছেন ইনি। তিনি শিবা হলেও শিবঘরণী নন, মঙ্গলময়ী অর্থে শিবা। ইনি পাবর্তী, কিন্তু পর্বত-কন্যা উষা নন। চণ্ডী বিভিন্ন নামে ভূষিতা হয়েছেন— দেবী-ভগবতী, পরমেশ্বরী, নারায়ণী, অম্বিকা, গৌরী, কাত্যায়নী, ভীমা প্রভৃতি। কিন্তু উমা বা পর্বতকন্যা পাবর্তী নামে তিনি কোথাও উল্লেখিত হননি। অথচ চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের দেবখণ্ডে যে চণ্ডীর দেখা মেলে, তিনি মূলত পাবর্তী-উমা এবং কবি-কল্পনায় এঁদের সমীকরণ ঘটে লৌকিক জীবনের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে। মঙ্গলকাব্যের চণ্ডী সম্পর্কে ড. আশুতোষ ভট্টাচার্য মন্তব্য করেছেন— 'আদিবাসী সমাজ হইতে উদ্ভূত হইয়াই এই দেবী কালক্রমে উচ্চতর হিন্দু সমাজে প্রবেশ করিয়াছেন। তারপর বৈদিক দেবী দুর্গা, উমা ইত্যাদি দ্বারা কালক্রমে প্রভাবিত হইয়া ইহাদের সঙ্গে অভিন্ন হইয়া গিয়াছেন। চণ্ডী শব্দটির গঠন দেখিয়াই মনে হয় যে, ইহা দ্রাবিড় শ্রেণীর ভাষা হইতে আগত। মৌলিক শব্দটি সম্ভবত চণ্ডীই ছিল— ক্রমে অর্বাচীন সংস্কৃতে চণ্ডী, চণ্ডিকা, চণ্ডেশ্বরী, চণ্ডা ইত্যাদি রূপ লাভ করিয়াছে, কিন্তু তাঁহারা মূলত যে এক, তাহা সহজেই অনুমান করা যায়।'[৬] ড. আশুতোষ ভট্টাচার্যের সিদ্ধান্তের সমর্থনে বলা যায়, প্রাচীন বাংলার ঐন্দ্রজালিক ছড়াতে চণ্ডীকে 'হাড়ির ঝি' বলে উল্লেখ করা হয়েছে। এই হাড়ি জাতি বাংলাদেশের অনার্য সম্প্রদায়ের একটি শাখা। সুতরাং, এদের সঙ্গে এইরূপ সম্পর্ক থেকেই চণ্ডীর অনার্য সংস্রব সূচিত হয়। বাংলাদেশে চণ্ডী পশুকুলের আরাধ্য দেবী হিসাবে সুপ্রতিষ্ঠিত। ব্যাধেরাই তাঁর প্রধান পূজক। ওলাই চণ্ডী, চেলাই চণ্ডী, কুলুই চণ্ডী, নাটাই চণ্ডী প্রভৃতি নামে স্বতন্ত্র ভাবে ইনি পূজিতা হন। অনার্য সমাজের রমণীরা বিবাহ সূত্রে আর্যসমাজে প্রবেশের ফলে, তাদের

হাত ধরেই দেবী চণ্ডী আর্য সমাজের চৌকাঠ পেরিয়েছেন বলে মনে হয়। ধনপতির আখ্যানে তার ইঙ্গিতও আছে। মঙ্গলকাব্যের চণ্ডী মূলত অনার্য লৌকিক দেবী। তাই প্রাচীন পুরাণে তাঁর দেখা মেলেনি। দ্রাবিড়, নিষাদ কিংবা কিরাত জাতি থেকেই তাঁর উদ্ভব ঘটেছে। পরবর্তীকালে তাঁর ওপর বৌদ্ধ ও হিন্দুতান্ত্রিক দেব-পরিকল্পনার প্রলেপ পড়েছে, শুরু হয়েছে আর্যীকরণ এবং পৌরাণিক চণ্ডীর সঙ্গে একাত্ম হয়ে তিনি দেবী হিসাবে বাংলাদেশে সুপ্রতিষ্ঠিত হয়েছেন।

ধর্মঠাকুরের উদ্ভব সম্পর্কে পণ্ডিতেরা এক মত হতে পারেননি। বাংলা সাহিত্যে সর্বপ্রথম ধর্মমঙ্গল সম্পর্কে আলোচনা পাওয়া যায় রামগতি ন্যায়রত্নের 'বাঙ্গালা ভাষা ও বাঙ্গালা সাহিত্য বিষয়ক প্রস্তাবে'। কিন্তু ধর্মঠাকুর সম্পর্কিত বিস্তারিত কোনো আলোচনা সেখানে পাওয়া যায়নি। মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর মতে ধর্মঠাকুর আসলে বৌদ্ধ দেবতা। তিনি মনে করেন বৌদ্ধধর্মের পরিণতি ঘটেছে ধর্মঠাকুরে এসে। মানিকরাম রচিত ধর্মমঙ্গলের সৃষ্টিতত্ত্ব অংশে ধর্মকে 'শূন্যমূর্তি' রূপে দেখানো হয়েছে। সেই সূত্র ধরে ব্রজসুন্দর সান্যাল তাঁর 'মাণিকরাম ও ধর্মমঙ্গল' প্রবন্ধে ধর্মকে বৌদ্ধ দেবতা বলে অভিহিত করেছেন। নগেন্দ্রনাথ বসু প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব 'রামাই পণ্ডিতের শূন্যপুরাণ' গ্রন্থে, ননীগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় 'ধর্মপূজা বিধান' গ্রন্থে, দীনেশচন্দ্র সেন 'বঙ্গভাষা ও সাহিত্য' গ্রন্থে ধর্মঠাকুরকে বৌদ্ধ দেবতা হিসাবে প্রতিপন্ন করেছেন। এছাড়া চারু বন্দ্যোপাধ্যায়, বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়, ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ প্রমুখ বিশেষজ্ঞরা মূলত শূন্যপুরাণের ওপর নির্ভর করে শূন্যতাবাদ ও আদিদেব নিরঞ্জন তত্ত্বের সঙ্গে বৌদ্ধধর্মের সংযোগ স্থাপন করেছেন এবং ধর্মঠাকুরকে বৌদ্ধদেবতা হিসাবে সুদৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠা করবার চেষ্টা করেছেন। ড. সুকুমার সেন ধর্মঠাকুরকে বৈদিক সূর্যদেবতা হিসাবে তাঁকে শ্বেত-অশ্বারোহী (ধবল-খচর) সিপাই বেশধারী (ইরাণীয়) সূর্য বলেছেন। তিনি আরো মন্তব্য করেছেন যে ধর্মঠাকুর একটি মিশ্রদেবতা। বৈদিক বরুণ দেবতা, ডোম-চাঁড়াল জাতির দেবতা, অনার্যের শিলাদেবতা, মুসলমানদের ফকির প্রভৃতির যেমন প্রভাব রয়েছে তেমনি বৈদিক সূর্য, অনার্য কোলগোষ্ঠীর প্রাচীন ধর্মবিশ্বাস, বৈদিক ধর্মাচার, প্রাচীন আর্যেতর সংস্কার, ব্রাত্য শৈবধর্ম, নাথধর্ম এবং ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতির মিশ্রণও তিনি ধর্ম ঠাকুরের মধ্যে লক্ষ করেছেন। পশ্চিমবঙ্গের বাইরে ছট্‌পরবের অন্তরালেও ধর্মঠাকুরের প্রচ্ছন্ন প্রভাব আছে বলে ড. সেন মনে করেন। নৃতত্ত্ববিদ শরৎচন্দ্র রায় মনে করেন যে, প্রাচীন হিন্দু সাহিত্যে সূর্যের আর এক নাম 'ধর্ম'। যমের আর এক নাম ধর্মরাজ। গবেষক রিজলি ধরম অথবা ধর্মরাজ নামে ডোম সম্প্রদায়ের পূজ্য মৎস্যপুচ্ছবিশিষ্ট নরাকৃতি এক দেবতার কথা উল্লেখ করেছেন। কিন্তু সূর্যের সঙ্গে ধর্মরাজের কোনো সম্পর্ক নেই। ক্ষিতিপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় ধর্মঠাকুরকে বৈদিক দেবতা বরুণের আধুনিক সংস্করণ বলে উল্লেখ করেছেন। বরুণ দেবতাকে সন্তুষ্ট করতে ছাগবলি প্রথা প্রাচীনকালে প্রচলিত ছিল। ধর্মঠাকুরের পূজায়ও বলি একটি বিশিষ্ট অঙ্গ। অঞ্চল বিশেষে ছাগবলি, নরবলি, পাখিবলি, মুরগিবলি দেওয়ার প্রথা প্রচলিত আছে। ধর্ম এবং বরুণ দুই দেবতার ক্ষেত্রেই বলির প্রসঙ্গ আছে বলেই অনেকে বরুণের সঙ্গে ধর্মদেবতার সাদৃশ্য

খুঁজে পেয়েছেন। ধর্মঠাকুরের পূজারিগণ তাঁকে কোথাও বিষ্ণু, কোথাও শিব, কোথাও সূর্য হিসাবে পূজা করে থাকে। যেসব অঞ্চলে বিষ্ণু হিসাবে ধর্মঠাকুর পূজিত হন সেখানে ধর্মঠাকুরের মূর্তিকে কূর্মরূপে বিবেচনা করা হয়। কারণ বিষ্ণুর দশ অবতারের মধ্যে কূর্ম একটি রূপ। ধর্ম কূর্মের ওপর আসন করে আছেন। এই আসন করা থেকে কোথাও কোথাও ধর্ম স্বয়ং কূর্ম হয়ে গেছেন। কিন্তু ধর্মশিলার আকৃতি কূর্মের মতো নয়। কোথাও ডিম্বাকৃতি, কোথাও দীর্ঘাকৃতি, কোথাও ত্রিকোণ বা চতুষ্কোণ, কোথাও কচ্ছপাকার। কোথাও কাঁকড়াবিছার মতো। কারো মতে প্রস্তর খোদিত কূর্মমূর্তিই ধর্মঠাকুর। ধর্মের সঙ্গো কূর্ম টোটেমের যোগ আছে ঠিকই কিন্তু তাই বলে বৌদ্ধদের সঙ্গো তার সাদৃশ্য খোঁজা বোধহয় ঠিক নয়। রাঢ়ের একটি অঞ্চল গোপালপুরে কাঁকড়াবিছার মতো ধর্মঠাকুরের মূর্তি পূজিত হয়। ছোটোনাগপুর ও উড়িষ্যায় যারা ধর্ম ঠাকুরের পূজারি তারা 'ধরম দেওতা' বলতে একমাত্র সূর্যকেই বুঝে থাকেন। তবে ধর্মের সাথে কূর্মের বা কূর্মরূপের সন্ধান খোঁজার পিছনে হিন্দুসম্প্রদায়গত বিষ্ণুভক্তদের প্রভাব আছে এ কথা নিশ্চিত। বিষ্ণুর অবতার কূর্ম, আবার যমুনার বাহন কূর্ম, কূর্মপুরাণ নামে হিন্দুদের একটি সংস্কৃত পুরাণও আছে। অনেকে মনে করেন ধর্মঠাকুরের মূর্তির কোনো স্থিরতা নেই— অর্থাৎ মূর্তি আছে কিন্তু তা এক এক স্থানে এক এক প্রকার। অন্যদিকে শূন্যপুরাণ, ধর্মপূজা বিধান ও অনাদ্যের পুথিতে ধর্মঠাকুরকে নিরাকার নিরঞ্জন হিসাবে উপস্থাপন করা হয়েছে। সুতরাং সাকার মূর্তির সঙ্গো তার তুলনার প্রশ্নই ওঠে না। 'ধর্ম' শব্দটির উৎপত্তি সম্পর্কেও বিভিন্ন জন বিভিন্ন মত প্রকাশ করেছেন। ভাষাতত্ত্ববিদ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের অনুমান প্রাচীন অস্ট্রিক শব্দ 'দড়ম' বা 'দরম' -এর সংস্কৃত রূপ 'ধর্ম'। 'যে শিলাখণ্ডকে (সাধারণত অধিকাংশ শিলাই প্রায় কূর্মাকৃতি হয়ে থাকে) আদিম নিষাদ জাতি দেবতা ভেবে পূজা করত, সেই দড়ম যা আর্য-সংস্কৃতির সংস্পর্শে এসে 'ধর্মে' রূপান্তরিত হয়েছে।'[৭]

ডোমজাতিই মূলত ধর্মঠাকুরের পূজারি। ধর্মপূজায় এদের একাধিপত্য সর্বজনবিদিত। 'ডোম' শব্দটির সঙ্গো অনেকে 'ধর্ম' শব্দটির সাদৃশ্য খুঁজে পেয়েছেন। কারণ ডোমেদের সঙ্গো ধর্ম বা সমোচ্চার্য কোনো শব্দের অঙ্গাঙ্গী মিল আছে এবং ডোম সম্প্রদায়ই সেই সমস্ত শব্দের ব্যবহার করেছে। যেমন— ধরম, দেরাত্মা, ধর্মেশ প্রভৃতি ডোম সম্প্রদায়ের মধ্যে প্রচলিত শব্দ। ধর্মঠাকুর গ্রামদেবতা। কোনো গাছের নীচে বা খোলা মাঠে তাঁর আস্তানা। পশ্চিমবাংলায় ধর্মঠাকুরের বিভিন্ন নামের সঙ্গো 'রায়' যুক্ত হতে দেখা যায়। যেমন— বাঁকুড়ারায়, কালুরায়, বুড়ারায়, যাত্রাসিদ্ধিরায়, দলুরায় প্রভৃতি। এ সম্পর্কে ড. আশুতোষ ভট্টাচার্যের মন্তব্য—"'রায়' কথাটি 'রাজ' শব্দ হইতে আসিয়াছে এবং হিন্দু প্রভাবের যুগেই ধর্মঠাকুরের স্থানীয় নামের সঙ্গো যুক্ত আছে বলিয়া মনে হয়। প্রধানত ডোমদিগের পূজিত দেবতা বলিয়া রাঢ় অঞ্চলের নবাগত বৌদ্ধ ও হিন্দু বসতিস্থাপনকারীগণ বোধহয় এই দেবতাকে 'ডোমরায়' বলিয়াই উল্লেখ করিত। 'ডোমরায়' হিন্দু প্রভাবের যুগে ধ্বনিতত্ত্বের (phonology) সাধারণ নিয়মানুসারেই প্রথমত, বর্ণ বিপর্যয়ে এবং দ্বিতীয়ত, সংস্কৃতকরণ (Sanskritisation) নীতি দ্বারা 'ধর্ম' কথাটি এইভাবে পরিবর্তিত হইয়া থাকিবে;

যেমন— ডোমরায় > ডোমরা Domra > ডোম্‌রা > ডোর্‌মো> ধর্ম। পশ্চিম বর্ধমানে নিত্যানন্দপুর গ্রামে 'ডোমুর‍্যা' নামক এক ধর্মরাজ আছেন, তাঁহার সঙ্গো ডোম্‌রা বা ডোম রায় কথাটির সম্পর্ক থাকিতে পারে। বর্ধমান জিলার ডোম্‌রা, বীরভূম জিলার ডুমরা ও মানভূম জিলার ডুমরাও নামক গ্রাম সমূহে প্রাচীন ধর্মমন্দির ও ডোম জাতির ঘন বসতি আছে। ইহাদের সঙ্গোও 'ধর্ম' কথাটির সম্পর্ক আছে বলিয়া মনে হয়। ক্রমে বৌদ্ধ হিন্দু প্রভাবিত যুগে রাঢ়ে প্রচলিত সূর্যদেবতার ডোমের সঙ্গো সম্পর্কিত অনার্য নামটির পরিবর্তে ধর্ম কথাটির ব্যাপক প্রচার হয়— কারণ ধর্ম এক অর্থে বুদ্ধ, আবার হিন্দু পুরাণের মতে যম। যখন ধর্ম নামটিকে বৌদ্ধ আশ্রয় লাভ করিল, তখন ধর্মঠাকুরের বুদ্ধ পরিকল্পনাও হিন্দু পরিকল্পনার মধ্যে আসিয়া সংমিশ্রণ লাভ করিল; সেইজন্য ধর্মঠাকুর ব্রাহ্মণ পুরোহিত কর্তৃক বিষ্ণু কিংবা যম বলিয়া কল্পিত হইয়াও নিরঞ্জন বলিয়া অভিহিত হন।"[৮] ডোমজাতির সঙ্গো ধর্ম শব্দটির অঙ্গাঙ্গী যোগ ও পরবর্তীকালে হিন্দুধর্মের স্পর্শকে ড. ভট্টাচার্য বিশেষভাবে গুরুত্ব দিয়েছেন। অন্যত্র তিনি ধর্মপূজাকে আদিম সূর্যপূজা বলে উল্লেখ করেছেন এবং ধর্মপূজার মধ্যে সূর্যোপাসনার তিনটি ধারা, যথা— আদিম, বৈদিক এবং পারসিকের সংমিশ্রণ ঘটেছে বলে নিশ্চিত হয়েছেন।

ধর্মঠাকুর সম্পর্কে সমালোচকদের মধ্যে নানামত দেখা গেলেও প্রত্যক্ষভাবে এর সাথে বৌদ্ধধর্মের সংযোগ সাধন করা যেমন কঠিন, তেমনি প্রাগার্য অস্ট্রিক সমাজের সূর্যোপাসনা এবং প্রাচীন-অর্বাচীন বৈদিক-অবৈদিক সৌরকাল্টের প্রভাবকে অস্বীকার করাও দুরূহ। ধর্মমঙ্গালের সৃষ্টিতত্ত্বের সঙ্গো বৈদিক সৃষ্টিতত্ত্বের সাদৃশ্য থেকে মনে হয় ধর্মঠাকুরে বৈদিক প্রভাব আছে। ধর্মমঙ্গালের ধর্ম ও পুরাণের বিষ্ণুর একীভূত হওয়াও কোনো কোনো ক্ষেত্রে দেখা যায়। বাংলাদেশে বহুল প্রচলিত শিবের গাজনের সঙ্গো ধর্মের গাজনের প্রচুর ঐক্য লক্ষ করা যায়। আদিম বাংলার কোলগোষ্ঠীর শিলা 'টোটেমে'র সাথে ধর্মঠাকুর নামাঙ্কিত প্রস্তরখণ্ড পূজার সাদৃশ্য লক্ষণীয়। এখানে শিবলিঙ্গোর প্রভাবও অসম্ভব নয়। সুতরাং মিশ্র ধর্মীয় প্রভাব ও সংস্কৃতির প্রভাবে সৃষ্ট ধর্মঠাকুর পরবর্তীকালে ব্রাহ্মণ্য প্রভাব দ্বারা পরিপুষ্টি লাভ করেছে।

ধর্মঠাকুর মূলত উত্তর রাঢ়ভূমির মধ্যেই সীমাবদ্ধ। তিনি প্রধানত দাতা। নিঃসন্তান নারীকে সন্তান দান করেন, অনাবৃষ্টি হলে ফসল দান করেন, কুষ্ঠরোগীর রোগমুক্তি ঘটান। রাঢ় অঞ্চলে আর্য সভ্যতার প্রসার বিলম্বিত হওয়ায়, অনার্য-সম্ভূত অন্যান্য দেব-দেবীর মতো তাঁর আর্যীকরণ সম্পূর্ণ হয়নি। তিনি কিছুটা অনার্য স্তরেই রয়ে গেছেন। আদিম অনার্য উপকরণ এখনো ধর্মঠাকুরের মধ্যে বর্তমান। এ প্রসঙ্গো ড. অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়-এর মন্তব্য স্মরণযোগ্য। তিনি বলেছেন, 'ধর্মোপাসক সম্প্রদায় পশ্চিমবঙ্গোর বহুস্থলে এখনও আছে এবং অদ্যাপি তাহারা ধর্মঠাকুরের অর্চনার দ্বারা পুরাতন 'কাল্‌ট্‌'-এর ধারা কতকটা রক্ষা করিতেছে।'[৯] বোধ হয় এই 'কাল্‌ট্‌' প্রবল ছিল বলেই ধর্মমঙ্গাল কাব্যে ধর্মের উন্নত মাহাত্ম্য সপ্তদশ শতাব্দীতেও অক্ষুণ্ণ থেকেছে। সামগ্রিক আলোচনার পর এই সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় যে, ধর্মঠাকুর মূলত প্রাগার্য আদিম কোনো দেবতা। প্রাচীন

কালে একমাত্র ডোমজাতিই তাঁর পূজা করত। পরবর্তীকালে হিন্দু ও বৌদ্ধ ধর্মের বহু দেব-দেবীর প্রভাব ধর্মপূজায় এসে গেছে। ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব, সূর্য প্রভৃতি পৌরাণিক দেবতার সংমিশ্রণে তাঁকে ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতি দ্বারা পরিপুষ্ট করা হয়েছে। তবে ধর্মঠাকুরের পরিকল্পনায় লৌকিক দেবতা সবচেয়ে বেশি কার্যকর হয়েছে একথা অনস্বীকার্য।

শিব পুরাণাশ্রিত দেবতা। ভারতীয় সভ্যতার উন্মেষপর্বে বৈদিক যুগের রুদ্র, পৌরাণিক যুগের মহেশ্বর এবং লৌকিক শিবের অঙ্গাঙ্গী যোগ সুস্পষ্ট। বৈদিক রুদ্রদেবতা ভয়ানক ও শান্ত দুই সত্তায় বিভক্ত। ইনি দেবাদিদেব মহেশ্বর, ভারতের প্রাচীনতর দেবতা। 'বেদের যিনি রুদ্র, তিনিই পুরাণের শিব-প্রমথেশ, শঙ্কর, মহাদেব। তিনি একাধারে তমোগুণে সংহারক, রজোগুণে অন্নপূর্ণার মহেশ্বর, ধনদা লক্ষ্মী, জ্ঞানদা সরস্বতী, সিদ্ধিদাতা গণপতি ও দেব সেনাপতি কার্তিকেয়ের জনক, দেবসভামণ্ডলীর ভক্তিভাজন, আদিদেব এবং সত্ত্বগুণে ব্রহ্মস্বরূপ।'[১০] শুধু অধ্যাত্মচেতনায় নয়, শিল্পে, সংস্কৃতিতে, পুরাণে, লোককল্পনায়—এককথায় ভারতীয় জীবনধারার প্রতিটি পর্বেই শিবের সুগভীর ও দীর্ঘস্থায়ী প্রভাব পড়েছে। সমগ্র ভারতীয় সভ্যতায় শৈবতত্ত্ব সংযুক্ত। লৌকিক ও অলৌকিক জীববাদের মেলবন্ধন ঘটিয়ে তিনি যতিধর্ম ও গার্হস্থ্যধর্মকে একসূত্রে গেঁথেছেন। শুধু ভারতবর্ষে নয়, মিশর, ব্যাবিলন, গ্রিস, রোম প্রভৃতি দেশেও শিবের ভাবাদর্শ বিশেষভাবে প্রচলিত। অনেকের মতে, অতি প্রাচীনকালে আর্যতর সমাজে শিবের মতো কোনো দেবতার অস্তিত্ব ছিল। পরে তাঁর সঙ্গে বৈদিক রুদ্র ও পার্বত্য শিবের সংমিশ্রণ ঘটে শিবকাহিনি জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে। আদিদেব পৌরাণিক শিবের অলৌকিক মহিমা, দেবত্ব প্রভৃতির সঙ্গে এক লৌকিক ও গ্রামীণ দেবতার প্রলেপ পরবর্তীকালে দেখা গেছে। তাই 'শিবায়নে'র শিবকে আমরা পৌরাণিক মহিমায় মহিমান্বিত দেবাদিদেব হিসাবে পাই না। এই শিবদেবতার উদ্ভব ঘটেছে বাংলার কৃষককুল থেকে। কোচ জাতীয় কৃষকদের সমাজেই পৌরাণিক শিব প্রথম প্রবেশ লাভ করেন এবং কোচদের সামাজিক জীবনের উপাদানের মিশ্রণে লৌকিক রূপ পরিগ্রহ করে কৃষিদেবতায় রূপান্তরিত হন। পৌরাণিক মহিমা পরিত্যাগ করে তিনি হয়ে উঠেছেন স্ত্রী-কন্যা-পুত্র পরিবেষ্টিত গৃহধর্মে অভিনিবিষ্ট এক পরম সংসারী শিব। গৃহধর্মের আদর্শকেই বাঙালিরা সর্বাপেক্ষা বড়ো করে দেখে। এখানে নারীজীবনের আদর্শও বিশেষভাবে স্বতন্ত্র। হাজার অভাব-অনটন, অসন্তোষ, দুঃখ-যন্ত্রণা দাম্পত্যজীবনে অটুট বন্ধনকে শিথিল করতে পারে না। শিব ও পার্বতীর মধ্যে বাঙালি জীবনের দাম্পত্য সম্পর্কের ছবি ফুটে উঠেছে। রবীন্দ্রনাথের ভাষায়, 'কৈলাস ও হিমালয় আমাদের পানাপুকুরের ঘাটের সম্মুখে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে এবং তাহাদের শিখররাজি আমাদের আমবাগানের মাথা ছাড়াইয়া উঠিতে পারে নাই। যদি তাঁহারা নিজ নিজ অভ্রভেদী মূর্তি ধারণ করিবার চেষ্টা মাত্র করিতেন, তাহা হইলে বাংলার গ্রামের মধ্যে তাঁহাদের স্থান হইত না।'[১১] বাংলার শিব পৌরাণিক যোগীরাজ শিব নন, গৃহী শিব। ইনি কৃষিকাজে নিযুক্ত হয়ে আছেন। কখনো ভিক্ষা করেও জীবিকা নির্বাহ করেছেন। সমস্ত প্রকার মানবিক দুর্বলতা এই শিবের মধ্যে বর্তমান। ইনি

ভাঙ-ধুতুরা-গাঁজায় আসক্ত, কোচ রমণীদের সঙ্গো অবৈধ প্রণয়ে লিপ্ত, বাগ্দী যুবতীকে দেখে ইনি উন্মত্ত হয়ে ওঠেন। তার সঙ্গ পাওয়ার জন্য হাঁটুজলে নেমে মাছ ধরতেও তিনি দ্বিধা করেন না। লাম্পট্য তাঁর স্বভাবসিদ্ধ। তিনি স্ত্রীর সঙ্গো কলহে মেতে ওঠেন। সংসার যাত্রা নির্বাহে তাঁর নাভিশ্বাস ওঠে। পৌরাণিক সত্তা হারিয়ে তিনি কামুক চরিত্রে পর্যবসিত হয়েছেন 'শিবায়ন' কাব্যে। পৌরাণিক শিব ও লৌকিক শিব মূলত এক কিনা সে বিষয়ে ড. আশুতোষ ভট্টাচার্যের মন্তব্য প্রণিধানযোগ্য— 'ব্রাহ্মণ্যধর্ম এদেশে প্রচার লাভ করিবার সঙ্গো সঙ্গোই বৌদ্ধ ও জৈনধর্মের বহু উপাদান আসিয়া লৌকিক শৈবধর্মের সঙ্গো মিশ্রিত হইতে আরম্ভ করে। পৌরাণিক শিবের পরিকল্পনাও বুদ্ধদেবের চরিত্র দ্বারা প্রভাবিত। অতএব বাংলার তদানীন্তন বৌদ্ধসমাজ শিবের চরিত্রের মধ্যেই নিজেদের আদর্শের সন্ধান পাইয়াছিল। জৈন তীর্থঙ্করাদিগের জীবনাদর্শ গৌতম বুদ্ধ ও পৌরাণিক শিব হইতে বিশেষ স্বতন্ত্র নহে, এইজন্যেই কালক্রমে তদানীন্তন বাংলার বিরাট বৌদ্ধ ও জৈন সমাজ নিজেদের ধর্মীয় উপকরণ দ্বারা এদেশের শৈবধর্মকে অভিনবরূপে পুনর্গঠন করিয়া লইয়াছিল। বাংলাদেশের তদানীন্তন আর একটি ব্যাপক প্রচলিত ধর্ম নাথধর্ম। শৈব কিংবা বৌদ্ধধর্মের বাহিরে ইহার উদ্ভব হইলেও শৈবধর্মের ব্যাপক প্রসারবশত কালক্রমে নাথসিদ্ধাগণও শিবকে গুরু বলিয়া স্বীকার করিয়া লইলেন। ক্রমে হিন্দু, বৌদ্ধ, জৈন, নাথ ও অনার্য— এই সকল ধর্মমত হইতে উপকরণ সংগ্রহ করিয়া বাংলার লৌকিক শৈবধর্ম এক অভিনব সঙ্কর রূপ পরিগ্রহ করিল।'[১২] বস্তুত, শিব সংহারের দেবতা। তিনি রুদ্র রূপে ধ্বংসের প্রতিভূ হলেও ঔদার্যে ও সহনশীলতায় তিনি অতুলনীয়। তাই অন্যান্য ধর্মসম্প্রদায় তাঁকে খুব সহজে আপন করে নিতে পেরেছিল। বলা যায়, এই আশুতোষের ওপর বৌদ্ধ, জৈন, নাথধর্ম এবং অনার্য-আর্য সম্প্রদায়ের প্রভাব পড়ে সঙ্কর শিব সৃষ্টি হলেও বাঙালি জীবনাচরণের লৌকিক উপাদান তাঁকে সামগ্রিকভাবে পরিপুষ্ট করে শিবায়ন কাব্যের 'মানুষ-শিবে' পরিণত করেছে।

মধ্যযুগের রাজনৈতিক বিশৃঙ্খলা, প্রতিকূল রাজশক্তি ও ধর্মীয় বিভেদের প্রাবল্য থেকে রেহাই পেতে তৎকালীন হিন্দুসমাজ এই সমস্ত অনার্য দেব-দেবীর শরণাপন্ন হয়েছিল। দেবজনোচিত নয়, প্রতিহিংসাপরায়ণ ক্রূর দেবতাদের প্রতিই তৎকালীন জনমানস বেশি আকৃষ্ট হয়েছিল। তাই দেবী চণ্ডীর কলিঙ্গারাজ্যে বন্যাসৃষ্টি, মনসার দ্বারা চাঁদ সদাগরের প্রতি অত্যাচার তদানীন্তন শাসকগোষ্ঠীর অন্যায় আচরণের প্রতিধ্বনি ঘটানোর মাধ্যম হয়ে উঠেছিল। তাছাড়া যেকোনো ধরনের ভয়, অন্যধর্মের প্রাবল্য, ধর্মচ্যুতির ভীতি প্রভৃতিও এই সমস্ত দেব-দেবীর উদ্ভবের প্রেক্ষাপট। তাছাড়া রাষ্ট্রশক্তির পীড়নে মানুষ যখন আত্মবিশ্বাস হারিয়ে ফেলেছিল তখন স্বাভাবিকভাবেই তারা দৈবনির্ভর হয়ে পড়েছিল। বলা যায়, ধর্মীয় ও রাজনৈতিক পীড়নের প্রভাবেই মঙ্গালকাব্যের দেব-পরিকল্পনার উদ্ভব হয়েছিল। এ বিষয়ে রবীন্দ্রনাথের একটি উক্তি দিয়েই আলোচনা শেষ করা যায় : 'যখন

আপন শক্তির মূলধন লইয়া জনসাধারণের কারবার না চলে তখন সকল ব্যাপারেই মানুষ দৈবের কাছে, গ্রহের কাছে, পরের কাছে হাত পাতিয়া ভয়ে ভয়ে কাটায়। এই ভাবটার বর্ণনা যদি কোথাও খুব স্পষ্ট করিয়া ফুটিয়া থাকে তাহা বাংলার প্রাচীন মঙ্গালকাব্য।'[১৩]

উৎসের সন্ধানে

১. সাহিত্য, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, বঙ্গাভাষা ও সাহিত্য
২. সাহিত্য, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, বঙ্গাভাষা ও সাহিত্য
৩. বাংলা মঙ্গালকাব্যের ইতিহাস: ড. আশুতোষ ভট্টাচার্য (দশম পুনর্মুদ্রণ), পৃ. ৬৯-৭০
৪. পূর্বোক্ত, পৃ. ২৫৪
৫. পূর্বোক্ত, পৃ. ২৬২-২৬৩
৬. পূর্বোক্ত, পৃ. ৪৩৮-৪৩৯
৭. সমগ্র বাংলা সাহিত্যের পরিচয় : পরেশচন্দ্র ভট্টচার্য, তৃতীয় সংস্করণ, পৃ. ৩২৩
৮. বাংলা মঙ্গালকাব্যের ইতিহাস : ড. আশুতোষ ভট্টাচার্য, (দশম পুনর্মুদ্রণ), পৃ. ৭০১-৭০২
৯. বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত : অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, তৃতীয় সংস্করণ, পৃ. ৬৬
১০. পূর্বোক্ত, দ্বিতীয় সংস্করণ পৃ. ২১৭
১১. প্রাচীন সাহিত্য:রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
১২. বাংলা মঙ্গালকাব্যের ইতিহাস : ড. আশুতোষ ভট্টাচার্য (দশম পুনর্মুদ্রণ), পৃ. ১৮৯
১৩. কালান্তর, কর্তার ইচ্ছায় কর্ম, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

মঙ্গালগান

সুশান্তকুমার সামন্ত

বাংলা সাহিত্য ও সঙ্গীতের একটি একত্রিত রূপ বা সংমিশ্রিত রূপ 'মঙ্গালগান', যা মঙ্গালের গান। মঙ্গালজনিত গান বা মঙ্গালবহনকারী গান। সাধারণভাবে মানবের হিতসাধনকাব্য বা কল্যাণসাধনকারী, মঙ্গালসাপেক্ষে রচিত গানই 'মঙ্গালগান'। 'মঙ্গালগান' বিস্তৃত বর্ণনামূলক, আখ্যানধর্মী গান। 'মঙ্গালগান' স্তবগান। দেব-দেবীর লীলা বা মাহাত্ম্য বর্ণনামূলক গানই 'মঙ্গালগান'। 'মঙ্গালগান' কাব্যধর্মী গান। তবে, আজকের দিনে উৎকৃষ্ট বাংলা গান বলতে স্থায়ী-অন্তরা-সঞ্চারী-আভোগ-বিশিষ্ট গানকে আমরা বুঝি। 'মঙ্গালগান' তা নয়। আবার 'মঙ্গালগান' যে 'গীতকথা' কিংবা ভাষা-গীত সে সম্বন্ধেও ভিন্ন মত পোষণ করা সম্ভব নয়। 'মঙ্গালগান'কে বাংলা কাব্যসঙ্গীতের উৎস-সঙ্গীত হিসাবে স্বীকৃতি দেওয়া যায় কিনা তা ভেবে দেখা যেতে পারে। বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস গড়ে উঠেছে কাব্যানুশীলনের মধ্যে দিয়ে আর বাংলা গানের ধারাটি কাব্যানুপন্থী। গানের কথার সঙ্গো সুরের সার্থক মিলনে গড়ে ওঠে যথার্থ কাব্যসঙ্গীত। সেখানে গানের বাণী (কথা) সুরের ঐশ্বর্যে শ্রীমণ্ডিত হয়ে অনির্বচনীয় রসের সঞ্চার করে। কাব্যসঙ্গীতের চরম উৎকর্ষতা দিয়ে মঙ্গালগানের ইতিবৃত্তকে ধরতে হলে বাংলা সাহিত্য ও সঙ্গীতের ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটটি একটু ফিরে দেখা দরকার।

বাংলা গানের ক্রমবিকাশের ধারাটি পর্যবেক্ষণ করলে দেখা যায় বাংলা সাহিত্যের অগ্রগতির সঙ্গো সঙ্গো গানের ধারাটিও পূর্ণতা পেয়েছে। সমাজ ও সভ্যতার ক্রমবিকাশ ও অগ্রগতির সঙ্গো সঙ্গো সাহিত্য যেমন তার শিশুকালকে অতিক্রম করে পূর্ণবয়স্করূপ পরিগ্রহ করেছে বাংলা গানের ক্ষেত্রেও সে কথা অক্ষরে অক্ষরে সত্য। বাংলা সাহিত্যের ঐতিহ্যের সঙ্গো বাংলা গানের সম্পর্ক তাই যেমন প্রাচীন তেমন সুস্পষ্ট। সেই ধারাবাহিকতা আজও প্রবহমান। আসলে বাংলা গানের ভিত্তিভূমি হল বাংলা সাহিত্য। এ প্রসঙ্গো একটি উল্লেখযোগ্য বিষয় হচ্ছে তখনকার দিনে সাহিত্য পুস্তকাকারে যত না জনমানসের কাছে প্রকাশিত হয়েছে, সুর-সহযোগে অনাবিল ভাবে সাধারণ মানুষের কাছে তা পৌঁছে গেছে তার চেয়ে বেশি দ্রুত ও অতি সহজে। চর্যা, বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের যেমন আদিতম নিদর্শন, বাংলা গানেরও তেমনি প্রাচীনতম উৎস। মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর 'হাজার বছরের পুরাণ বাঙ্গালা ভাষার বৌদ্ধগান ও দোহা' কিংবা পরবর্তীকালের 'চর্যগীতিকোষবৃত্তি'র

তিব্বতী অনুবাদ থেকে এ ব্যাপারে অজ্ঞাত-পূর্ব অনেক তথ্য জানা যায়। যাইহোক বাংলা সাহিত্যের ক্রমবিবর্তনের ইতিহাসে এমনই আর একটি সংযোজন—মঙ্গালকাব্য। বাংলা গানের ঐতিহাসিক পটভূমিকায় যা 'মঙ্গালগান'। মঙ্গালকাব্যও চর্যার মতোই সুরে পাঠ করা হত। এ যেন গানের ভিতর দিয়েই সাহিত্যের ভুবনখানি ধরার প্রয়াস। মধ্যযুগের সাহিত্যও রচনাকাল থেকেই সুরের মাধুর্যে বিকশিত হয়ে উঠেছে। তবুও কাব্যসম্পদের বৈভবে তা সাহিত্যেরই বিষয় হিসাবে ইতিহাস রচনা করেছে। মঙ্গালকাব্য ও মঙ্গালগান একাকার হয়ে গেছে। এ যেন একই অঙ্গো দুটি রূপ।

কাব্য ও গানের গূঢ় সম্পর্ক ও রহস্য সন্ধানের পথে বাংলা সাহিত্যের ঐতিহাসিক পটভূমিকাকে গুরুত্ব দিলে আমরা দেখতে পাই সাহিত্য-সংস্কৃতির উন্মেষের একটি বিশেষ সন্ধিক্ষণ। সেই সময়ে কী ঘটছে? মধ্যযুগের একটি নির্দিষ্ট সময়ে বাংলার সমাজজীবন ও সংস্কৃতি তখন নানাভাবে আক্রান্ত। তুর্কি আক্রমণে দেশ বিপন্ন। প্রভুত্বের লড়াইয়ের পাশাপাশি রাষ্ট্রশক্তির অত্যাচার উৎপীড়ন, জাতিগত বিরোধ-বিদ্বেষ ইত্যাদি জীবনের অনিশ্চয়তাকে ক্রমবর্ধমান হারে বাড়িয়ে দিচ্ছিল। ফলে বাধা পেয়েছে শিক্ষা-দীক্ষা, নানাবিধ অগ্রগতি। এ রকমই একটি অসহনীয় সন্ধিক্ষণে দুঃখ কষ্ট অপমান লাঞ্ছনা প্রবঞ্চনা অত্যাচার অবিচার থেকে অব্যাহতি পাওয়ার ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় যে-সাহিত্যসাধনার সূত্রপাত তারই বহিঃপ্রকাশ মঙ্গালকাব্য। আর মানুষের এই 'পরিব্যাপ্ত ভাবাবেগ' সংকট লঙ্ঘনের প্রবল আকাঙ্ক্ষাই প্রবাহিত হল 'মঙ্গালগানে'। 'বঙ্গাভাষা ও সাহিত্য' প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথের স্বতোৎসারিত ভাবনাটি মনে পড়ে যায়—'সমাজ যখন নিজের চতুর্দিকবর্তী বেষ্টনের মধ্যে নিজের বর্তমান অবস্থার মধ্যেই সম্পূর্ণ অবরুদ্ধ থাকে, তখনো সে বসিয়া বসিয়া আপনার সেই অবস্থাকে কল্পনার দ্বারা দেবত্ব দিয়া মণ্ডিত করিতে চেষ্টা করে। সেই চেষ্টার মধ্যে মানবচিত্তের যে বেদনা যে ব্যাকুলতা আছে তাহা বড়ো সকরুণ। সাহিত্যে সেই চেষ্টার বেদনা ও করুণা আমরা শাক্তযুগের মঙ্গালকাব্যে দেখিয়াছি। তখন সমাজের মধ্যে যে উপদ্রব-উৎপীড়ন, আকস্মিক উৎপাত, যে অন্যায় যে অনিশ্চয়তা ছিল মঙ্গালকাব্য তাহাকেই দেবমর্যাদা দিয়া সমস্ত দুঃখ অবমাননাকে ভীষণ দেবতার অনিয়ন্ত্রিত ইচ্ছার সহিত সংযুক্ত করিয়া কথঞ্চিৎ সান্ত্বনা লাভ করিতেছিল, দুঃখ ক্লেশকে ভাঙাইয়া ভক্তির স্বর্ণমুদ্রা গড়িতেছিল।' চরম সংকট মুহূর্তে 'সমস্তই সম্ভব বলিয়া বোধ'-এর অসাধ্য-সাধনে ব্রতী হওয়ায় 'প্রকৃত এবং অপ্রকৃত' 'ঘটনা এবং কল্পনা'-র সম্মিলনে উদ্ভব ঘটে মঙ্গালকাব্যের—শক্তির উপাসনা বা ভক্তিরসের প্রাবল্যে। 'কাব্য কেবলমাত্র জীবনের প্রতি সহানুভূতিই নহে, সহানুভূতির সরস অভিব্যক্তি।' আবার সরসতা প্রকাশের উপযুক্ত মাধ্যম হল গান। মঙ্গালকাব্যও হয়ে উঠল গান।

বাংলা গানের বিবর্তনের ইতিহাসকে জানতে এবার আমরা সমকালীন ও সেই সময়ের কাছাকাছি সঙ্গীতশাস্ত্র পুরাণ, বিভিন্ন গ্রন্থে মঙ্গালগানের যে অভিব্যক্তি প্রকাশিত হয়েছে বা মঙ্গালগানের যে পরিচয় লিপিবন্ধ হয়েছে সে সম্বন্ধে একটু জানার চেষ্টা করব। শারঙ্গাদেবের রচনা 'সঙ্গীত রত্নাকর'-এ আছে—

কৈশিক্যাং বোট্টরাগে বা মঙ্গালং মঙ্গালৈঃ পদৈঃ।
বিলম্বিত লয়ে গেয়ং মঙ্গালছন্দসা তথা।।

এবং আরো জানা যায় মঙ্গালগান প্রবন্ধগীতের অন্তর্গত। কৌশিকী বা বোট্টরাগে তা গাওয়া হয়। মাঙ্গালিক পদ বা ছন্দে তা নিবদ্ধ। সাধারণত, মঙ্গালগান বিলম্বিত লয়ে গাওয়া হয়। ত্রয়োদশ শতাব্দীর আগে রচিত কুমারসম্ভবেও মঙ্গালগীত অর্থাৎ মঙ্গাল গানের উল্লেখ আছে বলে জানা যায়—'সঙ্গীতাচার্য প্রজ্ঞানানন্দ দেখিয়েছেন যে ৫ম শতকের কবি কালিদাসও তাঁর কুমারসম্ভব কাব্যের অন্তত দুই জায়গায় (৮/৮৫, ১১/৩৩) কৌশিক রাগে গেয় মঙ্গালগীতের কথা উল্লেখ করেছেন।' (মধ্যযুগের কাব্যপাঠ, ড. নির্মল দাশ, ওরিয়েন্টাল বুক কোম্পানি, ১৩৯৩ বঙ্গাব্দ) 'হরিবংশে' মঙ্গালগীত বা গাথিকার উল্লেখ আছে যা আনন্দ বা উৎসবের সময় কয়েক মাস ধরে গাওয়ার রীতি ছিল। 'গীতগোবিন্দ'কে জয়দেব 'মঙ্গালমুজ্জ্বলগীতি' বলে বর্ণনা করেছেন—'শ্রীজয়দেবকবেরিদং কুরুতে মুদং মঙ্গালমুজ্জ্বলগীতি', মৈথিলী কবি উমাপতি উপাধ্যায় 'পারিজাত হরণ'-এ কাব্যসূত্র প্রসঙ্গো বলেছেন—'আদিষ্টোহস্মি শ্রীহরিহরদেবেন যথা উমাপত্যুপাধ্যায় বিরচিতং নব-পারিজাতমঙ্গালম্।' 'মঙ্গালগীত' হোক্, 'মঙ্গালগাথা' হোক আর কেবল 'মঙ্গাল'-ই হোক পুরাণেও তার উল্লেখ আছে। 'শ্রীমদ্ভাগবতপুরাণে' বর্ণিত আছে—

সৃষ্টৌমঙ্গালরূপা চ সংহারে কোপরূপিণী।
তেন মঙ্গালচণ্ডী সা পণ্ডিতেঃ পরিকীর্তিতা॥

'ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণে'র ব্যাখ্যা থেকে জানা যায়—

মঙ্গালে মঙ্গালার্হে চ সর্বমঙ্গালে।
সতাং মঙ্গাল দে দেবি সর্বেষাং মঙ্গালালয়ে।।

'বৃহদ্ধর্মপুরাণ' থেকে জানা যায়—

ত্বং কালকেতুবরদাচ্ছল গোধিকাসি
যা ত্বং শুভা ভবসি মঙ্গালচণ্ডিকাখ্যা।

'কৃত্তিবাসী রামায়ণ'-এর বর্ণনা থেকে অনুমান করা যায় গৃহে শুভ অনুষ্ঠান বা উৎসব উপলক্ষ্যে মঙ্গালগান গাওয়া হত—

নাটগীত দেখি শুনি পরম কুতূহলে
কেহ বেদ পঢ়ে কেহ পঢ়য়ে মঙ্গালে।।
নানা মঙ্গাল নাট-গীত হিমালয়ের ঘরে।
পরম আনন্দে লোক আপনা পাসরে।।

ঐতিহাসিক তথ্যে সমৃদ্ধ বৃন্দাবন দাসের 'চৈতন্যভাগবত' থেকে জানা যায়—

ধর্ম কর্ম লোকে সবে এইমাত্র জানে।
মঙ্গাল চণ্ডীর গীত করে জাগরণে।।

বাংলার আদিপদ চর্যাতেও মঙ্গালের এ রকম বর্ণনা আছে—

আলি কালি দুই পাদ ধরন্তে।
এ চউ জোইনী মঙ্গলগীতে।।

‘শ্রীকৃষ্ণকীর্তন’-এ উল্লেখ আছে—

ষোলশত গোপীজন করি কোলাহল।
জায়িতেঁ হরষিত মনে গায়িতে মঙ্গল।।

বিভিন্ন উৎস থেকে ‘মঙ্গল’-এর নানাবিধ ধারণা জন্মায়। তবে মঙ্গলকাব্যের বিকাশ ও প্রসারেই যে গান বা সংগীত রচনার উৎসাহ, আমাদেরও উৎসাহ সেই গানকে অবলম্বন করেই। তাই চণ্ডীমঙ্গালের কবি যখন বলেন—

মানিক দত্তেরে আমি করিয়ে বিনয়।
যাহা হৈতে হৈল গীত পথ পরিচয়।।

মঙ্গালগানের সঙ্গে তখন আমাদের পরিচয়ও সহজ হয়।

দৈনন্দিন সমাজ জীবনের প্রাত্যহিকতার স্পর্শ যেমন মঙ্গালকাব্য বা গানের আখ্যানবস্তু, সমাজ জীবনের রূঢ় সত্য বা বাস্তব সত্যই তার মাঙ্গালিক উপাদান। প্রসঙ্গাক্রমে ধর্ম অলৌকিকতা, দেবদেবীর লীলা বা মাহাত্ম্যকীর্তন ইত্যাদি তার উপকরণ হয়ে উঠেছে। গীতিকাব্য প্রবণতাও নিজস্ব পথ ধরে এগিয়ে চলেছে। রাজসভাকে কেন্দ্র করে সাংগীতিক ঐতিহ্যের যে ভাবনা গড়ে উঠেছিল, তারই ছোঁয়া এসে লাগল সাধারণ জনগণের মনে। তাদের রুচি অনুযায়ী তা গীত হতে শুরু করল নিত্য প্রয়োজনে। গানের ভাষা, তার অবয়ব, গীতরীতি সম্পর্কে কাব্য রচয়িতাদের মধ্যেও দ্বন্দ্ব-বিদ্বেষ দেখা দিল। যদিও ভীত সন্ত্রস্ত লৌকিক শক্তিতে আস্থাহীন বা বিশ্বাসহীন সাধারণ মানুষ দৈবশক্তির ওপর নির্ভরশীল হয়ে পড়ল। পদ্যবন্ধে লিখিত সাহিত্যের জন্ম হল তারই পরিপ্রেক্ষিতে। মনসামঙ্গালের কবি বিজয় গুপ্ত লিখলেন—

মূর্খ রচিল গীত না জানে মাহাত্ম্য।
প্রথমে রচিল গীত কানা হরিদত্ত।।
হরিদত্তের যত গীত লুপ্ত হইল কালে।
যোড়া গাঁথা নাহি কিছু ভাবে মোরে ছলে।।
কথার সঙ্গাতি নাই নাহিক সুস্বর।
এক গাইতে আর গায় নাহি মিত্রাক্ষর।।
গীতে মতি না দেয় কেহ মিছা লাফ ফাল।
দেখিয়া শুনিয়া মোর উপজে বেতাল।।

সংগীত বা গান সম্পর্কে সতর্ক ভাবনা-চিন্তা শুরু হয়ে গেল। গানের বাণী বা কথার সঙ্গাতি, ছন্দ মিল, গান গাওয়ার সময় বা রচনার সময় যে মনোযোগ দাবি করে তা নিয়ে আলোচনার সূত্রপাত ঘটল। গানের মাধুরী ও পরিপূর্ণতার প্রতি নজর রেখে কবিকঙ্কণ ‘সৃষ্টি প্রকরণ’ প্রসঙ্গে বললেন—

১. অষ্ট মঙ্গালা সায়   শ্রীকবিকঙ্কণ গায়
অমর সাগর মুনিবরে।।
২. অভয়ার চরণে   মজুক নিজ চিত
শ্রীকবিকঙ্কণ গায় মধুর সঙ্গীত।।

গানের সুচারু রূপের প্রতি আগ্রহ প্রকাশ করে 'মঙ্গালচণ্ডীর গীত'-এ দ্বিজ মাধব মঙ্গালগানের এক নব অধিষ্ঠান ঘটালেন—

হেরম্ব মহাশয়   হইয়া সদয়
ঘটেতে কর অধিষ্ঠান।
বিঘ্ন করবে নাশ   রক্ষরে নিজ দাস
সুচারু হউক মোর গান।।
(গণেশ বন্দনা, মঙ্গালচণ্ডীর গীত, দ্বিজ মাধব)

গানের মধ্যে কাব্য-ভাষা ও সঙ্গীতের উপস্থিতিকে গুরুত্ব দিতে 'অনাদিমঙ্গাল'-এর কবি রামদাস লিখলেন—

জলপানে রামদাস প্রাণ পেলে তুমি।
ধর্মের সঙ্গীত গাও শুনি কিছু আমি।।
আসরে জুটিবে গীত আমার স্মরণে।
সঙ্গীত কবিতা ভাষা ভাসিবে বদনে।।

ধর্মের সঙ্গো সঙ্গীতের নিবিড় সম্পর্ক বা সঙ্গীতের মধ্যে ধর্মের অবস্থানকে চিহ্নিত করার একটি প্রয়াস লক্ষ করা যায়। মঙ্গাল গানের ভাষা যে সহজ ও স্বচ্ছন্দ অর্থাৎ স্বতঃস্ফূর্ত হবে এখানে তারও ইঙ্গিত পাওয়া যায়। অবশ্য কবিকঙ্কণের 'গৌরীর তপস্যা' আখ্যানেও একই সম্মতি লক্ষ করার মতো—

তপস্বিনী হইয়া কর শিবপদ আশা।
মুকুন্দ রচিল গৌরীমঙ্গাল ভাষা।।

মঙ্গালগানের পরিচয় প্রসঙ্গো কবিকঙ্কণ মুকুন্দ আরো বিস্তৃত ব্যাখা করেছেন—

শুন ভাই সভাজন   কবিত্বের বিবরণ
এই গীত হইল যেন মতে।
উরিয়া মায়ের বেশে   কবির শিয়র দেশে
চণ্ডিকা বসিলা আচম্বিতে।।

গানের উৎস-মুখের সন্ধান দিতে তিনি লিখলেন—

দেবী চণ্ডী মহামায়া   দিলেন চরণছায়া
আজ্ঞা দিলেন রচিতে সঙ্গীত।
চণ্ডীর আদেশ পাই   শিলাই বহিয়া যাই
আড়রায় হইনু উপনীত।।

মঙ্গালগানের অবয়ব, আঙ্গিক, ধরন-ধারণ, রূপ ও রীতি সম্পর্কে নানা তথ্যের সন্ধান পাওয়া যায় কবিদের ভণিতা ও রচনার বিভিন্ন আখ্যানে। 'চণ্ডীমঙ্গালে'র কবিকঙ্কণ মুকুন্দ চক্রবর্তীর ভণিতায় যেমন জানা যায়— এ গানের পদ মনোহর (মুকুন্দ রচিত গীত মনোহর পদ)। মাধুর্য যে সঙ্গীতের বড়ো সম্পদ এ গানের ক্ষেত্রেও তা সত্য (শ্রীকবিকঙ্কণ গান মধুর সঙ্গীত)। ভাব সম্পদ হিসাবে রসের ভিত্তি আছে এ গানে (শ্রীকবিকঙ্কণ রস গান)। এ গানের পদকে চারুপদ বলে অভিহিত করেছেন (তাঁর সভাসদ্ রচি চারুপদ)। নৃত্যগীতি এ গানের অঙ্গীভূত (মঙ্গাল নৃত্যগীতি/ হরয়ে ভব্যভীতি/ শ্রীকবিকঙ্কণ রস ভণে)। আবার 'ধর্মমঙ্গাল'-এ কবি রূপরামের ভণিতায় উল্লেখ আছে— মঙ্গালগান ধর্মের গান (দ্বিজ রূপরাম গান ধর্মের সঙ্গীত/দ্বিজ রূপরাম গান ধর্মের মঙ্গাল)। অপরূপ সঙ্গীতের আধার মঙ্গালগান, (অপরূপ সঙ্গীত রচিল রূপরাম)। এভাবে মঙ্গালগানের নানা বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে ধারণা জন্মায়। তার 'ছন্দ' ও 'সৃষ্টি' সম্পর্কে বলতে গেলে মনে হয় মঙ্গালগান পয়ার ছন্দে রচিত। তা কখনো একপদী। কখনো ত্রিপদী—লঘু ও দীর্ঘ। ভাষার সারল্য ও স্বতঃস্ফূর্ততাও সঙ্গীত রচনার উপাদান। এ প্রসঙ্গো গোবিন্দ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'ধর্মমঙ্গালে'র পদ স্মরণযোগ্য—

আছিল ময়ূর ভট্ট সুকবি পণ্ডিত।
রচিল পয়ার ছন্দে অনাদ্যের গীত।।

পাশাপাশি 'অথ সৃষ্টি পালা আরম্ভ' আখ্যানে কবিকঙ্কণের বাণীও উল্লেখের দাবি রাখে—

প্রভুর ইঙ্গিত পাইয়া আদিদেবী মহামায়া
সৃষ্টি সৃজিবারে কৈল মন।
রচিয়া ত্রিপদী ছন্দ পাঁচালী করিয়া বন্ধ
চক্রবর্তী শ্রীকবিকঙ্কণ।।

আবার মঙ্গালগানের বিষয়গত দিকটিকে আরো স্পষ্ট করে তুলে ধরতে 'মনসামঙ্গালে'-র কবি বিপ্রদাসের রচনার প্রভাবও অস্বীকার করার উপায় নেই—

সংক্ষেপে পদ্মার ব্রত কহিল মঙ্গালগীত
বিস্তারে কহিব সপ্তনিশি।।

মঙ্গালগানের 'গাথা গান' হয়ে ওঠার কাহিনি বিধৃত হয়েছে 'সতীর দেহত্যাগ' পালায়—

যোগেতে তেজিলা তনু জগতের মাতা।
মুকুন্দ রচিল গৌরীমঙ্গালের গাথা।।

মঙ্গাল বা শুভ-র আশ্রয় যে মঙ্গালগান কিংবা লোকহিত ও মঙ্গালকামনা বা মঙ্গালভাবনা যে মঙ্গালগানের একটি মূল্যবান শক্তি বা উদ্দেশ্য তা সহজেই অনুধাবন করা যায় 'তীর্থমঙ্গালে'-র কবি বিজয় সেনের রচনায়—

তীর্থমঙ্গাল গানে মনোযোগে যেই শুনে
তাঁহাকে সদয় হন শিব।

কিংবা রামানন্দ যতির 'চণ্ডীমঙ্গল' থেকে—

রামানন্দ যতি জগতে বিদিত
লোকহিত হেতু করে ভাষা গীত।।

কিংবা দ্বিজ মাধবের 'মঙ্গলচণ্ডীর গীত' (সূর্য বন্দনায়)—

বন্দম দিনকর নাথ কশ্যপ তনয়ে।
যাহার স্মরণে মাত্র বিঘ্ন বিনাশয়ে।
উদয় অচলে প্রভু প্রথমে প্রকাশ।
ভ্রমিয়া অখিলের দুঃখ করহ বিনাশ।।

কিংবা কবিকঙ্কণ মুকুন্দের 'সরস্বতী বন্দনা'-র শেষাংশে কবির অঙ্গীকার মেলে—

হাতে লইয়া পত্রমসী আপনি কলমে বসি
যেবা লিখ যে বোল বানান।
নাহি জানি কি কৌতুকে অম্বিকা মুকুন্দ মুখে
আপন সঙ্গীত রসগান।।
দিবা নিশি তুয়া সেবি রচিলে মুকুন্দ কবি
নূতন মঙ্গল অভিলাষে।
উরগো কবির কামে কৃপা কর শিবরামে
চিত্রলেখা যশোদা মহেশে।।

মঙ্গলগানে রাগরাগিণীর ব্যবহার আছে কি না, যন্ত্রানুষঙ্গ হিসাবে কীসের ব্যবহার হত, কোথায় বসার আয়োজন হত বাজনদারদের ইত্যাদি বিষয়ে কবিকঙ্কণ তাঁর রচনায় যথেষ্ট তথ্য দিয়েছেন—

ক। দিবানিশি করিভাগ সেবে যাঁরে ছয় রাগ
অনুক্ষণ ছত্রিশরাগিণী।
রবাব যবক বেণী সপ্তস্বরা পিনাকিনী
বীণা বেণু মৃদঙ্গাবাদিনী।। (সরস্বতী বন্দনা)

খ। সকল দোষহীন আজি মোর শুভ দিন
গৌরীর বিবাহ মঙ্গল।
সুশঙ্ক বেণু বীণা মৃদঙ্গ ভেরী নানা
বাজনে হৈলা কোলাহল।। (গৌরীর অধিবাস)

গ। আটদিকে বাজনাতে হৈল গণ্ডগোল।
ঘন বাজে ধীর কাঁসি শিঙা কাড়া ঢোল।
পুষ্পকেতু রাজা হৈব পড়িল ঘোষণা।
নৃত্য গীত আদি ঘরে ধরে সুবাজনা।।

ঘ। মধুর মধুর স্বরে মন্দিরা লইয়া করে
গায়নে মঙ্গল গায় গীত। (গুজরাটে আনন্দোৎসব)

৬। তেজিয়া কৈলাস গিরি উর মা মরতপুরী
ভৃত্যের করিতে পরিত্রাণ।
বিশ্রাম দিবস আট শুন গীত দেখ নাট
আসরে করহ অধিষ্ঠান।। (প্রার্থনা)

‘গুজরাটে আনন্দোৎসব’ কিংবা ‘প্রার্থনা’ পালার উল্লিখিত অংশ থেকে এ গানের গায়ন-রীতি সম্পর্কে স্বল্প ধারণা করা যায়। আট দিন ধরে এ গান গাওয়ার রীতিটিকে যা মনে করিয়ে দেয়। আবার নিবিষ্ট মনে শ্রবণ অর্থাৎ মগ্নতা যে এ গানের জন্য অত্যন্ত প্রয়োজনীয় সে সম্বন্ধে উল্লেখ আছে ‘নারীগণের পতিনিন্দা’ আখ্যানে—‘নিবিষ্ট হইয়া ভজ চণ্ডীর চরণে।’ গানের মর্মবস্তু যে হেঁয়ালিতে আবদ্ধ তার আভাস পাওয়া যায় কবিকঙ্কণের ‘চণ্ডীমঙ্গাল’ বণিক খণ্ডে—

শ্রীকবিকঙ্কণ গায় হিঁয়ালী রচিত।
বারমাস ত্রিশদিন বান্ধেন পণ্ডিত।।

মঙ্গালগানের সঙ্গো পাঁচালির সম্পর্কের কথা আগেই উল্লেখ করেছি। কিন্তু এর সাথে লাচাড়ি বা লাচারি কিংবা নাটগানের সম্পর্ক আছে বলে বিভিন্ন রচনায় উল্লেখ আছে। যেমন—

১. বিজয় গুপ্ত বলে গাইন হও সাবহিত।
পয়ার এড়িয়ে বলি লাচাড়ীর গীত।।
২. সুকবি নারায়ণ দেবের সরস পাঁচালী।
পয়ার ছাড়িয়া এক বলিব লাচারী।।
৩. সাবিরিদ খানে ভনে বিজ্ঞজন স্থানে।
অশুদ্ধ থাকিলে পদ শুধিবা যতনে।
এ নাটগীতিতে তাল না করিয়া ভঙ্গা।
এক মনে শুনিলে বাড়িবে মনোরঙ্গা।।

গায়নরীতি বা গানের লক্ষণ নিয়ে বিতর্ক উঠলেও তৎকালীন অন্য গানের প্রভাব মঙ্গালগানে সহজভাবেই এসেছে এবং গায়ন রীতিতে তার প্রভাব পড়েছে। মঙ্গালগানকে পাঁচালিতে নিবদ্ধ করার কারণ খুঁজতে পাঁচালির প্রাচীন রূপ ও রীতিটিকে জানা দরকার। সে প্রসঙ্গো বলা যায় পাঁচালি যদি দোহার সহযোগে আবৃত্তি গীত হয় তাহলে কোনো সন্দেহ থাকে না যে মঙ্গালগানও মূল গায়েন ও দোহার বা জুড়িদের সম্মেলক গান বা ঐকতান। কালের বিবর্তনে পাঁচালি ঢংয়ের পরিবর্তন হয়েছে। রাগসংগীত, কবিগান ইত্যাদির প্রভাবে রূপান্তরিত পাঁচালির জন্ম হয়েছে। লাচাড়ি বা লাচারি কিংবা নাচারি প্রসঙ্গো বলা যায় নৃত্য বা নাচ কিংবা লাচ-এর সাথে বা সংযোগে যে গান তার কথা বলা হচ্ছে। মঙ্গালগানে নৃত্যের কোনো যোগ ছিল না একথা জোর দিয়ে বলা মুশকিল। কারণ এ গান গাওয়ার সময় মূল গায়েন ‘পয়ার’ অংশ সুরে বা রাগে আবৃত্তি করতেন। সঙ্গী দোহার বা জুড়িরা একটি ধ্রুব কলি বার বার গেয়ে মূল গায়েনের গাওয়া অংশের ভাবটিকে উদ্দীপিত করতেন,

বিস্তৃত গানটিকে সম্পূর্ণ করতেন। আর মূল গায়েনও পায়ের নুপুরের এবং বাজনদারদের বাজনার তালে তালে সামনে পিছনে যাতায়াত করতেন যাকে নৃত্যের ভঙ্গিমার সঙ্গো তুলনা করা যেতে পারে। নাটগীত বা নাট্যগীত যে নাটক ও গানের সমাহার সে সম্বন্ধে তো সন্দেহের অবকাশ নেই। মঙ্গালগান যেখানে আখ্যানকাব্যের গীতিরূপ বা গাথাকাব্যের গীতরূপ, নাট্যগীত বা নাট্যরসের স্পর্শ থাকবে না সে গানে, তা হতে পারে না।

ভাব ও রূপের দিক থেকে বিচার করলে দেখা যায় বা বোঝা যায় 'লৌকিক মঙ্গালাপেক্ষ' মঙ্গালগান কাব্যগীতের প্রকৃতিধর্মী। কাব্যের ছন্দ গীতিছন্দের (তাল) মধ্যে একাত্মতা অনুভব করে। শব্দের অন্তর্নিহিত ভাবটিকে উদ্ভাসিত করতে রাগ-রাগিণীর ব্যবহার অর্থাৎ সুরসঞ্চার প্রাধান্য পেয়েছে। প্রাচীন প্রবন্ধ গানের আঙ্গিক মঙ্গালগানে অনুপস্থিত। তুলনায় দীর্ঘ গীতিকবিতার গানে উত্তরণ ঘটেছে মঙ্গালগানের মাধ্যমে। মঙ্গালগান কাব্যসংগীত বা বর্তমান কাব্যসংগীতের উৎস গান। মনসামঙ্গাল, চণ্ডীমঙ্গাল, ধর্মমঙ্গাল, অন্নদামঙ্গাল, অনাদিমঙ্গাল ইত্যাদি প্রত্যেকেই সুদীর্ঘ গীতকাহিনির উদাহরণ। পালা করে গাওয়ার জন্য এ গানকে পালাগানও বলা চলে। 'প্রাচীন হস্তলিখিত চণ্ডীমঙ্গাল পুথির যে পালাবিভাগ আছে তাহাতে প্রত্যেক দিনের দিবাপালা ও নিশাপালা বলিয়া স্বতন্ত্র বিভাগ দেখিতে পাওয়া যায়।' (বাংলা মঙ্গালকাব্যের ইতিহাস, শ্রী আশুতোষ ভট্টাচার্য, এ মুখার্জী এন্ড কোং প্রা. লি., ১৯৮৯)। আট দিনে গীত হত বলে 'চণ্ডীমঙ্গাল' ও 'অন্নদামঙ্গাল'-এর গান ষোল পালার। 'ধর্মমঙ্গাল' -এর গান আবার বারোদিনের অর্থাৎ চব্বিশপালার। জাগরণ পালায় আখ্যান গীতের পরিসমাপ্তি। 'মনসামঙ্গাল' প্রতিদিন এক পালা করে একমাস ধরে তিরিশটি পালায় গাওয়া হত। মঙ্গালগানের সমস্ত পদ আনুপূর্বিক গাওয়া হত কিনা সন্দেহ জাগে। কারণ পালাগুলির শুরুতে রাগ-রাগিণীর উল্লেখ থাকলেও বিস্তৃত পালাটির শরীরে তার যথার্থ ইঙ্গিত দৃষ্ট নয়। দ্বিজমাধবের 'মঙ্গালচণ্ডীর গীত' সূর্যবন্দনা, গণেশবন্দনা, দেবীবন্দনা (প্রথম পালার এই ত্রি-বন্দনার মাথায় যথাক্রমে রাগ ধানশী, রাগ মল্লার এবং রাগ পটমঞ্জরীর উল্লেখ আছে। অথচ 'সর্ব্ব-দেব-দেবী বন্দনা-ধর্ম নিরঞ্জন'-এর মাথায় রাগ ধানশীর উল্লেখ থাকলেও 'ব্রহ্মা-বিষ্ণু', 'বিষ্ণুর অবতার', 'বিবিধ' এবং 'আত্মকথা'তে রাগ-রাগিণীর কোনো উল্লেখই নেই। মঙ্গালগানের স্বরলিপির অভাবও তার গায়নরীতি সম্পর্কে আমাদের অন্ধকারে রাখে। রাগ-রাগিণী প্রসঙ্গো একটি উল্লেখযোগ্য বিষয় হল প্রায় আটাশটি রাগ-রাগিণী (দ্বিজমাধব বিরচিত 'মঙ্গালচণ্ডীর গীত' অনুযায়ী) যথা—ধানশী, মল্লার, পটমঞ্জরী, পাহিয়া, টোড়ী, বসন্ত, ভাটিয়াল, মায়ূর, বড়ারি, পাহি, সুহি, কহু, ভূপালি, শ্রী, মন্দার, সিন্ধুড়া, মালশী, আশোয়ারী, কর্ণাট, গুঞ্জরী, কানোয়ার, নট কামোদ, কামোদ, বসন্ত, আহির, কানাড়া, মঙ্গালমঞ্জরী, কেদার, দেশ ইত্যাদি ব্যবহৃত হয়েছে, অথচ সঙ্গীতশাস্ত্রে উল্লিখিত কৈশিক, বোট্ট বা মঙ্গালরাগ মঙ্গালগানে ব্যবহৃত হয়েছে বলে তেমন তথ্য নেই। আর একটি বিষয়ও অনুমান করা যায় যে যেহেতু রাগসঙ্গীতের ইতিহাস থেকে সরে গিয়ে নূতন সঙ্গীতরীতির অবির্ভাব ঘটছে সেক্ষেত্রে রাগরূপ প্রচারের পথটি পরিহার করে রাগ-রাগিণীর আভাসটুকু বা ভাবটিকে প্রকাশ করতে সুরের সামান্য পরশের ওপরে ঝোঁক

থাকাটাই স্বাভাবিক। তাই এ গানে কথকতা বা ছড়া কাটার প্রবণতাও আশ্রয় নিতে পারে। বাংলা গানের নব রূপায়ণের পথে মঙ্গালগানে 'তাল' হিসাবে প্রাচীন শাস্ত্রীয় তাল 'রূপক', যতি, একতাল, নিঃসার ইত্যাদির অনুমান করা যেতে পারে। যদিও তাল নামের উল্লেখ খুঁজে পাওয়া দুঃসাধ্য। বিভিন্ন কবির উল্লিখিত রচনাংশ থেকে অনুমান করা যায় রবাব, খবক, বেণী, বেণু, বীণা, পিনাকিনী, মৃদঙ্গ, ভেরী, মন্দিরা নুপুর ইত্যাদি যন্ত্রানুষঙ্গের ব্যবহার হত গানে। তবে মঙ্গালগান যেহেতু 'শুধুই গান' নয়, কাব্য হিসাবেই যার বিশেষ পরিচয়, সব দিক দিয়ে তাকে গান বলে চিহ্নিত করা বা সর্বগুণান্বিত গান বলে আখ্যায়িত করা বা অভিহিত করা সম্ভব নয়।

মধ্যযুগে পদ বা কাব্যের হাত ধরে শুরু হয়েছিল সাহিত্যের পথ-পরিক্রমা। চর্যাপদ, মঙ্গালকাব্য, শ্রীকৃষ্ণকীর্তন, পদাবলী, কবিগান ইত্যাদি সেই ধারারই এক একটি ঐতিহ্যমণ্ডিত ফসল। অভাব থেকে, অপূর্ণতা থেকে পূর্ণতায় উত্তীর্ণ হওয়ার বাসনা, সময়ের সঙ্গে তাল মিলিয়ে আত্মপ্রকাশের, বিশেষ বা বৈচিত্র্য সৃষ্টির বা ইচ্ছার বিরাম নেই। কাব্য সূত্রে সাহিত্য এবং সাহিত্য সূত্রে গান তাই একটি পরস্পর প্রতিপূরক ও ঐতিহাসিক ঘটনা। মঙ্গালকাব্যের গানে রূপান্তরিত হওয়াতেও তার ব্যত্যয় ঘটেনি। 'গীতং বাদ্যং তথা নৃত্যং ত্রয়ং সংগীতমুচ্যতে'—সংগীত সম্পর্কে প্রাচীন ত্রি-স্তরীয় ধারাটি যে মঙ্গালগানে সম্পূর্ণভাবে গৃহীত হয়নি তার কারণ পরবর্তীকালে খুঁজে পাই যখন দেখি কাব্য ও সঙ্গীতে কীভাবে বাংলা গানের বিকাশ ঘটেছে বৈষ্ণবকাব্যে, কীর্তনে আর তার চরম উৎকর্ষ ঘটেছে রবীন্দ্রগানে। রসের লীলায় জীবনধারা সংপৃক্ত না হলে যেমন প্রাণের অস্তিত্ব বিপন্ন হয়, প্রাণের সঙ্গে যোগ না থাকলে সাহিত্য, সংস্কৃতিও অর্থহীন হয়ে পড়ে। গানেও তার ব্যতিক্রম ঘটেনি। 'সংগীতের এতখানি প্রাণ থাকা চাই, যাহাতে সে সমাজের বয়সের সহিত বাড়িতে থাকে, সমাজের উপর নিজের প্রভাব বিস্তৃত করিতে পারে ও তাহার উপরে সমাজের প্রভাব প্রযুক্ত হয়।' রবীন্দ্রনাথের এই সংগীত-ভাবনার কিছু চিহ্ন বা লক্ষণ মঙ্গালগানের দেহে যে আছে তা না স্বীকার করে উপায় নেই।

মঙ্গালকাব্য পাঠে রবীন্দ্রনাথ

সনৎকুমার নস্কর

অনিন্দ্য, অতুলনীয় ও অপরিমেয় সাহিত্যের স্রষ্টা রবীন্দ্রনাথ ছিলেন একজন অনন্য প্রজ্ঞাবান পাঠকও। তাঁর পাঠ-পরিধি বিদ্যায়তনের সংকীর্ণ গণ্ডি ভেঙে বহুদূর পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। রবীন্দ্রজীবনের খোঁজ-খবর রাখেন যাঁরা তাঁরা বোধহয় জানেন যে, প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার বাইরেই বরং রবীন্দ্রনাথ বেশি মাত্রায় বিচিত্রধর্মী বিদ্যাকে আয়ত্ত করেছিলেন। 'আশ্রমের রূপ ও বিকাশ' গ্রন্থের 'সংযোজন' অংশে তিনি প্রাসঙ্গিকভাবে জানিয়েছেন তাঁর বিদ্যালাভের ইতিবৃত্তের কিয়দংশ : 'যখন আমার বয়স তেরো তখন এডুকেশন-বিভাগীয় দাঁড়ের শিকল ছিন্ন করে বেরিয়ে পড়েছিলেম। তারপর থেকে যে বিদ্যালয়ে হলেম ভর্তি তাকে যথার্থই বলা যায় বিশ্ববিদ্যালয়। ...তখন আমি যেসব বই পড়বার চেষ্টা করেছি কোনো কোনো গুরুজন তা আমার হাতে দেখে মনে করেছেন স্পর্দ্ধা। শিক্ষার কারাগার থেকে বেরিয়ে এসে যখন শিক্ষার স্বাধীনতা পেলুম তখন কাজ বেড়ে গেল অনেক বেশি, অথচ ভার গেল কমে।'[১] সেই নির্ভার অথচ আনন্দময় শিক্ষা তাঁকে ভিতরে ভিতরে তৈরি করেছিল। শুষ্ক পাণ্ডিত্যের কঠিন শৃঙ্খলের বেড়াজাল থেকে মুক্ত হয়ে প্রকৃত শিক্ষিতের অধিকারলাভে তিনি সমর্থ হয়েছিলেন। তাঁর হয়তো আই.সি.এস. হয়ে ওঠা ভাগ্যে ঘটেনি, তার বদলে তাঁর ভাগ্যদেবতা তাঁর জন্য সুনির্দিষ্ট রেখেছিলেন বিশ্ববরেণ্য এক কবির পদ, কলারসিকের মহিমাময় আসন। ভৌমবিশ্বের নানা প্রাঙ্গণ থেকে নেওয়া পাঠ তাঁকে এতটাই স্বশিক্ষিত ও সুশিক্ষিত করে তুলেছিল যে, ফেলে-আসা দুই সহস্রাব্দের মধ্যে বাঙালি-মনীষার চূড়ান্ত সারস্বত প্রকাশ হয়ে দেখা দিয়েছিলেন চিরবন্দিত রবীন্দ্রনাথ।

অথচ আশ্চর্যের বিষয়, শিশু রবীন্দ্রনাথের শিক্ষার ও সাহিত্যচর্চার সূত্রপাত হয়েছিল তাঁদের বিশাল জমিদার পরিবারের চাকরদের মহলে। 'জীবনস্মৃতি' গ্রন্থের 'শিক্ষারম্ভ' অধ্যায়ে রবীন্দ্রনাথের নিজের স্বীকারোক্তি এ কথার সবচেয়ে বড়ো প্রমাণ। ভৃত্যমহলে তাঁর বাল্যকাল কাটবার সুবাদে সেখানে চর্চিত চাণক্যশ্লোকের অনুবাদ ও কৃত্তিবাসী রামায়ণ শুনে শুনে তাঁর প্রায় পড়াই হয়ে গিয়েছিল। এরপর স্কুলে যেতে শুরু করলে সে-পড়া পড়াতে আসতেন নীলকমল ঘোষাল, জ্ঞানচন্দ্র ভট্টাচার্য, রামসর্বস্ব বিদ্যাভূষণ, সীতানাথ দত্ত প্রমুখ মাস্টারমশাইরা। এসব আয়োজিত বিদ্যাচর্চা রবীন্দ্রনাথকে কী পরিমাণ পীড়িত করেছিল তার কিছু কিছু পরিচয় ধরা আছে 'জীবনস্মৃতি' ও 'ছেলেবেলা'য়। কৌতুকের মিশেল দিতে

দিতে 'ছেলেবেলা'য় পরিণত রবীন্দ্রনাথ জানিয়েছেন তাঁর কিশোরকালের পাঠচর্চার সংক্ষিপ্ত ইতিবৃত্ত : 'সকাল থেকে রাত পর্যন্ত পড়াশুনোর জাঁতাকল চলছেই। ঘর্ঘর শব্দে এই কলে দম দেওয়ার কাজ ছিল আমার সেজদাদা হেমেন্দ্রনাথের হাতে। তিনি ছিলেন কড়া শাসনকর্তা। তম্বুরার তারে অত্যন্ত বেশি টান দিতে গেলে পটাং করে যায় ছিঁড়ে। তিনি আমাদের মনে যতটা বেশি মাল বোঝাই করতে চেয়েছিলেন, তার অনেকটাই ডিঙি উলটিয়ে তলিয়ে গেছে, একথা এখন আর লুকিয়ে রাখা চলবে না। আমার বিদ্যেটা লোকসানি মাল।'[২] এই বিবৃতিকে পুরোপুরি আক্ষরিক অর্থে গ্রহণ না করাই বুদ্ধিমানের কাজ, তবে এই অম্লরসাত্মক মন্তব্যের ভেতর থেকে পড়াশোনার বাঁধাধরা রীতি সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের বিরাগ টের পাওয়া যাচ্ছে। আসলে রবীন্দ্রনাথ প্রথমাবধি এবং চিরদিনই ছিলেন প্রথাবদ্ধতার বিরোধী তথা মুক্তচিন্তার দিশারী। সেই মুক্তির ক্ষেত্র তিনি রচনা করেছিলেন তাঁর তরুণ বয়সে স্বনির্বাচিত পাঠমালার মধ্যে। স্কুলের পড়া একপাশে সরিয়ে রেখে পড়তেন গীতগোবিন্দ, অন্নদামঙ্গল, বিদ্যাপতির পদাবলি, বাসবদত্তা, হাতেমতাই, পারস্য উপন্যাস ইত্যাদি রসসমৃদ্ধ রচনা। কিশোর বয়সেই তিনি হাতে পেয়ে গিয়েছিলেন বঙ্কিমচন্দ্র সম্পাদিত 'বঙ্গদর্শন', যা মাসে মাসে প্রকাশিত হয়ে সেদিনের শিক্ষিত বাঙালির মানসিক ভোজের আয়োজন সুসম্পূর্ণ করে তুলেছিল। বিশুদ্ধ সাহিত্যের সঙ্গে সে পত্রিকায় পরিবেশিত হত উচ্চমানের সাহিত্য সমালোচনা। রবীন্দ্রনাথ সেগুলি খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে পড়তেন। কেবল আধুনিক সাহিত্য নয়, মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের একজন নিবিষ্ট পাঠক হিসেবে এ সময় থেকেই রবীন্দ্রনাথ নিজেকে জানান দিতে থাকেন। জীবনস্মৃতির 'ঘরের পড়া' অধ্যায়ে জানিয়েছেন, একদা কীভাবে তাঁর হাতে এসে পড়েছিল 'প্রাচীন কাব্যসংগ্রহ'-এর মতো সংকলন। এটির সম্পাদক ছিলেন অক্ষয়চন্দ্র সরকার ও সারদাচরণ মিত্র। এতে সংকলিত ব্রজবুলিতে লেখা বিদ্যাপতির পদের শব্দঝংকার তাঁকে ভীষণ মুগ্ধ করে। কিশোর রবীন্দ্রনাথ সেই ভাষার আদর্শে পদাবলি লিখতে উৎসাহী হয়ে ওঠেন। এ সময়ে তিনি চণ্ডীদাস ও গোবিন্দদাসের লেখা পদও পড়েছিলেন। তাঁর বিশেষ পাঠপদ্ধতির মধ্যে ছিল কোনো বিশিষ্ট শব্দের অর্থ, ব্যাকরণের বিশেষত্ব, আনুষঙ্গিক টীকা কিংবা মন্তব্য লিখে রাখা। প্রাচীন সাহিত্যে ব্যবহৃত শব্দতত্ত্বে তাঁর এই ঔৎসুক্যের প্রমাণ আছে একটি 'ভালো বাঁধানো খাতা'য় পরপর লিখে রাখার নমুনায়। ১২৮৫ বঙ্গাব্দে অক্ষয়চন্দ্র সরকার সম্পাদনা করে বের করলেন 'শ্রীমুকুন্দরাম চক্রবর্তী প্রণীত কবিকঙ্কণ চণ্ডী।' এ বইটি পড়েও তিনি কিছু শব্দের নোট করেন। বিশ্বভারতী রবীন্দ্রভবনে রক্ষিত ২৪৬ সংখ্যক পাণ্ডুলিপির শেষের ছয়টি পৃষ্ঠায় 'সন্দেহ মূল' শিরোনামে তিনি এই শব্দগুলি নোট করেছিলেন সম্ভবত তাদের উৎসমূলে পৌঁছুনোর জন্য। দেখা যাচ্ছে রবীন্দ্রনাথ সংকলিত ওই শব্দ-তালিকায় পসালা, কুটা, রড়ে, হেঁট, লোহে, বোঢ়া, শলী-শলা, চোঁয়া, চড়িতে ইত্যাদি শব্দের পাশে ইংরেজিতে 'Root' কথাটি লিখে রেখেছেন।[৩] হয়তো এ নিয়ে তাঁর বিশেষ কোনো ভাবনা ছিল, তবে তখন তার লিখিত বহিঃপ্রকাশ দেখা যায়নি। কিন্তু কবিকঙ্কণ মুকুন্দের চণ্ডীমঙ্গালের ভাব, বিশেষত মুকুন্দের কবিত্ব নিয়ে তাঁর মনে যে অসন্তোষ ছিল, তা উক্ত

গ্রন্থ প্রকাশের প্রায় সমকালে লেখা একটি বিশেষ প্রবন্ধ থেকে স্পষ্ট বুঝতে পারা যায়। প্রবন্ধটি হল 'বাঙ্গালী কবি নয়'।[৪] এটি 'ভারতী' পত্রিকাতে প্রথম প্রকাশিত হয় ১২৮৭ বঙ্গাব্দের ভাদ্র সংখ্যায়। এখানে তিনি মূলত যে বক্তব্যগুলি সাজালেন সেগুলি এইরকম—

১। মুকুন্দকে যাঁরা মহাকবি ও তাঁর কাব্যকে মহাকাব্য বলেন তাঁরা ভ্রান্ত; মুকুন্দের রচনা বড়ো জোর উপাখ্যান রূপে বিবেচিত হতে পারে।
২। মুকুন্দের কাব্য বাঙালির আদরের বস্তু হলেও বিশ্বসাহিত্যের দরবারে তার প্রবেশাধিকার অর্জিত হয়নি।
৩। কবিকঙ্কণ চণ্ডী সরসতার কারণে ভারতচন্দ্রের তুলনায় শ্রেষ্ঠতর।
৪। কবিকঙ্কণ বাঙালি কবি ও বাস্তবরসের চিত্রকর। তাঁর রচনায় 'বঙ্গাবাসীর গৃহ অতি সুচারুরূপে চিত্রিত'। কবির হাতে পড়ে দেবতারা শুধু মানুষে পরিণত হয়নি, তাঁর কালের বাঙালিতেও পরিণত হয়েছে।
৫। 'শিক্ষার অভাব' এবং 'অসম্পূর্ণতা' কল্পনাশক্তিতে কবিকঙ্কণকে ক্ষীণ করেছে।

রবীন্দ্রনাথের এই বক্তব্য যুক্তিপূর্ণ হওয়া সত্ত্বেও সেকালের মুকুন্দ-পূজকদেরকে আহত করে। কেউ কেউ এর অভিঘাতে রবীন্দ্রনাথকে আক্রমণ করে বসেন। এমনকি বিবাদের স্থলে উঠে পড়ে তাঁর ব্রাহ্মসত্তার কথা। অথচ স্থিরবুদ্ধিতে চিন্তা করলে রবীন্দ্রনাথের ভাবনার যথার্থতা ধরা পড়ে। যাইহোক, 'ভারতী'তে প্রকাশের সাত বছর বাদে ১২৯৪ বঙ্গাব্দে 'সমালোচনা' গ্রন্থে উক্ত প্রবন্ধটি অন্তর্ভুক্তির সময় রবীন্দ্রনাথ দুটি ক্ষেত্রে পরিবর্তন ঘটালেন। প্রথমত পূর্বের শিরোনাম বদলে দিলেন, এখন তার নাম হল 'নীরব কবি ও অশিক্ষিত কবি' এবং দ্বিতীয়ত মুকুন্দ-সমালোচনার তিক্ত অংশগুলির সিংহভাগই বর্জন করলেন, কেবল রয়ে গেল 'কমলে-কামিনী'র প্রসঙ্গে মুকুন্দের সৌন্দর্য-কল্পনার অভাব ও অসামঞ্জস্যের দৃষ্টান্তটুকু। এ ছাড়া বোধহয় তাঁর উপায় ছিল না। মুকুন্দ-ভক্তদের আক্রমণ রবীন্দ্রনাথকে আপাতত সংযত করলেও, কবিকঙ্কণের কাব্য-সমালোচনা ঘিরে এই তিক্ত অভিজ্ঞতা তাঁর আজীবন স্মরণে ছিল। চণ্ডীমঙ্গালের ভাববস্তু বিষয়ে তাঁর যে ধারণা পরে প্রকাশ পেয়েছিল, তার অঙ্কুরোদগমও হয় ১২৮৭ সালের ওই লেখায়।

সাল-তারিখের পরিসংখ্যানগত হিসেব থেকে দেখা যাচ্ছে, গ্রন্থ-সমালোচক হিসেবে রবীন্দ্রনাথের আবির্ভাব হয়েছিল ১২৮৩ বঙ্গাব্দের কার্তিকে 'জ্ঞানাঙ্কুর ও প্রতিবিম্ব' পত্রিকায় যখন তাঁর বয়স মাত্র পনেরো বৎসর। মধ্যযুগের সাহিত্য সমালোচনায় নামেন এর বছর চারেক পরে। অবশ্য প্রথম বছর দশেক (১২৮৭-১২৯৮ বঙ্গাব্দ) তিনি যতটা আগ্রহ ও ঔৎসুক্য নিয়ে মধ্যযুগের সাহিত্য বিষয়ে চর্চা করেছেন, বাকি পঞ্চাশ বছরে (১২৯৯-১৩৪৮ বঙ্গাব্দ) তা অনেকাংশে স্তিমিত হয়ে গেছে। এ প্রসঙ্গে এটাও উল্লেখ্য যে, মধ্যযুগের বাংলায় সাহিত্যের অনেকরকম ধারার সাক্ষাৎ পাওয়া গেলেও রবীন্দ্রনাথ মুখ্যত বৈষ্ণব সাহিত্য ও মঙ্গালকাব্যের ওপর আলোকপাত করেছিলেন। এর মধ্যে আবার

বৈষ্ণব সাহিত্য ও পদকর্তাদের নিয়ে যেন তাঁর বেশি আগ্রহ, যার প্রমাণ মেলে সাত-সাতটি স্বয়ংসম্পূর্ণ ও দীর্ঘ প্রবন্ধ রচনায়। অন্যদিকে, মঙ্গালকাব্য বিষয়ক দুটি প্রবন্ধ থাকলেও কোনোটিই বিশেষ কবিকে কেন্দ্র করে নয়। এখানে বরং তাঁর দৃষ্টি অনেকটাই সার্বিক ও তত্ত্বসন্ধানী। যে শৈল্পিক গুণপনা বৈষ্ণবপদে প্রত্যক্ষ করেছেন এবং তা পাঠক-সমক্ষে হাজির করতে প্রয়াস পেয়েছেন রবীন্দ্রনাথ, তার ছিটেফোঁটাও মেলে না মঙ্গালকাব্যের আলোচনায়। কবি বরং মঙ্গালকাব্যগুলিকে বিচার করেছেন তৎকালীন রাজনৈতিক ও সামাজিক সংকটের মানদণ্ডে। এবং দু-একটি ক্ষেত্র ছাড়া সার্বিকভাবে মঙ্গালকাব্য সম্বন্ধে তাঁর মনোভাব যে অনুকূল ছিল না সেটা বিভিন্ন নেতিবাচক মন্তব্যে জানতে পারা যায়। তাছাড়া বৈষ্ণব কবিদের আলোচনায় তিনি বঙ্কিম-প্রবর্তিত তুলনাত্মক বিচার-পদ্ধতি কোথাও কোথাও অনুসরণ করলেও, মঙ্গালকাব্যের আলোচনায় তার প্রয়োগে যত্নবান হননি। আপাতত এই মোটা সূত্রগুলিকে মাথায় রেখে এবার মূল আলোচনায় প্রবেশ করা যাক।

যতদূর জানা যায়, ১৮৭৮ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত অক্ষয়চন্দ্র সকরারের 'প্রাচীন কাব্য সংগ্রহ'-র অন্তর্গত 'কবিকঙ্কণ চণ্ডী' দিয়েই শুরু হয়েছিল রবীন্দ্রনাথের মঙ্গালকাব্য বিষয়ে পড়াশুনো। যদিও মঙ্গালকাব্য বিষয়ে রবীন্দ্র-ভাবনার মেধাবী স্ফুরণ ঘটে যে-ঘটনার প্রেক্ষিতে তা কম-বেশি সবারই জানা। প্রাসঙ্গিকভাবে বিষয়টিকে একটু ছুঁয়ে যাই। রবীন্দ্র-অনুরাগী ও রবীন্দ্র-সাহিত্যের অন্যতম বিশ্লেষক চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় তখন যোগদান করেছেন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে সদ্য-প্রবর্তিত আধুনিক ভারতীয় ভাষাবিভাগের অধ্যাপক হিসেবে। বিভাগের অধ্যক্ষ আচার্য দীনেশচন্দ্র সেন চারুচন্দ্রকে দিলেন মুকুন্দ চক্রবর্তী বিরচিত 'কবিকঙ্কণ চণ্ডী' পড়ানোর দায়িত্ব। চারুচন্দ্র সাহিত্যরসজ্ঞ, নিপুণ অধ্যাপক। তবুও সৃজনশীল সাহিত্যরসের কাণ্ডারী ও ভাণ্ডারী রবীন্দ্রনাথের কাছে ছুটলেন বইটি সম্পর্কে তাঁর অভিমত জানতে। অসুস্থ রবীন্দ্রনাথ শান্তিনিকেতনে তখন বিশ্রাম নিচ্ছিলেন। ফলে তাঁর পক্ষে সেই মুহূর্তে আলোচনা করা সম্ভব ছিল না। সুস্থ হয়ে ওঠার পর চারুচন্দ্রকে চিঠিতে লিখলেন, 'কল্যাণীয়েষু, কবিকঙ্কণ এবং অন্নদামঙ্গাল পড়ে নোট্ করে রেখেছি। এক কপি মনসামঙ্গাল ও ধর্মমঙ্গাল যদি পাঠাতে পার তাহলে মঙ্গালকাব্য সম্বন্ধে আমার যা কিছু বক্তব্য আছে জানতে পারবে।' এ চিঠির তারিখ ১৭মে ১৯১৯। এখানে উল্লেখ্য যে, এর প্রায় সতেরো বছর আগে রবীন্দ্রনাথ নবপর্যায় বঙ্গাদর্শনে 'বঙ্গাভাষা ও সাহিত্য' (শ্রাবণ, ১৩০৯) শীর্ষক প্রবন্ধে দীনেশচন্দ্র সেনের সমনামীয় বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস গ্রন্থটির পর্যালোচনা করেছিলেন। বইটির বিষয়বস্তুর পরিচয় দিতে গিয়ে রবীন্দ্রনাথ প্রাগাধুনিক বাংলা সাহিত্যের বিভিন্ন শাখা সম্বন্ধে তাঁর অভিমত দিয়েছিলেন। সেই সুবাদে এসেছিল মঙ্গালকাব্যগুলির কথা। রবীন্দ্রনাথ এই শ্রেণির রচনাসমূহের ভিতরে দেখেছিলেন 'শক্তির লীলা'। তাঁর ভাবনায়, মনসা-চণ্ডী প্রমুখ এক একটি দেবী স্বেচ্ছাচারী, ভয়ংকরী। ভক্তির দস্যুবৃত্তির কারণে তাঁরা 'দেবী' অভিধার অযোগ্য। তবু সেদিন সব ত্রাসিতের পুজো এসে ঠেকেছিল তাঁদের পায়ে। তাঁদের মাহাত্ম্য ও পূজা প্রচারের কল্পিত উপাখ্যানগুলির মধ্য দিয়ে মূর্ত হয়ে উঠেছিল শক্তির স্বেচ্ছাচারী রূপ। চণ্ডীমঙ্গালের গ্রন্থোৎপত্তির কারণ

অংশটিকে রবীন্দ্রনাথ ব্যাখ্যা করেছিলেন তৎকালীন রাষ্ট্রীয় অরাজকতার প্রেক্ষাপটে। সন্ত্রস্ত উচ্ছৃঙ্খল সেই পরিবেশে শক্তির মহিমাকীর্তন স্বভাবতই ন্যায়ধর্মহীন ঈর্ষাপরায়ণ ক্রুরতার জয়কীর্তনে পরিণত হয়েছিল।

মনসামঙ্গালের আখ্যানের ভিতরেও এই একই অন্যায়-অধর্মের বলদর্পিতা। 'বাংলা ভাষা পরিচয়'-এর পঞ্চম অধ্যায়ে রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন—'মনসামঙ্গালের মধ্যেও এই একই কথা। দেবতা নিষ্ঠুর, ন্যায়ধর্মের দোহাই মানে না, নিজের পূজা-প্রচারের অহংকারে সব দুষ্কর্মই সে করতে পারে। নির্মম দেবতার কাছে নিজেকে হীন করে, ধর্মকে অস্বীকার করে, তবেই ভীরুর পরিত্রাণ, বিশ্বের এই বিধানই কবির কাছে ছিল প্রবলভাবে বাস্তব।'[৫] চণ্ডীমঙ্গালের কাহিনির ঐতিহাসিক তাৎপর্য নিরূপণেও সচেস্ট হয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথ। পূর্বে ব্যাধসমাজে প্রচলিত পশুবলির উপাচারে সম্পন্ন ভীষণ পূজাই যে চণ্ডী আরাধনায় রূপান্তরিত হয়েছিল, এ বিষয়ে তিনি ছিলেন প্রায় নিঃসন্দিগ্ধ। বিষয়বস্তুগত বিচারে মঙ্গালকাব্যগুলিকে তাঁর মনে হয়েছিল সমাজ থেকে শিবের প্রাধান্য হটিয়ে শক্তির দম্ভ প্রকাশের নিষ্ঠুর আখ্যান। বিশেষ রাজনৈতিক পরিস্থিতি যে এদের জন্ম-মহোৎসবকে সম্ভাবিত করেছিল, তা না বললেও বোঝা যায়। চণ্ডী যেমন প্রচণ্ড উপদ্রবের সাহায্যে নিজের মাহাত্ম্য প্রতিষ্ঠায় সফল হন, সন্ত্রাসের অভিন্ন পথ ধরে আবির্ভূত হন মনসা, শীতলা প্রমুখ দেবীরা। রবীন্দ্রনাথ মঙ্গালকাব্যগুলির আখ্যানের মধ্যে তৎকালীন সামাজিক বিপর্যয়কেও অনুধাবন করতে পেরেছেন। তাঁর ধারণায়, এই কাব্যগুলি আর কিছুই নয়, সমাজের নিম্নস্তরগুলির উপরের স্তরে ওঠবার প্রাণান্তর প্রয়াসের সাহিত্য-রূপায়ণমাত্র। এমন ঘটনা তো কেবল ভূমিকম্পের সময়েই ঘটে। মঙ্গালকাব্য সৃষ্টির সময়টাকেও বলা যেতে পারে সামাজিক ভূমিকম্পের কাল। যেজন্য স্বেচ্ছাচারী শক্তির ইচ্ছেয় সেখানে কালকেতুর মতো গুণহীন ব্যাধ রাজা হয়ে সমাজের উঁচু স্তর দখল করেছে। যে-শক্তি এমন ওলট-পালট করে দিতে পারে, মানুষ স্বাভাবিকভাবে সেই শক্তির দাসত্ব স্বীকার করে নেয়। এই প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন— 'এইরূপ শক্তি ভয়ঙ্করী হইলেও মানুষের চিত্তকে আকর্ষণ করে। কারণ, ইহার কাছে প্রত্যাশার কোনো সীমা নাই। আমি অন্যায় করিলেও জয়ী হইতে পারি, আমি অক্ষম হইলেও আমার দুরাশার চরমতম স্বপ্ন সফল হইতে পারে। যেখানে নিয়মের বন্ধন, ধর্মের বিধান আছে, সেখানে দেবতার কাছেও প্রত্যাশাকে খর্ব করিয়া রাখিতে হয়।'[৬]

'বঙ্গাভাষা ও সাহিত্য' প্রবন্ধে প্রাসঙ্গিকভাবে রবীন্দ্রনাথ তুলনা টেনেছেন শাক্ত সাহিত্যের সঙ্গে বৈষ্ণবসাহিত্যের। কেননা, এই দুটি ধর্মমত, তাঁর মতে, সমাজের প্রধান ধর্ম শৈবধর্মকে দ্বিমুখী আক্রমণে পর্যুদস্ত করেছিল। অবশ্য বৈষ্ণবধর্ম শাক্তধর্মের মতো 'বলরূপিণী নহে, প্রেমরূপিণী।' আনন্দই সে ধর্মের অন্তিম আশ্রয়। বৈষ্ণবধর্মে প্রেমের সম্বন্ধ যেখানে সেখানে সকলেরই নিত্য দাবি। অন্যদিকে শাক্তধর্ম ভেদকেই প্রাধান্য দিয়েছে, বৈষ্ণবধর্মের মতো তাকে নিত্য মিলনের উপায় বলে গণ্য করেনি। এরপরই অন্যায় শক্তিবাদের বিরোধী ভক্তিবাদী রবীন্দ্রনাথের সেই চমৎকার মন্তব্য : 'ইহা হইতেই দেখা যাইতেছে বাংলাদেশ আপনাকে যথার্থভাবে অনুভব করিয়াছিল বৈষ্ণবযুগে। সেই সময়ে

এমন একটি গৌরব সে প্রাপ্ত হইয়াছিল যাহা আলোকসামান্য। যাহা বিশেষরূপে বাংলাদেশের, যাহা এদেশে হইতে উচ্ছ্বসিত হইয়া অন্যত্র বিস্তারিত হইয়াছিল। শাক্তযুগে তাহার দীনতা ঘোচে নাই, বরঞ্চ নানারূপে প্রস্ফুটিত হইয়াছিল, বৈষ্ণবযুগে অযাচিত ঐশ্বর্যলাভে সে আশ্চর্যরূপে চরিতার্থ হইয়াছে।'[৭]

এই গ্রন্থ-সমালোচনাটির বাইরে বাংলা মঙ্গালকাব্যগুলি সম্বন্ধে মোটা দাগের মন্তব্য পাওয়া যায় রবীন্দ্রনাথের আরো কতকগুলি প্রবন্ধে। 'সাহিত্য' বইটির 'সাহিত্যসৃষ্টি' প্রবন্ধে তিনি জানাচ্ছেন মুকুন্দের কাব্য, ঘনরামের ধর্মমঙ্গাল, কেতকাদাসের মনসার ভাসান, ভারতচন্দ্রের অন্নদামঙ্গাল আসলে 'বাংলার ছোটো ছোটো পল্লীসাহিত্যকে বৃহৎ সাহিত্যে বাঁধিবার প্রয়াস।' এরই সঙ্গো রবীন্দ্রনাথ মনে করতেন, এ কাব্যগুলির বীজস্বরূপ রয়ে গিয়েছে বিভিন্ন গ্রাম্যকাহিনি। যদি কোনোদিন গ্রাম্য ছড়াগুলির পরিচয় উদ্‌ঘাটিত হয়, 'তবেই ভারতচন্দ্র-মুকুন্দরাম রচিত কাব্যের যথার্থ পরিচয় পাইবার পথ হয়।' এমন আরো নানা টুকরো মন্তব্য থেকে দেখা যাচ্ছে যে, মঙ্গালকাব্যগুলি সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ তেমন উচ্চধারণা পোষণ করতেন না। তাঁর বিবেচনায়, এ জাতীয় কাব্য 'ধনীদের ফরমাসে ও খরচে খনন করা পুষ্করিণী' মাত্র। (১৯৩৯ সালের সেপ্টেম্বর মাসে দীনেশচন্দ্রকে লেখা চিঠি দ্রষ্টব্য) মঙ্গালকাব্যগুলি একটি বিশেষ সময়ের ফসল বলেই এর সাহিত্যমূল্য সম্বন্ধে তিনি ভীষণ সন্দিহান ছিলেন। ১৩২২ বঙ্গাব্দের জ্যৈষ্ঠে বেরোনো 'সোনার কাঠি' প্রবন্ধে লিখেছেন, 'আজ পর্যন্ত আমাদের সাহিত্যে যদি কবিকঙ্কণ চণ্ডী, ধর্মমঙ্গাল, অন্নদামঙ্গাল, মনসার ভাসানের পুনরাবৃত্তি নিয়ম চলতে থাকতো তাহলে কী হত। পনেরো-আনা লোক সাহিত্য পড়া ছেড়েই দিত।' কবিকঙ্কণ চণ্ডী বইটির মার্জিনে করা মন্তব্যগুলি যে এই মনোভাব থেকেই বেরিয়ে এসেছিল তার উল্লেখ করা বোধহয় বাহুল্য।

'বঙ্গাভাষা ও সাহিত্য' ও অন্যান্য প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথের এইসব মন্তব্য সামগ্রিকভাবে সব শাখার মঙ্গালকাব্য সম্বন্ধেই প্রযুক্ত হয়েছিল। অবশ্য তাঁর সেইসব নির্ণয় আধুনিক বিবেচনায় সবক্ষেত্রে মান্যতা পায়নি। যদি ধরেই নেওয়া যায় যে, সামাজিক মিলনের তাগিদ থেকে মঙ্গালকাব্যের শক্তি-প্রতিষ্ঠার আখ্যানগুলি লিখিত হয়েছিল, তবে সেই তাগিদের জন্ম যে নিম্নজাতির অভ্যন্তর ভাগ থেকে ঘটেনি, তা এসেছিল সমাজের ওপরের স্তর থেকে, সেটা মঙ্গালকবিদের সামাজিক পরিচয়ের সূত্র থেকে বোঝা যায়। এক্ষেত্রে লক্ষণীয়, তথাকথিত অন্ত্যজ শ্রেণির কোনো মানুষকেই দেবতার মাহাত্ম্যকথা রচনার কাজে ব্রতী হতে দেখা যাচ্ছে না। তবে এটা ঠিক, বৈষ্ণব সাহিত্যের মতো মঙ্গালকাব্যগুলির প্রতি রবীন্দ্রনাথের আগ্রহ যে যথেষ্ট পরিমাণে জাগরুক ছিল তার প্রমাণ মেলে ওইসব চিন্তাঋদ্ধ মন্তব্যে। সাম্প্রতিক কালের একজন গবেষক 'জীবনস্মৃতি'র সাক্ষ্যসূত্রে দেখাতে চেয়েছেন যে, রবীন্দ্রনাথ ছেলেবেলা থেকেই মঙ্গালকাব্যগুলি বিষয়ে বিশেষ উৎসাহী ছিলেন।[৮] এ ব্যাপারে তিনি তাঁর দাদা জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের বন্ধু অক্ষয়চন্দ্র চৌধুরীর রম্য সাহচর্য লাভ করেছিলেন। অক্ষয়চন্দ্র ইংরেজি সাহিত্যে সুপণ্ডিত। তিনি ইউরোপীয় সাহিত্যের পাশাপাশি এদেশীয় পুরোনো সাহিত্যেরও একনিষ্ঠ ভক্ত ছিলেন। রবীন্দ্রনাথের ভাষায়—

'বাংলা সাহিত্যে বৈষ্ণব পদকর্তা, কবিকঙ্কণ, রামপ্রসাদ, ভারতচন্দ্র, হরু ঠাকুর, রাম বসু, নিধুবাবু, শ্রীধর কথক প্রভৃতির প্রতি তাঁহার অনুরাগের সীমা ছিল না।' অক্ষয়চন্দ্রের সেই অপর্যাপ্ত উৎসাহই যে মধ্যযুগের সাহিত্যপাঠে রবীন্দ্রনাথের মনের জমি অনেকটাই তৈরি করে দিয়েছিল এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। এখানে দুটি তথ্য জানানো প্রয়োজন—
১. মঙ্গলকাব্য সম্পর্কে উপরোক্ত সামগ্রিক মন্তব্য ছাড়া আলাদাভাবে দুটি মঙ্গলকাব্য নিয়ে তিনি নানাস্থানে তাঁর অভিমত জ্ঞাপন করেছিলেন। এই দুটি গ্রন্থ হল কবিবর মুকুন্দ চক্রবর্তীর চণ্ডীমঙ্গল এবং রায়গুণাকর ভারতচন্দ্রের অন্নদামঙ্গল।
২. কোনো কবিরই ধর্মমঙ্গল কাব্য সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের কোনো অভিমত সেভাবে জানতে পারা যায় না, যদিও চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়কে একটি ধর্মমঙ্গল পাঠাবার জন্য পত্রে অনুরোধ করেছিলেন। আমরা এবার পর্যায়ক্রমে চণ্ডীমঙ্গাল ও অন্নদামঙ্গাল সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের পাঠ-প্রতিক্রিয়াটুকু অনুসরণ করার চেষ্টা করব।

আগেই বলেছি, কবিকঙ্কণের চণ্ডীকাব্য নিয়ে রবীন্দ্র-অভিমত সর্বপ্রথম প্রকাশিত হয়েছিল ১২৮৭ বঙ্গাব্দের ভাদ্র মাসে 'ভারতী' পত্রিকায়। 'বাঙ্গালী কবি নয়' প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ কিন্তু কবিকঙ্কণের অবিমিশ্র নেতিবাচক সমালোচনা করেননি। 'কবিকঙ্কণ চণ্ডী অতি সরস কাব্য'— এই মন্তব্য তিনি বেশ কয়েকবার করেছেন এবং স্পষ্টত বলেছেন, ভারতচন্দ্রের কাব্য অপেক্ষা মুকুন্দের কাব্য 'শ্রেষ্ঠতর'। কবিকঙ্কণ অঙ্কিত দেবদেবীরা যে তাঁর সময়কার 'বাঙ্গালী'তে পরিণত হয়েছেন, এমন অভিমতও ব্যক্ত করেছেন রবীন্দ্রনাথ। কেবল আপত্তির জায়গা হিসেবে তুলেছেন সমুদ্র-মরীচিকা 'কমলে-কামিনী'র প্রসঙ্গটি। এক অপূর্ব সুন্দরী রমণী পদ্মদলে বসে একটি হাতিকে গ্রাস করেই পরমুহূর্তে বমন করছে— এই কাব্য-চিত্রে ক্ষুব্ধ রবীন্দ্রনাথ মুকুন্দের কল্পনার সৌন্দর্যহীনতা সম্বন্ধে নিশ্চিত হয়ে প্রায় আক্রমণাত্মক ভাষায় মন্তব্য করেছেন— 'কবিকঙ্কণের কমলে-কামিনীতে একটি রূপসী ষোড়শী হস্তীগ্রাস ও উদ্গার করিতেছে, ইহাতে এমন পরিমাণ-সামঞ্জস্যের অভাব হইয়াছে যে, আমাদের সৌন্দর্যজ্ঞানে অত্যন্ত আঘাত দেয়।'[৯] রোমান্টিক ও সূক্ষ্ম ভাবানুভূতির অধিকারী কবির পক্ষে এমন মন্তব্য অস্বাভাবিক নয়। কিন্তু রবীন্দ্র-ভাবনায় এখানে বোধহয় একটুখানি ত্রুটি রয়ে গেছে। তিনি কমলে-কামিনীর ভাব-কল্পনাকে কবি মুকুন্দের মৌলিক উদ্ভাবনা বলে ভেবেছিলেন। আসলে এটি তো কবিকঙ্কণের স্বকপোলকল্পিত কোনো বিষয় নয়, পূর্বাগত ঐতিহ্য থেকে রিক্থ হিসেবে পাওয়া। কবি কেবল তাকে নিজস্ব সামর্থ্য অনুযায়ী রূপ দিয়েছিলেন। ত্রুটি হয়ে থাকলে তা কাহিনির মূল পরিকল্পকদের, মুকুন্দের নয়। তবে তিনি যে একে মহাকাব্যের শ্রেণিতে ফেলতে পারেননি,তা বোধহয় যুক্তিসঙ্গত। প্রকৃত মহাকাব্যের মধ্যে যে গাম্ভীর্য, মহানতা এবং দ্যুলোক-ভূলোক-সঞ্চারী মহত্তম কল্পনার আয়োজন থাকে, কবিকঙ্কণ চণ্ডীতে তার নিদারুণ অভাব। অথচ সেকালের মুকুন্দ-স্তাবকগণ কবিকঙ্কণের কবিত্বশক্তি সম্পর্কে প্রশংসায় মুক্ত কচ্ছ হয়ে একটি মঙ্গলকাব্যকে মহাকাব্যের তক্মা দিতে পিছপা হননি। রবীন্দ্রনাথ মূলত এঁদের অতিস্তুতির বিরুদ্ধেই খড়্গহস্ত ছিলেন এবং যুক্তিপূর্ণভাবে চণ্ডীমঙ্গালের শ্রেণিবিচার করে তাকে 'উপাখ্যান'-এর গোত্রে

ফেলেছিলেন। তাঁর 'বাঙ্গালী কবি নয়' প্রবন্ধের পিছনে ছিল কালীপ্রসন্ন ঘোষের 'নীরব কবি' (বান্ধব, মাঘ ১২৮১) ও বঙ্কিমচন্দ্রের 'বাঙ্গালী কবি কেন' (বঙ্গাদর্শন, পৌষ ১২৮২) প্রবন্ধদ্বয়ের নিঃশব্দ নেতিমূলক প্ররোচনা। কালীপ্রসন্নর উক্ত প্রবন্ধে উপস্থাপিত 'নীরব কবি'র তত্ত্বটি বাতিল করার জন্য এবং বঙ্কিমচন্দ্র কথিত—অশিক্ষিতের ওপর কল্পনার আধিপত্য এবং বাঙালি অশিক্ষিত বলেই কল্পনার অধীনস্থ ও তার সুবাদে কবি— এই 'লজিকে'র প্রতিবাদ করার জন্য রবীন্দ্রনাথকে আটঘাট বেঁধে সাহিত্যিক তর্কযুদ্ধে নামতে হয়েছিল। তাঁর কলমে মুকুন্দের সঙ্গে সমালোচিত হয়েছিলেন 'The Passionate Shepherd to His Love' কবিতার রচয়িতা যোড়শ শতাব্দীর ইংরেজ কবি ক্রিস্টোফার মার্লোও।

যাইহোক, কবির এই মুকুন্দ-বিরূপতার পিছনে আরো কিছু বাহ্যিক কারণও ছিল। অধ্যাপক বিশ্বনাথ রায় তাঁর একটি তথ্যসমৃদ্ধ প্রবন্ধে ('রবীন্দ্র-ভাবনায় কবিকঙ্কণ মুকুন্দের চণ্ডীমঙ্গাল') এ বিষয়ে বিশদ আলোচনা করেছেন।[১০] তাতে দেখা যাচ্ছে, রবীন্দ্রনাথ যখন এ প্রবন্ধ রচনায় হাত দেন তার মাস ছয়েক আগে তিনি বিলেত থেকে দেশে ফিরেছেন। বিগত দেড় বছর তাঁর কেটেছিল ইংরেজি সাহিত্যের সুপণ্ডিত লন্ডন ইউনিভার্সিটি কলেজের প্রখ্যাত অধ্যাপক হেনরি মর্লির কাছে সাহিত্যের রসসমৃদ্ধ পাঠগ্রহণে। সুতরাং অল্প বয়স থেকেই সূক্ষ্ম রোমান্টিকতার সঙ্গে তাঁর কবিচেতনায় মিশে গিয়েছিল শেক্সপীয়র-মিলটন-বায়রনের রচনাসমূহে প্রকাশিত হৃদয়াবেগের প্রবলতা। আর তিনি এর নিতান্তই অভাব দেখেছিলেন চণ্ডীমঙ্গালে। এছাড়া ঠাকুরবাড়িতে অবস্থানকালে তাঁর প্রথম দিকের সাহিত্য-রসাস্বাদনের দীক্ষাদাতা ছিলেন সেকালের প্রসিদ্ধ কবি অক্ষয়চন্দ্র চৌধুরী, যাঁর কথা আগেই বলেছি। তিনি যে রবীন্দ্রনাথের গোড়ার দিকের রচনারীতিকে লক্ষ্যে-অলক্ষ্যে প্রভাবিত করেছিলেন তা কবির স্বীকারোক্তিতেই পাওয়া যায়। এই চৌধুরী মহাশয় রমেশচন্দ্র দত্তের 'Literature of Bengal' (1878) বইটির একটি ধারাবাহিক গ্রন্থ-সমালোচনা লিখতে শুরু করেন 'ভারতী' পত্রিকায়। সেখানে একটি সংখ্যায় (কার্তিক, ১২৮৫) তিনি কবিকঙ্কণ চণ্ডীর প্রশংসার পাশাপাশি কিছু ত্রুটিও ধরিয়ে দিয়েছিলেন। অধ্যাপক রায় এ প্রসঙ্গে বলেন, 'অক্ষয় চৌধুরী নির্দেশিত কবিকঙ্কণ চণ্ডীর দোষ-ত্রুটিগুলি আলোচ্য রবীন্দ্র রচনায় পল্লবিত হয়েছে বলা যায়।' আর সেই পল্লবায়নের জন্য রবীন্দ্রনাথকে মুকুন্দ-স্তাবকদের হাতে কম লাঞ্ছিত হতে হয়নি। তাঁর 'রুদ্রচণ্ড', 'ভগ্নহৃদয়' প্রভৃতি রচনার ব্যঙ্গাত্মক সমালোচনা করতে কসুর করেননি অক্ষয়চন্দ্র সরকার ও কালীপ্রসন্ন ঘোষ। আত্মপক্ষ সমর্থনের জন্য রবীন্দ্রনাথকেও লিখতে হয়েছিল 'বাঙ্গালি কবি নয় কেন?' (ভারতী, আশ্বিন ১২৮৭), 'বস্তুগত ও ভাবগত কবিতা' (ভারতী, বৈশাখ ১২৮৮), 'কাব্যের অবস্থা পরিবর্তন' (ভারতী, আশ্বিন ১২৮৭), 'বস্তুগত ও ভাবগত কবিতা' (ভারতী, বৈশাখ ১২৮৮), 'কাব্যের অবস্থা পরিবর্তন' (ভারতী, শ্রাবণ ১২৮৮) প্রভৃতি প্রবন্ধ। এই প্রবন্ধগুলিতে একজন উঠতি রোমান্টিক কবি হিসেবে রবীন্দ্রনাথ মূলত বস্তুগত কবিতার বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়িয়েছিলেন। এতে অবস্থা আরো ঘোরালো হয়। রবীন্দ্র বিদূষকদের আক্রমণ

মারাত্মক রূপ নেয় ১২৯৩-এর অগ্রহায়ণে 'নবজীবন' পত্রিকায় প্রকাশিত অক্ষয়চন্দ্র সরকারের 'কাব্যি সমালোচনা' নামক প্রবন্ধে। তিনি রবীন্দ্রনাথের তৎকালে প্রকাশিত দুটি কাব্য 'ছবি ও গান' এবং 'কড়ি ও কোমল'-এর ওপর ব্যাপক আক্রমণ শানালেন ভাবালুতার অভিযোগে। রবীন্দ্রনাথও বসে থাকবার পাত্র নন। তিনি এর প্রত্যুত্তরে 'ভারতী ও বালক' পত্রিকার চৈত্র, ১২৯৩-সংখ্যায় লিখলেন 'কাব্য : স্পষ্ট ও অস্পষ্ট' প্রবন্ধ। এখানে তিনি অক্ষয়চন্দ্রকে আক্রমণ করতে গিয়ে কবিকঙ্কণ চণ্ডীকে আশ্রয় করলেন এবং বেছে নিলেন ফুল্লরার বারোমাস্যার সেই অংশটি যেখানে রয়েছে দারিদ্যসূচক সেই দুই চরণ : 'দুঃখ করো অবধান, দুঃখ করো অবধান।/আমানি খাবার গর্ত দেখো বিদ্যমান।' কাব্যের উদ্ধৃতি দিয়ে রবীন্দ্রনাথ লিখলেন : 'আমানি খাবার গর্ত দেখাইয়া দারিদ্র্য সপ্রমাণ করার মধ্যে কতকটা নাট্যনৈপুণ্য থাকিতেও পারে। কিন্তু ইহার মধ্যে কাব্যরস কোথায়? দুটো ছত্র, কবিত্বে সিক্ত হইয়া উঠে নাই; ইহার মধ্যে অনেকখানি আমানি আছে, কিন্তু কবির অশ্রুজল নাই। ইহাই যদি সার্থক কবিত্ব হয় তবে 'তুমি খাও ভাঁড়ে জল আমি খাই ঘাটে', সে তো আরও কবিত্ব।'[১২] শুধু এখানেই থামলেন না, কাকে 'সার্থক কবিত্ব' বলে সেটা চোখে আঙুল দিয়ে দেখানোর জন্য রবীন্দ্রনাথ তুলে আনলেন বিদ্যাপতির সেই বিখ্যাত পদ— 'সখী, এ ভরা বাদর, মাহ ভাদর/শূন্য মন্দির মোর।' বললেন, এ পংক্তি স্পষ্ট হয়েও কাব্য হয়েছে, যার ত্রিসীমানায় পৌঁছয় না মুকুন্দের প্রতিভা। এই একই প্রতি-তুলনার আরও একবার উল্লেখ মেলে তাঁর 'সাহিত্যরূপ' প্রবন্ধে। (বৈশাখ, ১৩৩৫) 'যব গোধূলি সময় বেলি' ...ইত্যাদি কাব্যচরণে সামান্য একটা ঘটনা কীভাবে অসামান্য হয়ে উঠল, তা জানানোর পরে অনিবার্যভাবে টেনে এনেছেন বারোমাস্যার সেই দুটি চরণ— 'দুঃখ করো অবধান, দুঃখ করো অবধান।/আমানি খাবার গর্ত দেখ বিদ্যমান।।' এই পংক্তি দুটিতে দরিদ্র নারায়ণের স্পষ্ট উপস্থিতি থাকলেও তা যথার্থ কাব্য হয়ে উঠতে পারেনি। এরপর রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন— 'কথাটা রিপোর্ট করা হল মাত্র, তা রূপ ধরল না। কিন্তু, সাহিত্যে ধনী বা দরিদ্রকে বিষয় করা দ্বারায় তার উৎকর্ষ ঘটে না; ভাব ভাষা ভঙ্গী সমস্তটা জড়িয়ে একটি মূর্তি সৃষ্টি হল কিনা এইটেই লক্ষ করবার যোগ্য। 'তুমি খাও ভাঁড়ে জল আমি খাই ঘাটে'— দারিদ্র্য-দুঃখের বিষয় হিসেবে এর শোচনীয়তা অতি নিবিড়, কিন্তু তবু কাব্য-হিসাবে এতে অনেকখানি বাকি রইল।'[১২]

চণ্ডীমঙ্গালের আর একটি কাব্যচিত্র রবীন্দ্রনাথের সূক্ষ্ম কল্পনাবোধকে ভীষণভাবে বিদ্ধ করেছিল বলে মনে হয়— সেটি কালকেতুর ভোজন-দৃশ্য। অতিকায় মানবটির দানবীয় ভোজনের বর্ণনা দিতে গিয়ে কাব্যের একস্থানে কবিকঙ্কণ লিখেছেন, 'শয়ন কুৎসিত বীরের ভোজন বিটকাল।/ছোট গ্রাস তোলে যেন তে-আঁটিয়া তাল।।' এই ছবিটার সঙ্গো যে কোনো ভাবেই হোক পরিমাণ-সামঞ্জস্যের অভাববোধ জড়িয়ে গিয়েছিল রবীন্দ্রনাথের মনে। তাই যেখানেই সমধর্মী ঘটনা চোখে পড়েছে কিংবা ভাব মনে এসেছে সেখানে এর অনুষঙ্গ ফুটিয়ে তুলেছেন। জাপানে গিয়ে কবি দেখেছিলেন বাণিজ্যের অতিকায় চেহারা। তাকে বর্ণনা করতে গিয়ে 'জাপান যাত্রী' বইয়ের ১১ নং পত্রে রবীন্দ্রনাথ ব্যবহার

করলেন এই বদখৎ উপমানটি : 'কবিকঙ্কণচণ্ডীতে ব্যাধের আহারের যে বর্ণনা আছে—সে এক-এক গ্রামে এক-এক তাল গিলছে, তার ভোজন উৎকট, তার শব্দ উৎকট, এও সেই রকম; এই বাণিজ্য-ব্যাধটাও হাঁসফাঁস করতে করতে এক-এক পিণ্ড মুখে যা পুরছে, সে দেখে ভয় হয়।'[১৩] ১৯৩২ সালে যখন 'কালের যাত্রা' লিখছেন রবীন্দ্রনাথ তার অন্তর্গত 'রথের রশি'তে কবির সংলাপে আবার ফিরে এল মুকুন্দ ব্যবহৃত শব্দবন্ধ : 'কুম্ভকর্ণের মতো গড়ন যার বেমানান/যার ভোজন কুৎসিত।'[১৪] এসব উল্লেখ থেকে বোঝা যায়, কবিকঙ্কণের ওই বর্ণনা রবীন্দ্রনাথের শিল্পীমনে কতটা বিরক্তি উৎপাদন করেছিল।

চণ্ডীমঙ্গালের সার্বিক চরিত্র-চিত্রণে নিয়ে যে রবীন্দ্রনাথের মনে কিছুটা অসন্তুষ্টি রয়ে গিয়েছিল তা টের পাওয়া যায় তাঁর 'পঞ্চভূত' গ্রন্থের 'নরনারী' প্রবন্ধটি থেকে। প্রসঙ্গাটি ছিল এইরকম, সাহিত্যে ও সমাজে নারী ও পুরুষের গুরুত্ব ও অবস্থান কতখানি তা নিয়ে পাঞ্চভৌতিক সভার সদস্যরা মত বিনিময় করছিল। সেখানে সমীর নামক চরিত্রটি জানায় যে, বাংলা সাহিত্যে পুরুষের তুলনায় নারী চরিত্রগুলি বেশি জীবন্ত ও সক্রিয়। উদাহরণ টেনে সে বলে, 'কবিকঙ্কণ চণ্ডীর সুবৃহৎ সমভূমির মধ্যে কেবল ফুল্লরা এবং খুল্লনা একটু নড়িয়া বেড়ায়, নতুবা ব্যাধটা একটা বিকৃত বৃহৎ স্থানুমাত্র এবং ধনপতি ও তাঁহার পুত্র কোনো কাজের নহে।'[১৫] সমীরের আড়ালে এই মত আসলে স্বয়ং রবীন্দ্রনাথের। অবশ্য এই দোষের পুরোটাই একা বেচারী মুকুন্দের ঘাড়ে বর্তাবে কিনা সন্দেহ। তবে রবীন্দ্রনাথ অন্য একটি প্রসঙ্গো প্রশংসা করেছেন মুকুন্দের অনবদ্য সৃষ্টি ভাঁড়ুদত্তের। এমন সজীব সরল চরিত্র মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে প্রায় নেই বললেই চলে। ভাঁড়ুর ঠকামি, অভিনয়-চাতুর্য, গায়ে-পড়া ভাব, মোড়লিপনা রবীন্দ্রনাথের রসিক চিত্তকে মুগ্ধ করেছিল। 'সৌন্দর্য ও সাহিত্য' (বৈশাখ, ১৩১৪) প্রবন্ধে খুব বিশদ করেই ব্যাখ্যা করেছেন রবীন্দ্রনাথ কাব্যের ভাঁড়ুদত্তের এই রসের সমগ্রতার দিকটি : 'কবিকঙ্কণ এই ছাঁদের মানুষটিকে আমাদের কাছে যে মূর্তিমান করিতে পারিয়াছেন তাহার একটি বিশেষ কারণ আছে। ভাষায় এমন একটু কৌতুকরস লইয়া সে জাগিয়া উঠিয়াছে যে, সে শুধু কালকেতুর সভায় নয়, আমাদেরও হৃদয়ের দরবারে অনায়াসে স্থান পাইয়াছে। ভাঁড়ুদত্ত প্রত্যক্ষসংসারে ঠিক এমন করিয়া আমাদের গোচর হইত না। ... কবিকঙ্কণ-চণ্ডীতে ভাঁড়ুদত্ত তাহার সমস্ত অনাবশ্যক বাহুল্য বর্জন করিয়া কেবল একটি সমগ্র রসের মূর্তিতে আমাদের কাছে প্রকাশ পাইয়াছে।'[১৬] বস্তুত কেবল ভাঁড়ুদত্তের চরিত্র-চিত্রণ নয়, রবীন্দ্রনাথ কবিকঙ্কণ-চণ্ডীতে যেখানে যেখানে সাহিত্যরসের বাঙ্ময়মূর্তি প্রত্যক্ষ করেছেন সেই সেই কাব্যপ্রসঙ্গাগুলি সম্বন্ধে তিনি উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেছেন। সুতরাং তাঁকে নির্বিচারে মুকুন্দ-বিরোধীর তকমায় চিহ্নিত করা যুক্তিযুক্ত নয়। তাঁর মুকুন্দ বিচার ছিল পুরোপুরি কাব্যতত্ত্বের নিক্তিতে, যে তত্ত্ব প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য সাহিত্যের অমর সৃষ্টিসম্ভার পাঠের ফলে তাঁর সমালোচক সত্তায় স্বতঃস্ফূর্তভাবে তৈরি হয়ে উঠেছিল। তিনি কবিকঙ্কণের বিচারে পূর্বাগত কোনো সংস্কার দ্বারাই চালিত হননি। তাঁর তৎকালীন তরুণ হৃদয় ভাবগত কবিতার মধ্যে আপনার স্ফূর্তিকে সম্পূর্ণরূপে অনুভব করছিল। অন্যদিকে, সেকালে কবিকঙ্কণের কাব্য এবং তাঁর প্রতিভা সম্পর্কে কিছু

প্রাচীনপন্থী মানুষের উচ্ছ্বাস ছিল বেশি, যা সবসময় যুক্তি-বুদ্ধির পথ ধরে এগোয়নি। রবীন্দ্রনাথ সেইসব মুকুন্দ-স্তাবকদের মধ্যে দেখেছিলেন যুক্তিহীন অতিভক্তির বাড়াবাড়ি। মুকুন্দের আক্রমণের পেছনে তাঁরাও ছিলেন তাঁর লক্ষ্যস্থল। তাছাড়া রক্ততারল্যের কারণে সদ্যযুবার মধ্যে থাকে তর্ক ও প্রতিবাদ-প্রবণতা। প্রথমদিকের সমালোচক রবীন্দ্রনাথ এ জাতীয় প্রবণতা থেকে মুক্ত ছিলেন না। এর আর একটি বড়ো প্রমাণ মেলে মাইকেলের 'মেঘনাদবধ কাব্য'-র বিধ্বংসী প্রতিকূল সমালোচনায়। সুতরাং মুকুন্দকে নিয়ে রবীন্দ্রনাথের প্রথম দিকের বিবেচনায় নিন্দামন্দই বেশি চোখে পড়ে।

কিন্তু কবিকঙ্কণ সম্পর্কে এই বিচারই রবীন্দ্রনাথের শেষ বিচার নয়, পরবর্তীকালে লেখা প্রবন্ধগুলি দেখলে সে কথাই মনে হবে। চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছ থেকে চণ্ডীমঙ্গাল সম্পর্কে কিছু বলবার অনুরোধ পেয়ে আবার খুঁটিয়ে পড়েন কবিকঙ্কণ-চণ্ডী এবং সেই পাঠ-প্রতিক্রিয়ার একটা অংশ অন্য প্রসঙ্গো প্রকাশ পায় 'বাতায়নিকের পত্র'-এ (৫ জ্যৈষ্ঠ, ১৩২৬)। লেখাটা 'প্রবাসী'তে ছাপা হয় পরের মাসেই। এর মাস চারেক পরে ওই 'প্রবাসীতে'ই প্রকাশিত হয় 'শক্তিপূজা'। এই দুটি প্রবন্ধে মঙ্গালকাব্য সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের সামগ্রিক অভিমত অত্যন্ত প্রাঞ্জলভাবে প্রকাশ পেয়েছে। এখানে তিনি সাহিত্যের রসতাত্ত্বিক বিচার করেননি, করেছেন আখ্যানগুলির সাংস্কৃতিক ও সমাজতাত্ত্বিক বিচার। মনসা কিংবা চণ্ডী শক্তিদেবী হিসেবে সমাজে পূজিত হন। এঁরা কীভাবে শৈব ধর্মবিশ্বাসকে পরাভূত করে নিজেদের মহিমা প্রতিষ্ঠায় অগ্রসর হয়েছিলেন সংশ্লিষ্ট মঙ্গালকাব্যের আখ্যানে তারই আভাস পেয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথ। দেবীদের অন্যায়, অধর্ম ও পক্ষপাতিত্ব স্পষ্টমাত্রায় ফুটে উঠেছে ধনপতি, চন্দ্রধর ও কালকেতুর প্রতি আচরণে। শক্তিদেবীদের দম্ভসূচক অধর্মের জয়গানকে মঙ্গালগান বলে সমাজে চালিয়ে দেবার অপকৌশলকে রবীন্দ্রনাথ মন থেকে মানতে পারেননি। তাই তাঁর ভাবনায় যখনই অন্যায়ের প্রতিরূপ সৃষ্টির প্রসঙ্গা এসেছে তিনি বলদর্পী মঙ্গালদেব-দেবীদের কিংবা তাঁদের কাহিনির প্রাসঙ্গিক অনুষঙ্গা ব্যবহার করেছেন। রবীন্দ্রনাথ ছিলেন প্রথমাবধি ভক্তির পূজারি, শান্ত-শিব-মঙ্গালের সাধক। তাই মুকুন্দের কাব্যের বিষয়বস্তুকে অন্তরের সঙ্গো মেনে নিতে পারেননি। মুকুন্দ-বিরূপতার এটা একটা বড়ো কারণ।

অধ্যাপক বিশ্বনাথ রায় তাঁর পূর্বোক্ত প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথের মুকুন্দ-অনুধ্যানের যে সার্বিক চিত্র তুলে ধরেছেন তাতে দেখা যাচ্ছে, কবিকঙ্কণের কাব্য নানা কারণেই কবির বিতৃষ্ণা উৎপাদন করলেও তাঁর সারাজীবনের রচনায় প্রায় পঞ্চাশটি ক্ষেত্রে কবিকঙ্কণ চণ্ডীর প্রসঙ্গা উত্থাপন করেছেন— কোথাও প্রশংসার জন্য, কোথাও সমালোচনার জন্য, কোথাও বা নিছক 'রেফারেন্স'-এর প্রয়োজনে। অধ্যাপক রায় আবিষ্কার করেছেন রবীন্দ্রনাথের তিনটি কবিতায় (চিত্রার 'অন্তর্যামী', শ্যামলীর 'বাঁশিওয়ালা' ও আকাশপ্রদীপের 'সময়হারা') মুকুন্দের ভাবগত প্রভাব। চণ্ডীমঙ্গালকে 'সরস কাব্য' হিসেবে রবীন্দ্রনাথ অকুণ্ঠ প্রশংসার সঙ্গো স্বীকার করেছেন এবং মুকুন্দের কাব্যেই পেয়েছেন 'বাংলার জনসাধারণের পরিচয়'। সুতরাং, রবীন্দ্রনাথের মুকুন্দ-সমালোচনাকে যাঁরা অবিমিশ্র নেতিবাচক মূল্যায়ন বলে মনে

করেন, তাঁরা রবীন্দ্র-চিন্তার খণ্ডাংশের সঙ্গেই পরিচিত; আর খণ্ডাংশ চিরকালই পূর্ণাংশের বিকৃত রূপ।

বাংলা মঙ্গলকাব্যসমূহের মধ্যে রায়গুণাকর ভারতচন্দ্র রায় রচিত 'অন্নদামঙ্গল' বিশিষ্ট। কাব্যটি লেখা হয়েছিল রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের রাজসভায় বসে; রচনা সমাপ্তির কাল ১৭৫২ খ্রিস্টাব্দ। ভারতচন্দ্রের মতো কৃতবিদ্যা, যশস্বী, শক্তিমান কবির আবির্ভাব বঙ্গদেশে সারা মধ্যযুগে ঘটেছিল কিনা সন্দেহ। তাঁর অসাধারণ সৃষ্টি 'অন্নদামঙ্গল' বিষয়বস্তুর অভিনবত্বে, চরিত্র-চিত্রণের মুন্সিয়ানায়, ভাষার আলংকারিকতায় গতানুগতিক সাহিত্য-ভাবনায় অভ্যস্ত ঝিমিয়ে পড়া পাঠকসমাজে একদা চাঞ্চল্য সৃষ্টি করেছিল। এই হঠাৎ ঝাঁকুনির একটা কারণ অবশ্যই 'অন্নদামঙ্গলে'র দ্বিতীয় খণ্ড 'বিদ্যাসুন্দর'। এ অংশে যে অনাবৃত অশ্লীলতা রয়ে গিয়েছে তা কবিকে একই সঙ্গে নিন্দিত ও নন্দিত করেছে। যুগরুচিই যে অনেক সময়ে সাহিত্যসৃষ্টিকে নিয়ন্ত্রণ করে ভারতচন্দ্রের কাব্য তার উল্লেখযোগ্য দৃষ্টান্ত। কৃষ্ণনগরের রাজসভার কবি হওয়ার সুবাদে তাঁর রচনায় দরবারি সাহিত্যের যা-কিছু বিশিষ্টতা সবই আছে। সবচেয়ে বেশি আছে বোধহয় 'আর্ট', যে-আর্ট শ্লীল-অশ্লীল নিয়ে ভুরু-বাঁকানো প্রশ্ন তোলে না। আঠারো শতকের মধ্যপর্বের কাব্য হলেও কবির মনোভাবে কোথাও কোথাও স্পর্শ লেগেছিল আগামী আধুনিকতার। সব মিলিয়ে এ কাব্য অনন্য ও কারো কারো মতে মঙ্গলকাব্যধারার শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি। এমন একটি প্রাতিস্বিক রচনার সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের পরিচয় হওয়া খুবই স্বাভাবিক। তবে গ্রন্থটির সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের প্রথম পরিচয় কবে হয়েছিল জানা যায় না। অধ্যাপক চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছে কবিকঙ্কণ চণ্ডী বিষয়ে জানতে গেলে কবি কেবল চণ্ডীমঙ্গলটুকু পাঠ করে মঙ্গলকাব্য বিষয়ে তাঁর মতামত গড়ে তোলেননি, সেই সঙ্গে যে 'অন্নদামঙ্গল'ও পড়েছিলেন এবং 'নোট' করে রেখেছিলেন, তা উক্ত চিঠিতেই জানিয়েছিলেন। দুর্ভাগ্যের বিষয়, মার্জিনের নোটসহ 'চণ্ডীমঙ্গল' বইটি পাওয়া গেলেও 'অন্নদামঙ্গল'টি আর মেলেনি। ফলে ভারতচন্দ্রের কাব্যটি সম্বন্ধে নানা স্থানে টুকরো টুকরো যেসব মন্তব্য রবীন্দ্রনাথ করেছিলেন, সেগুলি সূত্রাকারে সাজিয়ে এ কাব্য বিষয়ে তাঁর প্রতিক্রিয়াটি বুঝে নেওয়া যেতে পারে।

আচার্য দীনেশচন্দ্র সেনের 'বঙ্গভাষা ও সাহিত্য' বইটির পুস্তক-পর্যালোচনা সূত্রে যে-প্রবন্ধ লিখেছিলেন রবীন্দ্রনাথ তাতে 'অন্নদামঙ্গল' সম্পর্কে বিশেষ কোনো বিশ্লেষণ মেলে না। তবে শক্তিমাহাত্ম্য বিষয়ক অন্যান্য মঙ্গলকাব্য সামাজিক আরাজকতা ও রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাসের অভ্যন্তরে ভাগ থেকে যেভাবে উত্থিত হয়েছিল 'অন্নদামঙ্গল' এইরকম কোনো পটভূমি থেকে উদ্ভূত হয়নি বলে তাঁর মনে হয়েছে। তিনি বরং শিব-গৃহিণীর রূপান্তরটি কালের প্রেক্ষাপটেই লক্ষ করেছেন। পূর্বের 'অত্যুগ্র চণ্ডী' 'উত্তরোত্তর মধুর ও কোমল'মূর্তি ধারণ করেছেন ভারতচন্দ্রের রচনায়। তিনি এখানে দেখা দিয়েছেন জননী অন্নপূর্ণা, ভিখারির গৃহলক্ষ্মী ও বিচ্ছেদবিধুর পিতামাতার কন্যারূপে। 'বাঙালির দরিদ্রগৃহের মধ্যে এই মঙ্গলমাধুর্যসিক্ত দেবভাবের অবতারণা কবিকঙ্কণ চণ্ডীতে কিয়ৎ পরিমাণে আপনাকে অঙ্কিত করিয়াছে, অন্নদামঙ্গলও তাহার উপর রঙ ফলাইয়াছে।'[১৭]

এই মন্তব্যের একযুগ আগে ১২৯৪ বঙ্গাব্দের শ্রাবণে প্রকাশিত 'আলস্য ও সাহিত্য' প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ 'অন্নদামঙ্গালে'র স্থানে স্থানে অলস কল্পনাকে প্রত্যক্ষ করেছিলেন, যে-কল্পনা পবিত্র জীবনের অভাবে বিকৃতি প্রাপ্ত হতে থাকে। বিদ্যাসুন্দরের একটা বিশেষ অংশ উদ্ধৃত করে রবীন্দ্রনাথ দেখিয়েছেন, হৃদয়ের আবেগ কল্পনার তেজ হারিয়ে কীভাবে কেবল বঙ্কিম কথাকৌশলে পরিণত হয়। আলস্য ও দারিদ্র্য আসলে একই মুদ্রার এপিঠ-ওপিঠ। প্রথমটি দ্বিতীয়টিকে আহ্বান করে। সাহিত্যেও এ দুইয়ের অবস্থান কখনো কখনো লক্ষ করা যায়। অলস কল্পনার পক্ষে উঞ্ছবৃত্তি ছাড়া তখন আর কিছু উপায় থাকে না। ভারতচন্দ্র অঙ্কিত শিব চরিত্রে এর প্রমাণ পেয়েছেন রবীন্দ্রনাথ। 'অন্নদামঙ্গালে'র শিব 'কুমারসম্ভবে'র যতি-সন্ন্যাসী নন, বাংলার বেদে সমাজের একজন। যার ধূসর মলিন বেশ, মাথার চুলে জট, গায়ে উড়ছে খড়ি। শিবের এই মূর্তি আলস্যপ্রসূত দরিদ্র কল্পনার ফল। এরই সঙ্গো এ কাব্যে রবীন্দ্রনাথ যে-ইন্দ্রিয়বিকার প্রত্যক্ষ করেছেন, তার মূলেও দেখেছেন এই দরিদ্র কল্পনার উপস্থিতি। প্রবন্ধটির একস্থানে লিখেছেন— 'কল্পনার দারিদ্র্য যদি দেখিতে চাও অন্নদামঙ্গালের মদনভস্ম পাঠ করিয়া দেখো। বদ্ধমলিন জলে যেমন দূষিত বাষ্পস্ফীত গাঢ় বুদ্বুদশ্রেণী ভাসিয়া উঠে তেমনি আমাদের এই বিলাস-কলুষিত অলস বঙ্গাসমাজের মধ্য হইতে ক্ষুদ্রতা ও ইন্দ্রিয়বিকারে পরিপূর্ণ হইয়া অন্নদামঙ্গাল ও বিদ্যাসুন্দর ভাসিয়া উঠিয়াছিল। নিরবচ্ছিন্ন আলস্যের মধ্যে এইরূপ সাহিত্যই সম্ভব।'[১৮] এখানে প্রাসঙ্গিকভাবে উল্লেখ্য যে, ভারতচন্দ্রের 'বিদ্যাসুন্দর' নিয়ে উনিশ ও বিশ শতকের শিক্ষিত বাঙালি সমাজ স্পষ্টত দুটি দলে বিভক্ত ছিল। একটা দলের মতে, ভারতচন্দ্রের কাব্য যে অশ্লীল হয়ে উঠেছে তার জন্য দায়ী যুগরুচি ও দীর্ঘদিনের ভারতীয় সাহিত্য-ঐতিহ্য। প্রাচীন ভারতবর্ষে এ রসের চর্চা ছিল যথেষ্ট। 'বিদ্যাসুন্দরে'র কবি সেই ধারারই অনুবর্তীমাত্র। তাছাড়া উনিশ শতকের পশ্চিমি সংস্কৃতি ও মূল্যবোধ এদেশে প্রবেশ করার আগে অব্দি এখানকার অলংকারশাস্ত্রীরা অশ্লীলতাকে অন্য চোখে দেখতেন। ভারতচন্দ্র ভীষণই অশ্লীল। তাঁর রচনা রুচি-বিকৃতির চূড়ান্ত। যা পাঠকের মনকে অসুস্থ করে তোলে। এ কাব্য নৈতিক মূল্যবোধের অধঃপতনকে সূচিত করে, অতএব এর থেকে শত হস্ত দূরে থাকাই শ্রেয়।

এই দুই পরস্পর বিরুদ্ধ মতের পরিপ্রেক্ষিতে ভারতচন্দ্র সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের অবস্থান ছিল বিমিশ্র। তিনি 'বিদ্যাসুন্দরে'র অশ্লীলতা নিয়ে যেমন কটু সমালোচনা করেছেন, তেমনি 'অন্নদামঙ্গালে'র বাণীশিল্পকে পরিয়েছেন বিজয়মাল্য। এই মঙ্গালকাব্যটিতে পুরাণ, কল্পকাহিনি ও জাহাঙ্গীর-সমকালীন ইতিহাস একত্র সহাবস্থান করলেও তিনি এর ঐতিহাসিক অংশ মানসিংহ বা ভবানন্দ পালা নিয়ে কিছুই বলেননি। প্রথমাংশ অন্নপূর্ণা-মাহাত্ম্য বিষয়ে রবীন্দ্রনাথের বক্তব্য অন্যান্য শাক্তমঙ্গালকাব্যের মতোই। অর্থাৎ নিগ্রহের দেবীকে নিয়ে মঙ্গালগান রচনা সমাজের পক্ষে একধরনের বিড়ম্বনা। সন্ত্রাস কখনই সমাজে পূজা পেতে পারে না— এই নৈতিক ধারণা রবীন্দ্রনাথকে 'অন্নদামঙ্গালে'র কাহিনিবস্তু বিচারে কিছুটা কুণ্ঠিত করে রেখেছিল। অধ্যাপক শঙ্করীপ্রসাদ বসু এর সঙ্গো যুক্ত করেছেন রবীন্দ্রনাথের বিশেষ ধর্মবিশ্বাসকে, (যাকে তিনি 'সাম্প্রদায়িক কারণ' বলে নির্দেশ করেছেন) যা কিনা

শাক্তসাহিত্য সম্বন্ধে তাঁর স্বাভাবিক অপ্রীতির ও সহজাত মানসিক বিরূপতার কারণ।[১৯] হয়তো এই সঙ্গেই জুড়ে দেওয়া যায় গীতিধর্মিতা সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের স্বাভাবিক সহানুভূতি ও আখ্যানপ্রধান রচনা সম্পর্কে তাঁর বিতৃষ্ণাকেও। একাধিক জায়গায় তিনি অভিযোগ করেছেন বিশ্বসাহিত্যের শ্রেষ্ঠ সৃষ্টিগুলির মধ্যে যে সার্বভৌমিকতা আছে, ভারতচন্দ্র কিংবা মুকুন্দের প্রশংসাকারীরা আবেগ ও ভক্তিবশত সেইস্থানে এঁদের সাহিত্যকে স্থাপন করলেও সেসব রচনা প্রাদেশিকতার ছাপ মুছে ফেলতে পারেনি। সেজন্য রবীন্দ্রনাথ 'অন্নদামঙ্গলে'র যতটুকু প্রশংসা করেছেন তা হিসেবি প্রশংসা এবং যুক্তি-সমর্থিত।

অন্যান্য অনেক নীতিবাগীশ সমালোচকের মতো রবীন্দ্রনাথও খড়্গহস্ত হয়েছেন বিদ্যাসুন্দরের অশ্লীলতার ওপর। এ বিষয়ে তাঁর বন্ধু লোকেন পালিতকে লেখা ১২৯৮ বঙ্গাব্দের পত্রটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য (যা পরে 'মানব প্রকাশ' নামে প্রকাশিত হয় 'সাধনা' পত্রিকার ১২৯৯ সালের ভাদ্র-আশ্বিন সংখ্যায়)। তাঁর মতে, রাজসভার এই কৃতবিদ্য কবি অশ্লীলতাকে পুরোপুরি অনাবৃত করেননি, চাকচিক্যময় ভাষা-ছন্দ-অলংকারে অর্ধোন্মুক্ত রেখেছিলেন, আর তাতেই সেই আংশিক অনাবরণ হয়ে উঠেছে প্রবলমাত্রায় জুগুপ্সাব্যঞ্জক। রচনার কিয়দংশ এই : 'সুবৃহৎ অনাবরণের মধ্যে অশ্লীলতা নেই। সেইজন্যে শেক্‌সপীয়র অশ্লীল নয়, রামায়ণ-মহাভারত অশ্লীল নয়। কিন্তু ভারতচন্দ্র অশ্লীল, জোলা অশ্লীল— কেননা তা কেবল আংশিক অনাবরণ।'[২০] তাই 'বিদ্যাসুন্দর' সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের সিদ্ধান্ত হল— 'ভারতচন্দ্রের বিদ্যাসুন্দর পড়িয়া কাহারো মনে কখনো মহান ভাব বা যথার্থ সুন্দরভাবের উদয় হয় নাই।' বিদ্যাসুন্দরে পরিবেশিত অসামাজিক প্রেম সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের বিরূপতা চিরস্থায়ী হয়েছিল। ১৩০৫ বঙ্গাব্দের ফাল্গুন-চৈত্র সংখ্যায় 'ভারতী'-তে প্রকাশিত 'গ্রাম্যসাহিত্য' প্রবন্ধে তিনি আরও একবার আক্রমণ করলেন ভারতচন্দ্রকে। বৈষ্ণব কবিদের কামকে প্রেমে পরিণত করবার অসীম ক্ষমতার কথা উল্লেখ করে প্রতিতুলনায় নিয়ে এলেন রায়গুণাকরের প্রসঙ্গ। দ্ব্যর্থহীন ভাষায় বললেন : 'বরঞ্চ বিদ্যাসুন্দরের কবি সমাজের বিরুদ্ধে যথার্থ অপরাধী। সমাজের প্রাসাদের নীচে তিনি হাসিয়া হাসিয়া সুরঙ্গ খনন করিয়াছেন। সে সুরঙ্গ মধ্যে পূত সূর্যালোক এবং উন্মুক্ত বায়ুর প্রবেশপথ নাই।'[২১] তথাপি বিদ্যাসুন্দর কাব্যের এবং বিদ্যাসুন্দর যাত্রাপালার এত কদর কেন এদেশে? নিজেই প্রশ্ন করে তার উত্তর সন্ধানও করেছেন : 'উহা অত্যাচারী কঠিন সমাজের প্রতি মানব-প্রকৃতির সুনিপুণ পরিহাস।' ১৩৩৪ বঙ্গাব্দের শ্রাবণে 'বিচিত্রা' পত্রিকায় প্রকাশিত হল রবীন্দ্রনাথের 'সাহিত্যধর্ম' প্রবন্ধ। সেখানে তাঁর আলোচনার বিষয় ছিল পশ্চিমি সাহিত্যের হাত ধরে বাংলা সাহিত্যে ঢুকে-পড়া ফ্রয়েডীয় মনোবিকলনের যৌনতাগ্রস্ত আধুনিকতা। সৌজন্যে কল্লোলগোষ্ঠী। সেখানেও তিনি 'ল্যাঙট-পরা গুলিপাকানো ধূলো মাখা আধুনিকতা'কে মান্যতা দিতে পারেননি, বলেছিলেন এ হচ্ছে 'সাহিত্যরসের হোলিখেলায় কাদামাখামাখির ভোজপুরী মাতলামি।' রিয়্যালিটির ধুয়ো তুলে কাঁচা নর্দমার পাঁক পরিবেশ করা হচ্ছে সাহিত্যের নাম করে। আর সেই প্রসঙ্গেই তপ্ত নাগরিকতার দৃষ্টান্ত ও আদিরসের সহজ কদর বোঝাতে গিয়ে ভারতচন্দ্রের 'বিদ্যাসুন্দরে'র কথা তাঁর আগে স্মরণে এসেছিল।

'অন্নদামঙ্গলে'র চরিত্রচিত্রণ বিষয়েও রবীন্দ্রনাথের নিজস্ব কিছু ভাবনা ছিল। এই কাব্যে শিবের যে বর্ণনা পাওয়া যায় তাতে তাঁকে শাস্ত্রীয় যতী-বৈরাগী বলে আদৌ মনে হয় না। তাঁর লৌকিক রূপটাই যেন প্রধান করে তুলেছেন ভারতচন্দ্র। তিনি ভিখারী ও রঙ্গব্যঙ্গের উপকরণ। রবীন্দ্রনাথ 'কালান্তর' গ্রন্থের 'শক্তিপুজা' প্রবন্ধে বিষয়টিকে উল্লেখ করেছেন : 'রাজসভার কবি ভারতচন্দ্রের অন্নদামঙ্গালে শিবের যে চরিত্র বর্ণিত সে আর্যসমাজসম্মত নয়।'[২২] যে হীরা মালিনী প্রায় সব সমালোচকেরই প্রশংসা কুড়িয়েছে, রবীন্দ্রনাথ সেই বাক্‌বিদগ্ধ পরিহাসপটু রসিকা সম্বন্ধে একেবারেই নীরব থেকেছেন। এমনকি ঈশ্বরীপাটনি সম্পর্কেও তাঁর আলাদা কোনো অভিমত নেই। এতে মঙ্গালকাব্য সম্পর্কে তাঁর আন্তরিক বিরক্তি টের পাওয়া যায়।

তবে এর পাশাপাশি এটাও সত্য যে, রবীন্দ্রনাথ 'অন্নদামঙ্গালে'র নিছক বিধ্বংসী সমালোচনা করেননি, প্রয়োজনে তার অকুণ্ঠ স্তুতিও করেছেন এবং সচেতন-অচেতনভাবে ভারতচন্দ্রের দ্বারা ছন্দ-ভাষা-অলংকারে প্রভাবিত হয়েছেন। ভারতচন্দ্র ছিলেন অসম্ভব শব্দসিদ্ধ কবি। তাঁর বিদ্যা ও বৈদগ্ধ্যে ঘটেছিল শুভ পরিণয়। বিদ্যাসুন্দরে কেউ নাসিকাকুঞ্চনের মতো উপকরণ পেলেও কবির পরিবেশন গুণে তা অশ্লীলতার চারুশিল্পে পরিণত হয়েছে। তৎকালীন রাজসভাগুলিতে আদিরসের চর্চা বেশ হতো। ভারতচন্দ্র ধর্ম তথা আধ্যাত্মিকতার পোশাক পরিয়ে বিদ্যাসুন্দরে এই রসের চূড়ান্ত (সৌজন্যে 'বিহার' ও 'বিপরীত বিহার') করে ছেড়েছেন। বাংলা ভাষার সঙ্গে যাবনী শব্দ মিশাল দেওয়ায় ঐতিহাসিক বাস্তবতা ফুটেছে অনেক বেশি। দেশি শব্দের মধ্যে নিহিত প্রাণশক্তির সন্ধান পেয়েছিলেন ভারতচন্দ্র। তাকেও পূর্ণমাত্রায় ব্যবহার করেছেন কাব্যের যত্রতত্র। ধ্বন্যাত্মক শব্দ ও প্রবাদোপম উক্তির ব্যবহারে রায়গুণাকর গোটা মধ্যযুগের শিরোমণি কবি। ছন্দের ক্ষেত্রেও তিনি সব্যসাচী। বাংলা ও সংস্কৃত ছন্দের এমন নিপুণ প্রয়োগ নিশ্চয়ই শ্রুতিসচেতন রবীন্দ্রনাথকে আপ্লুত করেছিল। গুণাকর কবির সেই গুণপনাকে কদর করতে একটুও কুণ্ঠিত হননি রবীন্দ্রনাথ। 'কবি-সংগীত' প্রবন্ধে তিনি যেন প্রবচন বাক্যের অমোঘতা সঞ্চার করে লেখেন এই হীরকদ্যুতিময় বাক্য : 'রাজসভাকবি রায়গুণাকরের অন্নদামঙ্গাল গান রাজকণ্ঠের মণিমালার মতো, যেমন তাহার উজ্জ্বলতা তেমনি তাহার কারুকার্য।'[২৩] তাঁর এই মন্তব্য আজও পর্যন্ত ভারতচন্দ্রের সমালোচনায় সবচেয়ে বেশি ব্যবহৃত প্রাজ্ঞোক্তি।

এবার রবীন্দ্রনাথের ওপর ভারতচন্দ্রের ছায়াবিস্তারের কথা। এ বিষয়ে প্রথম আভাস দিয়েছিলেন ভারতচন্দ্রের শ্রেষ্ঠ সমালোচক প্রমথ চৌধুরী। তিনি ছিলেন ফরাসি সাহিত্যের পাঠ নেওয়া রসজ্ঞ এক বোদ্ধা। ১৯১৭ সালের ১৪ মে তারিখে রবীন্দ্রনাথের দ্বারা অনুরুদ্ধ হয়ে এক সাহিত্য সমাবেশে ভাষণ দিতে গিয়ে ভারত-প্রতিভার মূল্যায়ন বিষয়ে বলেছিলেন— '...there is nothing which can be compared to it as a work of art. With the solitary exception of Rabindranath Tagore, no Bengalee poet has ever shown such mastery over verse-forms'.[২৪](The Story of Bengali Literature) সুন্দর চোরের মতো ভারতচন্দ্রও গোপন সুড়ঙ্গ কেটে রবীন্দ্রনাথের

মনোজগতে পৌঁছেছিলেন বলে মনে হয়। এ বিষয়ে কয়েকটি দৃষ্টান্ত দিচ্ছি :

১. ভারতচন্দ্রের লেখায় ধ্বন্যাত্মক শব্দ বিশেষ ধ্বনিঝংকারের সৃষ্টি করেছে। তিনি মূলত যুদ্ধের বর্ণনায় কিংবা উত্তেজনাকর কোনো পরিস্থিতির বর্ণনায় এ ধরনের শব্দ ব্যবহার করতে আগ্রহী হয়েছেন। যেমন শিবের দক্ষালয় যাত্রায় লিখেছেন—

যক্ষ রক্ষ লক্ষ লক্ষ অট্ট অট্ট হাসিছে।...
ঘোর রোল গণ্ডগোল চৌদ্দলোক ঝাঁপিছে।।
অট্ট অট্ট খট্ট খট্ট ঘোর হাস হাসিছে।[২৫]

এর সঙ্গে মিলিয়ে পড়া যাক রবীন্দ্রনাথের 'বাল্মীকি প্রতিভা'র এই অংশ—

ওই লক্ষ লক্ষ যক্ষ রক্ষ ঘেরি শ্যামারে।
ওই লট্ট-পট্ট-কেশ অট্ট অট্ট হাসেরে।।[২৬]

২. আধুনিক বাংলা সাহিত্যে ছন্দ নিয়ে রবীন্দ্রনাথই প্রথম নানারকম দুঃসাহসিক পরীক্ষা-নিরীক্ষায় নামেন। তার আগে প্রাগাধুনিক পর্বে এই বিশেষ ভূমিকায় বৃত ছিলেন ভারতচন্দ্র। বাংলার স্বাভাবিক তিন ছন্দোরীতি তো বটেই, প্রত্নকলাবৃত্ত, প্রাকৃত এবং অনেকগুলি সংস্কৃত ছন্দের সরাসরি প্রয়োগ করেছেন বাংলায়। পয়ার ও ত্রিপদীতে ছোটো-বড়ো নানা দৈর্ঘ্যের চরণসজ্জা করে স্তবক রচনা করেছেন। বোধহয় পূর্ব দৃষ্টান্ত হিসেবে এগুলি রবীন্দ্রনাথকেও ভাবিয়েছিল। নিচের সাদৃশ্যগুলি কৌতূহলের সঙ্গে লক্ষ করবার মতো—

আটমাত্রিক চরণে ভারতচন্দ্র—

জানকী জীবন রাম।
নবদুর্বাদল শ্যাম।।
মোরে তারহ তারিণী।
অভয়া ভয়হারিণী।।[২৭]

আটমাত্রিক চরণে রবীন্দ্রনাথ—

স্বপ্ন আমার জোনাকি,
দীপ্ত প্রাণের মণিকা।
স্তব্ধ আঁধার নিশীথে
উড়িছে আলোর কণিকা।[২৮]

৩. ভারতচন্দ্রের 'বিদ্যাসুন্দর'-এর প্রধান অবলম্বন ছিল সংস্কৃত কবি বিল্‌হনের 'চৌরপঞ্চাশিকা।' এতে পঞ্চাশটি শ্লোকে আদিরস বর্ণিত হয়েছে। ভারতচন্দ্র অবশ্য মাত্র তিনটি শ্লোকের অনুবাদ করেছিলেন। রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'কল্পনা' কাব্যে 'চৌরপঞ্চাশিকা' নামের কবিতায় বিদ্যাসুন্দরের উপাখ্যানের মধ্যে বিশ্বের প্রেমিক-প্রেমিকার জন্য যে চিরন্তন প্রেমের বাণী আছে, তার ইঙ্গিত দিয়েছেন। রবীন্দ্রনাথ সেই কবির জয়গান করে বলেছেন—

ওগো সুন্দর চোর,

তোমারি রচিত সোনার ছন্দ-
পিঞ্জরে তারা ভোর।
দেখিতে পায় না কিছু চারিধারে
শুধু নিশিদিন গাহে বারে বারে
তোমাদের চিরশয়নদুয়ারে
ওগো সুন্দর চোর,
আজি তোমাদের দুজনের চোখে
অনন্ত ঘুমঘোর।[২৯]

যে অবৈধ প্রেমের জুগুপ্সাব্যঞ্জক কাব্য নিয়ে রবীন্দ্রনাথ বারবার আঘাত হেনেছেন ভারতচন্দ্রকে, এ কবিতায় তা-ই হয়েছে তাঁর অবলম্বন। সৃষ্টিপর্বের প্রথম দিকে রবীন্দ্রনাথ 'প্রকৃতির প্রতিশোধ'-এ (১৮৮৪) একদল মালিনীকে নিয়ে এসেছেন আখ্যান মধ্যে, যারা রঙ্গামঞ্চে প্রবেশ করে গায়—

বুঝি বেলা বহে যায়,
কাননে আয় তোরা আয়।
আলোতে ফুল উঠল ফুটে, ছায়ায় ঝরে পড়ে যায়।
সাধ ছিল রে পরিয়ে দেব মনের মতন মালা গেঁথে
কই সে হল মালা গাঁথা, কই সে এল হায়![৩০]

এ গান শুনেই চট্ করে মনে পড়ে যায় আঠারো-উনিশ শতকের বিদ্যাসুন্দর যাত্রাপালার কথা, যেখানে আবশ্যিকভাবে ছিল মালিনী চরিত্র এবং তারও মুখে এমন চটুল গান। ব্রাহ্ম পরিবারে বিদ্যাসুন্দরের চটুলতা নৈতিক কারণেই নিষিদ্ধ ছিল, কিন্তু এ ধরনের রসালো সাহিত্য যে একেবারে প্রবেশ করতই না, একথা জোর দিয়ে বলা যাবে না। স্বর্ণকুমারী দেবীর 'সেকেলে কথা' জলজ্যান্ত সাক্ষ্য দিচ্ছে : 'মনে আছে বাড়িতে মালিনী বই বিক্রি করিতে আসিলে মেয়েমহল সেদিন কি রকম সরগরম হইয়া উঠিত। সে বটতলার নতুন বই, কাব্য, উপন্যাস, আষাঢ়ে গল্প অন্তঃপুরে আনিয়া দিদিদের লাইব্রেরীর কলেবর বৃদ্ধি করিয়া যাইত। ...বড় হইয়া সে-কালের বইগুলি যথেষ্ট নাড়াচাড়া করিয়াছি, মানভঞ্জন, প্রভাস-মিলন, দূতী-সংবাদ, কোকিল দূত, রুক্মিণীহরণ, পারিজাতহরণ, গীতগোবিন্দ, প্রহ্লাদ চরিত্র, রতিবিলাপ, বস্ত্রহরণ, অন্নদামঙ্গল, আরব্যোপন্যাস, পারস্যোপন্যাস, চাহার-দরবেশ, হাতেমতাই, গোলেবকায়লী, লায়লামজনু, বাসবদত্তা, কামিনীকুমার ইত্যাদি।'[৩১] এসব বইয়ের কিছু কিছু যে হাতফেরতা হয়ে অন্তঃপুর ছেড়ে বারমহলে গিয়ে পড়ত না, তার কি কোনো প্রমাণ আছে? রবীন্দ্রনাথের বাল্য-কৈশোর কেটেছিল এইসব বইয়ের সাহচর্যে। তাঁর মনের অন্দরে ভারতচন্দ্র নিঃশব্দে অতনু প্রভাব ফেলে গিয়েছেন। বাইরের পরিশীলিত রুচি, কাব্যগত সংস্কার বাধা দিলেও ভেতরে ভেতরে বিদ্যাসুন্দরের উজ্জ্বল রস তাঁকে সম্মোহিত করেছে।

তাই তাঁর বিবেচনাবোধে দোলাচলতা। এমন দোদুল্যমানতা আমরা কবিকঙ্কণের

ক্ষেত্রেও দেখেছি। অন্যদিকে মঙ্গালকাব্যের সামগ্রিক ভাবাকাশ নিয়ে রবীন্দ্রনাথের যে অভিমত, সে অনেক বেশি পরিণত— গভীর চিন্তার ফসল। তাঁর সে ভাবনাই পরবর্তীকালের সমস্ত ভাবুকদের যাবতীয় চিন্তার গতিপথ নিয়ন্ত্রণে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা নিয়েছে। 'কালান্তর' গ্রন্থের নানা স্থানে করা তাঁর সূক্তিতুল্য উক্তিগুলো আজও প্রাতিস্বিক চিন্তার চিহ্নবাহী হয়ে মঙ্গালকাব্য সমালোচনার দিকনির্দেশ করছে।

উৎসের সন্ধানে

১। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, রবীন্দ্র-রচনাবলী, ১৪শ খণ্ড, পশ্চিমবঙ্গা সরকার প্রকাশিত, ফেব্রুয়ারি ১৯৯২, পৃ. ৪৮১

২। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, রবীন্দ্র-রচনাবলী, ১১শ খণ্ড, পশ্চিমবঙ্গা সরকার প্রকাশিত, আগস্ট ১৯৮৯, পৃ. ১০৪

৩। পশ্য : বিশ্বনাথ রায় সম্পাদিত 'কবিকঙ্কণ মুকুন্দের চণ্ডীমঙ্গাল : বীক্ষা ও সমীক্ষা', প্রথম প্রকাশ, এপ্রিল ২০১৪, এবং মুশায়েরা, পৃ. ৮২০-২১

৪। ভারতী, ভাদ্র ১২৮৭ বঙ্গাব্দ, পৃ. ২১৯-২৯

৫। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, রবীন্দ্র-রচনাবলী, ১০ম খণ্ড, পশ্চিমবঙ্গা সরকার প্রকাশিত, মার্চ ১৯৮৯, পৃ. ১০২৭

৬। তদেব, পৃ. ৩৬৭

৭। তদেব, পৃ. ৩৬৯

৮। পশ্য : সত্যবতী গিরি ও সনৎকুমার নস্কর সম্পাদিত 'মধ্যযুগের বাঙ্লা সাহিত্য গবেষণা পত্রিকা'র প্রথম বর্ষ দ্বিতীয় সংখ্যার (ভারতচন্দ্র-১), অগস্ট ২০০২-জানুয়ারি ২০০৩, সুধাংশুশেখর মুখোপাধ্যায়ের প্রবন্ধ।

৯। ৫ সংখ্যক তথ্যসূত্র দ্রষ্টব্য, পৃ. ১২

১০। ৩ সংখ্যক তথ্যসূত্র দ্রষ্টব্য, পৃ. ৮২৭-৮৩৬

১১। ৫ সংখ্যক তথ্যসূত্র দ্রষ্টব্য, পৃ. ৩৮০

১২। তদেব, পৃ. ৫৩৪

১৩। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, রবীন্দ্র-রচনাবলী, ১২শ খণ্ড, পশ্চিমবঙ্গা সরকার প্রকাশিত, ডিসেম্বর ১৯৮৯, পৃ. ১৬৯

১৪। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, রবীন্দ্র-রচনাবলী, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পশ্চিমবঙ্গা সরকার প্রকাশিত, মার্চ ১৯৮৫, পৃ. ২৮১

১৫। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, রবীন্দ্র -রচনাবলী, ১৫শ খণ্ড, পশ্চিমবঙ্গা সরকার প্রকাশিত, অগস্ট ১৯৯৪, পৃ. ৮১

১৬। ৫ সংখ্যক তথ্যসূত্র দ্রষ্টব্য, পৃ. ৩৩৯-৪০

১৭। তদেব, পৃ. ৩৬৮

১৮। তদেব, পৃ. ৩৮৮

১৯। শঙ্করীপ্রসাদ বসু, কবি ভারতচন্দ্র, প্রথম প্রকাশ, আশ্বিন ১৩৮১, মণ্ডল বুক হাউস, পৃ.

১২৪
২০। ৫ সংখ্যক তথ্যসূত্র দ্রষ্টব্য, পৃ. ৪০৩
২১। তদেব, পৃ. ১৯৯
২২। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, রবীন্দ্র-রচনাবলী, ১৩শ খণ্ড, পশ্চিমবঙ্গ সরকার প্রকাশিত, নভেম্বর ১৯৯০, পৃ. ৬৩৫
২৩। ৫ সংখ্যক তথ্যসূত্র দ্রষ্টব্য, পৃ. ১৮৯
২৪। ৮ সংখ্যক তথ্যসূত্র দ্রষ্টব্য, পৃ. ৩৬
২৫। রামপ্রসাদ-ভারতচন্দ্র রচনাসমগ্র, প্রথম প্রকাশ, অগস্ট ১৯৮৬, রিফ্লেক্ট পাবলিকেশন, পৃ. ২৫৬
২৬। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, রবীন্দ্র-রচনাবলী, ৫ম খণ্ড, পশ্চিমবঙ্গ সরকার প্রকাশিত, জুলাই ১৯৮৪, পৃ.৭
২৭। ২৫ সংখ্যক তথ্যসূত্র দ্রষ্টব্য, পৃ. ২৮০
২৮। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, রবীন্দ্র-রচনাবলী, ২য় খণ্ড, পশ্চিমবঙ্গ সরকার প্রকাশিত, মে ১৯৮২, পৃ. ৭২৩
২৯। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, রবীন্দ্র-রচনাবলী, ১ম খণ্ড, পশ্চিমবঙ্গ সরকার প্রকাশিত, জুলাই ১৯৮০, পৃ. ৭৯৯
৩০। ২৬ সংখ্যক তথ্যসূত্র দ্রষ্টব্য, পৃ. ৩০
৩১। উদ্ধৃত : প্রশান্তকুমার পাল, রবিজীবনী, ১ম খণ্ড, ১ বৈশাখ ১৩৮৯, ভূর্জপত্র, পৃ. ১৬১

বাংলা মঙ্গালকাব্য : নারীর স্বাধিকার প্রতিষ্ঠার কাহিনি

জয়ন্তী সাহা রায়

'নারীর আপন ভাগ্য জয় করিবার' নানা কাহিনি আধুনিক বাংলা সাহিত্যের একটি জনপ্রিয় বিষয় হয়ে উঠেছে। আধুনিক বাংলা সাহিত্যের বহু রচনাকারের রচনাতেই ভাগ্যের বিরুদ্ধে নারীর জেহাদ ঘোষণার ছবি দেখে আজ আমরা খুশি হই। নারী সমাজের এই স্বাধিকার প্রতিষ্ঠার সূচনা কিন্তু আরও প্রায় ৫০০ বছর আগের বাংলা সাহিত্যেই লক্ষ করা যায়। মধ্যযুগের বিশিষ্ট সাহিত্যধারায় রচিত মঙ্গালকাব্যগুলি, যার বেশিরভাগই নারীকেন্দ্রিক— বিশেষত প্রধান মঙ্গালকাব্যগুলির মধ্যে মনসামঙ্গাল, চণ্ডীমঙ্গাল ও অন্নদামঙ্গাল তিনটিই নারীদেবতার মাহাত্ম্যজ্ঞাপক কাব্য— আর এগুলির মধ্যে আমরা অনায়াসেই খুঁজে পাব নারীর আত্মপ্রতিষ্ঠা তথা স্বাধিকার প্রতিষ্ঠার প্রাণপণ সংগ্রামের কাহিনি। পুরুষতান্ত্রিক সমাজ-ব্যবস্থায় যেখানে নারীকে পদে পদে লাঞ্ছনা বা অবমাননার শিকার হতে হয় সেখানে প্রয়োজনে নারীও যে পুরুষের সঙ্গো লড়াই করে আত্মমর্যাদা প্রতিষ্ঠায় উদ্যোগী হতে পারে তার জ্বলন্ত উদাহরণ এই মঙ্গালকাব্যত্রয়।

পুরুষতান্ত্রিক সমাজে শিব অর্থাৎ পুরুষদেবতাই সমাজে প্রতিষ্ঠিত ও স্বীকৃত—তাই মনসামঙ্গালের চাঁদ সদাগর বা চণ্ডীমঙ্গালের ধনপতি সদাগর উভয়েই পরম শৈব, তাঁরা নিষ্ঠাভরে শিবের পূজা করেন কিন্তু কোনো নারী দেবতাকে (তাঁরা হলেনই বা শিবের স্ত্রী বা কন্যা) পূজা করা তাঁদের মতে অনুচিত।

তাই গর্ব ভরে কেউ বলেন (চাঁদ সদাগর)—

যেই হাতে পূজি আমি দেব শূলপাণি।
সেই হাতে না পূজিব চেঙ্গামুড়ি কানী॥

আবার কেউ বা (ধনপতি) বাণিজ্য যাত্রাকালে পতির মঙ্গালকামনায় আরাধিতা দেবী চণ্ডীর মঙ্গালঘট পায়ে ঠেলে ফেলে স্ত্রীকে অপমান করতে দ্বিধাবোধ করেন না। বলেন— 'স্ত্রীদেবতার পূজা আমি নাহি করি।' এঁদের বিরূপতাকে ছলে-বলে-কৌশলে জয় করে নিজ পূজা আদায় করাই এই দুই দেবী অর্থাৎ মনসা ও চণ্ডীর নামাঙ্কিত মঙ্গালকাব্যদ্বয়ের মূল কথা। শুধু ভক্তের কাছে পূজা পাওয়ার বাসনাই নয়, মর্ত্যে পূজা প্রচারের মধ্য দিয়ে দেবসমাজে আত্মপ্রতিষ্ঠা লাভ করাই হল তাঁদের আসল উদ্দেশ্য। এঁরা উভয়েই শিবের

পরিবারেরেই সদস্য— একজন মনসা হলেন শিবের মানসকন্যা, অযোনি সম্ভবা; অপরজন চণ্ডী হলেন শিবের ঘরণী, যিনি ঘর ছেড়েছেন শিবের প্রতি বিরক্ত হয়ে নিজের পূজা আদায় করতে। অন্নদামঙ্গালের দেবী অন্নদারও একই ব্যাপার।

চণ্ডী বা অন্নদা মূলত পার্বতীরই রূপভেদ। সেই পার্বতী বা গৌরী গিরিরাজনন্দিনী হয়েও নিঃস্ব শিবের ঘরণী হওয়ায় শিবের ঘরজামাই হয়ে থাকার খোঁটা সহ্য করতে না পেরে শিবের সঙ্গো কৈলাসে গেছেন স্বামীর ঘর করতে কিন্তু দৈবদুর্বিপাকে তাঁকে হতে হয়েছে ভিখারির স্ত্রী, কারণ দরিদ্র শিব সংসার চালানোর আর কোনো উপায় খুঁজে না পেয়ে ভিক্ষাকেই সম্বল করেছেন। কিন্তু মুশকিল হল সেই ভিক্ষার কাজেও তাঁর প্রবল আলস্য, একদিন ভিক্ষা করেই তিনি ক্লান্তি বোধ করেন, পরের দিন বিশ্রাম নিতে চান ঘরে বসে স্ত্রীকে লম্বাচওড়া রান্নার ফিরিস্তি দিয়ে। অথচ যেইমাত্র পার্বতী সবিনয়ে জানান—

রন্ধন করিতে ভাল বলিলে গোঁসাই।
প্রথমে যা পাত্রে দিব সেই ঘরে নাই॥
আজিকার মত যদি বান্ধা দেহ শূল।
তবে সে পারিব নাথ আনিতে তণ্ডুল॥

সঙ্গো সঙ্গো ভিখারি শিবের সুপ্ত পৌরুষ দীপ্ত হয়ে ওঠে। ক্ষিপ্ত হয়ে বলেন—এরকম সংসারে তিনি থাকতে চান না। গৃহিনীই যখন সুগৃহিনী নন, সেই সংসারে বাস করে সুখ নেই— তার চেয়ে বনবাস শ্রেয়।

আমি ছাড়ি ঘর যাব দেশান্তর
কি মোর ঘর করণে।
হয়ে স্বতন্তর তুমি কর ঘর
লয়ে গুহ গজাননে॥...
গৃহিনী দুর্জ্জন গৃহ হল বন
বাস করি তরুতলে॥

তখন বাধ্য হয়েই চণ্ডীকে বিবাদে নামতে হয় :

বাপের সাপ পোয়ের ময়ূর সদাই করে কেলি।
গণার মূষা কাটে ঝুলি আমি খাই গালি॥
বাঘ-বলদে সদাই দ্বন্দ্ব নিবারিব কত।
অভাগিনী গৌরীর দারুণ উপহত॥...
উচিত বলিতে আমি সবাকার বৈরী
দুঃখিত জনেরে বাপ বিভা দিল গৌরী॥

এই আক্ষেপোক্তি করে তিনিও সংসার ত্যাগ করবেন ঠিক করলে সখী পদ্মাবতী তাঁকে পরামর্শ দেন পিত্রালয়ে ফিরে গেলে আবার নতুন অশান্তি হবে তার চেয়ে মর্ত্যে 'মঙ্গালচণ্ডী' রূপে নিজের পূজা প্রচার করে নিজের পায়ে দাঁড়ানোই শ্রেয়। সে অনুরোধ মেনে নিয়ে চণ্ডীও এবার পূজাপ্রচারের কাজে নামেন। শিবকে দেখিয়ে দিতে চান যে বিনা

কারণে শুধু শুধু গঞ্জনা বা লাঞ্ছনা সহ্য করার পাত্রী তিনি নন, সমাজে তাঁরও স্বতন্ত্র ভূমিকা আছে। তাই এরপর ব্যাধ কালকেতুকে ঘড়া ঘড়া ধন দিয়ে রাজা করেন এবং সেই রাজ্যে তাঁর মন্দির নির্মাণ করে সাড়ম্বরে পূজা প্রচার করতে বলেন—

চণ্ডিকা বলেন শুন ব্যাধের নন্দন।
নগরের মাঝে দেহ আমার ভবন॥

আবার কলিঙ্গরাজকেও তাঁর বরপুত্র কালকেতুকে হেনস্থা করার অপরাধে ভয়ঙ্কর স্বপ্নপ্রদান করে সন্ত্রস্ত করে তুলে নিজ মহিমা প্রচার করেন।

অন্যদিকে ধনপতি সদাগর অহমিকাবশে বাণিজ্য যাত্রাকালে তাঁর পূজার ঘট পায়ে ঠেলে তাঁকে অপমান করলে তার শোধ নিতেও ভোলেন না—

ভূমিতে দেবীর ঝারি গড়াগড়ি যায়।
নিকট হইয়া সাধু ঠেলে বাম পায়।

সিংহলরাজকে 'কমলে-কামিনী' দর্শন করাতে না পারার ফলে ধনপতিকে সিংহলের কারাগারে বন্দি থাকতে হয় বহুকাল। শেষ পর্যন্ত অবশ্য পুত্র শ্রীমন্ত সেই 'কমলে-কামিনী' সিংহলরাজকে দর্শন করাতে পারলে দীর্ঘকাল পরে তার কারামুক্তি ঘটে। সে প্রসঙ্গে চণ্ডী নিজমুখেই খুল্লনাকে বলেছেন—

দৈবদোষে ধনপতি মোর ঘটে মারে লাথি
তোমা দেখি কৈনু পরিত্রাণে।...
না দেখি কমলবন নৃপতি ক্রোধিত মম
বন্দী করি রাখিল তাহায়॥
দ্বাদশ বৎসর বন্দী করাইনু নিরানন্দী
করিলাম বাদের সুসার।

এবং এইভাবে নিজপূজা মর্ত্যধামে প্রচার করে শেষকালে শিবের কাছে সগর্বে ঘোষণা করেছেন—"এবে আমি ভুবন পূজিতা॥" ভারতচন্দ্রের অন্নদামঙ্গলেও অন্নদার পূজা প্রচারের মূলেও রয়েছে সেই স্বামীর সঙ্গে বচসা ও অহেতুক অপমানিতা হবার জ্বালা। নিঃস্ব ভিখারি শিব ক্ষুধার জ্বালায় অন্ন না পেয়ে যখন আক্ষেপ করেন—

গৃহিনী ভাগ্যের মত পাইয়াছি চণ্ডী।।
সর্বদা কন্দল বাজে কথায় কথায়।
রসকথা কহিতে বিরস হয়ে যায়॥
কিবা শুভক্ষণে হৈল অলক্ষণা ঘর।
খাইতে না পানু কভু পুরিয়া উদর॥

তখন গৌরীও শোনাতে ছাড়েন না—"হায় হায় কি কহিব বিধাতা পাষণ্ডী।/চণ্ডের কপালে পড়ে নাম হৈল চণ্ডী॥.../কহিবারে পারি কিন্তু উপযুক্ত নয়॥/অলক্ষণা সুলক্ষণা যে হই সে হই।/মোর আসিবার পূর্ব্বকালি ধন কই।।/তখনো যে ধন ছিল এখনো সে ধন।/তবে

মোরে অলক্ষণা কন কি কারণ॥.../করেতে হইল কড়া সিদ্ধি বেটে বেটে।/তৈল বিনা চুলে জটা অঙ্গ গেল ফেটে॥/শাঁখা শাড়ী সিন্দুর চন্দন পান গুয়া।/নাহি দেখি আয়তি কেবল আচাভুয়া।।" এ কথার সদুত্তর দিতে না পেরে শিব যখন অগত্যা 'আরোহিয়া বৃষবর/ চলিলেন ভিক্ষার লাগিয়া' তখন গৌরীও পুত্রদের সঙ্গে নিয়ে পিত্রালয়ে যেতে উদ্যোগী হলে সখী জয়ার পরামর্শে সে সঙ্কল্প ত্যাগ করে অন্নপূর্ণা হয়ে কৈলাসশিখর পূর্ণ করার ব্যবস্থা করলেন, যার ফলে—

'ফিরি ঘরেঘর হইয়া ফাঁফর
কোথাও অন্ন না পেয়ে'

শিবকে শেষপর্যন্ত ভিখারিবেশে অন্নপূর্ণার দ্বারে এসে দাঁড়তে হল—

দেখি অন্নদার সাজ শিবের হইল লাজ
তত্ত্ব কিছু না পান ভাবিয়া॥

এবং অন্নদার দেওয়া চর্বচোষ্য ভোজ্যপেয় গ্রহণ করে পরম তৃপ্ত হয়ে শেষকালে অন্নদার কাছে হার মানতে বাধ্য হলেন। আর অন্নপূর্ণা কাশীধামে নিজের মন্দির নির্মাণ করে সকলের অন্নের সংস্থান করতে লাগলেন। এমনকি শিব স্বয়ং সেই অন্নপূর্ণা রূপের পূজা করেছেন দেবলোকে—

আনন্দে ত্রিনয়ন সহিত দেবগণ
পূজেন নানা আয়োজন।...
বিরিঞ্চি পুরোহিত বিধান সুবিদিত
পূজক আপনি মহেশ।
আপনি চক্রপানি যোগান দ্রব্য আনি
নৈবেদ্য অশেষ বিশেষ।।

এরপর মর্ত্যধামেও অন্নপূর্ণা পূজার প্রচলন হয়েছে হরিহোড় ও ভবানন্দ মজুন্দারের মাধ্যমে।

মনসামঙ্গালে মনসার আত্মপ্রতিষ্ঠার লড়াই আরও তীব্র ও জোরদার। জনমদুখিনী মনসা জন্ম থেকেই অভাগিনী—

জনমদুখিনী আমি দুঃখে গেল কাল।
যেই ডাল ধরি আমি ভাঙ্গে সেই ডাল॥

শিবের মনসাকন্যা সে, তাই অযোনিসম্ভবা, তাঁর জন্মের পিছনে সামাজিক স্বীকৃতি নেই, সেই কারণেই শিবও তাকে প্রথমে বাড়িতে নিয়ে যাননি, ফলে বনে বনেই তার বাল্যকাল কেটেছে। তাই তার আক্ষেপোক্তি—

দেবকন্যা হইয়া স্বর্গে না হইল স্থল।...
বিধাতা করিল মোরে জনমদুখিনী।

তরুণী মনসাকে শিব গৃহে গিয়ে এলেও বিমাতা চণ্ডী কোনো মতেই তাকে সহ্য করতে পারেননি—তাকে চরম প্রহার করেন—

চণ্ডীর প্রহারে দেবীর শরীর জর্জর।
সহিতে না পারে পদ্মা বলে খরতর॥

চণ্ডীর সঙ্গে তার এই কলহ ও দ্বন্দ্বের পরিণামে শেষপর্যন্ত তার একটি চোখ হারাতে হয়, হতে হয় 'চেঙ্গামুড়ি কানী'। আবার অসামান্যা রূপবতী হয়েও এই হতভাগিনী পায়নি স্বামীর প্রেম বা ভালোবাসা। জরুৎকারু মুনির সঙ্গে বিবাহ হলেও অতি তুচ্ছ কারণেই মুনি বিবাহের পরের দিনই তাকে পরিত্যাগ করে চলে যান, তাই তার মুখে শুনি—

স্বামী ছাড়ে নিজ নারী
সকলি মোর কপাল নির্বন্ধ॥

এই কারণেই শুরু হয় স্বামীপরিত্যক্তা, সমাজলাঞ্ছিতা অভাগিনী মনসার সমাজে আত্মপ্রতিষ্ঠার জন্য প্রাণপণ সংগ্রাম। স্বামীসঙ্গ-বঞ্চিতা হলেও স্বামীর বরে পুত্রসন্তানের জননী (যদিও তারা অষ্টনাগ) হবার সৌভাগ্য মনসার হয়েছে বটে কিন্তু সেই পুত্রকে সমাজ পুরোপুরি স্বীকৃতি দিয়েছে কিনা বলা মুশকিল—

শুনিয়া মনুষ্য হাসে পদ্মার কত কাজ।
যেই দেখে মুখ ঢাকে সেই বাসে লাজ।

সেই অপমানের যোগ্য প্রত্যুত্তর দিতেই মনসাকে সমাজের স্বীকৃতি আদায় করতে হয়েছে, আর তা করতে গিয়ে কখনো কখনো কারও কারও প্রতি বিষোদ্গারও করতে হয়েছে। এছাড়া দ্বিতীয় পথ ছিল না সেই অসহায়া ভাগ্যলাঞ্ছিতা রমণীর। কারণ বিমাতা চণ্ডীর অনুরোধে শিবও অসহায়া কন্যার ভার নিতে চাননি, তাকে শেষপর্যন্ত নির্বাসনে পাঠান সিজুয়া পর্বতে—'বনবাস দিলা মোরে সৎমায়ের বোলে।'

তাই নিজেই সার্থকতার পথ চিনে বা খুঁজে নিতে বাধ্য হয়েছে মনসা মর্ত্যলোকে তার পূজা আদায়ের মাধ্যমে। চাঁদসদাগর সমাজের গণ্যমান্য ব্যক্তি— তার কাছে পূজা আদায় করতে পারলে সমগ্র মানব সমাজেই তার পূজা প্রচারিত হবে— চাঁদের কাছে পূজা আদায় করতে মনসা তাই মরিয়া। কিন্তু চাঁদ তো শৈব—তাঁর প্রতিজ্ঞা, তিনি শিব ছাড়া আর কারও পূজা করবেন না। অগত্যা মনসা একে একে চাঁদের ছয় ছেলেকে কেড়ে নিয়েছে, বন্ধু-ধন্বন্তরীকেও, হেতালের লাঠিও সরিয়ে দিয়েছে ছলনা করে, কারণ চাঁদ সাপ দেখলেই সেই লাঠি দিয়ে মারতে আসেন—

পূজার মণ্ডপে আইল সর্প সর্প বলে।
মারিল নির্ঘাৎ বাড়ি পদ্মার কাঁকালে॥

শুধু নিজে মেরেই ক্ষান্ত হন না, সকলকেই আদেশ দেন সাপ দেখলেই মেরে ফেলবার। এ হেন অপমান মনসাই বা কতদিন সহ্য করতে পারে। তাই চাঁদকে নানা ভাবে নাকাল ও বিপর্যস্ত করেছে সে, তার কাছে একটু পূজা পাবার আশায়, আর তা না পেলে হিংস্র ও ক্ষিপ্ত হয়ে উঠেছে মনসা। আরও বহু ঘটনাক্রমের পর অবশ্য বেহুলাকে দিয়ে চাঁদের কাছ থেকে পূজা আদায় করে তবেই সে ক্ষান্ত হয়েছে এবং চাঁদের সমস্ত ক্ষয়ক্ষতিই সে

পূরণ করে দিয়েছে তার হৃত ধনসম্পদ ও সাতপুত্রের জীবন ফিরিয়ে দিয়ে।

মনসামঙ্গালের আর এক অভাগিনী নারী হল বেহুলা, যাকে বিয়ের রাতেই বিনা দোষে পতিঘাতিনীর অপবাদ পেতে হয়েছে—

খণ্ডকপালিনী বেহুলা চিরলদাঁতি।
বিভাদিনে পতি মৈল না পোহায় রাতি।।

সেই অপবাদ ঘোচাবার জন্য প্রাণপণ লড়াই করে সকলের মন তাকে জয় করতে হয়েছে। এমনকি নাচে-গানে দেবলোককে তুস্ট করে মৃত স্বামীর জীবন ফিরিয়ে এনে তাকে প্রমাণ করতে হয়েছে যে সে সতী নারী।

বিপুলার নৃত্যে মোহিত দেবগণ।
শঙ্করে করিলা সত্য শুনে সর্বজন।।

তার জীবনের এই ভাগ্য বিপর্যয়ের জন্য দায়ী যে শ্বশুর, যিনি বলেছেন—

লখাই মৈল, ভাল হৈল।
নির্ভয় হৈনু মনে চেঙ্গামুড়ি কানিসনে
এত দিনে বিবাদ ঘুচিল।।

সেই শ্বশুরকেই মনসাপুজোয় রাজি করাতে হবে এহেন কঠোর শর্তে স্বামীর জীবন ফিরিয়ে আনতে হয় তাকে শ্বশুরের দয়া বা করুণার ওপর নির্ভর করে। মনসা তাকে বলে—

সত্য কর সুন্দরী গো দেবের গোচর।
মোরে না পূজিবে তোমার শ্বশুর সদাগর।।

এর উত্তরে বেহুলাকে বাধ্য হয়েই প্রতিজ্ঞা করতে হয়—

সত্য কৈনু সুন্দরী গো তোমার গোচর।
অবশ্য পূজিবে তোমায় শ্বশুর সদাগর।।

এবং শেষপর্যন্ত অনেক লড়াই করে, অনেক অশ্রু বিসর্জন দিয়ে নির্মম শ্বশুরকে রাজি করিয়েছে মনসার পুজোয়, মনসার কাছে তার শর্তরক্ষা করতে পেরেছে সে, কিন্তু এর জন্য যে কতখানি কঠোর সংগ্রাম তাকে করতে হয়েছে তার হিসাব মেলে মনসামঙ্গালের ছত্রে ছত্রে। তাই মধ্যযুগের এই মঙ্গালকাব্যত্রয়কে আসলে ভাগ্যবিপর্যস্তা নারীর সংগ্রামের মাধ্যমে আত্মপ্রতিষ্ঠার জেহাদ বললে বোধ করি ভুল হবার সম্ভাবনা নেই— একথা আশা করি সুধীজন মাত্রেই স্বীকার করতে কুণ্ঠিত হবেন না। তাই এই মঙ্গালকাব্যত্রয়ের কবিদের উদ্দেশে জানাই আজকের নারীসমাজের প্রণতি।

মঙ্গালকাব্যের যুগশৈলী

অভিজিৎ মজুমদার

১.০ প্রস্তাবনা : শৈলী এবং শৈলীবিজ্ঞান (Style and stylistics) :

বিশ শতক এবং এই সময়ের সাহিত্য সমালোচনায় শৈলীবিজ্ঞান এক অভিনব দিগ্‌দর্শন। ভাষার বিজ্ঞানমুখী অনুশীলন থেকে ভাষাবিজ্ঞানের উদ্ভব, আর সাহিত্যের বস্তুমুখী ও বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ থেকে শৈলীবিজ্ঞানের সূত্রপাত। আসলে সাহিত্য যে মূলত ভাষাশিল্প (language craft), এই কথাটা একালে নতুনভাবে উচ্চারিত হবার সঙ্গো সঙ্গো ভাষাকেন্দ্রিক সাহিত্য সমালোচনার অগ্রগতিও সমান তালে শুরু হয়ে গিয়েছে। কবিতা বা গদ্যের ভাষা-বিশ্লেষণ এবং কৃতি বিচার (text analysis) তাই আজকের ভাষা-গবেষকদের অন্যতম দায়িত্ব।

বস্তুত, সাহিত্য সমালোচনা আর ভাষাবিজ্ঞানের দুটি স্বতন্ত্র ক্ষেত্রের মধ্যে এক সেতুবন্ধ রচনা করেছে শৈলীবিজ্ঞান। সাহিত্য সমালোচক রচনার বিষয়, আর শৈলীবিজ্ঞানী রচনার ভাষা এবং তার বুনোট (texture) থেকে লেখক, তাঁর রচনা, সমকাল এবং সমাজকে আবিষ্কার করতে চান। সমালোচনাকে যুক্তিনিষ্ঠ, গাণিতিক, প্রণালী-নির্ভর এবং প্রমাণযোগ্য করে তোলার মাধ্যমেই শৈলীবিজ্ঞানের আত্মপ্রকাশ। বলাবাহুল্য, শৈলীবিজ্ঞান অন্যান্য সাহিত্য সমালোচনার পদ্ধতির বিকল্প নয়, প্রতিস্পর্ধী তো নয়ই, বরং পরিপূরক। প্রথাগত সাহিত্য সমালোচনা খানিকটা ব্যক্তিনির্ভর, সমালোচকের নিজস্ব আবেগ ও অনুভূতির দ্বারা পরিচালিত। অন্যদিকে শৈলীবিজ্ঞানী রচনার অবয়ব-নির্ভর, ব্যক্তি-নিরপেক্ষ বিশ্লেষণকেই প্রাধান্য দেন। সমালোচনার এই দুই মেরুর সম্পর্ক প্রতিষ্ঠিত করতে গিয়ে বিশিষ্ট ভাষাবিজ্ঞানী মন্তব্য করেন— '...Stylistics takes the language as primary and artistic values as incidental to linguisic description; literary criticism, on the other hand, takes artistic values as primary and refers to language insofar as it serves as evidence for aesthetic assessments' (1992 : 143)[১]।

শৈলীর সহজ সংজ্ঞা পাওয়া দুষ্কর। আধুনিক ভাষাবিজ্ঞানী ক্রিস্টাল ও ডেভি তাই মন্তব্য করেন— 'Style is certainly a familiar word to most of us; but unfortunately to say... style does not clarify matters greatly, because of the multiplicity of definitions that the word style has' (1969 : 9)[২]। কোনো তাত্ত্বিক জটিলতায়

না গিয়ে শৈলীর সহজ সংজ্ঞা দিতে চেয়েছেন পবিত্র সরকার (১৯৮১ : ৬১)[৩]। তাঁর মতে, শৈলী হল লেখকের দ্বারা সচেতনভাবে অথবা তাঁর অজ্ঞাতসারে নিয়োজিত ভাষাগত উপায় (means), যার সাহায্যে লেখক ও পাঠকের অভিপ্রেত যোগাযোগ সম্ভব হয়।

অপরপক্ষে শৈলীবিজ্ঞান হল লেখকের রচনাশৈলী বিশ্লেষণের এক অন্যতম বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি। ভাষা ও সাহিত্যের মধ্যে সম্পর্ক গড়ে তোলে শৈলীবিজ্ঞান। সিম্পসন (১৯৯৭) তাঁর 'Language through Literature' গ্রন্থে শৈলীবিজ্ঞানের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে তাই বলেন—

'The branch of language study which is principally concerned with this integration of language and literature' (p. 2)[৪]। সমালোচকের ব্যক্তিগত অনুভূতির মূল্যায়ন নয়, রচনার তন্ময় এবং বস্তুনিষ্ঠ বিশ্লেষণই হল শৈলীবিজ্ঞানীর লক্ষ্য। আব্রামসের উক্তিতেও এ বক্তব্যের সমর্থন মেলে— '...a method of analysing works of literature which proposes to replace the subjectivity and 'impressionism'of standard criticism with an 'objective' or 'scientific' analysis of the style of literary texts' (1981 : 192)[৫]। সাহিত্যের কৃতি বিশ্লেষণ করে তার শৈলীগত চিহ্নগুলিকে (Stylistic markers) পাঠকের কাছে নির্দিষ্ট করে দেয় শৈলীবিজ্ঞান। পাশাপাশি শৈলীবিষয়ক অনুসন্ধানে লেখকের অনুভব আর উদ্দেশ্যের জগৎকে তাঁর শৈলীগত পদ্ধতির (means) সঙ্গে সম্পর্কিত করার প্রয়াসও নিহিত থাকে (দে, ১৯৯২ : ১৬)।[৬] কোন্ কোন্ প্রেরণায় ভাষার বিভিন্ন স্তরে শৈলীর প্রকাশরূপ গড়ে ওঠে, কীভাবেই বা গড়ে ওঠে, প্রথাগত ভাষাপ্রয়োগ থেকে শৈলীগত বৈচিত্র্য কী করে স্বতন্ত্র ও ব্যতিক্রমী হয়ে ওঠে এবং এই প্রসঙ্গে শৈলীর নিয়ন্ত্রকগুলির আবিষ্কার, শৈলীগত বৈশিষ্ট্যের পরিমিতি ও পরিসংখ্যান ইত্যাদি যাবতীয় বিষয় নিয়েই শৈলীবিজ্ঞানের সমীক্ষাকর্ম (শ, ১৯৯৬ : ৪৯)।[৭]

যাঁরা শৈলীবিজ্ঞানের আলোচনাকে আরো বিশদাকারে দেখতে চান, তাঁরা বলেন ব্যক্তিশৈলীর (personal style) পাশাপাশি যুগশৈলী (period Style) চিহ্নিত হওয়াটাও সমান জরুরি। এঁদের মতে শৈলীবিজ্ঞানের আলোচনায় বিশেষ একজন লেখকের বিভিন্ন রচনা বা একই রচনার বিভিন্ন অংশ, একটি বিশেষ যুগের বিভিন্ন রচনা অথবা একই সংরূপের (genre) রচনাসমূহ কিংবা কোনো রচনার সমসাময়িক বা পূর্ববর্তী কোনো সাহিত্যকৃতি মুখ্য হয়ে উঠতে পারে। প্রাগ্‌গোষ্ঠীর এজাতীয় শৈলীভাবনার পরিচয় দিতে গিয়ে ভার্মা ও কৃষ্ণস্বামী জানান— 'In literature, as in language all linguistic elements inter-determinate each other and each component gets its meaning only in relation to (a) all other components of the same work; (b) all other writings of the same author; (c) all the writings of the same period; (d) all the writings of the same genre; (e) all the writings that have preceded it and/or are simultaneous with it, by contrast/tension or harmony' (1992 : 137)[৮]।

১.১ মঙ্গালকাব্য : যুগশৈলী ও প্রেক্ষাপট

মধ্যযুগের বাংলা কাব্যের পটভূমি বিস্তৃত। এই যুগ পরিসীমায় রচিত সাহিত্যকর্মে সাধারণভাবে যে ভাষাশৈলী গড়ে উঠেছিল, তাকে বলতে পারি যুগশৈলী (Period Style)। আলোচনার বিষয় মঙ্গালকাব্য। সেকারণে শুধুমাত্র মঙ্গালকাব্যের পরিপ্রেক্ষিতে যুগশৈলী নির্ধারণের প্রাথমিক কাজটুকু করা যেতে পারে। বলাই বাহুল্য, মঙ্গালকাব্য ধারার যুগশৈলী গড়ে উঠেছে প্রধানত দুটি মাত্রার ওপর নির্ভর করে।

প্রথমত, মঙ্গালকাব্যের রচয়িতারা বিভিন্ন সময়ে আবির্ভূত হ'লেও একই যুগের পটভূমিতে তাঁরা অবতীর্ণ হয়েছেন। ফলে তাঁদের রচনায় দেখা গেছে এক সাধারণ ছাঁদ এবং ভাষারীতি।

দ্বিতীয়ত, মঙ্গালধারার একই দেব-দেবীকেন্দ্রিক কাহিনি অবলম্বন করার ফলে কাহিনির বিন্যাস এবং আখ্যানগত বিস্তারে দেখা গেছে সাধারণ ঐক্য। তাছাড়া কাব্য রচয়িতারা সুনির্দিষ্ট পৌরাণিক আদর্শেরও অনুসরণ করেছিলেন। বস্তুত, যুগের প্রেক্ষাপট এবং সংরূপগত (genre) সামঞ্জস্যই মঙ্গালকাব্যের সুনির্দিষ্ট যুগশৈলী নির্ধারণ করে দেয়।

মধ্যযুগের মঙ্গালকাব্য সম্পর্কে আলোচনা প্রসঙ্গে এক বিদগ্ধ সমালোচক যথার্থই মন্তব্য করেন— 'পৃথিবীর প্রায় প্রতিটি দেশের সাহিত্যের আদিযুগের ধমনীতে স্পন্দিত হয়েছে সে দেশের প্রাচীন ধর্মচেতনা।' (নস্কর, ১৯৯৯ : ৩৬৫)।[৯] বাংলা সাহিত্যের সূত্রপাত এমনই এক ধর্মীয় পরিমণ্ডলে। চর্যাপদ, পদাবলী বা মঙ্গালকাব্যের কবিদের বিশুদ্ধ ধর্মনিরপেক্ষ সাহিত্যরস সৃজনের উদ্দেশ্য ছিল না, বরং সাহিত্যের মাধ্যমে তাঁরা এক বিশেষ ধর্মনৈতিক ধারাকেই পুষ্ট করে তুলতে চেয়েছিলেন। মধ্যযুগের কাব্যবলয় অনুসরণ করতে গিয়ে দেখা যায়, বারবার উদ্দেশ্যমূলক চর্চার মধ্য দিয়ে প্রতিটি পৃথক সাহিত্যশ্রেণিতে গড়ে উঠেছে একই ধরনের নির্দিষ্ট কতকগুলো বৈশিষ্ট্য। এ বৈশিষ্ট্যগুলিকে মধ্যযুগের কাব্যকারেরা অবশ্যপালনীয় শর্ত বলে মনে করেছেন। ফলে খুব সঙ্গত কারণেই মধ্যযুগের সাহিত্যে ঘটনা বা আখ্যান বিন্যাসে দেখা গেছে সামঞ্জস্য বা ঐক্য। মঙ্গালকাব্য ধারাও এর ব্যতিক্রম নয়।

তাছাড়াও মনে রাখতে হবে, মঙ্গালকাব্যগুলি গড়ে উঠেছিল এক বিশেষ সমাজ-সাংস্কৃতিক পটভূমিতে। বস্তুত, একটি বিশেষ সমাজ-সাংস্কৃতিক এবং রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে কোনো যুগের সমগ্র রচনার সাধারণ ভাষাশৈলী গড়ে ওঠে। ত্রয়োদশ থেকে অষ্টাদশ শতক পর্যন্ত মধ্যযুগের কালসীমা। এই দীর্ঘবিস্তৃত সময়ের যুগভাবনা মূলত দুটি ঐতিহাসিক ঘটনাকে কেন্দ্র করে আবর্তিত—

ক। ত্রয়োদশ শতকে বাংলাদেশে তুর্কি আক্রমণ
খ। চৈতন্যদেবের দিব্য আবির্ভাব (১৪৮৬-১৫৩৩ খ্রিস্টাব্দ)

প্রাক্-চৈতন্যযুগের বাঙালি সমাজে অভিজাত জীবনযাত্রার সঙ্গো তথাকথিত নিম্নশ্রেণির ভাবগত সংঘাত প্রতি পদে মূর্ত হয়ে উঠেছিল। এই দুই বিপরীত মেরুবিন্দুর সাক্ষ্য যথাক্রমে

'গীতগোবিন্দ' ও 'চর্যাপদ'। তাই গীতগোবিন্দের পাঠকসমাজ দরবারি অভিজাত রস ও রুচিতে পরিপুষ্ট। সংস্কৃত অধ্যয়নে কৃতবিদ্য এবং পাশাপাশি পৌরাণিক-ঐতিহ্যে লালিত। অন্যদিকে চর্যাপদে যে সমাজ চিত্রিত, তা ব্রাত্যদের ক্রীড়াভূমি, অন্ত্যজ সমাজের আঙিনা। বলাবাহুল্য, শ্রীকৃষ্ণকীর্তন এই দুই বিপরীত ভাবধারার সঙ্গমস্থল। কারণ এ কাব্যে একদিকে যেমন গীতগোবিন্দ-সুলভ পূর্বানুশীলিত পৌরাণিক অনুধ্যান, অন্যদিকে তেমন লৌকিক সংস্কার ও জীবনবোধের প্রতিফলন।[১০]

তুর্কি আক্রমণের অবশ্যই কিছু ইতিবাচক দিক ছিল। অভাবিত এ আক্রমণের দরুণ ব্রাহ্মণ্য ধর্মের প্রতাপ হ্রাস পেল, অভিজাত এবং অনভিজাত সমাজজীবনের দ্বন্দ্ব ঘুচে সমন্বয়ের ভাব জাগল বাঙালির মনে। রাজশক্তির পৃষ্ঠপোষকতায় লালিত ব্রাহ্মণ্যসমাজ এতদিনে অনুভব করতে পারলেন যে গণশক্তির ওপর নির্ভর করতে পারলেই আত্মরক্ষা সম্ভব। তাই লোকায়ত সংস্কার, বিশ্বাস, এমনকি দেবদেবীদের আর্য আভিজাত্য দানে তাঁরা স্বীকৃত হলেন। অন্যদিকে বাইরের ইসলাম ধর্মের কাছে উৎপীড়িত সামান্য হিন্দুরা (বর্ণহিন্দুরা) আশ্রয় প্রার্থনা করছিল ব্রাহ্মণ্য সমাজ ও সংস্কৃতির কাছে। ফলে খুব স্বাভাবিক কারণেই সমন্বয়-সাধনের এই সুনির্দিষ্ট চেতনা সাময়িকভাবে অস্তিত্ব রক্ষারই প্রয়াস হয়ে দাঁড়িয়েছিল। বস্তুত, লোকায়ত ও ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতির মিলনের জন্যই গ্রামীণ দেবী মনসা পৌরাণিক দেবতা শিবের কন্যা হয়ে উঠেছেন। মনসার সহচরী হয়েছে নিম্নবর্গের নেতা ধোপানী; চণ্ডীমঙ্গালের অনার্য ব্যাধের দেবী চণ্ডী উমা-পাবর্তীর সঙ্গো একাকার হয়ে গেছে। সমন্বয়ের সব থেকে বড়ো প্রমাণ ভাষা —কবিদের রচনায় তাই সংস্কৃত ও লৌকিক ভাষার সহাবস্থান। বলাবাহুল্য, বড়ু চণ্ডীদাসের শ্রীকৃষ্ণকীর্তনেই এর সূত্রপাত।

চৈতন্যদেবের আবির্ভাব বাঙালির এই সামাজিক সমন্বয়কে আরো তরান্বিত করেছিল। তাঁর আবির্ভাবে বাঙালি তথাকথিত ধর্মীয় সংকীর্ণতা থেকে হয়েছিল মুক্ত। দ্বিতীয়ত, অনভিজাত গণচেতনা তাঁর সংস্পর্শে উচ্চতর জীবনমহিমায় প্রতিষ্ঠা পেয়েছিল। সর্বোপরি তাঁর দিব্য আগমনে মানুষ তাঁর মধ্যে খুঁজে পেয়েছিল পরিপূর্ণ এক মানবীয় আদর্শ। স্পষ্টতই, তাঁর প্রত্যক্ষ প্রভাবে বাংলা সাহিত্যে শুরু হল পৌরাণিক ঐতিহ্যের অনুবৃত্তি ও স্মৃতিচারণ— অনুবাদ সাহিত্যে যার প্রতিফলন। মঙ্গলকাব্যের আদিম প্রতিহিংসাপরায়ণ দেবদেবীরাও চৈতন্য-পরবর্তী যুগের ভক্তিরসের প্লাবনে হয়ে উঠেছেন ক্ষমাসুন্দর, সহিষ্ণু। ভাষার ক্ষেত্রে পৌরাণিক ঐতিহ্যে লালিত কবিকুল সংস্কৃত শব্দাবলী ও বাক্যরীতিকে নিজস্ব করে পেতে চেয়েছেন। তদ্ভব শব্দের সংস্কৃতায়িত পরিমার্জনা এযুগেই সমাদৃত হয়েছে।[১১]

বাস্তবিকই চৈতন্যদেবের আবির্ভাবের ফলে বাংলা সাহিত্য হয়ে উঠেছে এক অখণ্ড যৌথ শিল্প। একদিকে অদৃষ্টবাদ, কর্মফলে বিশ্বাস, সম্ভব ও অসম্ভবের পরিণয় ইত্যাদি ধারণা সম্পর্কে সমাজমনের নিঃসংশয় ঐক্য, অন্যদিকে সমাজ-ধর্মনিষ্ঠা, চিরন্তন আদর্শের প্রতি স্থির সুগভীর বিশ্বাস শিল্পীর রচনায় এক যৌথমনের আবেগ সঞ্চারিত করেছে। এরই ফলশ্রুতি রূপে মঙ্গালসাহিত্যের পরিকল্পনায় গড়ে উঠেছে এক সাধারণ সাহিত্যিক ছাঁদ।

বিষয়গত দিক থেকে অলৌকিকতা, বৈষ্ণবীয় প্রভাব, পৌরাণিক প্রসঙ্গ এবং লোকায়ত

পরিমণ্ডল যেমন মঙ্গলকাব্যের সাধারণ বিন্যাস গড়ে তুলেছে, তেমনই আঙ্গিকের দিক থেকে কাব্যধারায় এর সাধারণ রূপায়ণ পদ্ধতি হয়েছে অনুসৃত। কাহিনিবিন্যাসে চতুরঙ্গ-প্যাটার্ন (বন্দনা, গ্রন্থোৎপত্তির কারণ, দেব ও নরখণ্ড), বারমাস্যা, চৌতিশা, বর্ণনামূলক অংশ— যথা, নায়িকার রন্ধন প্রণালী, কাঁচুলি নির্মাণ ইত্যাদি কাহিনির অপরিহার্য আঙ্গিকগত বৈশিষ্ট্য হয়ে উঠেছে। বলাবাহুল্য, সমাজ-সাংস্কৃতিক সমন্বয়ের ছবি প্রতিফলিত হয়েছে ভাষিক অবয়বেও। ফলে সমগ্র মঙ্গলকাব্যের ভাষা-বিন্যাসেও দেখতে পাওয়া যায় এক সাধারণ যুগশৈলী (common core style of the age)

১.২ উপাত্তের ভিত্তি

ভাষাগত দিক থেকে দেখতে গেলে সমগ্র মঙ্গলকাব্যধারায় ঘটেছে এক বিস্তৃত যুগশৈলীর প্রতিফলন। এ ভাবনাকে প্রতিষ্ঠিত করতে গেলে অবশ্য বিস্তারিত গবেষণার প্রয়োজন। বর্তমান নিবন্ধের স্বল্প পরিসরে মঙ্গলকাব্যের বিপুল সম্ভার থেকে কয়েকটি বিশেষ শ্রেণির রচনাকে কেবল প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে। আলোচনায় অন্তর্ভুক্ত হয়েছে মঙ্গলকাব্যধারার 'মনসামঙ্গল', 'চণ্ডীমঙ্গল', 'ধর্মমঙ্গল' এবং 'অন্নদামঙ্গল' গ্রন্থের বিভিন্ন অংশ। যুগশৈলীর পরিচয় দিতে গিয়ে 'মনসামঙ্গল' ধারার কেতকাদাস ক্ষেমানন্দের সর্বপ্রথম মুদ্রিত কাব্য, কবিকঙ্কণ মুকুন্দের 'চণ্ডীমঙ্গল', 'ধর্মমঙ্গল'-এর কবি ময়ূরভট্ট ও ঘনরাম চক্রবর্তীর আখ্যায়িকা এবং ভারতচন্দ্রের 'অন্নদামঙ্গল' থেকে উপাত্ত গ্রহণ করা হয়েছে। কবিকঙ্কণের রচনা ষোড়শ শতাব্দীর; কেতকাদাসের 'মনসামঙ্গল' কাব্যটি সম্ভবত রচিত হয়েছিল সপ্তদশ শতকের শেষার্ধে। অন্যদিকে অষ্টাদশ শতকের সৃষ্টি ঘনরামের 'ধর্মমঙ্গল' এবং ভারতচন্দ্রের 'অন্নদামঙ্গল' কাব্য। খুব স্বাভাবিকভাবেই ভাষাগত দিক থেকে রচনাগুলি কালানুক্রমিক (diachronic) ধারার একটি স্পষ্ট পরিচয় বহন করে। ময়ূরভট্টের পুথি প্রামাণিক কিনা এ নিয়ে বিস্তর বিতর্ক থাকলেও মঙ্গলকাব্যের কালানুক্রমিক প্রেক্ষাপটে রচনাটির কিছুটা মূল্য থেকেই যায়। বলাবাহুল্য, বিষয়গত ভিন্নতা, কাহিনি বিন্যাসের বৈচিত্র্য, এমনকি কালগত বিভেদ থাকলেও মঙ্গলকাব্যের সামগ্রিক ধারায় যে একটি সাধারণ ভাষাছাঁদ গল্পে উঠেছে, তা অনুধাবনের জন্যই উপরোক্ত গ্রন্থগুলি নির্বাচন করা হয়েছে। তবে মূল আলোচনায় যাবার আগে দু'একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রসঙ্গ উত্থাপন করা জরুরি।

প্রথমত, বর্তমান নিবন্ধে মঙ্গলকাব্যধারার সাধারণ শৈলীবিচার আমাদের লক্ষ্য। কোনো ব্যাকরণগত বিচার অবশ্যই উদ্দেশ্য নয়। তাই শৈলীবিচারের জন্য প্রয়োজনীয় সাংগঠনিক উপকরণই কেবল এ আলোচনায় স্থান পেয়েছে। বস্তুত, শৈলীগত অনুধাবনে ব্যাকরণের সীমাবদ্ধতা অনস্বীকার্য। রিফাতের এ প্রসঙ্গে বলেন 'No grammatical analysis of a poem can give us more than the grammar of the poem' (1966 : 213)[১২]। শৈলীবিজ্ঞানী গর্গেশের মতও এক্ষেত্রে অনুধাবনযোগ্য— 'The relevant poetic structures would comprise only those elements which evoke a reader's response' (1990 : 75)[১৩]। কাজেই কাব্যের ব্যাকরণ নয়, পাঠকের অনুভূতিকে যেসব ভাষিক উপাদান

উদ্দীপ্ত করে তোলে, সেগুলির বিশ্লেষণই আমাদের লক্ষ্য।

দ্বিতীয়ত, শৈলীবিজ্ঞানের আলোচনায় বিশেষ কয়েকটি শৈলীগত লক্ষণ (যেমন, পুনরুক্তি, সমান্তরতা ইত্যাদি) সাধারণত চিহ্নিত করা হয়। এ ধরনের লক্ষণ শুধু যে একজন বিশেষ কবির কাব্যেই সুলভ, তা নয়। মধ্যযুগের যে কোনো মঙ্গলকাব্যেই এরকম প্রয়োগ সুলভ হতে পারে। ভিন্ন ভিন্ন কবি স্বতন্ত্র প্রসঙ্গে (Context) একই শৈলীগত বৈশিষ্ট্যের প্রয়োগ ঘটাতেই পারেন। মনে রাখতে হবে, শৈলীগত প্রকরণের নতুনত্ব হয়তো মধ্যযুগের কবির কাছ থেকে প্রত্যাশিত নয়, কিন্তু সে-প্রকরণগুলির প্রযুক্তিগত অভিনবত্ব, প্রয়োগের প্রসঙ্গ (context) এবং নিজস্বতা কবির ভাষাশৈলীর পরিমাপক।

তৃতীয়ত, কবি যে সবসময় সচেতনভাবেই তাঁর নিজস্ব শৈলীকে গড়ে তোলেন, তা নয়। অনেকসময় তাঁর অজ্ঞাতসারেই গড়ে উঠতে পারে কাব্যের স্বতন্ত্র ভাষাশৈলী। লেখক সচেতনভাবে কী ভাবছেন বা কী ভাবছেন না, তার মূল্যায়ন শৈলী আলোচনার একমাত্র লক্ষ্য নয়। পাঠের (reading) মধ্য দিয়ে রচনার ভাষা সম্পর্কে পাঠকের নিজস্ব বিচারও শৈলী-আলোচনায় সমানভাবে গুরুত্বপূর্ণ। বিশেষত, আজকের পাঠককেন্দ্রিক সমালোচনা-তত্ত্বে (reader-oriented theory) এ জাতীয় ভাবনাই প্রাধান্য পেতে শুরু করেছে।

চতুর্থত, ভাব ও ভাষার মেলবন্ধনে নির্মিত হয় লেখকের শৈলী। শুধু শৈলীগত লক্ষণের আবিষ্কার নয়, শৈলীগত বৈশিষ্ট্য কীভাবে রচনার ভাববস্তুর সঙ্গে সম্পৃক্ত হয়ে যায়, তার অনুসন্ধানও শৈলীবিজ্ঞানীর অন্যতম দায়িত্ব। তবে ভাবের সঙ্গে ভাষার সংলগ্নতা (cohesiveness) প্রতিষ্ঠিত করতে গেলে প্রতিটি রচনার নিবিড় ও তন্নিষ্ঠ বিচার-বিশ্লেষণ প্রয়োজন। বর্তমান রচনার সংক্ষিপ্ত পরিসরে আমরা মূলত কিছু সাধারণ শৈলীগত বৈশিষ্ট্য চিহ্নিত করতে প্রয়াসী হয়েছি, শৈলীগত বৈশিষ্ট্যের মাধ্যমে ভাব ও ভাষার সেতুবন্ধ কীভাবে গড়ে উঠেছে, তার বিস্তৃত পর্যবেক্ষণে উদ্যোগী হইনি।

এবারে কয়েকটি নির্বাচিত শৈলীগত লক্ষণের ভিত্তিতে মঙ্গলকাব্যের যুগশৈলীর স্বরূপ নির্ণয়ের প্রচেষ্টা করা যেতে পারে।

১.৩ মিল ও পুনরুক্তি (alliteration and recurrence)

ভাষিক উপাদানের পুনরুক্তি বা পুনরাবর্তন অনেকসময়ই কাব্য ও কবিতার শৈলীগত উপকরণ হয়ে উঠতে পারে। পুনরুক্তি ঘটতে পারে শব্দের স্তরে, কিংবা পদগুচ্ছ অথবা বাক্যের স্তরেও। কিন্তু যে স্তরেই তা ঘটুক না কেন, একদিক থেকে তা ধ্বনিগত পুনরাবৃত্তিও (acoustic repetition) বটে। ফলে পুনরাবৃত্তি শ্রোতার কাছে এক ধরনের শ্রুতিগত সংবেদনার বাহক হয়ে ওঠে। লীচ একারণেই পুনরুক্তিকে ‘ECHOIC aspect of literary language’ (1984 : 73)[১৪] বলে অভিহিত করতে চেয়েছেন। মনে হতে পারে, পুনরুক্তি হয়তো বা একদিক থেকে বিচার করতে গেলে কবির ভাষাগত দৈন্যের প্রকাশ। কিন্তু অনেকসময় লেখকের ভাবগত উচ্ছ্বাস, রুদ্ধ আবেগের উন্মোচন, অথবা বক্তব্য বিস্তারের প্রয়াস— এ সবই ফলপ্রসূ হতে পারে পুনরাবৃত্তির মাধ্যমে। লীচ তাই বলেন— ‘Although

repetition sometimes indicates poverty of linguistic resource, it can, as we see, have its own kind of eloquence... It may further suggest a suppressed intensity of feeling... an imprisoned feeling' (1984 : 79)[১৫]।

ধ্বনির পুনরাবর্তন গড়ে তোলে মিলের প্যাটার্ন, যা কাব্য এবং কবিতার অন্যতম বৈশিষ্ট্য। মিলের সুমিত ও সংযত প্রয়োগ রচনার সৌন্দর্যকে দেয় বাড়িয়ে, মিলের মধ্য দিয়ে স্বর ও ব্যঞ্জনধ্বনির সুষম বিন্যাস (assonance-consonance) এবং পরস্পর-সংলগ্নতা সৃষ্টি করে ধ্বনির সংগীত। বঙ্কিমচন্দ্র ঈশ্বরগুপ্তের অনুপ্রাস প্রয়োগ সম্পর্কে বলতে গিয়ে যথার্থই মন্তব্য করেছিলেন— 'অনুপ্রাস যমকের বাহুল্য বড় কষ্টকর। রাখিয়া ঢাকিয়া পরিমিতভাবে ব্যবহার করিতে পারিলে বড় মিঠে, বাঙ্গালাতেও তাই।' অবশ্য বলাইবাহুল্য, মিল বলতে যে কেবল চরণান্ত মিল বোঝায়, তা নয়। মিল ঘটতে পারে চরণের বিভিন্ন ধ্বনি বা দলের মধ্যেও।

মঙ্গালকাব্যের কবিরা অবশ্য খুব সচেতনভাবেই মিলের প্রয়োগ ঘটান। তবে প্রয়োগের মাত্রাভেদও রয়েছে। 'অন্নদামঙ্গাল' বা ঘনরাম চক্রবর্তীর 'ধর্মমঙ্গাল' কাব্যে মিলের যে বৈচিত্র্য পাওয়া যায়, কেতকাদাসের 'মনসামঙ্গাল'-এ তা ততটা স্পষ্ট নয়। আবার মিলের অতিরেক রামেশ্বর চক্রবর্তীর 'শিবায়ন' কাব্যের অনেক জায়গাতেই হানিকর মুদ্রাদোষে পরিণত হয়েছে (বন্দ্যোপাধ্যায়, তৃতীয় খণ্ড/২য় পর্ব : পৃ. ৮৯)।[১৬]

ধ্বনিমিলের প্রয়োগ মঙ্গালকাব্য ধারার প্রায় প্রতিটি রচনাতেই। উদাহরণস্বরূপ—

১. ক। কুটিল কুন্তল পাশ খোঁপায় বকুল/তাহে বসি মকরন্দ পিএ অলিকুল (কেতকাদাস, পৃ. ২৩৯)
   খ। ভয় নাই ভায়া চল ভাবি মায়াধরে/রাজা বলে ধর্ম্মপদপঙ্কজপিঞ্জরে (ঘনরাম, পৃ. ২৫৫)
   গ। কমল-পরিমল/লয়ে শীতল জল/পবনে ঢল ঢল উছলে কুলে (ভারতচন্দ্র, পৃ. ২৮৭)
   ঘ। হুলাহুলি দেয় যত অমররমণী (মুকুন্দ, পৃ. ৬০)

(ক) দৃষ্টান্তে ধ্বনির অবস্থানগত বৈচিত্র্যে তৈরি করে দেয় মিলের অভিনবত্ব। অন্ত্যদলে 'ল' যখন একই ধরনের মিলের প্রত্যাশিত বিন্যাস তৈরি করে, তখন 'ক' ও 'প' ধ্বনির মিলের ক্ষেত্রে আদি ও মধ্য অবস্থানে মিলের বৈচিত্র্য ঘটে। ফলে মিলের মাধ্যমে সৃষ্টি হয়ে যায় প্রত্যাশা এবং অপ্রত্যাশার এক দ্বন্দ্ব। (খ) দৃষ্টান্তে ধ্বনিমিলের সাহায্যে সমাসবদ্ধ ভিন্ন শব্দজোটের মধ্যে এক অদৃশ্য ভাবের বন্ধন গড়ে ওঠে (তু. 'ধর্ম্মপদপঙ্কজপিঞ্জরে'), যার ফলে পাঠকের মন শব্দগুলোর পারস্পরিক সম্পর্ক আবিষ্কারে সচেষ্ট হয়ে ওঠে। শৈলীবিজ্ঞানের পরিভাষায় একে বলা হয় 'chiming'। লীচ এ কৌশলকে বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন— 'the device of... connecting 'two words by similarity of sound so that you are made to think of their possible connections' (1984 : 95)[১৭]। (গ) দৃষ্টান্ত ধ্বনিকেন্দ্রিকতার (Phono-centricity) সার্থক নিদর্শন। ধ্বনির পুনরাবর্তন

এক্ষেত্রে হয়ে উঠছে বিশেষ মনস্তাত্ত্বিক অভিজ্ঞতার দ্যোতক। 'ল' এর পুনরুক্তি একাধারে কোমলতা ও গতির সঞ্চার ঘটায় পাঠকের মনে। (ঘ) বিম্ব অনুপ্রাসের (mirror image alliteration) নমুনা, একই ধ্বনিসংগঠন 'অমররমণী' এখানে বিপরীত ক্রমে প্রযুক্ত হয়।

চরণের অন্ত্যমিলে চমক ঘটাতেও রয়েছে কবিদের স্বভাব-দক্ষতা। চরণের সমাপ্তিতে ধ্বনিপুঞ্জের পুনরাবর্তন পাঠকের মনে জাগিয়ে তোলে প্রত্যাশা। সে প্রত্যাশা হল ওই ধ্বনিপুঞ্জেরই প্রত্যাবর্তন। কিন্তু অনিবার্যতার মাধ্যমে প্রত্যাবর্তন হাজির হলে মিলের চমৎকারিত্ব যায় হারিয়ে। অপ্রত্যাশিত শব্দকে আশ্রয় করে মিলের নক্‌শা গড়ে উঠলেই শৈলীগত দিক থেকে তা সার্থক হয়ে ওঠে। মঙ্গলকাব্যেও এর নমুনা রয়েছে। যথা—

২. ক। ভিক্ষা মাগি খুদ কণা যা পান ঠাকুর/তাহার ইন্দুরে করে কাটুরকুটুর (ভারতচন্দ্র, পৃ. ২৭৫)

খ। অধিক অবুঝ/পিঠ ভরা কুঁজ/শুতে গেলে করে উঃ
ঘাড়ে কুঁজ জুড়ে/ভূমে যায় গড়ে/মিনসে রাজ্যের কু। (ঘনরাম, পৃ. ২৫৯)

অথচ পাশাপাশি 'চণ্ডীমঙ্গাল' কাব্যকে তুলনায় টানলে দেখা যায়, মিল সেখানে অনেকসময়ই কাব্যের প্রথামাত্র, অপ্রত্যাশিত পথে চমৎকারিত্ব সৃষ্টির চেষ্টা কবি বিশেষ একটা করেননি। উদাহরণস্বরূপ—

৩. ক। মূর্খবিপ্র বৈসে পুরে/ নগর্যা যাজন করে (পৃ. ২০০)

খ। বারুই নিবসে পুরে/বরজ নির্মাণ করে (পৃ. ২০৭)

গ। বাইতি নিবসে পুরে/নানাবিধি বাদ্য করে (পৃ. ২০৯)

লক্ষণীয়, একই 'পুরে' শব্দ বারবার ফিরে আসে, মিলও ঘটে একই শব্দ 'করে'র সঙ্গো।[১৮] শুধু ধ্বনি নয়, শব্দ এবং বাক্যের স্তরে পুনরাবর্তনের সাহায্যেও মিলের প্যাটার্ন গড়ে উঠেছে মঙ্গালকাব্যে।

প্রথমত, সর্বনামীয় পদের পুনরুক্তি অধিকাংশ মঙ্গালকাব্যেরই একটি লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য। বিশেষত, অনিশ্চয়তাবোধক (Indefinite) বা প্রশ্নসূচক (Interrogative) সর্বনামের পুনরাবর্তন অনেকক্ষেত্রেই একটি অনুকরণীয় লক্ষণ হয়ে উঠেছে। বলাবাহুল্য, এজাতীয় বিন্যাস কাব্যে গড়ে তোলে সমান্তরাল সংগঠন (parallel structure)।

৪. ক। *কেহ* বলে ওই এল শিব বুড়া কাপ/*কেহ* বলে বুড়াটি খেলাও দেখি সাপ
কেহ বলে জটা হৈতে বার কর জল... (ভারতচন্দ্র, পৃ. ২৭৮)

খ। *কেহ* তার কাড়্যা লয় রাস্তা আসাবাড়ি/*কেহ* তার কাড়্যা লয় রঙ্গান চুপড়ি
মুঠ্যা কর‍্যা *কেহ* তার গাএ দেই ধূলা (কেতকাদাস, পৃ. ৯২)

গ। *কেহ* কিনে কেহ বিচে কেহ ধরে গুণে/*কেহ* চাখে কেহ ভখে *কেহ* বা অন্যে (ঘনরাম, পৃ. ৪৫৭)

ঘ। *কত* ঠাঁই দালান দেউল দেবালয়/*কত* কাঁচা কাঞ্চন কলস শোভে তায় (ঘনরাম, পৃ. ৩৮০)

ঙ। *কেহ* কলন্তর লয়/*কেহো* বৃষে ধান্য বয়/কালে কিন্যা রাখে কোন জন *কেহ* দর করি তোলা/হীরা নীলা মোতি পলা/*কেহো* মরকত মণি কিনে (মুকুন্দ, পৃ. ২০২-০৩)

চ। *কোন* রাজ্যে বৈস নিবাস *কোন* গ্রাম/তোমার রাজ্যের রাজা তার *কিবা* নাম/*কে বা* তথি মহাপাত্র *কে বা* অধিকারী/এতেক ধরহ তেজ কার আজ্ঞাকারী (মুকুন্দ, পৃ. ২৪২)

দ্বিতীয়ত, অনেক সময় ক্রিয়ার পুনরাবর্তন কাব্যের বিভিন্ন চরণের মধ্যে সংলগ্নতার (cohesiveness) সৃষ্টি করে।

৫. ক। হংসপৃষ্ঠে *আইলা* সগণ প্রজাপতি/...গণসহ গণেশ *আইলা* গজানন ...ইন্দ্রাণী *আইলা* সঙ্গে দেবীর সমাজ (ভারতচন্দ্র, পৃ. ২৮৪)

খ। কৃষ্ণদেব *লিখিলেক* যত যদুবংশ/মথুরার পাটে *লিখে* দুরাশয় কংস কামদেব *লিখিলেক* কৃষ্ণের কুঙর (কেতকাদাস, পৃ. ১৯৯)

গ। সবৎস কপিলা *মলো* সেনের বিয়োগে/শোকে *মলো* সারী শুক পিঞ্জর ভিতর ঢাক ভরে *মরিল* বায়েন হরিহর (ঘনরাম, পৃ. ৬৭৪)

ঘ। মহাদেবের পুত্র *হইব* ষড়ানন/গৌরীর উদরে তার *হইব* জনম/তার রণে তারকের *হইব* নিধন (মুকুন্দ, পৃ. ৪৫)

তৃতীয়ত, শব্দের পুনরাবৃত্তি বিশিষ্ট ভাবকে কখনো কখনো প্রমুখিত (foregrounded) করে তোলে। যেমন—

৬. ক। *কমল* আসন/কমল ভূষণ/*কমলমাল* ললিত/*কমল*-চরণ/*কমল* বদন/*কমল*-নাভি- গভীর (ভারতচন্দ্র, পৃ. ২৪৬)

খ। রণজয়ী *রণ*সিংহ *রণ*ভীম বীরে/*রণ*ঝটা আদি সাজে নানা অস্ত্র করে (মুকুন্দ, পৃ. ২২২)

গ। *সাপের* আসন/*সাপের* বসন/দ্বিভূজে *সাপের* শঙ্খ *সাপ*-সুধাবলী/*সাপের* কাঁচলী/হেম বিরাজিত অঙ্গ (কেতকাদাস, পৃ. ১৭)

ঘ। *রণ*জিতা *রণ*ঘাটু *রণ*মেঘা আর/*রণ*ঝাপ *রণ*বাঘ *রণ*চাপাডাল (ময়ূরভট্ট, পৃ. ১৯)

চতুর্থত, অর্থবহ শব্দের মতো সংখ্যাবাচক শব্দ, কিংবা ব্যাকরণিক উপাদানের পুনরুক্তি অথবা পদগুচ্ছের পুনরাবর্তনও সহজলভ্য।

৭. ক। *চারি* বেদে তব গুণ গান করিবারে/*চারি* মুখ দিলা তুমি অধিক আমারে/*চারি* তাল ধরিতে অধিক আট হাত (ভারতচন্দ্র, পৃ. ২৭২)

খ। দেবসেনা *সঙ্গে* লয়ে দেব ষড়ানন/দেবগণ *সঙ্গে* লয়ে ইন্দ্র দেবরাজ/ ইন্দ্রানী আইলা *সঙ্গে* দেবীর সমাজ (ভারতচন্দ্র, পৃ. ২৮৪)

গ। *এই* বরপুত্রে মোর নাহি কোন কাজ/কেমনে বসিব পুত্র দেবতা-সমাজ/...*এই* পুত্র ভুবনে হইল বিঘ্নরাজ/*ইহারে* পূজিব যত দেবতাসমাজ (মুকুন্দ, পৃ. ৬৩)

ঘ। *অবিবাহী গর্ভবতী* আপদের চিন... *অবিবাহী গর্ভবতী* বাণের নন্দিনী... *অবিবাহী গর্ভবতী* রাজা যদি শুনে (কেতকাদাস, পৃ. ২০১)

পঞ্চমত, আরও লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য হল, কবিরা অনেকক্ষেত্রে শব্দের গঠনগত উপাদান— যথা উপসর্গ, প্রত্যয় ইত্যাদির পুনরুক্তির সাহায্যেও মিলের বিন্যাস গড়ে তোলেন।

৮. ক। *অচক্ষু* সর্ব্বত্র চান *অকর্ণ* শুনিতে পান/ *অপদ* সর্ব্বত্র গতাগতি (ভারতচন্দ্র, পৃ. ২৫১)

খ। চণ্ড-*বিনাশিনি*/মুণ্ড-*নিপাতিনি*/শুম্ভ-নিশুম্ভ *ঘাতিনি* (ভারতচন্দ্র, পৃ. ২৪৫)

গ। *খড়্গিনী শূলিনী* কেহ *গদিনী চক্রিণী*/*শঙ্কিনী চাপিনী* ঘোরা *নৃমুণ্ডমালিনী* (ঘনরাম, পৃ. ৬৫৫)

ঘ। *ভদ্রকালী ভূতমতী ভ্রামরী* ভীষণী/ভূপতি-ভবনে ভয় ভাঙ্গাহ ভবানী (মুকুন্দ, পৃ. ২৪৯)

শব্দ অথবা শব্দের গাঠনিক-উপাদানের মতো বাক্য এবং বাক্যাংশের পুনরুক্তিও সহজলভ্য।

৯. ক। যত দুঃখ পায় সাধু গালি পাড়ে তত (কেতকাদাস, পৃ. ২৩৩, ২৩৬)

খ। বুদ্ধি বল নেত গ উপায় বড় নেত (কেতকাদাস, পৃ. ১৮৬)
বুদ্ধি বল নেত গ উপায় বল মোরে (কেতকাদাস, পৃ. ১৮৫)

গ। সে বাছাকে নিল মোর চক্ষে দিয়া ধূলা (ঘনরাম, পৃ. ৫৪৩)
সে বাছাকে নিল মোর চক্ষে ধুলা দিয়া (ঘনরাম, পৃ. ৫৪৩)

ঘ। ই বোল সুনিঞা তবে রঞ্জার নন্দন... ই বোল সুনিঞা মন্ত্রি কহেন তখন ...ই বোল শুনিঞা বালা কুপিলা তথাই (ময়ূরভট্ট, পৃ. ৫)

ঙ। বৈশাখ হৈল বিষ বৈশাখ হৈল বিষ... দেখ এই স্থান রামা দেখ এই স্থান... বহু ভাগ্য মনে গণি বহু ভাগ্য মনে গণি (মুকুন্দ, পৃ. ১৪৮-৪৯)

বলাবাহুল্য, অনেকক্ষেত্রেই এ ধরনের পুনরুক্তি গড়ে তুলেছে ধ্রুবপদের (refrain) আঙ্গিক।

১.৪ ধ্বন্যাত্মক শব্দ ও শব্দদ্বৈত

কাব্যে এবং কবিতায় ধ্বন্যাত্মক শব্দের প্রয়োগ যথেষ্ট সংকেতধর্মী। উলম্যান তাঁর 'Meaning and style' গ্রন্থে যথার্থই মন্তব্য করেন— 'Onomatopoeia, sound symbolism, phono-aesthetic effects and kindred phenomena are part of the fabric of poetry' (1973 : 43)[১৯]। ধ্বনির অনুকরণে গড়ে ওঠে ধ্বন্যাত্মক শব্দ। লীচ জানান— 'in its narrowest and most literal sense, it refers to the purely mimetic power of languge— its ability to imitate other (mostly non-linguistic) sounds' (1984 : 97)।[২০] অবশ্য সাহিত্যের শৈলীগত আলোচনায় দুটি বিষয়ের ওপর দৃষ্টিপাত করা হয়—

ক। প্রাথমিক ধ্বনিবৃত্তি বা ধ্বনির অনুকারক শব্দ (primary onomatopoeia) : এক্ষেত্রে ধ্বন্যাত্মক শব্দগুলি ধ্বনির যথার্থ অনুকরণ এবং পাঠকের শ্রুতির সঙ্গে প্রায় প্রত্যক্ষ

সম্পর্কান্বিত। যেমন— 'ঝন্‌ঝন্‌', 'টুপ্‌টাপ্‌', 'শন্‌শন্‌' ইত্যাদি।

খ। অপ্রধান ধ্বনিবৃত্তি (secondary onomatopoeia) : এজাতীয় ধ্বন্যাত্মক শব্দগুলো ধ্বনির ঠিক অনুকারক নয়, বরং ভাবের প্রকাশক। শ্রুতির অতীত অন্য এক ধরনের সংবেদন পাঠকের মনোভূমিতে সৃষ্টি করাই এদের কাজ। উলম্যান কথিত Secondary onomatopoeia-প্রয়োগ রবীন্দ্রনাথও লক্ষ করেছেন— '...ধ্বনির সহিত যে সকল ভাবের দূর সম্বন্ধও নাই, তাহাও বাংলায় ধ্বনির দ্বারা ব্যক্ত হয়। যেমন— কনকনে শীত, কনকন ধ্বনির সহিত শীতের কোনো সম্বন্ধ খুঁজিয়া পাওয়া যায় না।' বাংলায় আরো উদাহরণ হল 'টন্‌টন্‌', 'কন্‌কন্‌', 'মিট্‌মিট্‌' ইত্যাদি। এরকম ধ্বন্যাত্মক শব্দ যে চিত্রকল্প (image) সৃষ্টি করে, আধুনিক শৈলীবিজ্ঞানে তাকেই বলে auditory বা 'Phonoaesthetic image'। মঙ্গালকাব্যে দু'ধরনের ধ্বনিবৃত্তিরই পর্যাপ্ত উদাহরণ রয়েছে, যদিও প্রাথমিক ধ্বনিবৃত্তি প্রয়োগের প্রবণতাই বেশি করে নজর কাড়ে।

১০. ক। দশনের *কড়মড়ি*/ঢাকে যেন পড়ে বাড়ি (মুকুন্দ, পৃ. ১১৪)

খ। বক্ষের কাঁচলি/করে *ঝলমলি* (মুকুন্দ, ১৪৩)

প্রথম দৃষ্টান্তটি প্রাথমিক এবং দ্বিতীয়টি অপ্রধান ধ্বনিবৃত্তির নিদর্শন। বাংলা সাহিত্যে ধ্বন্যাত্মক শব্দের প্রয়োগবাহুল্য দেখা যায় অষ্টাদশ শতক থেকে। আদি-মধ্য বাংলার 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' কাব্যে অবশ্য এ ধরনের প্রয়োগের প্রাথমিক প্রয়াস লক্ষ করা গেছে। যেমন— 'এবে *ঘুসঘুসাআঁ* পোড়ে তোর মন' (পৃ. ১৩২); দেখি সব দেবাগণ *খলখলি* হাসে' (পৃ. ৭০) ইত্যাদি। অষ্টাদশ শতকের কবিদের সার্থক পূর্বসূরী অবশ্যই ষোড়শ শতকের কবি মুকুন্দ। তবে ধ্বন্যাত্মক প্রয়োগের বাহুল্য দেখা যায় ঘনরাম চক্রবর্তীর 'ধর্মমঙ্গাল' কাব্যে। অবশ্য শৈল্পিক দক্ষতার সর্বোত্তম প্রতিফলন ঘটেছে ভারতচন্দ্রের 'অন্নদামঙ্গাল' কাব্যে। মঙ্গালকাব্যের বিভিন্ন রচনা থেকে কয়েকটি দৃষ্টান্ত উদ্ধৃত করা যেতে পারে।

১১. ক। ঘন বাজে জয়ঢোল/*ঝনঝন* ঝিকিরোল (কেতকাদাস, পৃ. ৭৮)

খ। *দুড় দুড়্‌ম দুড়্‌ম* দুদিকে নদীর ভাঙে কুল (ঘনরাম, পৃ. ৩৬৩)

গ। পায়স পয়োধি *সপসপিয়া*/পিষ্টক পর্ব্বত *কচমচিয়া* / *চুকু চুকু চুকু চুষ্য*-চুষিয়া / *কচর মচর* চর্ব্ব্য চিবিয়া ... (ভারতচন্দ্র, পৃ. ২৭৯)

ঘ। দূরে হৈতে শুনিয়ে খুরের *চড়চড়ি* (মুকুন্দ, পৃ. ২৬২)

বলাবাহুল্য, ওপরের সব কটি উদাহরণই প্রাথমিক ধ্বনিবৃত্তির নিদর্শন। মঙ্গালকাব্যে ধ্বন্যাত্মক শব্দের প্রয়োগ অনেকসময়ই প্রসঙ্গা-নির্ভর (contextual)। উদাহরণস্বরূপ, যুদ্ধের বর্ণনা বা প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের চিত্র আঁকতে গিয়ে কবিরা ধ্বন্যাত্মক প্রয়োগে অভ্যস্ত হয়ে পড়েন।

১২. ক। দামা *দোঙ দোঙ*/বাজিছে সঘন/তেঘাই কাঁসর ঢোল/ অস্ত্র *ঠনঠনি*/সেনার সাজনি/শ্রবণে না শুনি বোল (কেতকাদাস, পৃ. ২০৫)

খ। *টনটান ঠনঠান*/ঢালে ঢালে *ঢনঢান*/*ঝনঝান* ঘন রণনাদ (ঘনরাম, পৃ. ৫৩৫)

গ। *হুড় হুড় দুড় দুড়* বিশ্বকিয়া ঝড় (মুকুন্দ, পৃ. ১৮৬)

কাব্যে ধ্বন্যাত্মক প্রয়োগের বিন্যাসের মধ্যেও রয়েছে বিশিষ্টতা। যেমন, ভারতচন্দ্রের কাব্যে চরণের শুরুতে বা শেষে ধ্বন্যাত্মক শব্দের পুনরাবর্তন প্রত্যাশিত হয়ে ওঠে।

১৩. ক। *লটপট* জটা লপটে গায়/*ঝরঝর* ঝরে জাহ্নবী তায়/*গর গর গর* গরজে ফণী (ভারতচন্দ্র, ২৭৯)

খ। ঊর্দ্ধে ছুটে জটা ঘনঘটা *জরজর*/উছলিয়া গঙ্গাজল ঝরে *ঝর ঝর* (ভারতচন্দ্র, ৩০০)

ধ্বন্যাত্মক শব্দ একধরনের শব্দদ্বৈত (reduplicated structure)। তবে ধ্বন্যাত্মক প্রয়োগ ছাড়াও অন্যান্য শব্দদ্বৈতের ব্যবহার গতিময় চিত্রকল্প সৃষ্টি করতে পারে।

১৪. ক। এইরূপে কোন্দলে লাগিল *ঝুটাঝাটি*/*ডাকাডাকি* গালাগালি মাথা *কুটাকুটি* (ভারতচন্দ্র, ২৬৮-৬৯)

খ। *কিচিকিচি কলবল*/ ভয়ে মহী *টলমল*/*থরথর* কাঁপে ঘর বাড়ী (কেতকাদাস, পৃ. ২০৩)

গ। উভ উভ উড়ে ফলা *অধঃ অধঃ* অসি/ পাশে পাশে *ফিরাফিরি* রণ *কসাকসি* (ঘনরাম, পৃ. ৫২৯)

ঘ। *লাফে লাফে* ধায় বাঘা আঁচড়ায়ে ক্ষিতি (মুকুন্দ, পৃ. ১৭০)

লক্ষণীয় (ক), (গ) এর দৃষ্টান্তের মতো অনেকক্ষেত্রেই ব্যতিহারাত্মক শব্দজোট প্রয়োগে গতিময় পরিমণ্ডল গড়ে তোলা হয়।

১.৫ ক্রিয়ার প্রয়োগ

ক্রিয়ার প্রয়োগে মঙ্গালকাব্য ধারায় অভিনবত্বের পরিচয় পাওয়া যায়। সমাপিকা ক্রিয়ার পুনরাবর্তন যেমন কাব্যের গঠনে সংলগ্নতার সৃষ্টি করে (দ্র. ১.৩), তেমনি অসমাপিকা ক্রিয়ার প্রয়োগ-বৈচিত্র্য কাব্যে আনে অভিনবত্বের আস্বাদ। অসমাপিকা ক্রিয়া-প্রয়োগের কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্যের প্রতি দৃষ্টিপাত করা যেতে পারে।

প্রথমত, চরণের অন্ত্যমিল অনেকক্ষেত্রে অসমাপিকা ক্রিয়ার পরস্থাপনার (postposing) মাধ্যমে ঘটানো হয়। ফলে অন্ত্য অবস্থানে ধ্বনিমিলের পাশাপাশি ব্যাকরণিক মিলও তৈরি হয়ে যায়।

১৫. ক। ভাইপো সৌলদজঙ্গো খালাস করিয়া/উড়িষ্যা করিল ছার লুটিয়া *পুড়িয়া* (ভারতচন্দ্র, পৃ. ২৪৮)

খ। সাজির ভিতর/দেব দিগম্বর/পাতাল-কুমারী থুয়্যা/বঞ্চনা কারণ/ দেব ত্রিলোচন /গৌরীরে কহিল *গিয়া* (কেতকাদাস, পৃ. ১৯)

গ। রসের দর্পণে রামা মুখ দেখে চেয়ে/মনে হলো নাগরে মোহিব মাত্র *যেয়ে* (ঘনরাম, পৃ. ২৬১)

ঘ। শিবের আদেশ পায়্যা/পাছু নন্দী যান *ধায়্যা*/বৃষভের করিয়া সাজন।

দ্বিতীয়ত, অসমাপিকা ক্রিয়ার বা ক্রিয়াগুচ্ছের (verb phrase) পূর্বস্থাপনাও (preposing)

লক্ষণীয়। এ ধরনের সজ্জার মাধ্যমে সংগঠন হয়ে ওঠে ক্রিয়া-কেন্দ্রিক (verb-centric)।

১৬. ক। করিঞা কপট মায়া/ভূমিতে লোটাঞা কায়া/চেতন হরিঞা বালা রয়/দেখিঞা দুর্ম্মখা চেড়ি/য়তি ব্যস্তে রড়ারড়ি/কহে জাঞা কানড়ার স্থানে (ময়ূরভট্ট, পৃ. ৬৪)

খ। শুনিয়া ওঝার নাম/বয়ানে ছুটিল ঘাম ...বসিয়া দেখহ তুমি/ চক্ষুর নিমিষে আমি/এখনি খাওয়াব তারে সাপে (কেতকাদাস, পৃ. ১৭৩)

গ। *হৈয়া* সতন্তর/তুমি কর ঘর/*লৈয়া* গুহ গজাননে (মুকুন্দ, পৃ. ৭০)

অনুরূপ সমাপিকা ক্রিয়ার পূর্বস্থাপনাও লক্ষণীয়।

১৭. ক। পরম কৌতুকে/*করিল* একে একে/পঞ্চদেবতার পূজা অস্ট লোকপালে/পূজিল পুষ্পমালে/হরিষে হরিহর রাজা (কেতকাদাস, পৃ. ১০১)

খ। *হইবে* চণ্ডীর ভক্ত/চারি মাসে হবে যুক্ত/*আসিবে* আপন নিকেতন (মুকুন্দ্ ৮৫)

গ। *না দেখিব* সে বদন *না হেরিব* সে নয়ন/*না শুনিব* সে মধুর বাণী (ভারতচন্দ্র, পৃ. ২৬৪)

তৃতীয়ত, অসমাপিকা ক্রিয়ার ধারাবাহিক প্রয়োগও শৈলীগত দিক থেকে তাৎপর্যবহ। একাধিক ক্রিয়াখণ্ড প্রয়োগের মাধ্যমে 'ডিটেলিং'-এর মানসিকতা রচনার মধ্যে স্পষ্ট হয়ে ওঠে। পাশাপাশি গতিময়তারও সৃষ্টি হয়।

১৮. ক। *উঠিয়া* প্রভাতকালে/ঊর্ধ্ব ফোঁটা *করি* ভালে/বসন মণ্ডিত *করি* শিরে/*পরিয়া* উজ্জ্বল ধুতি/কক্ষতল *করি* পুঁথি/গুজরাটে বৈদ্যজন ফিরে (মুকুন্দ, পৃ. ২০৩)

খ। *ধেয়ে যেয়ে কেন্দে* ছেলে ধরিল কাপড় (ঘনরাম, পৃ. ২৬২)

গ। এইরূপে ব্যাস *গিয়া* বারাণসী *প্রবেশিয়া*/আদি কেশবেরে *প্রণমিয়া*/সংহতি বৈষ্ণবগণ/হরিনাম সংকীর্ত্তন/নানারসে *নাচিয়া গাইয়া* (ভারতচন্দ্র, পৃ. ২৯৪)

ক্রিয়া ব্যবহারের বৈচিত্র্যের পাশাপাশি ক্রিয়াহীন প্রয়োগের প্রযুক্তিও মঙ্গলকাব্যের ভাষায় লক্ষ করা যায়। যেমন—

১৯. ক। বুড়া গরু লড়া দাঁত ভাঙ্গা গাছ গাড়ু/ঝুলি কাঁথা বাঘছাল সাপ সিদ্ধি লাডু (ভারতচন্দ্র, পৃ. ২৭৫)

খ। ভাগ্যবান শচীপতি/বিচিত্র অমরাবতী/সুবর্ণ-নির্ম্মিত-পুরীঘর/আঁচির পাঁচীর যত/কলধৌত-বিরচিত/গজমুক্তা পরশ পাথর (কেতকাদাস, পৃ. ৩৬)

গ। নানাবিধ উপচার/অপূর্ব আমান্ন আর/উপহার মনোহর ফুল/ খাসা মধু ক্ষীরখণ্ডা/বিমধু অমৃত মণ্ডা/চাঁপাকলা চিনি গঙ্গাজল (ঘনরাম, পৃ. ২৯৫)

বলাবাহুল্য, এ ধরনের প্রয়োগের মাধ্যমে গড়ে ওঠে সংহত বর্ণনামূলক অধিবাচন।

১.৬ বাক্যিক প্রয়োগ

১.৬.১ সমান্তরাল বিন্যাস

বাক্যিক স্তরে সমান্তরতার (parallelism) অর্থ, সমগঠন বা প্রায় সমগঠনের যে কোনো আন্বয়িক উপাদানের বারবার ব্যবহার এবং তার ফলে সৌষম্যের সৃষ্টি।

সাধারণত, পুনরুক্তির মধ্য দিয়েই গড়ে ওঠে সমান্তরতা। কিন্তু যে কোনো পুনরুক্তিই সমান্তরতা পদবাচ্য নয়। শুধু পুনরুক্তি নেহাতই যান্ত্রিক। কিন্তু পুনরুক্তি যখন সাহিত্যকে বৈচিত্র্যময় করে তোলে, তখনই তাকে সমান্তরতা বলা হয়। সমান্তরাল গঠনে এই বৈচিত্র্য গড়ে ওঠে মিল-অমিলের দ্বন্দ্বের মাধ্যমে। লীচ তাই বলেন— 'in any parallelistic pattern there must be an element of identity and element of contrast' (1984 : 65)[২১]। একই ধরনের প্যাটার্নের পুনরাবর্তন যখন মিলের প্রত্যাশা তৈরি করে, তখন ভিন্ন ধরনের আবির্ভাব সে প্রত্যাশাকে ভেঙে দেয়। বস্তুত, বাক্যের স্তরে সমান্তরতা বাক্যিক পরিধির মধ্যেই কেবল সীমাবদ্ধ থাকে না। সমালোচক শিশিরকুমার দাশ জানান— 'বাক্যের মধ্যে নয়, বাক্যের সীমা ছাড়িয়ে সমগ্র অনুচ্ছেদের মধ্যে এক ধরনের আন্বয়িক উপাদানের আবর্তনে সৃষ্টি হয় একটি বিশেষ সংগীত এবং সমগ্র অংশের মধ্যে একটি বিশেষ ঐক্য' (১৯৮৭ :৩০)।[২২]

মঙ্গলকাব্যের ভাষাতে এরকম সমান্তরাল বিন্যাসের প্রচুর দৃষ্টান্ত রয়েছে। যেমন—

২০. ক। ভার্গবের/সৌষ্ঠবের/দাড়ি গোঁপ ছিঁড়িল/পূষণের/ভূষণের/দন্তপাঁতি পড়িল (ভারতচন্দ্র, পৃ. ২৫৬)

খ। গদাচক্র তেয়াগিয়া/পাঞ্চজন্য বাজাইয়া/অন্নদা-উদ্দেশে পদ্ম দিয়া/অনশনে যোগ ধরি/তপস্যা করেন হরি/ রমা বাণী সংহতি করিয়া (ভারতচন্দ্র, পৃ. ২৮৬)

গ। সাপের আসন/সাপের বসন/দ্বিভুজে সাপের শঙ্খ/সাপ সুধাবলী/সাপের কাঁচলী/হেম বিরাজিত অঙ্গ (কেতকাদাস, পৃ. ১৯)

ঘ। পাঁচ বৎসরে জেবা কন্যা করে দান/তার এক ফল হয় পুস্করণী সমান/সাত বৎসরের জেবা কন্যা করে দান/ তার এক ফল হয় দেউল সমান (ময়ূরভট্ট, পৃ. ১১৩)

ঙ। বাইতি বৈসে পুরে... বাগদী বৈসে পুরে... জালিয়া নিবসে পুরে (মুকুন্দ, পৃ. ২০৯)

ক। উদাহরণে দুটি চরণেই বাক্যের বিন্যাস (colligation) এক।

খ। দৃষ্টান্তে একই প্যাটার্নে কর্ম-ক্রিয়া (অসমাপিকা) সংগঠনের পুনরাবর্তন।

গ। একই ধরনের বিশেষ্যগুচ্ছ (NP) (যথা— সাপের আসন, সাপের বসন ইত্যাদি) গড়ে তোলে সমান্তরাল সংগঠন।

ঘ। দৃষ্টান্তে আবার দুটি পংক্তি মিলিয়ে যে unit তৈরি হয়, তারই পুনরাবর্তন পরের দুই পংক্তিতে।

ঙ। দৃষ্টান্তে বিকল্প (Substitution) (যথা— বাইতি/বাগদী/জালিয়া ইত্যাদি) নির্বাচনের মাধ্যমে মিলের প্যাটার্নে বৈচিত্র্য গড়ে ওঠে।

মিল-অমিলের দ্বন্দ্বও স্পস্ট হয়ে ওঠে সমান্তরাল গড়নে। যেমন—

২১. ক। গড়িল স্ফটিক দিয়া রাজহংসগণ/প্রবালে গড়িল ঠোঁট সুরঙ্গ চরণ/সূর্য্যকান্তমণি দিয়া গড়িলা কমল/চন্দ্রকান্তমণি দিয়া গড়িলা উৎপল (ভারতচন্দ্র, পৃ. ২৮২)

খ। রণ জিনে ডোমগণ মারে মালসাট/প্রবেশ করিল আসি কালিন্দীর ঘাট/অস্ত্রশস্ত্র রাখি সবে জলক্রীড়া করে/ঝোড়ে ছিল গোদা পাইক লুকাইয়া ডরে (ঘনরাম, পৃ. ৬৩০)

গ। ছড়া ঝাঁটি দেয় কেহ জল বয়/অজা অজী রাখে কেহ কেহ রাখে হয় (ঘনরাম, পৃ. ২৭৭)

ঘ। ইন্দ্র আদি দেব কৈল পুষ্পবরিষণ/মন্দ মন্দ নিনাদ করয়ে মেঘগণ (মুকুন্দ, পৃ. ৬০)

ক। দৃষ্টান্তে শেষ দু'চরণে একই বিন্যাস পুনরাবৃত্ত, যদিও প্রথম চরণে ক্রিয়ার পূর্বস্থাপনার মাধ্যমে মিল-অমিলের প্যাটার্ন গড়ে উঠেছে।

খ। দৃষ্টান্তে প্রথম দু'চরণে অসমাপিকা ও সমাপিকা ক্রিয়ার অবস্থানগত বৈপরীত্য, যা শেষ দু'চরণেও পুনরাবৃত্ত।

গ। উদাহরণে একই চরণে ঘটেছে বাক্যিক বিপর্যয় (chiasmus) —প্রথমে কর্ম-ক্রিয়া-কর্তা, এবং পরে কর্তা-কর্ম-ক্রিয়ার বিন্যাস গড়ে তুলেছে বৈপরীত্যমূলক সমান্তরতা (reverse parallelism)। ঘ। দৃষ্টান্তেও একইভাবে কর্তা-ক্রিয়া-কর্মের প্যাটার্ন পাল্টে গিয়ে হয়েছে কর্ম-ক্রিয়া-কর্তার বিন্যাস।

১.৬.২ প্রশ্ন ও নেতিবাক্য

মঙ্গালসাহিত্যের বিভিন্ন রচনাতে প্রশ্ন ও নেতিবাক্যের পরম্পরা অনেকসময়ই সমান্তরাল বিন্যাস গড়ে তোলে। উদাহরণস্বরূপ—

২২. ক। কে রান্ধে কে বাড়ে কেবা দেয় কেবা খায় (ভারতচন্দ্র, পৃ. ২৭৭)

খ। কোন দোষে আমার কাশীতে দিলি সাপ/কি দোষ করিলি তোর কাশীবাসিগণ/কেন শাপ দিলি ওরে বিটলা বামন (ভারতচন্দ্র, পৃ. ৩০১)

গ। কি হইল কোথা যাব পাব কোথা গিয়া (কেতকাদাস, পৃ. ৪২)

ঘ। কেবা জানে মহাজ্ঞান/মড়া কোথা পায় প্রাণ/কোথা যাবে জলেতে ভাসিয়া (কেতকাদাস, পৃ. ২৬০)

ঙ। কোথা বা আপনি কৃষ্ণ কোথা জাম্ববতী/কোথা শত্রাজিত সুতা কোথা ছিল কান/কোথা ছিল রুক্মিণী/ভেটিল ভগবান (ঘনরাম, পৃ. ৪৩২)

চ। কোথা হেন রূপ বাছার হইল ছারখার/কালু আদি বার দলই কোথাকারে গেল/য়ণ্ডির পাখর ঘোড়া কেবা কাড়্যে নিল (ময়ূরভট্ট, পৃ. ৪২)

ছ। কি বুদ্ধি জন্মিল তোর বাপে/কি লাগি পাঠাএ তোমা তপে... সেবায় মানাত্যে পারে কেবা (মুকুন্দ, পৃ. ৫০)

২৩. ক। আমারে ভবানী ছাড়িও না/...শিলাময়-হিয়া হইও না/...দোষ বারে বারে লইও

না (ভারতচন্দ্র, পৃ. ২৭১-৭২)

খ। ক্রমে তিন পুরুষের বিদ্যা না হইবে/ক্রমে তিন পুরুষের ধন না রহিবে/ক্রমে তিন পুরুষের মোক্ষ না হইবে (ভারতচন্দ্র, পৃ. ২৯৭)

গ। সীঁথার সিন্দূরে তোর না পড়িল কালি/পরিধান বস্ত্রে তোর না পড়িল মলি/পাএর আলতায় তোর না পড়িল ধূলি (কেতকাদাস, পৃ. ২৫৯)

ঘ। গ্রহ পীড়া রোগ শোক/নাহি জানে প্রজালোক/ভেদাভেদ নাহি কার দেহ/গ্রামের যতেক জন/না পূজিয়া ত্রিলোচন/জলপান নাহি করে কেহ (কেতকাদাস, পৃ. ১৮৯)

ঙ। আর না শুনিব স্তুতি ও চাঁদবয়নে/...আর নাহি বাছা রে বসিবি রাজপাটে/না হেরি বদনবিধু বুক মোর ফাটে (ঘনরাম, পৃ. ৫৪৩)

চ। না দিল যজ্ঞের ভাগ না দিল আসন (মুকুন্দ, পৃ. ৩৯)

মধ্য বাংলার নিজস্ব বৈশিষ্ট্য হল সমাপিকা ক্রিয়ার পূর্বে নেতিবাচক অব্যয়ের ব্যবহার। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই নেতিবাচক অব্যয় ও সমাপিকা ক্রিয়ার একযোগে পুনরাবৃত্তি সমান্তরতার সৃষ্টি করে। আরো লক্ষণীয়, নেতিবাচক সাধারণত, স্থানান্তরিত সমাপিকা ক্রিয়ার পূর্বে অবস্থান করে (দ্র. ২৩. গ, ঙ, চ ইত্যাদি)।

প্রশ্নবাক্য প্রয়োগের উদ্দেশ্য যে শুধু সমান্তরাল সুষম বিন্যাস গড়ে তোলা, তা নয়। আখ্যানধর্মী রচনায় সংলাপধর্মী অধিবাচনের রীতি আরোপ করার প্রয়াসও এজাতীয় উদ্যোগে ধরা পড়ে। লক্ষণীয়, মধ্যযুগের কাব্যে সুনির্দিষ্ট যতিচিহ্নের প্রয়োগ ছিল না। অথচ সংলাপের নিজস্ব টোন বাক্যের প্যাটার্নে প্রশ্নের আদলকে সুস্পষ্টভাবেই চিহ্নিত করে।

১.৭ বিপ্রতীপতা

বাক্যিক ক্রমের বিপ্রতীপতা (inversion) আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ শৈলীগত বৈশিষ্ট্য। সমালোচক শিশিরকুমার দাশ জানান, প্রাচীনতম বাংলা কবিতা থেকেই বিপ্রতীপ ক্রমের আধিপত্য। চর্যাপদের 'চঞ্চল চীএ পইঠো কাল', শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের 'কে না বাঁশি বাএ বড়াই কালিনী নই কূলে', চণ্ডীদাসের 'সই কে বা শুনাইল শ্যাম নাম' থেকে শুরু করে হাজার বছরের বাংলা কবিতায় দেখা গেছে বিপ্রতীপ ক্রম। কবিতায় অনেকসময়ই অন্ত্যমিলের প্রয়োজনে কাব্যিক ক্রমের বিপ্রতীপতা দেখা যায়। কখনো আবার গঠনের সৌষম্য সৃষ্টির জন্য অথবা ক্রমের বৈপরীত্যের মাধ্যমে বিশেষ অর্থকে মূর্ত করে তোলার তাগিদে বিপ্রতীপতার সাহায্য নেওয়া হয়।[২৩] কয়েকটি দৃষ্টান্তের সাহায্যে মঙ্গালকাব্যে বিপ্রতীপতা প্রয়োগের ব্যাপারটিকে স্পষ্ট করা যেতে পারে।

২৪. ক। গিয়াছিলে বুড়াটি যখন বর হয়ে/দিয়াছিলে মোর তরে কত ধন লয়ে (ভারতচন্দ্র, ২৭৫)

খ। লুটি বাঙ্গালার লোকে করিল কাঙ্গাল/গঙ্গা পার হৈল বান্ধি নৌকার জাঙ্গাল

(ভারতচন্দ্র, ২৬৮)

গ। কান্দে রাণী মেনকা চক্ষুর জলে ভাসে/ নখে নখে বাজয়ে নারদ মুনি হাসে(ভারতচন্দ্র, ২৬৮)

(ক) দৃষ্টান্তে সমাপিকা ক্রিয়ার পূর্বস্থাপনা বাক্যিক ক্রমে বৈপরীত্যের সৃষ্টি করে; ভাবের দিক থেকে ক্রমের এই অদলবদল সমগ্র বাক্যে গড়ে তোলে অভিযোগ এবং প্রশ্নের সুর। (খ) দৃষ্টান্তে অন্ত্যমিলের কারণে সমাপিকা ক্রিয়া স্থানান্তরিত। (গ) দৃষ্টান্তে 'কান্দে রাণী মেনকা' অংশে পদক্রম বিপ্রতীপ, যদিও 'নারদ মুনি হাসে'-তে স্বাভাবিক ক্রম রক্ষিত। অন্বয়ের বৈপরীত্যে হাসি-কান্নার বিপরীত ছবি তৈরি হয়ে যায় এখানে। ফলে বিপ্রতীপ ক্রমের সাহায্যে গঠন আর অর্থের টানাপোড়েন তৈরি হয়ে যায়। অন্যান্য কাব্য থেকেও উদাহরণ দেওয়া যায়। যেমন—

২৫. ক। ধন্বন্তরি বলে দধি বেচ গিয়া তুমি/কিনিতে তোমার দুধ না পারিব আমি (কেতকাদাস, ১৭৯)

খ। অকস্মাৎ কোন রাজা তুলিল আওয়াস/কোথাকার গেল দুটি জালু মালু দাস (কেতকাদাস, পৃ. ১৪৭)

গ। ভাঙ্গিয়া গড়হ তুমি/গড়িয়া ভাঙ্গহ জানি (মুকুন্দ, পৃ. ৩৮)

ক। দৃষ্টান্তে দধি কেনা-বেচার মধ্য দিয়ে যে প্রতিস্পর্ধী সম্পর্ক গড়ে ওঠে, তা বাক্যিক বিন্যাসে কর্তার পরস্থাপনার (postposing) মাধ্যমে প্রতিফলিত। খ। দৃষ্টান্তে ক্রিয়ার স্থানান্তর প্রশ্নবাক্যের 'ফর্ম'কে নিশ্চিত করে। গ। উদাহরণটিতে ভাঙ্গা-গড়ার অর্থগত বৈপরীত্য ফর্মের স্তরে প্রমুখিত হয় সমাপিকা ও অসমাপিকা ক্রিয়ার অবস্থানগত বিপর্যাসের মাধ্যমে।

১.৮ বাক্যিক সংযুক্তিকরণ (linking)

পুনরুক্তির অতিরেক কাব্যে অনেকসময়ই সমান্তরতার সৃষ্টি করে। বিপরীত প্রক্রিয়া হিসেবে বাহুল্য বর্জনের প্রচেষ্টাও কাব্যে লক্ষণীয়। এজাতীয় প্রয়াসের ফলে বাক্যিক সংবদ্ধতার পাশাপাশি রচনায় পাঠগত সংলগ্নতাও (textual cohesiveness) গড়ে ওঠে।

বাক্যিক বিন্যাসে একই কর্তা অনেকসময় একাধিক বাক্য বা বাক্যাংশকে সংযুক্ত করে।

২৬. ক। তিনি দিলা ফুলপান/আর গ্রাম পাঁচখান/বসতি করিতে দিলা স্থল (কেতকাদাস, পৃ. ৬)

খ। শোকে ভাসে আঁখিজলে/সখা সখা করি কোলে/কান্দে বীর লাউসেন রায় (ঘনরাম, পৃ. ৫২২)

গ। বারুই নিবসে পুরে/বরজ নির্মাণ করে/মহাবীরে নিত্য দেয় পান (মুকুন্দ, পৃ. ২০৭)

অনুরূপ, একই ক্রিয়ার সাহায্যে দু'পাশের বিশেষ্যগুচ্ছকে (noun phrase) সংযুক্ত করার প্রচেষ্টাও লক্ষণীয়। ক্রিয়া অনেকটা সংযোজকের মতো কাজ করে দু'পাশের কর্ম-সূচক বিশেষ্যগুচ্ছ-সমূহকে সংযুক্ত করে।

২৭. ক। নানা দ্রব্য নানা ভক্ষ্য লয় মিঠা জল/ যুঝার গাড়র লয় তেলেঙ্গা ছাগল (কেতকাদাস, পৃ. ২২৪)

খ। ডাহুক ডাহুকী গড়ে খঞ্জনী খঞ্জান/সারস সারসী গড়ে বক বকীগণ (ভারতচন্দ্র, পৃ. ২৮২)

গ। ব্রাহ্মণ আশিস দিল শিরে দূর্ব্বাধান/...রাজভেট দিল আর কাঙুরের কর (ঘনরাম, পৃ. ৪০২-০৩)

ঘ। বাসসজ্জা দিবে জনে চাউল করি ধান (মুকুন্দ, পৃ. ১৫৫)

১.৮.১ সম্পর্কিত বাক্যের ব্যবহার :

বাক্যিক সংগঠনে পাঠগত সংলগ্নতা অনেকক্ষেত্রে পরস্পর-সম্পর্কিত বাক্য ব্যবহারের মাধ্যমেও গড়ে ওঠে। মূলত, সম্বন্ধী সর্বনামের (relative pronoun) সাহায্যে ভিন্ন বাক্যের মধ্যে সম্পর্ক তৈরি করেন কবি।

২৮. ক। কারণ-জল মোরে বলে *যেই*/কারণ-জলের কারণ *সেই*/না ছিল সৃষ্টির আদি *যখন*/কাশীপতি কাশী কৈলা *তখন* (ভারতচন্দ্র, পৃ. ৩০৪)

খ। সহায় শঙ্কর *যার*/যশ কীর্ত্তি বাড়ে তার/*যাহার* দুয়ারী ষড়ানন (কেতকাদাস, পৃ. ১৮৯)

গ। *যে* দেব সদয় হলে উদয় প্রকাশে/*সে* দেখ পাতাল পথে পলায় তরাসে (ঘনরাম, পৃ. ৬৭৫)

ঘ। জিয়াইতে পার *জদি* রাজ বরাবর/*তবে* জানি সত্য তুমি ধর্মের কিঙ্কর (ময়ূরভট্ট, পৃ. ৮)

ঙ। *যেই* যজ্ঞে সহিবেক গণেশের পূজা/*সেই* যজ্ঞে ভোজন করিব বলিরাজা (মুকুন্দ, পৃ. ৬৩)

১.৯ শব্দের প্রয়োগ :

মধ্যযুগে শিক্ষিত অভিজাতদের মধ্যে নাগরিক ঐতিহ্যের সূচক হিসেবে সংস্কৃত ভাষার প্রয়োগ ছিল। অন্যদিকে তদ্ভব ও দেশি শব্দের মিশ্রণজাত বাংলার নিজস্ব লৌকিক ভাষা ব্যবহৃত হত গ্রামীণ সমাজে। দীর্ঘদিন মুসলিম শাসনে থাকার ফলে জনজীবনে আরবি ও ফারসি ভাষার প্রভাব পড়েছিল। অধিকাংশ কবির সংস্কৃত ভাষায় পাণ্ডিত্য থাকার ফলে কাব্যে আবার তৎসম শব্দেরও প্রাচুর্য। তবে চৈতন্যপূর্ব মঙ্গলকাব্য ও রামেশ্বর চক্রবর্তীর শিবায়নে তদ্ভব ও দেশি শব্দ সমন্বিত লৌকিক ভাষার প্রাধান্য দেখতে পাওয়া যায়। তৎসম শব্দের বানান শৈথিল্যের মধ্য দিয়ে ধরা পড়ে ভাষার আঞ্চলিক রূপ। বিজয়গুপ্তের 'পদ্মাপুরাণ'-এ তৎসম, তদ্ভব, দেশি এবং আরবি-ফারসির পরিবেশোপযোগী ব্যবহার ঘটেছে। ঘনরামের 'ধর্মমঙ্গাল' কাব্যে তৎসম শব্দের প্রাধান্য থাকলেও তদ্ভব ও দেশি শব্দের প্রাসঙ্গিক প্রয়োগ দেখা যায়। ভারতচন্দ্রের কাব্যেও তৎসম শব্দের আধিক্য, পাশাপাশি প্রযুক্ত হয়েছে আরবি ও ফারসি।[২৪]

শব্দপ্রয়োগে মঙ্গলকাব্য ধারার কবিরা এক সাধারণ প্রযুক্তি অর্জন করেছেন। সাধারণত, এঁরা তিন শ্রেণির শব্দপ্রয়োগ করেন (পূর্বোক্ত উপাদানগুলি ছাড়াও)। ক। অপ্রচলিত, খ। তৎসম শব্দের বিকারী রূপ, গ। নতুন ধরনের শব্দগঠন।

২৯. ক। কোথা হৈতে বুড়া এক ডেকরা বামন (ভারতচন্দ্র, পৃ. ২৬২)
খ। মরণ টাকিলি বেটা অনাথা দেখিয়া (ভারতচন্দ্র, পৃ. ৩১০)
গ। ক্ষুধায় আকুল মুঞি, লাগে ভোকছানি (কেতকাদাস, পৃ. ২৫৬)
ঘ। বাঘা যেন নাহি দেখে আড়ি উড়ি দিয়া (ঘনরাম, পৃ. ২৩১)

৩০. ক। যাবে বাপ ঘর/খেয়াতি হবে কাঙ্গালী [< খ্যাতি] (ভারতচন্দ্র, পৃ. ২৭৬)
খ। তাহার ক্রন্দন শুনি দরবিত হিয়া [< দ্রবিত] (কেতকাদাস, পৃ. ১৫৫)
গ। এ কথা প্রিত্যয় তুমি কর কার বোলে [< প্রত্যয়] (ঘনরাম, পৃ. ৬৮)

৩১. ক। কারণ অমৃত-পরিপূর্ণ অতুলিত (ভারতচন্দ্র, পৃ. ২৮৮)
খ। দুহে প্রেম অতিতর (ভারতচন্দ্র, পৃ. ৩২০)
গ। আমি অপূজনী হৈলে তুমি পাবে লজ্জা (কেতকাদাস, পৃ. ২৬)
ঘ। উপর চরণে দিল বাজন্ত নপুর (ময়ূরভট্ট, পৃ. ৯৩)

১.১০ আঙ্গিকের অন্যান্য লক্ষণ :

মঙ্গলকাব্যের ভাষা-আঙ্গিকে যুগের সাধারণ শৈলী কীভাবে প্রতিফলিত, সে-সম্পর্কে আলোচনা করাটাই ছিল এ নিবন্ধের উদ্দেশ্য। আঙ্গিকের অন্যান্য কয়েকটি সাধারণ বৈশিষ্ট্যের উল্লেখ করে এ প্রবন্ধের ইতি টানব। বলাবাহুল্য, এজাতীয় প্রবণতা শুধু মঙ্গলকাব্য নয়, মধ্যযুগের অন্যান্য কাব্যেও কমবেশি উপস্থিত।

আঙ্গিকের দিক থেকে মঙ্গলকাব্য ধারার অন্যতম বৈশিষ্ট্য হল, 'পূর্বকথা' (flash back) ও 'উত্তর কথা' (feed back) পদ্ধতির ব্যবহার। উদাহরণস্বরূপ—

৩২. ক। পূর্ব্বকথা কহি যবে জন্মিলে গোকুলে/মহামায়া জনমিলা যশোদা জঠরে/তখন জন্মিলে তুমি বসুদেব ঘরে... (কেতকাদাস, ২১৪)
খ। হইল আকাশবাণী শুনিবারে পায়/শুন রতি তনু ত্যাগ না কর এখন... দ্বাপরে হবেন হরি কৃষ্ণ অবতার/কংস বধি করিবেন দ্বারকা বিহার (ভারতচন্দ্র, পৃ. ২৬৪-৬৫)
গ। প্রথমে কলির অংশে/জন্মাইবে ব্যাধের বংশে/ইন্দ্রের কুমার নীলাম্বরে... গন্ধবণিক জাতি/খুল্লনা হইব খ্যাতি/বিবাহ করিব ধনপতি (মুকুন্দ, পৃ. ৭২)
ঘ। লাউসেন বলে মাতা কর যবধানে.. নব লক্ষ্য দলে রাজা গিঞা গৌড়েশ্বরে/বিভা করিবারে গেলা সেমল্যার গড়ে (ময়ূরভট্ট, পৃ. ৭০)

দ্বিতীয়ত, মঙ্গলকাব্যের আখ্যানধর্মী রচনায় সংলাপধর্মী অধিবাচন প্রয়োগের একটি সাধারণ রীতিও লক্ষ করা যায়।

৩৩. ক।শুন বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ ঠাকুর মহাশয়/আমারে প্রণাম করা উপযুক্ত নয়... মুনি বলে

এ ভয় দেখাও তুমি কারে/তোমার কৃপায় ভয় না করি তোমারে (ভারতচন্দ্র, পৃ. ২৬১)

খ। গজানন কহে আর কি চাহ বয়ান/মন্থনে মুহিত হৈলা বাপ ত্রিনয়ান/ঈশান-কুমারী কহে কিসের কারণ/কি লাগি হইল বাপ মহেশ মোহন (কেতকাদাস, পৃ. ৬৫)

গ। বুড়ী বলে কেন দুঃখ বাড়াও মরমে/বয়স বলিয়া বাড়া ঠেলো না হে রায়/... সেন বলে ত্যজ বুড়ী পাপ অভিলাষ/সময় উচিত বলি কর গঙ্গাবাস (ঘনরাম, পৃ. ২৮৫)

তৃতীয়ত, মধ্যযুগের অন্যান্য সাহিত্যের মতো মঙ্গালকাব্যধারায় লোকায়ত জীবন ও সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের ছাপ পড়েছে। লৌকিক জীবনের ছবি আঁকতে গিয়ে খুব স্বাভাবিক কারণেই লৌকিক বাগ্‌ভঙ্গি ও প্রবাদপ্রবচন ব্যবহার করেছেন কবিরা।

৩৪. ক। নগর পুড়িলে দেবালয় কি এড়ায় (ভারতচন্দ্র, পৃ. ২৪৮)

খ। ভাঙ্গিলে সোনার পাত্র/পুনু গড়া যায় মাত্র/ভাঙ্গিলে না গড়া যায় মন (কেতকাদাস, ১৬০)

গ। মিছা কথা সিঁচা জল কতক্ষণ রয় (ঘনরাম, ৪১৯)

ঘ। চোরে নাহি সুনে কভু ধর্ম্মের বচন (ময়ূরভট্ট, ১০)

চতুর্থত, প্রথাগত সংস্কৃত উপমার পাশাপাশি লৌকিক উপমার প্রয়োগেও মঙ্গালকাব্যের কবিদের মধ্যে রয়েছে সাধর্ম্য। রূপ-সৌন্দর্যের বর্ণনায় প্রাচীন আলংকারিক রীতিই গৃহীত, তবে লৌকিক উপমা কাব্যে অভিনবত্ব এনেছে।

প্রথাগত সংস্কৃত উপমা :

৩৫. ক। মৃণাল ভুজনী/খঞ্জন লোচনী/বচন পীযূষ জিনি/নাভি সরোবর/প্রণয় গভীর/কটিদেশ অতি ক্ষীণি (কেতকাদাস, পৃ. ১৭)

খ। সুবলিত ভুজ/সহিত অম্বুজ/কনক-মৃণাল রাজে/...কোটি শশধর/বদন সুন্দর/ঈষৎ মধুর হাস (ভারতচন্দ্র, পৃ. ২৪৫)

গ। সহিত যুগল ভুরু জিনি কামধেনু/কপালে সিন্দূর বিন্দু প্রভাতের ভানু (ঘনরাম, ১৫০)

লৌকিক উপমা

৩৬. ক। উমার কেশ চামরছটা, তামার শলা বুড়ার জটা.... উমার নখ চাঁদের চূড়া, বুড়ার দাড়ী শণের নুড়া (ভারতচন্দ্র, পৃ. ২৬৮)

খ। ধূম ধূম ধুমসী দুহাতে হাতী হানে/কোদলে কদলী যেন কাটিছে কৃষাণে (ঘনরাম, পৃ. ৪৫৩)

পঞ্চমত, মধ্যযুগের লিরিক কবিতার পরিচয় পাওয়া যায় বৈষ্ণব পদাবলিতে। মঙ্গালকাব্য আখ্যায়িকা কাব্য হলেও চৈতন্য পরবর্তী কাব্যগুলিতে বৈষ্ণব ভাবানুষঙ্গের প্রকাশ ঘটেছে। লক্ষণীয়, আঙ্গিকের দিক থেকে লিরিক কবিতাসুলভ ধ্রুবপদের (refrain) ব্যবহার রয়েছে

বিজয়গুপ্তের 'পদ্মাপুরাণ', মুকুন্দ-কবির 'চণ্ডীমঙ্গল' এবং ভারতচন্দ্রের 'অন্নদামঙ্গল' কাব্যে।[২৫]

যেমন, বিজয়গুপ্তের 'পদ্মাপুরাণ'-এ 'নিল প্রাণ চিকনকালিয়া' (পৃ. ১৫৯), 'আহা হরি এইবার তরাইয়া নেও রাম' (পৃ. ২৪৬), 'ভালরঙ্গো নাচেরে সোনার গিরিবর' (পৃ. ১৫৭) ইত্যাদি ধ্রুবপদ ব্যবহৃত। অনুরূপ 'অন্নদামঙ্গল'-এর ধ্রুবপদে রয়েছে লৌকিক সুষমা— 'আই আই ওই বুড়া কি এই গৌরীর বর লো/বিয়ার বেলা এয়োর মাঝে হৈল দিগম্বর লো' (পৃ. ২৬৮)।

উপসংহার :

শৈলীবিজ্ঞানের আলোচনায় কোনো লেখকের নির্দিষ্ট কোনো রচনার শৈলীগত বিচার ও বিশ্লেষণ অবশ্যই গুরুত্বপূর্ণ, মূল্যবান। কিন্তু তার থেকেও গুরুত্বপূর্ণ হল যুগের অন্যান্য সাহিত্যকর্মের প্রেক্ষাপটে রচনাটির মূল্যায়ন। যুগের প্রচলিত ভাষাশৈলীর সঙ্গে লেখক কতটা একাত্ম, কতটাই বা স্বতন্ত্র, সেটা বুঝে নেওয়াটা শৈলীবিজ্ঞানীর পক্ষে একান্ত প্রয়োজনীয়। এঙ্কভিস্ট স্পষ্টতই জানান, কোনো রচনার শৈলী-সূচকগুলির (Stylistic markers) নির্ধারণে প্রসঙ্গের (context) বৃহত্তর প্রেক্ষাপটে রচনাটিকে বিচার করা প্রয়োজন। 'The aim of stylistic analysis is the inventory of style markers and a statement of their contextual spread ...We have to climb higher rungs on the hierarchic ladder of contexts before we arrive at meaningful descriptions of style.'[২৬] (১৯৬৪ : ৩৮-৩৯)। শৈলীবিজ্ঞানের বিশ্লেষণে যুগশৈলীর সামগ্রিক পরিচয় তাই আলাদা তাৎপর্য বহন করে।

মঙ্গালকাব্য ধারার ভাষাশৈলীর কয়েকটি বিশিষ্ট লক্ষণ তুলে ধরাই ছিল বর্তমান নিবন্ধের উদ্দেশ্য। বলাইবাহুল্য, যুগশৈলীর প্রকৃত পরিচয় পেতে হলে আরো বিস্তৃত এবং সার্বিক গবেষণার প্রয়োজন, এ প্রবন্ধের স্বল্প পরিসরে তা সম্ভবও নয়। অবশ্য শুধু মঙ্গালকাব্য নয়, বৈষ্ণব পদাবলি, জীবনী এবং অনুবাদ সাহিত্য ইত্যাদি বিভিন্ন শ্রেণির রচনার মধ্য দিয়ে মধ্যযুগের ভাষাশৈলীর সামগ্রিক চিত্রটিকে আবিষ্কার করার অন্যতম দায়িত্ব একালের শৈলীবিজ্ঞানীদের।

উৎসের সন্ধানে

১। Krishnaswamy, N., S.K. Verma and M. Nagarajan (1992) : Modern Applied Linguitics, Madras : Macmillan India press.

২। Crystal, D. and D. Davy (1969) : Investigating English Style, London : Longman.

৩। পবিত্র সরকার (১৯৮১) : বাংলা গদ্য : রীতিগত অনুধাবন; অরুণ বসু (সম্পা) : বাংলা গদ্যজিজ্ঞাসা, পৃ. ৫৫-১০২

৪। Simpson, p. (1997) : Language through Literature : An Introduction, London

and New York : Routledge

৫। Abrams, M.H. (1981) : A Glossary of Literary Terms (4th ed.), New York : Holt, Rinehart and Winston.

৬। আশিসকুমার দে (১৯৯২) : সাহিত্যালোচনা ও শৈলীবিজ্ঞান, কলকাতা: সাহিত্য প্রকাশ

৭। রামেশ্বর শ' (১৯৯৬) : সাধারণ ভাষাবিজ্ঞান ও বাংলা ভাষা, কলকাতা : পুস্তক বিপণি, চতুর্থ সংস্করণ

৮। দ্র. সূত্রনির্দেশ : (১)

৯। সনৎকুমার নস্কর (১৯৯৯) : কবিকঙ্কণ চণ্ডী (সম্পা.) কলকাতা : রত্নাবলী

১০। পরেশচন্দ্র মজুমদার (১৯৯২) : শ্রীকৃষ্ণকীর্তন : কাব্যপাঠ ও ভাষাবিশ্লেষণ; নরেশচন্দ্র জানা (সম্পা.) : শ্রীকৃষ্ণকীর্তনচর্চা, কলকাতা : ভারত বুক এজেন্সি, পৃ. ১০৩-২৮

১১। —(১৯৯২) : বাঙলা ভাষা পরিক্রমা (১ম খণ্ড), কলকাতা : দে'জ পাবলিশিং, পৃ. ৮৯

১২। Riffaterre, M. (1966) : Describing poetic structures : Two approaches to Baudelaire's 'Les chats', Yale French Studies, 36/37, p. 200-42

১৩। Gargesh, R. (1990) : Linguistic Perspective of Literary Style, Delhi : University of Delhi.

১৪। Leech, G. (1984) : A Linguistic Guide to English Poetry, London : Longman.

১৫। তদেব।

১৬। অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় (১৯৮১) : বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত, ৩য় খণ্ড, ২য় পর্ব, কলকাতা : মডার্ন বুক এজেন্সি।

১৭। দ্র. সূত্রনির্দেশ : (১৪)।

১৮। শিশিরকুমার দাশ (১৯৮৭) : কবিতার মিল ও অমিল, কলকাতা : দে'জ পাবলিশিং, পৃ. ৪-৫

১৯। Ullmann, S. (1973) : Meaning and Style, Oxford : Basil Blackwell.

২০। দ্র. সূত্রনির্দেশ : (১৪)।

২১। তদেব।

২২। দ্র. সূত্রনির্দেশ : (১৮)।

২৩। তদেব, পৃ. ৭৯-৮৮

২৪। মনোয়ারা হোসেন (১৯৯৬) : বাংলা শব্দের শ্রেণিবিচার ও প্রয়োগ বিশ্লেষণ (প্রাচীন ও মধ্যযুগ), ঢাকা : বাংলা একাডেমি।

২৫। মঞ্জুলা বেরা (১৯৯৯) : বৈষ্ণব পদাবলীর ভাষাশৈলী, কলকাতা : সোনার তরী, পৃ. ২৮

২৬। Spencer, J. (1964) (ed.) : Linguistics and Style, London : Oxford University Press.

উৎস গ্রন্থ

১। অক্ষয়কুমার কয়াল ও চিত্রা দেব (১৯৭৪) : ময়ূরভট্টের-ধর্মমঙ্গল, কলকাতা : জি.

ভরদ্বাজ অ্যান্ড কোং।
২। —(১৯৭৭) : কেতকাদাস ক্ষেমানন্দের মনসামঙ্গাল, কলকাতা : লেখাপড়া।
৩। ক্ষুদিরাম দাস (১৯৭৭) : মুকুন্দ চক্রবর্তীর কবিকঙ্কণচণ্ডী (১ম খণ্ড), কলকাতা : কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়।
৪। পীযূষকান্তি মহাপাত্র (১৯৬২) : ঘনরাম চক্রবর্তী বিরচিত শ্রীধর্ম্মমঙ্গাল, কলিকাতা : কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়।
৫। বসন্তরঞ্জন বিদ্বদ্বল্লভ (বাং ১৩৫৬) : শ্রীকৃষ্ণকীর্তন— বড়ু চণ্ডীদাস, চতুর্থ সংস্করণ, কলকাতা : বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ।
৬। রামপ্রসাদ-ভারতচন্দ্র রচনাসমগ্র (১৯৮৬) : বুলবুল বসু কর্তৃক প্রকাশিত, কলকাতা : রিফ্লেক্ট পাবলিকেশন।
৭। জয়ন্তকুমার দাশগুপ্ত (সম্পা) (১৯৬২) : বিজয়গুপ্তের পদ্মাপুরাণ, কলকাতা।

মঙ্গালকাব্যে হাস্যরস

অনির্বাণ মান্না

বাংলা শিষ্টসাহিত্যে হাস্যরসাত্মক রচনার ইতিহাস খুব একটা গৌরবজনক নয়। ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায়, পরে রাজশেখর বসু বা আরো পরে শিবরাম চক্রবর্তীকে বাদ দিলে অন্যান্য সাহিত্যশাখার পাশাপাশি রম্যরচনার সংখ্যা নগণ্য। অথচ মধ্যযুগীয় কাব্যে দেবতা ও মানুষ এই দুই চরিত্রকে কেন্দ্র করে ধর্মরূপ বালুকারাশির তলদেশে অনাবিল হাস্যরসের ফল্গুধারা বহমান।

যেখানে ভয়ভক্তি, বিস্ময়, অলৌকিকতা কিম্বা দমননীতি কাব্যের মুখ্যবিষয় হওয়া উচিত ছিল, হাস্যরসের উদ্দামতা সেখানে বিস্ময়কর নয় কি? এর কারণ এমন হতে পারে, **প্রথমত,** মঙ্গালকাব্যের একটি প্রথাগত বৈশিষ্ট্য হল, স্বর্গের দেবদেবী শাপভ্রষ্ট হয়ে স্বর্গ থেকে মর্ত্যে আসেন দেবমহিমা প্রচারের জন্য। অথচ দেবতা-মানুষ এক নয়। সেক্ষেত্রে মানুষের সঙ্গো দেবতার সহাবস্থান অসঙ্গাতি ছাড়া আর কি হতে পারে। ফলে মানুষকে কেন্দ্র করে দেবতার, বিপরীতক্রমে মানুষের দেবতাকে নিয়ে হাস্যরস সৃষ্টির একটা সম্ভাবনা থেকে যায়।

দ্বিতীয়ত, রাজশক্তির আশ্রয়ে এবং মদতে কবিরা মঙ্গালকাব্য রচনা করতেন। কবিদের প্রচ্ছন্ন প্রবণতা থাকত রাজদরবারের শ্রোতাদের মানসিক বিশ্রাম দেবার। তাই মানসিক বিনোদনের দিকে লক্ষ রেখে কবিরা হাস্যরসকে তাঁদের কাব্যে বিশেষ গুরুত্ব দিতেন।

তৃতীয়ত, মঙ্গালকাব্যগুলি কবিদের কোনো মৌলিক সৃষ্টি নয়। এগুলি গ্রামবাংলায় প্রচলিত লোককাহিনির কাব্যরূপ। লোকসাধারণই দেবতাকে মাটিতে টেনে এনেছে। তাঁদের সঙ্গো রসিকতা করেছে। শেষপর্যন্ত দেবতা তাঁর দৈবী খোলস ত্যাগ করে মানুষ হয়ে গেছেন। তাই শিব-পার্বতী আমাদের পরিচিত গ্রাম্য নর-নারী ছাড়া আর কিছু নন। দেবতাদের নিয়ে রঙ্গারসিকতা যে পাপকাজ—সেই ধারণা ক্রমশ লুপ্ত হয়েছে। মঙ্গালকাব্যের কবিরা এই সুযোগকে তাঁদের কাব্যে কাজে লাগিয়েছেন।

সর্বোপরি কালোত্তীর্ণ সাহিত্যস্রষ্টা সমকালের সমস্ত প্রতিবন্ধকতা অতিক্রম করে, ব্যক্তিগত সমস্যা-জর্জরিত জীবনকে উপেক্ষা করে 'অলৌকিক' দক্ষতায় জীবনরসের কথা শোনান। তাই জীবনসত্যকে মেনে কবি দুঃখের কথা শুনিয়েছেন। আবার সুখের দিকটিকেও উপেক্ষা করেননি। কাব্যের প্রয়োজনেই হাস্যরসের উপস্থাপন ঘটেছে মঙ্গালকাব্যগুলিতে।

মনসামঙ্গাল, চণ্ডীমঙ্গাল, ধর্মমঙ্গাল কিম্বা অন্নদামঙ্গাল ইত্যাদি মঙ্গালকাব্যের যে শাখাতেই হোক না কেন সমস্ত কাব্যেই মানুষের চেয়ে দেবতাকে নিয়ে কবিদের হাস্যরস সৃষ্টির প্রবণতা বেশি। দেবতাকে পীড়ন করে উৎপন্ন হাস্যরসের আবেদন হয়তো পাঠকের কাছে বেশি। এই হাস্যরসের বৃত্তের কেন্দ্রে অনেক ক্ষেত্রে শিব অবস্থান করেছেন এবং পরিধিতে পার্বতী। বিচ্ছিন্নভাবে কখনো মেনকা বা দক্ষ কিংবা অন্য কোনো দেবতা এসে উপস্থিত হয়েছেন। ভারতচন্দ্রের 'অন্নদামঙ্গাল' কাব্যে মদন শিবের ধ্যানভঙ্গোর জন্য কামশর নিক্ষেপ করলে কামমত্ত শিবের প্রতিক্রিয়া হাস্যকর—

কামে মত্ত হর দেখিয়া অপ্সর
কিন্নরী দেবী সকল।
যাই পলাইয়া পশ্চাত তাড়িয়া
ফিরেন শিব চঞ্চল॥

আমাদের মনে যে দেবতা সম্পর্কিত উচ্চ ধারণা আছে শিবের এই কামচাঞ্চল্য তাকে আঘাত করে। দেবতা ষড়রিপু নিয়ন্ত্রক হবেন এটাই স্বাভাবিক। এখানে শিবকে রক্তমাংসের শরীরধারী বলে মনে হয়। শিবের আচরণে আমরা হেসে উঠি। নারদের পরামর্শে বিবাহেচ্ছুক শিব তর সইতে পারেন না। শিব অনেকটা যেন 'বিয়ে-পাগলা বুড়ো'—

মুনি কহে দ্রুত সকলি প্রস্তুত
বর হয়ে কবে যাবা।
কহেন শঙ্কর বিলম্ব না কর
আজি চল মোর বাবা॥

হরগৌরীর বিবাহে মজাদার ঘটনার উপস্থাপন করেন মঙ্গালকাব্যের কবিরা। বিবাহযাত্রার প্রাক্কালে শিবের বরসজ্জায় নারদ যেভাবে পরামর্শে দিয়েছেন তা অভিনব। শিবের টোপর পরার দরকার নেই, জটা আর সাপ থাকলেই চলবে। মুক্তোর মালা নয়, হাড়ের মালাই যথেস্ট। কস্তুরী কেশর নয়, চন্দন নয়, শিব ঘন করে ছাই মেখেছেন। মণির বিকল্প হয়েছে ফণী। কাপড়ের পরিবর্তে বাঘছাল। রথ হস্তী নয়, বুড়ো বলদ হয়েছে বাহন। পরিশেষে সিদ্ধি ধুতুরার নেশায় শিব বর হিসেবে আদর্শ হয়ে উঠেছেন। শিবকে নিয়ে হাসাহাসির মাত্রা চূড়ান্ত হয়েছে বিবাহসভায়। যখন নারদ—

গরুড়ে কহিলা তুমি ভয় দেখাইয়া।
শিব কটি-বন্ধ সাপ দেহ খেদাইয়া॥

নারদের কথামতো—

গরুড় হুঙ্কার দিয়া উতরিল গিয়া।
মাথা গুঁজে যত সাপ যায় পলাইয়া॥
বাঘছাল খসিল উলঙ্গা হৈলা হর।
এয়োগণ বলে ওমা এ কেমন বর॥ (অন্নদামঙ্গাল, ভারতচন্দ্র)

শিব আপন-ভোলা লোক, ভোলানাথ। এই ঘটনায় তাঁর হয়তো কিছু যায় আসে না। কিন্তু

পৌরাণিক সত্যকে স্বীকার করে সর্প-বিদ্বেষী গরুড়ের সাহায্যে এই স্থূল হাস্যরসের ঘটনায় শিবকে পাঠকগণ আর একটুও ভয় পান না, সাধারণ মানুষও না। নারদকে দিয়ে কবির এই হাস্যরস সৃষ্টির পরিকল্পনা প্রশংসার্হ।

শিব-পার্বতীর বিয়ে হল। কিন্তু শিবের সংসারে পাবর্তীর দুঃখের সীমা নেই। দারিদ্র্য মেনে নেওয়া যায়। কিন্তু শিবের বেশবাসের জন্য পার্বতীর ভালো ঘুম হয় না—

শয়নে তোমার পাশে নিদ্রা নাহি হয় ত্রাসে
জটায় জলের কুলকুলি।
সাপের ফোঁসফাঁস শুনি সাত পাঁচ মনে গুনি
পালাইতে পরম আকুলি।।

(শিবায়ন কাব্য : রামকৃষ্ণ রায়)

আমাদের ধারণা, দেবতারা মহাসুখে স্বর্গে নিদ্রা যান। কিন্তু পার্বতীর অভিযোগ শুনে সর্বশক্তিমান ঈশ্বরেরও ত্রুটি খুঁজে পেয়ে আমরা অনাবিল আনন্দ পাই। শিবায়ন কাব্যের শিব কৃষিসভ্যতার প্রতীক। তাই শিব যেন চাষিঘরের কোনো একজন।

এই বিশ্বসৃষ্টির মূলে আছেন শিব আর সেই সৃষ্টির মূলীভূত কারণ হলেন পার্বতী। এই তত্ত্ব জেনেই অন্নদামঙ্গালের শিব পার্বতীকে বলেন—

অর্দ্ধ অঙ্গা তোমার আমার অর্দ্ধ অঙ্গো।
হর গৌরী একতনু হয়ে থাকি সঙ্গো।।

শিবের মুখের এই তত্ত্বকথা শুনে পার্বতী মোটেও সুখসাগরে নিমজ্জিত হয়নি। বরং যুক্তিপূর্ণ ব্যঙ্গাত্মক উত্তর দিয়েছেন শঙ্করকে—

হাসিয়া কহেন দেবী এমনো কি হয়।
সোহাগে এমন কথা পুরুষেরা কয়।।

পার্বতীর যুক্তি : যদি পুরুষ মারা যায় তবে নারী পতিসঙ্গো সহমরণে যায়। কিন্তু নারীর মৃত্যু হলে পুরুষ মৃতা স্ত্রীকে ভুলে সঙ্গো সঙ্গো নতুন বধূ ঘরে আনে। তাই পার্বতী যেন বলতে চান, সোহাগের বশে শঙ্কর 'একতনু' হবার কথা বললেও পার্বতী মারা গেলে শঙ্কর 'সহমৃত' হতে পারবেন তো? শঙ্করের প্রতি পার্বতীর এই কটাক্ষ চরম হয়ে উঠেছে পরবর্তী দুই চরণে—

অর্দ্ধ অঙ্গা যদি মোর অঙ্গো মিলাইবা।
কুচুনীর বাড়ি তবে কেমনে যাইবা।।

হাসতে হাসতে পার্বতী এইভাবে শঙ্করকে ব্যঙ্গাবাণে বিদ্ধ করেছেন। তেমনি শিবের চরিত্রহীনতাকে কটাক্ষ করার জন্য ব্যঙ্গোর তীব্রতাকে হাস্যরসের আবরণে প্রকাশ করেছেন পার্বতী, যা স্যাটায়ারকেই চিহ্নিত করে। এখানে শিবের প্রতি দুর্গা যেমন চরম কৌতুক অনুভব করেছেন একইভাবে স্ত্রীর কাছে শিবের আসল চরিত্র নগ্ন হওয়ার করুণ পরিণতি পাঠককেও হাসিয়েছে।

শিবের এই চরিত্রহীনতার পরিচয় আমরা বিজয় গুপ্তের 'মনসামঙ্গালে'ও পাই। এই শিব এমনই কামোন্মত্ত যে ডোমনীর বেশে মোহিত করে দেবী সহজেই শিবকে ভুলিয়েছেন—

ভালমন্দ জ্ঞান নাই কামে অচেতন।

রতিরঙ্গো শিবের বাছবিচার নেই। সেজন্য দেবী ডোমনীর ছদ্মবেশ ধারণ করে রান্না করে খাওয়াতে চাইলে শিবের কোনো আপত্তি থাকে না। পরে দেবীর প্রতিক্রিয়া হাসির উদ্রেক ঘটায়—

হাতে হাতে কচালে দেবী দন্তে কড়মড়।
অতি কোপে বলে দেবী, 'ক্ষে যারে ভাঙ্গাড়'॥

সহজেই বুঝতে পারি যে 'ভাঙ্গা' শিবের এত প্রিয় তার প্রতিও শিবের সেই মুহূর্তে আর কোনো টান নেই। দেবীর এই কটাক্ষে শিবের লজ্জা আমাদের প্রাণখোলা হাসি জাগায়।

শিব পার্বতীকে নিয়ে সংসার পাতলেও তিনি সংসারী হতে আর পারলেন না। ভবঘুরে কর্মবিমুখ শিব আত্মসম্মান খুইয়ে ঘরজামাই থাকতেও দ্বিধাবোধ করেন না। কেননা, পেটের চিন্তা আর করতে হয় না। এই নিয়েই গৌরীর সঙ্গো মা মেনকার বিবাদ। মুকুন্দ চক্রবর্তীর 'অভয়ামঙ্গাল' কাব্যে 'গৌরীর সহিত মেনকার কলহ' পালায় অধৈর্য্য হয়ে মাতা মেনকা বলেছেন—

রান্ধি বাড়ি আমার কাঁকাল্যে হইল বাত।
ঘরে জামাই রাখিয়া জোগাব কত ভাত॥

শিবের ঘরে অভাব লেগেই আছে। গণেশ, কার্তিকের পিতা হিসাবে শিব সংসারে অভাবের জন্য প্রবাদ-প্রবচন আউড়ে পার্বতীকে অভিযুক্ত করেন—

পরম্পরা পরস্পর শুনি এই সূত্র
স্ত্রীভাগ্যে ধন পুরুষের ভাগ্যে পুত্র।

শিব ভেবেছিলেন ভাগ্যের দোহায় দিয়ে তিনি এটা বোঝাতে পারবেন যে, শিব পুত্রের জনকহেতু ভাগ্যবান, কিন্তু পার্বতীর দুর্ভাগ্যের জন্যই নিত্য ঘরেতে অভাব। অথচ শিবের এই যুক্তি যেভাবে পার্বতী খণ্ডন করেছেন সেই ব্যঙ্গাবিদ্রুপের শরে শিব একেবারে ধরাশায়ী হয়েছেন। শিবা শিবকে ব্যঙ্গা করে বলেছেন—

গুণের নাহিক সীমা রূপে ততোধিক।
বয়সে না দেখি গাছ পাথর বল্মীক॥
সম্পদের সীমা নাই বুড়া গরু পুঁজি।
রসনা কেবল কথা সিন্দুকের কুঁজি॥
কড়া পড়িয়াছে হাতে অন্নবস্ত্র দিয়া।
কেন সব কটু কথা কিসের লাগিয়া॥

(অন্নদামঙ্গাল, ভারতচন্দ্র)

স্যাটায়ারধর্মী হাস্যরসের একটি বৈশিষ্ট্য হল আপাত বৈপরীত্য, এক তির্যক দৃষ্টিভঙ্গি। 'গুণের নাহিক সীমা' অর্থাৎ অর্থটা এমনও হতে পারত যে গুণ অসীম। কিন্তু পার্বতীর কটাক্ষে বুঝতে অসুবিধা হয় না যে শিবের রূপগুণ তো নেই-ই বয়সেরও কোনো ঠিক ঠিকানা নেই। সম্পদ বলতে শিবের বাহন বুড়ো বলদ। আর সংসারে স্ত্রীকে অন্নবস্ত্র দিয়ে শিবের হাতে কড়া পড়েছে এই কথায় পার্বতী স্ত্রীর প্রতি স্বামীর দায়িত্বহীনতাকে বিদ্রুপ করতে চেয়েছেন। পার্বতীর যুক্তিও অসামান্য। পার্বতীর মতে বিয়ের আগেও তো শিবের সম্পদ বলতে—

বুড়া গরু লড়া দাঁত ভাঙ্গা গাছ গাড়ু।
ঝুলি কাঁথা বাঘছাল সাপ সিদ্ধি লাডু।

অতএব—

তখনো সে ধন ছিল এখনো সে ধন।
তবে মোরে অলক্ষণা কন কি কারণ।।

এই ব্যঙ্গের তীব্রতা থেকে বাপের সঙ্গে বেটারাও রেহাই পায়নি। আর শিব-পার্বতির এই সাংসারিক কলহে মানুষের মতো দেবতারাও যে অসুখী এই ভেবে পাঠকগণ মুচকি হাসেন।

শিবের বিবাহ হল। সন্তান জন্মাল। কন্যা বিবাহযোগ্যা হল। শিব কন্যার বিবাহ স্থির করে চণ্ডীকে তার আয়োজন করতে বললে দারিদ্র্যের জন্য শিবকে কটাক্ষ করে চণ্ডী বলেছেন—

হাসি বলে চণ্ডী আই তোমার মুখে লজ্জা নাই
কিবা সজ্জা আছে তোমার ঘরে।
এয়ো আসবে মঙ্গল গাইতে তারা চাইবে পান খাইতে
আর চাইবে তৈল সিন্দুরে।।

আমরা পাঠকবর্গ ভেবেছিলাম, শিব এই সমস্যার উত্তরে কোনো সুচিন্তিত মতামত দেবেন। কিন্তু উত্তরে যা বললেন তা হাস্যকর এবং কুরুচিপূর্ণ—

হাসি বলে শূলপাণি এয়ো ভাণ্ডাইতে জানি
মধ্যে দাঁড়াব নেংটা হয়ে।
দেখিয়া আমার ঠান এয়োর উড়িবে প্রাণ
লাজে সবে যাবে পলাইয়ে।। (মনসামঙ্গল : বিজয়গুপ্ত)

নিজের দীনতাকে চাপা দিতে দেবতা যে এতটা নীচে নামতে পারে মানুষের পক্ষে ভাবা বোধ হয় একটু কঠিন।

অসঙ্গতিই হাস্যরসের যদি মূল কারণ হয় তবে সেই উপাদান অন্নদামঙ্গলে যথেষ্ট আছে। শিব ও তাঁর অনুচরদের তাণ্ডবে দক্ষমুনির যজ্ঞভূমি যখন শ্মশানভূমি হল তখন দক্ষ-পত্নীর স্বামী হারানোর কাতর বিলাপ শুনে শিব দক্ষকে বাঁচিয়ে দিলেন। তখনই এক করুণ অথচ কৌতুককর ঘটনা ঘটে গেল—

ধড়ে মুণ্ড নাহি দক্ষ দেখিতে না পায়।
উঠে পড়ে ফিরে ঘুরে কবন্ধের প্রায়।।
দক্ষের দুর্গতি দেখি হাসে ভূতগণ।
প্রসূতি বলিছে প্রভু এ কি বিড়ম্বন।।

দুই

মঙ্গালকাব্যে হাস্যরসের ধারায় দেবতাকে নিয়ে দেবতার রঙ্গারস যেমন ঘণীভূত হয়েছে, এরই পাশাপাশি দেবতা-মানুষের মধ্যে একটা হাস্যরসের বৃত্ত অঙ্কিত হয়েছে, যেখানে বৃত্তের কেন্দ্রে রয়েছে দেবতা। দেবতাদের অলৌকিক ক্ষমতাকে কটাক্ষ করেছে মানুষ। শোষণ-পীড়নের যোগ্য জবাব দিতে মানুষ দেবতার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেছে। দেবতার অসহায়তায় মানুষ নিজের দুঃখ ভুলে জয়োল্লাসে মেতে উঠেছে। ভারতচন্দ্রের অন্নদামঙ্গাল কাব্যে দেখি, শিবকে লক্ষ করে লোকসাধারণের সে এক অদ্ভুত কৌতুককর কৌতূহল—

কেহ বলে ওই এল শিব বুড়া কাপ।
কেহ বলে বুড়াটি দেখাও দেখি সাপ॥
কেহ বলে জটা হৈতে বার কর জল।
কেহ বলে জ্বাল দেখি কপালে অনল॥
কেহ বলে ভাল করি শিঙাটি বাজাও।
কেহ বলে ডমরু বাজায়ে গীত গাও॥
কেহ বলে নাচ দেখি গাল বাজাইয়া।
ছাই মাটি কেহ গায় দেয় ফেলাইয়া॥

এই শিব দেবতা নন, যেন গাজনে সঙ্-দেখানো কোনো সন্ন্যাসী। যিনি রঙ্গাতামাশা দেখাতে বেরিয়েছেন। তার দেহে জড়ানো সাপগুলো নকল নয়তো? শিব শিঙা বা ডমরু বাজাতে পারেন কিনা এই নিয়েই সাধারণের কৌতূহল। শিব সত্যিসত্যি জটা থেকে জল বের করতে পারেন কিনা কিম্বা কপালে আগুন জ্বালাতে পারেন কিনা মানুষ সেই বিষয়ে সন্দেহ প্রকাশ করেছে। দেবতাকে দেবতার ব্যঙ্গা দৈবী ধারণাকে হয়ত ততটা আঘাত করে না, যতটা করে মানুষ দেবতাকে রঙ্গাব্যঙ্গোর পাত্র হিসাবে তুলে ধরলে। লোকসাধারণ শিবকে হাসির খোরাক করে দেব-মহিমাকে মাটিতে মিশিয়ে দিয়েছে। মঙ্গালকাব্যগুলিতে মানুষকে নিয়ে দেবতারাও কম হাসাহাসি করেননি। মানুষের লোভ লালসা, সংকীর্ণ ও স্থূলবুদ্ধির পাশাপাশি দেবতার ঔদার্য্য অমলিন হাস্যরসের সন্ধান দেয়। চণ্ডীমঙ্গালকাব্যে ধনপ্রাপ্তিতে কালকেতুর সন্দিগ্ধচিত্ততা কৌতুককর। কালকেতুর স্থূলবুদ্ধির পরিচয়ে দেবী চণ্ডী হাসেন আর পাঠক হাসেন। কালকেতু বলেছে—

যদি গো অভয়া ধন নাহি দিতে পার।
এক ঘড়া ধন মাতা নিজ কাঁখে কর॥

দেবীকে দিয়ে দাসীবৃত্তি সাধনে কালকেতু হাস্যরসের উপাদানে পর্যবসিত হয়েছে।

কালকেতুর এর পরের আচরণ আরো কৌতুককর—'পশ্চাতে চণ্ডিকা যান আগে কালু যায়।/ফিরি ফিরি কালকেতু পাছুপানে চায়।।/মনে মনে কালকেতু করেন যুকতি।/ধন ঘড়া নিয়া পাছে পালায় পার্বতী।।/হাসেন জগৎ মাতা বুঝি তার মন।/না পালাইব লয়্যা তোর বাপকালি ধন।।" (চণ্ডীমঙ্গাল : মুকুন্দ চক্রবর্তী) এই আখ্যান পর্বে হাস্যরস একটি বহুমাত্রিক রূপ লাভ করেছে। এই চণ্ডীমঙ্গালকাব্যেই কৌশলে চণ্ডী গোধিকারূপে কালকেতুর গৃহে এসে সুন্দরী রমণীর বেশধারণ করলে আর এক বিড়ম্বনার সৃষ্টি হয়। দেবীকে সতীন ভেবে ফুল্লরা বারোমাসের দুঃখকাহিনি শুনিয়েছে। কিন্তু ফুল্লরার মূল অভিপ্রায় জেনে দেবীও হেসেছেন, সাথে সাথে পাঠকও। কেননা, ফুল্লরা দুঃখের কাহিনি শুনিয়ে দেবীকে ওই বাড়িতে সতীন হিসেবে আসার পথটি রুদ্ধ করতে চায়। ফুল্লরা যখন দেবীকে বলে—

দুঃখ কর অবধান দুঃখ কর অবধান।
আমানি খাবার গর্ত দেখ বিদ্যমান।।

তখন পাঠক দেখে আমানির গর্ত হাস্যরসে টইটম্বুর। তা আরো বৃদ্ধি পায় যখন দেবী ফুল্লরাকে বলেন— 'আজি হইতে মোর ধনে আছে তোর অংশ' তখন ফুল্লরার কান্না দেখে আমাদের হাসি পায়। কেননা, দেবীর আসলরূপের পরিচয় আমরা আগেই জেনেছি। অথচ ফুল্লরা ভেবেছে ঐ সুন্দরী রমণী তার স্বামীকে পুরোটাই অধিকার করে ফেলেছে। তবে ফুল্লরাকেও সে ঐ ভাগের অংশীদার করতে চায়।

অন্নদামঙ্গালকাব্যে দেবী অন্নপূর্ণা ঈশ্বরীপাটনীকে নিয়ে সূক্ষ্ম রসিকতা করেছেন তাঁর পরিচয়দানে। তার আগে দেবীকে চিনতে না পেরে আর পাঁচজন সাধারণ নারীকে রাত্রিবেলা পারাপার করতে যে সমস্যা সে কথাই বলেছে ঈশ্বরী পাটনী—

পরিচয় না দিলে করিতে নারি পার।
ভয় করি কি জানি কে দিবে ফেরফার।।

এসব ক্ষেত্রে পাঠক আগেভাগেই দেবীর পরিচয় পেয়ে যান। সেক্ষেত্রে ঈশ্বরীপাটনীর কথায় একধরনের Irony কাজ করেছে। রাত্রিবেলা যে নারীকে নিয়ে মাঝির এত ভয় তাঁর ব্যাজস্তুতিমূলক পরিচয় প্রদানে মাঝির ভয় এবং রহস্য আরো গাঢ়তর হয়েছে। 'যে মোরে আপনা ভাবে তারি ঘরে যাই'—এ মেয়ে কেমন হবে? অতএব 'পাটনী বলিছে আমি বুঝিনু সকল।' কিন্তু পাটনী যা বুঝেছে ভুল বুঝেছে, পাঠক তা ভালো করেই জানেন। এই বোঝা এবং না-বোঝার অসঙ্গাতি এক সূক্ষ্ম হাস্যরসকে আহ্বান করে।

কখনো কখনো দেবতা নিজের অসঙ্গাতির দৃষ্টান্ত দেখিয়ে মানুষকে নিয়ে রসিকতা করেছে। ধর্মমঙ্গালকাব্যে সিমুলারাজের বিরুদ্ধে বিবাহেচ্ছুক গৌড়রাজ সসৈন্যে যুদ্ধের অভিপ্রায়ে শিবির স্থাপন করলে কানড়া কাতর হয়ে পার্বতীর আরাধনা করলেন। পাবর্তী দেখা দিলে কানড়া তাঁকে বলেছে—"তবে কেন বুড়া পতি ঘটাইলে মা।" এর প্রতিক্রিয়ায়— "বসুলি বলেন বাছা শুন প্রাণ জুড়া।/কোথা পাব যুবক আপনি ভজি বুড়া।।" (শ্রীধর্মমঙ্গাল : ঘনরাম চক্রবর্তী)

দেবীর কৌতুকবহ উত্তর যুক্তিসঙ্গত। বুড়ো শিব যাঁর স্বামী তিনি কী করে অন্য নারীকে যুবক বর দিতে পারবেন! যদি যুবক বর পেতেন তবে দেবীই কী আর বুড়ো বরকে বাছতেন! দেবী রসিকতা করে একথাও হয়তো বলতে চান— তিনি দেবী, তিনি যখন বুড়ো বর পছন্দ করেছেন তখন ভাবতে হবে বর হিসেবে বুড়োরা খারাপ নয়। পুরানো চাল ভাতে বাড়ে।

মঙ্গালকাব্যগুলিতে যতই দেবতার প্রাধান্য থাকুক না কেন দেবতার খোলসের আড়ালে মানুষই বড়ো হয়ে উঠেছে। সুখ-দুঃখ, হাসি কান্না নিয়ে মানুষ স্বর্গ নয় মর্ত্যেই জীবন কাটাতে চায়। সোনার খাঁচা নয় বনের পাখির কাছে বনই সুন্দর। এই ক্ষেত্রে মানুষের সঙ্গে মানুষের একটা হাস্যরসের বৃত্ত গঠনের সুযোগ রয়ে যায়। তাই দেখি ধর্মমঙ্গালকাব্যে কালুডোমের স্বর্গারোহণের অনিচ্ছা ও তার কারণ বিশ্লেষণ হাসির খোরাক হয়েছে—

কালু কয় মহারাজ মনে অবিসার।
জিউ গেলে না ছাড়িব জেতের ব্যবহার॥
স্বর্গে গেলে সদ্য যদি মদ্য মাংস পাই।
সংসার অসার বলে তবে স্বর্গে যাই॥

কালুর এই ইচ্ছা সত্যিই কৌতুককর। মদ মাংসের জন্য তার কাছে সংসার 'অসার' হতে পারে। কিন্তু স্বর্গে যদি এই সুবিধা পাওয়া না যায় তবে স্বর্গে গিয়ে অমরত্ব লাভের বাসনা কালুর নেই—

সেন কন সুরা মাংস স্বর্গে নাই পাবে।
দরশন করিবে দেবাদিদেব দেবে॥
কালু কয় দেবদেবে মোর কিবা কাজ।
মদ্য মাংস না পেলে মাথায় পড়ে বাজ॥

(ধর্মমঙ্গাল : রূপরাম চক্রবর্তী)

দেবতা-টেবতার দর্শনলাভে যে কোনো লাভ নেই কালুর এই মানসিকতায় মর্ত্যপ্রীতি যেমন বড়ো হয়ে উঠেছে তেমনি সামান্য মদ্য মাংসের মোহে স্বর্গলাভের অনীহা পাঠকবর্গকে অনাবিল হাস্যরসে স্নাত করে। ধর্মমঙ্গালকাব্যে অলৌকিক ঘটনার সমাবেশ বেশি। নিদ্রামন্ত্রে সকলেই নিদ্রাগত হলে সেই অবস্থার সুন্দর ও সূক্ষ্মবর্ণনা দেওয়া হয়েছে ঘনরাম চক্রবর্তীর লেখায়—

পণ্ডিত পুস্তক কোলে পড়ে যায় নিদ।
পাঁদাড়ে ঘুমায় চোর ঘরে কেটে সিঁদ॥
ঘোর ঘুমে ঘরে কেহ উঠানে পিঁড়ায়।
অনাথ মণ্ডলে কত অতিথি ঘুমায়॥
কত নারী শিশুর বদনে দিয়ে স্তন।
ছায়ে মায়ে ভূমে পড়ে ঘুমে অচেতন॥

এখানে একটা মুহূর্তের চিত্র তুলে ধরা হয়েছে। ভাবলে হাসি পায় চোর চুরি করতে এসে

ঘুমিয়ে পড়েছে। পড়তে পড়তে ঘুমিয়ে পড়া অস্বাভাবিক কিছু নয়। যে যেখানে যে অবস্থায় ছিল সেই অবস্থাতেই সকলে ঘুমে অচেতন। এ যেন সত্যজিৎ রায়ের পরিচালনায় 'গুপী গায়েন বাঘা বায়েনে'র সেই দৃশ্য যেখানে গুপীর গান শুনে শ্রোতারা নিশ্চল, নিশ্চুপ।

ধর্মমঙ্গাল কাব্যের আর একটি ঘটনা বেশ হাস্যরসাত্মক। ইছাই ঘোষ নিজের বিক্রমের কথা শুনিয়ে লাউসেনকে তার কাছে ডেকে নিয়ে আসার জন্য কালুডোমকে বলেছিল। কিন্তু কালুডোম শান্তভাবে উত্তর দিয়েছিল—

কালু বলে, যদি এইখানে কাটি মাথা।
মহাশয় সহিত সাক্ষাৎ হবে কোথা।

(শ্রীধর্মমঙ্গাল : ঘনরাম চক্রবর্তী)

উক্তিটি বেশ নাটকীয়। কেননা, কালু ডোম বলতে চায়, ইছাই ঘোষকে সে যদি এখনই হত্যা করে তবে ইছাই ঘোষের সঙ্গো লাউসেনের স্বর্গ বা নরকে কোথাও দেখা হওয়ার সম্ভাবনা নেই। কেননা, লাউসেন তো জীবিত থাকবেন। কালুডোমের রসিকতাবোধ উপভোগ্য। ঘনরাম চক্রবর্তী সম্পর্কে সমালোচক যথার্থই বলেছেন— 'হাস্যরস সৃষ্টিতে স্থূল ভাঁড়ামি এবং গ্রাম্য রসিকতা নাই, স্নিগ্ধ কৌতুক-রসের ঝলক চকমকির মত হাস্যরসের আলোক বিকিরণ করিয়াছে, বিদ্রুপ অথবা ব্যঙ্গোর তীব্রতা এবং জ্বালা নাই।' (ঘনরাম বিরচিত ধর্মমঙ্গাল : পীযূষকান্তি মহাপাত্র, ক.বি., ১৯৬২)

কৌতুক বিজয়গুপ্তের লেখায় এক বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে আছে। দক্ষিণ পাটনে চাঁদ সদাগরের বাণিজ্যপ্রসঙ্গো চটের থানকে কেন্দ্র করে চটুল হাস্যরস উদ্দাম হয়ে উঠেছে। চাঁদের বক্তৃতায় বা বলা যায় Marketing-এ মুগ্ধ হয়ে রাজা রাজবেশ পরিত্যাগ করে তিনখানা চট গায়ে পরেছেন—

একখানা কাছিয়া পিন্ধে আরখানা মাথায় বান্ধে
আরখানা দিল সর্বগায়।

ভাগ্যিস রাজা চট গায়ে দিয়েছেন, আমাদের যে উলঙ্গা রাজার গল্প শুনতে হয়নি তাই রক্ষে। মঙ্গালকাব্যে পাক-প্রণালী, খাদ্যের বৈচিত্র্য ও সমাহার বেশ অভিনব। শিবের ভোজন হাস্যকর। আবার কালকেতুর ভোজনের কোনো তুলনাই হয় না। চণ্ডীমঙ্গালকাব্যে মুকুন্দ কালকেতুর ভোজনের সুন্দর বর্ণনা দিয়েছেন—

মোচড়িয়া গোঁফ দুটা বান্ধিলেন ঘাড়ে।
এক সাথে সাত হাঁড়ি আমানি উজাড়ে॥
চারি হাঁড়ি মহাবীর খায় খুদ জাউ।
ছয় হাণ্ডি মুসুরীসুপ মিশ্যা তথি লাউ॥
ঝুড়ি দুই তিন খায় আলু ওল পোড়া।
কচুর সহিত খায় করঞ্জা আমড়া॥

এখানে কালকেতুর ভোজনের চিত্রধর্মিতার বিস্ময়রস ও হাস্যরস মিলেমিশে একাকার

হয়ে গেছে। এখানে সবকিছুর মধ্যেই একটা বিরাটত্ব আছে। যেমন কালকেতুর গোঁফ এমন বড়ো যা ঘাড়ে বাঁধা যায়। আমানি, খুদ-জাউ এবং মুসুরীসুপ নিয়ে মোট সতেরো হাঁড়ি খাবার খায় সে। এছাড়াও রয়েছে কয়েক ঝুড়ি আলু, ওল, কচু, করঞ্জা আর আমড়া। সত্যিই—

শয়ন কুৎসিত বীরের ভোজন বিট্‌কাল।
ছোট গ্রাস তোলে যেন তেয়াটিয়া তাল॥

কালকেতু চরিত্রের মধ্যে যে স্থূলতা এবং গ্রাম্যতা রয়ে গেছে তা তার ভোজনের পরিমাণ ও পদ্ধতির কদর্যতার সঙ্গে মিলে গেছে। মনে একটাই প্রশ্ন জাগে কালকেতুর 'ছোট গ্রাস'কে 'তেয়াটিয়া' তালের সঙ্গে যদি তুলনা করা হয় তবে বড়ো গ্রাসকে তুলনা করার জন্য কবি তালের কতগুলি আঁটি কল্পনা করতেন?

ড. ক্ষেত্র গুপ্ত তাঁর 'কবি মুকুন্দরাম' গ্রন্থে লিখেছেন— 'চরিত্রচিত্রণেও মুকুন্দরাম কৌতুকরসকে একটি সাধারণ উপকরণ হিসেবে ব্যবহার করেছেন। বলা উচিত, ব্যক্তিগত কিংবা টাইপগত স্বাতন্ত্র্য থাকা সত্ত্বেও কবির কৌতুক দৃষ্টিপাতে প্রায় সব কটি উল্লেখ্য পাত্র-পাত্রীতে সরসতা একটা অতিরিক্ত স্বাদের কারণ হয়েছে। ভাঁড়ুর ভিলেনি, মুরারির শাঠ্য, কালকেতু বা ফুল্লরার স্বল্পবুদ্ধি অন্ত্যজ আচরণ, শিবের ভোজন লোলুপতা তথা কর্মে অনিচ্ছা—সকলই কবির কৌতুকের অংশীদার হয়েছে। এমনকি বনের ভালুক পর্যন্ত এই কৌতুক প্রসারিত।'

ভাঁড়ু দত্ত নাম শুনেই আমাদের মানসকল্পনায় এক গোপাল ভাঁড়ের চেহারার মতো ধূর্ত মানুষের আবির্ভাব ঘটে। যার অন্তঃসারশূন্য জাতকৌলীন্য এবং অর্থকৌলীন্য আমাদের হাসির উদ্রেক ঘটায়। এই ভাঁড়ু যখন কালকেতুকে বলে—

তুমি খুড়া হৈলে বন্দি অনুক্ষণ আমি কান্দি
বহু তোমার নাহি খায় ভাত।

তখন তার কপট অভিনয়ে আমরা মজা পাই। মাছের হাটে মেছেনীর কাছে ভাঁড়ুর চরম অপদস্থ হওয়াও কম কৌতুকের নয়। আবার সাঁতার না জানা ভাঁড়ু বন্যার সময় উঠানে যখন ডুবে যাচ্ছে তখন তার স্ত্রী তাকে উদ্ধার করলে ভাঁড়ু বলেছে—

উঠানে ডুবিয়া মরি না জানি সাঁতার।
জটে ধরি মাগু মোরে করিল উদ্ধার॥

যে ভাঁড়ু শঠ, প্রবঞ্চক আবার বিপজ্জনকও বটে, তার এই অসহায় অবস্থা দেখে হাসি পায়। একই ভাবে বণিক মুরারির আচরণও হাস্যকর। কালকেতুর কাছে মাংস খেয়ে ধার শোধ না করা মুরারি কালকেতুর ভয়ে পালিয়ে যেতে দ্বিধা করে না। এই মুরারিই আবার—

ধনের পাইয়া আশ আসিতে বীরের পাশ
ধায় বান্যা খিড়কীর পথে।

'পশুগণের ক্রন্দন' অংশে দুর্বলের প্রতি সবলের অত্যাচারের প্রতীকায়িত রূপ ফুটে উঠেছে। কিন্তু এই দুঃখের প্রসঙ্গে কবি হাস্যরসেরও অবতারণা করেছেন। পশুগণের দুঃখকথা

শোনার জন্য চণ্ডী বলেন—'শুনিতে কৌতুক বড় মনে।' যখন কবি লেখেন— 'হুক হুক করি কান্দে বানর মর্কটে' কিংবা—

ভূমে গড়াগড়ি কান্দে শশারু শজারু।
দুঃখ না ঘুচিল মোর সেবি কল্পতরু।।
গাড়ের ভিতরে থাকি লুকি ভালো জানি।
কি করি উপায় বীর তথি দেয় পানি।।
চারিপুত্র মৈল মোর মৈল চারি ঝি।
মাগু মৈল বুড়া কালে জীয়া কাজ কি।।

(চণ্ডীমঙ্গল : মুকুন্দ চক্রবর্তী)

তখন দুঃখবেদনার ভার অনেকটাই লঘু হয়ে যায় হাস্যরসের উদ্বেলে।

মঙ্গালকাব্যের কবিরা যে হাস্যরস সৃষ্টি করেছেন, কাব্যের ভাষা, কাব্যে ব্যবহৃত প্রবাদ প্রবচন, ধাঁধা, অলংকার প্রয়োগ অনেক সময় তার অনুকূল হয়েছে। যেমন 'শিবে অন্নদান' পালায় ভারতচন্দ্রের ভাষা ব্যবহারে দক্ষতা অসাধারণ—

পায়সপয়োধি সপসপিয়া।
পিষ্টক পর্বত কচমচিয়া।।
চুকু চুকু চুকু চুষ্য চুষিয়া।
করে করে চর্ব্ব্য চিবিয়া।
লিহ লিহ জিহে লেহ্য লেহিয়া।
চুমুকে চকচক পেয় পিয়া।।

এই ভাষা প্রয়োগ চোখের সামনে এক চিত্র ফুটিয়ে তোলে তাতে আমরা শিবের 'চর্ব্য, চোষ্য লেহ্য পেয়' পদ্ধতিতে পরম তৃপ্তি সহকারে খাওয়ার দৃশ্য দেখতে পাই এবং খাওয়ার শব্দও আমাদের কানে আসে।

অনেকে ভারতচন্দ্রের হাস্যরসের মধ্যে অশ্লীলতার গন্ধ পান। এজন্য অবশ্য তাঁকে অভিযুক্ত করা যায় না। দরবারের শ্রোতাদের চাহিদা মেটাতে ভারতচন্দ্রকে কোথাও কোথাও অশ্লীলতার আবহ তৈরি করতে হয়েছে। তবে এই বিষয়ে 'ভারতচন্দ্রের অন্নদামঙ্গাল' গ্রন্থে সঠিক মন্তব্য করেছেন ব্রজেন্দ্রচন্দ্র ভট্টাচার্য— 'মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্রের রাজপ্রাসাদে সকলেই আদিরসের প্লাবনে গা ভাসাইয়া মহানন্দে নিমগ্ন থাকিতেন। ভারতচন্দ্র ছিলেন এই আনন্দবাজারের একজন প্রধান হোতা। কিন্তু তবু আমরা বলিব যে, আদিরস ভারতচন্দ্রের কাব্যের অঙ্গীরস হইলেও মুখ্যরস নহে। তাঁহার কাব্যের সর্বত্র এক অন্তর্লীন কৌতুকরস আদিরসকে প্রাধান্য বিস্তার করিতে দেয় নাই।'

স্মার্তব্যবস্থা ও বাঙালির জীবনশিল্প মঙ্গলকাব্য

অর্জুনদেব সেনশর্মা

হিন্দুবাঙালির জীবন স্মৃতিতন্ত্রে পূর্ণবৃত্ত। স্বাভাবিকভাবেই স্মৃতি বলতে এখানে স্মৃতিসংহিতা, মহাভারতাদি ইতিহাস, পুরাণ এবং স্মৃতিনিবন্ধকে বোঝানো হয়েছে। তন্ত্রের সাধনা, দর্শন ও আখ্যান-এর থেকে পৃথক একটি ধারা।

'লৌকিক' শব্দটিকে আমরা অস্পষ্টতার জন্য বর্জন করেছি। কারণ শ্রুতির তুলনায় স্মৃতি লৌকিক। আবার স্মৃতির বিপরীতে তন্ত্র— 'ব্রাত্য' ধারা বা মুনিপন্থীয় ধারা বলে স্বাভাবিকভাবেই 'লোকায়ত'। তন্ত্রও সম্পূর্ণ বেদবাহ্য নয়, অন্তত যে বৈদিকীস্মৃতিতে 'পুংসবণ' সংস্কার সেখানে 'তন্ত্র'-কে পূর্ণত অবৈদিক বলতে বাধা আছে। পরে দেখব, তান্ত্রিক সাধনাই শুধু নয়, আখ্যানের বীজও শ্রুতিসাহিত্যে বর্তমান। পুনশ্চ মনে রাখতে হবে, 'লোক' এবং 'জনপ্রিয়', 'Folk' এবং 'Popular' এই দুটি পর্যায়শব্দ নয়। যদি বিভিন্ন প্রান্তিক জনজাতির ধর্মটাকে 'লৌকিক' বলা হয় তবে সেগুলি যখন একশো কোটির দেশে এক কোটির জীবনেও গৃহীত হয়, তখন কাকে 'লৌকিক' বলব? ঐ এক কোটিকে না ঐ 'উপজাতি'-কে। এককোটির ধর্ম কি লোক-ধর্ম হবে? যদি হয় তবে ঔপজাতিক ধর্ম তাতে প্রবেশ করলে 'লোক-ধর্মে'-র 'লোক ধর্মে' প্রবেশ বলা যাবে? নিশ্চয়ই না। তখন এক কোটির ধর্মাচারকে কী বলব? জনপ্রিয় ধর্মভাবনা তো আসলে তার পূর্বপূর্ব যুগে কোনো ধর্মদর্শনের অবশ্যম্ভাবী বিবর্তিত রূপের সঙ্গে বিভিন্ন বাহ্যধর্মের মিলনেই তৈরি হয়েছে। তাই 'লোকধর্ম' না বলে আমরা 'ঔপজাতিক ধর্ম' এই শব্দবন্ধটি ব্যবহার করেছি। এই ঔপজাতিক ধর্মগুলির, যদি দর্শন থাকে (ক্ষিতিমোহন সেনের মতো আমরা যোগ, ভক্তি, তন্ত্রকে অবিচারে সবই অনার্য বলতে পারছি না। ক্ষিতিমোহনের যুক্তিটা ছিল সম্ভবত— যেগুলি শঙ্কর-অনুমোদিত নয় সেগুলিই অনার্য। কিন্তু অ-শাঙ্কর মানেই 'হয়ত' অনার্য নয়। পাণিনি বহু লোকব্যবহারের উদাহরণ দিয়েছেন। সেগুলিই অনার্য নয়। মূল ধারার বিরোধী।) যদি তা আদিমস্তরের 'সর্বপ্রাণবাদে'র মতো কোনো ভাবনাও হয়, সেই দর্শন ও রিচ্যুয়াল শ্রুতি-স্মৃতি ও তন্ত্রে বুদ্ধপূর্ব যুগ থেকেই প্রবিষ্ট হয়েছে। সেগুলিকে— মূল ধারা দুটি নিজেদের দর্শনপোষিত কৃত্যমালায় স্থান দিয়েছে। সেগুলিকে চেনবারও উপায় আছে। ঔপজাতিক ধর্মদর্শনের হিন্দু মূলধারায় (অসমসত্ত্ব হলেও আধিপত্যকারী ধারায়) প্রবেশের চিহ্ন খুঁজতে গেলে একটি পথ হতে পারে, স্মার্ত বা তান্ত্রিকী সাহিত্যে

কোনো কৃত্য বা আচারের প্রমাণ। নিবন্ধে যার অন্য শাস্ত্রপ্রমাণ উল্লিখিত নেই— তা ঔপজাতিক। যদি প্রমাণ থাকে, সেই প্রমাণের প্রামাণিকতা বিচার করতে হবে, 'প্রমাণের' সময় খুঁজতে হবে। দার্শনিকভাবে সেই রীতিটি যদি স্মার্ত, তান্ত্রিকী ধারার বিরোধী হয় এবং অন্য উপজাতি স্তরে তা বিদ্যমান থাকে (যার সম্ভাবনা কম, কারণ কৃত্যর অনুপ্রবেশের সঙ্গে সঙ্গে, স্মার্ত কাঠামোয় অন্য সমানধর্মা উপজাতিগুলিও সমান্তরাল কাঠামোয় অন্তর্ভুক্ত হয়ে বিবাহাদির দ্বারা মিশ্রিত হয়ে যেতে পারে।) তবে— স্মার্ত বা তান্ত্রিকী নিবন্ধের প্রাচীনতম প্রমাণের পূর্বে যে ঐ ঔপজাতিক ধর্ম মূলধারায় অন্তর্ভুক্ত হয়েছিল, তার উৎস খুঁজতে স্মৃতিনিবন্ধগুলির আঞ্চলিক রূপান্তরগুলিকে ধরেও কাজ করা যেতে পারে।

সাধনদর্শনের দিক থেকেও তান্ত্রিক সাধনার গোপনীয়তা রক্ষার দায় ছিল। অধিকাংশ ঐতিহাসিক গোপনীয়তার শর্তকেও 'লৌকিক'-এর চিহ্ন বলে ধরেন। মনে করেন তা বুঝি নিম্নবর্গীয় গৌণধর্মাচারীদেরই একচেটিয়া গুপ্ত অভ্যাস। না তাও নয়। আভিজাত্যের ধর্মই বরঞ্চ 'জনসংঘ বিভীষিকা মোর।' সবাই যা বলেন— অভিজাত মনু অ-'লৌকিক'। সেই অ-'লৌকিক' মনুও 'শূদ্র'-কে 'বেদার্থ'মতি দিতে চাননি। অ-লৌকিক ব্রহ্মসূত্রকার তো শূদ্র কর্ণবিবরে সিসেগালার পরিপূরণ দিতে খুব আনন্দ পান। নাগরিক জীবনের প্রতিনিধি বাৎস্যায়ন সুহৃদগোষ্ঠীর বাহিরে নাগরিকজনের মেলামেশা পছন্দ করতেন না। তেমনি সাধনার ভিতর দিকের বিশুদ্ধি রক্ষার দায় শুধু স্মার্তদেরই নয় তান্ত্রিকদেরও যথেষ্ট, এমনকী কিঞ্চিৎ বেশি ছিল। পূর্ণাভিষেকের আগে পর্যন্ত তান্ত্রিকী সাধনায় প্রবেশ সরল কিন্তু 'বিদ্যা' মাতৃজারবৎ গোপনীয়। এই গোপনীয়তা তাঁরা রক্ষা করতেন কীভাবে? বিখ্যাত তন্ত্রবচন— 'নানারূপধরাঃ কৌলাঃ বিচরন্তি মহীতলে/অন্তর্শাক্তাঃ বহির্শৈবাঃ সভায়াং বৈষ্ণবমতাঃ।' বিষ্ণুআরাধনাকারীরা নিবৃত্তিমূলক স্মার্ত বিধিগুলি সবথেকে বেশি অনুসরণ করেন তা বলাই বাহুল্য। ঠিক এই যুক্তিতেই মঙ্গলকাব্যে স্মার্ত মুখোশ পরানো আছে। তাতে হিন্দু বাঙালি জীবনের একটা সামাজিক ছায়া থাকতে পারে, অনুবৃত্তির কারণে কবিরা সেই বর্ণনাকে পল্লবিতও করতে পারেন। স্মার্তধর্মে মনসা-চণ্ডীর ব্রতকৃত্যের বাড়বাড়ন্তের সময়ে, সেই ব্রতকৃত্যগুলির মধ্যেই যে তন্ত্রের একটা বড়ো প্রভাব আছে, কবিরা তা কতটা মনে রেখেছিলেন তা নিশ্চয় করে বলা যায় না। কিন্তু পুরাণের সঙ্গে মঙ্গলকাব্যর বাহ্য কিছু মিল থাকলেও একটি গূঢ় পার্থক্য ছিল। বাংলাদেশের মধ্যযুগে ঢুকে গিয়ে পুরাণ শিষ্ট রাজসভাশ্রিত মুসলিম প্রশাসকরা ভাগবতের পোস্টা, মহাভারতের শ্রোতা। রামায়ণও অংশত তাই। মহাভারত,, ভাগবত মুসলিম রাজারা শুনেছেন, যবন হরিদাস বৈষ্ণব সাধনাচারে মাহাত্ম্য লাভ করেছেন, মুসলিম কবিরা বৈষ্ণবপদাবলী লিখেছেন। মঙ্গলকাব্যর ধারায় অন্তত কবিকঙ্কণ, ভারতচন্দ্রর পোস্টা স্থানীয় হিন্দু করদ ভূস্বামী বা রাজা হলেও শ্রোতা মূলত হিন্দু প্রকৃতিপুঞ্জ। তবে বিষবৈদ্যরাও মনসামাহাত্ম্য সূচক বিষনামানোর মন্ত্র ব্যবহার করেছেন, মুসলিম লেখকরা তার সম্পাদনা করেছেন। চণ্ডীমঙ্গল, মনসামঙ্গাল, ধর্মমঙ্গাল পাঠ চণ্ডী-মনসা-ধর্মর পূজা আনুষ্ঠানিকভাবে হিন্দু পূজাবিধির সঙ্গে যুক্ত ছিল। যদিচ তাতে মুসলিম প্রকৃতিপুঞ্জের অংশগ্রহণে না হলেও, উপস্থিতিতে বাধা ছিল না। চণ্ডী-মনসার

পূজারীতিটি যথাসম্ভব তন্ত্রগর্ভিত স্মার্ত, ধর্মদেবতার ক্ষেত্রেও বৌদ্ধ-স্মার্ত মিশ্রণ আছে। মনসার স্মার্ত পূজাবিধি-অর্বাচীনতম ব্যাড়ীভক্তিতরঙ্গিণী, চণ্ডীমঙ্গালের মঙ্গলচণ্ডী পূজাবিধি রঘুনন্দন প্রণোদিত কালিকাপুরাণ অনুসারী আর ধর্মপূজাবিধিতে বৈদিকধ্বংসাবশেষ প্রকটিত। অর্থাৎ আখ্যানগুলি যদি তান্ত্রিক হয়, বাহ্যপূজাবিধিটিতে অ-তান্ত্রিকী আখ্যানে যুক্ত হয়নি, (চণ্ডীমঙ্গালের বণিকখণ্ডের আখ্যান তন্ত্রের প্রাথমিক স্তরের নয়, ধর্মমঙ্গালের তো নয়ই)। বাহ্যপূজাবিধিটি বাহ্যত অ-তান্ত্রিক হওয়ায় স্মার্তপ্রধান সাধনধারায় তাকে আত্মসাৎ করার একটা প্রবণতা থাকতে পারে বলে আমরা মনে করি। এও এক বহুকালের ধারা। তান্ত্রিকী পুরাণগুলিতে এই ধারা প্রায় খ্রিস্টীয় ৭ম-৮ম শতক থেকে শুরু হয়ে গেছে। স্মার্তপূজাবিধিতে ও তান্ত্রিকীপূজাবিধিতে বাহিরের স্তরে সাদৃশ্যও আছে। শ্যামাচরণ কবিরত্ন ও জগন্মোহন তর্কালঙ্কার— দুই ধারার দুই মান্য পদ্ধতিকার ও সাধকের গ্রন্থ পাশাপাশি রাখলেই তা বোঝা যাবে।

ঠিক এই কারণেই, আমাদের ধারণা মঙ্গালকাব্যকেও একটা গতানুগতিক স্মার্তরূপকে আশ্রয় করতে হয়। তবে সেইজন্যই মুকুন্দ নিজের ব্রাহ্মণ্যাদর্শে কালকেতুর জীবনের ধারাকে ব্রাহ্মণ্যসংস্কারকর্মের বাঁধা গতে ফেলে দিয়েছেন বলে সমস্যার সমাধান হয় না। সৎশূদ্রদের তো বটেই মধ্যম বা অধম সঙ্করদের বা অন্ত্যজগোষ্ঠী যারা ব্রাহ্মণ্যসংস্কৃতির নিজের থাকে বিন্যস্ত হচ্ছিল, তাদের জীবনে সংস্কার চালু হয়ে যাচ্ছিল দ্বাদশ শতকের আগে থেকেই, তা আমরা দেখেছি। মুকুন্দর বয়ানে সোমাঞি পণ্ডিতকে সঞ্জয়কেতু (সেও চুয়াড়) বলে ‘সপ্তমপুরুষে তুমি মোর পুরোহিত’। তাহলে সঞ্জয়কেতুর সাতপুরুষ আগেই যে ব্রাহ্মণপুরোহিতের আচারাধীনে সঞ্জয়কেতুরা অন্তর্ভুক্ত হয়েছিল তার একটা খবর পাওয়া যাচ্ছে। কিন্তু স্মার্তসংস্কারে থাকবন্দি হওয়ার কোনো কারণ সঞ্জয়কেতুর থাকলেও কালকেতুর ছিল কি? যে ষড়ৈশ্বর্যময়ী চণ্ডীর অঙ্গুলিহেলনে সবই হতে পারে, তার ব্রতদাস কালকেতু পরে তারই প্রতিষ্ঠিত চণ্ডীর মন্দিরে পুরোহিত পাওয়ার সমস্যায় ভোগে কেন? বলা যেতে পারে— ভোগে না। চণ্ডীই তো পুরোহিত যুগিয়ে দেন। প্রশ্ন হল— এতো খুবই স্বাভাবিক— চণ্ডী স্বপ্নাদেশে পুরোহিত যুগিয়েই দেবেন— এবং নিম্নশ্রেণির ব্রাহ্মণ নয়— উচ্চশ্রেণির ব্রাহ্মণই, কিন্তু এই ব্রাহ্মণ পাওয়া যাবে কিনা— এই প্রশ্নটাকে বয়ানে ঢোকানো হল কেন? আমাদের মতে কালকেতুর আখ্যানের মধ্যে যে অভিনবত্ব আছে— তাকে ঢেকে দেওয়ার জন্যই। এইবার আমরা বলতে পারি যে— সে অভিনবত্ব যদি কিছু থাকে— তবে তার ঢাক্না খোলার আগে ঢাকনাটার রূপটাও জেনে নেওয়া ভালো :

‘হিন্দুসমাজে স্মৃতিশাস্ত্রের স্থান বুঝিতে না পারিলে তাহার ইতিহাস বা হিন্দুজাতির ইতিহাস বুঝিবার চেষ্টা করা বৃথা।

প্রথমে বৈদিকধর্ম ও লোকধর্ম পৃথক ছিল। মহাভারতে লোকাচারের উল্লেখ আছে। কিন্তু স্মৃতির উল্লেখ নাই। লোকাচারের ‘লোক’ বলিতে কাহাকে বোঝায়? লোকযাত্রা-নির্বাহক শাস্ত্রও বোধ হয় ছিল। ব্রাহ্মণের চক্ষে এ সকল শাস্ত্র নিষ্প্রয়োজন। দেশাচার রক্ষাই ব্রাহ্মণের প্রধান কর্ম হইল।

স্মৃতির যুগে ব্রাহ্মণগণ শূদ্রদিগকে যে স্থান দিয়াছিলেন, শূদ্রেরা সেই স্থান চিরদিনই অধিকার করিয়া রাখিয়াছিল। মাঝে মাঝে সংস্কারের চেষ্টা হইয়াছে—। কিন্তু কোথাও কোনো স্থায়ী ফল হয় নাই। শ্রীচৈতন্যদেব বাঙ্গালী 'জাতি' সৃষ্টি করেন। তাঁহার ভক্তি-জীবনদর্শনের ফলে বাঙ্গালা ওড়িষ্যা আসাম বৈষ্ণবধর্মে দীক্ষিত হয়। জাতি গঠনে তাঁহার স্থান অদ্বিতীয়। পাতঞ্জলপন্থী যোগিগণ ব্রাহ্মণ্যধর্মে না মিশিয়া বৈষ্ণবধর্মে আশ্রয় পাইলেন। (ধর্মমঙ্গালের সূত্র-মন্তব্য আমাদের)

জাতিগঠনে সকল দেশে ধর্মই প্রধান উপাদান। বাঙ্গালাদেশে এক ধর্ম হইলেও সামাজিক বৈষম্য শেষপর্যন্ত উঠিল না।

বর্তমান ব্রাহ্মণ্য সমাজনীতি স্মৃতিযুগ হইতে শুরু হইয়াছে। ব্রাহ্মণ অনুশাসন... লঙ্ঘন করিবার ক্ষমতা বাঙালীদের কখনও হয় নাই।... ব্রাহ্মণের আজ্ঞাপালন শ্লাঘার বস্তু... পৌরাণিক ধর্মই আচরণীয়।' —ড. পঞ্চানন মণ্ডল, চিঠিপত্রে সমাজচিত্র, প্রথম খণ্ড অপরার্ধ, বিশ্বভারতী, ১৯৮৫, পৃ. ৩১১।

এই আচরণীয় পৌরাণিক ধর্মের অন্তরালে কী কী স্রোত কীভাবে আত্মগোপন করল তার উন্মোচন করতে গেলে পূর্বে ঐ আচরণীয় ধর্মটির স্বরূপ দেখে নেওয়া প্রয়োজন।

কোনো একটি প্রতিষ্ঠিত মূল্যবোধ সমাজে ছড়িয়ে পড়বার সবথেকে বড়ো মাধ্যম হল শিক্ষাব্যবস্থা। শিক্ষাব্যবস্থা যেমন প্রতিষ্ঠিত শক্তির নির্দেশ অনুসারে চলে, তেমনি প্রতিষ্ঠিত স্বার্থের ক্ষমতায়ন ও তার পৃষ্ঠপোষণাতে পুস্ট হয়। এইজন্যই মঙ্গালকাব্যগুলির স্মার্তমূল্যবোধের আবহাওয়া মঙ্গালকাব্যের নায়কদের লেখাপড়ার সূত্রে বুঝে নেওয়া যেতে পারে।

বিপ্রদাসের মনসাবিজয়ে লখিন্দরের হাতেখড়ি অনুষ্ঠান হয়েছিল। যদিও 'বিদ্যারম্ভ' কোনো সংস্কার নয়, তবু রঘুনন্দনের আগে থেকেই তা প্রচলিত। 'তিথিতত্ত্বে' রঘুনন্দন 'বিদ্যারম্ভ'-র উল্লেখও করেছেন। সে অক্ষর, ফলা, ধাতুর প্রাথমিক পাঠ নিয়ে, সংস্কৃত কাব্য, নাটক, জ্যোতিষ, পুরাণ প্রভৃতি চৌষট্টি বিদ্যা শিখেছিল উপাধ্যায়ের কাছে। গুরুত্বপূর্ণ অংশটি এই যে—

> অলঙ্কার কুমার পড়িল অভিধান
> জ্যোতিষ নাটক কাব্য পড়িল বিধান।
> অষ্টাদশ পুরাণ পড়িয়া অনিবার
> হইল পণ্ডিত বড়ো রাজার কুমার।।[১]

প্রথমে লক্ষণীয় যে সে দর্শন পড়েনি। অর্থাৎ দর্শন পড়তে গেলে সাক্ষাৎ শ্রুতিবাক্য গুরুগৃহে পাঠ করতে হত। শূদ্রসন্তান লখিন্দর স্বাভাবিকভাবেই তার বাহিরে। স্মৃতিশাস্ত্রও সে পড়েনি। স্মৃতি ও ন্যায় মধ্যযুগে মূলত ব্রাহ্মণেরই একচেটে ছিল। স্মৃতি পড়তে গেলেও বেদার্থবিচারজ্ঞান লাগে। কিন্তু পুরাণ? বাংলাদেশের হিন্দু ব্রাহ্মণের পুরাণ নিয়ে অবস্থানটা চিরকালই দ্বিধান্বিত। একদিকে ইতিহাস পুরাণের বিষয়েও পুরাণসূত্র আদেশ[২] আছে— যা তা কেবল 'শ্রোতব্য', কদাচ 'অধ্যেতব্য' নয়, অন্যত্রও বলা হয়েছে— 'ভাষায়াং মানবং

শ্রুত্বা রৌরবং নরকম্ ব্রজেৎ' তবে লখিন্দর পুরাণ পড়েই বা কেন আর ভাগবত-মহাভারতের অনুবাদ হয়ই বা কী করে?

আসলে 'ব্রহ্মসূত্র'-এর 'অপশূদ্রাধিকরণ'-এর ব্যাখ্যায় স্বয়ং শঙ্কর ইতিহাস-পুরাণে শূদ্রাধিকার স্বীকার করে নিয়েছিলেন। ঐ অংশের ভাষ্যে শঙ্কর লিখেছেন— 'শ্রাবয়েৎচতুরোবর্ণান্' (মহাভারত শাঃ ৩২৭/৪৯) ইতিচ ইতিহাস পুরাণাধিগমে চাতুর্ব্বর্ণস্য অধিকারস্মরণাৎ।'[৩] এইবার দেখা যাক শঙ্করভাষ্য প্রমাণে মহাভারত শ্লোকটি কী? 'শ্রাবয়েচ্চতুরোবর্ণান্‌কৃত্বা ব্রাহ্মণমগ্রতঃ' অর্থাৎ 'ব্রাহ্মণকে পুরোভাগে স্থাপন করে শূদ্রও পুরাণ শুনতে পারবেন।' কীভাবে শুনবেন? স্বরাদিরহিত ভাবে। তদুপরি ব্যাসসংহিতা বলছেন— (১। ৫-৬)[৪] 'শূদ্র চতুর্থবর্ণ ধর্মে অধিকারী, বেদমন্ত্র, স্বধা, স্বাহা, বষট্‌কার বিনা ধর্মে।' বেদমন্ত্র বাদ দিয়ে দিলে স্মার্তকর্মে তার অধিকার থাকে। এখন ভবিষ্যপুরাণ বলেছেন যে পুরাণপাঠে শূদ্রের অধিকার নেই, তাহলে তার সঙ্গে ব্যাসসংহিতার বিরোধ হয়। যেহেতু পুরাণে ও স্মৃতিতে বিরোধ হলে, স্মৃতিই বলবত্তর, এবং হিন্দু বাঙালি শূদ্রের স্মার্তকর্ম করার জন্যে পুরাণপাঠ অনিবার্য হয়ে পড়ে, সুতরাং লখিন্দরের পুরাণপাঠ নিষিদ্ধ করা যায় না। ব্রাহ্মণ-উপাধ্যায় অগ্রে স্থাপন করে অর্থাৎ গুরুগৃহে সে 'স্বরাদিরহিত' অর্থাৎ বিনা লঘুগুরু ছন্দে সে পুরাণ পড়তেই পারে। এছাড়াও 'পড়িল বিধান' অংশটিও গুরুত্বপূর্ণ। 'স্মৃতি' শূদ্র পড়ত না ঠিকই। কিন্তু 'বিধান' তার একটা সার। পুরো স্মৃতি না পড়ালেও একটা সার মনে হয় পড়ানো হত। কারণ দণ্ড প্রায়শ্চিত্ত অনুযায়ী তো সমাজ চলবে।

সুধীভূষণ ভট্টাচার্য সম্পাদিত দ্বিজমাধবের 'মঙ্গলচণ্ডীর গীত'-এ জনার্দন পণ্ডিতের কাছে শ্রীমন্তর বিদ্যারম্ভের বর্ণনা আছে। জনার্দন পণ্ডিতের কাছে সে মন দিয়ে সংস্কৃত পড়েছে। কেন?

চণ্ডিকার ব্রত হেতু পড়িল সকল ধাতু
দীপিকায়ে জানিল কারণ
ষত্ব ণত্ব জ্ঞান হয়ে সংস্কৃতে কথা কহে
পারগ হইল ব্যাকরণ।

(সুধীভূষণ ভট্টাচার্য, মঙ্গলচণ্ডীর গীত, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯২৫, পৃ. ২৩৮)

সংস্কৃত না জানলে স্মার্ত বা তান্ত্রিকীকৃত্য দুই-ই অসম্ভব। রাজকর্মের জন্য সংস্কৃতের আর প্রয়োজন নেই, বাংলা ভাষাশিক্ষার তো প্রশ্নই ওঠে না— ধর্মকৃত্য নির্বাহই শূদ্র সন্তানের শিক্ষারম্ভের প্রথম ধাপেই গুরুত্ব পেয়ে যাচ্ছে। এইজন্যই আমরা হিন্দু বাঙালির জীবনটাকে হিন্দু বাঙালির ধর্মজীবন বলছি।

কবিকঙ্কণের চণ্ডীমঙ্গালে আমরা সেইযুগের সমাজ ও শিক্ষার পূর্ণ প্রতিফলন পাই। প্রাথমিক অক্ষর পরিচয়ের পরে—

পড়ে দত্ত শ্রীয়পতি সন্ধিমূল সন্ধিবৃত্তি
রাত্রিদিন করএ ভাবনা

নিবিষ্ট করিআ মন লিখে পড়ে অনুক্ষণ
বিদ্যা বিনা নহে অন্যমনা।
পড়িল ব্যাকর্ণটিকা গণবৃত্তি সমাসিকা
অমর জুমরবর্ণ নানা
জানিতে সন্ধির তত্ত্ব পড়িল উজ্জ্বল দত্ত
ছন্দ পড্যা মানিল মাননা।
পড়িল দুর্ঘট বৃত্তি ধীর সভায় চক্রবর্তী
নিরন্তর করেন বিচার
দিবা নিশি যত্নবান পড়ে ভট্টি অভিধান
পুথি শোধে বিবিধ প্রকার।
ক্ষুদ্রকাব্য পড়ি দ্রুত মাঘ পড়ে মেঘদূত
নৈসধ কুমারসম্ভবে
দিবানিশি নাহী জানি পড়ে রঘু স্বেত বেনি
ভারবি উদ্ভট জয়দেবে।
কাব্যপ্রকাশ পড়ি অভ্যাস করিল বড়ি
রত্নাবলী সাহিত্যদর্পণে
কাদম্বরী আখ্যায়িকা পড়ে নানাশাস্ত্র টীকা
প্রসন্ন রাখব (রাঘব) রামগুণে।
পড়িল বামন দণ্ডী কবির কবিত্ব খণ্ডি
নানা ছন্দে পড়িল পিঙ্গাল
করি দ্রড় অনুরাগ পড়িল ভারবি মাঘ
বন্ধুজনের বাড়ে কুতূহল।
অব্যাহত বুদ্ধিগতি পড়ে বালা সপ্তশতী
পড়ে মুদ্রা মুরারি মালতী
হিত উপদেশ কথা পড়িল বাসবদত্তা
কামশাস্ত্র দীপিকা ভাস্বতী।
বৈদ্যের বৈদ্যক জত বিশেষ কহিব কত
একে একে পড়িল শ্রীপতি—[৫]

না, এই তালিকায় কাব্য, কাব্যশাস্ত্র, কামশাস্ত্র, বৈদ্যশাস্ত্র থাকলেও— স্মৃতি, ন্যায়, ইতিহাস (মহাভারত), পুরাণ নেই। কিন্তু কাব্য পড়তে গিয়ে তো সে নানা শাস্ত্রটীকা পড়েছে। সুতরাং ইতিহাস পুরাণও জানতে হয়েছে। এই অবধি সে গুরু মুখে পড়েছে। আর গুরু তাকে পড়াননি, কিন্তু সে শুনে শুনে আরো শিখেছে— 'বেদবিদ্যা আগমপুরাণ।'[৬] তার পরে তার স্মার্তনীতিবোধকে খণ্ডন। সেখানে অত্যাশ্চর্য ঘটনা ঘটেছে। পূর্বপক্ষগুলি মোক্ষম। অজামিল বেশ্যাসঙ্গামে, পূতনা কৃষ্ণকে গরল দানেও কেন স্বর্গ পেল? শূর্পনখা আত্মদানের জন্য এসে তার নাক-কান কোন্ বিচারে কাটা গেল? শূর্পনখার ক্ষেত্রে শূর্পনখা আত্মদানের জন্য এসেছিল না কামেচ্ছা চরিতার্থ করতে এসেছিল— সে প্রশ্ন গুরু করতে পারেননি,

কিন্তু কামার্থিনী স্বেচ্ছাবিহারিণীকে প্রত্যাখ্যান করতে নাক-কান কেটে দেওয়ার বিধান তো কোথাও নেই। শ্রীপতির প্রশ্নের সমাধানে গুরুর একমাত্র উত্তর 'ঈশ্বরেচ্ছা'। এই ঈশ্বর-বিশ্বাসের জন্যই নিরীশ্বর সাংখ্যদর্শন একদিন সেশ্বর হয়েছিল। ব্রহ্মে পাকাপোক্ত বিশ্বাস থাকার জন্যই শঙ্কর ব্রহ্মসূত্রভাষ্যে ন্যায়দর্শনকে যথাসাধ্য এড়িয়ে গেছেন। এইজন্যই আমরা গবেষণাপত্রের পূর্বঅধ্যায়ে সংস্কৃতির ইতিহাসে 'Religious belief'-এর সূত্রটি সংযোগ করতে চেয়েছিলাম। যাইহোক শ্রীপতির অতি উদ্ধত প্রতিপ্রশ্ন— 'কেন বা প্রভুর ইচ্ছা হব অনুচিত।' না, এই প্রশ্ন প্রণিপাতের দ্বারা সেবার দ্বারা ঋদ্ধ পরিপ্রশ্ন নয়। এর পিছনে স্মার্তব্রাহ্মণ্যবাদের ভিত কাঁপানো প্রশ্ন আছে। তাই-ই এর উত্তর আর গুরু বিস্তার করতে পারেননি, সোজা শ্রীপতিকে অনধিকারী বলে দেগে দেওয়া হয়েছে। পিতা প্রবাসে থাকায় দুর্বাগোত্রীয় দত্তবংশীয় বানিঞার যে ধর্মশাস্ত্রের চর্চায় অধিকার নেই— তার প্রচার এবং গুরু শূদ্রকে পুরাণ পড়ান না বলেই নাকি এত অপমান। কার থেকে? বড়োলোকের ছেলের থেকে অপমান? —যে তাকে 'পঞ্চাশ কাহন কড়ি মাসে মাসে' দেয়। তাই তাকে একেবারে 'জারুয়া' (জারজ) বলে গাল দেওয়া।

প্রথমত এই অংশে বোঝা যায় চতুষ্পাঠীতে প্রত্যক্ষত গুরুমুখে না হোক, উপস্থিতির দ্বারা পরোক্ষত শূদ্রসন্তানও ধর্মশাস্ত্রের পাঠ নিত। এবং সেই শূদ্রসন্তান স্মার্তনীতিশাস্ত্রকে প্রতিস্পর্ধী প্রশ্নও করতে পারত। তাতে স্মার্তসমাজের ভাঙন ধরছিল কি? সুকুমার সেন সংস্করণে সপ্তম দিবস দিবাপালায় ৩৯৯ শিকলিতে শ্রীপতি জানায় গুরু তাকে বলেছেন— 'মিছা হিন্দুকুলে উতপতি'।[৭] এতো হিন্দুকুল থেকেই বার করে দেওয়ার ফতোয়া। কেন না তার প্রশ্ন সংশয়ীর প্রশ্ন।[৭ক] কিন্তু শ্রীপতি কি ঈশ্বরে অবিশ্বাসী? না, তা নয়। কেউ বলতে পারেন এই সংশয়ীকে ধর্মবিশ্বাসী করার জন্য চণ্ডীমঙ্গালের উদ্‌যোগ। না, একেবারেই তা নয়। শ্রীপতি স্মার্তনীতিবোধকে অস্বীকার করছে অন্য কোনো একটা সাধনমার্গের নীতিবোধের সামর্থ্যে। তাকে প্রতিষ্ঠা করবার জন্যই এই উদ্‌যোগ, স্মার্তনীতিবোধের ব্রাহ্মণ আধিপত্য সেখানে কিয়দংশে বারিত হয়েছে।[৮] নীতিশাস্ত্র যেখানে শাস্ত্রার্থ নির্গলিত করতে পারে না (লক্ষণীয় শ্রীপতির প্রশ্নগুলি রামায়ণের ও ভাগবতের ওপর। রামায়ণ মহাকাব্য মাত্র নয়— প্রস্থানত্রয়ের অন্তর্গত।) সেখান থেকেই রহস্যবিদ্যা শুরু হয়। দনাঞি শিক্ষাগুরুর রহস্যবিদ্যায় অধিকার ছিল না। তাই রামায়ণ ভাগবতের নীতিকূটের সমাধান তিনি করতে পারেননি। আর আমাদের বিচারে এই প্রশ্নত্রয়ের মধ্যেই 'কমলে-কামিনী'-র সূত্রপাত হল। যিনি করীকে জন্ম দেন, প্রকাশ করেন, খামোখা তিনিই তাকে গ্রাস করেন কেন?

অন্যদিকে ১৭৬৬ খ্রিস্টাব্দ নাগাদ রচিত রামানন্দ যতির চণ্ডীমঙ্গালে এই সব তর্ক-প্রতিতর্ক নেই। রামানন্দ যতির বয়ান বৈদান্তিক রামানন্দর উদ্দেশ্যপ্রণোদিত। এদিকে মুকুন্দের কাব্যেও শ্রীপতির মতো গন্ধবণিকের সন্তানেরা অত কাব্যশাস্ত্র ও পরোক্ষে ধর্মশাস্ত্র পড়ত কিনা তার বাস্তব ইতিহাস জানি না। ড. পঞ্চানন মণ্ডল বলেছেন[৯]— শূদ্র গুরুদের পাঠশালায় নানা উপবর্গের শূদ্রসন্তানরা বাংলা, কিছু আরবি ফারসি আর আঁককষা শিক্ষা করত। শ্রীপতির পাঠতালিকা যদি মাধবাচার্য বা মুকুন্দের পূর্বানুবৃত্তির ফলও হয় তবু তার

থেকে স্মার্তধারাটা যেমন চেনা যায়, তেমনি পরিপ্রশ্নগুলিও যে সমাজের গর্ভেই জন্ম নিচ্ছিল তাও জানা যায়। শুধু সমাজের গর্ভেই জন্ম নেয়নি, জন্ম নিয়েছে স্মার্তবিরোধী অন্য কোনো সাধনকৃত্যের প্রতিস্পর্ধী সামর্থ্যে। তখন আবার প্রশ্ন জাগে মুসলিম শাসনের ফলেই কি স্মার্তধারায় এইসব ফাটল ধরছিল? ইসলামিশাস্ত্র ও মুসলিম রাজসভা কোনো প্রশ্নর জন্ম দিয়েছিল কি? 'শেখ শুভোদয়া'য় মুসলিম পীরের সঙ্গো যোগীর বিতর্ক হয়েছিল। পীর ও যোগী সম্প্রদায়ের মধ্যে হিন্দুরাজসভায় অলৌকিকতার আধিপত্য নিয়ে প্রতিদ্বন্দ্বিতাই তার কারণ। পীরের সঙ্গো স্মার্ত পণ্ডিতদের কোনো দ্বন্দ্ব দেখা যায় না। দ্বন্দ্ব ছিল ঐ যোগীর সঙ্গো স্মার্তধারার। হিন্দু রাজসভার এই যোগীতান্ত্রিক ধারার সঙ্গো স্মার্ত পণ্ডিতদের দ্বন্দ্বের লোককথা মূলক ইতিহাস একটি দীর্ঘ ঐতিহাসিক ধারায় যোড়শশতক পর্যন্ত বহমান হয়েছিল। যোড়শ শতাব্দীতে 'শেখ শুভোদয়া'র আত্মপ্রকাশই তা প্রমাণ করে। দীর্ঘকাহিনির ব্যাখ্যানের বদলে একটি উদ্ধৃতিই যথেষ্ট[১০]—

> 'Then the Yogi said, "Brahmans hate us. For that reason they have no 'regard for me.'
> Then Misra disapproved (the statement of) the Yogi (and said), 'Let it be heard. Listen, O ...Sheikh, if an act (of respect) is proper to the Yogi as he was disowned by (his own) parents. The Scripture says.
> By mere speaking (with a Yogi) alone men go to hell.
> Then the Sheikh made him stop. The Yogi was depressed (and he commented). '(our) rivalry with you is eternal.'

এই উদ্ধৃতিটিতে দেখা যায় ব্রাহ্মণ-যোগীর দ্বন্দ্ব 'যুগে যুগে আছে।' যোগী সম্প্রদায় পাতঞ্জল যোগসাধনা, বৌদ্ধ যোগসাধনা ও বৌদ্ধ/হিন্দু তন্ত্রসাধনা এই ত্রিবিধ সমবায়ে গড়ে উঠেছিল। ব্রাহ্মণ্যস্মৃতিশাসিত সমাজের চোখে তারা অবজ্ঞেয় ছিল সেনরাজবংশের পূর্ব থেকেই। তারানাথের বিবরণও তাই বলে। কিন্তু মুসলিম শাসনেরই সময়ে কঠোরতর ব্রাহ্মণশাসন নিজেকে টিকিয়ে রাখতে নতুন করে চণ্ডী, মনসাকে স্মৃতিসংহিতায় তুলে নিয়ে মঙ্গালকাব্য রচনা করে—এই পূর্বানুমান যদি সত্য হয়, তাহলে অবজ্ঞাত নাথযোগী সম্প্রদায় মুসলিম শাসনের পরেও ব্রাহ্মণশাসনের অন্তর্ভুক্ত হল না কেন? গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্মেও গৃহত্যাগী মুমুক্ষুরা ছিলেন। স্মার্তশাসন সন্ন্যাসবিরোধী হলেও বৈষ্ণব নিষ্কিঞ্চনদের প্রতি স্মার্ত মনোভাব কখনোই যোগীদের প্রতি তাদের মনোভাবের সঙ্গো তুলনীয় নয়। নাথযোগীদের প্রতি বিরাগ অন্যদিকে মনসা-চণ্ডীর প্রতি অনুরাগ, মুসলিম রাজত্ব বিস্তারের সঙ্গো চণ্ডী-মনসাকেন্দ্রিক মঙ্গালসাহিত্য বিকাশের যোগাযোগের ইতিহাসকে পুনর্বার প্রশ্ন করতে বাধ্য করে এবং এই বিভিন্ন ধরনের আন্তঃসম্পর্কগুলির মূল কারণ খুঁজতে অনুপ্রেরণা দেয়। বোঝা যায়, শুধু দুর্দৈব বা ক্যালামিটিই যদি সমন্বয়ের কারণ হত— তবে ব্রাহ্মণের নির্বাচন এবং অবজ্ঞাতসম্প্রদায়গুলির আত্মলোপ অবাধ হত। কিন্তু তা হয়নি। যেখানে হয়েছিল, সেখানে উভয়পক্ষেরই অনেকগুলি বৈশিষ্ট্য এই সমন্বয়কে সম্ভব করেছিল, তার সঙ্গো

মুসলিম শাসনের সম্পর্ক কম। ড. পঞ্চানন মণ্ডলকে উদ্ধৃত করে আমরা আগেই দেখিয়াছি সেন রাজবংশের সূত্রপাত থেকেই পৌরাণিক ধর্ম আচরণীয় ধর্ম হয়ে উঠেছিল। পূর্বে আমরা আলোচনা করেছি, পালরাজবংশের শেষদিকে রাজধর্মও পৌরাণিক ধর্মের অনুব্রতী হয়ে পড়ছিল। স্মার্ত পৌরাণিক ধর্ম মূলত আভ্যুদয়িক। তবে ফলে অন্য যে কাল্টগুলি তার সঙ্গে আপসরফায় আসছিল সেগুলিও আভ্যুদয়িক। নাথযোগীধর্ম মূলত নিঃশ্রেয়সপন্থী, বৈরাগ্যপ্রধান, তদুপরি যোগী ও কাপালিক দুই ধারাই গার্হস্থ্য-বিরোধী। গৌড়ীয় বৈষ্ণব নিষ্কিঞ্চনরা গৃহস্থকে দীক্ষা দিয়েছেন, গৃহস্থর জন্যই স্মৃতিও রচনা করেছেন। তবুও গৌড়ীয় বৈষ্ণব সন্ন্যাসীদের কীর্তন ও অন্যান্য 'ভাবোন্মাদমত্ততা'-ও সমালোচিত হত। এমতক্ষেত্রে নাথযোগীরা যে স্মার্তশাসনে ঢুকতে পারতেন না তা বলাই বাহুল্য। 'শেখ শুভোদয়া'য় যোগীর খাদ্য— হিন্দুস্মৃতিসম্মত নয়। সুতরাং ইসলামের অভ্যুদয় ও অ-ইসলাম 'হিন্দু' মূলধারার সাহিত্যগুলির উত্থানের সম্পর্কের মডেলটি ক্রমশই প্রশ্নের মুখে পড়তে বাধ্য হচ্ছে। 'হিন্দু মূলধারা' বলতে স্মৃতি-অনুমোদিত ধারাকেই আমরা বুঝিয়েছি। চণ্ডী, মনসা, রঘুনন্দনে দ্বিধার সঙ্গে অন্তর্ভুক্ত। ধর্ম নন। নাথ যোগীদের প্রশ্নই নেই। অর্থাৎ 'গ্রহণ' নির্বিচারে হয়নি।

তবু স্মার্তশাসনে যে হিন্দুতান্ত্রিক কাল্টগুলি অনুপ্রবিষ্ট হচ্ছিল, তা তাদের সাধনার গ্রহণযোগ্যতা সামর্থ্যে ও শক্তিতে। সেই সাধনাকেই গ্রহণযোগ্য করতে তারা ভিতরে ভিতরে যে প্রশ্ন তুলে যাচ্ছিল শ্রীপতির উদাহরণে আমরা তা দেখিয়েছি। এইবার কালকেতুর বিদ্যাশিক্ষার দিকে নজর দেওয়া যাক। মুকুন্দ যে খুব অচেতনে নিজের স্মার্তধারণাকে চণ্ডীমঙ্গলে আরোপ করেননি, তা আখেটিক খণ্ডের কালকেতুর সঙ্গে বণিক খণ্ডের শ্রীপতির পাঠ্যতালিকার তুলনায় স্পষ্ট। কালকেতু জাতে চুয়াড়। কখনো বলা হয়েছে ব্যাধ। ভারতের সামাজিক ইতিহাসে পুলিন্দ, ব্যাধ, নিষাদ এই শব্দগুলি সতর্কতার সঙ্গে প্রয়োগ করা দরকার। বৃত্তি এক হলেও সবাই যে একই জনজাতির ও বর্ণমর্যাদা সবারই যে এক— তা কিন্তু নয়। আপাতত, ব্যাধ যেহেতু বৃত্তিপরিচয়— তাই 'ব্যাধ' কালকেতুই স্বীকার করে নেওয়া হল। কালকেতুর 'কর্ণবেধ'-এর উল্লেখ করেছেন মুকুন্দ 'পঞ্চম বরিষে কৈল কর্ণের বেধন।' রঘুনন্দনের 'জ্যোতিস্তত্ত্বম্'-এ 'কর্ণবেধ'-এর বিবরণ আছে। কর্ণবেধে কোনো বর্ণের বিধান নেই। কিন্তু কালকেতুর তো 'হাতেখড়ি' বা 'বিদ্যারম্ভ' হল না! ব্যাধসন্তানের 'বিদ্যারম্ভ'-র প্রয়োজন মুকুন্দ অনুভব করেননি, রঘুনন্দনও 'বিদ্যারম্ভ'-এ 'বেদবিদ্যা' বাদ দিয়েছেন। প্রমাণ উল্লেখ করে বলেছেন— 'সংস্কৃতৈঃ প্রাকৃতৈবাক্যৈ-র্যঃ শিষ্যম্ অনুরূপতঃ। দেশভাষাদ্যুপায়ৈশ্চ বোধয়েৎ সঃ গুরুঃ স্মৃতঃ।'[১১] তদুপরি বিপ্রবালক হলেও তখনো সে অনুপবীত। তাই শঙ্খ বচন উদ্ধার করে রঘুনন্দনের বিধান : "ন বেদমনধীত্যানাং...।' ব্যাধের ছেলের হাতেখড়ির বদলে শুভদিনে হাতে ধনু দেওয়াই ছিল রীতি। 'শুভদিনে শুভবারে ধনু দিল ব্যাধসুত করে।' 'অষ্টাবিংশতিতত্ত্ব'-এ ধনুক হাতে দেওয়ার অর্থাৎ শস্ত্রগ্রহণের কোনো বিধান আমাদের চোখে পড়েনি। এই সচেতনতার পার্থক্যটুকু থাকায় মুকুন্দের শ্রীমন্তের বিদ্যাশিক্ষার বর্ণনাকে পুরো অসচেতন বলা যায় না। শ্রীমন্তের শিক্ষা ও পরিপ্রশ্নের

মধ্যে স্মার্তশাসন প্রসারের ও অন্য সাধনধারার অন্তর্ভুক্তির একটা দ্বন্দ্ব দেখতে পাওয়া যায়।

ধর্মমঙ্গালে রূপরাম, ঘনরাম, মানিকরাম সবাই-ই অক্ষর পরিচয়ের পর সংস্কৃত উচ্চশিক্ষার বিবরণ দিয়েছেন। ঘনরামের লাউসেন পাণিনি পর্যন্ত,[১২] মানিকরাম পড়িয়েছেন— 'সাহিত্যসকল', মুরারি, ভারবি, ভট্টি, নৈষধ, পিঙ্গল, কালিদাস, অলঙ্কার, জ্যোতিষ, আগম, তর্ক, ছন্দশাস্ত্র, পুরাণ। লক্ষণীয় আমাদের ব্যবহৃত বিজিত কুমার দত্ত ও সুনন্দা দত্ত সম্পাদিত 'মানিকরাম গাঙ্গুলির ধর্মমঙ্গাল'— কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় সংস্করণে (১৯৬০) পৃষ্ঠা ১১৪, ১১৫-য় আছে— 'আগম ও পুরাণ'। আমরা বলেছি তন্ত্রে-স্মৃতিতে হিন্দুবাঙালির সমাজ মধ্যযুগে পূর্ণবৃত্ত হয়ে উঠছিল। মানিকরামের লাউসেন আগম, পুরাণ আর তর্কশাস্ত্র অর্থাৎ ন্যায় পড়েছে। এই সূত্রটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। বেদান্তবিরোধী নৈয়ায়িকরা বাংলাদেশে যে শাক্ত বা বৈষ্ণব সাধনসম্প্রদায়ের মানুষ, তার একটা পূর্বসূত্র এই ইঙ্গিতে লুকিয়ে আছে।

মঙ্গালকাব্যগুলিতে উপনয়নের কথা তেমন নেই। নায়করা সকলেই অব্রাহ্মণ। এইবারে অন্যসংস্কারগুলির একটু বিচার করা যাক। রাঢ়বঙ্গের তিনটি প্রতিনিধিস্থানীয় মূলধারার মঙ্গালকাব্যই আমরা বেছে নিয়েছি। এবং তিনজন প্রতিনিধিস্থানীয় মুখ্য কবির বিবরণই আমরা গ্রহণ করেছি। যদিও লৌকিক/অ-লৌকিক বর্গ আমরা ত্যাগ করেছি কিন্তু জনপ্রিয় /অভিজাত (Popular/Elite) এই বর্গ আমরা পূর্ণত ত্যাগ করিনি। মুকুন্দ, বিপ্রদাস, ঘনরাম জনপ্রিয় হয়েছিলেন বলেই পরবর্তীযুগের সাহিত্যের ইতিহাসে তাঁরা মূলধারার মঙ্গালকাব্য হিসেবে গৃহীত হয়েছেন। তাই এই তিনজনের বয়ানকেই প্রতিনিধিস্থানীয় হিসেবে গ্রহণ করে সেগুলির বিশ্লেষণ আমাদের কৃত্য বলে মনে হয়েছে। প্রথমে আখেটিক নায়কের টেক্সট, পরে দুটি বণিকখণ্ডের টেক্সট, তদন্তে যোদ্ধানায়কের টেক্সট— এইভাবে নির্বাচনটিকে সাজিয়ে নেওয়া হয়েছে।

আখেটিক খণ্ডকে কেউ কেউ বলেছেন, এটি বণিকখণ্ডের পরে লেখা। কিন্তু গায়নের সময়ে প্রথমদিবসে স্থাপনা পালা দিয়েই শুরু হত। প্রথমে গণেশ বন্দনা, ক্রমে শ্রীচৈতন্য, সরস্বতী, লক্ষ্মী বন্দনা। পঞ্চোপাসনার পূজার ক্রম এতে রক্ষিত হয়নি। তারপরে কবিত্ব বিবরণ। অতঃপর প্রথম দিবস নিশাপালায় শক্তিস্তুতি। সম্পূর্ণভাবে পৌরাণিকশক্তিবর্ণনায়— দেবীর বৈষ্ণবীরূপটি প্রাধান্য পেয়েছে। 'মার্কণ্ডেয় চণ্ডী'র 'যোগনিদ্রা' এবং ভাগবতীয় 'যোগমায়া' রূপদুটি গুরুত্ব লাভ করেছে। কিন্তু তার মধ্যে ঢুকে গেছে— 'আগম নিগম তন্ত্র/বীজরূপা মহামন্ত্র/বেদমাতা বিশ্বের জননী।' 'দুর্গোৎসবতত্ত্বম্'-এ দুর্গাপূজাকে রঘুনন্দন স্মার্ত হলেও তার তান্ত্রিকরূপটি যেমন কোনোভাবেই প্রচ্ছন্ন করতে পারেননি, এখানেও তাই। মনে রাখতে হবে মুকুন্দের পূর্বজ দশাক্ষর গোপাল মন্ত্রে যে দীক্ষিত হয়েছিলেন— তা তান্ত্রিকী দীক্ষাই। উপনয়নের সময় সাবিত্রীদীক্ষা ছাড়া যে কোনো দীক্ষাই তান্ত্রিকী এবং মহাপ্রভুর প্রথম দীক্ষাও দশাক্ষর গোপাল মন্ত্রে। এরপর সৃষ্টিতত্ত্ব— পুরাণ, সাংখ্য, শ্রুতি-মিশ্রিত সৃষ্টিতত্ত্ব। তারপর বরাহ অবতার, মনুর রাজসভা, দক্ষযজ্ঞের বর্ণনা। চণ্ডীমঙ্গালের আখেটিক খণ্ডের পৌরাণিক প্রভাবে সবকটির উৎস আমরা প্রয়োজন না

পড়লে উল্লেখ করছি না। তবে এগুলি সবই যে স্মার্ত পৌরাণিক আবহাওয়াটি চিনিয়ে দেয় তাতে সন্দেহ নেই। দক্ষযজ্ঞ, সতীর দেহত্যাগ, হিমালয়ের গৃহে উমার জন্ম, মদনদহন, রতিবিলাপ, উমার তপস্যা, উমার বিবাহ, গণেশ ও কার্তিকের জন্ম—সবই পুরাণানুমোদিতবর্ণনা। গণেশ ও কার্তিকের জন্মপ্রসঙ্গে এইটুকু বলবার, যে দুজনেরই জন্ম স্বাভাবিক যোনিজদ জন্ম নয়। কার্তিকের জন্মের সঙ্গে মনসার জন্ম তুলনীয়। কার্তিকের জন্ম অযোনিজ। তার মূল উদ্দেশ্য পৌরাণিক সৃষ্টিতত্ত্ব। অর্থাৎ দৈবজন্ম মনুষ্যোচিত নয়। অন্যদিকে মনসার জন্ম 'তান্ত্রিকী ও গুহ্য।'

দ্বিতীয় দিবস দিবাপালায় শিবের কৃষকরূপ, ভিখারী শিব ও কোঁচ বধূর গৃহে ভিক্ষা। ভিখারী শিবের আদিরূপ 'স্কন্ধপুরাণ' কাশীখণ্ডে প্রাপ্তব্য। শিবের কৃষকরূপও যে অসামান্য 'লৌকিক' নয়, এ সম্বন্ধে অনির্বাণ 'বেদমীমাংসা'-য় (১ম খণ্ড, ১৯৬১, সংস্কৃত কলেজ, কলকাতা, পৃ. ১২২) বলছেন—

> বাংলাদেশে আমরা শিবকে কৃষক দেবতারূপে দেখি। এই কৃষক শিবের আদি-কথা নিয়ে অনেক জল্পনা-কল্পনা আজও চলছে। কৃষি যে যোগ সাধনার রূপক, তার প্রমাণ পাই রোহিণী-পুত্র 'বলরাম'কে যখন হলধর রূপে দেখি। ...বৌদ্ধেরা এবং নাথযোগীরা আদ্যাশক্তিকে কল্পনা করেছেন অস্পৃশ্যা ডোমের বা চণ্ডালের মেয়ে বলে। চাষি শিবের কুচুনীর পিছনে ছোটার এইদিক দিয়ে একটা তাৎপর্য থাকতে পারে। কিন্তু লক্ষণীয় বামদেবেরও একটি কৃষিসূক্ত আছে, তার দেবতা 'ক্ষেত্রপতি'। ঋক্‌সংহিতায় এই একটিই কৃষিসূক্ত।

পৌরাণিক শিবের বর্ণনার মধ্যে যোগীশিবের রূপকধৃত কৃষকশিবের অনুপ্রবেশ— মধ্যযুগের বাংলায় দুটি বিরোধী ধারার সহাবস্থান। কারণ মধ্যযুগের বাংলায় স্মৃতি-পুরাণ আর যোগের একটি বাহ্য বিচ্ছেদ ছিল। কিন্তু স্মার্তক্রিয়ায় ও বৈদিক সন্ধ্যায় প্রাণায়াম চিরকালই ছিল। প্রাণায়ামের সঙ্গে যোগের সম্পর্ক অবিচ্ছেদ্য। এইবার যোগের ধারাটিই তথাকথিত অনার্য বা লৌকিক কিনা তার বিচার করতে পতঞ্জলি ও পূর্বের ইতিহাস দেখতে হয়। যেহেতু সিন্ধুসভ্যতার লিপি আমাদের অজানা— তাই সেই সভ্যতার সিলের প্রতিমূর্তি দেখে যোগসাধনা অনার্য না দ্রাবিড় সেইসব তর্ক আজকের ইতিহাস বিচারের পদ্ধতিতে 'ঐতিহাসিক রূপকথা' নির্মাণের মতোই লাগে।

দ্বিতীয় দিবস দিবাপালার ৪৬ শিকলিটি গুরুত্বপূর্ণ। কলিঙ্গারাজকে স্বপ্নে ভগবতী (নিশ্চয়ই 'হরের গৃহিণী' যখন তখন এখানে তিনি 'উমা') নিজেকে 'দাক্ষী' পরিচয় দিয়ে নিজের প্রকাশ বলে কয়েকটি তীর্থের নাম করেছেন। এই বিবরণগুলি থেকে কোন কোন গ্রামদেবী বা জনজাতিক দেবী বা অন্য ধর্মসাধনার দেবী মূলস্রোতে মিলে যাচ্ছেন তার একটা হদিস পাওয়া যায়। পুরুষোত্তমের 'বিমলা', 'তমুলুক'-এর 'বর্গভীমা' দুজনেই আদিতে বৌদ্ধতান্ত্রিক দেবী 'তারা'। কাশীপুরের 'বিশালাক্ষী'। সুকুমার সেনের মতে 'বিশালাক্ষী' মনসা, (এটি তিনি বহুজায়গায় বলেছেন। বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস-১ম (আনন্দ), বিপ্রদাস-এর মনসা বিজয়ের ভূমিকায়, মুকুন্দর চণ্ডীমঙ্গালের ভূমিকা এবং 'প্রবন্ধাবলী' ১ম

খণ্ডে) 'কবিকঙ্কণ চণ্ডী-বোধিনী'-তে ধৃত হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর মতে বাসলী চণ্ডী। কারুর মতে গ্রামদেবতা। গ্রাম দেবতা হলে মুকুন্দর সমকালীন কাশীপুরের বিশালাক্ষীই কি বিশালাক্ষীর পীঠ? 'যমদত্তের ডায়ারি'-তে যতীন্দ্রমোহন দত্ত জানিয়েছিলেন— গঙ্গার তীর বরাবর বিশালাক্ষীর বিস্তার। 'বাসলী' প্রসঙ্গো বিশালাক্ষীর আলোচনা করে গোপেন্দ্রকৃষ্ণ বসু 'বাংলার লৌকিক দেবতা'-গ্রন্থের (দেজ-১৪১৪) পৃ. ৬৫-৬৭-তে জানিয়েছেন— সর্বত্র যে বর্ণব্রাহ্মণ এঁর পৌরোহিত্য করেন তা নয়। দেয়াসী নারী ও ব্রাহ্মণেতর জাতিরাও তাঁর পৌরোহিত্য করেন। 'সুবর্ণলেখা'-য় গ্রথিত ড. মহেশ্বর দাসের 'মঙ্গালকাব্যের দেবদেবী'-র প্রবন্ধানুসারে 'বিশালাক্ষী' বৌদ্ধ বাগীশ্বরী হলে বলতে হবে বৌদ্ধতান্ত্রিকরা হিন্দুসমাজের কোঠায় ঢুকে বিশালাক্ষীকে হিন্দুসমাজে ঢুকিয়ে আনেন। তান্ত্রিক পূজাপদ্ধতি তার প্রমাণ। তার সঙ্গো ব্রাহ্মণ্য অর্থাৎ পৌরাণিক পূজাপদ্ধতির মিশ্রণের কথা গোপেন্দ্রকৃষ্ণ বসু বলেছেন। ব্রাহ্মণ্যপদ্ধতি অনুযায়ী তাঁর পূজাপার্বণ অনুষ্ঠিত হয় বলে যখন তিনি জানিয়েছেন, তখন স্মার্তপদ্ধতিতে তিনি গৃহীত হয়ে গেছেন বলে ধরতে হয়। তার প্রাচীন প্রমাণ 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন'-এর কবির 'বাসলী'-র দোহাই। গোপেন্দ্রকৃষ্ণ হুগলী, হাওড়ায়, চব্বিশ পরগনাতেও, (বাঁকুড়া, মেদিনীপুর বাদ দিয়েও) এঁর পূজা দেখেছেন। কিন্তু দুর্গম পল্লি অঞ্চলে এই দেবীর পূজায় অরণ্যজীবী ও ধীবর শ্রেণির মধ্যে উৎসাহ লক্ষ করেছেন। এঁর উপাচার দগ্ধমৎস্য (উৎস, তদেব)। বর্গভীমারও উপাচার তাই— আমরা ক্ষেত্রসমীক্ষায় তা জানি। গোপেন্দ্রকৃষ্ণ বলতে চেয়েছেন— এটি লৌকিকতার অবশেষ। তাঁর তান্ত্রিক 'পঞ্চ ম-কার' মনে পড়ল না, এটাই আশ্চর্য। সেখানে তৃতীয় উপাচার মৎস্য।

অরণ্যজীবী ভক্তদের প্রসঙ্গা, তান্ত্রিকীপূজা পদ্ধতি ও ব্রাহ্মণ পুরোহিতের অ-অনিবার্যতা কালকেতু প্রসঙ্গো লক্ষণীয়। ধীবর শ্রেণির উল্লেখও খুব গুরুত্বপূর্ণ। মহাযান বৌদ্ধদের সঙ্গো জেলে-কৈবর্তদের দূরত্ব থাকলেও, মনসার সঙ্গো ধীবরদের নৈকট্য মনসামঙ্গালে প্রতিষ্ঠিত। মীননাথ জেলে হলে এবং লুইপা ও মীননাথ একব্যক্তি হলে সহজিয়া বৌদ্ধদের সঙ্গো ধীবর সম্প্রদায়ের বিরোধ মিটে গিয়েছিল বলেই ধরে নিতে হবে। সেক্ষেত্রে কোনোভাবেই বিশালাক্ষী জনজাতিক দেবী না বৌদ্ধতান্ত্রিক দেবী তা সহজে নিষ্পন্ন করা যায় না। দুর্গম পল্লি অঞ্চলের বৌদ্ধদের প্রবেশ ছিল না তাও বলা যাবে না। সিদ্ধান্ত এই যে 'বিশালাক্ষী'-র ব্রাহ্মণ্য ও অব্রাহ্মণ্য তান্ত্রিক পূজাপদ্ধতির সংযোগ এবং অরণ্যজীবী ও ব্রাহ্মণ উভয়প্রকার ভক্ত সম্প্রদায় এবং আখেটিক খণ্ডে তাঁর উল্লেখ আখেটিক আখ্যানের চরিত্রের গূঢ় ইঙ্গিতবহ।[১৩]

ঐ পালারই ৪৮, ৪৯ শিকলিতে দেবীর পুরাণাশ্রিতরূপই প্রকাশিত। ৫৮, ৫৯ শিকলিতে মায়াহরিণের দুটি আখ্যান। একটি আখেটিক খণ্ডের নিজস্ব, আরেকটি তার প্রসঙ্গো রামায়ণের। পূর্বের লেখাপড়ার প্রসঙ্গা বা দেবীরূপের প্রসঙ্গোর মতো এখানেও স্মার্ত প্রসঙ্গোর সঙ্গো সঙ্গোই অ-স্মার্ত প্রসঙ্গা যুক্ত হয়েছে। বিশেষত মায়াহরিণ প্রসঙ্গাটি খুব গুরুত্বপূর্ণ। ৬৪ শিকলিতে দ্বাদশীর পারণ— সম্পূর্ণ স্মার্ত। 'রঘুনন্দনে'-র তিথিতত্ত্বে তার বিস্তৃত বিধান আছে। ৬৬ শিকলিতে 'সাধভক্ষণ'। অস্মার্ত লোকাচার। ৬৮ শিকলিতে

'অন্নপ্রাশন'—স্মার্ত সংস্কার। রঘুনন্দন 'সংস্কার তত্ত্ব'-এ 'গোভিল গৃহ্যসূত্র'-এর বিধানানুসারে কন্যাসন্তানের অন্নপ্রাশনের বিধান দিয়েছেন। সুতরাং শূদ্রের বিবাহই প্রধান সংস্কার হলেও, স্ত্রীগণের অধিকার থাকায় বাংলাদেশে শূদ্র পুত্রসন্তানের ছয়মাসে 'অমন্ত্রক' অন্নপ্রাশন প্রচলিত। নামকরণ রঘুনন্দনের মতে তিনমাস, দশদিন বা একবৎসর পরে 'নামকরণ' সংস্কার। 'স্মৃতিশাস্ত্রে বাঙ্গালী'র লেখক বলেছেন— 'আজকাল অন্নপ্রাশনের সময়ে ইহা হইয়া থাকে।'[১৪] বুঝতে হবে তাহলে মুকুন্দর সময় থেকেই এই 'আজকাল'। কালকেতু সৎশূদ্র বা উত্তম সংকরও নয়। তবু লক্ষণীয় বিবাহ ব্যতিরেকে দুটি সংস্কার তার হয়ে গেল। এই প্রসঙ্গে কালকেতুর জাতিবর্ণগত অবস্থান এবং সংস্কার ও সাধনযোগ্যতা আলোচ্য। ১০৩ শিকলিতে কালকেতু বলেছে—

আমি ব্যাধ নিচজাতি তুমি রামা কুলবতী
পরিচয় মাগে কালকেতু
ত্রিভুবনে এক ধন্যা কিবা দেব দ্বিজ কন্যা
ব্যাধের কুটীরে কিবা হেতু।
ব্যাধ হিংসক রাঢ় চৌদিকে পশুর হাড়
এই ঘর শ্মশান সমান
কহি আমি হিতবাণী এই ঘরে ঠাকুরাণী
ছুঞিলে উচিত হয় স্নান।

১০৭ শিকলিতে—

অতি নিচ কুলে জন্ম জাতিতে চোয়াড়
কেহো না পরশ করে লোকে বলে রাঢ়।

'রাঢ়' শব্দের অর্থ 'বোধিনী'-কার চারুচন্দ্র বলেছেন 'আদিনিবাসী কিরাত' (কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯২৫, পৃ. ৪০৪)। লক্ষণীয় তন্ত্রসাধনার 'কৈরাত সাধনা'। 'বঙ্গীয় শব্দকোষ'-এ হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় সাধারণ অর্থ করেছেন 'শূদ্র'। প্রথমে দেখা যাক মনুতে পশুব্যবসায়ীরা কোন কোন জাত হতে পারে—

১। দস্যু নামক সঙ্কর জাতীয় পুরুষ থেকে প্রতিলোমজ আয়োগব নারীতে উৎপন্ন পুরুষ— সৈরিন্ধ্র। পশুহিংসা তাদের বৃত্তি। তাদের অন্ত্যজ অস্পৃশ্য হওয়ারই কথা। যদিও অদাস। কিন্তু অস্পৃশ্য নয়। (মনু ১০/৩২)।

২। ব্রাহ্মণ থেকে দ্ব্যন্তরিতা নারীতে জাত সন্তান নিষাদ। অর্থাৎ মাতা শূদ্রা সুতরাং সে অনুলোমজ ও শূদ্র। অন্ত্যজ। (মনু ১০/৮) রামায়ণে 'মা নিষাদ...' শ্লোক প্রমাণে সে ব্যাধ। কিন্তু আর্যবাচী। অথচ অস্পৃশ্য নয়। মনুমতে স্বভাবে উগ্র। নিষাদের কাজ মৎস্যশিকার। (মনু ১০। ৪৮)

৩। রাঢ় শব্দের অর্থ যদি 'কিরাত' হয় তবে সে ব্রাত্যক্ষত্রিয় শূদ্র। (মনু ১০।৪৪, ৪৫)। কিন্তু অস্পৃশ্য নয়।

৪। ব্রাহ্মণ ও বন্দি স্ত্রীর সন্তার মদ্গু। তার কাজ বন্য পশুবধ। (মনু ১০। ৪৮)। বন্দি স্ত্রীতে উপগত হওয়া ব্যভিচার। তাই মদ্গু অন্ত্যজ।

৫। এছাড়া পশুজীবী মেদ, অন্ধ্র, চুঞ্চু, ক্ষত্তা, উগ্র পুক্কস (মনু ১০। ৪৮-৪৯)।

কিন্তু কাব্যে এই জাতগুলির নাম নেই। টেক্সটের প্রমাণে সে সৈরিন্ধ্র বা মদ্‌গু নয়। ব্যাধ বা রাঢ় বলায় সে নিষাদ বা কিরাত হতে পারে। দুইমতেই সে শূদ্র, স্পৃশ্য। তাই তার অমন্ত্রক সংস্কার সম্ভব। তার সংস্কারে পুরোহিত পাওয়া গেলেও সে বলছে তার বাড়িতে ঢুকলে স্নান প্রয়োজন, জাতিতে চুহাড়। তার সংস্কারের পুরোহিত ধরে নেওয়া গেল 'বর্ণের ব্রাহ্মণ'; নিষাদ বা কিরাত হলে মনুমতে শূদ্রযাজী ব্রাহ্মণ তার পৌরোহিত্য করে। কিন্তু চণ্ডীপূজায় পুরোহিত পাবে না বলে সে ভাবে কেন? সে তো ম্লেচ্ছ পুলিন্দ বা শবর নয়। টেক্সটে বলাও হয়নি। ম্লেচ্ছ জাতি পত্রবাস। ফুল্লরাকে পাতার গহনা পরতেও দেখা যায়নি। এবার তাহলে চুয়াড়/চুহাড় শব্দটির দিকে তাকানো যেতে পারে। হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় দেখান— চুয়াড়-চণ্ডাল— পর্বতীয় দস্যু। অর্থান্তরে ব্যাধ। চণ্ডাল বা দস্যু মনু মতে অবশ্যই অন্ত্যজ বঙ্গদেশীয় বৃহদ্ধর্মপুরাণ মতে অধমসংকর। অতএব জাত্যংশে কালকেতু চণ্ডাল, বৃত্তিতে ব্যাধ— এই মত নিষ্পন্ন না করলে কালকেতুর বক্তব্যের সঙ্গতি থাকে না। তাই তার সাধনযোগ্যতা নিয়ে সে নিজেই প্রশ্ন তোলে। এক্ষেত্রে 'বোধিনী'-কারের 'আদিমনিবাসী কিরাত' অর্থটিকে মনু থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেখলে রাঢ় বা চুহাড় 'চণ্ডাল' বা আদিমনিবাসী 'কিরাত' অব্রাহ্মণ্য বাংলার আদিমনিবাসী হতেই পারে। কিন্তু তখন তার মনুমতে এবং বৃহদ্ধর্মপুরাণমতেও সংস্কারযোগ্যতা থাকে না। চণ্ডাল-চুহাড় বর্ণাশ্রম বহির্ভূত। রাঢ় যদি আদিম অধিবাসী কিরাত হয় তবে সেও তাই। মনু কিরাতকে ব্রাত্যক্ষত্রিয়-শূদ্র বলছেন, আর চণ্ডালকে প্রতিলোমজ বলে দূরে রাখছেন। এর একটা ঐতিহাসিক অর্থসঙ্গতি হচ্ছে— যে আদিম অধিবাসীদের ক্ষমতায়ন হচ্ছিল, তারা বিপ্রানুসারী ছিল, তারা শূদ্রবর্গে ঢুকেছে, বিপরীতেরা চণ্ডালবর্গে প্রবিষ্ট। ব্যক্তি কালকেতুর সামাজিক অবস্থান অর্থের খাতিরে নিম্নবিত্ত। বাস্তবভাবে মনে হয় যেহেতু 'রাঢ়' শব্দের অর্থ 'কিরাত' এবং 'কিরাত' মনুমতে স্পৃশ্যশূদ্র তাই প্রাচীন ও নব্যস্মৃতি মতে তার সংস্কার সম্ভব এবং হয়েও ছিল। কিন্তু পশুশিকার যেহেতু একমাত্র কিরাতেরই বৃত্তি নয়, সেহেতু সে তাকে নিজে বা তার সমাজ অস্পৃশ্য, চণ্ডালের চোখেও দেখত। অর্থাৎ বৃত্তিগুলি মিশে যাওয়ায় তার অবস্থান 'ambivalent'। উপরন্তু বাংলার চণ্ডালাদি অধিবাসীরা এবং 'ব্রাত্য আর্য'-রা উপরন্তু বাংলার চণ্ডালাদি অন্ত্যজ সমাজে ব্রাহ্মণশাসনে নির্বাসিত হয়েছিল। তারই ফলে কালকেতু 'সংস্কার' ও অস্পৃশ্যতা এই দুই বিপরীতের সমবায়ে কিংকর্তব্যবিমূঢ়। কালকেতুর জাতের বিচার থেকে বোঝা যাবে স্মৃতিশাস্ত্রের বৃত্তিগত জাতব্যবস্থা, কতটা অনির্ভরযোগ্য ছিল। এই আধা-অস্পৃশ্য জাতিকে স্মৃতি ও পুরাণ শুধু 'নমস্কারে'র অধিকার দিয়েছিল। কিন্তু কালকেতুকে পূর্ণমর্যাদা দেবে— 'কৈরাতোমতম্' শক্তিসাধনার ধারা। 'পশ্বাচারী' মার্গে স্মার্তজীবনে প্রবেশ করিয়ে তাকে সশরীরে স্বর্গলাভ করিয়ে দেবে অভিপ্রেত আখ্যানটি।

এবার 'ষষ্ঠীপূজা'। রঘুনন্দনের 'তিথিতত্ত্বে'র অন্তর্ভুক্ত জন্মাষ্টমীকৃত্যের অন্তর্গত বিশুদ্ধ স্মার্ত-কৃত্য। ৭০ নং শিকলিতে সোমাঞি পণ্ডিতকে ধর্মকেতুর উক্তি 'সপ্তপুরুষে ওঝা তুমি পুরোহিত।' ব্রাহ্মণ ব্যাধের পুরোহিত— সাতপুরুষ ধরে। প্রতিপুরুষে ২৫-৩০ বছর ধরলেও

দুশো বছর আগে থেকেই শূদ্রর প্রতিনিধি নিয়োগে পূজাধিকার বাংলাদেশে প্রচলিত। মনুতেও শূদ্রর দ্বিজপুরোহিতের উল্লেখ আছে। তবে তা নিন্দিত। কিন্তু আপাতত যদি ব্যাধ বা নিষাদ বা চুয়াড় তার সূক্ষ্ম বিচার না করে কালকেতুকে জল-অনাচরণীয় শূদ্র বলেই ধরে নিই— তার ব্রাহ্মণশাসনে অঙ্গীভূত হওয়া নিতান্ত হালের ঘটনা নয়। তা বৈদিক-হিন্দু ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতির প্রসার ও আত্মসাৎ করবার দীর্ঘ ইতিহাসের অঙ্গীভূত বলেই এখানে লক্ষণীয়। ৭১, ৭২-এ বিবাহসংস্কার। অনেকেই এই অংশটিকেই মুকুন্দর আরোপ বলেছেন। একেবারেই তা নয়। বিবাহই শূদ্রর প্রধান সংস্কার। লক্ষণীয় 'ধর্ম কার্য ছিল জত/পুরোহিত সমাপিত/ধর্মকেতু শুনি সকৌতুকে।' অর্থাৎ বোঝাই যায় পুরোহিত পৌরাণিক মন্ত্র উচ্চারণ করেছেন, ধর্মকেতু শুনেছে মাত্র, বলেনি। শূদ্রের সংস্কারাধিকার বিচার করে 'আহ্নিককৃত্য'-কার শ্যামাচরণ কবিরত্ন বলেছেন, 'এতাবতা প্রাচীন ও স্মার্ত উভয়মতেই শূদ্রের গর্ভাধানাদি নব সংস্কার প্রতিপন্ন হইতেছে। তন্মধ্যে প্রভেদ এই যে, স্মার্ত মতে বিবাহটি সমন্ত্রক ও অন্যান্য সংস্কার অমন্ত্রক; এবং প্রাচীন মতে সকল সংস্কারই অমন্ত্রক।' (আহ্নিক কৃত্য-খণ্ড দ্বিতীয়, বিবাহবিধি)। তৃতীয়দিবস দিবা পালার ৯৪ থেকে ১০৪ শিকলি পর্যন্ত স্মার্ত-ব্রাহ্মণ্য পুরাণ-এর যত্রতত্র উল্লেখ। কিন্তু ১০৫ শিকলির প্রশ্নটি গুরুত্বপূর্ণ—

হিংসামতি ব্যাধ আমি অতি নিচ জাতি
মোর ঘরে কি কারণে আসিব পার্বতী।

'পার্বতী' দুর্গার পূজায় সববর্ণেরই অধিকার আছে। 'দুর্গোৎসবতত্ত্বম্'-এ স্পষ্ট রঘুনন্দনআদেশ আছে। কিন্তু তার থেকেও বড়ো প্রশ্ন কালকেতুর সংশয়— 'মোর ঘরে কি কারণে আসিব'। পার্বতীর পর্বতশীর্ষে বাস। এই সন্ধ্যার্থ নিষ্পন্ন করলে এই দুটি পঙ্ক্তিই আখেটিক আখ্যানের কুঞ্চিকা। পূর্বপক্ষ যদি বলেন ১০৬ শিকলিতে 'পাবর্তী' শারদ-দুর্গার রূপে প্রকটিতা— তবে বলতে হয় 'অষ্টনায়িকা পরিবেষ্টিতা' হরিশয়নকালের 'শারদদুর্গা' নিজেই তো স্মার্ত নন। কালিকাপুরাণের মতো তান্ত্রিকীপুরাণ ও রঘুনন্দন বললেও নন। 'শবরোৎসব'-কে রঘুনন্দন বন্ধ করেছেন কি? বলিদানের ব্যবস্থায় তিনি কী বলছেন? বলিদান দেবসম্মত হলেও, কোনো বৈদিক প্রমাণের আগেই 'দুর্গোৎসব তত্ত্বে' বলছেন—

বৈষ্ণবীতন্ত্রকল্পোক্ত ক্রমঃ সর্ব্বত্র সর্ব্বদা।
সাধকৈর্ব্বলিদানে তু গ্রাহ্যঃ সর্ব্বসুরস্যতু।।'

তিনি বৈষ্ণবতন্ত্রর প্রমাণে বলিদানের ব্যবস্থা দিচ্ছেন। তৃতীয় দিবস নিশাপালায় নগর-প্রাসাদ নির্মাণ ও মন্দির নির্মাণে বাস্তুবিদ্যা, তিথিতত্ত্বর অনুবর্তন আছে। আগ্রহী ব্যক্তি 'বৃহৎসংহিতা'-র সঙ্গে তুলনা করতে পারেন। কিন্তু গঙ্গা ও চণ্ডীর কলহ সূচক ১২০ শিকলিটি কৌতুহলব্যঞ্জক এবং প্রসঙ্গান্তরে বিস্তারযোগ্য।

১২১, ১২২, ১২৩ শিকলিতে চণ্ডীর ইন্দ্রকে মেঘ পাঠানোর অনুরোধ, মেঘেদের বৃষ্টিপাত, কলিঙ্গে বন্যা— ভাগবত-প্রভাবিত। এক্ষেত্রে গোবধর্নলীলা স্মরণযোগ্য।

১২৭, ১২৮, ১২৯ বুলান মণ্ডল, ভাঁড়ুর বিবরণ। সৎশূদ্র, জলআচরণীয়, অনাচরণীয়,

নবশাখ ইত্যাদি স্তরে বিন্যস্ত হিন্দুসমাজের গোড়াপত্তন হল। বুলান মণ্ডলের 'করব্যবস্থা'-য় 'অর্থশাস্ত্র'-র খাঁটি প্রতিধ্বনি নেই। 'ডিহিদার নাহি দিব দেশে' কালকেতুর এই উক্তি মুকুন্দর ডিহিদার মামুদ শরীপের সঙ্গো মিশিয়ে পড়লে কবিজীবন ও কাব্যর সম্পর্ক বোঝা যাবে। অনুবৃত্তির মধ্যেও মুকুন্দর স্বকীয় কবিচেতনার অস্তিত্বেরও প্রমাণ বটে। গুজরাট নগরের বসতিস্থাপনে নানা শ্রেণির ব্রাহ্মণের বসতি। ব্রাহ্মণেরা শূদ্ররাজার রাজত্বে বসতি করবেন, না, এতো মনুর বিধান। কিন্তু কলির বিধান? স্মার্তশাসনে শূদ্রকে ক্ষত্রিয় মর্যাদা দিয়ে অভিষেক করে তার একটা সমাধান করা যায়। এখানে তো তা হয়নি। 'চণ্ডীমঙ্গল'-এ এর সমাধান— কালকেতু তো কলিঙ্গারাজকে বলছে— সে রাজা নয়, শিব তার রাজ্যের রাজা। সে তার মহাপাত্র। এর পিছনে মুকুন্দ ত্রৈবর্ণিকের একটি খাঁচা রেখেছেন। সূর্যবংশ, চন্দ্রবংশের ক্ষত্রিয় যারা আছেন— তাঁরা সবই নতুন ক্ষত্রিয়। বাংলাদেশে মানসিংহের সঙ্গো আগত পশ্চিমাঞ্চলীয় যোদ্ধৃজাতির বংশধরও কিছু ছিল। উল্লেখযোগ্য রাজপুতদের ক্ষত্রিয় ধরা হচ্ছে। বুদ্ধপূর্ব যুগের প্রাচীন ক্ষত্রিয় বংশ লুপ্ত হয়ে যাওয়ার ইতিহাস পুরাণে, মনুতে আছে। কিন্তু 'শেখসুভোদয়া'তেও রাজপুতরা ক্ষত্রিয়ত্ব দাবি করেছে। 'বল্লালচরিতে'ও এই প্রসঙ্গ আছে। জাত্যুৎকর্ষের দাবি যে কেবল উনিশ শতকীয় নয়, তার প্রমাণ এইখানে মেলে। তবে বলে দেওয়া যায় ত্রৈবর্ণিকের এই বিন্যাসটি পুরো কাল্পনিক নয়। আবার ত্রৈবর্ণিকরহিত বিপ্রে শূদ্রে বিভাজিত— রঘুনন্দন ব্যবস্থাপিত ব্যবস্থাও পুরোটা বাস্তবরহিত প্রস্তাবমাত্র নয়। উভয় ব্যবস্থার আততি এই অংশে রয়ে গেছে। 'শুদ্ধিতত্ত্বম্'-এ রঘুনন্দন যে অশৌচব্যবস্থায় পূর্ববচনপ্রমাণানুসারে ত্রৈবর্ণিকের উল্লেখ করেছেন তাও তাৎপর্যপূর্ণ। নিশ্চয়ই স্বল্প হলেও এর প্রয়োজন ছিল, অন্তত কবিকঙ্কণে-র গুজরাটে ত্রৈবর্ণিকের বিন্যাসে তার প্রমাণ পাওয়া যাচ্ছে। তবে দুটি ব্যবস্থাই 'স্মৃতি সম্মত'। প্রাচীন ও নবীন— উভয় মতেই।

চতুর্থদিবস, দিবা পালার ১৪৩ শিকলিতে মনসার ঝাঁপান পাঠের আসর। তারই সঙ্গো 'প্রতিবাড়ি দেবস্থল/বৈষ্ণবের অন্ন জল/দুই সন্ধ্যা হরি সঙ্কীর্তন।' কিন্তু আশ্রমচত্বরে গুণীজন যে গীতনাটে আমোদিত হচ্ছেন, সেই গীতনাটের অন্যতম বিষয় রোজার ঝাঁপান গান। স্মৃতি ও অ-স্মার্ত ধর্মচর্চার পূর্ণবৃত্ত রূপ। ঐ দিনের নিশাপালায় ১৫৪ শিকলিতে ফুল্লরার রামায়ণ অনুবৃত্তি। যাঁরা ভাবেন ফুল্লরা মহাভারত পড়ল কবে— তাঁরা ভুলে যান এই সেদিন অবধিও দেশে কথকতা ছিল। আজও টি. ভি. সিরিয়াল আছে। জনপ্রিয় সাহিত্য যেমন পরযুগে শিষ্ট হয়ে যায়, শিষ্টও তেমনই জনপ্রিয় হয়ে দাঁড়ায়। চতুর্থ দিবস নিশাপালার ১৬৪, ১৬৫ শিকলির চণ্ডিকা মন্ত্রর ক-কারাদি ব্যঞ্জনে চণ্ডিকা স্তব, স্মার্ত নয়। যদিচ স্মার্ত অনুষঙ্গ বর্তমান।

১৭০ নং শিকলিতে রাজা কালকেতুর আশীর্বাদ চাইছেন। মনে রাখতে হবে স্মার্তব্যবস্থায় দেবতা ক্ষত্রিয় হলে ব্রাহ্মণঋষিও তাঁকে আশীর্বাদ করতে পারেন। বিষ্ণু ভৃগুপদচিহ্ন ধারণ করেন। সেই ব্যবস্থায় কালকেতু চণ্ডীর বরপুত্র হলেও রাজাকে আশীর্বাদ করতে পারে না। কিন্তু রাজা ভয়েই আশীর্বাদ চান। ভয় কালকেতুর সাধনশক্তিকে। 'চণ্ডীর

সেবক তুমি কর আশীর্বাদ।' এরপর মৃতসৈন্যের প্রাণদান। মরাকে বাঁচানো স্মার্ত ঐতিহ্য নয়। শুক্র এই বিদ্যা জানতেন। এখানে এসেছেন 'ভৃগুসুত'। 'বত্রিশসিংহাসন'-এর তান্ত্রিক আবহাওয়া প্রকাশ্য, সেখানে মৃতের বেঁচে ওঠার motif পুনরাবৃত্ত। শুক্র দৈত্যগুরু। দৈত্যরা দেবতাদের বৈমাত্রেয় ভ্রাতা— আসলে অবৈদিক আর্যধারা। সেইটাই যদি 'ব্রাত্য' মুনিধারার তন্ত্রসাধনা হয়— কালকেতুর আখ্যানের আগাগোড়া স্মার্ত অনুষঙ্গের অন্তরালবর্তী আরেকটি পাঠ দরকার।

আমাদের বিশ্লেষণে এও দেখা গেল স্মার্ত রীতিনীতি ও অনুষঙ্গ যা ব্যবহৃত হয়েছে, তার অধিকাংশই বা পুরোটাই রঘুনন্দনসম্মত। তখন এক পক্ষে ব্রাহ্মণত্ব কঠোর হচ্ছে অন্যপক্ষে মঙ্গলকাব্যে অবজ্ঞাত শ্রেণিকে ব্রাহ্মণশাসিত সমাজে টেনে আনা হচ্ছে, এই বৈপরীত্যটি আর সাজানো যাবে না। কারণ কালকেতুর আখ্যানে রঘুনন্দন-ব্যবস্থার সঙ্গে প্রাচীন ব্যবস্থার কোথাও বিরোধ হয়নি। অন্যদিকে রঘুনন্দন 'অষ্টাবিংশতি তত্ত্বম্'-এ ব্রাহ্মণ-ব্যবস্থাকে একটা পুনর্বিচার করেছেন, কিন্তু পরম্পরার সঙ্গে বিচ্ছিন্ন হয়ে কিছু করা তাঁর সম্ভব ছিল না। সেইজন্য কতটা নতুন করে তিনি কঠোর হয়েছেন এবং কেন প্রভাবিত হয়েছেন তা যথাযথ গবেষণায় বিচার্য। তবে একথাও অনস্বীকার্য যে ব্রাহ্মণসংস্কৃতির আবয়বিক সংহতিরক্ষা তাঁর অন্যতম অ্যাজেন্ডা ছিল। নতুন দেবতাকে স্মৃতিতে কতটা ঠাঁই দেওয়া হয়েছে, তাও সমালোচ্য। কারণ তা হলে অন্তত ব্যাধের আখ্যানে স্মার্তব্যবস্থার সঙ্গে একটা বিরোধ থাকত। বিরোধ বাহ্যত নেই।[১৫]

তুর্কি আক্রমণ, ইসলাম শাসন ও ক্রমবর্ধমান স্মৃতিবিরোধী প্রশ্নের মুখে তন্ত্র প্রমাণকে রঘুনন্দন আরো বেশি করে গ্রহণ করেছেন। সেনরাজবংশের পূর্ব থেকেই তন্ত্রাচার প্রবল হয়ে ওঠায় হলায়ুধের সময় থেকেই হিন্দুতন্ত্র ও হিন্দুস্মৃতির যৌগপত্য সাধিত হতে থাকে। প্রধানত পুরুষপ্রধান বৌদ্ধতন্ত্রের সঙ্গে তার বিরোধ ছিল। বৌদ্ধতন্ত্রবিরোধী হিন্দুতন্ত্রগর্ভিতস্মার্ত রূপটি তৈরি হতে থাকে স্মৃতিনিবন্ধে। রঘুনন্দনের হাতে ইসলামের প্রেক্ষাপটে সেই ধারাটিই আরো শক্ত হয়। মঙ্গলকাব্যের পূর্ববীজগুলির মধ্যে সেই বৌদ্ধতন্ত্রের সঙ্গে দ্বন্দ্ব ও হিন্দুস্মৃতির সঙ্গে হিন্দুতন্ত্রের মিলনের ইতিহাস অসামান্য সূত্রে সংযোজিত হয়ে রয়েছে। মুসলিম শাসনের সমকালে সংস্কৃত ভাষার সাহিত্যের ক্রমিক অবলুপ্তির ফলে 'ভাষাবাহিত' পূর্ববীজগুলি পল্লবিত হয়ে ওঠে। বিদেশি শাসকরা এদেশের জনভাষাকেই উৎসাহ দিয়েছেন, সংস্কৃতকে নয়। তদুপরি বৌদ্ধ মহাযান ও বৌদ্ধতন্ত্রধারা অভিজাত সমাজ থেকে উৎসাদিত হয়ে ব্রাহ্মণ্যব্যবস্থাকেই প্রধান করে ফেলে। মঙ্গলকাব্যের দেবীরা হিন্দু তন্ত্রেরই দেবী।[১৬] একাদশ শতকের আগে থেকেই তাঁদের মূর্তি পাওয়া যাচ্ছে। বৌদ্ধতন্ত্রের দেবীরা তাঁদের নিষ্ক্রিয় চরিত্র (কারণ বৌদ্ধতন্ত্রে প্রকৃতি নিষ্ক্রিয়)-কে বদলে সক্রিয় শক্তিতত্ত্বে পরিবর্তিত হয়ে হয় হিন্দুতন্ত্রের দেবীদের মধ্যে আত্মলোপ করেছেন, নয় সামাজিক যুদ্ধে হেরে গিয়েছেন। যাঁরা পরাজিত হয়েছেন আজ আর হিন্দুধর্মে তাঁদের কোনো অস্তিত্ব নেই। যাঁরা মিশে গিয়েছেন তাঁদের ছায়া চণ্ডী, মনসার মধ্যে পাওয়া যায়। (হিন্দু-চণ্ডীর অস্তিত্ব অন্তত বাণভট্টর সমকাল থেকেই বর্তমান। মনসার ধারা আরো প্রাচীন। বৈদিক ও অবৈদিক

আর্যধারার মিশ্রণ বলে অনুমান করেছেন সুকুমার সেন। আর দর্শনঅভিজ্ঞ সাধকপরম্পরা এই মতকে অনুমান করেন না, বরঞ্চ বিশ্বাসের পক্ষে শক্ত প্রমাণও দেন। সুকুমার সেন ও সাধক সমাজের যুগল মত অনুসরণের জন্য স্বামী শংকরানন্দর 'মনসাচরিত' (প্রকাশক-নীলমণি মহারাজ-১৯৫৭) গ্রন্থটি দেখা যেতে পারে।) হিন্দুতন্ত্রের এই দেবীরা তন্ত্র ও স্মৃতির বৈসাদৃশ্য সত্ত্বেও সাধনঘনিষ্ঠতার কারণে পুরাণে ও স্মৃতিতে প্রবিষ্ট হয়ে হিন্দুধর্মের তন্ত্রগর্ভিত স্মার্তরূপটিকে স্পষ্টতা দিতে থাকেন। মুসলমান শাসনে বৌদ্ধধর্ম সম্পূর্ণ বিনষ্টিভবন ও ব্রাহ্মণ্যত্বর দৃঢ়প্রতিষ্ঠার ফলে এই সব দেবীদের মঙ্গালকাব্যধৃত আখ্যানগুলি পল্লবিত হয়ে ওঠে। স্মার্ত আচ্ছাদন এমনভাবে চাপা দেওয়া থাকে যে ক্রমে তান্ত্রিকী রূপটির কথা সাধকসমাজের বাহিরে অপ্রকাশিত হতে শুরু করে। আমরা পূর্বেই বলেছি, ক্রমশ তা আনুষ্ঠানিকতাকেও ত্যাগ করে। কিন্তু বণিকখণ্ডের আখ্যানে দেখেছি শ্রীপতির প্রশ্নগুলি, নতুন বিচার, অন্য স্মৃতির প্রস্তাব। সেই প্রশ্ন থেকেই ক্রমে সমুদ্রযাত্রার অবতারণা। প্রকৃতপক্ষে ব্রাহ্মণ্যস্মৃতির সন্ধ্যাভাষার অন্তরালে অন্য একটা সাধন আখ্যান মিলিয়ে দেওয়া আছে, যা আলাদা করা যায় না। যেমনভাবে রঘুনন্দনের স্মৃতিতে তন্ত্রপ্রমাণকে এমনভাবে মিশিয়ে দেওয়া আছে, তাতে অনুমান করে নিতেই হয়, নিম্নতম সময়সীমাপক্ষে হলায়ুধ সমকালীন সেনরাজবংশের সময় থেকেই স্মৃতিতন্ত্রে পূর্ণরূপে রঘুনন্দনের পূর্ববীজ লুকিয়ে ছিল। বণিকখণ্ডের শেষ দিকে সেই পূর্ণরূপ ক্রমশ উন্মোচিত হয়েছে।

স্মৃতির সঙ্গো তন্ত্রের সম্পর্ক চণ্ডীমঙ্গালের বণিকখণ্ডের আধারে একবার দ্রুত দেখে নেওয়া যেতে পারে। তারই অনুবৃত্তি হিসেবে কালক্রম ভঙ্গা করে মনসামঙ্গালের প্রসঙ্গাও আমরা আনব। কারণ দুটিই বণিকভিত্তিক আখ্যান।

চণ্ডীমঙ্গালের ১৮৫ শিকলিতে খুলনার জন্মের পর 'ষষ্ঠিপূজা' অষ্টমদিনে 'আটকলাইয়া' 'একুষিআ' ইত্যাদি জাতকর্ম অনুষ্ঠানের বর্ণনা আছে।

কন্যা সন্তান বলে সপ্তম মাসে 'অন্নপ্রাশন'-এর স্মৃতিসম্মত বর্ণনা, পঞ্চম বৎসরে 'কর্ণবেধ'। ১৮৯ সংখ্যক শিকলিতে ধনপতির বন্ধুদের বৈষ্ণব নাম উল্লেখযোগ্য। ১৯৮ শিকলিতে দ্বাদশবর্ষীয়া খুল্লনার বিবাহের জন্য দনাই ওঝার শরণাপন্ন হওয়া। 'উদ্বাহতত্ত্বম্'-এ রঘুনন্দনের ব্যবস্থা— দশমবর্ষর মধ্যে অর্থাৎ রজস্বলা হওয়ার পূর্বেই বিবাহ প্রশস্ত। (দ্রষ্টব্য : আহ্নিককৃত্য, দ্বিতীয় খণ্ড, শ্যামাচরণ কবিরত্ন)। দনাই এই ব্যবস্থার পুনরাবৃত্তি করেছে মাত্র। তবে গন্ধবণিকের গৃহে কন্যার বিবাহে পণ নেওয়া হত। ১৯৬ শিকলিতে ধনপতির বর্ণনাও উল্লেখ্য— 'দেবদ্বিজ গুরুভক্ত শুদ্ধ সদাচার।' ১৯৭ শিকলিতে খুল্লনার দোজবরে বিবাহের কারণ— 'গণক কহিল মোরে/দিবে দ্বিতীয় বরে/বিচারিএ বিধবা-লক্ষণ'— স্পষ্টই ভৌম দোষ। 'জ্যোতিস্তত্ত্বম্' ধৃত ভৌমদোষের লক্ষণ খুল্লনার জীবনেও প্রতিফলিত। ২০২ শিকলিতে গঙ্গাজলে গণ্ডূষ করে ধনপতির আহার গ্রহণ। ২০৪ শিকলিতে জ্যোতিষবিচার, ২০৫ শিকলিতে অধিবাসতত্ত্ব, ২০৭ শিকলিতে গাত্রহরিদ্রা, বৃদ্ধিশ্রাদ্ধ 'উদ্বাহতত্ত্বা'নুগ। ২০৮ শিকলিতে খুল্লনার জন্য রম্ভাবতীর ষট্‌কর্মান্তর্গত বশীকরণবিদ্যার

প্রয়োগ। এইগুলি স্মার্তক্রিয়া নয়। লৌকিক যোষিতাকর্মও নয়। তান্ত্রিকী অভিচারক্রিয়ার অন্তর্গত। ২০১ শিকলিতে 'সাধু করে কন্যাদান বিপ্রগণে বেদগান' উল্লেখযোগ্য। ব্রাহ্মণ মন্ত্রপাঠ করেছেন, শূদ্র বণিক করেনি। ২১৩, ২১৪ শিকলিতে পশুবধপাপ বিচার, ব্যাধ বৃত্তির নিন্দা। ব্যাধখণ্ডের কাহিনির একটি বীজ এইখানে। ২১৭ শিকলিটিও সবিশেষ গুরুত্বপূর্ণ— এইটি শুকের মুখে যোগসাধনার ব্যাখ্যা। তার পরে ২১৮ শিকলিতে রামসীতা নলদময়ন্তীর আখ্যান। বিরহের গল্প ও যোগসাধনার ব্যাখ্যা ধনপতির জীবনে গভীর তাৎপর্যবহ। ২৩০ শিকলিও তান্ত্রিকী বশীকরণ ক্রিয়া। কিন্তু তার প্রমাণ হিসেবে জড়িয়ে দেওয়া হয়েছে পৌরাণিক চরিত্রপ্রসঙ্গ। ২৪৩ শিকলিতে সারিশুকের প্রসঙ্গ— নলদময়ন্তী কথার হংসদূতকে স্মরণ করার। পৌরাণিক ঐ দম্পতি ও মঙ্গলকাব্যের এই দম্পতির মধ্যে উপমান উপমেয় সম্পর্ক বিদ্যামান। ২৫০ ও ২৫১ শিকলিতে এই খণ্ডের কুঞ্চিকা। খুল্লনার মঙ্গলচণ্ডীর ব্রতর সূত্রপাত। কিন্তু স্মার্তব্রত নয়। কারণ মনুসংহিতা ৫।১৫৫ অনুসারে

নাস্তি স্ত্রীণাং পৃথগ্ যজ্ঞো ন ব্রতং নাপ্যুপোষণম্।
পতিং শুশ্রূষতে যেন তেন স্বর্গে মহীয়তে।

যজ্ঞে, ব্রতে তো বটেই, নিরঙ্কুশ নয় নারীর অধিকার। কিন্তু 'স্মৃতিশাস্ত্রে বাঙ্গালী'-কার বলেছেন (এ. মুখার্জী, ১৩৬৮ সং, পৃ. ৯৭)— 'এইরূপ অবস্থায় সম্ভবত পুরাণ ও স্মৃতির মধ্যে একটা আপোষ করিবার জন্যই বঙ্গীয় নিবন্ধকার মনুর বচনের একটি অভিনব অর্থ আবিষ্কার করিলেন। তিনি (অর্থাৎ ব্রততত্ত্বকার রঘুনন্দন) বলিলেন যে, সাধারণতঃ যজ্ঞ ও ব্রতাদিতে নারীর অধিকার না থাকলেও, তিনি পতির অনুমতি ক্রমে ব্রতাদির অনুষ্ঠান করিতে পারেন।' খুল্লনা ইন্দ্রের কন্যাদের থেকে এই ব্রতবিধান পেলেও— স্বামীর অনুমতি নেয়নি। প্রবাস থেকে ফেরার পরেও নেয়নি। তার ব্রতটি স্মৃতিবাহ্য। পূর্বপক্ষ যদি বলেন রঘুনন্দনের তিথিতত্ত্বে মঙ্গলচণ্ডীর ব্রতর উল্লেখ আছে তবে বলতে হবে সেখানে কালিকাপুরাণ থেকে গৃহীত একটি শ্লোকে ললিতকান্তা মঙ্গলচণ্ডিকার ধ্যানমাত্র আছে। ব্রতর বিধানও আছে। কিন্তু যে শক্তিবীজে তাঁর পূজার উল্লেখ আছে, সেটি বিশিষ্ট রূপে তান্ত্রিকী। উপরন্তু দেখা যায় এই ব্রতর জন্য খুল্লনার দীক্ষার প্রয়োজন হয়েছে। কিন্তু স্বামীর অনুমতি লাগেনি। এইটিই তান্ত্রিকীব্রতের অব্যর্থ প্রমাণ। এক্ষেত্রে তন্ত্রে স্মৃতিতে দ্বন্দ্ব হতেই পারে— আপাতস্মার্ত ধনপতি খুল্লনাকে ব্রতের অনুমতি না দেওয়ার ফলে ব্রত কি সিদ্ধ? ব্রত যদি সিদ্ধই না হয় তবে চণ্ডিকার ব্রতবিরুদ্ধতার জন্য ক্রোধের কারণ কী? কিন্তু ঈশ্বরেচ্ছায় ক্রোধ যখন হয়েছে তখন ব্রত সিদ্ধই বটে। স্বামীর অনুমতি ব্যতিরেকে গুরুপ্রণোদিত ও কুমারীচক্রে স্বয়ংবৃতা এই ব্রত নিশ্চিত লক্ষণে তান্ত্রিকী। পঞ্চম দিবস নিশাপালায় শাকুনবিদ্যার প্রয়োগ আছে। 'শাকুনবিদ্যা' তন্ত্রশাস্ত্রের অনুগামী বিদ্যা। তান্ত্রিক ষট্‌কর্মবিদ্যার প্রয়োগ বণিকখণ্ডে বেশি। ২৮২-২৮৩ শিকলিতে ধনপতির অকস্মাৎ ক্ষণমৃত্যু মনসামঙ্গালে লখিন্দরের বিবাহের পূর্বেও ঘটেছে। এটি সম্ভবত dramatic irony। ঐ পয়ারে ভাদ্র মাসের নষ্টচন্দ্রর উল্লেখ স্মার্ত। ২৯৬ শিকলিতে 'চৌষট্টি জোগিনী সঙ্গে খেলেন বাসুলী' বর্ণনাটিও তন্ত্রোচিত। কিন্তু ষষ্ঠদিবস দিবা শিকলিতে ২৯৮ শিকলিতে যে গ্রহশান্তিযজ্ঞর আয়োজন

তা আসলে 'গর্ভাধান সংস্কার'। কালের গতিতে গর্ভাধানসংস্কার আজ অবলুপ্ত হলেও, ধনাঢ্য গৃহে মধ্যযুগের হিন্দু শূদ্র গৃহে তা কিন্তু প্রচলিত ছিল। ২৯৮ শিকলিটি অন্যকারণেও আলোচ্য। ব্রাহ্মণ পুরোহিত দিয়ে ধনপতি অন্তত দুজন নারী দেবতার পূজা করেছে 'পার্বতী' এবং 'ষষ্ঠী'। নারীদেবতার পূজা সে করে না তা তো নয়। তাহলে নারীদেবতা বলে চণ্ডিকার সঙ্গে তার বিবাদ নয়। বিবাদ পাবর্তী ও চণ্ডিকার দেবতাচরিত্রের বৈপরীত্যে। আখেটিক খণ্ডে 'পার্বতী'কে দুর্গারূপে আত্মপ্রকাশ করতে হয়েছিল। কালকেতুর বাচনে 'পাবর্তী' ও 'চণ্ডিকা'-র পার্থক্য ছিল না। বোঝাই যাচ্ছে মাতৃকাভাবনায় নাম নয়, ধরন নিয়ে দুটি পক্ষ আছে। একটি পর্বতকন্যা পর্বতবাসিনী শারদ দুর্গার ধারণা। ধারণাটি স্মৃতিতে প্রতিষ্ঠিত। তার আখ্যানটি যে সময়ে তৈরি হয়েছে নিশ্চয়ই তা রঘুনন্দন, কবিকঙ্কণ এবং 'কালিকাপুরাণ'-এর আগে। তখনই এই ধারাটি প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেছে। কালিকাপুরাণের 'দুর্গোৎসববিধি' তো মান্যবিধি। আরেকটি ভাবনার পক্ষ 'চণ্ডিকা'-র পক্ষ। সেখানে শিবগৃহিণী রূপটি বড়ো নয়। ভৈরবের সঙ্গে বর্তমান থাকলেও 'শক্তি' স্বতন্ত্রা নিয়ন্ত্রী। স্বাভাবিকভাবেই এইটি তন্ত্রের ধারা। আখ্যানের মধ্যে এই দুটি ধারা পূর্ণবৃত্তরূপ লাভ করে, কারণ হিন্দু অধ্যাত্মদৃষ্টিতে এবং তন্ত্রেও 'পাপ' একটাই তা ভেদজ্ঞান। আখ্যানে যে ক্রমশ তান্ত্রিক অনুষঙ্গ বৃদ্ধি পাচ্ছে তার কারণ তান্ত্রিকী চণ্ডিকার আখ্যান— বণিকখণ্ডের বণিকের কাছে ভেদবর্জিত হয়ে স্মার্তদুর্গার সঙ্গে একাত্মতা লাভ করছে।

৩০৮ শিকলিতে মধ্যযুগের বাংলার কুলসংঘট্ট ও জাতি রাজনীতির আরেকটি প্রকাশ। ৩০৯, ৩১০, ৩১১, ৩১২, ৩১৫, ৩১৬, ৩১৭ সতীধর্মর পৌরাণিক বিবরণ। ৩১৮ শিকলিতে সতীত্বর পরীক্ষা। একেবারে স্মৃতির দিব্যপ্রয়োগের বাস্তব বিবরণ। জলদিব্য, সর্পদিব্য, অগ্নিদিব্য— তাতেও শেষ হয়নি, জতুগৃহদিব্য। দিব্যপ্রয়োগের বর্ণনায় মুকুন্দ রঘুনন্দনকে ছাড়িয়ে গেছেন। ৩২১ শিকলিতে খুল্লনার চণ্ডিকাস্তবে জানা গেল 'বিশালাক্ষ্মীর' অপরধাম 'কাশী'। অপর কয়েকটি দেবী নাম যুক্ত হয়েছে— নীলা, রঙ্কিণী এবং নৈমিষকাননের লিঙ্গাহরা। নীলা— নীলসরস্বতী। লিঙ্গাহরা নামটিও বিপরীতরতাতুরা কালিকামূর্তির নামান্তর। রঙ্কিণী ঘাটশিলার রাজবংশের কুলদেবী (উৎস-গোপেন্দ্রকৃষ্ণ বসু, 'রঙ্কিণী', বাংলার লৌকিক দেবতা)। তাঁর মূর্তিকল্পনায় বন্যহস্তীর অধিবাসী রূপে করধৃত হস্তী— করীবমনকারী চণ্ডিকার সঙ্গে মিশে যাওয়া স্বাভাবিক। আবার শশিভূষণ দাশগুপ্ত যে তাঁকে মূলত রাকিনী কল্পনা করেছেন বলে গোপেন্দ্রকৃষ্ণ জানিয়েছেন, তাও অসম্ভব নয়। এই প্রসঙ্গে বিহারের মনসাব্রত সম্বন্ধে অবেক্ষিত ষড়ভগিনী যুক্তা মনসাও স্মরণে আসা সঙ্গত। (বা.সা.ই-১) কারণ অপর ছয়ভগ্নীর সঙ্গে তাঁর পূজার যোগ। ছয়ভগ্নী তো স্পষ্টতই ষট্চক্রের ছয়জন দেবী। বৌদ্ধতন্ত্রের ধারা থেকে হিন্দুতন্ত্র হয়ে উপজাতিদের মধ্যে তার বিস্তারই স্বাভাবিক। অর্থাৎ ঔপজাতিক গ্রামদেবীরা এই রংকিনীর মধ্যে আত্মলোপ করেছেন। গোপেন্দ্রকৃষ্ণ বসু মনে করিয়ে দিয়েছেন, ইছাই ঘোষ, 'রংকিনী'-র ভক্ত ছিলেন। ইছাই ঘোষ পাল-সেন যুগের স্মৃতিবহন করছেন। ধর্মকাল্টের দেবদেবীরা বৌদ্ধতান্ত্রিক গোত্রের হওয়াই সম্ভব। তবে ডাকিনী, শাকিনী, রাকিনী ইত্যাদি দেবীরা আদিতে ভোটচীনীয়

উপজাতি থেকে বৌদ্ধতন্ত্রে প্রবেশ করে থাকতে পারেন। ধলভূম অঞ্চলে বৌদ্ধতান্ত্রিক দেবীদের পীঠ ছিল তাও স্মরণীয়। ৩২৮ শিকলিতে জ্যৈষ্ঠ মাসের চন্দনদানের স্মার্তবিধি। এটি কিন্তু বৈষ্ণব আচার। ৩৩৬ শিকলিতে 'যাত্রা'-র মুহূর্ত বিচার স্মার্ত 'জ্যোতিষতত্ত্ব' সম্মত। অধিকন্তু হিন্দু বণিকের সমুদ্রযাত্রা কোনোদিনই স্মৃতিতে নিষিদ্ধ ছিল না। কবিকঙ্কণের সময়ে তা রাজনৈতিক-সামাজিক কারণে বন্ধ হওয়ার উপক্রম শুরু হয়েছিল মাত্র। অনুবৃত্তি করলেও মুকুন্দকে আমরা আগে বলেছি সচেতন কবি। সচেতন হলেও নদীপথে সমুদ্র হয়ে সিংহল যাত্রা ব্যতিরেকে আখ্যানটিই গড়ে উঠত না। তবে রঘুনন্দনের কাশীরামটীকায় স্পষ্ট আছে মরণনিশ্চিতসমুদ্রযাত্রার কোনো নিষেধ নেই।[১৭] ধনপতি যে মরণনিশ্চিত যাত্রা করেছিল তার প্রমাণ— পুত্রর নাম দিয়ে যাওয়া ও পরে তাকে চিনবার জন্য অঙ্গুরীয় প্রদান। ৩৪৬ শিকলিটিতে চণ্ডিকা স্তোত্রটি চণ্ডিকার পৌরাণিকতায় আত্মলোপের লক্ষণ। ৩৫৭ শিকলিটি ঠিক বিপরীত। 'কমলে কুঞ্জর কান্তা' দেখে সদাগর তার পরিচয় সম্বন্ধে সংশয় প্রকাশ করে পুনশ্চ বলে— 'ডাখিনী হাকিনী কিবা মুল্লিকা জোগিনি/কামের কামিক্ষা...' এই চারজন নিঃসন্দেহে তান্ত্রিকী। মুল্লিকা আমাদের বিশ্বাস— মৌলীক্ষা দেবীর ব্যঞ্জনসঞ্জাত নাম। ইনি মূলে বৌদ্ধদেবী পাণ্ডরা। রাঢ়-এর জাগ্রত দেবী। একটিই মন্দির তারাপীঠের নিকটে মুলুটিতে।[১৮]

৩৮২ শিকলিতে লহনার ভাগবত শ্রবণ লক্ষণীয়। লহনা শ্রোতামাত্র। খুল্লনার শাক্তসাধনার বিপরীতে ভাগবতশ্রবণরতা লহনা! মুকুন্দর বিষ্ণুভক্তি পদে পদে প্রকাশিত হলেও লহনার ভাগবতীয় স্বভাব তাঁর জীবনে কতটা প্রকাশ পায় তা প্রশ্নস্থল। তবে আমরা যে প্রস্তাব করেছিলাম শাক্ততান্ত্রিক সাধনার স্মার্তমুখোশের আড়ালে মুখ ঢাকার কারণ শুধু কোনো কোনো ক্ষেত্রে তাদের সাধনক্ষেত্রগত মিলই নয়, বৈষ্ণবপ্রতিপক্ষতাও তাদের মুখ লুকোতে বাধ্য করছিল, এই পয়ারটি আমাদের অনুমানের একটি প্রমাণ।

বয়ান যত এগিয়েছে জ্যোতিষের ও পুরাণের পুরনো মোটিফগুলি নানা প্রসঙ্গে ফিরে ফিরে এসেছে। কিন্তু সপ্তমদিবস দিবাপালার ৪১০ শিকলিটি উল্লেখের দাবি রাখে। লঙ্কা যে রাক্ষসপুরী, মুকুন্দর চেতনায় তাই-ই ছিল। সিংহল যে রামায়ণেরই লঙ্কা তা নিয়ে সংশয় নেই— কারণ শ্রীমন্তর উক্তি—

বিচারিয়া নানা তন্ত্র   লইব রামের মন্ত্র
নিশাচরে না করিব শঙ্কা।

সিংহল বা দক্ষিণ পাটনের অবস্থান নিয়ে যতই তর্ক হোক না কেন 'লঙ্কা' যে এক্ষেত্রে mythical তা নিশ্চয়। ৩৫৪ শিকলিতে নিশ্চিতভাবে বর্ণিত হয়েছে এই লঙ্কা বা সিংহল বর্তমান শ্রীলঙ্কা। কারণ 'রামেশ্বর' অতিক্রম করে ধনপতি সেখানে পৌঁছেছে। অন্তত মুকুন্দর সময় পর্যন্ত শ্রীলঙ্কাই যে রামায়ণের লঙ্কা— মানুষের এই ধারণা ছিল, তা ৪১০ শিকলিতে প্রমাণিত। বলাবাহুল্য এটি স্মার্ত-পৌরাণিক প্রভাবই বটে। দ্বিতীয়ত শ্রীপতির রামমন্ত্র স্মরণ কিন্তু বিবিধ তান্ত্রিক নিবন্ধে ধৃত রামমন্ত্র। তা রামভক্তিবাদ কিনা সংশয়স্থল। ৪২৩, ৪২৪, ৪২৫ শিকলিগুলিতে পৌরাণিক তীর্থমাহাত্ম্য বর্ণিত। তীর্থমাহাত্ম্য ও তীর্থকৃত্য

স্মৃতিশাস্ত্রে কৃত্যতত্ত্বের অন্তর্গত। ৪২৭ শিকলি চৈতন্যোত্তর গৌড়িয়ার পুরুষোত্তমতীর্থ পরিচিতির প্রমাণ। ৪২৯, ৪৩০, ৪৩১ শিকলিগুলি রামায়ণের পুনর্পাঠ। ইতিহাস, পুরাণ ও স্মৃতি একত্রে 'স্মৃতিপ্রস্থান'। ৪৪৩ শিকলিতে ধর্মশাস্ত্রানুসারে দণ্ডবিধানের কথা সিংহল রাজের মুখে শোনা যায়। ৪৫৫ শিকলিতে ক-কারাদি চণ্ডিকাস্তুতি বিপরীত পক্ষে অবশ্যই তন্ত্র প্রভাবিত। 'বাংলা'-য় বলে তাকে 'লৌকিক' বলা যাবে না। তান্ত্রিক সাধনায় 'ভাষা' যে স্বীকৃত— দোহাকোষ থেকে চর্যাপদে তার প্রমাণ আছে। 'বৃহদ্ধর্মপুরাণ'-এ উত্তরখণ্ডে ঊনবিংশ অধ্যায়ে নিষেধমুখে বলা হয়েছে 'কলিতে প্রাকৃতভাষায় অশাস্ত্রকে শাস্ত্ররূপে কল্পনা করে শূদ্রগণ ধর্মের ভাবকীর্তন করবে।' (১৯।১৩) সুতরাং এ থেকে যে বাস্তবের একটা ছবি পাওয়া যাচ্ছে তাতে সন্দেহ নেই। ৪৬৫ থেকে ৪৬৭ শিকলি বিভিন্ন পৌরাণিক বর্ণনার উপাদানে গঠিত। ৪৭১ থেকে ৪৭৫ শিকলি অতীব রহস্যময়। এই যুদ্ধ কি আদৌ সিংহল নামক দেশের রাজার সঙ্গে যুদ্ধ? এতো মার্কণ্ডেয়চণ্ডীর প্রত্যক্ষ প্রভাবে গঠিত। অষ্টমাতৃকার যুদ্ধে অংশগ্রহণও তার চিহ্ন। এই যুদ্ধের কী প্রয়োজন ছিল? দেবীর ইঙ্গিতমাত্রেই কার্যসিদ্ধ হতে পারত। ৪৭৯ শিকলিতে সিংহলরাজ নিজেই তা বলেছেন। তবে কি শ্রোতাকে চণ্ডীপাঠের আমেজ দেওয়া? তাহলে চণ্ডী-সপ্তশতীর সাধনসমরটুকুও তাকে মনে করিয়ে দেওয়া অন্য উদ্দেশ্য হবে না কেন? আখেটিক খণ্ডে সে প্রয়োজন হয়নি। 'ঈশ্বরেচ্ছা'। কিন্তু স্মার্তমতেও তা হয়তো অসম্ভব নয়। বিপ্র এবং শূদ্র এই দু'ভাগেই বিভক্ত রঘুনন্দনের সমাজ। ধরে নিতে হবে রাক্ষসসংসর্গে সিংহলরাজও গন্ধবণিকের পর্যায়ভুক্ত সৎশূদ্রই হয়েছেন। গন্ধবণিক বৃহদ্ধর্মপুরাণ মতে সৎশূদ্র। সিংহলরাজ— 'দ্রবিড়ঃ' হলেও ব্রাত্যক্ষত্রিয়। ব্রাত্যক্ষত্রিয় ও সৎশূদ্র একই পর্যায়। বৃত্তিতে ও বর্ণে ঈষৎ প্রতিলোম হলেও 'সৎশূদ্রপ্রযুক্তত্বাৎ' বিবাহে বাধা নেই। বিক্রমকেশরীর পক্ষেও একই কথা প্রযোজ্য। ৫৩০ শিকলিতে অবশেষে 'আগমপুরাণে কত আছে কলিগুণ/তোমারে কহিব মিত্র সাবধানে শুন।' পুনশ্চ পুরাণ ও তীর্থ বিবরণ।

কবিকঙ্কণের চণ্ডীমঙ্গল-এর বণিকখণ্ড পরিক্রমায় পুরাণের প্রসঙ্গ, তীর্থমাহাত্ম্য, স্মার্তজীবন আমরা নিষ্ঠার সঙ্গে অনুসরণ করেছি। কিন্তু তীর্থবর্ণনার মধ্যে যাত্রাপথের বিবরণটুকু ছাড়া অন্যদিকে স্মার্ত বিপ্র-শূদ্রে বিভক্ত সমাজে রাজকন্যা ও বণিক পুত্রের বিবরণ ছাড়া, আখ্যানে পুরাণের ও স্মৃতির প্রসঙ্গ ও স্মৃতির বিচার একবারই গুরুত্বপূর্ণ হয়েছে। শ্রীপতির সঙ্গে তার শিক্ষাগুরুর বিবাদ। সেই বিবাদের ফলে প্রবাসীপিতার সন্তান হিসেবে 'জারুয়া' অখ্যাতি থেকে শ্রীপতির যাত্রা শুরু। কিন্তু তাও কি অনিবার্য ছিল? ধনপতি তো বলেই গিয়েছিল সে নির্দিষ্ট সময়ে না ফিরলে তার ভাবীপুত্রকে চিহ্নসহ সিংহলে পাঠাতে। তাহলে আখ্যানের বাহিরের দিকে এই পৌরাণিক স্মার্ত বিবাদটুকুও অপ্রয়োজনীয় হয়ে গিয়ে একটা রূপক আখ্যানের সম্ভাবনাকে প্রকট করে তোলে। মনে রাখতে হবে তন্ত্র রূপকের ভাষাতেই কথা বলে। সিদ্ধ সাধক শ্রীপতির কৌলমার্গে জাতি-বিচার চলে না। তা নয়ত রাজকন্যা যতই ব্রাত্যক্ষত্রিয় অর্থাৎ মনুমতে শূদ্র হোক না কেন, শ্রীপতির সঙ্গে তার বিবাহ সম্ভব হত না। বানিয়া এবং রাজকন্যায় প্রতিলোম বিবাহ মধ্যযুগের বাংলাদেশে সহজ ছিল

না। তবে একটা কথা মনে রাখতে হবে— দুটি মঙ্গলকাব্যের বিচারে চাঁদসদাগর, ধনপতির পূর্বজ। চাঁদ নিজেই কিন্তু রাজা। তার পুত্র 'রাজার কুমার'। বিত্তপ্রাচুর্য যে সামাজিক অবস্থানকে বদলাচ্ছে তারও একটা পরোক্ষ প্রমাণ এখানে পাওয়া যাচ্ছে।

বিপ্রদাসের মনসামঙ্গালে গণেশবন্দনা, পঞ্চদেবতার বন্দনা দশদিক্‌পাল, নবগ্রহ, সপ্তর্ষি ইত্যাদি বন্দনার সঙ্গো ধর্ম, মনসা, নেতো, জরুৎকারুর বন্দনা দিয়ে আখ্যানের সূত্রপাত। বাংলার সৃষ্টিতত্ত্বে ধর্ম-মনসার বিশেষ স্থান আছে। তাদের সঙ্গো সৃষ্টিতত্ত্ব গভীরভাবে জড়িত— যা আবার নানা উপাদানে তৈরি ও আখ্যানের সঙ্গো সম্পর্কিত। ৩, ৪, ৫, ৬, ৭ শিকলি সবই 'মনসাপুরাণ'-এর স্থাপনা। আখ্যানভাগে পৌরাণিক নাম এলেও, ব্রাহ্মণ্য পৌরাণিক নয়। নানাপুরাণের চূর্ণে তৈরি ৮, ৯, ১০, ১১, ১২, ১৩, ১৪, ১৫, ১৬, ১৭, ১৮ শিকলি শিব, গঙ্গা, চণ্ডী, ধর্ম, মনসা (জন্ম)-কে নিয়ে তৈরি অন্যতর পুরাণ। স্মার্ত পুরাণের নাম এতে থাকলেও এই আখ্যানগুলিকে আবার কেবল লৌকিক গল্প হিসেবে পড়লে হবে না। এই আখ্যানগুলির জড় আছে নানান দার্শনিক ধারায়। ১৯, ২০ শিকলি বিনতার আখ্যান। ২১, ২২ চণ্ডী ও মনসার কলহ। চণ্ডী-গঙ্গা কলহ এবং চণ্ডী-মনসা কলহ যেমন তুলনীয় আবার তেমনই চণ্ডীমঙ্গালের চণ্ডী ও মনসামঙ্গালের চণ্ডীর মধ্যে পার্থক্য আছে। মনসামঙ্গালের চণ্ডী প্রথমদিকে স্মার্তগৃহস্থধর্মের প্রতিভূ। মনসা তা নয়। জরৎকারর সঙ্গো তার দাম্পত্য নামে মাত্র। পিতার সঙ্গো তার সম্পর্ক নিয়ে কানাকানি আছে। অন্যত্র উল্লিখিত 'বাপনভাতারী' বিশেষণটি তাৎপর্যপূর্ণ।

দ্বিতীয় পালার প্রথম শিকলিতে মনসার পুরী নির্মাণে ছত্রিশ জাতির উল্লেখ আছে। লক্ষণীয় বারে বারে ঐতিহাসিকরা চাতুর্বর্ণ্য বাংলাদেশ ছিল না বললেও ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও পৃথকভাবে পঞ্চবণিকের উল্লেখ মেলে। মুকুন্দের গুজরাট নগরেও তাই। তৃতীয় শিকলিটির দিকে বিশ্লেষকরা নজর দেননি। ব্রহ্মার বীর্য্যে চণ্ডীর গর্ভ। পরকীয়া ইন্দ্রিয়চাঞ্চল্য মনসামঙ্গালের বৈশিষ্ট্য। এই লক্ষণে সে স্বভাবত স্মার্তধরন থেকে পৃথক হয়ে যায়। কপিলাগাভীর চৌর্যবৃত্তিও ইঙ্গিতপূর্ণভাবেই অস্মার্ত। ১০ শিকলিতে অপৌরাণিক আখ্যানের সঙ্গো সমুদ্রমন্থন, ইন্দ্রঐরাবত, লক্ষ্মী, দুর্বাসা, অমৃতভাগ, অমৃতর পরে কালকূটের উত্থান বর্ণিত। কালকূট যে সমুদ্রমন্থনে পরে উঠেছে তা আখ্যানের প্রয়োজনে। পরবর্তী অংশে জরুৎকার মুনি, শিবদুহিতা মনসা এবং শিবের আদেশে বিবাহ প্রসঙ্গা। মুনির বিবাহে জাতিবিচার অবান্তর। চতুর্থ শিকলিতে পরীক্ষিৎ-কে অবলম্বন করে সঙ্ক ধন্বন্তরীর কাহিনি। এতো বাংলার নবপুরাণ। জনমেজয়ের সর্পযজ্ঞ অবশ্য মহাভারতীয়।

চতুর্থপালার ১০ শিকলি থেকে চাঁদের আবির্ভাব, গন্ধবণিক জাতি। বৃত্তিতে বাণিজ্য। পদে রাজা। শুধু শিবের পূজা করে না। 'শিব দুর্গা অপবর্গা সেবে অনায়াসে।' তাহলে চাঁদও স্ত্রীদেবতার পূজা করবে না বলে কোন্ যুক্তিতে?

চতুর্থপালার রাখালদের কাহিনিতে 'দশহরা তিথি' মাহাত্ম্যটি শুধু স্মার্ত। হাসান হোসেন পালা ইসলাম প্রভাবের ফল। মনসামঙ্গালের পঞ্চম শিকলিতে মনসা হাসানকে বর দিচ্ছেন— 'অচিরাতে রাজ্য কর নিজ মনোসুখে।' ধর্মকান্তের সঙ্গো ইসলামের চুক্তির সঙ্গো

এই অংশের বৈপরীত্য তুলনীয়। এইখানে মনসাপূজকদের সঙ্গো ইসলামের বৈরিতার অবসান সূচিত হয়। মনসাকাল্টের সঙ্গো ইসলামের দ্বন্দ্ব ছিল না তা চৈতন্যভাগবতেও প্রতীত হয়। কাজী— চণ্ডী-বিষহরির সদম্ভ পূজায় কোনো বাধার সৃষ্টি করেছে বলে জানা যায় না। আসলে মনসার সঙ্গো স্মার্ত বা ইসলামের দ্বন্দ্ব যতটা তাত্ত্বিক স্তরে সম্ভব বলে মনে করা হয়, বাস্তবে তা ততটাই অসম্ভব। কারণ সর্পভয় মানুষের মজ্জাগত মৃত্যুভয়। মনসাআখ্যানের আমরাও যে রূপকই বার করি না কেন এটা ভুলে গেলে চলবে না— প্রাকৃতিক সর্পভয়— আধিভৌতিক ভয়। তাই মনসার সঙ্গো চুক্তি করতে ইসলামও যেমন বাধ্য, স্মার্তও ততটা বাধ্য। বাংলাদেশে এই বাধ্যবাধকতাকে কোনো সামাজিক ইতিহাসের নির্দিষ্টবিন্দু থেকে শুরু করা যায় না। সর্পঅধ্যুষিত বাংলাদেশে যখনই যে সংস্কৃতি বা জনগোষ্ঠী এসেছে— তাকে কোনো না কোনোরূপে সর্পদেবীর আরাধনা করতে হয়েছে। সেইজন্যেই তান্ত্রিক প্রকাশ্য অনুষঙ্গ বিধিবদ্ধ মনসাআখ্যানে প্রবলভাবে থাকলেও তার 'লোকজীবনগত' স্বরূপকে মূলে অস্বীকার করা যাবে না। এখনও মনসামঙ্গালের বিধিবদ্ধ আখ্যানের পাশাপাশি, মনসার মন্ত্রজাত অনুন্নত সম্প্রদায়ে প্রবলভাবে প্রচলিত। সেইসব মন্ত্রেও প্রচুর তান্ত্রিকতার চিহ্ন বিদ্যমান। তবু মনে রাখতে হবে— তন্ত্রবিদ্যায় রোগনাশন বিষবিদ্যাও যেমন 'জ্ঞান' তেমনই সর্পাকারকুণ্ডলিনীবিদ্যাও 'মহাজ্ঞান'। বিষবিদ্যার সূত্রেই মনসামঙ্গালের আসরের বাহিরে ওঝাদের বিষনামানোর মন্ত্রে মনসার প্রসঙ্গো তান্ত্রিকতার অনুপ্রবেশ। স্মার্তধারায় ঔষধকরণ, বিষহরণ আয়ুর্বেদের অন্তর্গত। তান্ত্রিকীধারায় তা অতিপ্রাকৃত তন্ত্রসাধনার রহস্যবিদ্যার অন্তর্গত। সেই রহস্যবিদ্যা হিন্দু/মুসলিম ওঝা সম্প্রদায়ের মন্ত্রে প্রচলিত। আবার তা থেকে মনসামঙ্গালের আখ্যানের ভিতরের অর্থটিও বোঝা যায়। কুণ্ডলিনীসাধনা যেখানে মুক্তিপ্রদায়িকা মহাবিদ্যার সাধনা, বিষনাশনবিদ্যা সেখানে সিদ্ধাইয়ের অন্তর্গত। মনসা নিজেই মহাবিদ্যা— সে মহাদেব, চণ্ডী, লখিন্দরের বিষ ঝেড়েছে মহাবিদ্যার অন্তর্গত সিদ্ধাই দিয়েই। চাঁদ প্রাথমিকভাবে মহাদেবের থেকে এই 'সিদ্ধাই' পেয়েছিল। কিন্তু মনসারহিত মহাদেব যেমন মনসামঙ্গালে 'পূর্ণসিদ্ধ' নন (হলে তিনি কালকূট পানে মৃত্যু বা মূর্চ্ছায় কাতর হতেন না) চাঁদও তাই মনসা-বিদ্যায় সিদ্ধ না হয়ে 'সিদ্ধাই' হারিয়েছিল।

যাইহোক মনসাতন্ত্র বা লতাতন্ত্রে যে শুধু হিন্দুরই অধিকার তা নয়, তন্ত্রে 'যবনের'ও পূর্ণ অধিকার আছে। মনসামঙ্গালে হাসন রাজার আখ্যান তারই দ্যোতক। তবে তার পূজায় 'দ্বিজগণ' 'বেদগান' করছেন এটি গায়েনদের কল্পনামাত্র বা কবির কল্পনাবিলাস। স্মার্ত মতে সংকল্প করে সম্পন্ন 'যবন' গৃহে মনসাপূজার কোনো ইতিহাস আমরা ঐতিহাসিক আকরে পাইনি।

টেক্সটে জালু মালু জেলে। ধীবর। সুকুমার সেন দেখিয়েছেন ঝল্লমল্লরাই জালু মালু।[১৯] ঝল্ল মল্লর উল্লেখ মনুতে আছে। ধীবর সম্প্রদায়ের উল্লেখও মনুতে আছে। ঝল্লমল্লর উল্লেখ ব্রাত্য প্রসঙ্গো বৈদিক সাহিত্যেও আছে।[২০] সনকা এদের থেকে মনসাকে পেলে ধরে নিতে হবে, যবে থেকে গোপ এবং ঝল্লমল্লরা আর্যসংস্কৃতিবৃত্তে উল্লিখিত হচ্ছে তখন বা তার

আগে থেকেই সর্পদেবীর পূজা 'সনাতন' ধর্মপদ্ধতিতে প্রবেশ করেছে। ঝল্লমল্ল যদি 'ব্রাত্যসংস্কৃতিধারা'-র অন্তর্গত হয় তবে মুনিপন্থী অবৈদিক অথচ আর্য সাধনমার্গগুলি সর্পদেবী পূজার সঙ্গে যুক্ত থাকবেই। স্বাভাবিকভাবেই মনসার পুরাণ তখন স্মার্তধারার হবে না এবং স্মার্ত অনুষঙ্গও তখন কমে যাবে। বৈদিক পূর্বমীমাংসাবিরোধী ও স্মার্তবিরোধী চরিত্র ছিল বলেই ইসলামকে অঙ্গীভূত করতেও মনসামঙ্গালের বাধা নেই। কিন্তু স্মার্তরাও তাঁকে অস্বীকার করতে পারেননি। সংস্কৃতে তাঁকে নিয়ে কাব্য রচনা হয়নি তাঁর 'লোকায়ত' স্বভাবের জন্য। কিন্তু জৈন, বৌদ্ধ এবং দেবীভাগবত এবং অর্বাচীন পুরাণে রূপ বদলে তাঁর কথা নানাভাবে চলে এসেছে অবিচ্ছিন্ন ধারায়। মনসার আধ্যানের আভাস প্রাকৃত সাহিত্যেও পাওয়া গেছে। লঙ্কেশ্বরের 'প্রাকৃতকামধেনু'-র কথা এইপ্রসঙ্গে স্মরণযোগ্য।

সর্পভীতি চিরন্তন আধিভৌতিক ভীতি বলেই নিম্নবর্ণের বিষবৈদ্যরা বা বৌদ্ধ সহজিয়া সর্পবৈদ্যরা যখন স্মৃতিপ্রধান যুগে অনেকাংশে মুসলিম হয়েছেন তখনও মনসাকাল্ট ছাড়েননি। তবে নিম্নবর্ণের বাদিয়ারা মুসলিম হয়ে যাচ্ছেন বলে স্মার্তাধীন কবিরা মনসামঙ্গাল লিখলেন ও হাসনরাজাকে জায়গা করে দিলেন, না স্মার্ত কবিরা মনসাআখ্যান লিখে ও স্মৃতিগ্রন্থে রঘুনন্দন তাঁকে ব্রাহ্মণশাসনের অন্তর্ভুক্ত করলেন বলেই বর্ণাশ্রমঅধিকাররহিত অন্ত্যজ মনসাসেবকরা আরো বেশি করে মুসলিম হতে বাধ্য হলেন তা কোনোভাবেই নিশ্চিত করে বলা যাবে না। তন্তবায় বিষ্ণুপাল, বৈদ্য বিজয়গুপ্ত মনসামঙ্গাল লিখলেও মনসাপূজার ধারাটি এখানো স্মার্তবিদ্যাপতির 'ব্যাড়ীভক্তিতরঙ্গিণী' বা গোবিন্দানন্দের 'বর্ষক্রিয়াকৌমুদী' অনুসারেই হয়। বিদ্যাপতি রঘুনন্দন প্রায়সমকালীন। স্মার্তধারায় মনসাপূজাপদ্ধতি ও সাধারণ গ্রামীণ গৃহস্থসম্প্রদায় যাঁরা গৃহস্থ হিন্দু কবিদের মনসামঙ্গালের আসরে উপস্থিত থাকেন তাঁরা তো মুসলিম বিষয়ে 'Inclusive' নন।[২১] সেইজন্য বলা যায়— ইসলামের অভ্যুদয় ও মনসামঙ্গালের 'Inclusive Folk Character' নিয়ে আত্মপ্রকাশ এর সরল তত্ত্বটি ঘাতসহ নয়। স্পষ্টত মনসার দুটি ধারা এখনো বর্তমান। একটি আধা-সম্পন্ন হিন্দুগৃহস্থের ঘরে, আরেকটি মুসলিম বাদিয়াদের স্তরে। একটি ধারায় চাঁদ সদাগর, অপর ধারায় গারুড়ি ধন্বন্তরি। দুইয়েরই ঊর্ধ্বে মনসা। তান্ত্রিক সাধন আখ্যানও দুই স্তরে দুইরকম। চাঁদের স্তরে বীরাচার, অন্যদিকে গারুড়ির ধারায় বিষনামানো। ষষ্ঠ পালার ৯, ১০ শিকলি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। বিদ্যা হিসেবে মনসা শুধু সরস্বতীরই সঙ্গে জড়িত নন, তিনি শ্রী বা লক্ষ্মীর সঙ্গেই জড়িত। তাঁর গোয়ালিনী বেশে কমলা নামগ্রহণ গৌরীমহেশ্বরকে তাঁর পিতামাতা বলা— লক্ষ্মীর সঙ্গে সম্পর্কের প্রমাণ। লক্ষ্মীর পুরাকথায় গাভীও যুক্ত। সেই সূত্রেই গোপসম্পর্ক ও মনসা গোয়ালিনী। স্মার্তবিধানে সর্পভয়নিবারণে দুগ্ধপান কৃত্য।

ষষ্ঠ পালার ১৬ শিকলি মনসার 'মন্ত্রজাত'। বিষনামানোর তান্ত্রিকীমন্ত্র। আখ্যানের ভিতরেই মন্ত্রপ্রবেশ 'চণ্ডী' আরো বিশেষ করে মনসামঙ্গাল আখ্যানকে 'পদ্ধতিশাস্ত্র'-র রূপদান করেছে। আমরা পূর্বেই বলেছি বৃহদ্ধর্মপুরাণ বলেছে— সংস্কৃতেতর ভাষায় কলির 'ধর্মশাস্ত্র' রচিত হয়েছে। মনসামঙ্গাল তার বড়ো উদাহরণ।

অষ্টম পালার ১৩, ১৪ শিকলিতে অনিরুদ্ধ-ঊষার কাহিনিতে পৌরাণিক প্রভাব

লক্ষণীয়। নবম পালার প্রথমেই সনকার ব্রত। খুল্লনার মতোই এ ব্রতও স্বামীনির্দেশবঞ্চিত অস্মার্ত। দশম পালার ৪ শিকলিতে লখিন্দরের কর্ণবেধ প্রসঙ্গা পাই। এই বিষয়ে আমরা পূর্বে আলোচনা করেছি। চাঁদেরও তীর্থকৃত্যগুলি লক্ষণীয়। দশম পালার ১৫ শিকলিতে দেখি সর্বস্বহারা চাঁদ কলাচোপা দিয়ে শিবপূজা করে। তখন তার অবস্থা হৃতসর্বস্ব। কিন্তু নিত্যপূজায় সে অবিরত। এইটি আমরা ধনপতির ক্ষেত্রেও দেখেছি। এমনকী মুকুন্দ নিজেও। স্মার্ত নিত্য কর্মপদ্ধতির প্রভাব এখানে অবশ্যই লক্ষণীয়। তবে ধনপতি ও চাঁদ দুজনেই শূদ্র। অনুমান করা যায় শিবমন্ত্রে দীক্ষিত। তবে তাদের সম্প্রদায় ও চণ্ডীমনসার সঙ্গো সম্প্রদায়-বিরোধ বিচারের অপেক্ষা রাখে। জীবনাচরণে স্মার্তবিধি তারা অনুসরণ করে। দ্বাদশ পালার ৫ শিকলি তার প্রমাণ। দ্বাদশ পালার ৩২ শিকলিতে স্মার্ত ব্রতমাহাত্ম্য ঘোষিত হয়েছে পরোক্ষে। ঐ পালার ৪৫ সংখ্যক শিকলিতে দেখি মনসা স্ত্রীবধপাতক এড়াতে বেহুলাকে বাঁচায়। দ্বিজবধ, স্ত্রীবধপাতক এড়ানো স্মার্ত বৈশিষ্ট্য।

তবে অবশ্যই চণ্ডীমঙ্গালের স্মার্ত পৌরাণিক প্রভাবের তুলনায় মনসামঙ্গালের স্মার্তলক্ষণ অনেক কম। অধিকাংশ মিথই অব্রাহ্মণ্য। হতেই পারে কিছু মিথ বাংলায় বা বৃহৎবঙ্গো ব্রাত্যআর্য প্রভাবের ফল। নতুন সংস্কৃত নামের চরিত্রও বহুবিদ্যমান। মনসার আখ্যান গোপ ও বিশেষত ঝল্লমল্লদের সঙ্গো সংযুক্ত হওয়ায় এই অনুমান করা যায়। তান্ত্রিক সাধনার অনুষঙ্গ ও রূপক বহুল পরিমাণে ব্যবহৃত হওয়ায় মঙ্গালকাব্যের আখ্যানটির ধরনও অনেক খোলামেলা। বিজয়গুপ্ত ও ক্ষেমানন্দের টেক্সটেও সেই লক্ষণগুলি বিদ্যমান।

ধর্মমঙ্গালের প্রসঙ্গা জটিলতর। আমাদের বিচারে ধর্মমঙ্গালের আখ্যানবিন্যাসের মধ্যে হিন্দুবাঙালির ধর্মসাধনার বিবর্তনের ইতিহাস যেমন লুকিয়ে আছে, তেমনই ধর্মমঙ্গালের আখ্যানের বিশ্লেষণের মধ্যে মঙ্গালকাব্যধারার উদ্ভব ও অবয়বের ইতিহাস প্রচ্ছন্ন হয়ে আছে। সেইজন্যই তন্ত্রে-স্মৃতিতে মেশানো হিন্দুধর্মে ধর্মদেবতার অন্তর্ভুক্তি দুই-ই সুনিপুণভাবে বিশ্লেষণযোগ্য। 'ধর্মমঙ্গাল' কাব্যের অন্তর্ভুক্ত ধর্মকাল্টের তাত্ত্বিক রূপটি আছে 'শূন্যপুরাণ'-এ এবং প্রায়োগিক রূপটি আছে 'ধর্মপূজাপদ্ধতি'-তে। লক্ষ করতে হবে রঘুনন্দনের অষ্টাবিংশতিতত্ত্বে 'ধর্মপূজাপদ্ধতি' অন্তর্ভুক্ত হয়নি। এমনকি উনিশ-বিশ শতকের 'ক্রিয়াকাণ্ডবারিধি' বা 'আহ্নিককৃত্য'-র মত মান্যতম দুটি পদ্ধতিগ্রন্থেও ধর্মপূজাবিধির কোনো উল্লেখ নেই। মূলত এই দূরবর্তী অবস্থানের জন্যেই ধর্মমঙ্গালে আধারিত ইতিহাসধারাকে বেশি নির্ভর করা যায়।

ধর্মদেবতার মধ্যে বৈদিক, অবৈদিক, পৌরাণিক দেবতাদের সমন্বয় ঘটেছে, তা নিয়ে পণ্ডিতেরা দীর্ঘ গবেষণা করেছেন। হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর মতকে কেউ কেউ সমালোচনা করেছেন, কিন্তু একথা ধর্মমঙ্গালের ধর্মদেবতার অন্তশ্চরিত্র সম্বন্ধে প্রায় অকাট্য যে— ধর্মমঙ্গাল যে রূপে আমাদের হাতে এসে পৌঁছেছে তাতে— হিন্দু ব্রাহ্মণ্যে স্বাতন্ত্র্য বিসর্জনের শেষ ধাপটির আগে পর্যন্ত তার রূপটি বৌদ্ধ। শূন্যপুরাণের সম্পাদক ভক্তিমাধব চট্টোপাধ্যায় বলেছেন— 'ধর্মঠাকুরের আলোচনার সূত্রপাত থেকেই পণ্ডিতেরা বলে আসছেন, ইনি 'বৌদ্ধঠাকুর'। এখনও সে আলোচনার শেষ হয়নি। পরবর্তীকালে ধর্মঠাকুরের আরো

অন্যান্য বহুদেবদেবীর আভাস-প্রভাব মিলেছে, শেষ এসে ঠেকেছে অপসৃয়মান বৌদ্ধধর্ম ও বৌদ্ধ সন্ন্যাসীর শূন্যতা ও গৈরিকে তুর্কী আক্রমণের পর ত্রয়োদশ-চতুর্দশ শতাব্দীতে যারা মুখ লুকাল বাংলার নিম্নকোটির ব্রাত্য সমাজের অন্তরালে, গৈরিককে রূপান্তরিত করল ধর্মের সর্বশুক্লতায় এবং জ্ঞেয়-জ্ঞাতার অভিন্ন শূন্যতায় অঙ্গীকার করল সর্ববিধ সগুণত্ব।'[২২]

বিশ্লেষণটি সঠিক সন্দেহ নেই। সেনরাজবংশের হিন্দুতন্ত্রের প্রতি প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ উৎসাহে এবং স্মার্তক্রিয়ার প্রতি আত্যন্তিক আকর্ষণের ফলে বৌদ্ধধর্মাচারগুলির অবমূল্যায়নের সূত্রপাত এবং তুর্কি আক্রমণকারীদের প্রত্যক্ষ আক্রমণে ও তাদের পরোক্ষ প্রশ্রয়ে স্মার্ত হিন্দুদের প্রতিক্রিয়ায় ধর্মকাল্টকে লোকায়ত সমাজেই আত্মরক্ষা করতে হয়। কিন্তু মনে রাখতে হবে— কোনোভাবেই চণ্ডী ও মনসার ইতিহাস এই মুখ লুকোনোর ইতিহাস নয়। তার প্রমাণ যে, রঘুনন্দনেই তাঁরা স্বীকৃত হয়েছেন। তাঁদের পশ্চাতে বৌদ্ধদেবীদের ছায়া আছে নিশ্চিত, সেই বিবর্তনের ধারা প্রত্যক্ষত মঙ্গালকাব্যর যুগ পর্যন্ত বেয়ে এলেও— চণ্ডী বা মনসার বৌদ্ধবীজগুলি মঙ্গালকাব্যের যুগের আগেই হিন্দুধর্মের অন্তর্ভুক্ত হয়েছে হিন্দুতন্ত্রের দার্শনিক ব্যাখ্যার সরণীতে। তার ফলেই বাংলাদেশের বৌদ্ধযুগের সমকালের বা তারও পূর্বের পাশাপাশি বহমান পুরাণ-সাহিত্যে তাঁদের পূর্ববীজ লক্ষ করা গেছে। কোনো কোনো বৌদ্ধদেবীর চণ্ডী, মনসার বিবর্তিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তাঁদের নিজস্ব বৌদ্ধতন্ত্রের দর্শনপটভূমিকা থেকে হিন্দু তন্ত্রের দর্শনপটভূমিকাতে ভূমিকান্তর ও রূপান্তর ঘটে গেছে। সেই ইতিহাস মনসামঙ্গাল, চণ্ডীমঙ্গালে যত না আছে, আরো স্পষ্ট করে আছে ধর্মমঙ্গালে। সেইজন্যেই নতুন করে মঙ্গালকাব্যপাঠের পটভূমি রচনা করতে পারে 'ধর্মমঙ্গালপাঠ'। অন্যান্য বৌদ্ধ দেবদেবীদের মতো ধর্মঠাকুরের ক্ষেত্রে এই দার্শনিক গোত্রান্তর একইরকমভাবে হয়নি। হয়নি যে তার সবথেকে বড়ো প্রমাণ— ঘনরামের ধর্মমঙ্গাল জুড়ে ধর্মদেবতা ও ভবানীদেবীর সংঘাত।

বৌদ্ধ ক্ষণভঙ্গাবাদ আলোচনা করে ড. শশিভূষণ দাশগুপ্ত দেখিয়েছেন— যেমন নামরূপের কোনো নির্দিষ্ট অস্তিত্ব নেই, তেমনই সৃষ্টিবীজও বিজ্ঞানবাদী বৌদ্ধদের কাছে এক ভেদবর্জিত শূন্যতার ধারণা মাত্র। কিন্তু মহাযান মতে প্রবৃত্তিমার্গে অর্থাৎ সৃষ্টিব্যাখ্যায়— ত্রিকায়ের অন্তর্গত 'ধর্মকায়' একটা 'Cosmic unity or the organised totality of Things. Though not as a purely philosophical concept, but an object of religious consciousness, approximates the idea of the Brahman.' পুনশ্চ তিনি বলেছেন— 'The Dharma-kaya Buddha became the Lord Supreme, The Sambhoga kaya Buddha became the Dhyani Buddhas.'[২৩] বলাবাহুল্য ধর্মকায় বুদ্ধই ধর্মদেবতার শেষ আর্কেটাইপাল রূপ। তিনি, নারীও নন, পুরুষও নন। নারীরূপে প্রকাশিত হলে পুরুষ তার অন্তর্গত, পুরুষ রূপে প্রকাশিত হলে নারী তার অন্তর্ভুক্ত। স্বাভাবিকভাবেই ধর্মদেবতার শক্তি কল্পনা অবান্তর[২৪] (পঞ্চধ্যানী বুদ্ধের ধর্মকাল্টে পাঁচ পুরুষদ্বারী ও তাদের শক্তি সহ প্রকাশ আছে, তার আলোচনা এ প্রসঙ্গে অপ্রয়োজনীয়।)। এই ধর্মদেবতার সঙ্গে নাথযোগীধর্মের সম্পর্কটিও লক্ষণীয়। ড. সুকুমার সেন— প্রবন্ধাবলী

'বিচিত্রদেবতা'— প্রথম খণ্ড— (এ. কে. সরকার— ১৯৮৪) গ্রন্থের ১৮৬-১৮৭ পৃষ্ঠাতে বলছেন—

"বৃহদারণ্যক উপনিষদে উদ্ধৃত যে তিনটি শ্লোকে 'হিরণ্ময়ঃ পুরুষঃ একহংসঃ' উল্লিখিত হইয়াছেন তাহাতে অর্বাচীন নাথপন্থের ও ধর্মপূজার কোন কোন ছড়ার সঙ্গো গভীর ঐক্য উপলব্ধি হয়।

ধর্মঠাকুরের ছড়া—

ব্রাহ্মণ বড়ুয়া নয় নিরঞ্জন রায়
দেখিতে দেখিতে হংস শূন্যেতে লুকায়।

নাথপন্থের ছড়া—

উড়্যা যায় পরম হংস নাই যায় দূর
উড়িয়া ঘুরিয়া যান নিরঞ্জন পুর।

তান্ত্রিক মহাযানপন্থী বৌদ্ধ বলিয়া প্রসিদ্ধ অনেক সিদ্ধাচার্যই ছিলেন নাথ-যোগপন্থী।"

যদিও বর্তমান ধর্মমঙ্গালে যোগধর্মের রূপক 'শূন্যপুরাণ' সম্পাদক ভক্তিমাধব চট্টোপাধ্যায় খুঁজে পাননি, কিন্তু মহাযান বৌদ্ধধর্মের ধর্মকায়বুদ্ধ-সংশ্লিষ্ট মঙ্গালকাব্যে তিনি লক্ষই করেননি, ঘনরামের 'গীতারম্ভ' অংশ—

এত ভাবি সদানন্দ বিহ্বল হইয়ে।
মহেশ নাচেন মৃত মায়া-তনু লয়ে।।
তুষ্ট হয়ে বামদেবে ব্রহ্মা দিল বর।
তুমি সৃষ্টি সংসার করহ অতঃপর।।
সৃষ্টিকর হৈল হর প্রভুর আজ্ঞায়।
জন্মাল যতেক উগ্র ভয়ঙ্কর কায়।।[২৫]

আদিসৃষ্টিকর্তা শিব— এইটি যেমন অপৌরাণিক ধারা, তেমনই আদিবুদ্ধের ধারণা সমানতন্ত্র নাথযোগীদেরও সৃষ্টিতত্ত্বে স্বীকৃত।[২৬] সশক্তিক শিবের প্রকাশবিমর্শই সৃষ্টিমূল এটি কাশ্মীরী শৈবাদ্বৈতবাদেরও ধারণা বটে, তবে তার প্রসঙ্গ অন্যত্র প্রাসঙ্গিক। এখানে অশক্তিক শিবের আদিস্রষ্টা হিসেবে প্রকাশ নাথযোগীধর্মের সঙ্গো ধর্মকাল্টের দার্শনিক সম্পর্কের ইঙ্গিতবহ। এখন নাথযোগীধর্মের মীননাথ-গোর্খনাথ সম্প্রদায়ে একান্তভাবে নারীসঙ্গাবিবর্জিত ও যোগী হাড়িপা-কানপার সম্প্রদায় তান্ত্রিক ও দ্বীন্দ্রিয়যোগের সাধনা থাকলেও শক্তি সেই ধারাতেও সক্রিয় নয়, নিষ্ক্রিয়। ধর্মমঙ্গালের কাহিনি বিশ্লেষণে এই সূত্রটি গুরুত্বপূর্ণ বলেই— ধর্মদেবতা, ধর্মকায় বুদ্ধের স্বরূপ ও তার সঙ্গো নাথযোগীদের সম্পর্ক আমরা দেখিয়েছি। ধর্মমঙ্গালের ধর্মদেবতার সঙ্গো ভবানীর দ্বন্দ্ব, লাউসেনের প্রতিদ্বন্দ্বীর প্রতি ভবানীর দয়া, লাউসেনকে ভবানীর শক্তিপ্রদান— এবং বারংবার নিজের দিকে আনবার প্রয়াস, সুরিক্ষার ভূমিকা (সুরিক্ষা কোনো সাধারণ বেশ্যা নয়, সে আগমশাস্ত্রের পারিভাষিক অর্থে 'বেশ্যা'। তার ভূমিকা আসলে লাউসেনের 'ধাতুরক্ষা'-র পরীক্ষা নেওয়া। সেটি ধর্মকাল্টেও যেমন গুরুত্বপূর্ণ, হিন্দু আগমতন্ত্রে পঞ্চম-কার সাধনাতেও তাৎপর্যপূর্ণ। জিতেন্দ্রিয়ই পঞ্চম 'ম'-এর অধিকারী।)

ধর্ম-ভবানীর লাগাতার প্রতিদ্বন্দ্বিতা এবং কামরূপপতন গুরুত্বপূর্ণ। এটিকে আমরা পুরুষতত্ত্বপ্রধান বৌদ্ধ ধর্মকাল্টের (যখন তা শিবরূপে বিবর্তিত, গৌরী তখন অন্তর্গত হয়ে প্রায় গুহ্য— এও আমরা পূর্বেই ২৪ সংখ্যক পাদটীকায় দেখিয়েছি।) সঙ্গো হিন্দুতন্ত্রের সক্রিয়শক্তিপারম্যবাদের দ্বন্দ্ব হিসেবেই দেখেছি। বৌদ্ধতন্ত্রের দেবীরা পূজ্য হলেও তাঁরা সক্রিয়তত্ত্ব নন। আচার্য শশিভূষণ দাশগুপ্ত তাঁর তিনটি গ্রন্থেই 'Introduction to the Tantrik Buddhism', 'Obscure Religious Cult' এবং 'ভারতের শক্তিসাধনা ও শাক্ত সাহিত্য'-এ এই দিকে ইঙ্গিত করেছেন। নিষ্ক্রিয়া 'প্রজ্ঞা' থেকে সক্রিয়া 'আদ্যা'শক্তিতে এই দেবীদের পরিবর্তনের প্রক্রিয়াটাই মনসা ও চণ্ডীর আখ্যানকথার বীজ। এই পরিবর্তন হয়েছে বলেই শক্তিপ্রধান হিন্দুতন্ত্রের মধ্য দিয়ে স্মৃতি-ধর্মে তাঁরা গৃহীত হয়েছেন। বিপরীত দিকে এই হিন্দুতন্ত্রের সক্রিয়শক্তিপারম্যবাদের সঙ্গো দ্বন্দ্বই ধর্মদেবতার টিকে থাকবার লড়াই। খুব লক্ষণীয়— ইছাই ঘোষের মৃত্যুর সময়ে শক্তিকে কৈলাসে আটকে রাখছেন শিব। ধর্মমঙ্গালের শিবের বৌদ্ধ-হিন্দু এই দুই দর্শনের মাঝামাঝি অবস্থানটি লক্ষ করবার মতো। নাথদের তান্ত্রিকী শাখায় এই ধরনের সনিষ্ক্রিয়শক্তিক শিব বিদ্যমান। আরো অসামান্য এই যে— ধর্মভক্ত ও শক্তিভক্তর এই দ্বন্দ্বকে রাম-রাবণের দ্বন্দ্বের একটি মুখোশ দিয়ে দেওয়া হয়েছে। রাবণ শৈব কিন্তু শক্তিরক্ষিত লঙ্কাপুরী। বিপরীতে রাম অকালবোধন করেছেন।[২৭]

এইবার সহজেই ধর্মকাল্টের মনস্তত্ত্ব উন্মোচন করা যাবে। ধর্মকাল্টে শক্তির উপাসক ইছাই ঘোষ জাত্যংশে গোয়ালা বা গোপ। ধর্মর বরপুত্র 'কশ্যপ সন্তান' লাউসেনের জাত গন্ধবণিক হলেও সেন রাজবংশের অনুরূপ 'ক্ষত্রচারিত্রচর্য্য'। অন্তত ইছাই এর থেকে জাত্যংশে উচ্চ। লাউসেনের স্ত্রীদের জাতিবিচার গৌণ, কারণ তার বংশধরদের প্রসঙ্গা মঙ্গালকাব্যটির পরিসরবহির্ভূত। যেখানে চণ্ডীমঙ্গাল, মনসামঙ্গালের বয়ান সমঝোতা সত্ত্বেও পৌরাণিক স্মার্তকাহিনিগুলিকে নৈতিক প্রশ্ন করে, সেখানে ধর্মমঙ্গালের বয়ান ভবানীকে ইছাইর মৃত্যুকে যাথার্থ্য দিতে দাসীর মুখে অভিমন্যু, দ্রোণ, কর্ণ, সুধন্বার প্রসঙ্গাই আনতে হয়। এ থেকে আরো বোঝা যায়— ধর্মদেবতাকে 'লোকায়ত' বললে, মনসা চণ্ডীকে আর 'লোকায়ত' বলা যাবে না। ধর্মর 'মেজাজ' এবং মনসা-চণ্ডীর 'মেজাজ' এক নয়। মনসা-চণ্ডী যেভাবে 'speak' করে তাতে তাঁরা 'Subaltern' নয়। ধর্মকে কিন্তু শক্তির হাত থেকে লাউসেনকে বাঁচানোর জন্য মহাভারতের লৌহ-ভীমের মতো লাউসেনের 'সমান মূর্তি' গড়তে হয়। ধর্মকে সত্ত্বগুণোচিত বললে— এই কাল্টের সামাজিক অবস্থান বোঝা যাবে না, বুঝতে হবে তাঁকে লাউসেনের মতোই আত্মরক্ষার জন্য আত্মগোপন করতে হচ্ছে, চণ্ডী-মনসাকে তা করতে হচ্ছে না। স্মার্তব্রাহ্মণের সঙ্গো তাঁরা কথা বলতে পারেন সমানে সমানে। তাই নিম্নবর্গের সমাজে 'ধর্মকায় বুদ্ধ' ধর্মদেবতা রূপে আত্মগোপন করে রইলেন— হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর এই অনুমান নিখুঁত। তাঁর বৈদিক সূত্র সংকেত— যাই থাক, বেদবাহ্য বাংলাদেশের 'ডোম চাঁড়ালে' যে ধর্মদেবতার পূজা করেছে তিনি হিন্দু যোগদর্শনের প্রাক্তন ভিত্তি পেলে দাঁড়াতে পারতেন। কিন্তু নাথযোগীরাও মূলত অগার্হস্থ্য হওয়ায় হিন্দুস্মার্তভুবনে পরিত্যক্ত। অথচ যোগদর্শনের ধারা হিন্দু-ব্রাহ্মণের বাংলাদেশে ছিল না তা বলা যায় না।

'গীতা' বাংলাদেশে সুপ্রচলিত ছিল— তাতে যোগের কথা আছে, মহাভারতেও সুপ্রতুল। কিন্তু যোগ অনেকটাই গার্হস্থ্যবিরোধী। স্মৃতির বিধানে— সন্ন্যাস কলিবর্জ্য, তদুপরি কেবল ব্রাহ্মণের অধিকার। তাই অশক্তিক ধর্মঠাকুরের জায়গা করে নেওয়ার দার্শনিক জায়গা রাঢ়বাংলার স্মার্তভুবনে কম ছিল। উপরন্তু ব্রাহ্মণ্যধারায়ও যোগীহিসেবে 'সর্বযজ্ঞেশ্বরোহরিঃ' এবং যোগী শিবের পৌরাণিক প্রতিষ্ঠা ছিল পাকা। 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন'-এর কৃষ্ণও বলেছেন— 'আহোনিশি যোগ ধেয়াই।' তপস্যারত যোগী শিবের ধারাও 'কুমারসম্ভবম্'-এর পর থেকে সমগ্র ভারতবর্ষেই ভিত্তিমূল। সেখানে ধর্মকায়বুদ্ধের জায়গা হয়নি।[২৮] কিন্তু জায়গা ছেড়েও দেওয়া হয়নি। সেইজন্যই ধর্মমঙ্গালে যেমন— অন্য দুটি মঙ্গালকাব্যের তুলনায় অনেক বেশি পৌরাণিক প্রসঙ্গা টেনে আনা হয়েছে, তেমনই প্রতিস্পর্ধী স্মৃতিবিধানও তৈরি করে নেওয়া হয়েছে— 'ধর্মপূজাপদ্ধতি'-তে। তাতে শুধু স্মৃতিই নয় একেবারে গৃহ্যসূত্র ও শ্রৌতসূত্রেরও প্রভাব আছে। এই আলাদা স্মৃতি তৈরি করে নেওয়ার দুটি ধারা আমরা পাই। অভিজাত ধারার প্রতিস্পর্ধী আরেকটি অভিজাত ধারা— 'শ্রীহরিভক্তিবিলাস', অভিজাতধারার প্রতিস্পর্ধী অনভিজাত কিন্তু প্রায় বৈদিক ধারা— 'ধর্মপূজা পদ্ধতি'— সেও ব্রাহ্মণেরই লিখে দেওয়া।

এইবার এই ধর্মদেবতার মঙ্গালকাহিনিতে হিন্দুব্রাহ্মণের পুরাণপ্রসঙ্গার একটা দ্রুত রেখাঙ্কন করে নেওয়া যেতে পারে। সেইসঙ্গো হিন্দুতন্ত্রের সঙ্গো তার সম্পর্কও মাঝে মাঝে দেখা যাবে। বোঝা যাবে ব্রাহ্মণ্য স্মার্ত-তন্ত্রধারার সঙ্গো মিলন তার পক্ষে কতটা প্রয়োজন ছিল। লক্ষ করতে হবে বৈষ্ণবকাহিনির প্রসঙ্গা অনেকখানি। চৈতন্যোত্তর বৈষ্ণবধর্মের প্রভাবও সেখানে যেমন আছে, তেমনই স্মর্তব্য ধর্মঠাকুরের মূল প্রতিদ্বন্দ্বী হিন্দুশাক্ততন্ত্র।

স্থাপনা শিকলিতে বিষ্ণুদ্বারী জয় বিজয়, পাণ্ডব-পৌত্র পরীক্ষিত। মনে রাখতে হবে নীতি বা 'ethics'-এর প্রসঙ্গা ধর্মমঙ্গালে অনেক বেশিবার এসেছে। কিন্তু সেই নীতির প্রশ্নে সে স্মার্ত-ব্রাহ্মণ্যধারাকে আঘাত করছে না। মূলত তার আখ্যানে যেখানে আদি বৌদ্ধ শীলধর্ম ভেঙে যাচ্ছে সেখানে ব্রাহ্মণ্যকাহিনি দিয়ে ফাঁক পূরণ করা হচ্ছে। স্থাপনা পালাতেও রঞ্জাবতীকে ধর্মের উপদেশের মধ্যে এই মনোভাব স্পষ্ট। ঢেকুর শিকলিতে লক্ষণীয় ধর্মের প্রতিদ্বন্দ্বী ইছাই ও তার আরাধ্যা পার্বতীর তান্ত্রিকী স্বভাবটি—

ইছাই আনন্দ মনে, নানাবিধ আয়োজনে,
সঙ্গোপনে পূজে ভগবতী।
আবাহন তন্ত্রে মন্ত্রে আরাধিতে হেমযন্ত্রে,
মন্ত্র-বশে সাক্ষাৎ পার্ব্বতী।।[২৯]

ঢেকুর পালার আরেকটি অংশও খুব গুরুত্বপূর্ণ। চণ্ডীমঙ্গাল, মনসামঙ্গালের মতো ধর্মমঙ্গালেও কিন্তু রাজপুতদের অস্তিত্বর উল্লেখ আছে। বাংলাদেশে মঙ্গালকাব্যের মধ্যে স্মার্ততান্ত্রিকী আবহাওয়ায় বিন্যস্ত সমাজব্যবস্থার আধাতাত্ত্বিক রূপ যদি স্মৃতিশাস্ত্রসম্মত হয় তবে সেখানেও চাতুর্বর্ণ বাংলায় আছে কি নেই—তা নিয়ে একটা দ্বৈধ আছে। বাংলায়

'সিন্হারায়' পদবীধারীরা এখনো ক্ষত্রিয় সংস্কারে উপবীত ধারণ করেন, বর্তমান গবেষকের তা ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতায় রয়েছে। ধর্মমঙ্গলে এইসব 'ক্ষত্রিয়ত্ব-দাবি'-র কারণটিও ইঙ্গিতে দেওয়া আছে :

গজ পৃষ্ঠে ভূপতি বেষ্টিত বার ভুঁয়া
চোহান রাজপুত কত নামজাদা মিয়া।।[৩০]

রঞ্জাবতীর বিবাহ শিকলিতে ধর্মের ব্রতদাসী রঞ্জার বিবাহ কিন্তু সম্পূর্ণ ব্রাহ্মণ্য-স্মার্তবিধানে হয়েছে। ধর্মমঙ্গালে আলোচনার সূত্রপাতে আমরা রাম-রাবণের প্রসঙ্গ এনেছিলাম। 'হরিশ্চন্দ্র পালা'-য় রাবণের হাকন্দতপস্যা এবং হরিশ্চন্দ্রমহিষী মদনার হাকন্দতপস্যার কথা আছে। হাকন্দতপস্যার ধারাটি প্রাচীন। এই তপস্যার ধারাটির বৈদিক উৎস দেখিয়েছেন সুকুমার সেন— 'ধর্মঠাকুরের ইতিহাস' প্রবন্ধে (প্রবন্ধাবলী—প্রথম খণ্ড, বিবরণ পূর্বে উল্লিখিত)। এখন ব্যবহৃত সংস্করণের হরিশ্চন্দ্র শিকলিতে ৩৩ পয়ারে বলা হচ্ছে—

ধর্ম্ম ইতিহাস মতে, রঞ্জাবতী যোড় হতে,
প্রাণনাথে করে নিবেদন।

'ধর্ম্ম' দেবতার তবে একটি পৃথক ইতিহাস ছিল। এটি 'পুরাণে ইতিহাস'-ই বটে। বাহ্যত তা 'শূন্যপুরাণ'। ধর্মঠাকুরের আদি ইতিহাস বেদবিন্দু থেকে শুরু হলেও তা কোনো ভাবেই 'বৌদ্ধ স্পর্শদোষ' থেকে তাঁকে বাঁচাতে পারে না। আর পারে না বলেই ধর্মমঙ্গল কাব্যের উদ্ভাবন। 'হরিশ্চন্দ্র পালা'-র বল্লুকানিবাসী সন্ন্যাসীর মহামাসে আকাঙ্ক্ষা প্রসঙ্গে

সত্ত্ব গুণী সাধুর শীলতা নয় এ।
তুমি যদি সন্ন্যাসী ডাকাতে দেশে কে।

প্রশ্নটি অবশ্যই বৌদ্ধ। কিন্তু ধর্মের উত্তরটি হিন্দুব্রাহ্মণ্য রাজনীতির উদাহরণ—

'তেজীয়ান যা করে করিতে পারে তাই।' —একেবারে ভাগবত থেকে তেজস্বী ব্যক্তির আচার যে স্মৃতিশাসনের ঊর্ধ্বে এই নির্দেশ তুলে এনে বসিয়ে দেওয়া হয়েছে। আমরা যে বলেছি ধর্মদেবতাকে বারে বারেই স্মার্ত উদাহরণের সাহায্যেই নিজের গ্রহণযোগ্যতা বাড়াতে হয় এটি তার আরেকটি উদাহরণ। 'শালে ভর পালা' নানা কারণেই খুব গুরুত্বপূর্ণ। ধর্মের গাজনকে বা চৈত্রসংক্রান্তির গাজনকে 'ব্রাত্যস্তোম'- এর বিবর্তন বলেছেন প্রায় সকল বিশ্লেষক। বিশেষ হরেকৃষ্ণ সাহিত্যরত্ন, যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি। ব্রাত্যস্তোম ব্রাত্য— 'Outer Aryan'-দের বৈদিক ধারায় আধা অন্তর্ভুক্তির শুদ্ধি অনুষ্ঠান। ধর্মমঙ্গাল— ধর্মদেবতার স্মার্তধারায় প্রবেশের প্রয়োগআখ্যান যদি হয়, তবে তাতে ব্রাত্যস্তোমের ন্যায় 'শালে ভর' গাজন অনুষ্ঠানের অন্তর্ভুক্ত গুরুত্বপূর্ণ। সেখানে সামুলা— কিরাত।[৩১] কিরাত মনুসংহিতা মতে ব্রাত্যক্ষত্রিয়। ব্রাত্যক্ষত্রিয়রাই যদি 'Outer Aryan' -ই হন তারা আদিতে আর্যভাষী ছিলেন। কিন্তু সাবিত্রীচ্যুত অর্থাৎ অবৈদিক। তাহলে ভারতবর্ষের ইতিহাসবোধকে একটু গুরুত্ব দিতেই হয়। এই ব্রাত্য-আর্যদের মধ্যেই তো বৌদ্ধধর্মেরও সূত্রপাত। আর এই ব্রাত্য-আর্যদের গাজনের স্বভাব কী?

—'এখনও পঞ্জিকাকারগণ প্রাচীন প্রথা অনুসারে প্রতি বৎসর পঞ্জিকার প্রথমেই তাহার উল্লেখ করিয়া থাকেন। যাহা হউক সেই মহাকল্লান্তেই মহাকাল সমগ্র ব্রহ্মাণ্ডমণ্ডল একবার কলন্ বা গ্রাস করিয়া থাকেন। সেই মহাকলন্ সময়ে আপামর সকলেই তাঁহাতে লয় হইবার উপযুক্ত হইয়া থাকে। তাহারই অনুকল্পে আমাদের সৌর-বর্ষশেষে চৈত্র সংক্রান্তিতে আমরা চড়কসন্ন্যাসব্রত করিয়া থাকি। সেই সন্ন্যাসব্রতে জাতিভেদ থাকে না, তখন সন্ন্যাসাবস্থায় ব্রাহ্মণেতর সকলেই শিবগোত্র সমন্বিত হইয়া ব্রাহ্মণ হইতেও শ্রেষ্ঠবর্ণ বলিয়া বিবেচিত হয়।'[৩২]

আশা করা যায় 'ব্রাহ্মণ হইতে শ্রেষ্ঠবর্ণ' এই উক্তিটি গাজন অনুষ্ঠানের এবং ধর্মমঙ্গল উভয়ের spirit টাকেই বুঝিয়ে দেবে। মনে রাখতে হবে, অম্বট্‌ঠসূত্তে বুদ্ধ ক্ষত্রিয়কে ব্রাহ্মণের থেকে উৎকৃষ্ট বলেছিলেন, যদিও জাতিভেদকে নাকচ করেননি।

রঞ্জাবতীর পূজায় পুরোহিতের প্রয়োজন হয়নি এটাও লক্ষণীয়। কিন্তু ধর্মপূজায় ব্রাহ্মণপুরোহিত পরে প্রবেশ করবেন, 'ধর্মপূজাপদ্ধতি'ও রচনা হবে সংস্কৃতে। রঞ্জার সাময়িক মৃত্যু, স্ত্রীহত্যা পাতক, পাপের মানবী মূর্তিধারণ, ক্রমে বিপ্রহত্যাপাতক, এই সব পাতক থেকে ধর্মদেবতার উদ্ধার লাভের কাহিনিকে— বেদবিরোধী ধর্মগোষ্ঠী থেকে ধর্মদেবতার স্মার্তবৃত্তে প্রবেশের প্রয়াস হিসেবেই আমরা দেখছি। অবশেষে 'গুণহীন নিরাকার' ধর্মদেবতার— 'শুনি স্নেহে মায়াধারী/ হল ভক্ত মনোহারী/শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্ম-ধর।' —একেবারে হিন্দুর মূর্তিপূজার যাথার্থ্য প্রতিপাদক বচনের উদাহরণ— 'যতদিন ব্রহ্মজ্ঞান না জন্মে, ততদিন সাকার সগুণ ব্রহ্মেরই উপাসনা করিতে হয়। এইজন্যেই ব্রহ্মের রূপ কল্পনা করা হয়েছে।'[৩২] ধর্মকায় বুদ্ধ ক্রমে শিলা নারায়ণ হয়ে ওঠবার দিকে এগিয়ে গেলেন। ক্রমে পঞ্চধ্যানীবুদ্ধের পাঁচটি স্তূপ পাঁচপীরের মোকাম হয়ে ধর্মকাল্ট সত্যপীর-নারায়ণে পরিণত হয়ে বিংশশতকীয় বাঙালির একমাত্র বিষ্ণুপূজা রূপে আত্মপ্রকাশ করবে। পুরোহিত হবেন অবশ্যই ব্রাহ্মণ। লাউসেনের জন্মপালায় দেখা যায়, রাজসভায় 'রামায়ণ পাঠের' আসর। ব্যাসাসনে ব্রাহ্মণ। এরপরেই চোরের দেবতা 'কালী'র উল্লেখ। ধর্ম ও শক্তির দ্বন্দ্বের সূত্রপাত। এই দ্বন্দ্বটিকে আমরা পূর্বেই বৌদ্ধ মহাযান-শূন্যবাদ ও হিন্দুতন্ত্রের বিরোধ বলেছি। জাতিতত্ত্বের ইতিহাসে— যাঁরা বৌদ্ধ উপগোষ্ঠীগুলির সঙ্গে যুক্ত ছিলেন— তাঁরা কেউ কেউ ক্রমশ যে স্মার্তধর্মে সাধনাধিকার না পেয়ে গৌণধর্মীয় তান্ত্রিক বা বৈষ্ণব হয়ে যাচ্ছিলেন, তার ইতিহাস বৈষ্ণবধর্মের ইতিহাস আলোচনায় আমরা লক্ষ করব।

এই সূত্রে আমরা লক্ষ করব 'আখড়া পালা'-য় ব্রহ্মলোক থেকে উৎকল পর্যন্ত রামের অকালবোধনের অনুসারে শারদীয়া দুর্গাপূজা। চণ্ডিকা-দুর্গা ঘনরামের সময়ে Offender নন, Defender । তাঁর পূজা প্রতিষ্ঠিত। তাঁর ভূমিকার এতদিনে বদল হয়েছে। শুধু 'Offender' ধর্মদাস লাউসেনের রাজ্যে চণ্ডিকার পূজা হয় না। এর পরেই লাউসেনের ধাতুপরীক্ষা। বেশ্যা-চণ্ডিকার কাঁচুলিতে বৈষ্ণব চিত্রণ। ভবানী ও লাউসেনের মধ্যে সম্পর্কের হাতছানি— তা যে লাউসেনকে হিন্দুতন্ত্রের আওতায় আনার প্রয়াস তা নিয়ে কোনো সন্দেহ নেই। লাউসেনের সেই ইন্দ্রিয়যোগে বাধা তার ধর্মকাল্ট। সেইজন্যই ধর্মকাল্ট এখানে নিঃশক্তিক

এবং নাথ যোগীদের পর্যায়সাধনা।

অধরে অমিয়া হাসি অশেষ লাবণ্য।
দেবী কহে রায় হে তোমার কথা ধন্য।।
এ রসে বঞ্চিত এত ইহা কেবা জানে।
না পড় আগম কিন্তু শুনেছ ত' কাণে।।
পরদারে থাক্, পাপ ফলোদয়ে ঘটে।
সেন বলে সাধকে বাধক নাই বটে।।
কিন্তু মোর সংসারে সে সব শক্তি কৈ।
একান্ত জানি না ধর্ম্ম এক ব্রহ্ম বৈ।।'

(ঘনরাম রচনাবলী, পৃ. ১৪৬)

এবং আশ্চর্য ভবানীর উত্তর। তিনি বেশ্যাগমনের যাথার্থ্য বিচার করেছেন— তারা, মন্দোদরী, দ্রৌপদী, কুন্তী, অহল্যা এই পঞ্চসতীর কাহিনিতে, কৃষ্ণ-রাধায়, অর্জুনের নপুংসক হওয়ায়, অজামিলে, বিশ্বামিত্রে। স্মৃতি দিয়ে তন্ত্র-যোগকে ব্যাখ্যা করবার এ এক ব্যতিক্রমী উদাহরণ। চণ্ডীমঙ্গালে অজামিলের উপাখ্যান যেখানে শ্রীপতির প্রশ্নে খণ্ডিত হচ্ছে, এখানে তাকে সাধনারই উদাহরণ হিসেবে দেখা হচ্ছে। উদ্ধৃতির 'না পড় আগম' পঙ্‌ক্তিটি না হলে আসত না। সহজিয়ারা তাঁদের ইতিহাসকে যেমন বর্ধিত করেন, এ তারই অন্য এক নমুনা বটে।

'ফলানির্মাণ পালা'-য় লক্ষ করতে হবে, 'ফলা'-য় দশাবতার চিত্র আছে, কিন্তু ধর্মচিত্র নেই। ধর্ম নিরাকার নিরবয়ব। তদুপরি ফলা— চণ্ডিকার। 'গৌড়যাত্রা পালা'য় পদে পদে রামায়ণের উল্লেখ, ভবিষ্যপুরাণোক্ত শিবব্রতবিধান, 'কামদল বধ পালা'-য় ভাগবতের উল্লেখ লক্ষণীয়। ঘনরাম ধর্মের পাঁচালি লিখেছেন ঠিকই, কিন্তু তিনি কুলধর্মে বৈষ্ণব ছিলেন কিনা নিশ্চিত নয়। কিন্তু ধর্মদেবতার আখ্যানের মধ্যে বৈষ্ণব আখ্যানের দ্বারা প্রমাণ সংগ্রহের দায় ধর্মমঙ্গালের শাক্ততন্ত্র বিরোধিতাকে তো প্রমাণ করেই উপরন্তু গৌড়ীয় বৈষ্ণব আন্দোলনের বৌদ্ধ সংসর্গ নিয়েও কিছু পরোক্ষ প্রমাণ দেয়। সেইজন্যই ধর্মমঙ্গালকে আমাদের মনে হয় মধ্যযুগের বাংলার ইতিহাসের পত্রপুট। 'জামতী পালা'-য় পুনশ্চ চরিত্রবলের পরীক্ষা। একই স্মার্তপ্রসঙ্গা পুনরাবৃত্ত হয়েছে। 'জামতী পালা'-য় বারুই বালকের উক্তি খুব গুরুত্বপূর্ণ—

জননী জগতে মোর জাতি-কুল-নাশা।।
বিদেশী কেবল ধর্ম্ম পুরুষ প্রধান।
কুলটা মায়ের কথা কব কোন্‌খান।।
লাসবেশ লাবণ্যে মাগিল আলিঙ্গান।

এর সঙ্গো নাথপন্থের ঐতিহ্যে গোর্খনাথের হাতে গৌরীর তীব্র লাঞ্ছনা তুলনীয়। 'প্রবন্ধাবলী-প্রথম খণ্ড'-এ সুকুমার সেনের উদ্ধৃত দ্বিজ লক্ষ্মণের অনিলপুরাণে চণ্ডী, দুর্গা, বাসুলী, মনসা, সীতা, কপিলার অসতীত্বের বর্ণনা তার প্রমাণ। ধর্মমঙ্গালের মধ্যে যে

লাউসেনের ধাতুপরীক্ষার ছলে এই দুটি কাল্টের দ্বন্দ্ব হয়েছে, মূলত যা যোগ ও তন্ত্রের দ্বন্দ্ব (হিন্দু বৌদ্ধ নির্বিশেষে), 'গোলাহাট পালা' পাঠ করবার পর— তা নিয়ে সন্দেহ থাকে না। বরঞ্চ তান্ত্রিকদের মতে তন্ত্রসাধনায় অসামর্থ্য যে নপুংসকত্বের কারণ ও কার্য উভয়ই, তা অর্জুনের উদাহরণ দিয়ে এখানে দ্বিরাবৃত্ত হল। সুরিক্ষার পূজার মধ্যে তন্ত্রাচার প্রকট। ইস্ট-কামাখ্যা। কিন্তু তান্ত্রিকীধর্মে যে 'পারিভাষিক' অর্থে 'বেশ্যা', ধর্মকাল্টের চোখে সে সাধারণ বেশ্যা।

'গোলাহাট পালা'কে আমাদের মনে হয়েছে সাংস্কৃতিক ইতিহাসের ভাণ্ডার। আমাদের প্রবন্ধের একটি প্রবণতা হয়ত লক্ষ করা গেছে— যতটা সম্ভব ভারতইতিহাসের সঙ্গে লগ্ন থেকে মধ্যযুগের বাঙালির একটি ধারার সাহিত্যের বিচার। তবু অয়দিপাউসের প্রতি স্ফিংক্স-এর প্রশ্নর সঙ্গে সুরিক্ষার করা প্রশ্নর তুলনা করতে মন যায়। কিন্তু অবশেষে লাউসেনকে করা প্রশ্নটি 'কোন্ খানে বৈসে ধাতু সুরতি প্রসঙ্গা', আমাদের বিস্ময়ে স্তম্ভিত করে দেয়। এতো আরেক নারীবর্জিত যোগমার্গী বৈদান্তিককে উভয়ভারতী করেছিলেন। আচার্যশঙ্কর বৌদ্ধপ্রভাবিত বৌদ্ধদ্বেষী এ নিয়ে কোনো সন্দেহ নেই। শঙ্করকে এর উত্তর দিতে গিয়ে দেহান্তরে গিয়ে রতিশাস্ত্র জানতে হয়েছিল[৩৩]। লাউসেনকে একটি অতিনির্বিষ উত্তর জানতে হয়েছে, ধর্মের থেকে। এবং কামানভিজ্ঞ স্বয়ং ধর্ম জেনে এসেছেন চণ্ডিকার থেকে। বৈদান্তিক ব্রহ্মচর্য, যোগীব্রহ্মচর্য কেন গৃহস্থ হিন্দুধর্ম এবং তন্ত্রের কাছে পরাজিত হল তার যুক্তি এখানে আলোচ্য নয়। কিন্তু শেষাবধি লাউসেনের দাম্পত্য নিয়ে ধর্মর যতই আপত্তি থাক, লাউসেনকে যে দাম্পত্যে আসতেই হবে— তেমনই 'লোকায়ত' ধর্মসাধকদেরও যে জাতি বা বর্ণে বিন্যস্ত হিন্দুসমাজের নিচের দিকে কোনোমতে হলেও স্মার্ত বা তান্ত্রিকী ধর্মের অধিকারে প্রবেশ করতেই হবে, এ তারই পূর্বসূচনা। ধর্মকে তাই আজকে বাণলিঙ্গই হোক 'বুড়া শিব'ই হোক, যে নামেই হোক—আত্মগোপন করতে হয়। স্বামীপুত্র নিয়ে যে সব গৃহস্থ বধূরা সেবাব্রত করেন তাঁরা পুরোহিতের কাছে জেনে যায়— গৌরী 'অন্তর্গূঢ়'। আজকে শিবদুর্গা বা লক্ষ্মীনারায়ণ ছাড়া ধর্মর আত্মরক্ষা দায়। যাঁরা ব্রহ্মচর্য্য নেন, তাঁরা শুধু পনেরো দিন বা এক মাসের জন্য।

ধর্মমঙ্গালের মধ্যে আমরা বলেছি মঙ্গালকাব্য ব্যাখ্যার বহু লুকোনো সূত্র আছে। তার মধ্যে 'হস্তিবধ পালা' সর্বাধিক উল্লেখযোগ্য। লাউসেনের হাতে 'হস্তিসংহার' পুনশ্চ হস্তীর জীবনদান— দুইই ধর্মের কৃপায়। আজ অবধি কোনো সমালোচক এই পালাটিকে 'কমলে-কামিনী'র পাশে রেখে পড়েননি। হস্তীর গ্রাস ও বমনের সাধনভাষ্যও নানা দূরকল্পনায় ভারাক্রান্ত হয়েছে। এইটুকু শুধু এইখানে বলে রাখা যায় আমরা ধর্মমঙ্গাল ও শক্তিমঙ্গালগুলির মধ্যে যে বিরোধ কল্পনা করেছি তার অব্যর্থ প্রমাণ এই অংশটুকু। চণ্ডীসম্প্রদায় যে ধর্মসম্প্রদায়ের আগেই ব্রাহ্মণ্যসংস্কৃতিতে অন্তর্ভুক্ত হয়েছেন— তা তো মঙ্গালকাব্যগুলির কালক্রমেই শুধু নয়, আখ্যান অনুধাবন করলেই বোঝা যায়। ডোম সম্প্রদায়ের সামাজিক মর্যাদা প্রাক্‌গুপ্ত পূর্ব-ভারতে কীরকম ছিল তা অনুমান নির্ভর। কিন্তু ধর্মমঙ্গালের ডোমেরা যে বাঁশের কাজই করত এবং রাজপুত্র ধর্মসেবকের অনুগ্রহে তারা

জাতিবৃত্তি ছেড়ে 'পট্টধুতি' ও 'পাটসাড়ী' পরল— তা সামাজিক সচলতার তত্ত্বকেই প্রমাণ করে। কিন্তু স্মার্তসমাজ? ধর্মের পুরোহিত, 'অনেকদিন পর্যন্ত বর্ণের ব্রাহ্মণরাই হতেন, বর্তমানে শুদ্ধব্রাহ্মণরাও করেন।'[৩৪]

'কাঙুরযাত্রা পালা'-য় ধর্মদেবতার 'কামরূপ' অধিকার বর্ণিত। ভারতবর্ষে তন্ত্রের মূল পীঠটিকে অধিকার এই কাব্যের apocalypse। কামরূপ বর্ণনা পুরাণতন্ত্রের প্রথানুগ। 'কামরূপ' অধিকার করেও লাউসেনকে অবিবাহিত রাখা গেল না। তবে তার বিবাহ হল— অ-স্মার্তঅনুমোদিত সময়ে— অকালে। অকালে বিবাহর পরিকল্পনা— পরবর্তী নানা বিপদকে সম্ভাব্য করে তুলবার জন্যও হতে পারে, আবার বৌদ্ধবিবাহচিহ্নরূপেও হতে পারে। বৌদ্ধ মাত্রেই এক সময়ে ছিলেন সন্ন্যাসী। গৃহস্থ বুদ্ধ অনুগামীরা জাতি-বর্ণ অনুসরণ করতেন একথা আমরা পূর্বেই বলেছি। পরে মহাযান তান্ত্রিকীধর্ম প্রবর্তিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তান্ত্রিকীধর্মের ব্যক্তিগত চরিত্রর (Personal religion) জন্য গৃহীরাও মহাযানতান্ত্রিক ধর্মের আওতায় আসেন। বাংলাদেশে একেই বলা হয়— বৌদ্ধ সম্পিগুণ। এই মতটিকেই পরীক্ষা করবার জন্য আমরা যতটা সম্ভব বঙ্গদেশের বৌদ্ধধর্মের স্বরূপ ও সাহিত্যের সঙ্গে তার সম্পর্ক নির্ণয় করতে চেষ্টা করেছি। বৌদ্ধ সম্পিগুণের ফলে সমাজে একটা উপপ্লব হয় ঠিকই। কিন্তু পালরাজারা যদি বর্ণাশ্রমের রক্ষকই হন, তবে বৌদ্ধ সম্পিগুণ কোথায় হয়? সমাজের পরিধির দিকে, যেখানে সমাজ-শাসন দুর্বল? সেই উপপ্লবের পরে আবার আত্তীকরণও হয়। কিন্তু নব আত্তীকরণের সময়েই বৃত্তিমূলক জাত তৈরি হয়, এইমত ঠিক নয়। আমরা দেখিয়েছি অনেকপূর্বেই বৃত্তিমূলক জাতব্যবস্থা শুরু হয়। বৌদ্ধযুগে সম্পিগুণের মাত্রা, সদাচার বিচার ও বীজ বিচার করেই ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণের কাল থেকে চলে আসা সৎশূদ্রাদি বা উত্তমসংকরাদি ব্যবস্থা পরবর্তী যুগেও টিকে থাকে। কিন্তু কে-ই বা এই সদাচার ও বীজমাহাত্ম্য বিচার করেন আর কারাই বা নির্ধারণ করেন তাও যেমন অস্পষ্ট, এই ইতিহাসও কিছুটা কাল্পনিক তাও অস্বীকার করা যায় না।[৩৫] যে ন্যায়ে আমরা 'লৌকিক' বলে দেগে দিয়ে প্রথম স্তরের মঙ্গলকাব্যদ্বয়ের একমাত্র সরল কারণ ইসলামের আক্রমণকে বলতে পারি না, সেই ন্যায়েই অর্থাৎ প্রমাণাভাবে একেও সম্পূর্ণ স্বীকার করতে দ্বিধাবোধ করি। কারণ পালযুগের পূর্ব থেকেই শিলালিপিতে ক্ষত্রিয়, বৈশ্যের শাস্ত্রসম্মত উল্লেখ পাওয়া যায়নি। বৌদ্ধ সম্পিগুণের পরই যে চাতুর্বর্ণ্য উঠে গেল তাও নয়। আসলে চাতুর্বর্ণ্যের লোপ শুরু হয়েছিল আগে থেকেই। বিপ্রেতর সবাই ক্রমশ শূদ্র হয়ে যাওয়ায় যারা যতটা 'বামুন ঘেঁষে' ছিলেন— বা সংকর হিসেবে ত্রৈবর্ণিকের বীজ লাভ করেছিলেন তারা ততটা উচ্চে নিজেদের জায়গা করে নিয়েছেন। ব্রাহ্মণদের গাঞী বংশধারা-কুলজীর সত্যতা যেমন কিছুটা আছে, তেমনই অব্রাহ্মণদের গাঞী ইত্যাদি কুলজীনামা অনেকটাই যে বানিয়ে তোলা তা নিয়ে দ্বিধার অবকাশ নেই। কারণ বৌদ্ধশ্রমণন্যায়প্রমাণে তিনপুরুষ বৌদ্ধ হলেও ব্রাহ্মণসন্তানের ব্রাহ্মণত্ব থাকত। ফলে বিপ্রেতর বর্ণের উচ্চ বা নিম্নস্তর রাজঘনিষ্ঠতার তারতম্যর ওপরেও নির্ভরশীল ছিল, এই ঐতিহাসিক ধারণা করতে হয়। উপরন্তু আমাদের অনুমান মুসলিম রাজশক্তির পূর্বে যে যে হিন্দুরাজারা রাজত্ব করেছেন বা পরে যেসব স্থানীয়

হিন্দু ভূস্বামীরা প্রবল হয়েছেন— তাঁদের সম্প্রদায় এবং নিকট সম্প্রদায়গুলি ওপরের থাকে নিজেদের বিন্যস্ত করে নিয়েছেন। কিন্তু এগুলি সবই আংশিক ও আঞ্চলিক সত্য। কেবল এইটাই বলা যায় যে, মহাযান তান্ত্রিকরা গৃহকেন্দ্রিক হওয়ার ফলে 'বৌদ্ধবিবাহ পদ্ধতি' (দ্রষ্টব্য-সম্পাদনা ও ভাষান্তর— সাধনকমল চৌধুরী, 'ত্রিরত্নবন্দনা এবং বৌদ্ধ বিবাহপদ্ধতি', করুণা প্রকাশনী, ১৪১৬) প্রণীত হয়। লাউসেনের বিবাহ সেই মতেও হতে পারে। লাউসেনের বিবাহ পর্যন্ত বিবেচনাই আমরা যথেষ্ট বোধ করি।

এমনিতেই ধর্মমঙ্গল কাব্যের একটা Episodic ধরন আছে। এরপরে লাউসেনের সংসারকেন্দ্রিকতায় ধর্ম কখনো অসন্তুষ্ট হবেন। কিন্তু ধর্মদাস লাউসেনের দাম্পত্যে প্রবেশই প্রাচীন বৌদ্ধধর্মাচারটির স্মার্ত গৃহস্থ ধর্মে পর্যবসিত হওয়ার সূত্র বা গোত্রান্তরিত হওয়ার লক্ষণ বলে মনে হয়। এরপর থেকে ধর্মঠাকুর কখনো বিষ্ণু, রাম, নারায়ণ, শিব ইত্যাদি নামান্তসূচনায় সূচিত হবেন আর তাঁর ভক্তরাও ক্রমশ সামাজিক সচলতা লাভ করবেন। এরফলে মূলে রাজস্থানী ক্ষত্রিয়ত্বর দাবিদার বর্ধমানরাজের সভাকবি ব্রাহ্মণ ঘনরাম ধর্মমঙ্গল রচনা করলেন। কবি ও কাব্যের সম্বন্ধ তো কারণ-কার্যের নিয়তপরিবর্তমান সম্পর্ক এবং 'কারণেই কার্য নিয়ত বর্তমান।'

ধর্মকাল্টের সঙ্গো ইসলামের সম্পর্কটি চণ্ডীমঙ্গল ও মনসামঙ্গালের সঙ্গো ইসলামের সম্পর্কর মতো পরোক্ষ নয়। ধর্মকাল্ট তার মঙ্গালকাব্যপূর্ব শেষরূপে স্পষ্টত বৌদ্ধ। তাই 'শূন্যপুরাণ'-এ 'জালালি কলিমা'-য় ইসলামি আক্রমণ শূন্যপুরাণের কবির 'Protagonist'। কিন্তু চতুর্দশ শতাব্দীর ফিরোজশাহ তুঘলককে সে যতই অভ্যর্থনা[৩৬] করুক— অচিরাৎ সে বোঝে ইসলাম শাসনে ব্রাহ্মণ্যধর্মই সুপ্রতিষ্ঠিত হয়। ধর্মমঙ্গালের লাউসেনের সঙ্গো স্মার্তধর্মের সম্পর্ক তন্ত্রবিরোধী আবহাওয়ায় পুস্ট হলেও হিন্দুবিরোধী যবনপক্ষীয় কাহিনি নয়। ধর্মকাল্টের ক্রমশ বৈষ্ণব ধর্মে আত্মগোপন করার প্রয়োজন হয়ে পড়ছিল। গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্মের দার্শনিক ব্যাখ্যার আদিযুগে যদি কোনো তান্ত্রিক সূত্র থেকেও থাকে তা এতই গুহ্য ও মহাপ্রভুসাপেক্ষ-মাত্র যে ধর্মকাল্টের বৈষ্ণবধর্মে কোনো অসুবিধে হওয়ার কথা নয়। 'চূড়ামণিদাস বলিয়াছিলেন যে, চৈতন্যদেব জন্মগ্রহণ করায় বৌদ্ধেরা খুব আনন্দিত হইয়াছিল।

১৪০০ হইতে ১৬০০ পর্যন্ত যাঁহারা বৌদ্ধধর্মের মায়া কাটাইয়া উঠিতে পারেন নাই ধনের গৌরবে, পদমর্যাদার গৌরবে, বিদ্যার গৌরবে বা অন্য কোনো কারণে বৌদ্ধধর্মেই লাগিয়াছিলেন... চৈতন্যদেব তাঁহাদের হিন্দু করিলেও নিত্যানন্দদেব তাঁহাদের মন্ত্র দিলেও তাঁহারা অনাচারণীয় হইয়াই রহিয়াছেন। তাহার পর তাঁহারা ব্রাহ্মণ লইয়াছেন।...

আমরা পূর্বপুরুষদের নিকট শুনিয়াছি যে, এইসকল ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণ নহেন, ইঁহাদের গলায় পইতা দেওয়া হইয়াছিল মাত্র।...

তাঁহাদের পূর্বে বর্ণের যেসব ব্রাহ্মণ ছিলেন, তাঁহারা 'মঠধারী'। কিন্তু এইসকল ব্রাহ্মণকে বাধ্য হইয়া মঠধারীদের সহিত বিবাহাদি করিতে হইত, সুতরাং ইঁহারা এখন এক-একটি স্বতন্ত্র জাতি হইয়া উঠিয়াছেন। বর্ণব্রাহ্মণদের একটু বিশেষত্ব এই যে, এই বর্ণের ব্রাহ্মণ

অন্য বর্ণের ব্রাহ্মণকে অনাচরণীয় মনে করেন।'[৩৭]

এই প্রসঙ্গো অবশ্য এও স্মরণে রাখতে হবে— 'বৈষ্ণবসাহিত্যে সমাজতত্ত্ব' গ্রন্থে ড. ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত জানিয়েছেন—

'আশ্চর্যের বিষয় এই যে, অন্তত পশ্চিমবঙ্গো কতকগুলি জাতি রহিয়াছে, যাহারা মুসলমানও হয় নাই অথচ বৈষ্ণবধর্মও তাহাদের মধ্যে এখনও পর্যন্ত প্রবেশ করে নাই। এইগুলি তথাকথিত অন্ত্যজ জাতি, যথা বাউরি, বাগদি, হাড়ি, ডোম ইত্যাদি। ইহারা ধর্মপূজা করে। তাহাদের নিজেদের জাতীয় পুরোহিত আছে; যেমন ডোমদের ডোম পণ্ডিত...। ইহাদের কৌমগতধর্ম আর নাই। তাহা কেবল কতকগুলি নিষেধবিধি দ্বারা ধরা পড়ে।'[৩৮]

যদিও আধুনিক যুগ আমাদের আলোচনার বহির্ভূত, তবে এঁরাও আজকে সরকারি খাতায় 'Hinduism' ধর্মের অন্তর্ভুক্ত এই ব্যাপারটি সুনিশ্চিত।

তবু আমাদের 'অনৈতিহাসিক' স্বভাবদোষে আমরা ধর্মকায় বুদ্ধের ও বিষ্ণু-কৃষ্ণের মিলনের ধারাটিও একাদশ শতক থেকেই লক্ষ করি— ধর্মদেবতা প্রসঙ্গো সেই প্রসঙ্গাকে উদ্ধার করি কেবল একটি কচ্ছপের খোলসের জন্য—

'পূর্ববঙ্গো প্রাপ্ত ও ঢাকা যাদুঘরে সংরক্ষিত, কমঠের চতুরংশ খোলায় একাদশ শতাব্দীর অক্ষরে উৎকীর্ণ একটি লিপিতে পাওয়া যায়, 'নমো ভগবতে বাসুদেবায়। নমো বুদ্ধায়। ...সুজিনো জনানাং...। নমো ভগবতে বাসুদেবায়'। ..এগুলি বিষ্ণুর বুদ্ধাবতারের কথা নয়— বিষ্ণু-বুদ্ধের অভিন্নতার কথা...।'[৩৯]

সৃষ্টিতত্ত্ব— 'সুজিনো জনানাং' বুদ্ধ— ধর্মকায় বুদ্ধ। এই ধর্মকায়বুদ্ধর মধ্যে বা ধর্মদেবতার মধ্যে অন্য অনেক দেবতার প্রভাব কল্পনা করা হলেও সুস্পষ্ট ঐক্য প্রতিপাদক উল্লেখ এই এখানে বিষ্ণুর সঙ্গো, আর খ্রিস্টীয় ষষ্ঠশতাব্দীর গিলগিট পুথিতে যমদেবতার সঙ্গো।[৪০] আপাতত যমদেবতার কথা বাদ দিয়ে ধর্ম-বিষ্ণুকেই বাংলা সাহিত্য ও সংস্কৃতির ধারায় শিরোধার্য করে, বর্তমান প্রবন্ধটিতে মঙ্গালকাব্যের তিনটি প্রধান ধারায় বাঙালি হিন্দুর ধর্মজীবনের একটি পরিচয়ের প্রসঙ্গা শেষ করা যায়।

উৎসের সন্ধানে

১। 'অধ্যেতব্যং ন চান্যেন ব্রাহ্মণং ক্ষত্রিয়ং বিনা'—১।৭২, ভবিষ্যপুরাণবচন অস্বীকৃত হল। কাব্যের উদ্ধার— অচিন্ত্য বিশ্বাস, বিপ্রদাস পিপিলাইয়ের মনসামঙ্গাল, রত্নাবলী, ২০০২, পৃ. ১৪৪

২। 'অধ্যেতব্যং ন চান্যোন ব্রাহ্মণং ক্ষত্রিয়ং বিনা। শ্রোতব্যমেব শূদ্রেণ নাধ্যেতব্যং কদাচন।' (ভবিষ্যপুরাণ ১/৭২)

৩। স্বামীবিশ্বরূপানন্দ, বেদান্তদর্শন : ১ম খণ্ড, উদ্বোধন, ১৯৮০, পৃ. ৭৯৩

৪। তদেব— পৃ. ৭৯৭ এবং ব্যাসসংহিতা : আর্যশাস্ত্র সংস্করণ।

৫। সম্পাদনা : সুকুমার সেন, কবিকঙ্কণ বিরচিত চণ্ডীমঙ্গাল, সাহিত্য অকাদেমি, ১৯৯৩, ৭ম দিবস/নিশাপালা, পৃ. ২২২

৬। তদেব

৭। তদেব
৮। বিপরীতে পঠিতব্য, অনিলবরণ গঙ্গোপাধ্যায় সম্পাদিত, রামানন্দ বিরচিত চণ্ডীমঙ্গল, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৫৯
৯। 'চিঠিপত্রে সমাজচিত্র', প্রথম খণ্ড পূর্বার্ধ, বিশ্বভারতী, ১৯৬৮, পৃ. ২২৮
১০। ed. Sukumar Sen, Seka Subhodaya of Halayudha Misra, The Asiatic Society, Kolkata, 2002, Page 227
১১। অশোককুমার বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত, রঘুনন্দনের 'অষ্টাবিংশতিতত্ত্বম্', সদেশ, ১৪১৭, পৃ. ২৩১
১২। পরমেশ আচার্য, বাংলার দেশজ শিক্ষাধারা, অনুষ্টুপ, ২০০৯, পৃ. ৭৩
১৩। 'বাসুলীর প্রতিদ্বন্দ্বী / দ্বাদশবৎসর বন্দী / বিশালাক্ষী কৈল অপমান।'—বণিকখণ্ড, চণ্ডীমঙ্গল, কবিকঙ্কণ। বাসুলী এখানে স্পষ্টতই চণ্ডী। এছাড়া 'বাসলী'-কে 'অসুর ভাতার' বলা হয়েছে 'অনিল পুরাণে' (দ্বিজলক্ষ্মণ)। এ থেকেও বোঝা যায় বাসলী চণ্ডী-দুর্গা। তাহলে বলতে হয় মহিষাসুরমর্দ্দিনীর রূপ তৈরি হয়ে ওঠার পর বৌদ্ধ বাগীশ্বরীর চণ্ডী-দুর্গার সঙ্গে একাত্মতা হয়। সময়কালটি অন্ততপক্ষে কালিকাপুরাণের পরে (আনুমানিক খ্রিস্টীয় অষ্টম শতক)।
১৪। সুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, স্মৃতিশাস্ত্রে বাঙ্গালী, এ মুখার্জী, ১৩৬৮, পৃ. ৭৮
১৫। স্মার্ত ব্যবস্থার সঙ্গে বিরোধ নেই। কিন্তু গঙ্গা-চণ্ডীর বিরোধ আছে। এই বিরোধ আখ্যানের অগ্রগতির সঙ্গে খুব শিথিলভাবে সংযুক্ত। গঙ্গা বহুদিনই স্মৃতিতে মান্য। খ্রিস্টীয় চতুর্থ শতক তথা গুপ্তরাজবংশের সময় থেকেই গঙ্গার মূর্তিপূজা প্রচলিত—জানিয়েছেন 'পৌরাণিকা' (ফার্মা কে এল এম— ২০০১)। গঙ্গার স্নানের মন্ত্র 'পদ্মপুরাণ' বচনপ্রমাণে যেকোনো স্মৃতিতে যুক্ত। 'কলিতে গঙ্গাই তীর্থ।'—বিশুদ্ধসিদ্ধান্ত পঞ্জিকা ব্যবস্থাপকের নির্দেশ হিসেবে লক্ষণীয়। কিন্তু গঙ্গার ধবলত্ব, জলদেবীস্বরূপ অন্যদিকে ধর্মদেবতার ধবলত্ব ও বরুণের সঙ্গে ধর্মর সংযোগ এবং ধর্ম-চণ্ডীর বিরোধের সঙ্গে গঙ্গা-চণ্ডীর বিরোধ মিলিয়ে পড়া যেতে পারে। ধর্মদেবতা নারী না পুরুষ এই বিষয়ের জন্য দ্রষ্টব্য শশিভূষণ দাশগুপ্ত-র Obscure Religious Cult-এর প্রাসঙ্গিক অংশ। 'প্রকৃতি পুরুষ তুমি, তুমি পরমব্রহ্ম/অনাদি অনন্ত তুমি নিরাকার ধর্ম্ম।'—ইছাই বধপালা, ১৫৩, ঘনরামের ধর্ম্মমঙ্গল।
১৬। বাণভট্টর আভিজাত্যবৃত্ত প্রশ্নাতীত। সুতরাং কাব্যপ্রাণ বাঙালির চণ্ডীকাল্টে কোনো 'জনজাতিক চণ্ডী'-র প্রভাব থাকলে, সেটিই মুখ্যপ্রভাব কিনা বলতে গেলে বাণভট্ট, কালিকাপুরাণ ও মার্কণ্ডেয়পুরাণের সঙ্গে হিন্দু বাঙালির ও সেই জনজাতির চণ্ডীর সঙ্গে হিন্দু বাঙালির পরিচিতি কালক্রম তুলনা করতে হবে। হতেই পারে, আঞ্চলিক জনজাতিক প্রভাব মূলধারায় ঢুকল, সেক্ষেত্রে তাকে মূলধারার দর্শনটির সঙ্গে অঙ্গীভূত হয়েই ঢুকতে হবে। সেইজন্যই আজো গ্রামদেবীদের 'থান'-কে মন্দির বানাতে গেলে একটি পুরোহিত লাগে। কালকেতুরও লেগেছিল। কখনো ঐ দেবীদের পোষ্টাকে জনজাতিক স্বভাব হারিয়ে ব্রাত্যক্ষত্রিয় হিসেবে আত্মপরিচয় দিয়ে হয়। বিষ্ণুপুর, কোচবিহারের রাজারা তার উদাহরণ।
১৭। ব্যাখ্যাতা—স্মৃতি অধ্যাপক শ্রী হিমাংশুকুমার চক্রবর্তী। দূরাভাষ—০৩৩-২৩৭৩- ২৯৫৬।

১৮। ক্ষেত্রসমীক্ষা আমাদের।

১৯। সুকুমার সেন, বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস-প্রথম খণ্ড, আনন্দ-১৯৯১, পৃ. ২০০

২০। অনির্বাণ, বেদমীমাংসা-১, সংস্কৃত কলেজ, ১৯৬১, পৃ. ৮৪

২১। সপ্তম পালায় ২ শিকলিতে, মনসার উক্তি—
'শূদ্র কুলে উৎপতি তোমরা সর্বজন। যবন আচার কর কিসের কারণ।' মনসাচরিত্রের দ্বৈধ লক্ষণীয়। একাদশ পালার ১৮ শিকলিতেও দরবেশ ও চাঁদের দ্বন্দ্বে তা আভাসিত। বিপরীতে বেদিয়া সাপুড়িয়া সম্বন্ধে— The Tribes and Castes of Bengal' Vol-1-এ Risley (Farma KLM, 1988): 'Members of this caste are in a great request at the festival of Manasa Devi... being engaged by Brahmans to exhibit their collection... while his wife or child chants a mysterious Hindustani songs.' ব্রাহ্মণ পুজো করে কিন্তু গান গায় 'বেদিয়া রমণী।' বেদিয়ারা Risley-র মতে ধর্মে মুসলিম। এই বিষয়ে দ্রষ্টব্য-'বিপ্রদাস পিপিলাইয়ের মনসামঙ্গল'-এর সম্পাদক ড. অচিন্ত্য বিশ্বাস-এর ভূমিকার পৃ. ১৮৪, (রত্নাবলী, ২০০২)। আমরা মনসামঙ্গালের বর্তমান অংশের আলোচনা এই সংস্করণটি ধরেই করছি।

২২। সম্পা : ভক্তিমাধব চট্টোপাধ্যায়, শূন্যপুরাণ, ফার্মা কে এল এম, ১৯৭৭, পৃ. ৫৭

২৩। S.B. Dasgupta, Obscure Religious Cult, Farma KLM, 1976, Page 274

২৪। শিবের গাজন বা ধর্মের গাজনের একত্ব প্রতিপাদন করে 'সাধনপ্রদীপ' গ্রন্থে পৃ. ১৮২-এ সচ্চিদানন্দ সরস্বতী বলছেন— 'মহাকাল বা শিব— হরগৌরী বা শিবদুর্গার শিব নহেন, বা গৌরীপট্ট সম্বলিত শিবলিঙ্গও নহেন, তখন তিনি অনাদি বৃদ্ধ শিব বাণলিঙ্গ বা বুড়াশিব বলিয়া উক্ত হন। অর্থাৎ শিবের সংযুক্তশক্তি গৌরীপট্ট ও শিবে তুরীয়ভাবে লীন হইয়া গিয়াছেন। সেই কারণে গৌরীপট্ট সম্বলিত শিবের নিকট চড়ক-সন্ন্যাস গাজন উৎসব হয় না।' নবভারত (১৩৯৭)। 'Obscure Religious Cult' গ্রন্থে আচার্য দাশগুপ্ত পূর্বোক্ত সংস্করণের ২৮০ পৃষ্ঠায় দেখিয়েছেন নীলের গাজনই ধর্মের গাজন। এই গাজনে 'শক্তি'-রাহিত্য একটি তাৎপর্যপূর্ণ দিক সন্দেহ নেই। শক্তিরাহিত্য বা শক্তিনিষ্ক্রিয়তা বৌদ্ধলক্ষণ।

পরবর্তীকালে ধর্মের শক্তি কল্পনা হয়েছে। ধ্যানীবুদ্ধের শক্তির মতন স্বাভাবিকভাবেই ধর্ম তখন ধর্মকায় চরিত্র থেকে হিন্দুতন্ত্রের দিকে ঝুঁকে পড়েছেন। কিন্তু ঘনরামের ধর্মমঙ্গালে তাঁর আদিরূপটি অক্ষুণ্ণ আছে। 'স্বাভাবিকবাদী' বৌদ্ধ ধর্মে (নেপাল) ধর্মতত্ত্ব— বাহ্যত শক্তিতত্ত্ব। তাঁর থেকেই আদিবুদ্ধর উদ্ভব ও তাঁদের মিলনেই সৃষ্টি। জননী ও জায়ার যৌগপত্যযোগে এই সৃষ্টিতত্ত্ব নাথসাহিত্যে ও মঙ্গালকাব্যে গৃহীত হয়েছে। নাথ সাহিত্যে বৌদ্ধতন্ত্রের স্বভাবানুসারে পুরুষ সক্রিয় এমনকি দেবীকে অস্বীকারও করা হয়েছে। কিন্তু মঙ্গালকাব্যের দেবীদের সক্রিয়তা প্রতিষ্ঠার প্রয়াসের মধ্যে— বৌদ্ধতন্ত্রের দেবীদের হিন্দুতন্ত্রের শক্তিসক্রিয়তাবাদের আওতায় আসতে দেখা যায়। একেই আমরা পূর্বে বলেছি— চণ্ডী, মনসার ক্ষেত্রে বৌদ্ধতন্ত্রের দেবীদের হিন্দু তন্ত্রের দার্শনিক পটভূমিকায় স্থাপিত করবার প্রক্রিয়া। এই প্রক্রিয়ার ফলেই হিন্দুতন্ত্র হয়ে তাঁরা হিন্দু স্মার্ত মতে গৃহীত হয়েছেন। এইকারণেই তাঁদের লৌকিক বলতে আমাদের অনীহা। কিন্তু ধর্মকায় বুদ্ধকে ধর্মদেবতার সূত্রে অদ্বৈতবেদান্তের ব্রহ্ম বা রুদ্র,

বিষ্ণু বা বরুণের সঙ্গে মেশানো যেতে পারে। তার প্রমাণ হিসেবে বলা যায় যে—ঘনরামে মহাভারত, ভাগবত ও রামায়ণের নায়কদের সুপ্রচুর প্রসঙ্গের উল্লেখ। কিন্তু বৌদ্ধদর্শনের 'ধর্মকায়' স্বভাব থেকে তাঁকে ভ্রস্ট করা যাবে না।

২৫। সম্পাদক—ড. মোহন পাল, শ্রীধর্ম্মমঙ্গাল, ঘনরাম রচনাবলী, প্রজ্ঞাবিকাশ-২০১১, পৃ. ৮৬

২৬। ধর্মকায় বুদ্ধই যে গাজনের শিব তা আমরা পূর্বে বলেছি। আবার বামদেব্যসূক্তের শিবের কৃষক রূপটিও লক্ষণীয়। এটি তন্ত্রের আদি বৈদিক উৎস। শূন্যপুরাণের শিব চাষী এবং মৈথুনাসক্ত। আরো লক্ষণীয় বৈদিকতন্ত্রের এই ধারাটি পুরুষসক্রিয়তাবাদী। বৌদ্ধ মহাযান তন্ত্রমত অনেকটাই বৈদিকতন্ত্রের এই ধারায় পড়ে। যদিও অশ্বঘোষের বুদ্ধচরিতে বুদ্ধ যে আরাড় কালামের কাছে সাংখ্য শিক্ষা করেছিলেন তার প্রমাণ আছে।

২৭। বলাবাহুল্য এটি বাঙালির রামায়ণ।

২৮। লক্ষণীয় অষ্টম-দ্বাদশ শতাব্দীতেও বৌদ্ধসহজিয়া সিদ্ধাচার্যদের স্থান মূলধারার মহাযানবৌদ্ধতন্ত্র বা হিন্দুব্রাহ্মণ্যতন্ত্রের বাহিরেই উপনিবিষ্ট হয়েছিলেন। মনে রাখতে হবে— আমরা যোগের প্রসঙ্গ এনেছি— অন্তত ঘনরামের ধর্মমঙ্গালে ধর্মদেবতা অশক্তিক বলে। যোগই তাঁর উপযুক্ত দর্শনপ্রস্থান হতে পারত। কিন্তু যোগ মূলত আভ্যুদয়িক নয়, নিঃশ্রেয়সপন্থী। আর সেইজন্যই ধর্মমঙ্গালে ধর্মদেবতাকেও পরবর্তীকালে আভ্যুদয়িক দেবতারূপে তৈরি করে নেওয়া হল, পুরাণের দেবতাদের মতো। পৌরাণিক প্রসঙ্গা বৃদ্ধি পাওয়ার এটিও বড়ো কারণ।

২৯। সম্পাদনা : মোহন পাল, শ্রীধর্ম্মমঙ্গাল, ঘনরাম রচনাবলী, প্রজ্ঞাবিকাশ-২০১১।

৩০। তদেব, পৃ. ৯৮

৩১। 'কিরাত'-কে যদি জনজাতিও ধরা হয়, মনুবচন সেই জনজাতিদের আর্যদের নিকটবর্তী হয়ে ওঠবার প্রক্রিয়াকেই প্রতিষ্ঠা করে।

৩২। প্রতিমা পূজা, বিশুদ্ধসিদ্ধান্ত পঞ্জিকা (ভূমিকা, সাংবাৎসরিক)।

৩৩। দ্রষ্টব্য : শ্রী ইন্দ্রদয়াল ভট্টাচার্য, শঙ্করচরিত, উদ্বোধন, ১৩৮৮।

৩৪। তথ্যসূত্র : মহোপাধ্যায় হিমাংশুকুমার স্মৃতিতীর্থ, প্রাক্তন ধর্মশাস্ত্রাধ্যাপক, কলিকাতা রাষ্ট্রীয় সংস্কৃত কলেজ, প্রধান ব্যবস্থাপক— বিশুদ্ধসিদ্ধান্ত পঞ্জিকা।

৩৫। দ্রঃ ড. ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত, বৈষ্ণব সাহিত্যে সমাজতত্ত্ব, চিরায়ত, ২০০৭, পৃ. ৮৩

৩৬। বিস্তৃত আলোচনার জন্য দ্রষ্টব্য : সুকুমার সেন, 'ধর্মঠাকুর কথা' 'বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস', দ্বিতীয় খণ্ড, আনন্দ, ১৪০২।

৩৭। বাংলা বৌদ্ধ সমাজ : হিন্দু ও বৌদ্ধ— হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা, প্রথম সংখ্যা, ১৩৩৬।

৩৮। ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত, বৈষ্ণব সাহিত্যে সমাজতত্ত্ব, চিরায়ত প্রকাশনী, ২০০৭, পৃ. ৯৫

৩৯। নলিনীনাথ দাশগুপ্ত, বাংলায় বৌদ্ধধর্ম, শৈব্যা, ২০০১, পৃ. ৪০

৪০। দ্রষ্টব্য : শূন্যপুরাণ, পৃ. ৫১

বাংলা মঙ্গালকাব্যে বৈষ্ণব-প্রভাব

কাননবিহারী গোস্বামী

১। কথামুখ : মঙ্গালকাব্য ও বৈষ্ণবতা

১.১। 'মঙ্গালকাব্য' নামে আখ্যাত একশ্রেণির *'আখ্যানকাব্য'* (Narrative Poem) মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে প্রায় ছয় শতাব্দী ধরে প্রচলিত ছিল। এগুলি মূলত লৌকিক দেব-দেবীর মাহাত্ম্যসূচক কাব্য। যাঁদের মহিমাগাথা ও মর্ত্যমানবের মধ্যে পূজাপ্রচারের কাহিনি নিয়ে মঙ্গালকাব্যগুলি রচিত—যেমন মনসা, চণ্ডী, ধর্ম— এঁরা আদিতে ছিলেন *'গ্রামীণ লোক-দেব-দেবী' ('Rural Folk gods and goddesses)*। *'প্রাগার্য সভ্যতা' (Pre-Aryan civilisation)* থেকে এঁদের উদ্ভব। পরে এঁরা *আর্য সভ্যতায় (Aryan civilisation)* সাঙ্গীকৃত হন এবং *বৃহত্তর পৌরাণিক হিন্দু দেবদেবীলোকে (Greater Hindu Puranic Pantheon)* উত্তরিত হন। ফলে, এই শ্রেণির কাব্যের উপভোগ ও সমাদর পল্লির সাধারণ জনসভা থেকে নগরের বিশিষ্ট রাজসভায় ব্যাপ্তি ও প্রতিষ্ঠা লাভ করে। মঙ্গালকাব্যের প্রধান দুই আশ্রয় মনসা ও চণ্ডী— 'স্ত্রী-দেবী' (Female Goddesses)। **মনসা** সর্পদেবী, *প্রাণীর দেবীরূপ (Zoomorphic Goddesses)*। দক্ষিণ ভারতের সর্পদেবী *মনচাম্মা* থেকে বঙ্গে *'মনসা-মা'র* আবির্ভাব ঘটে থাকতে পারে। **চণ্ডী** *—শিলাদেবীর রূপান্তর (Geo-morphic goddess)*—ওঁরাওঁদের 'চাণ্ডী শিলা'র পরিশীলিত দেবী রূপ-বিবর্তন। **'ধর্ম'** একটি *মিশ্র-প্রকৃতির দেবরূপ (Amalgamated God)* । এই পুরুষ দেবতার কল্পনায় কূর্মশিলারূপ *'কুলকেতু' (Totem),* নভোচারী বৈদিক দেবতা সূর্য ও বিষ্ণু ('ইদংবিষ্ণু বিচক্রমে'), পৌরাণিক দেবতা যম এবং বৌদ্ধধর্মের ত্রিশরণের অন্যতম 'ধম্ম' ('ধম্মং শরণং গচ্ছামি') সমন্বিত হয়েছেন। চণ্ডীরই অন্নদাত্রী, বরদা, শুভঙ্করী মাতৃমূর্তি অন্নদা দেবী। বাংলা মঙ্গালকাব্যগুলির কাহিনি মূলত এই চার প্রধান দেব-দেবীকে ঘিরে গড়ে উঠেছে। এগুলি হল— ১। মনসামঙ্গাল, ২। চণ্ডীমঙ্গাল, ৩। ধর্মমঙ্গাল, ৪। অন্নদামঙ্গাল। অপ্রধান দেব-দেবীদের নিয়ে রচিত হয়েছে 'রায়মঙ্গাল', 'ষষ্ঠীমঙ্গাল', 'শীতলামঙ্গাল' ইত্যাদি।

১.২। মঙ্গালকাব্যের পরিচায়নে এই কাব্যধারার প্রধান ঐতিহাসিক ড. আশুতোষ ভট্টাচার্য লিখেছেন— 'আনুমানিক খ্রীষ্টীয় ত্রয়োদশ শতাব্দী হইতে আরম্ভ করিয়া অষ্টাদশ শতাব্দীর কবি ভারতচন্দ্রের কাল পর্যন্ত বঙ্গাসাহিত্যে যে বিশেষ এক শ্রেণীর ধর্মবিষয়ক আখ্যানকাব্য প্রচলিত ছিল, তাহাই বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে মঙ্গালকাব্য নামে পরিচিত।

বাংলার পল্লীর জনসভায় ইহার উদ্ভব হইলেও শেষপর্যন্ত রাজসভায় ইহা প্রতিষ্ঠালাভ করে। ...বিভিন্ন যুগের ও বিভিন্ন সম্প্রদায়ের আচার-আচরণ, সংস্কার-সংস্কৃতি ও ধর্মবিশ্বাসের বিস্তৃত ভিত্তির উপরই ইহাদের প্রতিষ্ঠা।' (*বাংলা মঙ্গলকাব্যের ইতিহাস*, এপ্রিল ২০০২ সংস্করণ, পৃ. ১১)।

১.৩। ড. ভট্টাচার্যের উদ্ধৃত পরিচিতির শেষ বাক্যটির অনুষঙ্গে বলা যায় যে, মঙ্গালকাব্যগুলি মূলত শক্তিদেবী ও শক্তিমান দেবতার লীলাকথা হলেও এদের মধ্যে নানাভাবে বৈষ্ণব ধর্ম ও সংস্কৃতি কালে কালে অনুপ্রবিষ্ট হয়েছে। বন্দনায়, আখ্যানের খণ্ডাংশে, তালিকা-প্রণয়নে, ছোটো ছোটো *গল্পাভাসে (Episodes)*, দেবদেবী চরিত্রের কোমলতায় ও পরিশীলনে এবং বর্ণনা ও অলঙ্কার প্রয়োগে মঙ্গালকাব্যগুলিতে বাংলা সাহিত্যের চৈতন্য-পূর্ব ও চৈতন্যোত্তর যুগে বৈষ্ণব-প্রভাব পরিব্যাপ্ত।

২। বিষ্ণুদেবতা, বৈষ্ণবধর্ম ও বৈষ্ণবসাহিত্য

২.১। বৈদিক ও পরবর্তী পৌরাণিক বিষ্ণু-দেবতাকে আশ্রয় করে বৈষ্ণবধর্ম ও বৈষ্ণবতার উদ্‌ভব প্রতিষ্ঠা ও বিস্তার। ইনি পরে শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে সমন্বিত। বঙ্গের বহু জনের প্রচলিত ধারণা— বৈষ্ণবধর্ম বাংলায় ***শ্রীচৈতন্য-মহাপ্রভু*** (*১৮ ফেব্রুয়ারি ১৪৮৬ খ্রি.— ২৯ জুন ১৫৩৩ খ্রি.*) প্রবর্তিত গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্ম। ১৫০৯ খ্রিস্টাব্দে গয়ায় পিতৃকৃত্য-সাধনের পর নবদ্বীপ ফিরে এসে নিমাই পণ্ডিত/শ্রীগৌরাঙ্গ/বিশ্বম্ভরের (পরে শ্রীচৈতন্যদেব) চিত্তে যথার্থ শ্রদ্ধাভক্তিবাসিত বৈষ্ণবীয় ভাবের উন্মেষ। ১৫১০ খ্রিস্টাব্দের ২৫-২৬ জানুয়ারিতে কাটোয়ায় শঙ্করাচার্যের মধ্যম-সম্প্রদায়ভুক্ত গুরু কেশব ভারতীর কাছে তাঁর সন্ন্যাসদীক্ষা-গ্রহণ। ১৫১০ খ্রিস্টাব্দে কাটোয়া-শান্তিপুর থেকে তাঁর পুরী বা নীলাচল-যাত্রা এবং ৪ ফেব্রুয়ারি সেখানে উপস্থিতি। এপ্রিল ১৫১০-এ নীলাচল থেকে তাঁর দাক্ষিণাত্য যাত্রা ও দু'বছর সেখানে নানা তীর্থ পর্যটনের পর পুরীতে প্রত্যাবর্তন। ১৫১৫ খ্রি.-তে বৃন্দাবনগমন ও শ্রীরাধাকৃষ্ণ লীলাস্থলীর লুপ্ত তীর্থাদি উদ্ধার। মথুরা হয়ে প্রয়াগ-গমন ১৫১৬ খ্রি.-তে। বারাণসীতে আগমন ও বৈষ্ণবশাস্ত্রাদি বিচার ১৫১৬-তেই। পুরী-প্রত্যাবর্তন মে, ১৫১৬ -তে। মর্ত্যে প্রকটকালের শেষ ১৮ বছর নীলাচল থেকে শ্রীচৈতন্য অন্য কোথাও যাননি। এর মধ্যে শেষ ১২ বছর কেটেছে পুরীতে কাশী মিশ্রের বাগানবাড়ি *গম্ভীরার* একটি ছোট্ট ঘরে স্বেচ্ছাবন্দিত্বে; শ্রীকৃষ্ণবিরহাতুরা শ্রীরাধিকার ভাবে 'দিব্যোন্মাদ' (*State of Divine Frenzy*) অবস্থায়। জীবৎকালেই তিনি 'অন্তঃকৃষ্ণ বহির্গৌর' রাধাকৃষ্ণের যুগল স্বরূপে পূজিত। ১৫৩৩ খ্রিস্টাব্দের ২৯ জুন তাঁর অপ্রকট— মর্ত্যলীলাবসান। তাঁর প্রধান শিক্ষা— শুদ্ধাভক্তি-আচরণ, হরিনাম-সংকীর্তন, জীবপ্রেম-সাধন ও জাতপাত-সংস্কার-হীন মহামানবতার মিলনব্রত-পালন। এই শিক্ষার প্রভাব খ্রিষ্টীয় ষোড়শ শতকের প্রথম দশক থেকে শুরু করে এই একবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় দশক পর্যন্ত বাংলা সাহিত্যে অন্তর্নিবিষ্ট।

২.২। যদি তাই হয়, তাহলে প্রশ্ন হতে পারে— মঙ্গালকাব্য তো ব্রতকথার প্রাথমিক মৌখিক রূপ থেকে খ্রিস্টীয় ত্রয়োদশ-চতুর্দশ শতকেই মঙ্গালকাব্য-রূপে লিখিত—গ্রন্থাকারে

বিবর্তিত। *মনসামঙ্গল* আদি মঙ্গলকাব্য। এর প্রথম দুই রচয়িতা কানা হরিদত্ত ও নারায়ণ দেবকে ড. আশুতোষ ভট্টাচার্য প্রমুখ মঙ্গলকাব্যের কিছু ঐতিহাসিক ত্রয়োদশ-চতুর্দশ শতাব্দীর কবি বলতে চান। এঁরা এবং *মনসামঙ্গল* কাব্যের সর্বোত্তম কবি বিজয় গুপ্ত—সকলেই চৈতন্যপূর্ব যুগের কবি। শ্রীচৈতন্যের গৌড়ীয় বৈষ্ণব *ভক্তি-আন্দোলন* (*Bhakti Movement)* এবং বঙ্গজীবনে ও বাংলা সাহিত্যে তার ব্যাপক প্রভাব-সঞ্চার খ্রিস্টীয় ষোড়শ শতাব্দীর প্রথম দশকের আগে ঘটেনি। তাহলে তার পূর্ববর্তী আদিযুগের *মনসামঙ্গল* কাব্যে বৈষ্ণব-প্রভাবের কথা আসে কীভাবে?

২.৩। এ-রকম প্রশ্ন-উত্থাপন আমাদের বৈষ্ণবধর্মের উদ্‌ভব ও বঙ্গে তার প্রচলনের কাল সম্পর্কে ঐতিহাসিক ধারণার অজ্ঞতা-সমুদ্ভূত।

২.৩.১। বৈষ্ণব কারা? **বিষ্ণু** শব্দের সঙ্গে জাতার্থে 'অন্' প্রত্যয়-যোগে *বৈষ্ণব* শব্দ সিদ্ধ। বিষ্ণুর যারা অপত্য বা শিষ্য-স্থানীয় উপাসক তাঁরাই বৈষ্ণব। "প্রাচীনকালে 'বৈষ্ণব' শব্দের পরিবর্তে 'একান্তিক' 'সাত্বত', 'ভাগবত' ও 'পঞ্চরাত্র' শব্দ প্রয়োগ করা হইত। 'মহাভারতে'র একেবারে শেষের দিকে (১৮/৬/৯৭, ৯৮, ১০৩) 'বৈষ্ণব' শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে।' (*বৈষ্ণবধর্ম*— বিমানবিহারী মজুমদার/ *ভারতকোষ*, পঞ্চম খণ্ড, ১৯৭৩ খ্রি., পৃ. ১৬৬)। বৈষ্ণবধর্মের কয়েকটি মূলতত্ত্ব, যেমন শুদ্ধাভক্তি, প্রেম, বিষ্ণুর সর্বভূতে বিরাজমানতা ইত্যাদির বৈদিক ও পৌরাণিক উৎস বিস্তৃতভাবে আলোচিত হয়েছে আমার অগ্র-জ্যেষ্ঠতাত পরলোকগত মহামহোপাধ্যায় ড. ভাগবতকুমার গোস্বামী শাস্ত্রী-রচিত গবেষণা গ্রন্থ *Bhakti Cult in Ancient India*-তে। *ঋগবেদের* ৭/১০০/ ২ মন্ত্রে আছে—'হে আপ্তকাম বিষ্ণু, তুমি তোমার সর্বজনহিতকারী, দোষ-বিরহিত অনুগ্রহবুদ্ধি আমাদের দাও। ঐ বেদেরই ১/২২/১৮ অনুবাকে বিষ্ণুকে *'গোপা'* বা গাভীদের রক্ষক ও ১/১৫৫/৬ অনুবাকে *যুবা আকুমার অর্থাৎ চিরকিশোর* বলা হয়েছে। এই ধারণাই পরবর্তীকালে পূর্ণতা পেয়েছে *ভাগবত-পুরাণ*-বর্ণিত 'গো-গোপ সঙ্ঘাবৃত', কৈশোর-বয়স্ক শ্রীকৃষ্ণের মধ্যে, যখন বৈদিক বিষ্ণু পৌরাণিক কৃষ্ণের সঙ্গে সমন্বিত। ইনি আবার বসুদেব-পুত্র *বাসুদেব* নামেও খ্যাত। খ্রিস্টপূর্ব পঞ্চম শতকে মহাবৈয়াকরণ পাণিনি তাঁর সংস্কৃতে জগৎপ্রসিদ্ধ *অষ্টাধ্যায়ী*-ব্যাকরণ গ্রন্থের *বাসুদেবার্জুনাভ্যাং বুন্*-সূত্রে (৪/৩/৯৮) বাসুদেব-ভক্তদের কথা ইঙ্গিতে বলেছেন। খ্রিস্টপূর্ব চতুর্থ শতকে ভারত-পর্যটক গ্রিক পণ্ডিত Megasthenes তাঁর অধুনালুপ্ত এবং অনুবাদে আংশিক অবশিষ্ট *Indica* গ্রন্থে *সৌরসেনয়* (প্রাচীন *সৌরসেন* রাজ্যের অধিবাসী) নামক এক ভারতীয় জাতির *হেরাক্লিস (হরি-কৃষ্ণ)* দেবতার উপাসনা কেন্দ্র-রূপে *মেথোরা (মথুরা)* নগরী এবং তার মধ্যে প্রবাহিত *জোবারিস (যমুনা)* নদীর উল্লেখ করেছেন।

২.৩.২। প্রাচীন বঙ্গে বিষ্ণু-কৃষ্ণ-চক্রধারী দেবতার অর্চনার উল্লেখ পাচ্ছি বাঁকুড়ার অনতি দূরে শুশুনিয়া পাহাড়ের বিধ্বস্ত গুহার গায়ে অঙ্কিত বিষ্ণুচক্রের নিচে ও পাশে উৎকীর্ণ, সংস্কৃতে রচিত লিপির এই কয় ছত্রে—"পুষ্করণাধিপতে মহারাজ শ্রীসিঙ্ঘবর্মণঃ পুত্রস্য/মহারাজ শ্রীচন্দ্রবর্মণঃ কৃতিঃ/চক্রস্বামিন দোষাগ্রণাতিসৃষ্টঃ।"(দ্রষ্টব্য : *বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস*,

ড. সুকুমার সেন, প্রথম খণ্ড, আনন্দ-২০০১ সং, পৃ. ১৯) এই প্রত্নলেখটি খ্রিস্টীয় চতুর্থ শতাব্দীর। গুপ্তসম্রাট সমুদ্রগুপ্ত-কালীন। এর অর্থ— 'পুষ্করণার (আধুনিক 'পোখরনা'-র) মহারাজ সিংহবর্মার পুত্র মহারাজ চন্দ্রবর্মার কৃতি (সৃষ্টি)। চক্রস্বামীর (অর্থাৎ সুদর্শন-চক্রধারী বিষ্ণুর) হস্তাগ্র থেকে এটি বিনির্গত।'

২.৩.৩। বৈষ্ণবধর্মের ঐতিহাসিক ড. রমাকান্ত চক্রবর্তী তাঁর *বঙ্গে বৈষ্ণবধর্ম* গ্রন্থের *প্রাচীন ও আদি-মধ্যকালে বঙ্গে বৈষ্ণব ধর্মের বিভিন্ন মাত্রা*-নামক প্রথম অধ্যায়ে বিবিধ প্রস্তরলেখ, তাম্রলেখ, মূর্তিলেখর তালিকা প্রণয়ন করে দেখিয়েছেন যে, প্রাচীনকালে অখণ্ড বঙ্গে খ্রিস্টীয় চতুর্থ শতাব্দী থেকে দ্বাদশ শতাব্দীর তৃতীয় দশক পর্যন্ত বৈষ্ণবধর্মের প্রচলন ও প্রসার ছিল। এগুলি পাওয়া গেছে বাঁকুড়া, রাজশাহী, দিনাজপুর, বর্ধমান, মালদহ, ঢাকা-নারায়ণগঞ্জ এবং ত্রিপুরার গুণাইঘর ও বাখাউড়া থেকে। অর্থাৎ বর্মণ যুগ থেকে শুরু করে গুপ্তযুগ, পালযুগ ও সেনযুগ পর্যন্ত বঙ্গে বৈষ্ণবধর্মের ধারা ছিল প্রবহমানা। এদের মধ্যে ১১০০ খ্রিস্টাব্দে লিখিত নারায়ণগঞ্জ-ঢাকার *বেলাভা-লেখে 'গোপীশতকেলিকার কৃষ্ণ'*-র নাম উৎকীর্ণ। স্পষ্টতই এটি গৌড়ীয় বৈষ্ণবদের সর্বমান্য গ্রন্থ *ভাগবতপুরাণ*-অনুসারে লেখা। দ্বাদশ শতকে সেনরাজ বল্লালসেন তাঁর *দানসাগর* গ্রন্থে *ভাগবতপুরাণ*-এর উল্লেখ করেছেন। সেন-রাজারা দক্ষিণ ভারতের কর্ণাটক প্রদেশ থেকে বঙ্গে এসেছিলেন। গৌড়ীয় বৈষ্ণবরাও মনে করেন *ভাগবতপুরাণ*-রচিত হয়েছিল দক্ষিণ ভারতে, সেখান থেকে বঙ্গে এসেছে। খ্রিস্টীয় অষ্টম শতকে পাহাড়পুরের মন্দির-গাত্রেও *ভাগবতপুরাণ*-এর নানা কাহিনির ছবি উৎকীর্ণ।

২.৩.৪। প্রত্নতাত্ত্বিক ও ঐতিহাসিক নিদর্শন ছাড়াও পুরোনো সংস্কৃত ও প্রাকৃত কাব্য ও শ্লোকসঞ্চয়ে বৈষ্ণবধর্ম ও কৃষ্ণলীলার নানা উল্লেখ দেখা যায়। পালযুগে [রামপাল (১০৭২-১১২৬ খ্রিস্টাব্দ), তৃতীয় গোপাল (১১২৮-১১৪৩ খ্রিস্টাব্দ) এবং মদনপালের (১১৪৩-১১৬১ খ্রিস্টাব্দ) কালে] সন্ধ্যাকর নন্দী রচিত সংস্কৃত *রামচরিত* কাব্যের শ্লিষ্ট বন্দনা-শ্লোকে একাধারে ফণিবলয়ভূষিত, জটাজুটধারী, শশিকলামণ্ডিত শিবের সঙ্গে ভুজে কালিয়নাগধারী, বনমালাবিভূষিত, শিখিপুচ্ছশোভিত শ্রীকৃষ্ণেরও বন্দনা করা হয়েছে। ১২০৭ খ্রিস্টাব্দে সেনরাজ লক্ষ্মণসেনের *প্রতিরাজ* বটুদাসের পুত্র শ্রীধরদাস সংকলিত *সদুক্তিকর্ণামৃত* গ্রন্থের কয়েকটি শ্লোকে কৃষ্ণলীলা বর্ণিত। যেমন— এই গ্রন্থে সংকলিত সেনরাজ লক্ষ্মণসেনের অন্যতম সভাকবি উমাপতি ধর-রচিত একটি শ্লোকে পরবর্তী গৌড়ীয় বৈষ্ণব ভাবধারার পূর্বাভাস আছে। শ্লোকটি এই—

> রত্নচ্ছায়াচ্ছুরিত-জলধৌ মন্দিরে দ্বারকায়াঃ
> রুক্মিণ্যাপি প্রবল-পুলকোদ্ভেদয়া লিঙ্গিতস্য।
> বিশ্বং পায়ান্ মসৃণ-যমুনাতীর-বাণীরকুঞ্জে
> রাধাকেলিভরপরিমল-ধ্যানমূর্ছা মুরারেঃ।।

অর্থাৎ— 'রত্নচ্ছায়া-স্ফুরিত জলধির তীরে, দ্বারকার মন্দির (প্রাসাদ)-মধ্যে প্রবলভাবে পুলকিত রুক্মিণীর (শ্রীকৃষ্ণমহিষীর) আলিঙ্গানে বন্ধ হয়েও (বৃন্দাবনের) শ্যামল যমুনা-তীরের

বেতসকুঞ্জে রাধার সঙ্গে প্রেমক্রীড়ার মহত্ত্ব ও মাধুর্য ধ্যান করতে মুরারির (শ্রীকৃষ্ণের) যে মূর্ছা, তা বিশ্বকে পালন করুক।' শ্লোকটির আলোচনায় ড. সুকুমার সেন লিখেছেন— 'এই কবিতায় চৈতন্য-প্রবর্তিত বৈষ্ণবমতের (অর্থাৎ রাধাকৃষ্ণলীলাচিন্তার) পূর্বাভাস আছে।' *(বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস, ১ম খণ্ড,* ১/২৯/প্রাগুক্ত সং) শ্রীচৈতন্যপন্থী গৌড়ীয় বৈষ্ণবদের মতে, রুক্মিণী দেবী শ্রীকৃষ্ণের বিবাহিতা মহিষী— *স্বকীয়া কান্তা।* আর ব্রজগোপীশ্রেষ্ঠা শ্রীরাধা শ্রীকৃষ্ণের বিবাহবিধিবর্হিভূতা *পরকীয়া কান্তা*। কিন্তু তা লৌকিক দূষণীয় পরকীয়া-কান্তা-ভাব নয়। এটি দিব্য অলৌকিক পরকীয়া ভাবপূর্ণ; শক্তিমান শ্রীকৃষ্ণ এবং তাঁর পূর্ণানন্দের হ্লাদিনী শক্তি শ্রীরাধার অভিন্নভাবের *ভেদে অভেদ* বা *অচিন্ত্যভেদাভেদ।* এই তত্ত্বটি গৌড়ীয় বৈষ্ণবদের অলৌকিক প্রেমদর্শনের মূল স্তম্ভ। এই *পরকীয়া ভাব* (শ্রীজীব গোস্বামী যাকে *সর্বসংবাদিনী*-তে বলেছেন *পরম-স্বীয়া* ভাব) লৌকিক জগতে কোথাও নেই; দিব্য ব্রজধাম ছাড়া অন্য কোথাও এর বসতি বা অস্তিত্বই নেই। কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী এর পরিচায়নে *চৈতন্যচরিতামৃত* মহাগ্রন্থে লিখেছেন—

পরকীয়া-ভাবে অতি রসের উল্লাস।
ব্রজ বিনা ইহার অন্যত্র নাহি বাস॥

গৌড়ীয় বৈষ্ণবদের ব্যাখ্যাত (শ্রীরূপ গোস্বামীর *ভক্তিরসামৃতসিন্ধু* ও *উজ্জ্বলনীলমণি* গ্রন্থদ্বয়ে আলোচিত) *শৃঙ্গার-রসতত্ত্ব* অনুযায়ী *স্বকীয়া কান্তাদের* শ্রীকৃষ্ণপ্রেমের তুলনায় *পরকীয়া কান্তা*-দের ওই প্রেমের গাঢ়তা, উৎকর্ষ ও *স্বসুখতাৎপর্যহীনতা* অধিক গৌরবময়। উমাপতি ধরের মন্দাক্রান্তা ছন্দে রচিত উদ্ধৃত শ্লোকটিতে এই শ্রীচৈতন্যপ্রদর্শিত শ্রীকৃষ্ণের পরকীয়া কান্তাদের প্রেমোৎকর্ষ-তত্ত্বের সুস্পষ্ট পূর্বাভাস পাওয়া যায়।

২.৩.৫। খ্রিস্টীয় ১২০০ অব্দের মধ্যে বিদ্যাকর-সংকলিত সংস্কৃত-শ্লোক-সংগ্রহ-গ্রন্থ *সুভাষিতরত্নকোষ/কবীন্দ্রবচনসমুচ্চয়*-এ বাঙালি কবি রচিত অনেকগুলি শ্লোকে রাধা-কৃষ্ণলীলার পরিচয় পাওয়া যায়। যেমন— সোল্লোক-নামক কবির এই শ্লোকে রাধা ও কৃষ্ণের নাম উল্লেখ করে বলা হয়েছে—

(যূয়ং গচ্ছত) ধৈনুদুগ্ধকলমানাদায় গোপ্যা গৃহং
দুগ্ধে বষ্কয়িণীকুলে পুনরিয়ং রাধা শনৈর্যাস্যতি।
ইত্যন্যব্যপদেশ-গুপ্তহৃদয়ঃ কুর্বন্ বিবিক্তং ব্রজং
দেবঃ কারণ নন্দসূনুরশিবং কৃষ্ণঃ স পুষ্ণাতুবঃ॥

এর অর্থ— 'গাই-দুধের কলস নিয়ে গোপী তোমরা, ঘরে যাও। বক্না-গরুগুলো দোয়া হলে **রাধা** ধীরে-সুস্থে যাবে।' —এই ছলে মনের ভাব গোপন রেখে গাইবাথানকে নির্জন করলেন যিনি, নন্দপুত্ররূপে অবতীর্ণ সেই ***কৃষ্ণ*** তোমাদের মঙ্গল করুন। (দ্রষ্টব্য : *বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস*, ড. সুকুমার সেন, প্রথম খণ্ড, আনন্দ-২০০১ সং, পৃ. ২৯ এবং *বাঙ্গালীর ইতিহাস*— আদিপর্ব— ড. নীহাররঞ্জন রায়/চতুর্থ সং, পৃ. ৫৮৫)

২.৩.৬। আর্তিহরের পুত্র, বন্দ্যঘটীয় (এখনকার বন্দ্যোপাধ্যায় বা বাঁড়ুজ্জে উপাধিধারী)

সর্বানন্দ দ্বাদশ শতকের মধ্যভাগে সংস্কৃত *সমার্থাভিধান (Dictionary of Synonims) অমরকোষের* একটি প্রসিদ্ধ টীকাগ্রন্থ রচনা করেন। এই বাঙালি বৈয়াকরণ কবিও ছিলেন। তিনি ছিলেন বিষ্ণু-উপাসক। তাই গ্রন্থারম্ভে ***গোপাল-কৃষ্ণের*** বন্দনা করেছেন এই শ্লোকে—

বর্হিণবর্হাপীড়ঃ সুষিরপরো বালবল্লবো গোষ্ঠে।
মেদুরমুদির-শ্যামলরুচিরব্যাজ্ এষ গোবিন্দঃ।।

অস্যার্থ— 'উষ্ণীষে শিখিপুচ্ছধারী, বেণুবাদনরত, স্নিগ্ধোজ্জ্বল-শ্যামলকান্তি গোষ্ঠের *বালগোপ গোপাল, সেই গোবিন্দ* (সকলকে) পালন করুন।' এই শ্লোকটিতে পরবর্তীকালে শ্রীকৃষ্ণের ধ্যানমন্ত্রের দুটি চরণের পূর্বচ্ছায়া আছে, যথা— ১) 'বর্হাপীড়ং মৃগমদতিলক, কুণ্ডলাক্রান্ত-সদ্‌গণ্ডম্ এবং (২) 'গোবিন্দং কলবেণুবাদনপরং দিব্যাঙ্গভূষং ভজে।'

২.৪.১। দ্বাদশ শতকে সেন-যুগে রাজা লক্ষ্মণসেনের রাজসভার কবিপঞ্চকের *মধ্যমণি* জয়দেব সংস্কৃত সাহিত্যের শেষ সর্বভারতীয় কবি। তিনি বাঙালি না ওড়িয়া এ-নিয়ে দীর্ঘ বিতর্ক আছে। ড. অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর *বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত* গ্রন্থের প্রথম খণ্ডের শেষ সংস্করণে নিঃসংশয়ে প্রমাণ করেছেন যে, জয়দেব বীরভূমের *'কেন্দুবিল্বসম্ভব'* খাঁটি বাঙালি কবি। তাঁর দ্বাদশ সর্গে রচিত বীথী-নাট্যজাতীয় সংস্কৃত কাব্য *গীতগোবিন্দম্* সর্বভারতে প্রভূত সমাদৃত। এর প্রমাণ কাব্যটির আশিটি টীকা, যার একটি বাঙালি লেখক পূজারী গোস্বামী-রচিত। এই কাব্যেই সর্বপ্রথম রাধাকে সংস্কৃত কাব্যের পূর্ণাঙ্গ নায়িকা করা হল এবং শ্রীকৃষ্ণ তাঁর *ধীরললিত* নায়ক। কাব্যটি দ্বাদশ শতক থেকে ষোড়শ শতকে মহাপ্রভুর কাল পর্যন্ত সমগ্র বঙ্গে সুপ্রচারিত, সমাদৃত ও নৃত্য-গীতাভিনয়ে উপস্থাপিত হত। এই কাব্যে একই সঙ্গে বৈষ্ণব ভক্তের ভক্তির *হরিস্মরণ* এবং রসিকের *বিলাসকলাকুতূহল* রয়েছে। কাব্যের প্রত্যেকটি সর্গ শ্রীকৃষ্ণের এক-একটি নামের দ্বারা চিহ্নিত। যেমন— *অক্লেশ কেশব, স্নিগ্ধ মধুসূদন, মুগ্ধ মধুসূদন, সুপ্রীত, পীতাম্বর...* ইত্যাদি। কাব্যরচনায় কবি পূর্ববর্তী প্রকীর্ণ সংস্কৃত শ্লোকাদির এবং *ভাগবতপুরাণ, বিষ্ণুপুরাণ* ও *ব্রহ্মবৈবর্ত*পুরাণের আশ্রয় নিয়েছেন। স্বয়ং শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু যে এই কাব্য আস্বাদন করতেন 'চৈতন্যচরিতামৃতে' (১৬১২, মতান্তরে ১৬১৫ খ্রি.) কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী তার উল্লেখ করেছেন—

চণ্ডীদাস বিদ্যাপতি রায়ের নাটকগীতি
কর্ণামৃত শ্রীগীতগোবিন্দ।
স্বরূপ রামানন্দ-সনে মহাপ্রভু রাত্রিদিনে
গায় শুনে পরম আনন্দ।।

২.৪.২। বিদ্যাপতি বাঙালি কবি নন। তিনি মিথিলার বিস্‌ফী-গ্রাম-জাত এবং ওইনীবার বংশীয় রাজন্যবর্গের পৃষ্ঠপোষকতালব্ধ *মৈথিল কোকিল* । তাঁর জীবৎকাল আ. ১৩৮০-১৪৬০ খ্রি.। অর্থাৎ শ্রীচৈতন্যের আবির্ভাবের ২৬ বছর আগে তিনি তিরোহিত হন। তাঁর আদিতে মৈথিল, পরবর্তীতে ব্রজবুলি ভাষায় রূপান্তরিত, রাধাকৃষ্ণলীলা-পদাবলি মিথিলায় ন্যায়শাস্ত্র পড়তে যাওয়া বাঙালি ছাত্ররা কণ্ঠে ধারণ করে সঙ্গে আনেন এবং বঙ্গবাসীরা তার ভাবে,

শিল্পরূপে, ধ্বনিঝংকারে মুগ্ধ হন— বিশেষত, তাঁর শ্রীরাধার বয়ঃসন্ধি, শ্রীকৃষ্ণের পূর্বরাগ, মাথুর, ভাবসম্মিলন, প্রার্থনা পর্যায়ের পদাবলি-আস্বাদনে।

২.৪.৩। খ্রিস্টীয় চতুর্দশ শতাব্দীতে সম্ভবত পিঙ্গালাচার্য রচিত এবং বারাণসীতে সংকলিত 'প্রাকৃতপৈঙ্গাল' গ্রন্থের প্রাকৃত-অপভ্রংশ-অবহট্ঠ ভাষার প্রকীর্ণ শ্লোকগুলির কোনো- কোনোটিতে কৃষ্ণলীলার বর্ণনা আছে। শ্রীকৃষ্ণের *নৌকালীলার* এই পদটি সম্ভবত কোনো বাঙালি কবির রচিত—

অরে রে বাহিহি কাহ্ন ণাব
ছোড়ি ডগমগ কুগই ণ দেহি।
তুহুঁ এখনই সন্তার দেহি
যো চাহসি সো লেহি।।

এর অর্থ— 'ওরে রে কৃষ্ণ! (তুমি) নৌকা বাইবে। (নৌকা) ডগমগ করা (টলমল করা) ছেড়ে দাও, (আমাদের) দুর্গতি দিয়ো না। তুমি এখনই খেয়া পারাপার করে দাও। যা চাও, তাই নাও।' এটি ভীতা মথুরাগামিনী শ্রীরাধা ও তাঁর সখীদের চতুর নায়ক শ্রীকৃষ্ণের প্রতি উক্তি। এর প্রত্যক্ষ প্রভাব পড়েছে বড়ু চণ্ডীদাসের *শ্রীকৃষ্ণকীর্তন* (আসলে '*শ্রীকৃষ্ণসন্দর্ভ*') *নাট-পালা-গীতিকাব্যে*।

২.৪.৪। বড়ু চণ্ডীদাস অথবা অনন্ত বড়ু-চণ্ডীদাস নামক কবির বীথী জাতীয়, গীতাভিনয়-আশ্রিত, পুতুল-নাটকের কাহিনিকাব্য *শ্রীকৃষ্ণকীর্তন* রচিত হয়েছিল আনুমানিক চতুর্দশ শতাব্দীর একেবারে শেষভাগ থেকে পঞ্চদশ শতাব্দীর সূচনাকালের মধ্যে (যদিও এই কালসীমা নিয়ে প্রবল বিতর্ক আছে)। *গীতিগোবিন্দের* মতো এ কাব্যেও বারোটি খণ্ড (*জন্মখণ্ড* থেকে *বংশীখণ্ড* পর্যন্ত) এবং সবশেষে খণ্ডনামহীন অসম্পূর্ণ রূপে প্রাপ্ত *রাধাবিরহ* অংশ। এই কাব্যে পৌরাণিক রাধাকৃষ্ণকে অমার্জিত, স্থূল আদিরসাশ্রিত লৌকিক, দেহসম্ভোগবহুল গ্রাম্য রাখাল নায়ক ও নায়িকার স্তরে নামিয়ে আনা হয়েছে। কাব্যপুথির আবিষ্কারক ও সম্পাদক বসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বদ্বল্লভের দাবি সত্ত্বেও অধিকাংশ সমালোচকের মতে এমন অমার্জিত রিরংসাপূর্ণ রাধাকৃষ্ণকেলিকথা শ্রীচৈতন্য কখনোই আস্বাদন করেননি। এটি স্বরূপ দামোদরের অনুমোদন লাভে অক্ষম এবং মহাপ্রভুর দ্বারা এর আস্বাদন অসম্ভব! কাব্যটি তার স্থূল ও উগ্র রতিবিলাসের জন্য বঙ্গে অনাদৃত ও পরিত্যক্ত ছিল। তা নইলে একটি মাত্র সংশায়িত খণ্ডিত পুথি ছাড়া বিগত ৯৭ বছরে এর আর কোনো খণ্ডিত বা অখণ্ড দ্বিতীয় পুথির সন্ধান পাওয়া গেল না কেন? তাই প্রাক্‌চৈতন্য বা চৈতন্যোত্তর কোনো মঙ্গলকাব্যকার এই অশ্লীলতাদুস্ট কাব্যের সঙ্গে পরিচিত ছিলেন না। তাঁদের কাব্যে এর প্রভাব পড়াও অকল্পনীয়। আর *শ্রীকৃষ্ণকীর্তন* পুরোপুরি বৈধ বৈষ্ণবকাব্যও নয়।

২.৪.৫। শ্রীচৈতন্য আস্বাদিত ও বহুমানিত একটি চৈতন্যপূর্ব অনুবাদকাব্য *শ্রীকৃষ্ণবিজয়*। *ভাগবত পুরাণের* মূলত দশম-একাদশ স্কন্ধ অবলম্বনে এই অনুবাদকাব্যটি ১৪৭৩-১৪৮০ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে গৌড়েশ্বর রুকনুদ্দিন বারবক শাহের পৃষ্ঠপোষকতায় রচনা করেন 'গুণরাজখান'- উপাধিক কুলীনগ্রাম-বাসী কবি মালাধর বসু। পুরীতে রথযাত্রার সময়

কুলীনগ্রাম-কীর্তনীয়াদের সঙ্গো আগত কবিপুত্র সত্যরাজখানের কাছে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু কাব্যটির ভূয়সী প্রশংসা করেছিলেন। *চৈতন্যচরিতামৃতে* কৃষ্ণদাস কবিরাজ এর বিবরণ দিয়ে জানিয়েছেন, মহাপ্রভু বলেছিলেন—

নন্দের নন্দন কৃষ্ণ মোর প্রাণনাথ।
এই বাক্যে বিকাইনু তান বংশের হাথ।।

শ্রীকৃষ্ণবিজয় থেকে উদ্ধৃত প্রথম পয়ার-ছত্রটিতে ব্রজগোপীদের 'রাগাত্মিকা সাধনার' ইঙ্গিত আছে, মহাপ্রভু ছিলেন যার মূর্ত বিগ্রহ। শ্রীচৈতন্য কর্তৃক আস্বাদিত ও বহুমানিত হওয়ায় যোড়শ শতাব্দীর প্রথমভাগেই পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষভাগে রচিত এই কাব্যটি বঙ্গো বহুল প্রচলিত হয়েছিল। এর প্রমাণ এ কাব্যের আবিষ্কৃত অনেকগুলি পুথি।

৩। মঙ্গালকাব্যে বৈষ্ণব-প্রভাব সন্ধানের সূত্র

৩.১। এই প্রবন্ধের দ্বিতীয় উপচ্ছেদে নানা প্রত্নতাত্ত্বিক উপাদানের বিবরণ এবং সংস্কৃত, বাংলা, ব্রজবুলি ও অপভ্রংশ-অবহট্‌ঠ ভাষায় রচিত বিষ্ণু বা শ্রীকৃষ্ণের লক্ষ্মী, রুক্মিণী, রাধা, ব্রজগোপী নায়িকাদিসহ বিবিধ লীলাত্মক কবিতা বা কাব্যের পরিচিতি-সংকলন আমাদের বর্ণিতব্য *বাংলা মঙ্গালকাব্যে বৈষ্ণব প্রভাব* বিষয়টি উপস্থাপনার জন্য অত্যাবশ্যক। এটি 'ধান ভানতে শিবের গীত' নয়।

৩.২। বাংলা মঙ্গালকাব্যগুলির মধ্যে প্রাচীনতম কাব্য *মনসামঙ্গাল*। চৈতন্যপূর্ব *মনসামঙ্গাল* কাব্যগুলির মধ্যে বিজয় গুপ্তের *পদ্মাপুরাণই* সর্বোত্তম। এই কাব্যে কোথাও কোথাও বৈষ্ণবীয় অনুষঙ্গা আছে। কোনো কোনো সমালোচক বলেছেন, এগুলি চৈতন্যোত্তর কালের গায়েনদের প্রক্ষেপ। আমি এ-মত মানি না। বিজয় গুপ্ত উত্তম সংস্কৃতজ্ঞ কবি ছিলেন। তিনি বঙ্গো দীর্ঘচলিত সংস্কৃত কৃষ্ণকথাশ্লোকাদি ও কাব্যকথা নিশ্চয়ই জানতেন। তার সূত্রসন্ধানের জন্যই আমরা চৈতন্যপূর্বযুগে প্রচলিত বৈষ্ণব কবিতা ও কাব্যের ধারাবাহিক, সংক্ষিপ্ত ঐতিহাসিক পরিচিতি সংকলন করেছি।

৩.৩। শ্রীচৈতন্যোত্তর মঙ্গালকাব্যগুলিতে প্রধানত *'চণ্ডীমঙ্গালে'* যে গাঢ় বৈষ্ণব-প্রভাব রয়েছে তারও বীজ পাওয়া যায় মূলত জয়দেবের সংস্কৃত *গীতগোবিন্দম্* কাব্যে, উমাপতি ধরের সংস্কৃত প্রকীর্ণ শ্লোকে, বিবিধ সংস্কৃত শ্লোক সংকলন গ্রন্থে, বিদ্যাপতির ব্রজবুলি পদাবলিতে। মালাধর বসুর ভাগবতানুসারী *শ্রীকৃষ্ণবিজয়* কাব্যে এবং *প্রাকৃতপৈঙ্গালের* শ্লোকাবলিতে। সেখানে বৈষ্ণব ভাবসাধনা ও রাধাকৃষ্ণলীলাকথার নানা বিষয় বর্ণিত, এমনকি রাগাত্মিকা ভক্তিসাধনার কথাও প্রাপ্য। এগুলির প্রভাবেই কাব্যের *বন্দনাখণ্ডে চৈতন্যবন্দনা* যুক্ত। মঙ্গালকাব্যের প্রথানুযায়ী নানা তালিকা রচনায় বৈষ্ণবীয় লীলাকথার বিস্তারণ, সংক্ষেপে *ভাগবতের* বিবিধ লীলাকাহিনি স্মরণ, নায়িকাদের রূপবর্ণনায় শ্রীরাধার রূপারোপের ছায়াসঞ্চার। পুরুষ ও নারী চরিত্রগুলির মধ্যে অনেকের নাম বৈষ্ণবীয় অনুষঙ্গা-নির্ভর। *মনসামঙ্গালে* বেহুলার নদীযাত্রাপথে এবং *চণ্ডীমঙ্গালের বণিকখণ্ডে* ধনপতির সমুদ্রযাত্রাপথে বহু বৈষ্ণবতীর্থের উল্লেখ চৈতন্যোত্তর বৈষ্ণবধর্ম-প্রভাবিত— এ-বিষয়ে সন্দেহের কোনো অবকাশ নেই।

৩.৪। সুতরাং *দুটি সূত্রে* বাংলা মঙ্গালকাব্যে বৈষ্ণব প্রভাব অনুসন্ধান আমাদের অন্বিষ্ট। ***এক.*** বৈষ্ণবতত্ত্ব, প্রত্নলেখ ও সাহিত্যের অনুষঙ্গে। ***দুই.*** বৈষ্ণব ভক্তি ভাবনা 'নানা লীলাবিলাস' জীবনকথা, আলংকারিকতা ও বাণী প্রয়োগের অনুষঙ্গে। প্রথমটি আগেই করেছি।

৪. 'মনসামঙ্গল'-কাব্যে বৈষ্ণব-প্রভাব

৪.১। বাংলা মঙ্গালকাব্যগুলির মধ্যে সর্পদেবী মনসার মাহাত্ম্যসূচক **মনসামঙ্গালই** প্রাচীনতম। এই মঙ্গালকাব্যে বৈষ্ণব প্রভাবের সূত্র আমরা আগে (৩.২ অংশে) উল্লেখ করেছি। বিজয় গুপ্তের সাক্ষ্য অনুসারে **কানা হরিদত্ত** *মনসামঙ্গালের* প্রাচীনতম কবি। ড. আশুতোষ ভট্টাচার্য তাঁর *বাংলা মঙ্গালকাব্যের ইতিহাস* (দশম পুনর্মুদ্রণ, ২০০২ খ্রি., পৃ. ৩১৬) গ্রন্থে লিখেছেন— 'সম্ভবতঃ ত্রয়োদশ শতাব্দীর শেষভাগে বা চতুর্দশ শতাব্দীর প্রারম্ভে হরিদত্ত বিদ্যমান ছিলেন।' হরিদত্তের দুটি মাত্র পদ পাওয়া গেছে। তাদের মধ্যে কোনো বৈষ্ণবীয় প্রভাব নেই।

৪.২। হরিদত্তের পরবর্তী মনসামঙ্গালকার **নারায়ণদেব**— 'খ্রিস্টীয় পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষভাগে আবির্ভূত হইয়াছিলেন।' *(বা. ম. ই,* তদেব, পৃ. ৩২৩)। ড. অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতে— 'কবি শাক্ত-মঙ্গালকাব্য লিখিলেও ধর্ম্মমতে বৈষ্ণবানুকূল ছিলেন।' *(বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত,* দ্বিতীয় খণ্ড, ১৯৯৬ খ্রি. সং., পৃ. ১২০)। নারায়ণদেবের কাব্যে উল্লিখিত হয়েছে যে, স্বপ্নে আবির্ভূত হয়ে স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ 'শিশুকালে গোপরূপে হাতে লৈয়া বাঁশী' কবিকে আলিঙ্গান দিয়েছিলেন। তাঁর কাব্যের নানা স্থানে, বিশেষত ধ্রুবপদ বা ধুয়াতে বৈষ্ণবপদাবলির বাণীঝংকার আছে। যেমন—

> বাপু ধীরে ধীরে যাও পথ নিরীক্ষিয়া।
> পাষাণ লাগিবে পদে পাষাণ ঠেকিয়া।।

এই পদাংশে *শ্রীমদ্ভাগবতের* দশম স্কন্ধে, শ্রীকৃষ্ণের বনভ্রমণের সময় তাঁর কোমল শ্রীচরণ যুগলে 'কূর্পাদি' বা তীক্ষ্ণ শিলা বিদ্ধ হয়ে ব্যথা লাগার আশঙ্কায় ব্রজগোপীদের উদ্বেগের ছায়াপাত আছে—

> ...তেবাটবীমটসি তদ্ ব্যথতে ন কিং স্বিৎ
> কূর্পাদিভির্ভ্রমতি ধীর্ভবদায়ুষাং নঃ। (১০/৩১/১৯)

আবার সমালোচকের মতে— 'ইহা তো বৈষ্ণব পদের বাৎসল্য রসের সুর।' (*বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত,* অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, *পূর্বোক্ত সং, পৃ. ১২০)*

৪.৩.১। নারায়ণদেবের পরবর্তী অথবা সমসাময়িক পূর্ববঙ্গের বরিশাল জেলার গৈলা-ফুল্লশ্রী গ্রামের কবি **বিজয় গুপ্ত** তাঁর *পদ্মাপুরাণ* কাব্য রচনা করেছিলেন— 'ঋতু শশী বেদ শশী পরিমিত শকে'। অর্থাৎ ১৪১৬ শকাব্দ বা ১৪৯৪ খ্রিস্টাব্দে। 'সুলতান হুসেন শাহ নৃপতি তিলক'-এর রাজত্বকালের সূচনায় (রাজত্বকাল ১৪৯৩-১৫১৮ খ্রিস্টাব্দ)। কবি যদিও পদ্মা বা মনসাদেবীর একান্ত ভক্ত, তবুও তাঁর কাব্যে স্থানে স্থানে

বৈষ্ণব-প্রভাবের চিহ্ন আছে। কাব্যের 'বন্দনা' অংশে (প্রথম পালায়) বিজয় গুপ্ত হংস-বাহন রথাসীন কমললোচন ব্রহ্মার বন্দনার পরই গেয়েছেন— 'গরুড় বাহনে বন্দম বিষ্ণুর চরণ।'

এছাড়াও কাব্যের বহুস্থানে রাধা-কৃষ্ণ এবং বিষ্ণু-হরির উল্লেখ আছে। যেমন—'হরি হর নারায়ণ স্মরয়ে গোবিন্দ', 'হরি ভজিবার সময় যায় যে বহিয়া', 'হরিধ্বনি জয়-জোকার বচাইর নগর, 'জনমে জনমে হই রাধা-কানুর দাস', 'বাঁশী হইল কাল যাইতে যমুনার জলে' ইত্যাদি। *(দ্রষ্টব্য : বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত, ২য় খণ্ড, অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, পূর্বোক্ত সং, পৃ. ১০৪)*। এমনকি বিবাহরাত্রে লখিন্দর বাসরে কালনাগিনীর বিষে ঢলে পড়ার পর বেহুলা একা গেছে মনসার প্রাসাদে। মনসা দেখা না-করে জানালেন— মাথা ধরেছে বলে তিনি শুয়ে আছেন। সখী নেতার তিরস্কারে মনসাকে দ্বার খুলে আসতে হল। তাকে দেখে উপহাস করে—

বেহুলা বলে— 'হরি হরি, গোপাল, গোবিন্দ।
দেবকন্যা হইয়া তুমি সাঁঝে যাও নিন্দ'।।

৪.৩.২। বিজয় গুপ্তের *মনসামঙ্গলের* আধুনিক সমালোচক ড. অচিন্ত্য বিশ্বাস এ-প্রসঙ্গে মন্তব্য করেছেন— 'বহু পরবর্তীকালের দৃষ্টিভঙ্গি, 'হরি হরি গোপাল গোবিন্দ' বলার মধ্যেও বোঝা যাচ্ছে এ রচনার আবহ চৈতন্য-পরবর্তী।' *(বিজয় গুপ্তের মনসামঙ্গল*, ১ম প্রকাশ ২০০৯ খ্রি., ভূমিকা, পৃ. ৪১) এই মন্তব্য মানা যায় না। আমরা পূর্বালোচনায় বিশদভাবে দেখিয়েছি চৈতন্যপূর্ব যুগ থেকেই বঙ্গে চক্রস্বামী বিষ্ণু, নারায়ণ, কৃষ্ণ, হরির উপাসনাধারা সুপ্রচলিত ছিল এবং সংস্কৃত, প্রাকৃত, ব্রজবুলি, বাংলা কবিতার পদ, শ্লোকাবলিতে তার ধারা ক্রমবাহিত হয়েছে। সংস্কৃতজ্ঞ বিদগ্ধ কবি বিজয় গুপ্তের তা অজানা থাকার কথা নয়। বরং এ-বিষয়ে ড. অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের পর্যবেক্ষণ যথাযথ—'চৈতন্যের পূর্বে ১৪শ-১৫শ শতাব্দীতে বাঙালী সমাজে তান্ত্রিক শাক্তমতের সঙ্গে সঙ্গে কিছু কিছু বৈষ্ণব মতও ছিল। কাজেই প্রায় সমস্ত মনসামঙ্গল কাব্যেই রাধাকৃষ্ণ বা বিষ্ণু-হরির প্রভাব দেখিতে পাওয়া যায়। বিজয় গুপ্তের মনটি কিয়দংশে বৈষ্ণব-ভক্তির অনুকূল ছিল।' *(বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত, ২য় খণ্ড, অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, পূর্বোক্ত সং, পৃ. ১০৪)* ।

৪.৪.১। বিজয় গুপ্তের কাব্য রচনার ঠিক পরবর্তী বছরে 'সিন্ধু ইন্দু বেদ মহী শকে', অর্থাৎ ১৪১৭ শক বা ১৪৯৫ খ্রিস্টাব্দে **বিপ্রদাস পিপলাইয়ের** *মনসাবিজয়* কাব্য রচিত হয়। (তবে কাব্যের এই রচনাকাল ও প্রাচীনত্ব সম্পর্কে ঘোর সংশয় আছে!) বিপ্রদাসের কাব্যের সূচনায় গণেশ ও ধর্মের বন্দনার পর নারায়ণের বন্দনা আছে। প্রত্যক্ষ বৈষ্ণব-প্রভাব এইটুকু মাত্র। ত্রয়োদশ পালায় সম্পূর্ণ এই কাব্যের কাহিনি বর্ণনায়, অথবা চরিত্র চিত্রণে, আর কোথাও বৈষ্ণব-প্রভাবের চিহ্নমাত্র নেই।

৪.৪.২। কিন্তু এই কাব্যের নবম—'বাণিজ্য'—পালায় একটি অদ্ভুত অসামঞ্জস্যকর বর্ণনা আছে, যাতে চৈতন্যোত্তর বৈষ্ণবধর্মের প্রভাব প্রকট। চাঁদ সদাগরের বাণিজ্যযাত্রা-পথে যে-সব ঘাটে এবং তীর্থে তাঁর ডিঙ্গা ভিড়েছে তাদের মধ্যে উল্লেখ রয়েছে আঁবুয়া

(অম্বিকা-কালনা), নিমাইতীর্থ, আকনা মহেশ, খড়দহ, আড়িয়াদহ প্রভৃতি স্থানের। আঁবুয়া বা অম্বিকা-কালনা নিত্যানন্দ প্রভুর দ্বাদশ গোপালের অন্যতম এবং প্রভুর খুড়শ্বশুর গৌরীদাস পণ্ডিতের শ্রীপাট। আকনা মহেশ প্রভুর অপর গোপাল কমলাকর পিপিলাইয়ের শ্রীপাট। খড়দহ স্বয়ং নিত্যানন্দ প্রভুর শ্রীপাট। কাব্যে একে 'শ্রীপাট' বা বৈষ্ণবতীর্থ বলেই উল্লেখ করা হয়েছে—

খড়দহ শ্রীপাট করিয়া দণ্ডবত।
বাহ বাহ বলি রাজা ডাকে অবিরত।।

আর 'দণ্ডবৎ' প্রণাম করাও খাঁটি চৈতন্যোত্তর বৈষ্ণবীয় রীতি। নিমাইতীর্থের প্রতিষ্ঠাও নিমাই বা শ্রীচৈতন্যের দেবমাহাত্ম্য প্রতিষ্ঠার আগে হতে পারে না। কাব্যটি যদি ১৪৯৫ খ্রিস্টাব্দে নিমাই বা শ্রীচৈতন্যের জন্মের মাত্র ন'বছর পরে রচিত হয়ে থাকে তাহলে এতে বঙ্গের বিখ্যাত গৌড়ীয় বৈষ্ণব তীর্থগুলির উল্লেখ অবিশ্বাস্য! এ-প্রসঙ্গে ড. অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের তির্যক মন্তব্য স্মরণীয়— 'রাম না হইতে রামায়ণ রচনা হয়তো সম্ভব, কিন্তু নিমাইয়ের পূর্বে নিমাইতীর্থ এবং নিত্যানন্দের পূর্বে শ্রীপাট খড়দহের সশ্রদ্ধ উল্লেখ সম্ভব নহে।' *(বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত, ২য় খণ্ড, অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, পূর্বোক্ত সং, পৃ. ১০৯)*। এই কালানৌচিত্য দোষের (Anachronism) মীমাংসায় বিপ্রদাসের কাব্য-সম্পাদক ড. সুকুমার সেন এই বর্ণনাংশকে পরবর্তী গায়েনের পরিবর্ধন এবং প্রক্ষেপ বলেছেন—'There is little doubt the earlier narrative is a singer's elaboration made at a much later date. *(Vipradas's Manasa Vijaya—Introduction p.V)* কিন্তু সমগ্র কাব্যের ভাষারীতি এত আধুনিক ও মার্জিত যে, কাব্যের মুদ্রিত রূপকে কিছুতেই চৈতন্যপূর্বযুগের পূর্ববর্তী বলা যায় না।

৪.৫.১। পূর্ববঙ্গের ময়মনসিংহ জেলার কিশোরগঞ্জ মহকুমার পাতুয়ারী গ্রামের কবি **দ্বিজ বংশীদাসের** মুদ্রিত *মনসামঙ্গল* কাব্যের 'জলধির বামেতে ভুবন মাঝে দ্বার' শককে অর্থাৎ ১৪৯৭ শকাব্দ বা ১৫৭৫-৭৬ খ্রিস্টাব্দকে কাব্য রচনার কাল বলে উল্লেখ অপ্রামাণিক। ড. আশুতোষ ভট্টাচার্যের এ বিষয়ে অভিমত— 'পারিপার্শ্বিক সমস্ত ঘটনা বিবেচনা করিয়া দ্বিজবংশীকে সপ্তদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে স্থাপন করাই সমীচীন বোধহয়।' *(বাংলা মঙ্গলকাব্যের ইতিহাস, পূর্বোক্ত সং., পৃ.৩৫১)*।

দ্বিজ বংশীদাসের 'মনসামঙ্গল' চৈতন্যোত্তর কালে রচিত। স্বভাবতই এ-কাব্যে চৈতন্যোত্তর বৈষ্ণব-প্রভাব সুপ্রকট। এই কাব্যে অনেকগুলি গৌড়ীয় বৈষ্ণব-ভাবাশ্রিত 'দিসা' আছে। যেমন—

১) 'গোপাল বনে যায় রে মায়ের প্রাণ লৈয়া।' (বাৎসল্য রস)
২) 'রাধা কোলে করি কানাই ভাসে।' (সম্ভোগ শৃঙ্গার রস)
৩) 'সখি গো চল দেখি গিয়া।
সাজিছে বিনোদ শ্যাম রাধার লাগিয়া।।' (সখী-তত্ত্ব) ...ইত্যাদি।

৪) ‘বংশীবদনের বদনে।
বাঁশী জানে রাধা নাম কেমনে।।’ (বংশী-মাধুর্য)

আবার এই কাব্যে শ্রীচৈতন্যের নামেও কয়েকটি ‘দিসা’ দেখা যায়। যথা—

১) ‘ও প্রাণ শচীর দুলাল গৌরকিশোর।’
২) ‘গৌরাঙ্গা নাচে নবদ্বীপের মাঝে।’
৩) ‘নিমাই কে ভাঙ্গিল আমার নদীয়ার বসতি।’ ...ইত্যাদি।

এ-প্রসঙ্গে ড. অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের মন্তব্য— ‘তিনি (বংশীদাস) বৈষ্ণব পদ রচনা করিলে ব্যর্থ হইতেন না, তাহা এই দিসাগুলির সহজ রস ও কবিত্ব হইতে অনুমিত হইতে পারে।’ *(বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস*, তৃতীয় খণ্ড, প্রথম পর্ব, তৃতীয় সং, পৃ. ৮১)। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে, এই দ্বিজ বংশীদাস *শ্রীমদ্ভাগবতের* অনুবাদকাব্য *শ্রীকৃষ্ণগুণার্ণব* রচনা করেছিলেন, যেখানে তাঁর বৈষ্ণবপ্রাণতা আরও সুব্যক্ত।*

৪.৬.১। পশ্চিমবঙ্গের *মনসামঙ্গল* কবিদের মধ্যে সর্বাধিক পরিচিত এবং শ্রেষ্ঠ *কেতকাদাস-ক্ষেমানন্দ।* উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের বঙ্গভাষা ও সাহিত্য বিভাগে সংরক্ষিত একটি পূর্বাংশহীন ও পরবর্তী অংশের অখণ্ড পুথি (নং ৪৫৬) অবলম্বনে ‘মনসামঙ্গল-কেতকাদাস ক্ষেমানন্দ’ নামে এই কাব্যের একটি ‘facsimile’ বা পুথি-প্রতিলিপি চিত্র-সহ মুদ্রিত সংস্করণ প্রকাশিত হয়েছে বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ থেকে ২১ জুলাই, ২০১০ খ্রিস্টাব্দে। এর ‘নিবেদন’ অংশে ত্রয়ী সম্পাদক তন্ময় মিত্র, মীর রেজাউল করিম ও সুবোধকুমার যশ জানিয়েছিলেন— ‘প্রাথমিক পর্যায়ে এটির (অর্থাৎ কবির আত্মবিবরণীতে উল্লিখিত রাজা ভারমল্লের একটি ভূমিদানপত্রের) সাল-তারিখ নিয়ে কিছু বিতর্ক ছিল ঠিকই, তবে বহু বিতর্ক-বিচারে এর সময়কাল ১৭২৯ খ্রিস্টাব্দ স্থির হয়েছে। সুতরাং, বলা যেতে পারে কবি *অষ্টাদশ শতকের প্রথমার্ধে* কাব্যখানি রচনা করেন।’ (পৃ.২)।

৪.৬.২। ড. সনৎকুমার নস্কর সম্প্রতি প্রকাশিত (১লা জানুয়ারি ২০১১ খ্রিস্টাব্দ) তাঁর সম্পাদিত *কেতকাদাস ক্ষেমানন্দের মনসামঙ্গল* গ্রন্থের ভূমিকায় ‘কাব্যরচনাকাল প্রসঙ্গে’ ভিন্ন তথ্য দিয়েছেন। তিনি ১৯৭৭ সালে প্রকাশিত অক্ষয়কুমার কয়াল ও চিত্রা দেব-সম্পাদিত কেতকাদাস-ক্ষেমানন্দের ‘মনসামঙ্গল’ কাব্যের উৎস-স্বরূপ একটি পুথির অন্তর্গত কবি-শকাঙ্ক সেখান থেকে উদ্ধার করেছেন— ‘শূন্য রস বাণ শশী/শিয়রে মনসা আসি/আদেশিলা রচিতে মঙ্গল।’ অর্থাৎ ১৫৬০ শকাব্দ বা ১৬৩৮-৩৯ খ্রিস্টাব্দে মনসার স্বপ্নাদেশ পেয়ে কেতকাদাস তাঁর কাব্যরচনা শুরু করেন। অন্যান্য পারিপার্শ্বিক প্রমাণাদি বিচার করে ড. নস্করের অভিমত— ‘স্থূল হিসাবে ক্ষেমানন্দের কাব্য সপ্তদশ শতকের প্রথমার্ধের মধ্যে সুসম্পন্ন হয়ে গিয়েছিল।’ (পৃ. ছয়)।

৪.৬.৩। তাহলে দেখা যাচ্ছে তন্ময় মিত্র, মীর রেজাউল করিম ও সুবোধকুমার যশের কেতকাদাস ক্ষেমানন্দের কাব্যরচনাকাল-নির্ণয়ের সঙ্গে তুলনায় ড. সনৎকুমার নস্করের ঐ কালনির্ণয়ের মধ্যে দীর্ঘ ১০০ বছরের ব্যবধান! এদিকে ড. আশুতোষ ভট্টাচার্যের অভিমত— ‘খ্রীস্টীয় সপ্তদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে তাঁহার কাব্য রচিত হয় বলিয়া গ্রহণ করা

যাইতে পারে।' (*বাংলা মঙ্গলকাব্যের ইতিহাস*— পূর্বোক্ত সং, পৃ. ৩৬১)। ড. সুকুমার সেনের বক্তব্য— 'কেতকাদাসের সময় সপ্তদশ-অষ্টাদশ শতাব্দীর সন্ধিকালে ধরিতে হইবে।' (*বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস*—২, ফাল্গুন ১৪১৭ সং, পৃ. ২২৬)। ড. অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিচারে— 'কাব্যটি সপ্তদশ শতাব্দীর শেষভাগে রচিত হইয়াছিল বলিয়া মনে হয়।' এত পরস্পরবিরোধী মতামতের মধ্যে কেতকাদাস ক্ষেমানন্দের কাব্যরচনাকাল-নির্ণয় চূড়ান্তভাবে করা যায় না। তবে সে-কাল সপ্তদশ অথবা অষ্টাদশ শতাব্দী যাই হোক-না-কেন, তা নিশ্চিতরূপেই চৈতন্যোত্তরকাল। তাই অনিবার্যভাবেই কেতকাদাস ক্ষেমানন্দের মনসামঙ্গলে চৈতন্যোত্তর গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্মের প্রভাব পড়েছে।

৪.৬.৪। কেতকাদাস ক্ষেমানন্দের কাব্য থেকে তাঁর বৈষ্ণবপ্রাণতার কিছু নিদর্শন দিচ্ছি।

৪.৬.৫। প্রথমেই শ্রীচৈতন্য, শ্রীনিত্যানন্দ, শচী (শ্রীচৈতন্যের জননী) ও পুরন্দরের (শ্রীচৈতন্যের পিতা জগন্নাথ মিশ্রের) বন্দনা—

অ) 'বন্দিলুঁ জগত গুরু : কলিযুগে কল্পতরু : নবদ্বীপে চৈতন্য গোসাঞি।
জীব নিস্তারিতে যার : কলিযুগে অবতার : যাঁহা হৈতে হরিগুণ গাই।।
শচী পুরন্দর ধন্য : যাঁর পুত্র শ্রীচৈতন্য : চতুর্ভুজরূপে নারায়ণ।
বিস্তারিতে ভবসিন্ধু : অনাথজনের বন্ধু : শ্রীগৌরাঙ্গ পতিতপাবন।।
প্রেমানন্দ নিত্যানন্দ : হরিরস-মকরন্দ : চৈতন্যচরণে কৈল পান।
কলির নিস্তার হরি : গোরাগুণ জগৎ ভরি : নামেতে করিল পরিত্রাণ।।'
(*ড. সনৎকুমার নস্কর সংস্করণ*, পৃ. ৪-৫)

এরপর বৃন্দাবন-সহিত রাধা-কানু-যোলশ গোপিনী ও তাঁদের প্রাণপতি শ্যামরায়ের বন্দনা—

আ) 'অষ্ট কুলাচল বন্দোঁ প্রভাতের ভানু। বৃন্দাবন-সহিত বন্দিনু রাধা-কানু।।
যোলশ গোপিনী সঙ্গে বন্দোঁ শ্যামরায়। কদম্বে হেলন দিয়া মুরলী বাজায়।।
(*ড. সনৎকুমার নস্কর সংস্করণ*, পৃ. ৫)

৪.৬.৬। উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের পুথি অবলম্বনে সম্পাদিত কেতকাদাস ক্ষেমানন্দের কাব্য-সম্পাদকত্রয়ী 'পাঠসম্পাদনা' ও 'পাঠপর্যালোচনা' অংশে এই কাব্যে বৈষ্ণব-প্রভাবের আরও কিছু নিদর্শন দিয়েছেন। তাঁদের মতে— 'কাব্যটিতে বৈষ্ণবীয় সংস্কৃতি, রস ও সাহিত্যের (শব্দ চয়নেও) প্রভাব আছে।' (পৃ. তেরো) যেমন—

১। বৈষ্ণবীয় সংস্কৃতি প্রথা

তুলসী বদল কৈল বিভার নির্ণয়।
লখাইরে বেহুলা দিলাম বলে সায়।।' (পৃ. ৪৩)

জনার্দন ঘটকের মধ্যস্থতায় চান্দ সদাগর চম্পাইনগর থেকে উজানি নগরে বেহুলার পিতা সায় বেনের ভবনে এসেছেন নিজ কনিষ্ঠপুত্র লখাই বা লখিন্দরের সঙ্গে সায়-কন্যার বিবাহের সম্বন্ধ করতে, সঙ্গে 'মেলানির' নানা উপহার। প্রস্তাব হল— 'লখিন্দর বিভা দিব বেহুলা নাচনি।' চতুর ঘটক সেকথা শুনে— 'তুলসী আনিয়া দিল হস্তেতে আপনি।'

তখন দুই বেয়াই তুলসী-বদল (তুলসীপত্র না মালা? বৈষ্ণব রীতি অনুযায়ী মালা হওয়াই সম্ভব।) করলেন। তখন বিবাহের 'বাগ্‌দান' হ'ল (উদ্ধৃতি দ্রষ্টব্য)।

২।বৈষ্ণবীয় রস (বাৎসল্য) দুকুড়ি নাগের মাতা কালনাগিনীর মধ্যে বাৎসল্যের প্রাবল্য	'বাসরে প্রবেশ কৈল এ কালনাগিনি। বেহুলা লখাই রূপ দেখিলা আপনি।।... এমন সুন্দর গায়ে কোনখানে খাইব। দেবী জিজ্ঞাসিলে তারে কি বোল বলিব।। আপনি তিতিল কালি নয়নের জলে। ঝুরিতে বিদরে বুক গেল পদতলে।। (পৃ. ৬৭)
৩।বৈষ্ণবীয় সাহিত্য (শব্দচয়নগত)	ক) *বদনে বদন দিয়া। নয়নে নয়ন দিয়া* চরণযুগল ধরি। ক্ষণে ক্ষণে কান্দে ঝুরি।। (*রসোদ্‌গার পৃ. ৬৯*) খ) ঐ শোকে মোর নয়নের নীর রজনি দিবস ঝুরে। এ বৃদ্ধ বয়সে প্রভু পরবাসে বিধি কিনা কৈল তারে।। (*মাথুর* পৃ. ২৯) গ) বিষম লোহার ঘরে লোহার কপাট। দুরন্ত প্রহরী জাগে যাইতে নাহি বাট।। (*শ্রীকৃষ্ণজন্ম* পৃ. ৬৬)

সর্বশেষ উদাহরণটিতে *ভাগবতের* দশম স্কন্ধে ভাদ্রমাসে শ্রীকৃষ্ণ জন্মাষ্টমী-রাত্রে মথুরায় কংস-কারাগারে, লৌহশৃঙ্খলিত কক্ষে, দেবকী-বসুদেবের প্রহরায় রত দুরন্ত প্রহরীদের অতন্দ্র প্রহরা বর্ণনার ছায়া পড়েছে বেহুলা-লখিন্দরের বিবাহরাত্রে চাঁদ সদাগরের নির্দেশে নির্মিত দুর্ভেদ্য লোহার বাসরঘরের প্রহরার বর্ণনায়।

৪.৬.৭। প্রবন্ধ-বাহুল্য আশঙ্কায় অন্যান্য কবিদের 'মনসামঙ্গল' কাব্যে বৈষ্ণব-প্রভাব অনুসন্ধানে বিরত রইলাম।

৫। 'চণ্ডীমঙ্গল' কাব্যে বৈষ্ণব-প্রভাব :

৫.১। 'চণ্ডী' মিশ্র প্রকৃতির দেবী। আদিতে প্রাগার্য লৌকিক, পরে আর্যীকৃত ও সংস্কৃতায়িত। তাঁর দেবকল্পনায় প্রাগার্য ওরাঁওদের 'চণ্ডীশিলা' পূজা থেকে শুরু করে বৈদিক অরণ্যানী, ঋগ্‌বেদের পৃথিবী ও শ্রী দেবী, বাক্, রাত্রি, অম্বিকা, কেন উপনিষদের উমা-হৈমবতী, মার্কণ্ডেয় পুরাণের চণ্ডী-মহিষাসুরমর্দিনী, দক্ষকন্যা সতী, হিমালয় মেনকার কন্যা পার্বতী-গৌরীর বিভিন্ন ধারা এসে মিশেছে। [চণ্ডীর দেবীরূপকল্পনার বিচিত্র উৎস স্বরূপ সম্পর্কে *কবিকঙ্কণ মুকুন্দের চণ্ডীমঙ্গল* গ্রন্থে (ড. আশিসকুমার দে ও ড. বিশ্বনাথ রায় সম্পাদিত) আমার লেখা দীর্ঘ প্রবন্ধ *মুকুন্দের চণ্ডীমঙ্গলে 'শিব ও চণ্ডী'* দ্রষ্টব্য।]

৫.২। অবিসংবাদিত রূপে *চণ্ডীমঙ্গলের* শ্রেষ্ঠ কবি ***কবিকঙ্কণ* মুকুন্দ চক্রবর্তী**। ষোড়শ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে রচিত *চণ্ডীমঙ্গল* বা *অভয়ামঙ্গল* কাব্যে তাঁর পূর্ববর্তী দুজন কবির কথা উল্লেখ করেছেন—

মাণিক দত্তেরে আমি করিয়ে বিনয়।
যাহা হৈতে হৈল গীত-পথ-পরিচয়।।
বন্দিলুঁ গীতের গুরু শ্রীকবিকঙ্কণ।
প্রণাম করিয়া মাতা-পিতার চরণ।।

(*বঙ্গবাসী সংস্করণ*, ১৩৩২, পৃ. ৬)

কিন্তু *মাণিকদত্তের পাঞ্চালী* নামে উত্তরবঙ্গ থেকে যে পুথি পাওয়া গেছে তার ভাষা এত অর্বাচীন এবং কাহিনি বর্ণনায় মুকুন্দের প্রভাব এত স্পষ্ট যে এই মাণিক দত্তকে মুকুন্দ-পূর্ববর্তী আদি 'চণ্ডীমঙ্গল' রচয়িতা বলা যায় না। ড. সুকুমার সেনের মতে— 'আলোচ্য কাব্যের রচনাকাল সপ্তদশ শতাব্দীর শেষভাগের আগে কিছুতেই নয়।' (*বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস—১*, পূর্বোক্ত সং, পৃ. ৪৫৭)। অবশ্য ড. আশুতোষ ভট্টাচার্য মনে করেন, মাণিক দত্ত দু'জন কবি। একজন মুকুন্দ-পূর্ববর্তী, অপরজন মুকুন্দ-পরবর্তী। তাঁর মতে, প্রথম মাণিক দত্ত— 'মুকুন্দরামের অগ্রবর্তী। তবে একেবারে তিনশত বৎসরের মঙ্গলকাব্যের অগ্রবর্তী কিনা তাহা জোর করিয়া বলা যায় না।' (*বাংলা মঙ্গলকাব্যের ইতিহাস*, পূর্বোক্ত সং, পৃ. ৪৭৪। ড. ভট্টাচার্যের অনুমান প্রথম মানিক দত্তের কাব্যের কিছু কিছু উপাদান নিয়ে দ্বিতীয় মানিক দত্ত তাঁর *'পাঞ্চালী-কাব্য'* লিখেছিলেন। তাঁর বাড়ি ছিল মালদহ জেলার ফুলুয়া নগর (বর্তমান ফুলবাড়ি গ্রাম)। এই মানিক দত্তের রচনায় বৈষ্ণব-প্রভাব আছে, যা চৈতন্য-সংস্কৃতির দান। যেমন—

চৈতন্য অবতার লিখে সন্ন্যাসীর গণ।
ছয় গোসাঞি লিখিয়া লইল ততক্ষণ।।

(*কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় পুথি সংখ্যা ৬১৮৫*, পৃ. ৪৮খ)

৫.৩। কবিকঙ্কণ মুকুন্দ তাঁর পূর্ববর্তী এক চণ্ডী-কবি *শ্রীকবিকঙ্কণ*-এর উল্লেখ করেছেন। ড. আশুতোষ ভট্টাচার্য এবং তৎপূর্বে ড. দীনেশচন্দ্র সেন অনুমান করেছেন যে, এই শ্রীকবিকঙ্কণের নাম বলরাম—"বলরাম কবিকঙ্কণের চণ্ডী মেদিনীপুর অঞ্চলে প্রচলিত ছিল।" (*'বঙ্গভাষা ও সাহিত্য'*— দীনেশচন্দ্র সেন) শুধু নামটুকুর উল্লেখ ছাড়া এই বলরাম কবিকঙ্কণের রচনার কোনো নির্দশন পাওয়া যায়নি। অতএব তাঁর অপ্রাপ্ত আনুমানিক কাব্যে বৈষ্ণব-প্রভাব সন্ধান অবান্তর।

৫.৪.১। বর্ধমান জেলার দামিন্যা গ্রামে আদিনিবাসী, পরে দেশত্যাগী হয়ে মেদিনীপুরের আড়রায় জমিদার বাঁকুড়া রায় ও তৎপুত্র রঘুনাথ রায়ের আশ্রয়প্রাপ্ত **কবিকঙ্কণ মুকুন্দ চক্রবর্তী** শুধু *চণ্ডীমঙ্গল* কাব্যের নয়, সমগ্র প্রাগাধুনিক বাংলা কাব্যের তিন শ্রেষ্ঠ কবির (অপর দুজন *চৈতন্যচরিতামৃত*-কার কৃষ্ণদাস কবিরাজ এবং *অন্নদামঙ্গল* রচয়িতা ভারতচন্দ্র রায়গুণাকর) অন্যতম। তাঁর কাব্যের নাম— *অভয়ামঙ্গল।*

৫.৪.২। মুকুন্দ চক্রবর্তীর কাব্যরচনাকাল নিয়ে বহু বিতর্ক-বিবাদ হয়েছে। তাঁর কাব্যের ১৭৪৫ শক বা ১৮২৩-২৪ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত আদি মুদ্রিত সংস্করণে এই শকাঙ্ক-নির্দেশক পয়ার-পঙ্‌ক্তিগুলি ছিল—

শাকে রস রস বেদ শশাঙ্ক গণিতা।
কতদিনে দিলা গীত হরের বনিতা।।
অভয়ামঙ্গল গীত গাইল মুকুন্দ।
আসোর সহিত মাতা হইবে সানন্দ।।

এই সুপরিচিত শ্লোকটি অনেক পুথিতেও মেলে। ড. সুকুমার সেন 'রস' শব্দকে ৬ অঙ্ক ধরে এর কালনির্ণয় করেছেন— ১৪৬৬ শক বা ১৫৪৪-৪৫ খ্রিস্টাব্দ। তাঁর মতে, এই সময়ই মুকুন্দের আড়রা-গমন ও কাব্যরচনাকাল।

ড. সেন মুকুন্দের *আত্মবিবরণী-তে* উল্লিখিত 'গৌড়বঙ্গ উৎকল অধিপ মানসিংহে'র বঙ্গাধিকার কাল ১৫৯৪-১৬০৬ খ্রিস্টাব্দ, এবং তাঁর পৃষ্ঠপোষক রঘুনাথ রায়ের রাজত্বকাল— ১৫৭৩-১৬০২ খ্রিস্টাব্দকে গণনার মধ্যে রাখেননি। তিনি বরং কাব্যের উপসংহার অংশে *অষ্টমঙ্গলায়* প্রাপ্ত একটি ত্রিপদীর বিচারে মুকুন্দের কাব্যের প্রথম গায়ক বিক্রমদেবের সুত প্রসাদদেবের এই কাব্যের প্রথম গাওনার তারিখ নির্ণয় করেছেন। কাব্যটি গাওয়া হয়েছিল মেদিনীপুরের কামেশ্বর শিবের মন্দিরে (এখনকার 'নেড়ার দেউল')। ত্রিপদীটি এই :

অষ্টমঙ্গালা সায় শ্রীকবিকঙ্কণ গায়
অমর সাগর মুনিবরে।
চারি প্রহর রাতি জ্বালিয়া ঘৃতের বাতি
গাইলেন প্রসাদ আদরে।।

উদ্ধৃত 'অমর সাগর মুনিবরে'— কথাগুলির ব্যাখ্যায় ড. সেন লিখেছেন—

> 'অমর (=১৪), সাগর (=৭) মুনিবর (=৭), অর্থাৎ ১৪৭৭ শকাব্দ (=১৫৫৫-৫৬ খ্রিস্টাব্দ)। ...অতএব দৃঢ়তর বিরুদ্ধ প্রমাণ উপস্থাপিত না হওয়া পর্যন্ত মানিতে হইবে যে মুকুন্দের আড়রা গমনের (দেশত্যাগ বলিব না) কাল ১৫৪৪-৪৫ খ্রিস্টাব্দ এবং কাব্যরচনা-সমাপ্তিকাল ১৫৫৫-৫৬ খ্রিস্টাব্দের পরে নয়।' *(কবিকঙ্কণ মুকুন্দ বিরচিত চণ্ডীমঙ্গল,* সম্পাদক ড. সুকুমার সেন, সাহিত্য অকাদেমি প্রকাশিত ২০০১ খ্রি. সংস্করণ, ভূমিকা, পৃ. ৪২-৪৩)।

৫.৪.২.১। কিন্তু ড. সুখময় মুখোপাধ্যায় এ-বিষয়ে দৃঢ়তর বিরুদ্ধ প্রমাণ দিয়ে ড. সুকুমার সেনের কালনির্ণয় খণ্ডন করেছেন। এ বিষয়ে তাঁর বিচার— 'ড. সুকুমার সেনের... যুক্তিটি সম্বন্ধে বলা যায়, 'অষ্টমঙ্গালা সায়' ইত্যাদি ত্রিপদটি যে কালবাচক তার প্রমাণ নেই, তার মধ্যে শকাব্দ কথাটিও উল্লিখিত নেই। তাছাড়া অমর =১৪ কোনমতেই ধরা যায় না। আসলে এই ত্রিপদীটির যে পাঠ সুকুমারবাবু পেয়েছেন সেটি ভুল। অনেক পুথিতে এর পাঠান্তর পাই, 'অষ্টমঙ্গালা সায় / শ্রীকবিকঙ্কণআয় / শ্রীঅমর সোমের মন্দিরে।' অর্থাৎ অমর সোম নামে কোনো লোকের বাড়িতে কবিকঙ্কণ গান করছেন।

'...ইতিপূর্বে আমরা দেখিয়েছি যে কবিকঙ্কণের 'চণ্ডীমঙ্গল' ১৫৯৪ থেকে ১৬১৯ খ্রীস্টাব্দের মধ্যে রচিত হয়েছিল। এখন আমরা নিঃসন্দেহে যে— এই কাব্য ১৬১৯ খ্রী. অল্পকিছু আগে সম্ভবত সপ্তদশ শতাব্দীর দ্বিতীয় দশকের গোড়ার দিকে রচিত হয়েছিল।'

(ড. সুখময় মুখোপাধ্যায়-সম্পাদিত *চণ্ডীমঙ্গল পরিক্রমা* গ্রন্থে সম্পাদক লিখিত প্রবন্ধ *কবিকঙ্কণের আত্মকাহিনী ও আবির্ভাবকাল*, পৃ. ১৩ ও ১৬)। নানা মতামত দেখে আমরা ড. সুখময় মুখোপাধ্যায়-নির্ধারিত মুকুন্দের *চণ্ডীমঙ্গল*-কাব্য রচনাকাল মেনে নিচ্ছি।

৫.৪.৩। ওপরের আলোচনা অনুসারে নিঃসংশয়ে বলা যায়, কবিকঙ্কণ মুকুন্দের *চণ্ডীমঙ্গল* বা *অভয়ামঙ্গল* কাব্যের রচনাকাল শ্রীচৈতন্য-পরবর্তী। অনিবার্যভাবেই এ-কাব্যে স্বয়ং শ্রীচৈতন্যদেব এবং গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মের প্রভাব প্রগাঢ়। আমরা তার অনেকগুলি দৃষ্টান্ত দিচ্ছি।

৫.৪.৪। প্রথমেই উল্লেখযোগ্য, কাব্যের সূচনাতেই প্রথম দিবসের *স্থাপনা* পালায় *বন্দনা* অংশে তৃতীয় *বন্দনা*-রূপে শ্রীচৈতন্যের একটি দীর্ঘ ভক্তিপ্রগাঢ় বন্দনা রয়েছে। তার অংশবিশেষ এইরূপ—

অবনিতে অবতরি চৈতন্য ঠাকুর হরি
বন্দহুঁ সন্ন্যাসী চূড়ামণি।
সঙ্গে সখা নিত্যানন্দ ভুবনে আনন্দকন্দ
মুকতির দেখল্যা সরণি॥
প্রণমহু শচীর নন্দন।
হৈয়া অকিঞ্চন বশ দিয়া জীবে প্রেমরস
বিস্তার করিল সর্বজন।।...
তপ্ত কলধৌত-গৌর ভুবনলোচন চৌর
করঙ্গা কৌপীন দণ্ড-ধারী।
কপটে লোচনে লোর গলে শোভে নামডোর
সতত বলেন হরি হরি।।
শ্রীকবিকঙ্কণ গায় বিকাইনু রাঙ্গা পায়
আজি মোর সফল জীবন।
গাইয়া তোমার আগে গোবিন্দ-ভকতি মাগে
চক্রবর্তী শ্রীকবিকঙ্কণ।।

(ড. সুকুমার সেন সম্পাদিত *কবিকঙ্কণ মুকুন্দ বিরচিত চণ্ডীমঙ্গল*, ২০০১ খ্রি. সংস্করণ, পৃ. ১-২)

৫.৪.৪.১। মুকুন্দের 'চণ্ডীমঙ্গলে' বৈষ্ণব-প্রভাব সম্পর্কে প্রথম সকলের বিশেষ দৃষ্টি আকর্ষণ করেন স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ। ১৯১৯ খ্রিস্টাব্দ থেকে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের এম.এ. শ্রেণিতে মুকুন্দের 'চণ্ডীমঙ্গল' পাঠ্যগ্রন্থ হয়। বইটি পড়াবার ভার দেওয়া হয় সাহিত্যিক চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়কে। এই কাব্যটি সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের মতামত জানার জন্য চারুবাবু

এটির বঙ্গাবাসী সংস্করণ (১৩৩২ বঙ্গাব্দ) শান্তিনিকেতনে রবীন্দ্রনাথের কাছে পাঠান। রবীন্দ্রনাথ এর কালকেতু উপাখ্যানটি পড়ে বইয়ের মার্জিনে নানা মন্তব্য লেখেন। এগুলি পড়ে চারুচন্দ্র মনে করেন, মুকুন্দ শাক্তদেবীর গান গাইলেও তিনি ধর্মে বৈষ্ণব ছিলেন। এজন্য রবীন্দ্রনাথের মন্তব্যাদিসহ বঙ্গাবাসী সংস্করণ 'চণ্ডীমঙ্গল'টি ফিরে পাবার পর স্বপ্রণীত *চণ্ডীমঙ্গল-বোধিনী*তে লিখেছিলেন— "চণ্ডীমঙ্গল' কাব্যে হরিকথার এত ছড়াছড়ি সেই কালের ওপর বৈষ্ণব-প্রভাব অথবা বৈষ্ণব শ্রোতাদের মনোরঞ্জনের জন্য হওয়ার সম্ভাবনার চেয়ে কবির নিজের ধর্মমতের জন্যই হওয়া বেশি সম্ভব বলিয়া আমার অনুমান।' [*দ্রষ্টব্য : কবিকঙ্কণের ধর্মমত : একটি সাম্প্রদায়িক বিতর্ক/মুকুন্দের চণ্ডীমঙ্গল : আলোচনা ও পর্যালোচনা* (সম্পাদক আশিসকুমার দে ও বিশ্বনাথ রায়) —দেবনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, ১৯৯৬ খ্রি., পৃ.২৪]। কাব্যটির বঙ্গাবাসী সংস্করণের ৩৩ পৃষ্ঠায় 'কলিঙ্গারাজার প্রতি স্বপ্নাদেশ' অংশ পড়ে রবীন্দ্রনাথ মন্তব্য লেখেন— 'কবি নিজে বৈষ্ণব অথচ তাঁর বিষয়টি শাক্ত। এইজন্য ইহাতে বিশুদ্ধ ভক্তির সুর পাওয়া যায় না। বরঞ্চ অভক্তির সুর আছে। এ কাব্যের দেবতা ভক্তির নয় ভয়ের— ইহাতে তখনকার রাষ্ট্রীয় অবস্থা বুঝা যায়।' (*দ্রষ্টব্য : বাংলা মঙ্গালকাব্যের ইতিহাস,* ড. আশুতোষ ভট্টাচার্য, ২০০২ খ্রি., ১৬০ পৃষ্ঠায় উদ্ধৃত)। রবীন্দ্রনাথের উদ্ধৃত বক্তব্যের প্রথমাংশ মানলেও, শেষাংশ মানা যায় না। ড. দেবনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর পূর্বোল্লিখিত প্রবন্ধে এর প্রথমাংশের বক্তব্যও মানেননি।

৫.৪.৪.২। কবিকঙ্কণ মুকুন্দের নিষ্ঠাবান বৈষ্ণব বংশে জন্ম। তাঁর কাব্যের পূর্বোদ্ধৃত *চৈতন্যবন্দনা* অংশে দেখা যায় কবির পিতামহ ছিলেন বৈষ্ণবমন্ত্রে দীক্ষিত মহামিশ্র জগন্নাথ :

ময়ারি কুলেতে জাত মহামিশ্র জগন্নাথ
একভাবে পূজিলে গোপাল।
কবিত্ব মাগিয়া বর মন্ত্র জপি দশাক্ষর
মীন মাংস ছাড়ি বহুকাল।।

(চণ্ডীমঙ্গল, ড. সুকুমার সেন সম্পাদিত, প্রাগুক্ত সং, পৃ. ২)

জগন্নাথ মিশ্র 'দশাক্ষর গোপাল মন্ত্রে' দীক্ষিত নৈষ্ঠিক বৈষ্ণব হয়ে আমিষ আহার মৎস্য-মাংস ছেড়ে দিয়েছিলেন। স্বয়ং মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যদেব ১৫০৮ খ্রিস্টাব্দে গয়াধামে শ্রীপাদ ঈশ্বরপুরীর কাছে এই 'দশাক্ষর গোপাল মন্ত্রে' দীক্ষিত হন। বঙ্গে এই মন্ত্রে বৈষ্ণবদীক্ষার চল হয়েছিল শ্রীচৈতন্যের দাদাগুরু মাধবেন্দ্র পুরীর মাধ্যমে। মন্ত্রটি এই— ***ক্লীং কৃষ্ণায় গোবিন্দায় স্বাহা।*** এই মন্ত্রে জগন্নাথ মিশ্র গোপাল-বিগ্রহের পূজা ও উপাসনা করতেন। এই তথ্য থেকে ১৯৪৫ খ্রিস্টাব্দে রচিত 'কবিকঙ্কণ প্রসঙ্গ' প্রবন্ধে ড. সুকুমার সেন প্রশ্ন তুলেছেন— 'ইনি কি তাহলে মাধবেন্দ্র পুরীর সংস্পর্শে কখনো এসেছিলেন?' *('কবিকঙ্কণ মুকুন্দের চণ্ডীমঙ্গল' : অলোচনা ও পর্যালোচনা',* পূর্বোক্ত সং, পৃ. ১২)

৫.৫। রবীন্দ্রনাথ বঙ্গাবাসী সংস্করণ 'চণ্ডীমঙ্গালে' মুকুন্দের কাব্যের যে যে স্থানে বৈষ্ণব প্রভাব নির্দেশ করেছিলেন, তার সূত্র ধরে ড. সুনীলকুমার ওঝা *মুকুন্দের কাব্যে বৈষ্ণব প্রভাব* প্রবন্ধে বিষয়টির সোদাহরণ বিস্তৃত আলোচনা করেছেন। *(দ্রষ্টব্য : 'চণ্ডীমঙ্গল*

পরিক্রমা', সম্পাদক ড. সুখময় মুখোপাধ্যায়, ২০১১ খ্রি. সং, পৃ. ৬০-৬৮)। প্রয়োজনে এই কাব্য থেকে আমরা কিছু কিছু দৃষ্টান্ত দিচ্ছি—

১) 'বন্দনাখণ্ডে' 'দিগ্‌বন্দনা'—অংশে শচীমাতাসহ কীর্তনস্রষ্টা ও প্রেমদাতা গোরার বন্দনাংশটি এইরূপ—

নবদ্বীপে বন্দোঁ গোরা শচীর কুমার।
হরিনাম দিয়া কৈল জীবের উদ্ধার।।
অবনী লোটায়্যা বন্দোঁ শচী ঠাকুরাণী।
যার গর্ব্ভে গোরাচাঁদ জন্মিলা আপনি।।
কীর্ত্তন সিজ্জন কৈল খোল করতাল।
প্রকাশি জীবের লাগি প্রেমের পসার।।
যেই জন নাম লয় নাম দেন তারে।
প্রভু নামে বান্ধ ভেলা সিন্ধু তরিবারে।।

(*কবিকঙ্কণ চণ্ডী :* ড. সনৎকুমার নস্কর সম্পাদিত, পূর্বোক্ত সং. পৃ-৯৯)

২) ড. সুকুমার সেন সম্পাদিত 'চণ্ডীমঙ্গালের' প্রথম দিবসের *নিশা-পালার* সপ্তম গীতে দেবী চণ্ডীকে *ভাগবত*-পুরাণ অনুসারে দৈবকীর অষ্টম গর্ভজাতা 'যোগনিদ্রাভগবতী' এবং পরে 'যশোদা-জঠরে জাতা... নন্দসুতা' বলা হয়েছে—

দানবকুলের দর্পে দৈবকী-অষ্টম গর্ব্ভে
হৈলা সৃষ্টি ক্ষিতিভার নাশে।
হরিতে তাহান ভীতি যোগনিদ্রা ভগবতী
থুইলা যশোদা-গর্ভবাসে।।...
হরিতে অবনীভার কৃপাময় অবতার
যদুকুলে হৈলা নারায়ণ।
যশোদা-জঠরে জাতা হইলা নন্দের সুতা
বিরচিল শ্রীকবিকঙ্কণ।। (প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৬)

৩) ঐ একই পালার ২৭ সংখ্যাক গীতে শিব কর্তৃক মদনভস্মের পর রতি অনলে সহমৃতা হতে চাইলে তার সই যে সান্ত্বনা দিয়েছে, তাতেও 'ভাগবত'-অনুসারী পূর্বকাহিনি-স্মরণ আছে–

যদুকুলে শ্রীহরি করিব অবতার।
হরিব অসুর বধি অবনীর ভার।।
দৈবকী উদরে বসুদেবের নন্দন।
কংস কারাগারে তার হইব জনম।।
রুক্মিণী বিবাহ প্রভু করিব প্রথম।
তাঁর গর্ব্ভে হইবেক কামদেবের জনম।। (তদেব, পৃ. ১৭)

কালকেতু উপাখ্যানের *কলিঙ্গারাজের প্রতি ভগবতীর স্বপ্নাদেশ* অংশেও একই কাহিনির পুনরাবৃত্তি আছে।

৪) *গৌরীর অধিবাস* প্রসঙ্গে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পুথিশালার ১০৯৩ সংখ্যক পুথিতে অতিরিক্ত রূপে পাই, *নারীদিগের বরদর্শনে গমন*-এর নিম্নরূপ বর্ণনা—

কোনো নাগরীর আধ সীমন্তে সিন্দূর।
কারো ভ্রমে পদে হার করেতে নেপুর।
কারো এক নয়নে ডালে দিয়াছে কজ্জলে।
পত্রাবলী এক কুচে নহিল সকলে।।

(*কবিকঙ্কণ চণ্ডী*— ড. সনৎকুমার নস্কর সম্পাদিত প্রাগুক্ত সং, পৃ. ১৩৭)

এই বর্ণনা স্পষ্টত বৈষ্ণব পদাবলিতে বর্ণিত *শ্রীরাধার ভ্রমাভিসার* প্রভাবিত। এর সঙ্গে তুলনীয় শ্রীচৈতন্য-পার্ষদ বংশীবদন চট্টোপাধ্যায়ের (বর্তমান প্রাবন্ধিকের উর্দ্ধতন দ্বাদশ পুরুষ) 'রাইয়ের ভ্রমাভিসারের' পদ :

রাই সাজে বাঁশী বাজে পড়ি গেও উল।
কি করিতে কি বা করে সব হৈল ভুল।।
করেতে নূপুর পরে জঙ্ঘে পরে তাড়।
গলাতে কিঙ্কিনী পরে কটিতটে হার।।
চরণে কাজর পরে নয়নে আলতা।
হিয়ার উপরে পরে বঙ্কয়াজপাতা।।

(*দ্রষ্টব্য : 'বাঘনাপাড়া সম্প্রদায় ও বৈষ্ণবসাহিত্য,*
কাননবিহারী গোস্বামী, দ্বিতীয় সং, পৃ.২১৩)

আমার নিশ্চিত বিশ্বাস, কবিকঙ্কণ অবশ্যই তাঁর পূর্ববর্তী বৈষ্ণব কবি বংশীবদনের এই পদটি পড়েছিলেন।

৫) ফুল্লরার কাছে স্বর্ণগোধিকা থেকে ষোড়শী রামায় রূপান্তরের সময় চণ্ডিকার আদেশে বিশাই বা বিশ্বকর্মা দেবীর কাঁচুলিতে যে চিত্র এঁকেছেন তাতে জয়দেবের *গীতগোবিন্দম্* কাব্যের *দশাবতার স্তোত্রে* বর্ণিত সব অবতারের বিবরণ আছে এবং 'ভাগবত পুরাণ' অনুসারে শ্রীকৃষ্ণের শৈশব-বাল্য-কৈশোরের নানা লীলার বর্ণনা আছে। দেবীর কাঁচুলি-চিত্রণের বর্ণনায় মুকুন্দ-কবি বিষ্ণুর যে-যে অবতারগুলির নাম এবং লীলার উল্লেখ করেছেন সেগুলি হ'ল— মীন, কূর্ম্ম, বরাহ, নৃসিংহ, বামন, পরশুরাম, রাম, হলধর বলরাম ও কল্কি। তালিকাটি জয়দেব-প্রদত্ত। এরপর 'চণ্ডী' কাব্যে শ্রীকৃষ্ণের 'ভাগবত' অনুসারী বিবিধলীলার কিছু অংশ এইরূপ—

হরিতে অবনী ভার   যদুকুলে অবতার
মধ্যে লেখে যশোদা-নন্দন।
অতি শিশুকালে রঙ্গা   করিলা শকট-ভঙ্গা
পুতনার করিলা নিধন।।
হয়্যা গিরিসম ভারী   তৃণাবর্ত্ত বীরে মারি
বিশ্বরূপ দেখাল্য বদনে।

যশোদা-নন্দন রঙ্গো যমল-অৰ্জ্জুন ভাঙ্গো
বকাসুরে করিলা বিনাশনে।।
(পূর্বোক্ত ড. সনৎকুমার নস্কর সংস্করণ. পৃ. ২২৪)

৫.৬.১। শঠ ভাঁড়ুদত্ত যখন কলিঙ্গারাজের কাছে কালকেতুর গুজরাট রাজ্যের বর্ণনা দিচ্ছে তখন তাকে একটি বৈষ্ণবনগর বলে মনে হয়—'প্রতি বাড়ী দেবমূল : বৈষ্ণবের অন্নজল : দুই সন্ধ্যা হরিসংকীর্ত্তন।' নাগরিক জনের বেশভূষা এইরূপ— 'চন্দনে চর্চিত তনু : জেন দেখি হেমভানু : তসরবসন পরিধান।' এই বর্ণনা প্রসঙ্গো ড. সুনীলকুমার ওঝা অনুমান করেছেন— 'কবি সম্ভবত কোন বৈষ্ণব সন্ন্যাসীকে প্রত্যক্ষ করেই এই ত্রিপদী রচনা করেছিলেন। সেই সন্ন্যাসী কে? তিনি কি স্বয়ং চৈতন্যদেব? মনে হয়, না হওয়ার কোনো কারণ নেই।' (*মুকুন্দের কাব্যে বৈষ্ণব প্রভাব— চণ্ডীমঙ্গাল-পরিক্রমা*, প্রাগুক্ত সং, পৃ. ৬৩)। না-হওয়ার যথেষ্ট কারণ আছে। আমরা মুকুন্দের কাব্যরচনাকাল সম্পর্কে পূর্ববর্তী *আলোচনাংশে* (৫.৪.২) ড. সুখময় মুখোপাধ্যায় কর্তৃক সুবিচারিত ১৫৯৪-১৬১৯ খ্রিস্টাব্দের সময়সীমা মেনে নিয়েছি। মুকুন্দকবি যদি কাব্যরচনা সূচনাকালের ২৫-৩০ বছর আগেও জন্মে থাকেন, তাহলে তাঁর আবির্ভাব ১৫৬৪-১৫৬৯ খ্রিস্টাব্দের আগে হতে পারে না। শ্রীচৈতন্যের অপ্রকট ১৫৩৩ খ্রিস্টাব্দে। সুতরাং মুকুন্দ চক্রবর্তীর পক্ষে শ্রীচৈতন্যকে দেখা অসম্ভব।

৫.৬.২। এবারে 'চণ্ডীমঙ্গালে'র বণিকখণ্ডে বৈষ্ণব-প্রভাবের কিছু নিদর্শন দেখা যেতে পারে।

১) বণিকপ্রধান ধনপতির সিংহল-বাসকালে তাঁর দ্বিতীয়া পত্নী খুল্লনার গর্ভজাত পুত্র শ্রীমন্ত, বা শ্রীপতি বা ছিরার জন্ম। বণিকনন্দন যখন তিনবছরের শিশু তখনই অন্যান্য শিশু সঙ্গীসাথী নিয়ে 'ভাগবত-খেলা' করত। একটু নিদর্শন—

তিন বৎসরের জবে বাণিঞার বালা।
শিশুগণ সঙ্গো করে ভাগবত-খেলা।।...
নগর্‍্যা ছাওয়াল আনি নিত্য করে মেলা।
কৃষ্ণলীলা অনুরূপ করে নানা খেলা।।
আনুরূপে রহে কেহ চরণ-নিকটে।
কৃষ্ণের আবেশে ছিরা ভাঙ্গিল শকটে।।
যশোদার বেশ ধরি কেহ করে কোলে।
সহিতে না পারি ভর থুইল মহীতলে।।
তৃণাবর্ত্ত হইআ কেহ তুলিল গগনে।
কণ্ঠদেশ চাপী তার করিল নিধনে।। ...ইত্যাদি।
(চণ্ডীমঙ্গাল, ড. সুকুমার সেন সম্পাদিত, পূর্বোক্ত সং, পৃ. ২১৯)

২) ধনপতি বাণিজ্যযাত্রাপথে পশ্চিমবঙ্গোর যে-সব নদীতীরবর্তী তীর্থক্ষেত্র দিয়ে গেছে, তার কতকগুলি প্রসিদ্ধ বৈষ্ণবতীর্থ। যেমন—

বামভাগে নবদ্বীপ ডাহিনে পাড়পুর।
শান্তিপুর পুরীখান রহে কথোদূর।।
(চণ্ডীমঙ্গল, পূর্বোক্ত ড. সেন সং, পৃ. ২০১)

উল্লিখিত বৈষ্ণব তীর্থগুলির মধ্যে নবদ্বীপ ও শান্তিপুর শ্রীচৈতন্য ও অদ্বৈতাচার্যের লীলাস্থল রূপে সুপরিচিত। কিন্তু 'পাড়পুর' কোথায়, একালের পাঠকরা হয়তো অনেকেই জানেন না। এটিও শ্রীচৈতন্য ও তাঁর পরিকরদের লীলাস্থল। এটি ছিল নবদ্বীপের গঙ্গার বিপরীত পাড়ে। স্থানটির প্রাচীন নাম— 'কুলিয়া-পাহাড়পুর।' 'পাহাড়পুর'-এর সংক্ষিপ্ত নাম 'পাড়পুর'। এটি শ্রীচৈতন্যের প্রিয় পরিকর বংশীবদন চট্টোপাধ্যায় এবং অপর পরিকর বংশী-পিতা মাধবদাস বা ছকড়ি চট্টোপাধ্যায়ের পিত্রালয়। সন্ন্যাসের পঞ্চম বর্ষে, ১৫১৪ খ্রিস্টাব্দে, মহাপ্রভু নীলাচল থেকে গৌড়ে স্থলপথে ফিরছিলেন। কিন্তু শান্তিপুর ও নবদ্বীপে তাঁকে দর্শনের জন্য অত্যন্ত লোকসংঘট্ট হওয়ায় তিনি জলপথে নৌকাযোগে কুলিয়া-পাহাড়পুরে যান এবং সেখানে মাধবদাসের গৃহে সাতদিন অবস্থান করেন। এই ঘটনার উল্লেখ বৃন্দাবন দাস তাঁর *চৈতন্যভাগবতে* এবং কৃষ্ণদাস কবিরাজ তাঁর *'চৈতন্যচরিতামৃতে'* করেছেন। এ-বিষয়ে শ্রীচৈতন্যের প্রত্যক্ষলীলাদর্শী ও কৃপাধন্য কবিকর্ণপূর বা পরমানন্দ সেনের সাক্ষ্য আরও প্রামাণিক। তাঁর 'চৈতন্যচন্দ্রোদয় নাটকম্' গ্রন্থে এর উল্লেখ এভাবে রয়েছে— 'ততো অদ্বৈতবাটীমভ্যেত্য হরিদাসেনাভিনন্দিতস্তথৈব তরণিবর্ত্মনা নবদ্বীপস্য পারে কুলিয়ানাথ গ্রামে মাধবদাস বাট্যামুত্তীর্ণবান্। নবদ্বীপ-লোকানু গ্রহহেতোঃ সপ্তদিনানিস্তত্র স্থিতবান্।' (রামনারায়ণ বিদ্যারত্ন সং, পৃ. ৫৬৬-৬৭)। পূর্বে ৫.৫ অংশের চতুর্থ (৪) উদাহরণে দেখিয়েছি যে গৌরীর অধিবাস উপলক্ষ্যে 'নারীদিগের বরদর্শনে গমন'-এর বর্ণনায় তাঁদের বেশ ও প্রসাধন-বিপর্যয়ের বিবরণে বংশীবদনের 'রাইয়ের ভ্রমাভিসার' পদের বর্ণনার প্রভাব প্রগাঢ়। কবিকঙ্কণ অবশ্যই বংশীবদন ও তৎপিতা মাধবদাসের (ইনিও বৈষ্ণব পদকর্তা ছিলেন) সঙ্গে শ্রীচৈতন্যের গভীর প্রীতি-সম্পর্কের কথা এবং পিতা-পুত্রের আবাসস্থলে মহাপ্রভুর 'লোকানুগ্রহ-লীলা'র ঘটনা জানতেন। সেজন্যই নবদ্বীপ ও শান্তিপুরের পাশাপাশি অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ বৈষ্ণবতীর্থ রূপে 'পাড়পুর' বা 'পাহাড়পুরে'র উল্লেখ করেছেন।

৫.৭। এতগুলি দৃষ্টান্ত চয়ন করে আমি দেখাতে চেয়েছি যে, কবিকঙ্কণ মুকুন্দ চক্রবর্তী পারিবারিক ঐতিহ্যসূত্রে বৈষ্ণব ছিলেন এবং বৈষ্ণবধর্মের প্রতি প্রগাঢ় অনুরাগবশত যখনই সুযোগ পেয়েছেন তাঁর 'চণ্ডীমঙ্গল' কাব্যের মধ্যে বৈষ্ণব-বিষয়াদি এনেছেন ও তাদের বহু দৃষ্টান্ত দিয়েছেন। কিন্তু গবেষক বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় মুকুন্দকবিকে শুধু বৈষ্ণব বলে স্বীকার করতে চাননি। তিনি কবিকে মধ্যযুগের বাংলার সকল স্মার্ত দেবদেবীতে বিশ্বাসী বলেছেন—

> Kavikankan Mukunda Ram Chakravarty was neither a Vaishnaba, nor a Sakta, nor a Saiva, nor a Ganapatya; but he was everything. In other words, he was a believer in all the dieties of the Smarta cult of medieval Bengal. ('Religion of Kavikankan Mukunda Ram Chakravarty', Indian Historical Quarterly, 1928).

কিন্তু কবিকঙ্কণের 'চণ্ডীমঙ্গাল'-এ বৈষ্ণব-প্রভাব এত ব্যাপক ও গভীর এবং স্বতঃপ্রকাশ যে 'তিনি বৈষ্ণব ছিলেন না'—বসন্তকুমারের এ মন্তব্য মানা যায় না।

৬.১। দ্বিজ মাধবের 'সারদাচরিত' বা 'মঙ্গালচণ্ডীর গীত'-এ বৈষ্ণব-প্রভাব :

চট্টগ্রামের কবি দ্বিজ মাধব 'সারদাচরিত' নামে একটি 'চণ্ডীমঙ্গাল' কাব্য লেখেন ১৫০১ শকাব্দ বা ১৫৭৯ খ্রিস্টাব্দে। বিভিন্ন পুথিতে প্রাপ্ত কাব্যরচনা কালজ্ঞাপক এই পয়ারশ্লোকটি পাওয়া যায়—

ইন্দু বিন্দু বাণ ধাতা শক নিয়োজিত
দ্বিজ মাধব গায় সারদাচরিত।

কবি সুস্পষ্টভাবে নিজ কাব্যের নাম *সারদাচরিত* বলে উল্লেখ করলেও কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ২৩১৮ সংখ্যক পুথি অবলম্বনে কাব্যটির সম্পাদক শ্রীসুধীভূষণ ভট্টাচার্য এর নাম দিয়েছেন— *মঙ্গালচণ্ডীর গীত*, যা আদৌ যুক্তিসঙ্গাত নয়। অনেকে দ্বিজ মাধবকে *শ্রীকৃষ্ণমঙ্গাল*-রচয়িতা মাধবাচার্য মনে করেছেন। তা-ও ভুল। দ্বিজমাধবের কাব্য কবিকঙ্কণ মুকুন্দের কাব্যের অনেক আগে রচিত কিন্তু মুকুন্দকবির 'চণ্ডীমঙ্গাল' এই ধারার সর্বশ্রেষ্ঠ কাব্য বলে পূর্বে আলোচনা করা হয়েছে। দ্বিজ মাধবের কাব্যেও বৈষ্ণবপ্রাণতার নানা পরিচয় পাওয়া যায়।

৬.২। দ্বিজ মাধব শাক্তকাব্য লিখলেও তাঁর কাব্যে বৈষ্ণব-প্রভাবের নিদর্শন রূপে অনেকগুলি *'বিষ্ণুপদ'* আছে। এগুলি চট্টগ্রাম অঞ্চলের ঐতিহ্য অনুসারে রচিত *ঘোষা* বা *ধুয়ার* মতো গীত। ড. আশুতোষ ভট্টাচার্যের মতে— 'সম্ভবতঃ দ্বিজ মাধবই এই রীতির প্রবর্তক। (বাংলা *মঙ্গালকাব্যের ইতিহাস*, প্রাগুক্ত সং, পৃ. ৫৯৫) এর দুটি দৃষ্টান্ত নিম্নরূপ—

মৈলু মৈলু সঞি বাঁশীয়ার জ্বালায়ে।
গৃহকর্ম লোকধর্ম রাখন না জায়ে॥
বাঁশের বাঁশী কহে কথা শুনিতে মধুর।
যে জনে দিয়েছে ফুক সে জন চতুর॥

এর সঙ্গো তুলনীয় চণ্ডীদাসের *আক্ষেপানুরাগ* পর্যায়ে *বংশী-নিন্দনের* পদাবলী।

বিনোদিনী বিলম্ব করিতে না জুয়ায়ে।
তুয়া পথ নিরক্ষিতে রহিয়াছে প্রাণনাথে
রাধা বলি মুরলী বাজায়ে।।
নূপুর কিঙ্কিণীর ধ্বনি ময়ূর কুণ্ডলমণি
পরিহরি করহ গমন।
প্রিয়সখীর কর ধরি নীল নিচোল পরি
দেখ গিয়া ও চান্দ বদন।।

এই পদাংশে স্পষ্টতই জয়দেবের *গীতগোবিন্দম্* কাব্যে মানিনী শ্রীরাধার প্রতি কৃষ্ণদূতী সখীর আহ্বানের প্রতিধ্বনি আছে—

পততিপতত্রে : বিচলিতপত্রে : শঙ্কিতভবদুপযানম্।
রচয়তি শয়নং : সচকিত নয়নং : পশ্যতি তব পন্থানম্॥
মুখরমধীরং : ত্যজ মঞ্জীরং : রিপুমিব কেলিষু লোলম্।
চল সখি কুঞ্জং / সতিমির পুঞ্জং / নীলনিচোলম্॥

৬.৩। ড. অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় অবশ্য এই বিষ্ণুপদগুলির প্রামাণিকতায় সন্দিহান! তাঁর মতে, এগুলি সম্ভবত গায়েনদের প্রক্ষেপ। তবে এদের অন্তর্নিহিত বৈষ্ণব-সুর অনস্বীকার্য— 'এই পদগুলি তাঁহার রচিত হউক অথবা গায়েনদের (লক্ষ্মীনাথ, কামদেব, দ্বিজ পার্বতী, রায় অনন্ত, অনন্তদাস ইত্যাদি) প্রক্ষেপ হউক, ইহাতে চৈতন্যযুগের সুরের পরিচয় পাওয়া যাইতেছে।' (*বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত*— ড. অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, দ্বিতীয় খণ্ড, পূর্বোক্ত সংস্করণ, পৃ. ১৫৩)

৭.১। ঘনরামের 'ধর্মমঙ্গালে' বৈষ্ণব-প্রভাব

ময়ূরভট্ট, রূপরাম, ঘনরাম চক্রবর্তী, মাণিকরাম গাঙ্গুলী প্রভৃতি অনেক কবিই সপ্তদশ থেকে অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগের মধ্যে 'ধর্মমঙ্গাল' কাব্য রচনা করেন। এঁদের মধ্যে রচনাগুণে ঘনরামের 'ধর্মমঙ্গাল'ই শ্রেষ্ঠ। তাই শুধু তাঁর কাব্যে বৈষ্ণব-প্রভাব সংক্ষেপে আলোচিত হল। [এ-বিষয়ে বিস্তৃততর আলোচনা আমার ছাত্র, বর্ধমান রাজ কলেজের বাংলা বিভাগের অধ্যাপক ড. মোহন পাল সম্পাদিত *'ঘনরাম-রচনাবলী'* গ্রন্থের ৩১-৩৩ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।]

৭.২। ঘনরামের 'ধর্মমঙ্গাল' রচিত হয় 'রামগুণ রস সুধাকর' শকে, অর্থাৎ ১৬৩৩ শকাব্দ, বা ১৭১১ খ্রিস্টাব্দের ১লা অগ্রহায়ণ তারিখে। কবি বর্ধমান জেলার কুকুড়া-কৃষ্ণপুর গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি সম্ভবত বর্ধমানরাজ কীর্তিচন্দ্রের অনুগ্রহ বা প্রসাদ লাভ করেছিলেন।

৭.৩। পূর্বেই বলা হয়েছে ধর্ম মিশ্র প্রকৃতির দেবতা। তাঁর দেবকল্পনায় বৈদিক বিষ্ণুর অংশ আছে। সুতরাং ঘনরামের ধর্মমঙ্গালে বৈষ্ণব-প্রভাব থাকবার কথা। এই প্রভাব এসেছে প্রধানত গৌড়ীয় বৈষ্ণবদের বেদতুল্য মান্যগ্রন্থ *ভাগবত পুরাণ* থেকে।

৭.৩.১। ১) ঘনরামের কাব্যে বৈষ্ণব-প্রভাবের প্রথম পরিচয় পাই কাব্যের 'বন্দনাখণ্ডে' 'শক্তির বন্দনা' অংশে শক্তিদেবীকে *ভাগবত পুরাণোক্ত* যোগমায়া ও কাত্যায়নী-রূপে ভাবনায়। অংশবিশেষ এইরূপ—

হয়ে বাসুদেব-বংশ কংসে কৃষ্ণ কৈল ধ্বংস
তায় তুমি তাঁরে অনুকূল।
গোলোকবিহারী হরি স্বামী পাইলা গোপনারী
পূজি তব চরণ রাতুল।।

('ঘনরাম-রচনাবলী', ড. মোহন পাল সম্পাদিত, ২০১১ খ্রি. সং, পৃ. ৮২)

২) ভাই মহামদের অনুপস্থিতিতে ভগ্নী রঞ্জাবতীর সঙ্গে বৃদ্ধ রাজা কর্ণসেনের বিবাহে অসন্তুষ্ট মহামদের উক্তিতে 'ভাগবতে'র দেবকী-উগ্রসেন-কংস অনুষঙ্গাটি নিম্নরূপ—

দৈবকী হইল রঞ্জা উগ্রসেন তুমি।

সবংশে করিতে ধ্বংস কংসরূপী আমি।।

(*ধর্মমঙ্গল*— ড. পীযূষকান্তি মহাপাত্র সম্পাদিত ১৯৬২ খ্রি. সং., পৃ ৫৭)

৩) লাউসেন ও তার ভাই কর্পূরধবলকে দেখে অনেকেই মথুরায় কংসের ধনুর্যজ্ঞে আগত শ্রীকৃষ্ণ ও তাঁর অগ্রজ বলরামকে স্মরণ করেছেন। মুকুন্দের 'চণ্ডীমঙ্গালে'র মতো ঘনরামের 'ধর্মমঙ্গালে'ও পার্বতীর কাঁচলিতে 'ভাগবত'-প্রভাবিত কৃষ্ণলীলাচিত্রাদি আছে। লাউসেনের মুখে প্রহ্লাদ ও ধ্রুবের অবিচল কৃষ্ণভক্তির কথা স্থান পেয়েছে। 'ভাগবতের' চতুর্থ স্কন্ধে ধ্রুবের আখ্যান এবং সপ্তম স্কন্ধে প্রহ্লাদ-হিরণ্যকশিপুর কাহিনি আছে।

৪) শিশু লাউসেনকে চুরি করতে এসে ইন্দা মেটে বা ইন্দ্রজাল কোটাল শিশুর লাবণ্যে মুগ্ধ। তার মনে পড়েছে কংসের ধনুর্যজ্ঞে কৃষ্ণকে আমন্ত্রণ জানানোর জন্য মথুরা থেকে অক্রূরের ব্রজে আগমনের কথা :

শ্রীনন্দকুমারে নিতে যেমন অক্রূর।
প্রবেশিল গোকুলে পাঠাল কংসাসুর।।

(*ধর্মমঙ্গাল* —মহাপাত্র সং, পৃ. ১২৭)

৫) ঘনরামের কাব্যের *'হস্তীবধ'* পালায় কৃষ্ণের কুবলয়াপীড় হস্তীবধ এবং *মায়ামুণ্ড* পালায় ঐ কাব্যের কালীয়দমন লীলার ছায়াপাত আছে।

৬) লাউসেনের গৌড়যাত্রার সময় চারজন সতীর বিরহবেদনার বর্ণনা *ভাগবত পুরাণ* অনুসারী। যেমন—

গোপীগণে কুঞ্জবনে কৃষ্ণহারা হয়ে।
কাননে কাননে ফিরে কানুর লাগিয়ে।।
না পেয়ে কান্দেন যত আহিরী অবলা।
কোথা গেল কি হইল নীলমণি কালা।।
গোপিকা-বিষাদ যত গায় গুণীজন।
শুনি প্রেম-গদগদ সতী চারজন।।

(*'ধর্মমঙ্গাল'*—মহাপাত্র সং, পৃ. ৫০০)

উদ্ধৃতাংশের সঙ্গো তুলনীয় ভাগবত পুরাণের দশম স্কন্ধের একত্রিংশ অধ্যায়ের এই ষোড়শ শ্লোকটি—

পতিসুতান্বয় ভ্রাতৃবান্ধবান্
অতিবিলঙ্ঘ্য তেহন্ত্য চ্যুতাগতাঃ।
গতিবিদস্তবোদ্‌গীত মোহিতা
কিতা ঘোষিতঃ কস্ত্যজেন্নিশি।।

৮.১। *ভারতচন্দ্রের অন্নদামঙ্গালে বৈষ্ণব-প্রভাব*

রায়গুণাকর ভারতচন্দ্র রায়ের 'অন্নদামঙ্গাল' কাব্য রচিত হয়েছিল নদীয়া-নরেশ মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র রায়ের পৃষ্ঠপোষকতায় 'বেদ লয়ে ঋষি রসে ব্রহ্ম' শকে, অর্থাৎ ১৬৭৪ শকাব্দ বা ১৭৫২ খ্রিস্টাব্দে। ভারতচন্দ্র মঙ্গালকাব্যের অন্তিম ধারার কবি— যখন দেববাদের প্রাধান্য

অবলুপ্তির মুখে এবং নব্য মানবতাবাদের অভ্যুত্থান। ভারতচন্দ্র নিজেও দেব-দেবীর দৈবী মাহাত্ম্যে আন্তরিক বিশ্বাসী ছিলেন না। কবি তাঁর ব্যঙ্গাতির্যক দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে 'নূতন মঙ্গল' লেখার আশা ব্যক্ত করেছিলেন। তবু মঙ্গলকাব্যের প্রথা মেনে কাব্যের বন্দনা অংশে এবং অন্য কোথাও কোথাও তাঁকে বৈষ্ণব-অনুষঙ্গ আনতে হয়েছে। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে তাঁর কাব্যের দেবী অন্নদা দেবী চণ্ডীরই রূপান্তর— তবে উগ্রা নন, প্রশান্ত-কোমল, ভক্তবৎসলা। আমরা কিছু দৃষ্টান্ত দিচ্ছি :

৮.২। কাব্যের সূচনায় বন্দনাখণ্ডে কবি গণেশ, শিব ও সূর্যের বন্দনার পর বিষ্ণুর বন্দনা করেছেন। তার অংশবিশেষ এইরূপ :

কেশবায় নমো নমঃ : পুরাণ পুরুষোত্তম : চতুর্ভুজ গরুড়-বাহন।
বরণ জলদ ঘটা : হৃদয়ে কৌস্তভচ্ছটা : বনমালা নানা আভরণ।।
শঙ্খ চক্র গদাম্বুজ : সুশোভিত চারিভুজ : মনোহর মুকুট মাথায়।
কিবা মনোহর পদ : নিরুপম কোকনদ : চরণ-নূপুর বাজে তায়।।...
উর প্রভু শ্রীনিবাস : নায়কের পূর আশ : নিবেদিনু বন্দনা-বিশেষে।
ভারত ও পদ-আশে : নূতন মঙ্গল ভাষে : রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের আদেশে॥

(*ভারতচন্দ্রের গ্রন্থাবলী :* বসুমতী সং, পৃ. ৯৫)

৮.৩। ভারতচন্দ্রের কাব্যে বিশেষ বৈষ্ণব ভক্তিভাবুকতা ছিল না। এজন্য কাব্য থেকে আমরা আর অধিক দৃষ্টান্ত চয়ন করলাম না।

বাংলা মঙ্গালকাব্যে বাণিজ্যিক পরিবেশ

তপনকুমার বিশ্বাস

আদিকাল থেকে আজকের বিশ্বায়ন ও উদার বাণিজ্যকরণের কাল পর্যন্ত ব্যবসা-বাণিজ্যের ঐতিহ্যই নানা শাখা-প্রশাখায় বিবর্তিত হতে হতে ক্রমশ সমৃদ্ধ হয়ে চলেছে। বাংলা ভাষায় সাহিত্য সৃষ্টির পূর্বে প্রাকৃত-অপভ্রংশে— 'অরে রে বাহিহি কাহ্ন নাব' প্রভৃতি অংশে নৌ-বাহকরূপে কৃষ্ণকে দেখেছি; রাধা সেখানে দধি-দুগ্ধ বিক্রেতা, পসারিণী। আর 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' কাব্যের 'চিকন গোয়ালিনী' রাধা বিনোদিনী তো দেহে-মনে পরিপূর্ণ ব্যবসায়ী— গ্রামে-গঞ্জের হাটে-বাটে তিনি দধিদুগ্ধ বিক্রি করে বেড়ান। এরপরই আসে মঙ্গালকাব্যের পালা। এখানে ব্যবসা-বাণিজ্যের পরিবেশ যেন আরো সমৃদ্ধ— আরো উজ্জ্বল। চাঁদ সদাগর-ধনপতি-শ্রীপতির মধ্যে আমরা দেখেছি বাণিজ্য-যাত্রার নিঃশঙ্ক দৃঢ়তা, তারা যেন বলতে চেয়েছে—

যাবই আমি যাবই, ওগো,
বাণিজ্যেতে যাবই।
লক্ষ্মীরে হারাই যদি
অলক্ষ্মীরে পাবই।

এই মঙ্গালকাব্যের আলোচনায় প্রথমেই কবিকঙ্কণ মুকুন্দের নাম চলে আসে। তাঁর 'অভয়ামঙ্গাল' কাব্যের 'আখেটিক খণ্ডে' দেখি কালকেতুর সঙ্গো ফুল্লরার বিবাহের ঘটকালি করেছে সোমাঞি পণ্ডিত এবং সেই প্রসঙ্গো হাট থেকে নানা বস্তু ক্রয় করা হয়েছে—

নানা বস্তু আনে হাটে   হরিণ মহিষ কাটে
নিমন্ত্রণে আনে বন্ধুজনে।

এখানে সামাজিক রীতিনীতির যেমন পরিচয় পাওয়া যায়, তেমনি বোঝা যায় হাটে তখন নানা জিনিস বিক্রি হত— অর্থাৎ ব্যবসা-বাণিজ্যের একটা গ্রামীণ পরিবেশ তখন গড়ে উঠেছিল।

পুত্রের বিবাহ দিয়ে ধর্মকেতু নিশ্চিন্ত হয়েছে, নিদয়াও বিশ্রাম পেয়েছে; কেননা, কালকেতু প্রতিদিন মৃগয়া করে এবং ফুল্লরা শাশুড়ির নির্দেশ মতো মাংস বিক্রি করে বেড়ায়—

নিদয়া বসিল খাটে মাংস লইয়া জায় হাটে
অনুদিন বেচয়ে ফুল্লরা
সাযুড়ি জেমন ভনে তেনমত বেচে কিনে
শিরে কাঁধে মাংসের পসরা।
মাস বেচি আনয়ে কড়ি চালু লয়ে ডালি বড়ি
তৈল লোন আনয়ে বেসাতি
সাক বাগ্যন কচু মুলা আধ্যা থোড় কাঁচকলা
নানা সজ পুরিয়া লয়ে পাথী।
ফুল্লরা আইল ঘরে নিদয়া জিজ্ঞাসা করে
করে বামা হাটের বিবরণ।

বোঝা যাচ্ছে মেয়েরা হাট বাজার করত, ব্যবসা-বাণিজ্যে তাদের বেশ দাপট ছিল। মাংস বিক্রি করে ফুল্লরা চাল, তেল, লবণ, শাক, বেগুন, কচু, মূলা প্রভৃতি হাট থেকে কিনে এনেছিল। অর্থাৎ হাটে এসব জিনিসের বেচা-কেনা চলত— ব্যবসাদারদের আনা-গোনা ছিল তখনকার হাটে। ফুল্লরা মাংস ছাড়াও বিক্রি করত হাতির দাঁত, 'সাজুড়িয়া'র চামর, মহিষের শিং, বাঘের ছাল-নখ প্রভৃতি আরো কত কিছু—

সিঙ্গার পসরা করে ফুল্লরা বাজারে
পণমুলে সিঙ্গা-জোড় বেচে সিঙ্গাদারে।
যন্ত্র আড়ি বাঘ মারি ছড়্যা লয় ছাল
ব্যাঘ্রনখ খুদ দিয়া কীনয়ে ছাওয়াল।
হাটে বাঘছাল বেচে ফুল্লরা রূপসী
যত্নে কীনিঞা লয় কাপড়ি সন্যাসি।

ব্রাহ্মণেরা তর্পণ করার খড়্গা এবং সন্ন্যাসীরা কাপড় হিসাবে পরিহিত বাঘছাল কিনত ফুল্লরার মতো ব্যাধ রমণীর কাছ থেকেই।

তখনকার বণিকেরা বেশ ধনী ছিল। মুরারি শীলের কথা প্রথমেই মনে আসে—

বান্যা বড় দুঃশীল নাম মুরারি শীল
লেখা-জোখা করে টাকা-কড়ি

কালকেতু তার কাছে দেবী প্রদত্ত অঙ্গুরী বিক্রি করতে গেলে সে প্রতারণা করে মহামূল্যবান অঙ্গুরী জলের দামে কিনে নিতে চায়—

রতি প্রতি হইল বীর দশগণ্ডা দর
দুই ধানের কড়ি তাহে পাঁচ গণ্ডা কর।
অস্ট পণ পাঁচ গণ্ডা অঙ্গুরির কড়ি
মাংসের পিছিলা কড়ি ধারি দেড় বুড়ি।
একুনে হইল অস্ট পণ আড়াই বুড়ি
চালু ডালি কিছু লহ কিছু লহ কড়ি।

—বোঝা যাচ্ছে, ব্যবসায়ীরা নগদ টাকার পাশাপাশি দ্রব্য বিনিময়ের মাধ্যমেও মুনাফা

অর্জনের চেষ্টা করত। যদিও মুরারি শীল শেষপর্যন্ত কালকেতুকে ঠকাতে পারেনি— অনেক দর-দামের পরেও দেবীর নির্দেশে উপযুক্ত মূল্য দিতে বাধ্য হয়েছিল।

কালকেতু টাকা পেয়ে গোলাহাটে গিয়েছিল জিনিসপত্র কিনতে। সেখানে সে কিনেছিল নানা দ্রব্য—

কনকের সাঁজাকুড়া বিচিত্র পাটের গড়া
মাজকুড়া হিরায় জড়িত
চন্দন তরুর পিড়া লম্বিত মুকুতা চূড়া
কিনে দোলা রত্নে ভূষিত।
পর্বতিয়া টাঙ্গন তাজি বাছিয়া কিনিল বাজি
গজ কিনে পর্বতের চূড়া।

শুধু তাই নয়, এই গোলাহাট থেকেই কালকেতু কিনেছিল ‘অঙ্গাদ কঙ্কণ হার’, যুদ্ধের জন্য অভেদ্য বর্ম, রত্নভূষিত মুকুট, মহিষের চামড়ার ঢাল, তরোয়াল, টাঙ্গি, ভিন্দিপাল, সেল, কামান, কৃপাণ প্রভৃতি নানা দ্রব্য। অর্থাৎ গোলাহাটে এসবের আমদানি ছিল—এ সবের ব্যবসা চলত বেশ জাঁকিয়ে—তা নাহলে কালকেতু অগ্রিম না জানিয়ে এসব জিনিস দিনের দিন পেল কী করে? নারীদের প্রসাধন সামগ্রীও বিক্রি হত হাটে, ফুল্লরার জন্য কালকেতু সেসব কিনেছিল—

পুরিতে জায়ার সাদ কিনিল পাটের জাদ
মণি-মুকুতা তাহে বেড়ি
হিরা নিলা মুতি পলা কলধৌত কণ্ঠমালা
কুণ্ডল কিনিল স্বর্ণ-চুড়ি।

তখন গরু-মহিষের হাট বসত। কাঠের খাট-পালঙ্কের দোকান ছিল—সর্ষে, ছোলা, মুসুরি, কলাই, ধান, তিল প্রভৃতি ভূষিমালের ব্যবসা চলত। কালকেতু এসবই কিনেছিল গোলাহাট থেকে—

নিজোজিয়া জনে জনে ধেনুমহিষ কিনে
বলদ কপোট কিনে খাসী
শকট বিমান রথ কিনে বীর শতশত
খাট পালঙ্ক কিনে দাসী।
সরিসা মুসুরি মাষ ধান্যে নাহি দিশপাশ
গুড় তিল মুগ বরবটী
তণ্ডুল কিনিল ছোলা মুলাইয়া চিনির গোলা
তৈল কিনে উমানিঞা ঘটি।

কলিঙ্গা ছেড়ে বিভিন্ন জাতি ও পেশার মানুষ গুজরাটে কালকেতুর রাজ্যে আশ্রয় নিয়েছিল, গোপ জাতির মানুষ যারা এসেছিল তারা চাষ-আবাদ শুরু করেছিল—তারই ফলে গুড়-চিনি-মুগমাষ-গম-সর্ষা-কার্পাস প্রভৃতি যা উৎপন্ন হত তার বিনিময় বা বেচা-কেনা চলত সহজেই। তেলিদের মধ্যে কেউ চাষ করত, কেউ বা ঘানি চালাত (সর্ষে থেকে তেল তৈরি করত),

কেউ আবার তেল কিনে বিক্রি করত— 'কিনিঞা বেচয়ে কেহ তেল'। কুম্ভকার হাঁড়ি-কুড়ি ও নানা মাটির বাদ্যযন্ত্র তৈরি করত ও বিক্রি করত। মালীরা ফুলের মালা বিক্রি করার জন্য নগরে নগরে ঘুরত। মোদক চিনি দিয়ে খণ্ডনাড়ু তৈরি করে নগরে নগরে বিক্রির জন্য ঘুরে বেড়াত। আর গন্ধবেনেরা বিক্রি করত ধূপধুনা; শঙ্খবেনেরা বেচত শঙ্খ—

বৈসে যত গন্ধবান্যা গন্ধ বেচে ধূপধুনা
পসরা করিয়া চলে হাটে
শঙ্খবান্যা কাটে শঙ্খ কেহ তার করে রঙ্গ
মণিবান্যা বৈসে গুজরাটে।

কাঁসারি থালা-ঘটিবাটি, পুজোর বাটা, পঞ্চপ্রদীপ প্রভৃতি কাঁসার জিনিস তৈরি করে বিক্রি করত। সুবর্ণ বণিকেরা রজত-কাঞ্চনের কেনা-বেচা করে অপেক্ষাকৃত ধনী হয়ে উঠত। এইভাবেই কালকেতুর গুজরাট নগরে ব্যবসা-বাণিজ্যের পরিবেশ গড়ে উঠেছিল। নানা জাতির প্রজারা গুজরাট নগরে আনন্দের পরিবেশ তৈরি করেছিল। ধীবর ও কোচেরা জাল বোনা ও মাছ ধরার কাজ করত, 'ধোবা'র ব্যবসা ছিল কাপড় কাচা, কেউ 'চিড়া কুটে মুড়ি ভাজে' আর পাটনী পারাপার করে রাজকর আদায় করত এবং চণ্ডালেরা লবণ বিক্রি করত জীবনধারণের জন্য। গুজরাট নগরে মদের ব্যবসাও চলত বেশ রমরমিয়ে—

নগরের একপাশে বহু সৌগণ বৈসে
সুরা তারা করে অনুক্ষণ।

মদের পাশাপাশি আসে মেয়েমানুষের কথা, দেহ পসারিণীদের কথা। গুজরাটে সে ব্যবসাও ছিল—

লম্পট পুরুষ আশে বারবধূগণ বৈসে
একভিতে তার অধিষ্ঠান
নাটুয়া কলন্ত সঙ্গে বসিল পরমরঙ্গে
শ্রীকবিকঙ্কণ রস গান।।

কালকেতুর রাজ্যের এই পরিবেশ আমাদের বর্তমান যান্ত্রিক নগরজীবনের কথাই স্মরণ করিয়ে দেয়।

বর্তমানে ব্যবসায়ীদের ওপর তোলাবাজদের দৌরাত্ম্যের কথা শোনা যায় প্রায়ই। কালকেতুর রাজ্যের ব্যবসায়ীদেরও তোলা দিতে হত—রাজার লোক ভাড়ুঁ দত্ত ছিল সেই তোলাবাজ—

পসরা লুটিয়া ভাঁড়ু ভরয়ে চুপড়ি
জত দ্রব্য লয় ভাঁড়ু নাঞি দেই কড়ি।
লণ্ডে ভণ্ডে দেই গালি বলে শালামালা
আমি হলাঙ মণ্ডল আমার আগে তোলা।
টানাটানি করে ভাণ্ডু হাটুয়া নাঞি ছাড়ে
কেশ ধরি কিল লাথি মারে তার ঘাড়ে।

শুধু তাই নয় হাটুয়াদের কাছ থেকে শাক, বেগুন, মূলা পর্যন্ত তোলা নিত ভাঁড়ু। বাবার ক্ষমতার ভয় দেখিয়ে ভাঁড়ুর ছেলে পর্যন্ত ময়রার কাছ থেকে গুড় লুটে নিত। এসব খবর রাজা কালকেতুর কাছে পৌঁছলে ভাঁড়ুকে তিনি অপমান করে তাড়িয়ে দেন। যাইহোক সব মিলিয়ে বোঝা যায় সেকালের বঙ্গদেশে ব্যবসা-বাণিজ্যে যেমন সমৃদ্ধি ছিল তেমনি তাতে নানা বিঘ্নও ছিল।

দুই

'বণিক খণ্ড'—নামকরণেই বোঝা যায় ব্যবসা-বাণিজ্যের কথা এখানে আসবেই। আমরা দেখেছি উজানী নগরের ধনপতি সদাগরের সঙ্গে নিধিপতির কন্যা লহনার বিবাহ হয়েছে। কিন্তু ইছানী নগরের লক্ষপতির কন্যা খুল্লনাকেও সে বিবাহ করতে ইচ্ছুক। তাই দনাই পণ্ডিতকে ধনপতি লক্ষপতির কাছে ইছানীতে প্রেরণ করেছে। পণ্ডিত বেশ চতুর, সে লক্ষপতিকে দেশ-বিদেশের পাত্রের অযোগ্যতা প্রমাণ করে ধনপতিকে যোগ্যপাত্র রূপে প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছে। এই উপলক্ষ্যে বিভিন্ন স্থানের গন্ধবেনের পরিচয় জানা যায়। বোঝা যায় যে, ব্যবসা-বাণিজ্য বেশ জাঁকিয়েই চলত সেই সময়ে। আমরা জেনেছি যে, চম্পকনগরের বণিক ছিলেন চাঁদসদাগর, বর্ধমানের নাম করা ব্যবসায়ী ছিলেন ধুস দত্ত, ফতেপুরে ছিলেন রামকুণ্ডু, কর্জনার বণিক ছিলেন হরি লা, তালুকীর সোম চন্দ, নাড়ুগাঁর রাম দাঁ। শুধু তাই নয় গঙ্গার দু'পাড়ে আরো অনেক বণিক ছিলেন—যাদের মধ্যে ধনপতিই ছিলেন সর্বশ্রেষ্ঠ সদাগর, খুল্লনার উপযুক্ত পাত্র। এই ফর্দ থেকেই বোঝা যায় যে, সে সময় ব্যবসা-বাণিজ্য বেশ ভালোই চলত।

সে সময়ে সব বণিককেই রাজার নির্দেশ মেনে চলতে হত। উজানীর রাজা বিক্রম কেশরীও ধনপতিকে পাঠিয়ে ছিলেন গৌড় পাটনে সুবর্ণ পিঞ্জর গড়িয়ে আনতে। কেননা, উজানীতে ঐ ধরনের পিঞ্জর ছিল না বা তৈরি করার কারিগর ছিল না। অর্থাৎ সে সময়ে আমদানি-রপ্তানির ব্যবসাও চলত। ব্যবসায়িক ক্ষেত্রে রাজার আদেশ ছিল অবশ্য পালনীয়। সদাগর প্রথমে দুই স্ত্রী ঘরে রেখে বিদেশে যেতে আপত্তি তুলেছিল। কিন্তু রাজার আদেশ বড়ো কঠিন—রাজনির্দেশ পাবার পর নিজের ঘরে ফেরার অনুমতি পর্যন্ত ছিল না বণিকদের। রাজার কাছ থেকে স্বর্ণমুদ্রা নিয়ে সরাসরি ব্যবসাক্ষেত্রে চলে যেতে হত। ধনপতি অবশ্য লুকিয়ে বাড়িতে গিয়েছিল।

গৌড়সভায় ধনপতি পৌঁছে রাজার কাছে আত্মপরিচয় দান করেছিল এবং ব্যবসায়িক প্রয়োজনের কথা নিবেদন করেছিল। এটাই ছিল তৎকালীন ব্যবসায়িক নীতি।

'দুর্বলার বেসাতি' অংশ থেকে তৎকালীন হাট-বাজারে জিনিসপত্রের দর সম্বন্ধে ধারণা করা যায়—

নারকেলে কচু কুমড়া বাইশা দরে পলা কড়া
পাকা আম্র কিনে বুড়ি মূলে।
বিশ দরে চিনি কিনি কিনিল নবাত ফেনি
পান কিনি কড়ার বদলে।।

দুর্বলা বিশ দরে লবণ কিনেছিল। আট কাহনে খাসি, তোলা দরে তেজপাতা ও বিনা দরে আদা কিনেছিল— যদিও সে বাড়ি ফিরে জিনিসপত্রের দাম বাড়িয়ে বলেছিল এবং নিজে অর্থ আত্মসাৎ করে হিসাব বুঝিয়ে দিয়েছিল।

ধনপতির পিতৃশ্রাদ্ধে দেশ-বিদেশ থেকে বণিকেরা এসেছিল। যেমন বর্ধমান থেকে এসেছিল ধুস দত্ত। বিষ্ণু কুণ্ডু এসেছিল পাসুরি আচলা থেকে, ভাসিকি থেকে শ্রীধর হাজরা, খণ্ড ঘোষ থেকে রামু সাহা, বিষ্ণুপুর থেকে জম দত্ত খাঁ, বর্ধমান থেকে ছোট নীলাম্বর, কাহতি থেকে অলঙ্কার দত্ত প্রমুখ। এই বর্ণনা থেকে বোঝা যায় যে, তৎকালে বণিক সম্প্রদায় বেশ প্রসার লাভ করেছিল এবং একটা ব্যবসায়িক পরিবেশ তারা গড়ে তুলেছিল। ধুস দত্তের পিতৃশ্রাদ্ধেও যোল শত বণিক হাজির ছিল—যার মধ্যে ধনে-মানে বড়ো বলে মালা-চন্দন পেয়েছিল শঙ্খ দত্ত। যাই হোক, আমরা দেখতে চাইছি সে সময়ে যোলশত ব্যবসায়ী-বণিকের বেশ প্রতিপত্তি ছিল—না হলে তারা আমন্ত্রণ পেত না—আজকের দিনে যেমন বণিক সভায় ধনী ব্যবসায়ীরা আমন্ত্রণ পায়।

'রাজসমীপে ভাণ্ডারীর উক্তি'—অংশ থেকে জানা যায় যে আমদানি-রপ্তানির ব্যবসা সে সময়ে বেশ গুরুত্বপূর্ণ বিষয় ছিল। রাজভাণ্ডারে কোন্ কোন্ জিনিসের সঞ্চয় শেষ হয়ে গিয়েছে তার বিবরণ পাওয়া যায় এখানে—

ভাণ্ডারে নাহিক নীলা   রসাল বণিক সিলা
মাণিক বিদ্রুমো মতিপলা।
যতেক চামর ছিল   সব পুরাতন হৈল
উড়ে যেন শিমূলের তুলা।।

এখানেই শেষ নয়, সৈন্ধব লবণ নেই, শঙ্খ নেই, হিঙ্গা, হিঙ্গুল, দ্রাক্ষা, কুমকুম, কস্তুরি, চন্দন প্রভৃতি সবই রাজভাণ্ডারে শেষ হয়ে গেছে। তাই এসব জিনিস আমদানির জন্য রাজা নির্দেশ দিলেন ধনপতি সদাগরকে। ধনপতি প্রথমে আপত্তি করলেও শেষপর্যন্ত ব্যবসাকার্যে দক্ষিণ পাটনে যেতে বাধ্য হয়েছিল।

এরপর 'ধনপতির বিনিময় দ্রব্য সংগ্রহ' থেকে জানা যায়, সে কোন্ কোন্ জিনিসের পরিবর্তে সিংহল থেকে কোন্ কোন্ জিনিস আমদানি করার পরিকল্পনা করেছিল। এখান থেকে বিনিময় প্রথার মাধ্যমে ব্যবসা-রীতির স্পষ্ট ছবি উঠে আসে। ধনপতি বলেছে—

কুরঙ্গ বদলে মাতঙ্গ পাব নারিকেল বদলে সঙ্খ।
বিড়ঙ্গ বদলে লবঙ্গ পাব সুঁঠের বদলে টঙ্ক॥
পুরঙ্গ বদলে মাতঙ্গ পাব পায়রা বদলে সুয়া।
গাচ্‌ফল বদলে জায়ফল পাব বয়ড়ার বদলে গুয়া॥
সিন্দুর বদলে হিঙ্গুল পাব গুঞ্জার বদলে পলা।
পাটন বদলে ধবল চামর কাঁচের বদলে নীলা॥
চিনির বদলে কর্পূর পাইব আলতার বদলে নাটী।
সকলাত কম্বল পামরি পাব বদল করিয়া পাটী।।
লবণ বদলে সৈন্ধব পাব জোঁগুানি বদলে জিরা।

আকন্দ বদলে মাকন্দ পাব হরিতাল বদলে হীরা॥
চয়ের বদলে চন্দন পাব পাগের বদলে গড়া।
সুক্তার বদলে মুক্তা পাব ভেড়ার বদলে ঘোড়া॥
মাস মুসরি তণ্ডুল মুগরির বটী বাট্য না চিনা।
বদলে শকটে তৈল ঘি পুরি ঘটে সদাগর লইল কিনা॥
গোধুপ জব খাড়ুয়া মুগ তিল মাড়ুয়া সরিসা মসিনা ছোলা।
বদলে সদাগর লইল বহুতর লবণে পাতিয়া গোলা॥

ধনপতির পুত্র শ্রীমন্তও প্রায় অনুরূপ বিনিময় দ্রব্য নিয়ে সিংহলে গিয়েছিল। যাবার আগে সে রাজার আজ্ঞা লাভ করেছিল এবং সিংহল পৌঁছে রাজা সালবাহনের কাছে নিজের পরিচয় দান করে দ্রব্য বিনিময়ের ইচ্ছা প্রকাশ করেছিল। অর্থাৎ এ সবই ছিল তৎকালীন ব্যবসা-বাণিজ্যের রীতি-নীতি, প্রথা ও মাধ্যম।

বিজয়গুপ্তের 'পদ্মাপুরাণ' কাব্যে দেখি চাঁদের পিতা জীব সাধু ব্যবসা-বাণিজ্য করে ধনের ঈশ্বর হয়েছিল— হীরামণি-মাণিক্য এনেছিল 'চৌদ্দঘর' ভর্তি করে। চাঁদ কাপুরুষের মতো ঘরে বসে আছে। কিন্তু সে জানে—

ধনে মহাধনী হইলে সর্ব্বলোক বশ।
রাহুতে অর্জ্জিয়া ধন খাইতে বড় রস।।

তাই সূত্রধর ডেকে নৌকা গড়ার নির্দেশ দিল চাঁদ—সে দক্ষিণ পাটনে যাবে। কেননা, তার ছয় ছেলে মনসার রোষে মারা গেছে, ঘরে বসে খেলে সব ধন ফুরিয়ে যাবে, বৃদ্ধকালে তাদের দেখবে কে? সনকা অনেক নিষেধ করে। সে স্বপ্ন দেখেছে, এবার পাটনে গেলে সমুদ্রপথে জীবননাশ হবে। কিন্তু চাঁদ দৃঢ়প্রতিজ্ঞ—

যে করুক সে করুক বিধি প্রাণ সংশয়।
অবশ্য পাটনে যাব কহিনু নিশ্চয়।।

এরপর চাঁদ চৌদ্দ ডিঙ্গায় বহুমূল্য ধন ভর্তি করে নিল বিনিময়ের উদ্দেশ্যে—

চৌদিকে বাজনা বাজে হুলাহুলি সর্ব্ব রাজ্যে
সাধু যায় দক্ষিণ পাটন।
আগে তোলে ধনখণ্ড স্বর্ণ তোলে ভাণ্ড ভাণ্ড
সাধু নহে ধনেতে কাতর।
হীরামন মাণিক্য ভরা ডিঙ্গায় তুলিল সারা
আর তোলে বিচিত্র পাথর।।
ছোলঙ্গা জামীর ফল মিষ্ট তোলে নারিকেল
গুয়ার পাকড়ি ছড়া ছড়া।
সুতার কাপড় গড়া তোলে জোয়ান ঘড়া ঘড়া
আর তোলে চটের ধোপড়া।।
মাষ মাশুরী ছোলা আদা হরিদ্রা মূলা

নানা দ্রব্য তোলে নিয়া নায়।
জিনিষ তুলিল নায় সানন্দে বিজয় গায়
সাধুরে জানাতে ধনা যায়।।

তারপর 'মধুকর', 'বিজুসিজু', 'গুয়ারেখি' প্রভৃতি চৌদ্দ ডিঙ্গা সাজিয়ে চাঁদ যাত্রা করল সিংহল অভিমুখে। কিন্তু মধ্যগাঙে চাঁদ এক পুরী দেখতে পেল—

মধ্যগাঙ্গে এক পুরী দেখিল তখন॥
দূরে থাকি তাহা দেখে চান্দ সদাগর।
কার পুরী দেখি এই সমুদ্র মাঝার॥
কেহ বলে ডাকাতে ভাত রান্ধি খায়।
কেহ বলে রাজা বুঝি জলকর লয়॥

বোঝা যাচ্ছে জলপথে ব্যবসা-বাণিজ্য নির্বিঘ্নে চলত না। জলদস্যুর ভয় ছিল, রাজাও ব্যবসায়ীদের কাছ থেকে 'জলকর' আদায় করতেন। এরপর চাঁদ সিংহলে পৌঁছে রাজার সঙ্গে সাক্ষাৎ করলেন। রাজা বললেন—

কোথাকার সদাগর কি নাম কোথায় ঘর
স্বরূপে কহিবা মোরে সার।।
চম্পক নগরে ঘর নাম আমার চন্দ্রধর
বাপ আমার ধনের কুবের।
আমার দেশের কথা কি কব তোমার হেথা
দ্রব্য মেলে অনেক প্রকার।

সব কিছু শুনে রাজা বললেন—

কিবা বস্তু আনিয়াছ আমার শহরে।
সকল আনিয়া দেহ আমার গোচরে॥

চাঁদবেনে পাকা ব্যবসায়ী, তাই সে ধনাকে ইঙ্গিতে বুঝিয়ে দেয় প্রথমে সস্তা দ্রব্য দেখাও। সেই মত কাঁচা আদা, শুকনো খেজুর, গুবাক, নারকেল প্রভৃতি রাজাকে দেখানো হয় এবং এসব দ্রব্যের গুণাগুণ ব্যাখ্যা করা হয়। রাজা সানন্দে সে সব গ্রহণ করে এবং বিনিময়ে চাঁদকে রাশি রাশি শঙ্খ এনে দেয়—

তপের প্রভাবে চান্দ কার্য্যে বড় দক্ষ।
ইহার বিশ গুণ হইল শঙ্খ চৌদ্দ লক্ষ।।

এরপর চাঁদ প্রচুর লাভ রেখে গুয়াপানের বদলে মাণিক্য, মূলার বদলে গজহস্তির দন্ত, হরিদ্রার বদলে সোনা, কলাইয়ের বদলে মুকুতা-প্রবাল, মসুরীর বদলে রক্ত হিঙ্গুল, বাউসের বদলে দ্রাক্ষা, ছাগলের বদলে হরিণ, বারকোষ বদলে পিতলের থালা, কুকুরের বদলে ঘোড়া, কাকের বদলে কাকাতুয়া, টিয়ার বদলে শুকপাখি, এক কাঠা কায়নের (চাল) বদলে কুড়ি কাঠা মুক্তা ও কুড়ি কাঠা প্রবাল সংগ্রহ করে নিল।

চাঁদ ছিল অত্যন্ত দক্ষ বণিক। তাই প্রথমেই সে খাদ্যদ্রব্য দিয়ে রাজার মন জয় করেছিল এবং পাটশাড়ির বিনিময়ে রাজা-রানি দুজনকেই খুশি করেছিল—

মিতা রে তুমি ত পণ্ডিত মহাজন।
চিন্তিত হইয়া বল তুমি দুর্লভ পাটের ভুনি
ইহার বদলে কোন ধন।।...
তোমার দেশের কাছে আর যত দ্রব্য আছে
চর দিয়া করহ বিচার।।...
রাজার যোগ্য বসন না পরে সামান্য জন
অনেক শকতি ইহা কিনি।
যতনে রাখিয়া ঘরে সর্ব্বকালে লোকে পরে
বড়ই দুর্লভ চটের ভুনি।।
চান্দর ললিত ভাষে খলখলি রাজা হাসে
আপন হাতে চট মেলি চায়।
একখান কসিয়া পিন্ধে আর খান মাথায় বান্ধে
আর খান দিল সর্ব্বগায়।।
চট পরিয়া রাজা ডাক দিয়া আনে খোজা
আবাসে পাঠাইল কতখান।
রাণীরে বলিও বাণী পরুক চটের ভুনি
যেন দেখি জুড়ায় পরাণ।।

এরপর প্রচুরতম লাভে দ্রব্য বিনিময় করতে চাঁদের আর বেগ পেতে হয়নি। চাঁদের সাহায্যকারী রোঙ্গাই পণ্ডিতও ব্যবসায়িক মনের অধিকারী ছিলেন। তিনি চাঁদকে বলেন—

এ দেশের মধ্যে যদি থাকে দুস্টজন।
প্রকাশ করিলে যাবে তোমার জীবন॥
ডাব নারিকেল পচে শিমূলের তুলা।
রৌদ্র শুকাইবে যত দিছ পাকা মূলা॥

সুতরাং খুব তাড়াতাড়ি বিদায় নেওয়া দরকার। তাই চাঁদ গেল বিদায় নিতে—

কোলাকুলি করি কহে বিক্রমকেশর। / করিয়াছ উপকার তুমি সদাগর॥
কি দিব তোমাকে আমি কি আছে আমার। / এক লক্ষ টাকা দিল সাধুকে ব্যবহার॥
রোঙ্গাই পণ্ডিত আর নফরযোগ্য ধনা। / ব্যবহার দিল তারে একমণ সোনা॥
স্বভাবে বণিক জাতি বড়ই সেয়ান। / রাজারে ব্যবহার দিল চট চারিখান॥

বিদায়কালীন উপহারের ক্ষেত্রেও চাঁদ সিংহলরাজকে ঠকিয়েছে। এক লক্ষ টাকা উপহারের বদলে চাঁদ মাত্র চারখানা চট বা পাটের শাড়ি দান করে কর্তব্য সম্পাদন করেছে, এখানে ব্যবসায়ী সমাজের গড় মানসিকতা প্রকাশ পেয়েছে।

কবিচন্দ্র মুকুন্দ মিশ্র প্রণীত ‘বাশুলীমঙ্গাল’ বা ‘বিশাল লোচনীর গীত’ কাব্যেও বর্ধমানের

ধুসদত্ত ও তাঁর পুত্র গুণদত্তের পাটনযাত্রার কাহিনি আছে। পিতা-পুত্র দু'জনেই 'মায়া দহে আশ্চর্য দর্শন' করেছিল। দেবী বাশুলীর ইচ্ছাতেই ধুসদত্ত কারাগারে বন্দি হয়েছিলেন, তাঁর ডিঙ্গা রাজা লুঠ করে নিয়েছিলেন। বাঙ্গাল মাঝিদের 'বাফই বাফই' ক্রন্দনেও কোনো কাজ হয়নি। পরে পুত্র গুণদত্ত ধনপতির পুত্র শ্রীমন্তের মতোই পাটনে যাত্রা করেছিল ও পিতার মতোই বন্দি হয়েছিল। অবশ্য দেবী বাশুলীর কৃপাতেই শেষপর্যন্ত পিতাকে সঙ্গো করে বর্ধমানে ফিরেছিল।

বোঝা যাচ্ছে ব্যবসা-বাণিজ্য খুব সহজ সরল আয়েসি ব্যাপার ছিল না। নদীপথে যাত্রাকালে ঝড়-বৃষ্টি বণিকের নৌকাডুবির ঘটনা সেসময় ঘটত প্রায়ই। চাঁদসদাগরের চৌদ্দ ডিঙ্গা ডুবে গিয়েছিল, ছয় পুত্র মারা গিয়েছিল—হতে পারে তা দেবীর রোষ, কিন্তু তা বাস্তবেরই কাব্যিক রূপায়ণ বলা যেতে পারে। শুধু প্রাকৃতিক বিপর্যয় নয়, বিদেশে ব্যবসা করতে গিয়ে রাজরোষে পড়লে কারাগারে বন্দি হওয়ার মতো দুঃখকর ঘটনাও ঘটত তখন—ধনপতি, শ্রীমন্ত, ধুসদত্ত, গুণদত্ত প্রমুখ বণিকরাই তার দৃষ্টান্ত।

পরিশেষে বলা যেতে পারে বিজয় গুপ্তের 'পদ্মাপুরাণ' (আনুমানিক ১৪৮৪ খ্রিস্টাব্দ), কবিকঙ্কণের 'চণ্ডীমঙ্গাল' (আনুমানিক ১৬০৪ খ্রিস্টাব্দ) বা কবিচন্দ্র মুকুন্দ মিশ্রের 'বাশুলীমঙ্গাল' (চণ্ডীমঙ্গালেরই সমসাময়িক কাল) কাব্যে বাণিজ্যিক পরিবেশের যে চিত্র আমরা পেলাম তা সমগ্র মধ্যযুগেরই বাস্তব প্রতিচ্ছবি। অন্যান্য মঙ্গালকাব্যগুলি ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করলে অনুরূপ ব্যবসায়িক পরিমণ্ডলের চিত্রই ফুটে উঠবে।

উৎসের সন্ধানে

১। আশুতোষ ভট্টাচার্য : 'বাংলা মঙ্গালকাব্যের ইতিহাস'
২। সুকুমার সেন সম্পাদিত : কবিকঙ্কণ মুকুন্দ বিরচিত 'চণ্ডীমঙ্গাল'
৩। সুকুমার সেন : 'বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস'—প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড
৪। বিজনবিহারী ভট্টাচার্য সম্পাদিত : কবিকঙ্কণ মুকুন্দরাম বিরচিত 'চণ্ডীমঙ্গাল'
৫। শ্রীশ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় ও বিশ্বপতি চৌধুরী সম্পাদিত : 'কবিকঙ্কণ-চণ্ডী'
৬। অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় : 'বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত', ২য় ও ৩য় খণ্ড
৭। অমৃতলাল বালা সম্পাদিত : বিজয়গুপ্তের 'পদ্মাপুরাণ'
৮। সুবলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ও শুভেন্দুসুন্দর সিংহরায় সম্পাদিত : কবিচন্দ্র মুকুন্দ মিশ্র প্রণীত 'বাশুলীমঙ্গাল'
৯। ক্ষেত্র গুপ্ত : 'বাংলা সাহিত্যের সমগ্র ইতিহাস'

পশ্চিমি গঠনতত্ত্বের আলোকে বাংলা মঙ্গালকাব্য

পিন্টু রায়চৌধুরী

গোটা মধ্যযুগ ধরে বাংলা সাহিত্যের যে ধারাটির সাথে লোকজীবনের নিবিড় যোগাযোগ সাধিত হয়েছিল তা অবশ্যই মঙ্গালকাব্য। কালের বিচারে পঞ্চদশ থেকে অষ্টাদশ শতক পর্যন্ত মঙ্গালকাব্য শাখার বিস্তার। তবে এর পটভূমি নির্মাণে প্রাচীন পুরাণ থেকে শুরু করে লোককথা, ব্রতকথা এমনকি আধুনিক যুগের কিছু সাহিত্য-লক্ষণেরও সংমিশ্রণ ঘটেছে একথা সত্য। দীর্ঘ সময় ধরে বিভিন্ন মিশ্র লক্ষণকে আশ্রয় করে এর কাহিনিধারাগুলো গড়ে উঠলেও, সাধারণভাবে বলতে হয় মঙ্গালকাব্য মূলত বাস্তবজীবনাশ্রয়ী।

পার্থিব জীবনের আশা-আকাঙ্ক্ষাকে কেন্দ্র করেই বাংলা মঙ্গালকাব্যের মূল ভিত্তি গড়ে উঠেছিল। সেই জন্যই মঙ্গালকাব্যের বৈশিষ্ট্য বিচারে লোকজ রীতি-নীতি-সংস্কারের প্রাধান্য এত প্রবল। বিশেষ করে গ্রন্থোৎপত্তির কারণ বর্ণনা, গর্ভ বর্ণনা, বিবাহাচার, দাম্পত্য কলহ, জন্মান্তরবাদ, বিভিন্ন বস্তু-তালিকা, ধাঁধা-প্রবাদ-প্রবচন, নারীর সতীত্ব পরীক্ষা, এমনকি দেবীর বৃদ্ধাবেশ ধারণ তথা রূপপরিবর্তনের মতো অলৌকিক গল্প বর্ণনার অংশগুলি যা মঙ্গালকাব্যের অন্যতম আকর্ষণ; তার সাথে আমাদের প্রাত্যহিকতার সম্পর্ক। এই সম্পর্ককে নিয়েই গড়ে উঠেছে গোটা মঙ্গালকাব্যের কাহিনি, তাকে সংস্কারে লালন করে আসছে সাধারণ জনসমাজ। নদীর ধারার মতো বহমান সেই জনসমাজের সাথে একান্ত সম্পর্ককে বাদ দিয়ে মঙ্গালকাব্যের সঠিক প্রকৃতি নির্ণয় করা প্রায় অসম্ভব। তাই আমাদের যাবতীয় আলোচনার কেন্দ্রে লোকজীবনের গর্ভজাত অভিপ্রায়গুলিকে ধরতে গিয়ে অদ্ভুতভাবে এসে পড়ে লোককথার একাধিক প্রসঙ্গা।

মঙ্গালকাব্যের সাথে লোককথার যোগ অন্তরের। আসলে লোকজীবনের উৎস থেকেই পার্থিব কামনা-বাসনার প্রতিফলন স্বরূপ লোককথা ও মঙ্গালকাব্যের আবির্ভাব। 'বাংলা মঙ্গালকাব্যের ইতিহাস' গ্রন্থের রচয়িতা বিশিষ্ট লোকসাহিত্য গবেষক আশুতোষ ভট্টাচার্য মহাশয় মনে করতেন—

> লোক-সাহিত্যের মৌখিক ধারা (oral tradition) -র ওপর ভিত্তি করিয়াই মঙ্গালকাব্যের লিখিত (written) ধারার সৃষ্টি হইয়াছে।

মৌখিক সাহিত্যের পরিণত লেখ্যরূপ বলেই, মঙ্গালকাব্যে বিস্তৃত লোকজীবনের প্রভাব অতিমাত্রায় বিদ্যামান। একমাত্র দেব-দেবীর অলৌকিক কার্যকলাপ বাদ দিলে বাস্তব জীবন

জটিলতার প্রত্যক্ষ উপস্থিতি বাংলা মঙ্গালকাব্যেই প্রথম বিস্তারিতভাবে ধরা পড়ে। স্বভাবতই জীবনের দাবি মেটাতে গিয়ে মঙ্গালকাব্যের পরিসর হয়ে পড়ে বহুমুখী ও বৃহৎ। সেখানে জন্ম থেকে মৃত্যু, বন্ধুতা থেকে শত্রুতা, সংসার জীবন থেকে সাংসারিক বিচ্ছেদ, বিবাহ, বৈধব্য, সতীন সমস্যা, অলৌকিক বিশ্বাস, যুদ্ধ বর্ণনা, বিভিন্ন বস্তুর দীর্ঘ তালিকা বর্ণনা, স্থান-নামের উল্লেখ প্রভৃতি বিবিধ বিষয়ের সহাবস্থান কাহিনির গঠনরূপকে অনেকটাই জটিল করে তোলে। এমতাবস্থায় বিশ্বের লোককাহিনিতে প্রযুক্ত রূপতাত্ত্বিক সূত্র প্রয়োগ পদ্ধতির দ্বারাই মঙ্গালকাব্যের যথার্থ গঠনগত বিশ্লেষণ করা সম্ভব। কারণ লোকজীবনকেন্দ্রিক বিশাল গতিময় বিষয় চর্চা আর বাংলা মঙ্গালকাব্যগুলি, উভয়ই সমধর্মী।

রূপতাত্ত্বিক বিশ্লেষণ পদ্ধতিতে, বিশ্বের যে কোনো লোক-কাহিনিকে একাধিক যুক্তিসঙ্গাত ভাগে ভেঙে নিয়ে তারপর কাহিনির অন্তর্গত ক্রিয়াশীলতার মধ্যে মিলযুক্ত অংশকে খুঁজে বের করাই প্রধান রীতি। পাশ্চাত্য লোকসাহিত্য গবেষকরা এই কাজটিকে নিপুণ যুক্তি সহকারে করেছেন। তাঁদের মধ্যে অন্যতম অ্যান্টি আর্নে, স্টিথ টমসন, ভ্লাদিমির জে. প্রপ, লেভি, স্ট্রস, অ্যালান ডানডেস্‌, রঁল্যা বার্তে এবং আরো অনেকে। তাঁদের সকলের আলোচনার নির্যাসটুকু আসলে একটি অভিন্ন সংগঠনতত্ত্বের সারাৎসার নির্মাণ করেছিল। পারস্পরিক আলোচনার সূত্রে বোঝা যায়, কোনো বিশ্লেষক কারও মতামতকে উপেক্ষা করে নিজের সিদ্ধান্ত প্রতিষ্ঠা করতে চাননি; তুলনায় সকলেই চেষ্টা করেছেন রূপতাত্ত্বিক আলোচনার সূত্রগুলোকে আরও উন্নত ও সরলভাবে সাজিয়ে ভবিষ্যৎ আলোচনার পথকে সুগম করতে। বর্তমান নিবন্ধে বাংলা মঙ্গালকাব্যে লোককথার সূত্র প্রয়োগ করে, আমরা পূর্বোক্ত গবেষকদের সেই প্রচেষ্টাকেই আরও একধাপ এগিয়ে দেবার প্রয়াস করব।

গঠনগত বিশ্লেষণের সূত্র অনুযায়ী লোককথার ক্ষেত্রে সবচেয়ে পুরানো পদ্ধতি হল ঐতিহাসিক-ভৌগোলিক পদ্ধতি, যার পথ ধরে দেখা দিল 'টাইপ' ও 'মোটিফ' বিচার পদ্ধতি। দেশ-কাল ও সমাজ নিরপেক্ষভাবে যেকোনো লোককাহিনির বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ করতে গেলে সবার প্রথমে প্রয়োজন 'টাইপ' ও 'মোটিফ' চিহ্নিত করা। এ প্রসঙ্গে প্রথমেই বুঝে নেওয়া উচিত 'টাইপ' ও 'মোটিফ' আসলে কী?

সংক্ষেপে বলা চলে, যেকোনো কাহিনির মূল বা কেন্দ্রীয় অভিপ্রায় হল 'টাইপ' এবং কাহিনির অন্তর্গত ছোটো ছোটো অসংখ্য অভিপ্রায়গুলি হল 'মোটিফ'। টাইপ ইনডেক্স প্রবক্তা অ্যান্টি আর্নের মতে একটি গল্পের মূল আধার স্বরূপ যে সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ এক মেজাজ ফুটে ওঠে, সেটাই টাইপ। কিন্তু টাইপ সূচির মধ্যে গল্পের সম্পূর্ণ যাত্রাপথের বা বাঁকের হদিশ মেলে না, তার জন্য আমাদের মোটিফের দ্বারস্থ হতে হয়। মোটিফ ইনডেক্স প্রবক্তা স্টিথ টমসনের মতে— লোককথাকে ভাঙলে তার একাধিক কাহিনি অংশ পাওয়া যায়, সেই ছোটো ছোটো অংশ বা অভিপ্রায়গুলিকে মোটিফ বলা চলে। অনেকগুলি মোটিফের সুসজ্জিত বিন্যাসে একটি গল্প গড়ে ওঠে। এ প্রসঙ্গে কয়েকটি লোককাহিনির বিশ্লেষণ নীচে করা হল—

১ নং কাহিনি

পাঁচ ভাই এক বোন। বোন শাক কাটতে গিয়ে আঙুল কেটে ফেলল। রক্তমাখা রান্না শাক খেয়ে পাঁচ ভাই খুব খুশি। তারা বোনের মাংস খেতে চাইল। শ্বশুরবাড়ি যাওয়ার পথে তারা তীর ধনুক দিয়ে বোনকে মেরে ফেলল। চার ভাই বোনের মাংস খেল, ছোটো ভাই তার ভাগের মাংস মাটিতে পুঁতে দিল। সেখানে হল এক চাঁপা ফুলের গাছ। শ্বশুর সব জেনে চার ভাইকে পাষাণ করে দিল। (বাংলার লোকসাহিত্য, চতুর্থ খণ্ড, আশুতোষ ভট্টাচার্য, প্রথম সংস্করণ, ১৯৬৬, ক্যালকাটা বুক হাউস, পৃ. ৬৫৯-৬৬০)

১নং কাহিনিতে মোটিফ :

১। ডি ২১২ রূপ পরিবর্তন : মানুষ থেকে ফুল

২। ই ৫২ যাদুবলে পুনর্জীবন লাভ

৩। কে ২২১১ বিশ্বাসঘাতক ভাইয়েরা

৪। পি ২৫৩ ভাই ও বোন

২ নং কাহিনি

গরিব ভাইবোন ছাগল চরিয়ে খায়। রাজার বাড়ির ফুল তুলতে গিয়ে রাজপুত্রের সঙ্গো বোনের বিয়ে হল। শাশুড়ি দেখতে পারে না বউকে, রোজ সাপ রান্না করে খাওয়ায়। বউ সাপ হয়ে গেল। সে এক বাঁধের ধারে চলে গেল। ভাই থাকে পাড়ে, সে থাকে জলে। সাপের এক ছেলে হল, ছেলে থাকে ভাইয়ের কাছে। রাজপুত্র খোঁজ পেয়ে সাপের খোলস থেকে উদ্ধার করল। শেষে মাকে গর্তে পুঁতে ফেলল। (ঐ, পৃষ্ঠা : ৬৬১-৬৬২)

২ নং কাহিনিতে মোটিফ :

১। ডি ১৯১ রূপ পরিবর্তন : মানুষ থেকে সাপ

২। এল ১১১.৪.২ পিতৃমাতৃহীন নায়িকা

৩। আর ১৫১.৪ স্বামী হারিয়ে-যাওয়া বউকে উদ্ধার করে

৪। এস ৫১ নিষ্ঠুর শাশুড়ি

৩ নং কাহিনি

বামুনের মেয়েরা নদীতে স্নান করতে যায়। এক বানর পাড়ে রাখা কাপড় নিয়ে গাছে চড়ে। তারা কাপড় ফেরত চায়। বানর কাপড় দেবে যদি ছোটো বোনের সঙ্গো বিয়ে দেয়। বানরের সঙ্গো ছোটো বোনের বিয়ে হয়। বানর বউকে নিয়ে পথ হাঁটে। সাত রাজার দেশ পেরিয়ে আমপাতায় ছাওয়া ঘরের পাশে এল। বানর রাতে মানুষ হয়, দিনে বানর। বউ একদিন বানরের খোলস পুড়িয়ে দিল। (ঐ, পৃষ্ঠা : ৭০৭-৭০৮)

৩ নং কাহিনিতে মোটিফ :

১। বি. ২১১.২.১০ কথাবলা বানর

২। ডি ৬২১.১ দিনে পশু রাতে মানুষ

৩। ডি ৭২১.৩ যাদুমুক্ত করতে খোলস পুড়িয়ে ফেলা

৪ নং কাহিনি

এক ছিল ব্যাধ আর তার বউ। একদিন ব্যাধের ফাঁদে পড়ল সুন্দর এক কথাবলা হীরামন পাখি। রাজার কাছে বিক্রি করতে গেলে পাখি তার দাম বলল দশ হাজার টাকা। রাজা পাখি কিনলেন। রাজার ছয় রানি। রাজা পাখিকে খুব ভালোবাসেন বলে রানিদের খুব হিংসে। রানিরা তাকে মারতে গেলে সে সাত সমুদ্র তেরো নদীর পারের এক সুন্দরীর প্রশংসা করে উড়ে পালিয়ে গেল। রাজা মৃগয়া থেকে ফিরে এলে পাখি আবার এল। পক্ষিরাজে চেপে রাজা ও হীরামন সাত সমুদ্র তেরো নদীর পারে গেলেন। অনেক বাধা পেরিয়ে হীরামনের সাহায্যে সেই সুন্দরী মেয়েকে বিয়ে করে রাজা দেশে ফিরে এলেন। (দ্য স্টোরি অব হীরামন, পৃষ্ঠা:২০৯-২১৯)

৪ নং কাহিনিতে মোটিফ :

১। বি ১৪৩ জ্ঞানী পাখি

২। বি ২১১..৩ কথাবলা পাখি

৩। বি ৩৩৫.৩ শত্রু উপকারী পশুকে হত্যা করতে ব্যর্থ হয়

৪। টি ২৫৭.১১ রাজা পাখিকে বেশি ভালোবাসেন বলে রানিরা হিংসে করে

উপরিবর্ণিত ১ থেকে ৪ নং গল্পে বিভিন্ন সংখ্যাচিহ্নিত মোটিফগুলির পারস্পরিক বিন্যাসে কাহিনির তারতম্য চিহ্নিত করা যায়। এভাবেই এক একটি মঙ্গলকাহিনি গড়ে ওঠে ভিন্ন ভিন্ন মোটিফের সহাবস্থানে। বাংলা মঙ্গলকাব্যের ইতিহাস রচয়িতা আশুতোষ ভট্টাচার্য মহাশয় তাঁর বিখ্যাত গবেষণা গ্রন্থে মঙ্গলকাব্যে লোককথার সূত্র প্রয়োগ করতে গিয়ে এই মোটিফগুলিকেই খুঁজে বের করার প্রয়াস করেছেন। (দ্রষ্টব্য, 'লোক-কথা ও মঙ্গলকাব্য' বিষয়ক আলোচনা। বাংলা মঙ্গলকাব্যের ইতিহাস, আশুতোষ ভট্টাচার্য, দশম সংস্করণ, এপ্রিল ২০০২, পৃষ্ঠা : ১২১-২৭)। যদিও প্রধান তিন ধারার মঙ্গলকাহিনিকে পাশাপাশি রেখে সুসজ্জিত মোটিফ বিন্যাসের কাজটি অধ্যাপক ভট্টাচার্য নিজে না করে পরবর্তী গবেষকের হাতে ছেড়ে দিয়েছেন। আমরা সেই কাজটিকেই পরিকল্পিতভাবে করার পাশাপাশি বাংলা মঙ্গলকাব্যের বেশকিছু আবশ্যিক মোটিফের অনুসন্ধান করব।

এক্ষেত্রে আরও একটি কথা বলে রাখা ভাল যে, আমাদের এই রচনার উদ্দেশ্য কখনই বাংলা মঙ্গলকাব্যের মোটিফ অনুসন্ধান নয়। এমন আলোচনা ইতিপূর্বে বহুবার বিভিন্ন প্রতিষ্ঠিত প্রাবন্ধিকের রচনায় উঠে এসেছে। আমরা কেবল এই পদ্ধতির সুসজ্জিত প্রয়োগ কৌশলটিকেই বোঝবার চেষ্টা করব। পাশাপাশি মঙ্গলকাব্যের মতো বহুমুখী জটিল কাহিনিধারাকে একটি নির্দিষ্ট সূত্রে গেঁথে নিয়ে, এর অন্তর্গত সাংগঠনিক পরিকাঠামোর চমৎকারিত্ব আবিষ্কার করব।

বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গিতে কোনো কিছুর সূত্র আবিষ্কার করতে হলে তার বাহ্যিক পরিধিকে চিহ্নিত করা প্রথম কাজ। পরবর্তী পদক্ষেপ অভ্যন্তরীণ বিচার-বিশ্লেষণ, ঠিক একইরকমভাবে

আমাদের প্রথমেই প্রয়োজন প্রধান তিন ধারার মঙ্গালকাহিনির উল্লেখ। এরপর সেই তিন প্রকার কাহিনির অভ্যন্তরস্থ মোটিফ আবিষ্কার করে তার সুসজ্জিত বিন্যাসের মাধ্যমে বাংলা মঙ্গালকাব্যের নির্দিষ্ট গঠনগত সূত্র আবিষ্কার করতে হবে। এই উপলক্ষ্যে তিনপ্রকার মঙ্গালকাহিনির সংক্ষিপ্ত গল্পরূপ প্রথমে উল্লেখ করা হল।

কাহিনি ১ : 'মনসামঙ্গাল'— মা মনসাকে স্বপ্নে দেখে কবি কাব্য লিখতে শুরু করেন এবং কাব্যের শুরুতেই ভবিষ্যতে দেবীর পূজাপ্রাপ্তির পটভূমি রচিত হয়। দেবীর ইচ্ছাতেই চাঁদ সদাগরের জীবনে দুর্ভাগ্যের কালো মেঘ নেমে আসে। এদিকে প্রবল জেদী পুরুষের সাথে দেবী মনসার বিরোধ এমন পর্যায়ে চলে যায় যে দেবীর অলৌকিক শক্তির পরিচয় পাওয়া সত্ত্বেও তাঁকে না মেনে নেওয়ায় চাঁদের ধন-সম্পত্তি ও বাণিজ্যতরী ইত্যাদি নষ্ট হয়। এমনকী তাঁর ছয় পুত্রেরও অকাল মৃত্যু ঘটে, অবশেষে কনিষ্ঠ পুত্র লখিন্দরের মৃত্যুর পর দৃঢ়চিত্ত চাঁদ বিমর্ষ হয়ে পড়েন। কিন্তু দেবীর কৃপায় কনিষ্ঠপুত্র সমেত সকলে প্রাণ ফিরে পেলে পুনর্মিলনের মাধ্যমে কাহিনি শেষ হয়। শেষ পর্যন্ত মনসার নিজের পূজা পাওয়ার ইচ্ছা চরিতার্থ হয় এবং চাঁদের হাতে পুষ্পাঞ্জলি পান দেবী।

কাহিনি ২ : 'চণ্ডীমঙ্গাল'— মাতৃবেশে আবির্ভূতা দেবী চণ্ডীকে স্বপ্নে দেখে কবি কাব্য লেখা শুরু করেন এবং কাব্যের শুরুতেই ভবিষ্যতে দেবীর পূজাপ্রাপ্তির পটভূমি বর্ণিত হয়। দেবী নিজের ইচ্ছাতেই তাঁর অনুগত ভক্তদের প্রতি কৃপা আর অবাধ্যদের প্রতি অবহেলা প্রদর্শন করেন। সেই কারণেই কালকেতু, শ্রীমন্ত প্রমুখ দেবীর সাহায্য লাভে ধন্য হয়েছে অন্যদিকে ভাঁড়ু দত্ত, ধনপতি প্রমুখ বিপর্যয়ের অতলে নিমজ্জিত হয়েছেন। অবশ্য চাতুর্য ও শঠতায় ধনপতি কখনই ভাঁড়ু দত্তের মতো জীবন্ত হয়ে ওঠেনি। ধনপতির সাথে দেবীর বিরোধ ব্যক্তিত্বের। সে ক্ষেত্রে দেবীর যেমন ইচ্ছা মর্ত্যে পূজা প্রচারের জন্য ধনপতির কাছ থেকে পূজা নেবেন, তেমনই ধনপতির জেদ এই যে শিবের ভক্ত বলে তিনি চণ্ডীপূজা দেবেন না। এই কাব্যের প্রথমাংশেই দেখি কালকেতু দেবী চণ্ডীর অনুগত হয়ে সামান্য ব্যাধনন্দন থেকে সৌভাগ্যের শিখরে উঠেছিল কিন্তু ধনপতি দেবীকে অগ্রাহ্য করে, তাঁর পূজার ঘটে লাথি মেরে দেবীর কোপে পড়লেন। বাণিজ্য করতে গিয়ে দক্ষিণ পাটনে রাজা সালবানের হাতে বন্দি হলেন। অবশেষে তাঁর একমাত্র পুত্র চণ্ডীর অনুগত ভক্ত শ্রীমন্তের সহযোগিতায় বন্দিদশা থেকে মুক্তি পেয়ে পুনরায় স্ত্রী-পুত্রের সাথে মিলিত হলেন। এরপর ধনপতি যখন বুঝতে পারলেন দেবীর কৃপাতেই তাঁর মুক্তি ঘটেছে তখন আর দেবীকে অবজ্ঞা না করে নিষ্ঠা সহকারে পূজার উদ্দেশে পুষ্পাঞ্জলি অর্পণ করলেন। অর্থাৎ সামগ্রিকভাবে দেখতে গেলে দেবীর ইচ্ছাই সার্থকতা লাভ করেছে আলোচ্য কাহিনিতে।

কাহিনি ৩ : 'ধর্মমঙ্গাল'— কাব্যের শুরুতেই লাউসেনের মাধ্যমেই মর্ত্যে ধর্মঠাকুরের পূজা প্রচার বৃত্তান্ত বর্ণিত। ধর্মের কৃপায় মর্ত্যে রঞ্জাবতীর গর্ভে অলৌকিক উপায়ে বীরপুত্র লাউসেনের জন্ম হয়। বিদ্যা-বুদ্ধি-বলে অভাবনীয় ক্ষমতার অধিকারী হয়ে ওঠেন লাউসেন, বীরত্ব ও সাহসে তাঁর কাছে সকলে পরাস্ত হয়। এদিকে লাউসেনের ক্ষতি কামনা করে তাঁর নিজের মামা মহামদ নানা প্রকার কুৎসিত চাল চাললেও ধর্মের কৃপায় সমস্ত প্রতিকূল

পরিস্থিতি কাটিয়ে ওঠেন লাউসেন। এমনকি গৌড়েশ্বরের রাজসভায় সকলের সামনে পশ্চিমে সূর্যোদয় দেখানোর প্রতিশ্রুতিও সফলভাবে পালন করলে মহামদের সামগ্রিক পরাজয় ঘটে। ধর্মঠাকুরের একনিষ্ঠ ভক্ত লাউসেনের জয় সূচিত হয়। অন্যদিকে অধর্মের পথে চলার জন্য মহামদের পরাজয় ও শাস্তি হয়। কাব্যশেষে ধর্মের কৃপাতেই লাউসেনের গড় আত্মরক্ষার্থে মৃত ব্যক্তিবর্গ সকলে পুনর্জীবন ফিরে পান এবং নিকট জনের সাথে আবার পুনর্মিলন ঘটে। এরপর লাউসেন ধর্মের নির্দেশেই মর্ত্যলোক পরিত্যাগ করে স্বর্গলোকে প্রত্যাবর্তন করে। সামগ্রিকভাবে তাই বলা যায় কাহিনিতে সর্বাংশে ধর্মঠাকুরের ইচ্ছাই চরিতার্থ হয়েছে, কেননা লাউসেনের মাধ্যমেই মর্ত্যে ধর্মঠাকুরের পূজা প্রসার লাভ করেছে।

উপরিবর্ণিত তিন ধারায় মঙ্গলকাহিনির যে সংক্ষিপ্ত বিবরণী উপস্থাপিত হল তাকে বলা যায় কাহিনিগুলির বাহ্যিক রূপ। বলাই বাহুল্য এই বাহ্যিক রূপের অন্তরালে অসংখ্য ছোটো ছোটো অভিপ্রায় যুক্ত হয়ে এর অন্তর্গত কাহিনির চমৎকারিত্ব বৃদ্ধি করেছে। আমাদের প্রধান কাজ সেই অভিপ্রায় বা মোটিফগুলিকে সর্বপ্রথমে সংগ্রহ করা। এক্ষেত্রে প্রতিটি ধারায় প্রচলিত কবির মূল বা আদর্শ গ্রন্থ পাঠ করে অতি সচেতনভাবে একের পর এক মোটিফগুলিকে সাজাতে হয়। পাশাপাশি প্রত্যেক কাহিনিতে কোন্ মোটিফের পর কোন্ মোটিফ আসবে তারও একটা নির্দিষ্ট ক্রম গঠন করা হয়। এই প্রক্রিয়ার সবচেয়ে বড়ো বৈশিষ্ট্য বাংলা সাহিত্যের মধ্যযুগে প্রচলিত মঙ্গলকাহিনিগুলির অনুকূলে লোককাহিনির সূত্র আবিষ্কার। ব্যাপারটিকে আরও স্পষ্টভাবে বুঝতে হলে মনসা, চণ্ডী ও ধর্মমঙ্গালের অভ্যন্তরস্থ মোটিফসূচি প্রথমে উল্লেখ করা প্রয়োজন। প্রবন্ধে স্থানাভাবের বিষয়টি মাথায় রেখে আমরা কেবল তিনটি প্রধান প্রধান মঙ্গালকাব্যের মোটিফসূচি ছকের মাধ্যমে নির্দিষ্ট করলাম। কিন্তু আগ্রহী পাঠক মূল কাহিনির অভ্যন্তরস্থ অভিপ্রায়গুলি (কাহিনির অংশবিশেষ) অবশ্যই বই থেকে দেখে নেবেন। মোটিফসূচি অনুযায়ী মঙ্গালকাব্যের গঠন বিন্যাসটি নিম্নরূপ।

ক। মনসামঙ্গাল কাব্যের মোটিফ—

১। মোটিফ : এস ৩১৩ শিশুর অস্বাভাবিক জন্ম-রহস্য ফাঁস।
২। মোটিফ : এফ ১১ আকাশ পথে যাত্রা।
৩। মোটিফ : এ ১৩৬.১৩ বৃষবাহন দেবতা।
৪। মোটিফ : এফ ৫৭৫.১ পরম রূপবতী কন্যা।
৫। মোটিফ : ডি ৬৯০ বার বার রূপ পরিবর্তন।
৬। মোটিফ : ডি ১৭১১ যাদুকর।
৭। মোটিফ : টি ৫২ ঘটক।
৮। মোটিফ : ডি ১৭১২ ভবিষ্যৎ বক্তা।
৯। মোটিফ : টি ১২১ অসম বিয়ে।
১০। মোটিফ : ডি ১৬৫২ ৩.১ কামধেনু।

১১। মোটিফ : এম ৩৪১. ১.১.১ ভবিষ্যৎবাণী, বিয়ের পর মৃত্যু হবে।
১২। মোটিফ : এল ১২ প্রিয় কনিষ্ঠ পুত্র।
১৩। মোটিফ : সি ৫০ নিষেধাজ্ঞা দেবতাকে বিরূপ করে।
১৪। মোটিফ : সি ৯৩০ নিষেধাজ্ঞাভঙ্গোর জন্য ভাগ্যহীন।
১৫। মোটিফ : এফ ৬১০ অস্বাভাবিক শক্তিমান মানুষ।
১৬। মোটিফ : জেড ৭১.২ সংকেত সংখ্যা, চার।
১৭। মোটিফ : জেড ৭১.৫ সংকেত সংখ্যা, সাত।
১৮। মোটিফ : সি ৯২১ নিষেধাজ্ঞা ভঙ্গোর জন্য তৎক্ষণাৎ মৃত্যু।
১৯। মোটিফ : বি ৪৫১.৪ উপকারী কাক।
২০। মোটিফ : ডি ১২৪২.১ যাদু জল।
২১। মোটিফ : ডি ৯৭৫ যাদু ফুল।
২২। মোটিফ : ই ০ পুনর্জীবন।
২৩। মোটিফ : এল ৪৫১ পুনর্মিলন।
২৪। মোটিফ : এম ৩৬৯২.১ ভাবী স্বামী-স্ত্রী সম্পর্কে ভবিষ্যৎবাণী।
২৫। মোটিফ : এন ৮১০ অলৌকিক সাহায্যকারী।
২৬। মোটিফ : আর ১৫২ বউ স্বামীকে উদ্ধার করে।
২৭। মোটিফ : ডি ১৭১৩ সাধুর যাদুশক্তি।

খ। চণ্ডীমঙ্গাল কাব্যের মোটিফ—

১। মোটিফ : ডি ১৭১২ ভবিষ্যৎ বক্তা।
২। মোটিফ : এফ ৫৭৫.১ পরম রূপবতী কন্যা।
৩। মোটিফ : ডি ৬৯০ বার বার রূপ পরিবর্তন।
৪। মোটিফ : ডি ১২৪২.১ যাদু জল।
৫। মোটিফ : ডি ২১০০ যাদু সম্পদ।
৬। মোটিফ : কিউ ৪৮৮.২ শাস্তি, মাথা মুড়িয়ে দেওয়া।
৭। মোটিফ : টি ২৫৭.২ সতীনের প্রতি হিংসে।
৮। মোটিফ : এইচ ১৫৭৩ ধর্মীয় পরীক্ষা।
৯। মোটিফ : সি ৯৩০ নিষেধাজ্ঞা ভঙ্গোর জন্য ভাগ্যহীন।
১০। মোটিফ : জেড ৭১.৫ সংকেত সংখ্যা সাত।
১১। মোটিফ : বি ২১১.৩.৪ কথা বলা শুকপাখি।
১২। মোটিফ : ই ০ পুনর্জীবন।
১৩। মোটিফ : এফ ১১ আকাশ পথে যাত্রা।
১৪। মোটিফ : এল ৪৫১ পুনর্মিলন।

গ। ধর্মমঙ্গাল কাব্যের মোটিফ—

১। মোটিফ : ডি ১৭১২ ভবিষ্যৎবক্তা।

২। মোটিফ : ডি ৬১০ বারবার রূপ পরিবর্তন।
৩। মোটিফ : এফ ৫৭৫.১ পরম রূপবতী কন্যা।
৪। মোটিফ : টি ৫১১ কিছু খেয়ে গর্ভবতী হওয়া।
৫। মোটিফ : এইচ ১৫৭৩ ধর্মীয় পরীক্ষা।
৬। মোটিফ : ডি ১২৪২.১ যাদু জল।
৭। মোটিফ : ই ০ পুনর্জীবন।
৮। মোটিফ : সি ৯৩০ নিষেধাজ্ঞা ভঙ্গের জন্য ভাগ্যহীন।
৯। মোটিফ : টি ৫৩ ঘটক।
১০। মোটিফ : জেড ৭১.৯ সংকেত সংখ্যা, তেরো।
১১। মোটিফ : জেড ৭১.৫ সংকেত সংখ্যা, সাত।
১২। মোটিফ : ডি ১৯৬০ যাদু ঘুম।
১৩। মোটিফ : কিউ ৪৮৮.২ শাস্তি, মাথা মুড়িয়ে দেওয়া।
১৪। মোটিফ : বি ২১১.৩৪ কথাবলা শুকপাখি।
১৫। মোটিফ : কিউ ২২০ অধর্মের শাস্তি।
১৬। মোটিফ : কিউ ২০ ধর্মানুরাগের পুরস্কার।
১৭। মোটিফ : সি ৩৪৫ বিবাহ।
১৮। মোটিফ : টি ২৫৭.২ সতীনের প্রতি হিংসে।
১৯। মোটিফ : বি ২৪০.৫ বাঘ।
২০। মোটিফ : কে ৩০০.১ চোর।

কাহিনির ক্রম অনুসারে উল্লেখিত ভিন্ন ভিন্ন কবির রচিত মঙ্গলকাব্যে নির্দিষ্ট কিছু মোটিফ-সূচির ব্যবহার স্পষ্টতই কাব্যটির সংরূপগত পার্থক্যকে চিহ্নিত করতে সাহায্য করবে। আলোচনার সুবিধার জন্য উল্লেখিত ছকে মোটিফসূচির যে সংক্ষিপ্ত বিভাজন করা হয়েছে, তাতে বাংলা মঙ্গলকাব্যের গঠনগত ঐক্যও স্পষ্টভাবে বোঝা সম্ভব। ধরা যাক, মনসামঙ্গলকাব্যের মূল কাহিনিতে ব্যবহৃত মোটিফসূচি হল এরকম—

ক। পদ্মবনে ষোড়শ বর্ষীয়া কুমারী নারীর প্রতি শিবের ভোগলিপ্সার আকাঙ্ক্ষায় জানা গেল সেই নারীর অস্বাভাবিক জন্ম-রহস্যের কথা। আসলে সেই নারীই মনসা, শিবের অযোনীসম্ভূতা সন্তান। (১)

খ। খামখেয়ালি আপনভোলা দেবতার কন্যা মনসা, যাঁর পিতা বৃষবাহনে আকাশপথে যাত্রা করেন। (২/৩)

গ। মনসার উজ্জ্বল আকর্ষণীয় রূপে মুগ্ধ হয়ে তাঁর সাথে কামবাসনা চরিতার্থ করতে চান শিব। (৪)

ঘ। বাধ্য হয়ে মনসা নিজের আসল রূপের পরিচয় দেন, এভাবেই বারবার রূপ পরিবর্তন করে নিজেকে দেবকন্যা হবার দাবি সুপ্রতিষ্ঠিত করেন মনসা। (৫)

ঙ। অলৌকিক শক্তির অধিকারিণী মনসা স্বকীয় ক্ষমতা প্রয়োগের ক্ষেত্রে যাদুশক্তির সাহায্যও গ্রহণ করেন। (৬)

চ। মেয়ের পরিচয় পাবার পর উপযুক্ত সুপাত্রে কন্যাদান করার জন্য ঘটক নিয়োগ করেন শিব। (৭)

ছ। মানুষের নির্বাচিত পাত্র রূপে জানা যায় সিদ্ধযোগী ব্রহ্মচারী পুরুষ জরুৎকারু মুনির কথা। (৮)

জ। জীবনসুখে নির্লিপ্ত পুরুষের সাথে বিয়ে হওয়ায় মনসার ভবিষ্যৎ জীবন অপ্রাপ্তির অতলে বিলীন হয়। (৯)

ঝ। স্বামী-সংসারহীন মনসা দিনে দিনে ক্রূর প্রকৃতির হয়ে পড়ায় তাঁর সন্তানদের তৃষ্ণা নিবারণের জন্য কামধেনু গাই প্রেরণ করা হয়। (১০)

ঞ। মনসার কোপের বিরুদ্ধে প্রবল প্রত্যয়ী পুরুষ চাঁদ সদাগরের আগমন এবং চাঁদের প্রতি মনসার নিষেধাজ্ঞা জারি। (১৩)

ট। মনসার প্রতি বিরুদ্ধাচরণের মাধ্যমে চাঁদ সদাগর নিষেধাজ্ঞা ভঙ্গ করেন, এবং এর জন্য চরম ভাগ্যবিপর্যয়ের মধ্যে পড়েন। (১৪)

ঠ। চরম দুঃখ কষ্টের মধ্যেও ধৈর্য্য হারিয়ে মনসার পায়ে ভেঙে পড়েননি চাঁদ সদাগর। (১৫)

ড। মনসার বিরুদ্ধে গিয়ে একে একে সাত পুত্রকে হারান চাঁদ। (১৭)

ঢ। কনিষ্ঠ পুত্র লখিন্দরের মৃত্যুতে ভেঙে পড়েন বণিক কিন্তু ছোটো বউ দায়িত্ব নিয়ে তার মৃত স্বামীর প্রাণ ফিরিয়ে আনে। দেবীকে সন্তুষ্ট করে মন্ত্রসিদ্ধ জল ও ফুলের সংস্পর্শে স্বামীর পুনর্জীবন ফিরে পায় বেহুলা। (২০/২১/২২)

ণ। কনিষ্ঠ পুত্রকে ফিরে পেয়ে বামহস্তে মনসাকে পুষ্পাঞ্জলি অর্পণ করেন চাঁদ সদাগর। এদিকে মনসাও সব বিরোধ মিটিয়ে একে একে চাঁদের সব পুত্রের জীবন দান করেন। অবশেষে পরিবারের সকলের সাথে পুনর্মিলন ঘটে। (২৩)

মোটিফ-এর ছক অনুযায়ী এখানে উল্লেখিত কাহিনিক্রম যথাক্রমে এভাবে এসেছে:

ক। ১ > খ। ২/৩ > গ। ৪ > ঘ। ৫ > ঙ। ৬ > চ। ৭ > ছ। ৮ > জ। ৯ > ঝ। ১০ > ঞ। ১৩ > ট। ১৪ > ঠ। ১৫ > ড। ১৭ > ঢ। ২০/২১/২২ > ণ। ২৩।

পাশাপাশি চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের পূর্ণাঙ্গ কাহিনিতে ব্যবহৃত মোটিফ সূচিঅনুযায়ী কাহিনির ক্রম পরম্পরাটি হল এই রকম—

ক। মর্ত্যে দেবী চণ্ডীর পূজা প্রচলন বিষয়ে উভয় খণ্ডে ভক্তবৃন্দের (কালকেতু ও খুল্লনা) অবদান সম্পর্কে ভবিষ্যৎ বৃত্তান্ত বর্ণিত হয়েছে। (১)

খ। প্রথম খণ্ডে দেবী চণ্ডীর রূপ এবং দ্বিতীয় খণ্ডে খুল্লনার রূপ, নারীদেহের সৌন্দর্যের প্রতীকরূপে বর্ণিত হয়েছে। (২)

গ। দেবী চণ্ডী অলৌকিক ক্ষমতার সাহায্যে নিজের কার্যসিদ্ধির উদ্দেশ্যে বারবার রূপ পরিবর্তন করেছেন। (৩)

ঘ। নিজের উদ্দেশ্যসিদ্ধির লক্ষ্যে দেবী চণ্ডী যাদুজল ও যাদুসম্পদ ব্যবহার করেন। (৪/৫)

ঙ। সর্বক্ষমতাময়ী দেবী চণ্ডীর অন্যতম প্রধান কৃপার পাত্র কালকেতুর সাথে শঠতার প্রাপ্য স্বরূপ ভাঁড়ু দত্তের মাথা মুড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। (৬)

চ। বণিক খণ্ডে দেবী চণ্ডীর কৃপার পাত্রী খুল্লনার সংসার জীবনে ভয়াবহ সতীন সমস্যা দেখা দিলে দেবীর কৃপাতেই তা দূর হয়। শাস্তিস্বরূপ লহনা ধনপতির কাছে লাঞ্ছিতা হয়ে সম্বিৎ ফিরে পায়। (৭)

ছ। লহনার নিষ্ঠুর চক্রান্তে পড়ে খুল্লনা কলঙ্কের অভিধা মাথায় নিয়ে কঠিন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়। অবশেষে নিজের স্বামী ও সমাজের কাছে তার সতীত্ব প্রমাণিত হয়। (৮)

জ। খুল্লনার নিষ্ঠা ও ভক্তি দেবী চণ্ডীর প্রতি অবিচলিত থাকলেও, তার স্বামী ধনপতি দেবীর বিরুদ্ধাচরণ করে। ফলত দেবী ক্ষুব্ধ হন ধনপতির প্রতি; তাঁর পূজা না করলে ধনে-জনে উৎখাত করার কথাও বলেন। (৯)

ঝ। দেবীকে উপেক্ষা করে ধনপতি সপ্ত ডিঙা নিয়ে বাণিজ্যে যাত্রা করেছে। (১০)

ঞ। ধনপতি বাণিজ্য করার জন্য গৃহ পরিত্যাগ করে অন্যত্র গমন করেছেন, পাশাপাশি রাজার নির্দেশে কথাবলা শুকপাখির খাঁচার কারিগর সন্ধানের জন্য গৃহবিমুখ হয়েছেন, আর এই সুযোগকে কাজে লাগিয়ে খুল্লনার ওপর দৈহিক ও মানসিক অত্যাচার করেছে লহনা। (১১)

ট। খুল্লনার পুত্র শ্রীমন্ত বড়ো হয়ে মায়ের মতোই একনিষ্ঠ দেবীভক্ত হয়েছে। মায়ের কষ্ট দূর করে সৌভাগ্য ফিরে পাবার আশায় বিদেশ গমন করেছে। কিন্তু বিদেশে গিয়েই চরম বিপর্যয়ের মুখে পড়েছে শ্রীমন্ত। দক্ষিণ পাটনের রাজা সালবানকে কমলে-কামিনী মূর্তি না দেখাতে পেরে, রাজরোষ থেকে বাঁচার আশায় দেবী চণ্ডীকে স্মরণ করেছে। অতঃপর দেবীর সহায়তায় বিশাল রাজসৈন্যকে পরাস্ত করে পুরস্কার স্বরূপ রাজকন্যা সুশীলাকে বিবাহের অধিকার লাভ করেছে। রাজার সাথে সমস্ত বিবাদ মিটে যাবার পর দেবীর কৃপায় মৃত সৈন্যগণের প্রাণও ফিরিয়ে এনেছে শ্রীমন্ত। (১২)

ঠ। রাজকন্যাকে বিয়ে করে প্রভূত সম্পদের অধিকার লাভ করবে জেনেও শ্রীমন্ত মনের দিক থেকে কিছুতেই খুশি হতে পারেনি। কারণ তার আসল উদ্দেশ্য পিতা ধনপতিকে উদ্ধার করে মায়ের কাছে ফিরিয়ে দেওয়া। পাশাপাশি মাতা-পিতার সাথে একসঙ্গে মিলিত হয়ে সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যে সংসার যাপন করা। অবশেষে দেবীর কৃপায় শ্রীমন্তর এই ইচ্ছা সফল হয়েছে। (১৪)

মোটিফ-সূচি অনুযায়ী এখানে উল্লেখিত কাহিনিক্রমটি হল— ক। ১ > খ। ২ > গ। ৩ > ঘ। ৪/৫ > ঙ। ৬ > চ। ৭ > ছ। ৮ > জ। ৯ > ঝ। ১০ > ঞ। ১১ > ট। ১২ > ঠ। ১৪।

এরপর উল্লেখ করব 'ধর্মমঙ্গল' কাব্যের কাহিনিক্রমটি, আলোচ্য কাব্যের মোটিফসূচি অনুযায়ী কাহিনির ক্রমপরম্পরাটি এরকম—

ক। কাব্যের সূচনাতেই রঞ্জাবতীর মর্ত্যাগমনের কারণ বর্ণিত হয়েছে, তৎসহ লাউসেনের মাধ্যমে ধর্মের পূজা প্রচারের বৃত্তান্ত সু-সংক্ষেপিত করে উপস্থাপিত হয়েছে। (১)

খ। ধর্মঠাকুরের পূজা প্রচারের জন্য স্বর্গ নর্তকী অম্বুবতীকে মর্ত্যে অবতরণের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। কিন্তু বিনা দোষে অম্বুবতীকে অভিশাপ দেওয়া সম্ভব নয় বলে দেবতারা ছলনার আশ্রয় নেন। বৃদ্ধা ব্রাহ্মণী বেশে ছলনা করে পার্বতী অভিশাপ দেন এবং অম্বুবতীকে বাধ্য করেন মর্ত্যে রঞ্জাবতী নাম নিয়ে জন্মগ্রহণ করতে। দেবতাদের কার্যসিদ্ধির প্রয়োজনে এভাবেই রূপপরিবর্তনের মাধ্যমে ছলনা করা প্রতিটি বাংলা মঙ্গালকাব্যের একটি অতিচর্চিত মোটিফ। (২)

গ। স্বর্গনর্তকী অম্বুবতীই মর্ত্যনারী রঞ্জাবতী, যার স্বামী বৃদ্ধ কর্ণসেন আর পুত্র লাউসেন। রঞ্জাবতীর বিবাহ, পুত্রকামনা ইত্যাদিকে কেন্দ্র করেই ধর্মমঙ্গালের নরখণ্ডে কাহিনির সূচনা ও প্রসার। এক কথায় বলা যায় কাহিনির সূচক রঞ্জাবতী, আলোচ্য কাব্যে যার অসামান্য রূপের বর্ণনা করা হয়েছে। (৩)

ঘ। ধর্মঠাকুরের কৃপায় রঞ্জাবতী নারকেল খেয়ে গর্ভবতী হল। (৪)

ঙ। ধর্মের বরপুত্র লাউসেন জন্ম নিলে তার অন্যতম প্রধান সহায় হন ধর্মঠাকুর নিজে। ঠাকুরের কৃপাতেই গৌড় যাত্রার সময় লাউসেন নানাবিধ কঠিন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে ধর্মঠাকুরের প্রতিজ্ঞাকে সুদৃঢ় করে। (৫)

চ। গৌড় যাত্রার সময় নিজের মাতুল মহামদের চক্রান্তে জড়িয়ে পড়লেও ধর্মঠাকুরের কৃপায় লাউসেনের অধিকাংশ প্রতিপক্ষের জীবনহানি ঘটে। অবশেষে লাউসেনের ইচ্ছাতেই জলের ছিটা দিয়ে সকলের প্রাণ ফিরিয়ে দেন ধর্মঠাকুর। (৬/৭)

ছ। ধর্মানুরাগী লাউসেনের প্রতিপক্ষ যেই হোক না কেন তার হার নিশ্চিত। দেবী চণ্ডী এই সত্য উপলব্ধি করেই ইছাই ঘোষকে সতর্কতা জারি করেন। কিন্তু নিষেধাজ্ঞা সত্ত্বেও দেবীর কথা না শুনে লাউসেনের সাথে বিবাদ বাধাবার ফলস্বরূপ ইছাই ঘোষের মৃত্যু ঘটে। (৮)

জ। এদিকে গৌড় অধিপতি সিমুল্যা-কন্যা কানাড়াকে বিবাহের অভিলাষে, ঘটক প্রেরণ করেও তেমন আশানুরূপ ফল না পাওয়ায় মহামদের যুক্তিতে লাউসেনকে পাঠালেন। (৯)

ঝ। লাউসেনকে সমস্ত কঠিন পরীক্ষার মুখোমুখি ফেলেই মহামদ ক্ষান্ত হয়নি,

পাশাপাশি লাউসেনের অনুপস্থিতিতে অতর্কিতে ময়নাগড় আক্রমণ করেছে। অবশ্য আক্রমণের পূর্বে গড়ের সকলকে ঘুম পাড়িয়ে দিয়েছে এবং মহামদের আক্রমণকে বীরত্বের সাথে প্রতিহত করেছে কালুডোম ও তার স্ত্রী। মূলত এই দুই অনুগত বান্ধবের জন্যই ময়নাগড় সর্বাত্মক ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা পেয়েছে। অবশ্য আলোচ্য কাব্যে কালু ডোম ও তার স্ত্রীর বীরত্বের যে সব চিত্র আছে তার মধ্যে অনেক ঘটনাই অবিমিশ্র বীর রসাত্মক নয়, যেন সেসব অনেকটা হাস্যরসের আধারে পরিবেশিত। যেমন কালুর সাত কলসি মদ্যপানের চিত্র এবং তার স্ত্রীর তেরো সন্তানের জননী হবার জন্য গর্ববোধ— এই দুই ঘটনাই বীরত্ব প্রকাশের জন্য উল্লেখিত হলেও চরিত্রের অসামঞ্জস্যতাকেই তুলে ধরেছে। (১০/১১/১২)

ঞ। মহামদের গড় আক্রমণের চক্রান্তে কালু ডোম ও তার স্ত্রীর দ্বারা প্রাথমিকভাবে বাধা পাবার পর বড়ো রকমের বিপর্যয় ঘটেছে কানাড়ার হাতে। মহামদ অবশেষে কানাড়ার কাছে যুদ্ধে হেরে গেছে এবং দেবীর নির্দেশে কানাড়া তার প্রাণ ফিরিয়ে দিলেও মাথা ন্যাড়া করে, জুতোর মালা পরিয়ে গড় থেকে বিতাড়িত করেছে। মহামদ দেবী চণ্ডীর সেবক হওয়া সত্ত্বেও অধর্মের পথে চলার ফলস্বরূপ কঠোর শাস্তি ভোগ করেছে। (১৩/১৫)

ট। অবশেষে মহামদের সমস্ত চক্রান্তে জয়লাভ করে গৌড়ের রাজা-রানির আস্থাভাজন হয়ে ওঠেন লাউসেন। কিন্তু পিতা-মাতার কুশল সংবাদ না জানায় খুবই অস্থির হয় লাউসেনের মন। তখন রাজদরবারে সারী-শুক স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে স্বীকারোক্তি করে যে, তারাই লাউসেনের পিতা-মাতার কুশল সংবাদ নিয়ে আসবে। সারী-শুকের কথায় অবশেষে লাউসেনের মনে শান্তি আসে। (১৪)

ঠ। কাব্যের শেষে ধর্মের অনুরাগী ভক্ত লাউসেনের অভিশাপ মোচন ঘটে। কশ্যপনন্দন লাউসেন মানবদেহ ত্যাগ করে পুনরায় স্বর্গে নিজের স্থান ফিরে পায়। (১৬)

মোটিফ-সূচি অনুযায়ী এখানে উল্লেখিত কাহিনিক্রমটি হল— ক। ১ > খ। ২ > গ। ৩ > ঘ। ৪ > ঙ। ৫ > চ। ৬/৭ > ছ। ৮ > জ। ৯ > ঝ। ১০/১২ > ঞ। ১৩/১৫ > ট। ১৪ > ঠ। ১৬।

সাংকেতিক সূত্র ধরে বিচার করলে প্রধান তিনটি মঙ্গলকাব্যে মোটিফ-সূচি অনুযায়ী কাহিনির গঠনগত সূত্র আবিষ্কার করা সম্ভব। এই গঠনগত সূত্র বা ঐক্যই হল মঙ্গলকাব্যের Common Motif—

১ গ. ৪/২ খ. ২/৩ গ. ৩ = পরম রূপবতী কন্যা।

১ ঘ. ৫/২ গ. ৩/৩ খ. ২ = বারবার রূপ পরিবর্তন।

১ ছ. ৮/২ ক. ১/৩ ক. ১ = ভবিষ্যৎ বক্তা।

১ চ. ৭/৩ জ. ৯ = ঘটক।

১ ট. ১৪/২ জ. ৯/৩ ছ. ৮ = নিষেধাজ্ঞা ভঙ্গের জন্য ভাগ্যহীন।
১ ঢ. ২০/২ ঘ. ৪/৩ চ. ৬ = যাদুজল।
১ ড. ১৭/২ ঝ. ১০/৩ ঝ. ১১ = সংকেত সংখ্যা, সাত।
২ ঞ. ১১/৩ ট. ১৪ = কথাবলা শুকপাখি।
১ ঢ. ২২/২ ট. ১২/৩ চ. ৭ = পুনর্জীবন।
১ ন. ২৩/২ ঠ. ১৪/৩ ঠ. ১৬ = পুনর্মিলন।

বাংলা লোককথার মোটিফসূচি অনুসারে যেকোনো মঙ্গালকাব্যে কাহিনির অন্তরঙ্গ রূপটি বিশ্লেষণ করলে ক্রমানুসারে যে বিষয়গুলি চোখে পড়তে বাধ্য সেগুলি এই প্রকার :

পরম রূপবতী কন্যা→বারবার রূপ পরিবর্তন→ভবিষ্যৎবক্তা→ঘটক→নিষেধাজ্ঞা ভঙ্গের জন্য ভাগ্যহীন→যাদুজল→সংকেত ও সংখ্যা, সাত→কথাবলা শুকপাখি→পুনর্জীবন→পুনর্মিলন।

মঙ্গালকাব্যের মূল কাহিনিকে ভাঙলে যেমন একাধিক মোটিফের সমন্বয় ফুটে ওঠে, তেমনি সংগঠনতাত্ত্বিক ভ্লাদিমির প্রপ লোককাহিনির ক্ষেত্রে সিনট্যাগমেটিক মডেল প্রয়োগ করেছিলেন। রাশিয়ান রূপতাত্ত্বিক প্রপ রূপকথার অন্তর্গত কাহিনিগুলিকে ভেঙে ভেঙে তার অন্তর্গত সক্রিয়মূল এককগুলিকে পর পর বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে সাজাবার চেস্টা করেছেন। প্রপের এই পদ্ধতি ভাষাবিজ্ঞানের আধারকে কেন্দ্র করেই পুষ্টি লাভ করেছে। একটি বাক্যের মধ্যে যেমন কর্তা-কর্ম-ক্রিয়া-কারক সাজানো হয়ে থাকে, একটি কাহিনির মধ্যেও তেমনি কোন্ 'মোটিফ'-এর পর কোন্ 'মোটিফ' আসবে তা একটি বিশেষ রীতি অনুসরণ করেই চলে। পারস্পরিক ক্রম পরম্পরা ভেঙে কোনো মোটিফ কাহিনিতে অনুপ্রবেশ করতে পারে না। প্রপের এই রীতিকে বলা যায় 'Syntagmatic Model' অর্থাৎ বাক্‌প্রবাহ ক্রমিক পদ্ধতি, কারণ 'Syntax' বা বাক্যের রীতি ধরেই এই মডেলের প্রবর্তন। এই প্রসঙ্গে প্রপ কাহিনির ক্রিয়াশীলতাকে ভেঙে দেখাতে চাইলেন এবং তার সাথে সাথে কাহিনির মৌল চরিত্রগুলির সম্পর্ক বিশ্লেষণ প্রসঙ্গে স্পস্ট করে বললেন—

> The discussion of Veselove Kij's ideas is particulary interesting. Veselove Kij's split up themes into motifs, so that in his system, the theme adds only a unifying, creative dimension; it stands over motifs, which are treated as further irreducible elements. But in this case Propp remarks, each sentence constitutes a motif, and the analysis of tales must be taken to a level that today would be called 'molecular' however, no motif can be said to be indivisible, since an example as simple as 'A dragon abducts the kings daughter' may be decomposed into at least four elements, each of which is commutable with others ('dragon' with 'Soricerer', 'whirlwind', 'devil', 'eagle' etc; 'abduction' with 'Vampinism', 'putting to sleep' etc; 'daughter' with 'sister', 'bride', 'mother' etc; and finally 'king' with 'prince', 'peasants', etc.) Smallar units than motifs are thus obtained, which

according to Propp, have no independent logical existence.

অর্থাৎ 'রাজকন্যাকে ড্রাগন জোর করে চুরি করে নিয়ে যায়', এই অংশটি একটি মোটিফ হতে পারে, কিন্তু তা অনুধাবন করতে হলে এটিকে আমাদের কতগুলো খণ্ডাংশে ভাগ করতে হবে। যেমন ড্রাগনের সঙ্গে যাদুমন্ত্রদাতা, ঘূর্ণিঝড়, খল, ঈগলপাখি ইত্যাদির একটি সম্পর্ক আছে। আবার কন্যার সঙ্গে যুক্ত রয়েছে ভগ্নি, নতুন স্বামী, মা এবং রাজা। সুতরাং কোনো মোটিফের একক অবস্থান নেই—অন্যের সঙ্গে সংযোগেই তার যাত্রা ও স্থিতি। এ বিষয়ে বিখ্যাত রূপতাত্ত্বিক গবেষক মযহারুল ইসলাম মনে করেন— প্রপ সমস্ত ক্রিয়াশীলতাগুলোকে ভিন্ন ভিন্ন চিহ্নে চিহ্নিত করেছেন এবং বলেছেন যে পরী কাহিনিগুলোতে প্রাথমিক ঘটনা আছে এবং তারপরেই কুশীলবদের স্থান ত্যাগ এবং দূরে যাত্রা। এই অনুপস্থিতি নায়ককে কখনো সরাসরিভাবে কখনো বা পরোক্ষ দুর্ভাগ্যের মধ্যে টেনে আনে। তখন কাহিনিতে খল (ভিলেন)-এর প্রবেশ ঘটে, যে কুশীলবের বা নায়কের সমস্ত তথ্য সংগ্রহ করে এবং তার ক্ষতির জন্য বদ্ধপরিকর হয়। প্রপ এগুলোকে ৩১টি ক্রিয়াশীলতায় দাঁড় করিয়েছেন এবং প্রত্যেকটির জন্য একটি করে অক্ষর নির্দেশ করেছেন। অধ্যাপক মযহারুল ইসলাম এই ৩১টি ক্রিয়াশীলতার সংক্ষিপ্ত রূপচিত্রণ করেছেন। আমরা তাঁরই অনুসরণে লোককাহিনিতে প্রযুক্ত ক্রিয়াশীলতার রূপচিত্রণ করব।

ঙ.ছ ১.২.৩.৪. ঞ ১.২.ভ ১.২.৩. ঐ ১.২.৩.৪. ফ ১.২.৩. ন ১.২.৩.৪ জ ১.২.৩.৪ আ ১.২.৩.৪.৫.৬.৭.৮.৯.১০.১১.১২.১৩.১৪.১৫.১৬.১৭.১৮.১৯.২০.২১.২২ অ ১.২.৩.৪.৫.৬ ব ১.২.৩.৪.৫.৬.৭ চ↑ ঢ ১.২.৩.৪.৫.৬.৭.৮.৯.১০. এ ১.২.৩.৪.৫.৬.৭.৮.৯.১০. ভ ১.২.৩.৪.৫.৬.৭.৮.৯. গ ১.২.৩.৪.৫.৬. হ ১.২.৩.৪. য ১.২. ই. ১.২.৩.৪.৫.৬. অ অ ১.২.৩.৪.৫.৬.৭.৮.৯.১০.১১. অ অ ভ ১ অ অ ভ ১ ↓ প র ১.২.৩.৪.৫.৬.৭ র স ১.২.৩.৪.৫.৬.৭.৮.৯.১০ ও ১.২ ল ১.২ ম ১.২.৩.৪.৫.৬.৭ স শ ঘ ট ১.২.৩.৪ উ ঊ ১.২.৩.৪.৫.৬

সংকেতের সংক্ষিপ্ত তালিকা

ঙ। প্রাথমিক অবস্থা

ছ। অনুপস্থিতি বা উপস্থিতি

ছ^{১} বয়স্কদের অনুপস্থিতি বা প্রস্থান

ছ^{২} পিতামাতা বা কারুর মৃত্যু

ছ^{৩} যুবক বা অল্পবয়স্ক কারুর অনুপস্থিতি বা প্রস্থান

ছ^{৪} উপস্থিতি

ঞ। নিষেধাজ্ঞা বা সতর্কতা

ঞ^{১} নিদিস্টভাবে কোনো সাবধানবানী উচ্চারিত হওয়া

ঞ^{২} উপদেশ অথবা নির্দেশ

ড। নিষেধাজ্ঞা লঙ্ঘন

ড১ যে রীতিতে নিষেধাজ্ঞা দেওয়া হয় সেই রীতিতেই তা লঙ্ঘিত হয়

ড২ লঙ্ঘিত নিষেধাজ্ঞা এবং উহ্য নিষেধাজ্ঞার কোনো নির্দেশ বা আদেশ অমান্য করা হয়

ড৩ লঙ্ঘন দিয়েই কাহিনির সূত্রপাত

ঐ। পরিদর্শন-পরিক্রমা

ঐ১ প্রাথমিক পরিদর্শন-পরিক্রমা যার মাধ্যমে খল নায়কের তথ্য সংগ্রহ করে

ঐ২ সরাসরি জিজ্ঞাসার মাধ্যমে খলের পরিদর্শন পরিক্রমা, অনুরূপভাবে নায়ক ও খল সম্পর্কিত তথ্যাদি পরিদর্শন-পরিক্রমার মাধ্যমে সংগ্রহ করে

ঐ৩ সহায়কের মাধ্যমে পরিদর্শন-পরিক্রমা

ফ। অর্পণ বা সরবরাহ করা

ফ১ খল নায়কের সম্পর্কে অথবা নায়ক খল সম্পর্কে সংবাদ সংগ্রহে ব্রতী হয়

ফ২ ভিন্নমুখী তথ্য সংগ্রহ ভিন্ন ভিন্ন সুযোগ খলের তথ্য এনে দেয়

ফ৩ একনজর দেখে তথ্য-সংগ্রহ

ণ। ছলনাজাল বিস্তার

ণ১ সাধুতার আচরণে ছলনাজাল; প্রতারণামূলক অনুরোধ-উপরোধ

ণ২ ক্রমাগত ক্ষতিসাধনের প্রয়াস

ণ৩ সরাসরি যাদুদ্রব্য অথবা যাদুপদ্ধতি প্রয়োগ

ণ৪ খলের চাতুরির বিচিত্র পন্থা

জ। দুষ্কর্মে নিজের অজান্তে বশীভূত হওয়া

জ১ অনুরোধ উপরোধ ইতিবাচক হওয়া

জ২ খলের যাদুজালে যান্ত্রিকভাবে ধরা দেওয়া

জ৩ আপন কাজের মাধ্যমে শত্রুকে সাহায্য করা

জ৪ প্রতারণামূলক প্রতিশ্রুতি যার মাধ্যমে খলের কাছে ধরা দেওয়া হয়

আ। খলত্ব

আ১ খল কাউকে অপহরণ করে

আ২ কোনো যাদুর দ্রব্য বা নিমিত্তকে হস্তগত করে

আ৩ যাদুতে সাহায্যকারীকে হস্তগত করে (বলপূর্বক)

আ৪ শস্য বিনষ্ট করে

আ৫ দিনের আলো হাতের মুঠোয় বন্দি করে

আ৬ অন্যভাবে ধ্বংস সাধন করে

আ৭ শারীরিক পীড়ন বা ক্ষতিসাধন করে

আ৮ যাদুশক্তি বা অন্য উপায়ে অন্তর্ধানীত করে

আ৯ শিকারকে হাতে পাবার জন্য দাবি জানায় বা প্রলুব্ধ করে

আ১০ কোনো একজনকে বিতাড়িত করে

আ^{১১} কাউকে জলে ডুবতে বা অগ্নিতে প্রবেশে বাধ্য করে
আ^{১২} যাদুমন্ত্র আরোপ করে
আ^{১৩} রূপান্তরিত করে এবং সেখানে অপরকে স্থাপন করে
আ^{১৪} হত্যার আদেশ এবং আদেশ কার্যকর করার নির্দেশ
আ^{১৫} খল নিজেই কাউকে নিহত করে
আ^{১৬} খল কাউকে কারারুদ্ধ বা আবদ্ধ করে
আ^{১৭} বলপূর্বক বিবাহের ভয় দেখায়
আ^{১৮} মানুষ খাবে— এই ভয় দেখিয়ে কার্যসিদ্ধি করতে চায়
আ^{১৯} রাত্রিতে পীড়নমূলক কাজ করে
আ^{২০} খল যুদ্ধ ঘোষণা করে

অ। অভাব

অ^{১} পত্নীর অভাব
অ^{২} যাদু নিমিত্তের অভাব
অ^{৩} ভ্রাম্যমান কোনো দ্রব্য বা পশু পাখির অভাব
অ^{৪} যাদুশক্তিসম্পন্ন দ্রব্য বা প্রাণী, যার মধ্যে জীবন অথবা মৃত্যু লুক্কায়িত, তার অভাব
অ^{৫} অর্থাভাব অথবা সম্পদ বা বাসস্থানের অভাব অর্থাৎ অভাববোধের যুক্তিগ্রাহ্য রূপ
অ^{৬} অন্যান্য যাবতীয় অভাব

ব। মধ্যস্থকারী অথবা সংযোগকারী ক্রিয়াশীলতা

ব^{১} নায়ককে প্রেরণের পরে আহ্বান জানানো
ব^{২} নায়ককে সরাসরি প্রেরণ বা তার নিকট কিছু প্রেরণ
ব^{৩} নায়ককে গৃহপ্রত্যাবর্তনের সুযোগ প্রদান
ব^{৪} দুর্ভাগ্যের কথা ঘোষণা
ব^{৫} নির্বাসিত নায়ককে অন্যত্র প্রেরণ
ব^{৬} মৃত্যুদণ্ডাজ্ঞাপ্রাপ্ত নায়কের মুক্তি
ব^{৭} শোকসংগীত গাওয়া

চ। প্রতিরোধ বা প্রতিশোধমূলক কাজের সূত্রপাত

↑ নায়কের গৃহত্যাগ

ঢ। সহায়কের বা দাতার ক্রিয়াশীলতা

ঢ^{১} দাতার দ্বারা নায়কের পরীক্ষা
ঢ^{২} দাতা কর্তৃক নায়ককে জিজ্ঞাসাবাদ
ঢ^{৩} মৃত্যুপথযাত্রীর অনুরোধ
ঢ^{৪} আবদ্ধ ব্যক্তির মুক্তির জন্য অনুরোধ

ঢ৫ ক্ষমা প্রদর্শনের অনুরোধ
ঢ৬ বিবাদীদের সম্পত্তি বন্টনের দাবি
ঢ৭ অন্যান্য অনুরোধ
ঢ৮ নায়ককে ধ্বংসের উদ্দেশ্যে মারমুখী ব্যক্তি বা প্রাণীদের উদ্যোগ
ঢ৯ মারমুখীদের নায়ককে হাততালিতে লিপ্ত করা
ঢ১০ যাদুদ্রব্য দেখিয়ে অন্যকিছু চাওয়া

এ। ভবিষ্যতে দাতার প্রতি নায়কের প্রতিক্রিয়া (ইতি বা নেতিবাচক)
এ১ পরীক্ষামূলক কাজে স্বীয় অবস্থান বজায় রাখা অথবা না-রাখা
এ২ অভিনন্দনের উত্তর দেওয়া অথবা না-দেওয়া
এ৩ মৃতব্যক্তির সৎকার করা অথবা না-করা
এ৪ বন্দিকে মুক্তিদান
এ৫ আবেদকের প্রতি নায়কের করুণা প্রদর্শন
এ৬ বিবাদকারীদের অংশ বণ্টন
এ৭ নায়কের অন্যান্য সেবাপরায়ণমূলক কাজ
এ৮ জীবনের ওপর আক্রমণের উদ্যোগ এবং আত্মরক্ষা
এ৯ প্রতিদ্বন্দ্বী শক্তিকে পরাভূত করা
এ১০ বিনিময়ে সম্পত্তি

ভ। যাদুর নিমিত্তের প্রয়োগ— কৌশল লাভ
ভ১ যাদুর নিমিত্ত সরাসরিভাবে প্রাপ্ত
ভ২ যাদুর নিমিত্ত সম্পর্কে নির্দেশ
ভ৩ যাদুর নিমিত্ত প্রণীত বা তৈরি হয়
ভ৪ যাদু নিমিত্তের ক্রয়-বিক্রয়
ভ৫ যাদু নিমিত্তের আকস্মিক প্রাপ্তি
ভ৬ যাদু-নিমিত্তের নিজে থেকে নায়কের কাছে আসা
ভ৭ যাদু-নিমিত্তের পান বা আহার করা
ভ৮ যাদু-নিমিত্তকে ধারণ বা হরণ করা
ভ৯ নানা জাতীয় (যাদু) চরিত নায়কের সাহায্যে নিজেদের সমর্পণ করে। অনেক সময় দেখা যায় যে, যাদু নিমিত্ত নিজেরাই প্রয়োজনের সময় উপস্থিত হবার আশ্বাস দেয়।

গ। স্থানগত পরিবর্তন এবং পথ প্রদর্শন
গ১ নায়ক বাতাসের মধ্যে দিয়ে উড়ে যায়
গ২ নায়ক স্থলপথ বা জলপথে যায়
গ৩ নায়ক পথ প্রদর্শিত হয়
গ৪ নায়ককে কোন পথে যেতে হবে, সেই পথের প্রতি নির্দেশ

গ^{৫} নির্দিষ্ট যোগাযোগ ব্যবস্থাকে ব্যবহার
গ^{৬} ফুল, রক্তের দাগ বা কোনো চিহ্ন দেখে পথের সন্ধান
হ। সংগ্রাম বা যুদ্ধ
হ^{১} খোলামাঠে যুদ্ধ
হ^{২} প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করা
হ^{৩} তাসের প্রতিযোগিতা
হ^{৪} মাপ বা ওজনের প্রতিযোগিতা
য। চিহ্নিতকরণ
য^{১} শরীরে চিহ্ন করে দেওয়া হয়
য^{২} আংটি অথবা তোয়ালে লাভ
ই। বিজয়
ই^{১} প্রকাশ্য যুদ্ধে খলের পরাজয়
ই^{২} প্রতিযোগিতায় খলের পরাজয়
ই^{৩} তাসখেলায় নায়কের জয়
ই^{৪} ওজন প্রতিযোগিতার নায়কের জয়
ই^{৫} প্রাথমিক যুদ্ধ ছাড়াই খলের নিধন
ই^{৬} খলের সরাসরি নির্বাসন
অ অ। অভাব অপসারিত ব্যক্তি বা বস্তু বুদ্ধির সাহায্যে হস্তগত করা
অ অ^{১}অনুসন্ধানীয় ব্যক্তি বা বস্তু বুদ্ধির সাহায্য হস্তগত করা
অ অ^{২} সম্মিলিত ভাবে দ্রুত হস্তগত করা
অ অ^{৩} ভয় দেখিয়ে লাভ করা
অ অ^{৪} পূর্ববর্তী কাজের ফলস্বরূপ অনুসন্ধনীয় ব্যক্তি পশু-পাখি বা বস্তুপ্রাপ্তি
অ অ^{৫} যাদু নিমিত্ত ব্যবহারের ফলে প্রাপ্তি
অ অ^{৬} যাদু নিমিত্তের সাহায্যে দারিদ্র্য-মুক্তি
অ অ^{৭} সন্ধানীয় ব্যক্তি পশু-পাখি বা বস্তু ধরা হয়
অ অ^{৮} সম্মোহনী শক্তির অবসান
অ অ^{৯} মৃতব্যক্তির পুনরুজ্জীবন
অ অ^{১০} বন্দির মুক্তি
অ অ^{১১} যাদু নিমিত্তের ন্যায় সন্ধানীয়ের প্রাপ্তি
অ অ ভ। ভ এর ন্যায় অপসারিত
অ অ ভ^{১} সন্ধানীয় ব্যক্তি বস্তু বা পশু-পাখি স্থানান্তরিত হয়
অ অ ভ^{২} সন্ধানীয় ব্যক্তি বস্তু পশু-পাখি দেখিয়ে দেওয়া হয়, ইত্যাদি।

প্র। অনুসরণ

প $_{র.১}$ নায়ককে উড়ন্ত ভাবে অনুসরণ

প $_{র.২}$ অনুসরণকারী অপরাধীকে দাবি করে

প $_{র.৩}$ অনুসরণ করা অবস্থায় রূপান্তরিত হওয়া

প $_{র.৪}$ অনুসরণকারীর নিজেকে লোভনীয় বস্তু/ প্রাণীতে রূপান্তকরণ এবং নায়কের সম্মুখে নিজেকে স্থাপন

প $_{র.৫}$ নায়ককে গিলে ফেলাতে চেষ্টা করা

প $_{র.৬}$ অনুসরণকারীর নায়ককে হত্যার উদ্যোগ গ্রহণ

প $_{র.৭}$ নায়ক যে গাছের মধ্যে আশ্রয় নেয় অনুসরণকারী সেই গাছটিকে চিবিয়ে খেতে চায়

র $_{স}$। অনুসরণ থেকে নায়কের উদ্ধার

র $_{স.১}$ নায়ককে বাতাসের মধ্য দিয়ে বহন করা

র $_{স.২}$ নায়ক পথে বাধার সৃষ্টি করতে করতে উড়ে যায়

র $_{স.৩}$ উড়ন্ত যাত্রার সময় নায়ক অচেনা কিছুতে রূপান্তরিত হয়

র $_{স.৪}$ আকাশ স্থল বা জলপথে প্রত্যাগমনের সময় নায়ক লুকোয়

র $_{স.৫}$ নায়ককে কোনো ব্যক্তি আড়াল করে

র $_{স.৬}$ নায়কের পশু বা পাথরে রূপ পরিবর্তন এবং আত্মরক্ষা

র $_{স.৭}$ লোভ থেকে বিরত থাকা

র $_{স.৮}$ বিরুদ্ধ পক্ষ তাকে গিলে ফেলুক বা ধারণ করুক এমন কোনো অবস্থায় নায়ক নিজেকে ফেলে না

র $_{স.৯}$ জীবন বিপন্ন হলে নায়ক নিজেকে রক্ষা করে

র $_{স.১০}$ সে প্রত্যাবর্তনরত অবস্থায় এক গাছ থেকে অন্য গাছে লাফ দেয়

ও। অপরিচিত অবস্থায় আগমন

ও^{১} দেশে ফিরে ছদ্মবেশে কাজ করে

ও^{২} দেশে সরাসরি ফিরে আসে কিন্তু তাকে কেউ চিনতে পারে না

ল। মেকি নায়কের দাবি অগ্রাহ্য হয়

ল১ অন্যেরা মিথ্যা দাবি করে যে, তারাই প্রকৃত কৃতিত্বের দাবিদার
ল২ অন্যেরা নায়কের স্ত্রীর ওপর দাবি করে

ম। কঠিন কাজ
ম১ খাদ্য এবং পানীয় দ্বারা পরীক্ষা
ম২ অগ্নিপরীক্ষা
ম৩ মৌখিক ভাগ্যপরীক্ষা
ম৪ নির্বাচনমূলক পরীক্ষা
ম৫ কুশলীপনামূলক পরীক্ষা
ম৬ সহনশীলতামূলক ভাগ্য পরীক্ষা
ম৭ কোনো কিছু নির্মাণ গঠন বা বিচ্ছিন্নকরণ জাতীয় পরীক্ষা

স। কাজগুলো সম্পন্ন করা

শ। নায়ককে চিনতে পারা

ঘ। মেকি নায়কের মুখোশ উন্মোচন

ট। নায়কের আকৃতি পরিবর্তন বা রূপান্তরকরণ
ট১ যাদু নিমিত্তের সাহায্যে সরাসরি চেহারায় পরিবর্তন
ট২ আশ্চর্য প্রাসাদ নির্মাণ
ট৩ নতুন পোশাক পরিধান
ট৪ যুক্তিগ্রাহ্য এবং কৌতুকময় আকৃতি

উ। খলের শাস্তি

ঊ। বিবাহ
ঊ১ রাজকন্যা এবং রাজ্যলাভ
ঊ২ সিংহাসন ছাড়া বিবাহ
ঊ৩ কেবল সিংহাসন লাভ
ঊ৪ বিবাহের প্রতিশ্রুতি
ঊ৫ পত্নীর বিয়োগ এবং সন্ধানের মাধ্যমে সুফল লাভ

আমাদের আলোচনায় প্রপ কথিত ৩১টি ক্রিয়াশীলতার গুরুত্ব কতখানি তা বোঝা যাবে তাঁর তত্ত্বের যথার্থ বিশ্লেষণের মাধ্যমে। ইতিপূর্বে বাংলা মঙ্গালকাব্যগুলিকে মোটিফ পদ্ধতিতে ভেঙে ভেঙে বিশ্লেষণ করায় কাহিনির গঠনগত রূপ নির্ণয় করতে গিয়ে যে তুলনামূলক অন্তর্লীন ঐক্য পাওয়া গিয়েছিল, তাতে কাহিনিগুলির সঙ্গো চরিত্রের সক্রিয়তা স্পষ্ট নয়। কিন্তু প্রপীয় পদ্ধতিতে কাহিনির গতিশীলতা সৃষ্টির ক্ষেত্রে নির্দেশিত ৩১টি ক্রিয়াশীলতার মধ্যে থেকেই বাংলা মঙ্গালকাব্যের গঠনগত সূত্র আবিষ্কার করা সম্ভব। সেক্ষেত্রে মনসামঙ্গালকাব্যের ক্রিয়াশীলতাগুলি হবে এই প্রকার—

১। ঙ. প্রাথমিক অবস্থা = কবি স্বপ্ন দেখে সর্পদেবী মনসা প্রসঙ্গো কাব্য লেখা শুরু করলেন। প্রথমেই দেবীর জন্ম রহস্যের কথা ব্যক্ত হল।

২। ছ[৪] উপস্থিতি = মনসার আসল পরিচয় জানতে পেরে শিব তাকে সাথে করে নিয়ে এলেন নিজের বাড়ি। শিব-দুর্গার সংসারে মনসার উপস্থিতি ঘটল।

৩। সৎ মায়ের সংসারে মনসার প্রতি দুর্ব্যবহার শুরু হল, এমনকি চণ্ডী তাঁর গায়ে হাত পর্যন্ত তুললেন। মনসার জীবন-সংগ্রাম এখান থেকেই শুরু। এরপর থেকে চলতে থাকল নিজের ব্যক্তিত্ব ও অধিকার প্রতিষ্ঠার লড়াই।

৪। অ[৬] অন্যান্য যাবতীয় অভাব = শিবের অযোনিসম্ভূতা কন্যা হবার সুবাদে প্রথম থেকেই পিতা-মাতা পরিব্যাপ্ত সাংসারিক জীবন-যাপনের অভাব ছিল। এরপর নপুংসক জরৎকারু মুনির সাথে বিয়ে হওয়ায় জীবনসুখ হতে বঞ্চনার অভাব দ্বিগুণ হয়ে উঠল মনসার। ফলস্বরূপ দিনে দিনে হিংস্র ও ক্রূর প্রকৃতির হয়ে পড়লেন মনসা।

৫। নিজের অধিকার প্রতিষ্ঠা করতে মনসা মর্ত্যে পূজা পাবার ইচ্ছা প্রকাশ করলেন। সনকা, জালু-মালু, হাসান-হোসেন প্রমুখের কাছ থেকে পূজা আদায় করে নিলেও কেবল শিবভক্ত চাঁদের কাছে কিছুতেই পূজা পেলেন না দেবী।

৬। ন. ছলনাজাল বিস্তার = ক্রুদ্ধা দেবী এরপর বিভিন্নপ্রকার ছলনাজাল বিস্তারের মাধ্যমে চাঁদের মহাজ্ঞান হরণ করতে চাইলেন। এর জন্য বিভিন্নরকম রূপ পরিবর্তন করে চাঁদ-এর মন হরণ করার বিচিত্র পন্থা অবলম্বন করেন দেবী।

৭। ঞ. নিষেধাজ্ঞা বা সতর্কবার্তা = মনসার কোপের বিরুদ্ধে হার না-মানা মানসিকতা নিয়ে রুখে দাঁড়ালে, দৃঢ় প্রত্যয়ী পুরুষ চাঁদের প্রতি নিষেধাজ্ঞা বা সতর্কবার্তা জারি হয়।

৮। ড. নিষেধাজ্ঞা লঙ্ঘন = মনসার প্রতি বিরুদ্ধাচরণের মাধ্যমে চাঁদ সদাগর সমস্তপ্রকার নিষেধাজ্ঞা লঙ্ঘন করে সনকার পূজার ঘটে লাথি মারে, এবং এরপর থেকে প্রবলভাবে ভাগ্য বিপর্যয়ের মধ্যে পড়ে। চাঁদ-মনসার বিরোধ নতুন মাত্রা পায়।

৯। চ. ভাগ্যের সন্ধানে ‘মধুকর’ বাণিজ্যতরী নিয়ে চাঁদের দূরদেশে যাত্রা। আলোচ্য অংশে নায়কের গৃহত্যাগে কাহিনিতে মোড় ঘোরে।

১০। বাণিজ্য করতে গিয়ে চাঁদ সদাগর পূর্বের ক্ষয়ক্ষতি মিটিয়ে সত্বর একপ্রকার স্থিতিশীল অবস্থায় এসে পৌঁছান। বিভিন্ন বস্তু বদল করে, বাণিজ্যে সফলতা লাভ করে বাড়ি ফেরার সময় ফের বিপর্যয় ঘটে। মনসার কোপে পড়ে সব কিছু হারিয়ে অবশেষে কোনোমতে চোরের মতো বাড়িতে প্রবেশ করেন চাঁদ সদাগর। নায়কের গৃহে প্রত্যাবর্তনে দ্রুত কাহিনির গতিমুখ পরিবর্তিত হয়।

১১। কাহিনিতে নতুন বিষয় প্রাধান্য পায়, চাঁদ সদাগরের ছোটো ছেলের বিয়ে হয় বেহুলার সাথে। নিয়তি বা সতর্কবাণী লঙ্ঘন করে লখিন্দর-বেহুলার বিয়ে হবার পর বাসর রাতেই মনসার বাহন কালসাপের হাতে লখিন্দরের মৃত্যু ঘটায় চাঁদ শেষে ভেঙে পড়েন।

১২। অ অ. অভাব অপসারিত = চাঁদের পুত্র লখিন্দরকে কলার মাজুযে করে ভাসিয়ে দেবার পর বেহুলা পণ গ্রহণ করল : হয় সে তার স্বামীর প্রাণ ফিরিয়ে আনবে নতুবা স্বামীর সাথে মৃত্যুবরণ করে নেবে। কিন্তু বেহুলার স্বর্গযাত্রা অংশে, বিস্তারিত কাহিনি বিশ্লেষণের ফলে আমরা জানতে পারি যে— বেহুলা কঠিন আদর্শের বলে ও বুদ্ধিতে শেষে স্বামী লখিন্দরের প্রাণ যেমন ফিরে পেয়েছেন, তেমনি হারানো ছয় পুত্রের প্রাণও ফিরে পেয়েছেন। দেবী মনসার ইচ্ছা অনুযায়ী— কাব্যের শেষে সমস্ত হৃত সম্পত্তি ও মৃত পুত্রদের ফিরে পেয়ে চাঁদ সদাগর নিজের হাতে দেবীর পূজা প্রচারে সহযোগী ভূমিকা পালন করে। কাহিনির এই পরিণতি অংশে যে ক্রিয়াশীলতাগুলি একত্রে কাজ করেছে সেগুলি নিম্নরূপ।

১৩। অ অ[১] অনুসন্ধানীয় ব্যক্তির বা বস্তু বুদ্ধির সাহায্যে হস্তগত করা = বাসর রাতে স্বামীর মৃত্যুর কারণ অনুসন্ধানের দ্বারা মৃতদেহে পুনরায় প্রাণ প্রতিষ্ঠার দাবিতে বেহুলার দেবলোকে গমন এবং দেবসভায় অনুপ্রবেশ।

১৪। অ অ.[৯] মৃতব্যক্তির পুনরুজ্জীবন = শিবের নির্দেশে মনসার দ্বারা মৃত লখিন্দরের ক্ষয়প্রাপ্ত দেহের পুনর্গঠন ও প্রাণ ফিরে পাবার আনন্দ।

১৫। উ[৫] পত্নীর বিয়োগ এবং সন্ধানের মাধ্যমে সুফল লাভ = বাসর রাতে বেহুলার সাথে বিচ্ছেদ, অবশেষে দেবী মনসার কৃপায় পুনর্জীবন লাভ করে ও স্ত্রী বেহুলাকে পাশে পেয়ে লখিন্দরের জীবনে এমনকি তার সম্পূর্ণ পরিবার জীবনে অপ্রত্যাশিত সুফল ফিরে এল।

এখন আমরা আলোচ্য মনসামঙ্গাল কাহিনিতে ব্যবহৃত গতিপ্রবাহ ও ক্রিয়াশীলতাগুলিকে নিম্নলিখিতভাবে সাজাতে পারি—

{ড. অ অ. উ[১] / + ইতি}

এক্ষেত্রে পুনর্মিলনের [illegible] ভাবকে '+' চিহ্নের দ্বারা কাহিনির শেষাংশে বিভাজিত করে দেওয়া হয়েছে বিবাদমান দুই পক্ষের মধ্যে। তাই কাহিনির শেষে সকলের আকাঙ্ক্ষা পূরিত হয়েছে। বাংলা মঙ্গলকাব্যের এটাই বিশেষ প্যাটার্ন। তবে কিছু কিছু ক্ষেত্রে ব্যতিক্রমও আছে। একমাত্র এভাবে বিশ্লেষণের মাধ্যমে কাহিনির মূল উপাদানগুলোকে পরস্পর বিচ্ছিন্ন করলে আমরা ক্রিয়াশীলতাগুলোকে লাভ করতে পারি এবং তাদের গতিপ্রবাহের অনুগমনকেও সহজেই চিহ্নিত করতে পারি। প্রসঙ্গাত প্রপ কথিত আরও কিছু চিহ্নের উল্লেখ করব যার দ্বারা অন্যান্য মঙ্গালকাব্যের কাহিনির সংকেতের মাধ্যমে কেবল কোন্‌টা কোন্ ক্রিয়াশীলতার অন্তর্ভুক্ত তা বোঝা সহজ হবে।

× অস্পষ্ট অথবা অপরিচিত গঠন বা ধরন

+ ক্রিয়াশীলতার জন্য ইতিবাচক ফল

– ক্রিয়াশীলতার জন্য নেতিবাচক ফল

: সংযোগকারী

§ সংযোগকারীদের জট পাকানো অবস্থা, ইত্যাদি।

একটু আগে মনসামঙ্গল কাহিনির মূল ক্রিয়াশীলতাগুলোর সম্মিলিত রূপকে গাণিতিক সংকেত সূত্রে উপস্থাপনের যে প্রয়াস আমরা করেছি, ঠিকভাবে সাজালে একই সাংকেতিক রূপসূত্র অন্যান্য বাংলা মঙ্গালকাব্যেও খুঁজে পাওয়া যাবে।

'চণ্ডীমঙ্গাল' কাব্যের সংকেত সূত্র—

১। ঙ. প্রাথমিক অবস্থা = কাহিনির সূত্রপাত

২। ছ^{৪}. উপস্থিতি = গোধিকা ছদ্মবেশে দেবী মনসার আগমন।

৩। ঐ^{৪}. সহায়কের মাধ্যমে পরিদর্শন-পরিক্রমা = কালকেতুকে দেবী সৌভাগ্য ও ধনরত্ন লাভে সহায়তা করেছেন।

৪। ঐ^{৩}. ছদ্মবেশে বা অন্য উপায়ে পরিদর্শন পরিক্রমা = ধনপতি খুল্লনার আরাধ্য দেবীকে অমান্য করায় দেবী বাণিজ্যরত সদাগরকে বিপদে ফেলেছেন।

৫। ন. ছলনাজাল বিস্তার = বারবার রূপ পরিবর্তন করে দেবী নিজের ঈপ্সিত লক্ষ্যে পৌঁছাতে চান। এই সবকিছুকে উপেক্ষা করে ধনপতি সপ্তডিঙা নিয়ে বাণিজ্য যাত্রা করেন। ↑ এখান থেকে কাহিনির জট পাকানো অবস্থার শুরু হয়, ':'।

৬। ঞ. নিষেধাজ্ঞা বা সর্তকবার্তা = দেবী নিষেধাজ্ঞা জারি করেন ধনপতির প্রতি। ধনপতিকে বিপদে ফেলার হুমকি দেন।

৭। ড. নিষেধাজ্ঞা লঙ্ঘন = দেবীর কথা অমান্য করে, তাঁর পূজার ঘটে লাথি মেরে নিষেধাজ্ঞা ভঙ্গা করেন ধনপতি।

৮। ধনপতির অবর্তমানে গৃহে দুই সতীন লহনা ও খুল্লনার মধ্যে বিবাদ বৃদ্ধি পায়। খুল্লনার গর্ভে পুত্রসন্তান জন্ম নেয়, চরম অবমাননা সহ্য করে পুত্রকে বড়ো করে তোলে খুল্লনা।

৯। ব. মধ্যস্থকারী অথবা সংযোগকারী ক্রিয়াশীলতা = খুল্লনা-ধনপতির একমাত্র পুত্র শ্রীমন্ত বাবার খোঁজে বাণিজ্যযাত্রা করে। ↓

১০। ঢ. সহায়কের বা দাতার ক্রিয়াশীলতা = শ্রীমন্তের সহযোগিতায় ধনপতি দীর্ঘদিন কারাবাস থাকার দায় থেকে মুক্তি পান।

১১। অ অ. অভাব অপসারিত = উভয় খণ্ডে কাহিনির শেষাংশে দেবীর মর্ত্যে পূজা পাবার বাসনা যেমন চরিতার্থতা লাভ করেছে, তেমনি ফুল্লরা-কালকেতু,

লহনা-ধনপতি- খুল্লনা-শ্রীমন্ত সবাই পুনর্মিলনের আনন্দে সামিল হয়েছে।

১২। উ^{১} রাজকন্যা এবং রাজ্যলাভ = শ্রীমন্তের শৌর্য-বীর্য দেখে মুগ্ধ হয়ে কলিঙ্গারাজ নিজের কন্যা ও রাজ্য দান করে শ্রীমন্তকে জামাই ও ধনপতিকে বেয়াই করে নিলেন।

এখন আমরা আলোচ্য চণ্ডীমঙ্গাল কাহিনিতে ব্যবহৃত গতিপ্রবাহ ও ক্রিয়াশীলতাগুলিকে নিম্নলিখিতভাবে সাজাতে পারি—

ঙ ছ^{৪} চ ↑ ন^{২} ম আ$^{১২.১৯.২০}$ { ঢ. ই^{১} উ অ অ / + ইতি }

এরপর 'ধর্মমঙ্গাল'কাব্যে ক্রিয়াশীলতার সংকেতসূত্র সম্পর্কে উল্লেখ করা হল—

১। ঙ. প্রাথমিক অবস্থা = গল্পের সূচনা।

২। ছ^{৪}. উপস্থিতি = রঞ্জাবতী ও লাউসেনের মর্ত্যাগমনের বৃত্তান্ত বর্ণিত হয়েছে।

৩। রঞ্জার গর্ভে বীরপুত্র লাউসেনের জন্মলাভ। ক্রমশ লাউসেনের বুদ্ধি ও বলপ্রাপ্তি।

৪। চ. নায়কের গৃহত্যাগ = লাউসেনের গৌড়যাত্রা। ↑

৫। ন^{২}. ক্রমাগত ক্ষতি সাধনের প্রয়াস = লাউসেনের বীরত্বে অবগত হয়ে তার মামা মহামদ ক্রমাগত ক্ষতি সাধনের প্রয়াস করে।

৬। ম. কঠিন কাজ = লাউসেনকে বিপাকে ফেলার জন্য বিভিন্নপ্রকার কঠিন কাজ সমাধান করার বন্দোবস্ত করে মহামদ।

৭। আ^{১২}. যাদুমন্ত্র আরোপ করা = লাউসেনের অনুপস্থিতিতে ঘুমপাড়ানি মন্ত্র আরোপ করে ময়নাগড় অধিগ্রহণের ফন্দি করে পাত্র মহামদ।

৮। আ^{১৯}. রাত্রিতে পীড়নমূলক কাজ করে = রাতে সবাই নিদ্রামগ্ন হয়ে পড়লে ময়নাগড়ে সসৈন্যে অতর্কিত হানা দেয় মহামদ।

৯। আ^{২০}. খলযুদ্ধ ঘোষণা করে = মহামদের অতর্কিত আক্রমণের বিরুদ্ধে গড়ের বীরাঙ্গানা নারীগণ রুখে দাঁড়ালে খলযুদ্ধ ঘোষণা করে।

১০। ঢ. সহায়কের বা দাতার ক্রিয়াশীলতা = লাউসেনের এই চরম দুর্দিনে ধর্মঠাকুর তাঁর অলৌকিক মহিমার আশ্রয়ে লাউসেনকে সকল বিপদ থেকে উদ্ধার করেন।

১১। ই^{১}. প্রকাশ্য যুদ্ধে খলের পরাজয় = অধর্মের পথে চলার জন্য লাউসেন-পত্নী কানাড়ার হাতে মহামদের পরাজয় ঘটে।

১২। উ. খলের শাস্তি = মহামদ প্রাণে বেঁচে গেলেও তার পাপকর্মের শাস্তি স্বরূপ মাথা মুড়িয়ে, জুতোর মালা গলায় পরিয়ে রাজ্য হতে বহিষ্কার করা হয়।

১৩। অ অ. অভাব অপসারিত = পরিশেষে লাউসেনের জীবনে সকল প্রকার অভাব অপসারিত হয়; একই সাথে ধর্মঠাকুরের পূজা প্রচারের আকাঙ্ক্ষা সার্থকতা লাভ করে। আমাদের আলোচ্য ধর্মমঙ্গাল কাব্যের গতিপ্রবাহ ও ক্রিয়াশীলতাগুলিকে

সূত্রাকারে সাজালে দাঁড়ায়—

এইবার পর পর মনসামঙ্গাল, চণ্ডীমঙ্গাল, ধর্মমঙ্গাল কাব্যে ব্যবহৃত ক্রিয়াশীলতাগুলোকে সাজালে বুঝতে পারব যে উক্ত তিন প্রকার মঙ্গালকাব্য কাহিনিরই মূল উপাদান এক ও অভিন্ন। অবশ্য বিভিন্ন কাহিনিতে ক্রিয়াশীলতাগুলি একটার পর একটা সু-সজ্জিতভাবে আসেনি তথাপি একথা ঠিক, প্রতিটি ক্রিয়াশীলতাই কাহিনিগুলির মধ্যে কোনো না কোনোরকমভাবে উপস্থিত। এ প্রসঙ্গো বাংলা লোককথার রূপতাত্ত্বিক গবেষক ড. মযহারুল ইসলামের একটি মন্তব্যে আমাদের সকল সন্দেহ দূর হয়। তাঁর মতে, ভ্লাদিমির প্রপ-এর বিরূপ সমালোচনা যে করা যায় না, এমন নয়। তিনি কাহিনির শ্রেণিকরণ সম্পর্কে তাঁর গ্রন্থে যে বেশ সচেতন হয়ে উঠেছিলেন গ্রন্থের শেষদিকে তার প্রমাণ রয়েছে। তাঁর শ্রেণিকরণ থেকে একথা বলা যায় যে, আসলে সব কাহিনি প্রায়ই একই রূপতাত্ত্বিক কাঠামোতে গঠিত, যার মোট চারটি মৌলিক ক্রিয়াশীলতা আছে। মোটকথা প্রপের একত্রিশটি ক্রিয়াশীলতাকে আরো সংখ্যায় বাড়ানো সম্ভব। তবে মূল ক্রিয়াশীলতাগুলি কাহিনিতে থাকা আবশ্যিক, আর আমাদের আলোচ্য মঙ্গালকাব্যে চারের অধিক মূল ক্রিয়াশীলতার অবস্থান কাহিনির গঠন আলোচনাকে আরো সহজ করে তুলবে এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। এইবার প্রধান তিন মঙ্গালকাব্যের মূল ক্রিয়াশীলতাকে পর পর সাজিয়ে তার আভ্যন্তরীণ কাঠামোয় সাযুজ্যের স্বরূপ চিহ্নিত করার চেষ্টা করব।

$$\text{মনসামঙ্গাল} > \text{ঙ ছ}^{\text{৪}}\ \text{অ}^{\text{৬}}\ \text{ন ঞ ড} \uparrow\downarrow \left\{ \frac{\text{অ অ}^{\text{১.৯}}\ \text{উ}^{\text{৫}}}{+\ \text{ইতি}} \right\}$$

$$\text{চণ্ডীমঙ্গাল} > \text{ঙ ছ}^{\text{৪}}\ \text{ঐ}^{\text{৪}}\ \text{ঐ}^{\text{৩}}\ \text{ন} \uparrow : \text{ঞ ড} \downarrow \left\{ \frac{\text{ড. অ অ. উ}^{\text{১}}}{+\ \text{ইতি}} \right\}$$

$$\text{ধর্মমঙ্গাল} > \text{ঙ ছ}^{\text{৪}}\ \text{চ} \uparrow \text{ন}^{\text{২}}\ \text{ম আ}^{\text{১২.১৯.২০}} \left\{ \frac{\text{ঢ. ই}^{\text{১}}\ \text{উ অ অ}}{+\ \text{ইতি}} \right\}$$

উপরিবর্ণিত ক্রিয়াশীলতাগুলির মধ্যে ঙ $\text{ছ}^{\text{৪}}$ ন অ অ এবং উ এই সংকেতগুলি অপরিবর্তনীয় থাকলেও বাকি ক্রিয়াশীলতাগুলির মধ্যে স্থানিক পরিবর্তনের ফলে কাহিনি ভিন্নরূপ ধারণ করেছে। তথাপি প্রতিটি কাহিনির শেষে '+ ইতি' উল্লেখের দ্বারা কাহিনির ইতিবাচক ফলাফল অক্ষুণ্ণ রয়েছে।

আপাতত কথা শেষ, তবে এমনটা নিশ্চিত করে বলা যায় যে—সংগঠনতত্ত্বের কাজই হল, পরিমিত ছকের ভিত্তিতে কাহিনির গঠন বিশ্লেষণ করা। আমরাও ঠিক সেই রীতি অনুসরণ করে লোকসাহিত্য বিশ্লেষণের দুটি মাত্র পদ্ধতিকে (মোটিফ ও ক্রিয়াশীলতা) যথাসম্ভব ব্যবহার করেছি বাংলা মঙ্গালকাব্যের ক্ষেত্রে। স্থানাভাবে মঙ্গালকাব্যের অন্তর্গত

প্রধান ও অপ্রধান ধারাগুলোর মধ্যে কেবল প্রধান ও উল্লেখযোগ্য কবির রচনাকেই ব্যবহার করতে হয়েছে। কিন্তু আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস, এই ধরনের সংগঠনধর্মী আলোচনাই পারে প্রথানুগ বাংলা মঙ্গলকাব্যের আলোচনায় নতুন প্রাণ প্রতিষ্ঠা করতে।

উৎসের সন্ধানে

১। বিজনবিহারী ভট্টাচার্য সম্পাদিত, মনসামঙ্গল, কলিকাতা, চতুর্থ সংস্করণ, ২০০০
২। সুকুমার সেন সম্পাদিত, বিপ্রদাসের মনসাবিজয়, এশিয়াটিক সোসাইটি
৩। সুকুমার সেন সম্পাদিত, কবিকঙ্কণ বিরচিত চণ্ডীমঙ্গল, সাহিত্য আকাদেমি, নয়াদিল্লি, চতুর্থ মুদ্রণ, ২০০১
৪। সুধীভূষণ ভট্টাচার্য সম্পাদিত, মঙ্গলচণ্ডীর গীত, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, দ্বিতীয় সংস্করণ, আশ্বিন ১৪০৬
৫। অক্ষয়কুমার কয়াল ও চিত্রা দেব সম্পাদিত, কেতকাদাস ক্ষেমানন্দ রচিত মনসামঙ্গল, কলিকাতা, লেখাপড়া
৬। অক্ষয়কুমার কয়াল সম্পাদিত, রূপরাম চক্রবর্তী বিরচিত ধর্মমঙ্গল, কলকাতা, ভারবি, ১৩৯২
৭। পীযূষকান্তি মহাপাত্র সম্পাদিত, ঘনরাম চক্রবর্তী বিরচিত শ্রী ধর্মমঙ্গল, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, প্রথম প্রকাশ ১৯৬২
৮। মযহারুল ইসলাম, ফোকলোর, পরিচিতি ও পঠন-পাঠন, ঢাকা বাংলা একাডেমী, তৃতীয় সংস্করণ, জানুয়ারি ১৯৯৩
৯। মযহারুল ইসলাম, ফোকলোর চর্চায় রূপতাত্ত্বিক বিশ্লেষণ পদ্ধতি।
১০। আশুতোষ ভট্টাচার্য, বাংলা মঙ্গলকাব্যের ইতিহাস, কলিকাতা, এ মুখার্জ্জী এন্ড কোং, দশম পুনর্মুদ্রণ, এপ্রিল ২০০২
১১। দিব্যজ্যোতি মজুমদার, বাংলা লোককথার টাইপ ও মোটিফ ইনডেক্স্, কলকাতা, কথাছাপা, দ্বিতীয় সংস্করণ, এপ্রিল ২০০০
১২। অভিজিৎ মজুমদার সম্পাদিত, চণ্ডীমঙ্গল (আখেটিক খণ্ড), কলকাতা, দে'জ পাবলিশিং, প্রথম প্রকাশ, জানুয়ারি, ২০০৫
১৩। পল্লব সেনগুপ্ত, লোকসংস্কৃতির সীমানা ও স্বরূপ, কলকাতা, পুস্তক বিপণি, দ্বিতীয় সংস্করণ, ২০০২
১৪। পল্লব সেনগুপ্ত, লোককথার অন্তর্লোক, কলকাতা, পুস্তক বিপণি, প্রথম প্রকাশ, ১৫ আগস্ট, ২০০০

পত্র পত্রিকা

১। সনৎকুমার মিত্র সম্পাদিত, লোকসংস্কৃতি গবেষণা : পদ্ধতিবিদ্যা সংখ্যা, লোকসংস্কৃতি গবেষণা পরিষদ, ১৪ বর্ষ ৪র্থ সংখ্যা।
২। দেবপ্রসাদ ভট্টাচার্যের প্রবন্ধ, বাংলা বিভাগীয় পত্রিকা (যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়) তৃতীয় সংখ্যা, ১৯৮৫

৩। নন্দিতা বসুর প্রবন্ধ, বাংলা বিভাগীয় পত্রিকা (যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়) দ্বিতীয় সংখ্যা, ১৯৮৫
৪। সত্যবতী গিরি ও সনৎকুমার নস্কর সম্পাদিত, মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্য গবেষণা পত্রিকা, কলকাতা, রত্নাবলী, প্রথম প্রকাশ, জুলাই ২০০২
৫। মৃণাল নাথ সম্পাদিত, ভাষা, কলকাতা, ৭ম বর্ষ ১ম সংখ্যা (নবপর্যায়) জানুয়ারি-জুন ২০০৪।

মঙ্গলকাব্যে ভণিতা : কবি-মনোভাব ও সমাজ পরিচয়

প্রভাস সামন্ত

প্রাচীন বাংলা কবিতা ছিল প্রধানত গীতি-প্রধান। সেই সময় কবিগণ কবিতার শুরুতে নয়, শেষাংশে এক বা একাধিক পংক্তিতে নিজেদের নাম, পরিচয় এবং অভিজ্ঞতা নির্দেশ করতেন। কবিনাম নির্দেশক সেই সব পংক্তিকে বিশিষ্টার্থে বলা হয় ভণিতা। চর্যাপদ থেকে শুরু করে সমগ্র মধ্যযুগীয় বাংলা সাহিত্যে সেই ভণিতার বহুবিচিত্র ব্যবহার লক্ষ করা যায়। প্রাকৃত-অপভ্রংশের যুগেও ভণিতার ব্যবহার ছিল। কবিতায় ভণিতা ব্যবহারের পেছনে কবি-মনে প্রধানত দুটি ভাবনা সক্রিয় ছিল—

এক : প্রচলিত কাব্যধারায় নিজের রচনাকে স্বতন্ত্রভাবে চিহ্নিতকরণ।

দুই : ব্যক্তিগত দু'চারটি সংবাদ জ্ঞাপনে পাঠক বা শ্রোতার কাছে নিজেকে উপস্থিত করা। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে প্রাচীন ও মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের একটি বড়ো সমস্যা তথ্যের অভাব। আবার প্রাপ্ত তথ্যের মধ্যেও ইচ্ছাকৃত বা অনিচ্ছাকৃত নানান বিরোধ, বিকৃতির বাহুল্য আসল সত্য-নির্ণয়ের পথে বড়ো বাধা হয়ে দাঁড়ায়। ভণিতা সম্পর্কিত আলোচনার সর্বাপেক্ষা জটিলতর দিকে হল কবিনাম-সমস্যা। এটি বাংলা সাহিত্যে ভণিতা-বিভ্রাট নামে পরিচিত। এই সমস্যা ঘটেছে —

ক। কবিনাম ও কবিধর্মগত সাম্যের ফলে।

খ। লিপিকর, অনুলেখক বা গায়েনদের স্বেচ্ছাকৃত বা অনিচ্ছাকৃত পরিবর্তনের ফলে।

গ। ছোটোখাটো কবিদের নামীদামী কবিদের নামে কবিতাকে চালানোর চাতুর্যপূর্ণ প্রয়াসের ফলে।

বাংলা সাহিত্যে এ যাবৎ ভণিতা সম্পর্কিত যে সব আলোচনা হয়েছে তার সিংহভাগই ভণিতা-বিভ্রাট বা কবিনাম-সমস্যা নিয়ে। বর্তমান লেখাটিতে সেই বহু চর্চিত সমস্যা থেকে সরে এসে একটু ভিন্ন পথে হাঁটার প্রয়াস আছে। ভণিতা অবলম্বনে কবিদের সামাজিক ও ব্যক্তিক পরিচয়কে তুলে ধরে সেই সময়ের সমাজ ও সাহিত্যের একটি চেহারা ফুটিয়ে তোলাই এই নিবন্ধের মূল লক্ষ্য। তবে সমগ্র মধ্যযুগীয় বাংলা সাহিত্য নয়, কেবলমাত্র মঙ্গলকাব্যের ভণিতাকেই এই রচনাটির আলোচ্য সীমায় আনা হয়েছে। তাই একটা সত্য স্বীকার করে নেওয়া ভালো যে এই আলোচনা কিছুটা হলেও খণ্ডিত হতে বাধ্য।

মঙ্গলকাব্যের ভণিতা সম্বন্ধীয় আলোচনা শুরুর আগে মঙ্গলকাব্যগুলির উদ্ভবের সামাজিক প্রেক্ষাপট সম্পর্কে দু'চার কথা বলা প্রাসঙ্গিক। মঙ্গলকাব্যের দেবদেবীগণ মূলত লৌকিক দেবতা। মানুষের জীবন-জীবিকার প্রয়োজনেই তাঁরা উদ্ভূত হয়েছেন। যেমন জল-জঙ্গালে ভরা অশিক্ষা কুশিক্ষায় আচ্ছন্ন এই বঙ্গাদেশে বাস করতে গিয়ে মানুষকে নানা প্রতিকূলতার মুখোমুখি হতে হয়েছে। আর সেই সব বাধা ডিঙিয়ে জীবনকে সুন্দর করতে তারা বিভিন্ন কল্পিত দেবদেবীকে এনেছে। সেজন্যই সর্পের হাত থেকে রক্ষা পেতে মনসা, হিংস্র বন্যজন্তুর হাত থেকে রক্ষা পেতে বনচণ্ডী, বসন্তরোগ, কলেরা মহামারীর হাত থেকে রক্ষা পেতে শীতলা, ওলাবিবি, পুত্র পাবার প্রত্যাশায় ষষ্ঠী এবং বিভিন্ন আপদ সংকট থেকে পরিত্রাণের লক্ষ্যে ধর্মঠাকুরের প্রসঙ্গ মঙ্গলকাব্যগুলিতে উঠে এসেছে।

এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছে ত্রয়োদশ শতক থেকে পঞ্চদশ শতক পর্যন্ত বিস্তৃত অস্থির সময়। প্রাথমিক পর্বের তুর্কি আক্রমণ, অবাধ লুণ্ঠন, অত্যাচার কিংবা শাসক শ্রেণির অনুদার মনোভাব, ধর্মান্তরীকরণ ইত্যাদি সামাজিক জীবনে তীব্র প্রতিক্রিয়া জাগিয়েছিল। একটা বড়ো অংশের হিন্দু জনগণ অত্যাচারী রাজশক্তির প্রতিপক্ষ হিসাবে মঙ্গলকাব্যের দেবদেবীদের উপস্থিত করেছিল। আর সেজন্যই মঙ্গল দেবদেবীগণ হয়ে উঠলেন অমিত ক্ষমতার অধিকারী, অঘটন-ঘটন পটিয়সী শক্তি। পাগল আত্মভোলা শিবের সারল্য থেকে বেরিয়ে এসে মনসা-চণ্ডী-কালিকার মতো দেবীরা উগ্রচণ্ডা রণরঙ্গিনী মূর্তিতে ভক্তের মনোবাঞ্ছা পূরণে উদ্যোগী হলেন। হিন্দু কবিদের লেখনীতে একদিকে যেমন দেবদেবীর এই উগ্ররূপের প্রকাশ ঘটল, তেমনি সেই ভয়ঙ্কর মূর্তির কাছে শত্রুপক্ষের শোচনীয় পরাজয়ে এক পরোক্ষ তৃপ্তির হাস্যমুখ উঁকি দিয়েছিল। তাই বিজয় গুপ্তের মনসামঙ্গলকাব্যে হাসান-হোসেন পালায় দেবমহিমার কাছে মুসলমানদের পরাজয়ের কৌতুককর কাহিনি বর্ণিত হয়েছে। বিপ্রদাস পিপলাইয়ের কাব্যেও তুড়ুক (তুর্কি) জমিদারের সঙ্গে মনসার বিরোধ ও পরিণতিতে জমিদারের নতি স্বীকারে একই মনোভাবের প্রতিফলন ঘটেছে। অবশ্য পরবর্তীকালে দেবদেবীর এই উগ্রতা ও ভয়ঙ্করত্ব অনেকটাই স্তিমিত হয়েছে। সেক্ষেত্রে দীর্ঘ সহাবস্থানে হিন্দু-মুসলমানের পারস্পরিক বোঝাপড়া, শাসকশ্রেণির বিচক্ষণতা এবং শ্রীচৈতন্যদেবের প্রেমধর্মের প্রভাব মিশ্র উপাদান হিসাবে কাজ করেছে। বাস্তবিক মঙ্গলকাব্যগুলির সামাজিক পটভূমি পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে জীবনের প্রয়োজনে, বাঁচার তাগিদে, আত্মরক্ষার স্বার্থে মঙ্গলকাব্যগুলির উদ্ভব ঘটেছিল। এগুলির উৎসভূমি ছিল বাংলার লোকায়ত ব্রত। আর ব্রতগুলির উৎস প্রসঙ্গে অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর মন্তব্য করেছেন—'...ঋতু পরিবর্তনের সঙ্গে মানুষের যে দশা বিপর্যয় ঘটত সেইগুলোকে ঠেকাবার ইচ্ছা ও চেষ্টা থেকেই ব্রতক্রিয়ার উৎপত্তি। বিচিত্র অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে মানুষ বিচিত্র কামনা সফল করতে চাচ্ছে, এই হল ব্রত...।' (বাংলার ব্রত) আর সেজন্যই আজো মেয়েরা মঙ্গলচণ্ডীর ব্রত করতে গিয়ে দেবীকে আবাহন জানায় 'আঘাটে ঘাট করতে, আপথে পথ করতে, অরাজককে রাজ্য দিতে, আইবুড়োর বিয়ে দিতে, হাপুতির পুত্র দিতে, নির্ধনকে ধন দিতে, চোরের বন্ধন ঘোচাতে।' সেখানে মঙ্গলচণ্ডীর কাছে তাদের ঐকান্তিক প্রার্থনা—

আপদ ফাঁড়া দূর করে দাও।
পথের কাঁটা সরিয়ে দাও।
দূরের মানুষ নিকটে এনে দাও।
দুই ঠাঁইকার মানুষ এক ঠাঁই করে দাও।
শত্রুর বিনাশ করে দাও।
সব কামনা সিদ্ধ করে মা জয়যুক্ত করে দাও।

বলাবাহুল্য এই বাস্তব চাওয়া পাওয়ার মধ্যে জীবনমুখী মানবিক আবেগের আকুতিই প্রধান হয়ে উঠেছে। একইভাবে মঙ্গালকাব্যগুলিও মানুষের জাগতিক চাওয়া-পাওয়াগুলিকে বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছে। আর সেজন্যই মঙ্গালকাব্যের ভণিতাগুলি পারত্রিক মুক্তির আকাঙ্ক্ষা অপেক্ষা ইহমুখী জীবনবোধের প্রকাশে অধিকতর উজ্জ্বল। যেমন—

১। নারায়ণ দেবে কয় বন্দিয়া বিসহরি।
পদ্মার বরে সভাকার বাড়ে ঠাকুরালি॥
২। দ্বিজ মাধবানন্দে দেবীপদে আশ।
ভক্ত সেবকের তরে বিঘ্ন কর নাশ॥
৩। কবিচন্দ্র ভণে দেবগণের কুলাঞ্জি।
সুখ মোক্ষ হয় যেই শুনে চিত্ত মাজি॥
অপুত্রের পুত্র হয় অধনের ধন।
দুর্ভিক্ষ না হয় দেশে অকাল মরণ॥
৪। রামাঞি পণ্ডিত ভণে এ কথা জে জন সুনে
তারে বর দেন নিরঞ্জন।
৫। অনাদ্যমঙ্গাল দ্বিজ রূপরাম গান।
যেই জন শুনে তারে রক্ষে ভগবান॥
৬। দেবীর চরণে জানে কবি বিষ্নুপাল ভণে
বর মাগি মনসার পায়।
কমলা ভরসা সুখ খণ্ডাবে সভার দুখ
নায়কে হবে বরদায়॥
৭। রামচন্দ্র পদদ্বন্দ্বে বন্দিয়া ত্রিপদী ছন্দে
আনন্দ হৃদয়ে ঘনরাম।
কবিরত্ন রসভাষে শ্রবণে পাতক নাশে
সুপ্রকাশে পূরে মনস্কাম॥
৮। কবি কৃষ্ণরাম বলে কালীর মঙ্গাল।
শুনিলে পলায় দুঃখ সদাই কুশল॥

ওপরের ভণিতাগুলির দিকে দৃষ্টি দিলে এই সত্যটি স্পষ্ট হবে যে বস্তুজগতে বেঁচেবর্তে থাকার আকুতিই কবিগণ নানাভাবে এখানে উচ্চারণ করেছেন। পাশাপাশি পারত্রিক মুক্তির আকাঙ্ক্ষায় দেবতার চরণাশ্রয়ের বন্দনা প্রসঙ্গা উত্থাপিত হলেও তার মধ্যে শুধু কবিদের

ব্যক্তিগত ভাবনা নয়, ধর্মাচ্ছাদিত সমাজ-মানসের প্রতিফলন ঘটেছে। মঙ্গলকাব্যের ভণিতায় কবিগণ নিজ পুত্রকন্যা, পরিজন, পৃষ্ঠপোষক জমিদার, রাজা কিংবা ধনাঢ্য ব্যক্তির জন্য দেবতার কাছে অনুকম্পা প্রার্থনা করেছেন। তবে সকলেই রাজা বা জমিদারের পৃষ্ঠপোষকতা পাবার সৌভাগ্যলাভে সমর্থ হননি। সেক্ষেত্রে অনেকে যে বাড়িতে কাব্যপাঠের আসর বসত, সেই গৃহস্থের প্রতি কিংবা বাদশাহ-জমিদার-বিত্তশালী ব্যক্তির কৃপালাভের বাসনা থেকে আগাম প্রশংসা বা কল্যাণ কামনা করে দেবতার কাছে প্রার্থনা জানাতেন।

সামাজিক গুরুত্বের দিক থেকে এই শ্রেণির ভণিতাগুলির বিশেষ তাৎপর্য আছে। মঙ্গলকাব্যের এক শ্রেষ্ঠ কবিব্যক্তিত্ব মুকুন্দ চক্রবর্তীর চণ্ডীমঙ্গলকাব্যের এ ধরনের ভণিতাগুলির সাহায্যে এই প্রবণতা ও সামাজিক তাৎপর্যের একটু পরিচয় নেওয়া যেতে পারে। যেমন ধরা যাক কবিকঙ্কণের এই ভণিতাটি—

রচিআ ত্রিপদী ছন্দ গান কবি শ্রীমুকুন্দ
রঘুনাথ রাজার প্রকাশে।

কিন্তু রঘুনাথ রায় কেবল কবির কাব্যের অনুপ্রেরণাদাতা বা প্রকাশক মাত্র ছিলেন না। ধন-মান দিয়ে তিনি কবির জীবনকে পূর্ণতাও দিয়েছেন। আর সেই কথাটিও কবি ভণিতায় উচ্চকণ্ঠে ঘোষণা করতে ভোলেননি :

নৃপতি রঘুনাথ কৈল অবধান
দিআ বহুধন কৈল বহুমান
গীত গাইল মুকুন্দ কবিবর।

সন্দেহ নেই এই ‘বহুধন’ প্রাপ্তিতেই কবি মুকুন্দ চক্রবর্তী তাঁর দুর্যোগপূর্ণ জীবনের শেষে এক সুখের আনন্দ নিকেতনে উপস্থিত হয়েছিলেন। তাই তো কবিকণ্ঠে শোনা যায় ‘সুখে থাকি আরড়া নগরে।’ কবির ‘আত্মপরিচয়’ থেকে জানা যায় যে ডিহিদার মামুদ শরিফের অত্যাচারে তাঁকে দামিন্যা গ্রামের পিতৃপুরুষের ভিটেমাটি ত্যাগ করে পথে নামতে হয়েছিল। পথে নানান বিড়ম্বনা ও ঘাত-প্রতিঘাত কাটিয়ে কবি আরড়া গ্রামের জমিদার বাঁকুড়া রায়ের আশ্রয়ে যান। সেখানে সম্ভবত জমিদার-পুত্র রঘুনাথ রায়ের গৃহশিক্ষক রূপে সম্মানিত হন এবং তাঁর সাহায্য ও আনুকূল্যে চণ্ডীমঙ্গলকাব্য রচনা করেন। সুতরাং এহেন পৃষ্ঠাপোষক রাজার জন্য কবি কয়েকছত্র প্রশস্তিবাক্য রচনা করবেন এতো স্বাভাবিক।

রাজা রঘুনাথ গুণে অবদাত
রসিক মাঝে সুজান।
তার সভাসদ রচি চারুপদ
শ্রীকবিকঙ্কণ গান॥

আর সবশেষে দেবী চণ্ডীর কাছে কবির আন্তরিক প্রার্থনা ‘ব্রাহ্মণভূমের পতি/ রঘুনাথ নরপতি/ জয় চণ্ডী তারে কর দয়া।’ কেননা, কবি জানেন যে আশ্রয়দাতার সুখ-সমৃদ্ধির

ওপরেই তাঁর নিশ্চিন্ত জীবনের বিষয়টি নির্ভরশীল। এদিক থেকে দেবীর কাছে পৃষ্ঠপোষকের জন্য দয়া ভিক্ষা করে কবি নিজের আশ্রয় ও নিরাপত্তাকেই সুনিশ্চিত করার ইচ্ছা প্রকাশ করেছেন।

কবিকঙ্কণের মতো অন্যান্য মঙ্গালকবিগণও নানাভাবে পেট্রন-প্রসঙ্গা তাঁদের ভণিতায় এনেছেন। যেমন ধর্মমঙ্গালের কবি ঘনরাম চক্রবর্তী বর্ধমানের রাজা কীর্তিচন্দ্রের, শিবমঙ্গালের কবি শঙ্কর কবিচন্দ্র বিষ্ণুপুরের রাজা বীরসিংহের, শীতলামঙ্গালের কবি মেদিনীপুর জেলার অন্তর্গত খেপুত গ্রামের শ্রীকৃষ্ণকিঙ্কর বর্ধমানের মহারাজ কীর্তিচন্দ্রের, তীর্থমঙ্গালের কবি বিজয়রাম সেন কৃষ্ণচন্দ্র ঘোষালের, অন্নদামঙ্গালের কবি ভারতচন্দ্র নদীয়ার কৃষ্ণনগরের মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের পৃষ্ঠপোষকতার কথা বলেছেন। বিজয়গুপ্তও তাঁর মনসামঙ্গালে নৃপতি হুসেন শাহের বিস্তর স্তুতি গেয়েছেন। এই পেট্রন প্রসঙ্গো সমাজবিজ্ঞানী শুশকিং (Schucking) এর একটি মন্তব্য স্মরণ করা যেতে পারে— 'The history of literature is in large part the history of the beneficence of individual princes and aristocrats.' একথাটি মনে রাখলে বোঝা যায় যে ভণিতার মধ্যে পৃষ্ঠপোষক রাজা বা জমিদারের নাম নির্দেশ শুধুমাত্র কবির নিজস্ব জীবনী সম্পর্কিত তথ্যজ্ঞাপন নয়, ইতিহাসের সমাজসত্যেরও এক পরিচয়বাহী।

শুশকিং আরো বলেছেন যে রাজা বা অভিজাত শ্রেণি যেহেতু রুটি জোগান দিতেন সেহেতু সাহিত্য-শিল্প-সংস্কৃতিও অল্পবিস্তর তাঁদের রুচি দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হত। কবি সাহিত্যিক শিল্পীরা সেক্ষেত্রে বাদশাহ আমীর ওমরাহ—এককথায় সামন্ত প্রভুদের চশমার মধ্য দিয়ে জগত ও জীবনকে দেখতেন—'...in the middle ages much of the principal art kept entirely within the General out look of the bread-giver... The world is seen through the spectacles of the feudal lord.' শুশকিং-এর এই মন্তব্য সর্বাংশে সত্য না হলেও কোনোভাবে উপেক্ষণীয় নয়। তাই মঙ্গালকাব্যের মধ্যেও অনেক ক্ষেত্রে পৃষ্ঠপোষক অন্নদাতার বিশেষ নিয়ন্ত্রক ভূমিকা কাজ করেছে। বিত্তশালী শ্রেণির বিলাস, কামকলা, জলক্রীড়া, পায়রা ওড়ানো, বহুপত্নীক জীবনের লীলা-বৈচিত্র্য, বাণিজ্যযাত্রার মতো বিষয়গুলি তাই মঙ্গালকাব্যে এক বিস্তৃত অধ্যায় জুড়ে বসেছে।

দরবারি সমাজের প্রবল প্রভাবে কবি ও তাঁর কাব্যকে কীভাবে শিকার হতে হয়, ভারতচন্দ্র রায়গুণাকর তার জ্বলন্ত প্রমাণ। ভারতচন্দ্রের কাব্যের প্রথম খণ্ডের শেষে মানসিংহ পালা বর্ণনার উল্লেখ আছে। অথচ দেখা যায় বিদ্যা ও সুন্দরের অবৈধ প্রেমের সরস কাহিনি দ্বিতীয় খণ্ডে চলে এসেছে যা অনেকাংশে অপ্রাসঙ্গিক। মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের রাজসভার দূষিত দরবারি আদর্শই তাঁকে অন্নদামঙ্গালকাব্যের মধ্যে বিদ্যাসুন্দর পালার সংযোজনে অনুপ্রাণিত করেছে। তাই এর মধ্যে কবির আত্মবিক্রয়ের ইতিহাস লুকিয়ে আছে। ভারতচন্দ্রের মতো একজন প্রতিভাবান কবির এই আত্মবিক্রয় লক্ষ করেই হয়তো প্রমথ চৌধুরী তাঁর 'ভারতচন্দ্র' প্রবন্ধে আক্ষেপ করে বলেছেন—'পরের মনোরঞ্জন করতে গেলে সরস্বতীর বরপুত্রকেও নটবিটের পর্যায়ভুক্ত হতে হয়। ভারতচন্দ্র তার প্রমাণ।'

মহাভারতের অনুবাদ প্রসঙ্গেও দেখা যায় যে ভারতকথার বিভিন্ন পর্বের মধ্যে অশ্বমেধ পর্বের পুথি পাওয়া গেছে সবচেয়ে বেশি। কেননা মুসলমানি রাজসভায় এই পর্বটির বিশেষ সমাদর ছিল। তাই অধিকাংশ পৃষ্ঠপোষক এই পর্বটির অনুবাদ কর্মে কবিদের উৎসাহিত করেছেন। বলাবাহুল্য, তার মধ্য দিয়ে পৃষ্ঠপোষকের অভিরুচির বিশিষ্ট প্রতিফলন ঘটেছে।

বাস্তবিক পেট্রন সম্পর্কিত ভণিতাগুলির পশ্চাতে কবিমনে দুটি ভাবনা কাজ করেছে।

এক— পৃষ্ঠপোষকের আর্থিক সাহায্য ও কৃপাতে সুখস্বচ্ছল জীবনের কামনা। (বিষয়টি আগেই উল্লেখ করা হয়েছে)

দুই— কাব্যের মৃত্যুঞ্জয়ত্ব।

সাধারণভাবে সব কবিরই একান্ত ইচ্ছা, তাঁর কাব্য জনসমাজে সমাদৃত হোক। কিন্তু সেক্ষেত্রে কবিদের অসামান্য প্রতিভার শিল্পিত প্রকাশই শেষ কথা নয়, সমাজের বিত্তশালী তথা প্রভাবশালী ব্যক্তিদের স্বীকৃতি ও দেবতার স্বপ্নাদেশের প্রসঙ্গও এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করেছে। আসলে কবিগণ যেমন জানতেন পৃষ্ঠপোষক রাজা বা ভূস্বামী সুখে থাকলেই তাঁরা সুখে থাকবেন। অর্থাৎ, অন্নদাতার গৃহে অন্নপূর্ণা বাঁধা থাকলেই তাঁদের গৃহও অন্নে পূর্ণ থাকবে, তেমনি এ সত্যও তাঁদের নিকট অজানা ছিল না যে এই সব রাজা-ভূস্বামীদের কাছে কাব্য পূজিত হলেই তবে তা লোকসমাজে সাদরে গৃহীত হবে। তাই তো কৃত্তিবাসের কাব্যে শুনি 'গৌড়েশ্বর পূজা কৈলে গুণের হয় পূজা'।

গৌড়েশ্বর কিংবা তাঁর অধীনস্থ সামন্ত প্রভু জমিদাররাই সমাজের মূল নিয়ামক শক্তি, দণ্ডমুণ্ডের কর্তা। তাঁদের নির্দেশেই সাধারণ মানুষের ওঠা-বসা। আর সেজন্য দেখি মনসাকে মর্ত্যে পূজা প্রচারের জন্যে অপমান, লাঞ্ছনা, এমনকি হেঁতালের লাঠির আঘাত খেয়েও চাঁদ সদাগরের পেছনে ছুটতে হয়েছে। অথচ মনসা তার আগেই জালু-মালু বা হাসান-হোসেনদের পূজা পেয়েছেন। এই কাহিনি থেকে একটা কথা জলের মতো পরিষ্কার যে হাজার হাজার জালু-মালু হাসান-হোসেনদের পক্ষে যা সম্ভব নয়, একা চাঁদ সদাগর তা পারেন। তাই চাঁদ সদাগরের অনিচ্ছাকৃত বাম হাতের ফুলেও মনসার খুশির সীমা নেই। হাতটি বাম কী ডান, সেটা বড়ো কথা নয়, যেহেতু হাতটি চাঁদ সদাগরের সেহেতু তাঁর নামের ঐন্দ্রজালিক ক্ষমতাই মনসার পূজাকে সামাজিক স্বীকৃতি দিয়েছে। এটাই ইতিহাসের এক অমোঘ মহাসত্য।

মনসার মতো কবিরাও জানেন যে গৌড়েশ্বর এবং তাঁর অধীনস্থ সামন্ত প্রভুরাও একা যা পারেন, রাম-রহিমদের পক্ষে তা অসম্ভব। তাই তাঁরা রাজা বা জমিদারের স্তুতিগান যেমন করেছেন, তেমনি নিজেদের সম্পর্কে শংসাপত্র আদায়ে সচেস্ট হয়েছেন। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে পৃষ্ঠপোষক রাজা বা ধনাঢ্য ব্যক্তি কবির অন্নদাতা বা আশ্রয়দাতা মাত্র নন, কবির কাব্যের পাবলিসিটির সহায়ক হিসাবে কাব্য-প্রচারকও। এদিক থেকে পেট্রন সম্পর্কিত ভণিতাগুলির মধ্য দিয়ে সামন্ততান্ত্রিক সমাজ-ব্যবস্থার এক বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ চরিত্র ফুটে উঠেছে।

বাংলাদেশের ধর্মাশ্রয়ী জীবন সম্পর্কেও মঙ্গাল কবিগণ সচেতন ছিলেন। দেবদেবীর মহিমাজ্ঞাপক কাব্য রচনা করতে গিয়ে তাঁরা দৈবী স্বপ্নাদেশের প্রসঙ্গা এনে কাব্যের ধর্মীয় ভিত্তিকে যেমন সুদৃঢ় করেছেন, তেমনি ধর্মভীরু মানুষ যাতে-ভয়ে ভক্তিতে তাঁর কাব্যকে গ্রহণ করে সেদিকেও সতর্ক দৃষ্টি রেখেছেন। আর তাই ছোটো-বড়ো সব কবিই কাব্যে দৈবী স্বপ্নাদেশকে গুরুত্ব দিয়েছেন। কিন্তু তা পেট্রন-প্রসঙ্গাকে অতিক্রম করেনি। এ প্রসঙ্গো ভারতচন্দ্রের একটি ভণিতা স্মরণ করা যেতে পারে :

আরে বাছা ভারত শুনহ মোর বাণী।
তোমার জননী আমি অন্নদা ভবানী।
কৃষ্ণচন্দ্র অনুমতি দিলেন তোমারে।
মোর ইচ্ছা গীতে তুমি তোষহ আমারে।।

এখানে দেবী অন্নদা কবিকে স্বপ্নে দেখা দিয়ে কাব্য রচনা করতে বলেছেন। কিন্তু লক্ষণীয় বিষয় যে দেবীর নির্দেশে নয়, পৃষ্ঠপোষক রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের অনুমতিই প্রধান হয়ে উঠেছে। ‘কৃষ্ণচন্দ্র অনুমতি দিলেন তোমারে’— এই বাক্যেই দেবতার ওপরে অন্নদাতা পৃষ্ঠপোষকের শ্রেষ্ঠত্ব নির্দেশিত হয়েছে।

অন্যভাবেও বিষয়টিকে দেখা যেতে পারে। কবিকঙ্কণ মুকুন্দ চক্রবর্তীর আত্মপরিচয় অংশ থেকে জানা যায় যে কবি জন্মভূমি দামিন্যা গ্রাম ত্যাগ করে স্ত্রী পুত্র পরিজন নিয়ে পথে পথে ভ্রাম্যমান অবস্থায় দেবী চণ্ডীর স্বপ্নাদেশ পেয়েছিলেন— ‘পথে চণ্ডী দিলা দরশন’। আত্মপরিচয়ে দেখা যাচ্ছে কবি মোগল-পাঠান বিরোধের সময় পরিণত বয়সে গৃহত্যাগ করেছিলেন। সুতরাং ১৫৭৫ বা তার কাছাকাছি কোনো সময়ে তিনি সম্ভবত দামিন্যা ছেড়েছিলেন। কাব্যের একস্থলে ‘গৌড়বঙ্গা উৎকল অধিপ’ হিসাবে মানসিংহের প্রশস্তি আছে। ১৫৯৪ থেকে ১৬০৪ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত মানসিংহ বাংলার সুবেদার ছিলেন। বাঁকুড়া রায় ও তাঁর পুত্র রঘুনাথ রায় ১৫৭৩-১৬০৪ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত জমিদারি শাসন করেছিলেন। সুতরাং ষোড়শ শতকের শেষদিকেই কবির কাব্য সম্পূর্ণ হয়েছিল। এখানে লক্ষণীয় যে কবি মুকুন্দ চক্রবর্তী দেবীর স্বপ্নাদেশ পেয়েছিলেন অনেক আগে। কিন্তু সেই স্বপ্নাদেশ বাস্তবায়িত হয়েছে অনেক পরে। যতদিন পর্যন্ত তাঁর কাব্যের উপযুক্ত পৃষ্ঠপোষকতা না এসেছে ততদিন পর্যন্ত দেবীর স্বপ্নাদেশ নিষ্ফলা থেকে গেছে।

অনুরূপভাবে ভারতচন্দ্রের মতো প্রতিভাবান কবিকেও নানান প্রতিকূলতা অতিক্রম করে মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের সান্নিধ্যে না আসা পর্যন্ত নীরব থাকতে হয়েছে। তাই একথা বলতে দ্বিধা নেই যে দেবতার স্বপ্নাদেশ কবিদের সমাজপৃষ্ঠে অবতীর্ণ হয়ে হঠাৎ যুগান্তকারী দীপ্তিতে উদ্ভাসিত হয়ে ওঠার প্রেরণা দান করেনি। বরং পৃষ্ঠপোষক রাজা বা ভূস্বামীদের আনুকূল্য সাহিত্যিক প্রতিভার বীজ অঙ্কুরিত হতে সাহায্য করেছে। এদিক থেকে প্রতিভার বিকাশের ও স্বীকৃতির ইতিহাস বৃহত্তর সামাজিক ইতিহাসের একটি অধ্যায় এবং মঙ্গালকাব্যের এ জাতীয় ভণিতাগুলি তারই স্মারক হিসেবে উল্লেখযোগ্য।

মঙ্গালকবিরা তাঁদের অনেক ভণিতায় ব্যক্তিজীবন সম্পর্কিত নানান তথ্যাবলি যেমন

পিতামাতা বা পুত্রকন্যার নাম, বাসস্থান, দেবতার অনুগ্রহ প্রার্থনা ইত্যাদি উপস্থিত করেছেন। ব্যক্তিজীবন প্রাসঙ্গিক এইসব ভণিতাগুলি সাহিত্যের ইতিহাস রচয়িতার কাছে মূল্যবান সন্দেহ নেই, কিন্তু কবি ব্যক্তিত্বকে জানার পক্ষে কোনোভাবে অপরিহার্য নয়। অন্যদিকে তেমন বেশ কিছু ভণিতা আছে যেখানে কবির অন্তর্জীবনই উন্মোচিত হয়েছে। যেমন—বিজয় গুপ্ত তাঁর মনসামঙ্গল কাব্যে (পদ্মাপুরাণ) আরাধ্য দেবীর বন্দনা করতে গিয়ে বলেছেন—

আমি বটি যন্ত্র মাগো যন্ত্রী বটো তুমি।
মা বলে বাজাও যন্ত্র তা বলিব আমি।।

এটি কেবল নিছক দেববন্দনা নয়, এর মধ্যে ফুটে উঠেছে কবির আত্মবিলুপ্তির ইতিহাসও। এই আত্মবিলুপ্তি কবিকঙ্কণ মুকুন্দ চক্রবর্তী, রূপরাম চক্রবর্তী, কৃষ্ণরাম দাস প্রমুখ কবিদের মধ্যেও লক্ষ করা যায়।

১। হাথে লৈয়া পত্রমসী আপনি কলমে বসি
জে বোলান জেই বা লিখান।
নাহি জানি কি কৌতুকে অম্বিকা মুকুন্দমুখে
নিজ সংকীর্তন রস গান।।

২। রূপরাম গীত গান অনাদ্য কিঙ্কর।
কলমে বসিয়া খেলা করে মায়াধর।।

৩। কবি কৃষ্ণরাম বলে শুনগো শীতলা।
রচিলো তোমার গীত যেমত কহিলা।।

কবিদের এই আত্মবিলোপের কথা মনে রেখেই অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত প্রাচীন ও আধুনিক কবিতার প্রস্থানভূমির পার্থক্য নির্দেশ করতে গিয়ে বলেছেন সে প্রাচীন কাব্যের মূলসূত্র রচয়িতার আত্মবিলুপ্তি এবং পরবর্তীকালের কবিতার উপপাদ্য অভিমানী অহং। কিন্তু সেই সঙ্গে কবি-সমালোচক এ কথাও স্বীকার করেছেন যে বাংলা কবিতায় আধুনিকতার চরিত্র ও মাত্রা সংক্রান্ত আলোচনায় প্রাক্-মধুসূদন অধ্যায়ের প্রবেশাধিকার অস্বাভাবিক নয়। এই উক্তিটির যাথার্থ্য সম্বন্ধে সন্দেহ থাকে না যখন দেখি ভারতচন্দ্রের এই ভণিতাটি—

নিত্য তুমি খেল যাহা নিত্য নহে ভাল তাহা
আমি যে খেলিতে চাহি সে খেলা খেলাও হে।
তুমি যে চাহনি চাও সে চাহনি কোথা পাও
ভারত যেমত চাহে সেই মতো চাও হে।

একেবারে বিজয় গুপ্তের বিপরীত কথা। আর এখানেই প্রথম সূচিত হল কবিকণ্ঠের নিজস্ব আকুতি। শশিভূষণ দাশগুপ্তের মতো সাহিত্য-সমালোচকগণ কেন কবিকঙ্কণ, চণ্ডীদাস, কৃত্তিবাস বা কাশীরাম দাসকে মধ্যযুগের কবি বলেন এবং ভারতচন্দ্রকে প্রাগাধুনিক কবিরূপে চিহ্নিত করেন, তা বুঝতে আর আমাদের অসুবিধা হয় না।

ভারতচন্দ্র যখন তাঁর কাব্যে ভণিতায় 'নৌতনমঙ্গল' রচনার কথা জানান তখন প্রচলিত

কাব্যধারায় তাঁর স্বাতন্ত্র্য-চিহ্নিত অবস্থান সম্পর্কে এক আত্মবিশ্বাসী কণ্ঠের উচ্চারণ শোনা যায়। একই ভাবে রামেশ্বর ভট্টাচার্য তাঁর 'শিবায়ন' কাব্যে বলেছেন 'ভব্যভাব্য ভদ্রকাব্য ভণে রামেশ্বর।' লোকায়ত শিবকাহিনির স্থূল গ্রাম্যতা দূর করে তাকে এক মার্জিত শিল্পরূপ দেবার আন্তরিক ইচ্ছা এখানে কবি প্রকাশ করেছেন। কতটা সাফল্য এসেছে, সেটা বড়ো কথা নয়, আপন ইচ্ছা ঘোষণার উচ্চকণ্ঠই এখানে প্রধান।

ভণিতায় কবিদের ব্যক্তিগত ধর্মবিশ্বাস ও ভক্তিভাবের প্রকাশও চমৎকারভাবে ঘটেছে। কবিকঙ্কণ তাঁর এক ভণিতায় বলেছেন—

উমাপদ হিত চিত   রচিল নৌতন গীত
চক্রবর্তী শ্রীকবিকঙ্কণ।

অথচ কাব্যের শুরুতেই আছে 'গোবিন্দ ভকতি মাগে / চক্রবর্তী শ্রীকবিকঙ্কণ'। একই সঙ্গে 'উমাপদ হিতচিত' এবং 'গোবিন্দ ভকতি মাগা'-র মধ্যে যে উদার ধর্মবোধের পরিচয় মেলে তা একাধারে ব্যক্তিক এবং তৎকালীন সমাজ-মানসের প্রতিফলন। শ্রীচৈতন্যদেবের বৈষ্ণবীয় প্রেমধর্মের প্লাবনে শুধু নদে ডুবু ডুবু নয়, সমগ্র বাংলাদেশ ভেসেছিল। ফলে সেই প্লাবনে শাক্ত কবিরাও না ভেসে পারেননি। তাই কবিকঙ্কণের মতো দ্বিজ রামদেবের 'অভয়ামঙ্গালে'ও বিষ্ণুপদের ছড়াছড়ি। ভারতচন্দ্রের কাছেও হরিহর অদ্বৈত সত্তায় বিরাজিত।

একই কলেবর   হইলা হরিহর
বুঝিতে প্রেম পরিচ্ছেদ।
যে জানে দুইরূপে   সে মজে মোহকূপে
ভারতে নাহি এই খেদ।।

মঙ্গালকবিদের সমাজমনস্কতা ভণিতায় কখনো কখনো আশ্চর্য দীপ্তিতে ধরা পড়েছে। যেমন ভারতচন্দ্রের কথাই ধরা যাক। ভারতচন্দ্রের যুগে রাষ্ট্রিক বিশৃঙ্খলা, বর্গি আক্রমণ, শাসকশ্রেণির ভোগবিলাস, সাধারণ প্রজাদের ওপর রাজস্ব আদায়ের জবরদস্তি, সর্বোপরি খাদ্যাভাব এক চরম সংকট ঘনিয়ে তুলেছিল। ফলে অন্নের হাহাকার চতুর্দিকে ধ্বনিত হয়ে উঠেছিল। নিরন্ন মানুষের এই আর্তনাদ রামপ্রসাদের মতো তন্ময় সাধকের চিত্তেও তীব্র প্রতিক্রিয়া জাগিয়েছিল। তাই তিনি শ্যামা মায়ের নিকটে প্রার্থনা জানিয়েছেন—

অন্ন দে গো অন্ন দে গো অন্ন দে গো অন্নদা।

ভারতচন্দ্রের সমাজসচেতন কবিমনও এই অন্নহীনতার প্রেক্ষাপটে দেবীকে অন্নদা মূর্তিতে উপস্থিত করেছেন। অন্নহীন সমাজের প্রতিনিধিরূপে কবি দেবীর কাছে প্রার্থনা জানালেন—

'ভারত বিনয় করে / অন্নে পূর্ণ করো ঘরে...।'

ঈশ্বর পাটনীর 'আমার সন্তান যেন থাকে দুধেভাতে'র প্রার্থনার মধ্যেও অনাহারক্লিষ্ট মানুষের চিরন্তন বাণীই বেজে উঠেছে। অন্য এক ভণিতায়ও কবি ভারতচন্দ্রের একই বক্তব্যের প্রতিধ্বনি শুনি—

পরশিয়া অন্নসুধা   ভারতের হর ক্ষুধা

মা বিনা বালকে অন্ন কে দেয় ডাকিয়া।

প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্রের আশ্রয়ে থেকে ভারতচন্দ্রের হয়তো অন্নাভাব ছিল না। কিন্তু কৃষ্ণচন্দ্রের আশ্রয়লাভের আগে তাঁকে তো অনেক ঘাটের জল খেতে হয়েছে। সেখানে কি তিনি কখনো অন্নহীনতার জ্বালা অনুভব করেননি? বাস্তবিক তাঁর স্বানুভব অভিজ্ঞতা কিংবা বৃহত্তর সমাজবোধ থেকেই জন্ম হয়েছে এই কথাগুলির 'আমার সন্তান যেন থাকে দুধে ভাতে' কিংবা 'অন্নে পূর্ণ করো ঘরে', অথবা 'পরশিয়া অন্নসুধা/ ভারতের হর ক্ষুধা।'

ভারতচন্দ্র জীবনের কবি, আর একটু এগিয়ে বলা যায় ভারতচন্দ্র যৌবনের কবি। তাঁর সেই যৌবনোচিত ভোগচেতনা, বৃহত্তর অর্থে জীবনমুখিতার প্রকাশ বিভিন্ন ভণিতায় আছে। যেমন এই ভণিতাটি—

ভারতের গোবিন্দের চরণের আশ।
পরিণাম হরিনাম আর কামপাশ।।

একই সঙ্গো হরিনাম ও কামপাশের কথা স্বতঃই মধ্যযুগের অন্যান্য কবিদের চেয়ে ভারতচন্দ্রের স্বাতন্ত্র্যকে সুস্পষ্ট করে তোলে। তাঁর পূর্ববর্তী বাংলা কাব্য অবশ্য জীবন-বিমুখ নয়। কিন্তু সেখানে ভারতচন্দ্রের মতো চিৎকার নেই। ভারতচন্দ্র যখন বলেন—

ভারতচন্দ্রের ভারতী যোগ।
যৌবনেতে কর যৌবন ভোগ॥

তখন তাঁর দেহবাদের সংরক্ত প্রকাশে শুধু কৃষ্ণচন্দ্রের দরবারি দূষিত আদর্শ বা বিকৃতি রুচির অন্বেষণ করাটা সুবিবেচনার কাজ নয়। কবির এক বিশিষ্ট জীবনদর্শন এখানে সক্রিয়। আর সেজন্যই তাঁর কাব্যে মদন ভস্মীভূত হলেও কাম মরে না। সেখানে শিবকে কামজ্বালায় অস্থির হতে হয়। তাঁর চরিত্ররা যৌবনে জীবন উপভোগ অপেক্ষা দেবপূজাকে তুচ্ছ করে বলেছে, 'এ নব বয়সে, ছাড়িয়া এ রসে, কার পূজা করে কেটা।'

আসলে ভারতচন্দ্রের এই বলিষ্ঠ জীবনবাদ সে যুগের পক্ষে ছিল বিস্ময়করভাবে অভিনব। আর সেজন্যই ভুল বোঝার অবকাশও ছিল বেশি। বৈষ্ণবদর্শনের ভাষ্যে প্রেম 'নিকষিত হেম কামগন্ধ নাহি তায়।' অথচ ভারতীয় জীবনদর্শন ধর্ম-মোক্ষের সঙ্গো কাম-অর্থকেও সমান গুরুত্ব দিয়েছিল। ভারতচন্দ্র সেই দর্শন মেনেই উচ্চকণ্ঠে হরিনাম ও কামপাশ, কিংবা যৌবনেতে যৌবনভোগের কথা ঘোষণা করেছেন।

মঙ্গালকাব্যের কবিরা কাব্যকাহিনি বর্ণনা প্রসঙ্গো পাদপূরণে অনেক সময় এমন সব ভণিতা দিয়েছেন যেখানে কবি-মনোভাবেরও বিশিষ্ট উন্মোচন ঘটেছে। যেমন কবিকঙ্কণের বণিক খণ্ডের এই ভণিতাটি—

একজন সহিলে কন্দল জায় দূর।
বিশেষ জানএ চক্রবর্তী ঠাকুর।।

এই উপলব্ধি কি শুধুই কবির লোকাভিজ্ঞতাজাত, না ব্যক্তিগত জীবনের পাতা থেকে

তুলে আনা? একইভাবে ভারতচন্দ্রও বলেছেন—

কহিছে ভারতচন্দ্র রায় গুণাকর।
দু সতীনে ঘরে দাসী অনর্থের ঘর॥

কেননা, সতীনদের মধ্যে 'দুজনে দ্বন্দ্ব করে/ দাসী আনন্দে চরে/ ভারত কহে আড়াআড়ি।'

রতিবিলাপের ভণিতাটিও কবি ভারতচন্দ্রের মনটিকে বোঝার পক্ষে বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। ভণিতাটি হল এরকম—

ভারতচন্দ্র কয় কাঁদিলে কি আর হয়
এই ফল বিরহীর শাপে।

যে ভারতচন্দ্রের ভারতীযোগ যৌবনেতে যৌবনভোগ, যিনি মনে করেন 'যৌবনে সকলি ধন্য', অবৈধ হওয়া সত্ত্বেও বিদ্যা ও সুন্দরের মিলন সংঘটনে যাঁর প্রীতি ও সহানুভূতি, তিনি যে সতীহারা বিরহী শিবের পক্ষেই থাকবেন, তা স্বাভাবিক। ভিখারী শিবের একমাত্র আশ্রয় ছিল সতীর ভালোবাসা। তা থেকে বঞ্চিত হয়ে শিবের শূন্য হৃদয়ের অন্তহীন জ্বালা এবং তা থেকে মুক্ত হবার জন্যই তাঁর তপস্যায় নিবিষ্টচিত্ত হওয়া। কিন্তু সেখানেও মদন পঞ্চশর নিক্ষেপ করে তাঁর মগ্ন সাধনায় বাধার সৃষ্টি করেছেন। ফলে যাবতীয় ক্রোধ গিয়ে পড়েছে মদনের ওপর। তাই 'এই ফল বিরহীর শাপে' কথাটি নিছক ভণিতার বিষয়-নির্দেশক পাদপূরণ নয়, কবির মনোদর্শনের এক উজ্জ্বল প্রতিভাস।

আর একটি ভণিতা দিয়ে আলোচনা শেষ করব। ভণিতাটি সুন্দরের ছদ্মবেশের বর্ণনা প্রসঙ্গে দেওয়া হয়েছে।

কখন নাটক কখন চেটক
কখন ঘটক কখন পাঠক
কখন গায়ক কখন গণক
ভারতের মনোহর হে॥

একি শুধু সুন্দরের ছদ্মবেশ? রাজসভার কবি হিসাবে এবং জীবনের বন্ধুর পথে ঠোক্কর খেতে খেতে ভারতচন্দ্র বিচিত্র অভিজ্ঞতার সম্মুখীন হয়েছিলেন। দেখেছিলেন নানান ছদ্মবেশী মানুষ— সাধুবেশে চোর, মিত্রবেশে ঘাতক, চাটুকার বেশে অনিষ্টকারী। হয়তো রাজসভার চারপাশেই তা দেখেছেন। একটু দুঃসাহস দেখিয়ে বলা যায় হয়তো মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের মধ্যেই তিনি দেখেছেন এই সব মহতী গুণের (?) সমাবেশ। কেননা, শাসকের বেশে শোষক, সংস্কৃতির রক্ষকবেশে বিকৃতি রুচির পঙ্কিলতায় ডুবে থাকার চিত্র তো তাঁর চোখের সামনেই হামেশা ঘটেছে। এদিক থেকে ভণিতাটি তাঁর সূচিমুখ যন্ত্রণায় আর্ত কবির অভিজ্ঞতার এক নির্যাস।

উৎসের সন্ধানে

১। জয়ন্তকুমার দাশগুপ্ত সম্পাদিত : বিজয় গুপ্তের ‘পদ্মাপুরাণ’
২। তমোনাশচন্দ্র দাসগুপ্ত সম্পাদিত : নারায়ণ দেবের ‘পদ্মাপুরাণ’
৩। সুকুমার সেন সম্পাদিত : বিপ্রদাস পিপলাইয়ের ‘মনসাবিজয়’
৪। সুধীভূষণ ভট্টাচার্য সম্পাদিত : দ্বিজ মাধবের ‘মঙ্গলচণ্ডীর গীত’
৫। সুকুমার সেন সম্পাদিত : কবিকঙ্কণ বিরচিত ‘চণ্ডীমঙ্গল’
৬। আশুতোষ দাস সম্পাদিত : দ্বিজ রামদেবের ‘অভয়ামঙ্গাল’
৭। দীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য ও আশুতোষ ভট্টাচার্য : রামকৃষ্ণ কবিচন্দ্রের ‘শিবায়ন’
৮। পঞ্চানন চক্রবর্তী সম্পাদিত : রামেশ্বরের রচনাবলী
৯। আশুতোষ ভট্টাচার্য সম্পাদিত : ‘বাইশা’ সংকলন
১০। ভক্তিমাধব চট্টোপাধ্যায় : রামাই পণ্ডিতের ‘শূন্যপুরাণ’
১১। সুকুমার সেন ও পঞ্চানন মণ্ডল : রূপরামের ‘ধর্মমঙ্গাল’ (১ম খণ্ড)
১২। পীযূষকান্তি মহাপাত্র : ঘনরাম চক্রবর্তীর ‘ধর্মমঙ্গাল’
১৩। সত্যনারায়ণ ভট্টাচার্য : কবি কৃষ্ণরাম দাসের ‘গ্রন্থাবলী’
১৪। ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোঃ ও সজনীকান্ত দাস : ‘ভারতচন্দ্রের গ্রন্থবলী’
১৫। সত্যনারায়ণ ভট্টাচার্য : ‘রামপ্রসাদের জীবনী ও কাব্য সমগ্র’
১৬। পুলকেন্দু সিংহ : ‘মুর্শিদাবাদের লোকায়ত সঙ্গীত ও সাহিত্য’ (১ম খণ্ড)
১৭। বিনয় ঘোষ : ‘জনসভার সাহিত্য’
১৮। প্রমথ চৌধুরী : ‘প্রবন্ধ সংগ্রহ’
১৯। অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত : ‘স্থির বিষয়ের দিকে’
২০। শশিভূষণ দাশগুপ্ত : ‘বাংলা সাহিত্যের নবযুগ’
২১। দেবনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় : ‘রাজসভার কবি ও কাব্য’
২২। শঙ্করীপ্রসাদ বসু : ‘কবি ভারতচন্দ্র’
২৩। অরবিন্দ পোদ্দার : ‘মানবধর্ম ও মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্য’

মঙ্গালকাব্যে মিথ

অরিন্দম সরকার

মঙ্গালকাব্যে 'মিথ' বা 'লোকপুরাণে'র ভূমিকা উল্লেখযোগ্য ও গুরুত্বপূর্ণ। এই মিথ-এর পশ্চাতে রয়েছে লোককথার প্রাপ্ত পুরাণকেন্দ্রিক মোটিফের আদর্শ। সংস্কৃতগন্ধী পুরাণের আদর্শকে সরিয়ে রেখে মঙ্গালকাব্যগুলি লোকায়ত জীবনকথায় প্রাপ্ত গল্পকথাকে আশ্রয় করে বিস্তার লাভ করেছিল। ফলত, দেখা গেছে মঙ্গালসাহিত্যের সময়ের সমাজবীক্ষণের ক্ষেত্রে মিথগুলি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করেছে। ওই সময়ে মানুষের বিশ্বাস ও সংস্কার গড়ে উঠেছিল লৌকিক দেবদেবীকে কেন্দ্র করে। লৌকিক দেবদেবীরা ভীষণ উগ্র প্রকৃতির। তাদের সন্তুষ্ট করে মধ্যযুগীয় মানুষেরা অভীষ্ট-প্রাপ্তির আশায় উন্মুখ হয়েছিল। আলস্যমণ্ডিত পৌরাণিক দেবতারা সরে গেল। স্থান করে নিল মঙ্গালকাব্যের দেবদেবীরা ও তাদের পশ্চাতে থাকা লোকপুরাণগুলি। এই লোকপুরাণগুলি সততই বিভিন্ন গোত্রের অদ্ভুত বৈশিষ্ট্যের ধারক ও বাহক। তার মধ্যে কখনও এসেছে বাহনের সংস্কার, কখনও পুনর্জন্মবাদের বা সৌভাগ্য-দুর্ভাগ্যের সংস্কার, আবার কখনওবা বিশ্বাসঘাতক বন্ধুর আদর্শ। কখনও এই মিথের মধ্যে রূপবতী নারীর দেহলাবণ্যের প্রসঙ্গা এসেছে। কবিরা মিথকে মঙ্গালকাব্যের উপাদানরূপে ব্যবহার করতে গিয়ে দেবদেবীর অলৌকিক তত্ত্বের মধ্যে তাদের অলৌকিক জন্মকথা; আগে মৃত্যু পরে জন্ম, বিবাহের রাত্রে মৃত্যুর আশীর্বাণীর কথা; স্বপ্ন বা আকাশবাণীর কথা; খাদ্যদ্রব্যের মাধ্যমে মৃত্যুর কথার প্রসঙ্গা এনেছেন। দেবতার মধ্যে সৃষ্টি-স্থিতি-লয়ের প্রসঙ্গোর সঙ্গো সঙ্গোই এসেছে দেবতার মানবায়ন বা মানবের দেবনির্ভরতা প্রসঙ্গোর কথা। মানবও দেবতার সঙ্গো একাসনে বসতে চান। ফলত, সৃষ্টিতত্ত্বের মাধ্যমে জগৎ ও জগতের জীবসৃষ্টির প্রসঙ্গো কথা ব্যক্ত করা হয়েছে। বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গী তখনকার মানবের মধ্যে ছিল না। তখন তারা জীব সৃষ্টির বিষয়টিকেই ব্যক্ত করতে চেয়েছেন 'সৃষ্টিপত্তন' অংশের মাধ্যমে। এখানেও 'লোকপুরাণ' বা 'মিথের' গুরুত্ব রয়েছে। মধ্যযুগের কবিরা আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গীসম্পন্ন। তাঁরা শুধু পুরাণকে নিয়েই চিন্তা করেননি, কেন পুরাণকে এভাবে ব্যাখ্যা করা হয়েছে তার ভেতরকার বৈজ্ঞানিক রহস্যও উন্মোচন করার চেষ্টা করেছেন। আর সে কারণেই আধুনিক তাত্ত্বিক-সমালোচকগণ পৌরাণিক তত্ত্বগুলিকে সেই যুক্তিবাদের আলোকে ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করেছেন। নীচে কিছু বৈশিষ্ট্যের ভিত্তিতে মঙ্গালকাব্য সাহিত্যে কীভাবে 'লোকপুরাণ' বা 'মিথ' আলোচিত হয়েছে, তা সংক্ষেপে দৃষ্টান্ত দিয়ে ব্যাখ্যা করা হল—

১.

‘বাহন’ শব্দটি এখন যানবাহন রূপে ব্যবহার করা হলেও ‘বাহন’ শব্দটি দেবতার আসন হিসেবেও সেসময় ব্যবহৃত হতো এবং তাত্ত্বিকগণ-এর যৌক্তিক ব্যাখ্যা দিয়ে প্রমাণ করে দিয়েছেন কেন বিভিন্ন দেবতার বিভিন্ন প্রকার বাহন এবং সেই বাহন শুধু আদিম কৌম জীবনের প্রতীক নয়। বাহনগুলি দেবদেবীর বিভিন্ন কার্যের ধারক ও বাহক বলে প্রতিভাত হয়েছে। বিশেষত প্রাগার্য দ্রাবিড়, অস্ট্রিক গোষ্ঠীর প্রাগার্য, লোকায়ত-সংস্কার লোক-পুরাণের ধারাকে বর্ধিত করেছে—এটাও কিয়দংশে সত্য। দেবদেবীর বাহনের মধ্যে কোথাও কৃষিসংস্কার, কোথাও আবার প্রজননের সংস্কার; কোথাও শক্তিমান বলবীর্যের সংস্কারের ইঙ্গিত বহন করার দিকটি নির্দেশ করে চলেছে। যেমন—ভীষণদর্শন অপ্রতিরোধ্য মৃত্যুর শক্তির কারণে যমের বাহন মহিষ; কর্মক্ষম-বলবান ও শুক্রল দেহের জন্য শিবের বাহন ষাঁড় ও সেই ষাঁড় শিবের মতোই একাধারে চণ্ড ও অপরধারে শিষ্টের প্রতিমূর্তি। অশ্ববাহনের দেবতা সূর্য। অশ্ব দ্রুততার প্রতীক, যজ্ঞের তিনিই মেধা। তাই অশ্ব বিশেষ স্থান লাভ করেছিল। মনসার সর্পবাহন প্রজননের প্রতীক; গণেশের ইঁদুর বাহন কৃষির প্রতীক আবার কৃষিসভ্যতা ধ্বংসেরও ইঙ্গিতবাহী। ইন্দ্রের হস্তি প্রচণ্ড শক্তির প্রতীক। ব্রহ্মা হংসবাহন দেবতা—জ্ঞানের প্রতীক হল হংস। ‘হংস’ পরম বীজ রূপে জ্ঞাত হয়েছে। ময়ূরবাহন দেবতা কার্তিকের ময়ূর কার্তিকের অস্থির মতি বা চঞ্চলতার সঙ্গে প্রজননের প্রতীক। এভাবে বাহন সংস্কারের মাধ্যমে মিথকে ব্যাখ্যা করা যেতে পারে। সিংহবাহিনী দেবী চণ্ডিকার কেশরী প্রচণ্ড শক্তির প্রতীক এবং মহিষের প্রচণ্ড শক্তির কাছে প্রবল পরাক্রমী রূপে পরিগণিত হয়। এদিক থেকে বাহন সংস্কারকে লোক পুরাণের লোক উপাদানরূপে ব্যক্ত করা হয়েছে।

২.

‘মিথ’ সৃষ্টিতে পুনর্জন্মবাদ-এর অসামান্য ভূমিকা রয়েছে। মানুষের বিশ্বাস এই যে পুনর্জন্মের মাধ্যমে মানুষ তার অপূর্ণ উদ্দেশ্যকে পূরণ করতে পারে। দেবতা-মানবের পুনর্জন্মের মাধ্যমে মঙ্গালকাব্যে অসাধ্য সাধন ঘটতে দেখা যায়। ভারতীয় দর্শন ও অধ্যাত্মতত্ত্বে পুনর্জন্মবাদ বিশেষ ভূমিকা নিয়ে রয়েছে। মনসামঙ্গালে লখিন্দরের পুনর্জন্ম; চণ্ডীমঙ্গালে ইন্দ্রপুত্র নীলাম্বরের কালকেতু রূপে জন্ম; পরে দেবীর কার্য সমাধার পর তাদের ইন্দ্রলোকে প্রত্যাবর্তন উল্লেখযোগ্য বিষয়। অলৌকিক সৃষ্টি-পত্তন বিভিন্নভাবে ব্যাখ্যা করা হয়েছে। কোথাও নিরঞ্জন; কোথাও বায়ুতে ভর দিয়ে ভেসে থাকা পরম পুরুষ; কোথাও পরম পুরুষ ও পরমা প্রকৃতির মিলনে, জগৎ সৃষ্টি; আদ্যার সৃষ্টির স্বতন্ত্র রহস্য—সবকিছুকেই বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গী তৈরি হওয়ার পূর্বে ব্যক্ত করা হয়েছে। তখনকার দিনের মানুষেরা একান্ত ধর্ম বিশ্বাসে এই মিথকে ব্যক্ত করতে চেষ্টা করেছিলেন। লোকায়ত পুরাণও হয়তো নিজেদের অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখতে পারত না। তবুও লোকায়ত বিশ্বাসের প্রতি যত্নবান মানুষ তাকে সুন্দরভাবে টিকিয়ে রাখার চেষ্টা করেছেন।

৩.

লোকপুরাণে সৌভাগ্যের দেবী, দুর্ভাগ্যের দেবী-র ধারণা রয়েছে। যে দেবী মানুষকে ধন-সম্পদ-সমৃদ্ধি দান করতে পারেন; তিনি সৌভাগ্যের দেবী। আর যিনি মুখ্যত ঈর্ষাপরায়ণা, প্রতিহিংসায় উন্মত্তা, তিনি দুর্ভাগ্যের দেবীরূপে চিহ্নিত। সৌভাগ্যের দেবী রূপে চন্ডিকা ও দুর্ভাগ্যের দেবীরূপে মনসার প্রসঙ্গ উত্থাপিত হয়েছে। মৃত্যুর কথা বলে জন্মগ্রহণ করার মতো বিচিত্র ঘটনা লোকপুরাণে দেখা যায়। মৃত্যুর মত বিচ্ছেদের ইঙ্গিত যেখানে অগ্রে স্থান লাভ করে। যেমন—লখিন্দরের জন্মগ্রহণের পূর্বে মনসার আশীর্বাদ—"বাসরে মরিবে সর্পাঘাতে...।"

৪.

দেবতাদের জন্মগ্রহণে রয়েছে বরাবর বিচিত্রতার ইঙ্গিত। বিভিন্ন উপায়ে তাদের জন্ম হচ্ছে। কখনওবা বীর্য পত্রে বা পক্ষিণীর মাধ্যমে পাতাল চলে গিয়ে; কখনওবা বীর্য শরবনে পতিত হয়ে; কখনওবা গাত্রমলের মাধ্যমে; কখনও বা যজ্ঞের কুন্ড থেকে; আবার কখনও বা পরম পুরুষের হাস্বিতে, আবার কখনওবা কুসুমের গোটা ফল থেকে, কখনও আবার নাসারন্ধ্র থেকে। যথা ব্রহ্মার নাসারন্ধ্র থেকে বরাহ বিষ্ণুর সৃষ্টি; এভাবেই চণ্ডী বা আদ্যা; কার্তিকেয়; মনসা; শীতলা; ধর্মগোসাঞির; গণেশের উৎপত্তিকে লোকপুরাণে ব্যক্ত করা হয়েছে। শাপভ্রষ্ট নীলাম্বর যেভাবে কালকেতু ব্যাধ হয়ে জন্মায় বা মণিকর্ণ যেভাবে ধনপতি হয়ে জন্মায় সেটা সত্যই আশ্চর্যের বিষয়। আবার নেতের অঞ্চল চিরে নৃত্যা বা নিত্যাদেবীর জন্মবৃত্তান্তও সমভাবে গুরুত্বপূর্ণ ও প্রাসঙ্গিক। গণেশের মুণ্ডহীন দেহ গৌরীর গাত্রমলের অভাব—এমনও বলা হয়েছে।

৫.

লোকপুরাণের উপাদান হিসেবে রূপসী নারীদের প্রসঙ্গ উত্থাপিত হয়েছে। রূপসী-নারীর অবয়ব সৌন্দর্য ও তার সাজসজ্জার সৌষ্ঠব নিয়ে মধ্যযুগের কবিরা তাঁদের কৃতিত্ব দেখিয়েছেন। যেমন—রূপবতী দেবী চণ্ডীর প্রসঙ্গ। এছাড়াও লোকপুরাণের দেবতাদের বিচিত্র বৈশিষ্ট্য লক্ষ করার মতো। রজোগুণ বিশিষ্ট শঙ্করের প্রসঙ্গ উত্থাপিত হয়েছে। মহাদেব ধ্বংসের দেবতা। তিনি তমোগুণোময়। দক্ষযজ্ঞে বীরভদ্রের মাধ্যমে যজ্ঞনাম করে দক্ষের মুণ্ড কর্তন করে অগ্নিতে নিক্ষেপ করেন। ব্রহ্মার পঞ্চানন রূপ ঘুচিয়ে নিজে পঞ্চানন হন সতীর বিবাহসভায় লোলুপ পিতামহ ব্রহ্মার একটি মুণ্ড কর্তন করে। লোকপুরাণের প্রসঙ্গে দেবতাদের বিচিত্র গুণের প্রসঙ্গও উত্থাপিত হয়েছে—যা লোকপুরাণকেই পক্ষান্তরে সমৃদ্ধ করেছে।

৬.

আকাশবাণী ও স্বপ্ন দর্শন মধ্যযুগের মঙ্গলকাব্যে এক বিশেষ উপকরণ বলে গণ্য হয়। এটি লোকপুরাণকে সমৃদ্ধ করেছে বলেই মনে হয়। দেবী বা দেবতা আকাশবাণী বা স্বপ্নের মাধ্যমে মঙ্গলকাব্যের পাত্র বা পাত্রীদের সতর্ক বা আগাম জানান দিয়েছেন বলে মনে হয়। যেমন—বিশ্বকর্মার প্রতি মনসার আকাশবাণী বা সমাজকে স্বপ্ন দর্শন দিয়ে মাতৃত্বের শুভ সংবাদ দিয়ে যাওয়া। চণ্ডীর স্বপ্নদর্শন দিয়ে কলিঙ্গারাজ সুরথকে ভয় দেখানো প্রভৃতি।

৭.

নারী লোকপুরাণের মধ্যে হয়ে উঠেছেন সততই প্রতিহিংসাপরায়ণা, স্বার্থচরিতার্থ না হলে যেমন তিনি প্রতিহিংসাপরায়ণ হয়ে ওঠেন; তেমনি আচারে অনুরূপভাবে প্রতিহিংসাপরায়ণ হয়ে ওঠেন অবৈধ সন্তান সম্পর্কে। সেখানে পতিদেবতার ক্রোধ সন্তানের ওপরে গিয়ে পড়ে। লোকপুরাণ বা 'মিথ' সৃষ্টিতে এর কিয়দ্ ভূমিকা লক্ষ করার মতো। যেমন—মনসার প্রতিহিংসাপরায়ণী হয়ে ওঠা; চণ্ডীর শিশু মনসাকে দেখে শিবের প্রতি ক্রোধে মনসার ওপর অকথ্য নির্যাতন চালানো; মনসার অঙ্গহানি হওয়া প্রভৃতি।

৮.

লোক উপাদানের মধ্যে রয়েছে লোকপুরাণের প্রসঙ্গ। লোকপুরাণের দেবতা বা দেবীরা পর্বতে একাকী বসবাসে অভ্যস্ত এমন দেখা যায়। যেমন—শিব, মনসা, চণ্ডী এরা পর্বতবাসিনী; আবার কখনও বা প্রাগার্যদের পূজার উপকরণ ঘট, বৃক্ষ প্রভৃতির জন্য বৃক্ষবাসিনী বা গর্ভিনী-নারীর প্রতীক ঘটকে অবলম্বন করে বিস্তার বা প্রতিষ্ঠা পাওয়ার চেষ্টায় সেখানে অবস্থান করেন। তাই ঘট বসাবার প্রসঙ্গও এসেছে। এরপর লোক-পুরাণে বিভিন্নভাবে জীবনদান প্রসঙ্গ এসেছে। দেবী বিভিন্নভাবে দেবতাদের জীবনদান করে তাদের আয়ু রক্ষায় তৎপর হয়েছেন—

১. মনসার শিবকে প্রাণদান
২. মনসার চণ্ডীকে প্রাণদান
৩. মনসার ধন্বন্তরি/শঙ্কর গারুড়ীকে প্রাণদান।
৪. মনসার লখিন্দরের প্রাণদান।

৯.

লোকপুরাণ অনুযায়ী দেবতাদের বিচিত্র নামকরণ ও তার যুক্তি দেখানো হয়েছে। এতে দেবতা বা দেবীর নামকরণ-সংক্রান্ত বিশেষতত্ত্বটি সুষ্ঠ ও সুচারুভাবে ব্যাখ্যাত হয়েছে। দেবাদিদেব মনসাদেবীর বিভিন্ন নামকরণ করেছেন—বিভিন্ন পরিস্থিতিতে দেবীর বিবিধ নামকরণকে চিহ্নিত করা হয়েছে। যেমন—পদ্মপত্রে জন্ম বলে দেবী 'পদ্মাবতী', মনকে মথন করে জন্মেছেন বলে দেবী 'মনসা'; ঈশানের কন্যা বলে দেবী 'ঈশানী'; শিব তাঁকে মহাজ্ঞান দান করায় দেবী 'মহাজ্ঞানযুক্তা' বলেও পরিচিতা। বিষ হরণ করার জন্য দেবী 'বিষহরি'। দেবী চণ্ডীর ক্ষেত্রে অরণ্যকুল রক্ষা করায় দেবী 'অরণ্যানী' নামেও পরিচিতা।

১০.

দেবদেবীর মধ্যে অন্তর্বিরোধ মঙ্গলকাব্যের লোকপুরাণ অংশকে সর্বদা সমৃদ্ধ করেছে। ফলে 'লোকপুরাণ' বা 'মিথ্' সৃষ্টির অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হিসাবে তাদের মধ্যে দ্বন্দ্ব দেখতে পাওয়া যায়। যথা—'গঙ্গা-চণ্ডীর দ্বন্দ্ব', 'মনসা-যম দ্বন্দ্ব' ও তার ফলে যুদ্ধ; 'যম ও চণ্ডীর বিরোধ'; 'বিশ্বকর্মা-মনসা বিরোধ' প্রভৃতি। এগুলি বিভিন্ন দিক থেকে লোকায়ত জীবনকে পুষ্ট করেছে।

১১.

লোকপুরাণের পশ্চাতে রয়েছে বিভিন্ন ধরনের সংস্কার; যেমন—আঁচল পেতে ভিক্ষা চাওয়া। মানুষের বিশ্বাস সে আঁচল পেতে ভিক্ষা চাওনা। মানুষের বিশ্বাস যে, আঁচল পেতে যদি ভিক্ষা চাওয়া হয়, তবে সে মনস্কামনা অবশ্যই পূরিত হয় এবং শুধু তাই নয়—যার জন্য এ ভিক্ষা চাওয়া হয়, সে দীর্ঘজীবন লাভ করে। এজন্যই হয়তো বেহুলা লখিন্দরের জন্য আঁচল পেতে তার প্রাণভিক্ষা চেয়েছিল। 'শুভসংখ্যা' অনেক সময় লোকপুরাণের উপকরণ রূপে কাজ করে। শুভসংখ্যা থেকে অনেক গুণ বা বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে আলোচনা করা সম্ভব হয়। যেমন—কার্তিকেয়ের শুভসংখ্যা '৬'। এ বিষয়ে বিভিন্ন ব্যাখ্যা দেওয়া যেতে পারে।

ক. ষড়রিপু ধ্বংসকারী দেবতা।

খ. ষড় কৃত্তিকা দ্বারা পালিত 'ষড়ানন' ষড়গুণান্বিত।

গ. ষড় দিবসে পূজিতা দেবী ষষ্ঠী তাঁর প্রণয়িনী; ফলত প্রজননের বা সন্তান প্রদানকারী দেবতা 'গুহ' কোথাও বা 'স্কন্দকান্তা রূপিনী ষষ্ঠীর' সঙ্গে সম্পর্কান্বিত।

১২.

আত্মাতত্ত্বকে লোকপুরাণের উপকরণ বলে ব্যাখ্যা করা হয়েছে। ব্রহ্মাণ্ডে সতত সঞ্চরণশীল কোটি আত্মা নর, দেব, পশু, পক্ষী, পতঙ্গ প্রভৃতির রূপ ধারণ করে অভিজ্ঞতা সঞ্চয়ের জন্য। এইকারণে স্বামী অভেদানন্দ আত্মাতত্ত্বকে গুরুত্বপূর্ণ লোকপুরাণের উপকরণ বলে গ্রাহ্য করেছেন। দেবী চণ্ডী, মনসা প্রত্যেকেই ব্রতান্তে পাত্র-পাত্রীর জীব নিয়ে স্বর্গে যান। তাদের পূর্বরক্ষিত দেহে প্রাণ দেন। এখানেও আত্মাকে জীব বলা হয়েছে। ফলত আত্মাতত্ত্ব লোকপুরাণের আলোচনায় উল্লেখযোগ্য স্থান লাভ করেছে। সবশেষে বলা যায়—বিভিন্ন উদ্দেশ্যে বিভিন্ন দেবীর বা দেবতার পূজা মধ্যযুগে দেখা গেছে। মনস্কামনা পূরণের দেবী মনসা, সন্তান প্রদানের জন্যও তাকে পালনের জন্য দেবী ষষ্ঠী, রোগ-ব্যধি মুক্তির দেবী শীতলা, কুষ্ঠমুক্তির দেবতা ধর্ম, অন্নকস্ট নিবারণের দেবী অন্নদা প্রমুখ। 'লোকপুরাণ' বা 'মিথ' আলোচনা করার ক্ষেত্রে এঁদেরকে নিয়ে লেখা মঙ্গালকাব্যে বিভিন্ন বৈশিষ্ট্য প্রতিভাত হয়, যাতে বোঝা যায়, মধ্যযুগীয় বাতাবরণে লালিত দেবদেবীরা ও তাদেরকে পরিবেস্টন করে থাকা লোক উপাদানে সমৃদ্ধ লোকপুরাণ মধ্যযুগের মঙ্গালকাব্য সাহিত্যকে যে শুধু সমৃদ্ধ করেছে তাই নয়, মঙ্গালকাব্যকে রীতিমত পুস্ট করা ছাড়াও লোক উপাদানে সমৃদ্ধ লোকপুরাণ সমস্ত মঙ্গালকাব্য সাহিত্যে একটি গুরুত্বপূর্ণ উপকরণ হিসাবে পরিগণিত হয়েছে। সংস্কৃতগন্ধী পৌরাণিক বাতাবরণের বাইরে প্রাগার্য লোকসমাজকে তুলে ধরে এই লোকউপাদানগুলি মঙ্গালকাব্যে অন্য মাত্রা যোগ করেছে।

মঙ্গালকাব্য : 'রূপসী বাংলা'র কবি ও কয়েকজন

অনিলকুমার রায়

যে কোনো দেশের যে কোনো সাহিত্যই একটা দেশ, একটা কালের জীবনপ্রবাহকে ধরে রাখার চেষ্টা করে। সেই জীবনপ্রবাহকে নিজস্ব জীবনবোধে আত্মস্থ করে লেখক তাকে বিশেষ নান্দনিকতায় পৌঁছে দেন। জীবনবোধের গভীরতার স্পর্শে সাহিত্য হয়ে ওঠে মনোহারী। এ ধরনের সাহিত্য বিশেষ শিল্প-মণ্ডিত। কিন্তু আরেক ধরনের সাহিত্য আছে তাতে জীবনবোধের গভীরতার সঙ্গো জীবনের চলমান সহজ রূপকেও যথাযথভাবে তুলে ধরতে প্রয়াসী হন লেখক। দ্বন্দ্ব-জটিলতামুক্ত সুখ-দুঃখ মথিত সহজ মানবসংসারকে প্রকৃতির নিবিড় সান্নিধ্যে তুলে ধরতে সচেষ্ট হন লেখক। স্বচ্ছ দৃষ্টি নিয়ে লেখক জগৎ আর জীবনের ছবি আঁকেন। এ ধরনের সাহিত্য রচনায় তাই চলমান স্বাভাবিক জীবনের ছবি আছে। কোনোরকম কৃত্রিমতা তাতে স্পর্শ করতে পারে না। লেখক বস্তুদৃষ্টি নিয়ে জীবন ও জগৎকে দেখেন। এখানে লেখকের আত্মবোধ অপেক্ষা বস্তুগত চিত্রণই বড়ো হয়ে দেখা দেয়। মহাকাব্যের বৈশিষ্ট্য আলোচনা করতে গিয়ে রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী বলেছিলেন—

> মহাকাব্যের মধ্যে একটা উন্মুক্ত, অকৃত্রিম স্বাভাবিকতা আছে, তাহা বোধ করি আর কখনও ফিরিয়া আসিবে না।[১]

এই অকৃত্রিম স্বাভাবিকতা বস্তুমুখীন সাহিত্য মাত্রেই সত্য।

মধ্যযুগে রচিত বাংলা মঙ্গালকাব্যগুলি দীর্ঘ সময় ধরে বিস্তৃত। মঙ্গালকাব্যের কবিরা দেব-দেবীর মাহাত্ম্যকীর্তন করতে গিয়েও সমকালীন জীবন ও জীবন-পরিবেশকে যথাযথ-ভাবে তুলে ধরতে ভোলেন নি। বরং দেব-দেবীর মাহাত্ম্য অপেক্ষা জীবনের সহজ দ্বন্দ্ব তথা প্রকৃতির অনাবিল সৌন্দর্যকেই তুলে ধরতে কবিরা বেশি আগ্রহী হয়েছেন। একটা দেশ-কালের চলমান ছবিই যেন মঙ্গালকাব্যগুলিতে বিধৃত হয়ে আছে। মঙ্গালকাব্যগুলি, বিশেষত, মনসামঙ্গাল, চণ্ডীমঙ্গাল, ধর্মমঙ্গাল কাব্য পাঠ করলে আমরা খুঁজে পাই গ্রামীণ বাংলার জনজীবনের সহজ ছন্দকে। নৈসর্গিক পরিবেশে সে জনজীবন ছিল জটিলতামুক্ত, স্বতঃস্ফূর্ত। মনীষী রাজনারায়ণ বসু বলেছেন—

> প্রাচীন কবি কবিকঙ্কণ, ভারতচন্দ্র, রামপ্রসাদ, রামবসু ইহাদের কবিতা যেন ঠিক স্বভাবের হস্ত হইতে বাহির হইয়াছে।[২]

এই স্বভাবের হস্ত বা সহজগ্রাসী রূপের জন্য মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্য বিশেষত, মঙ্গালকাব্যগুলি আধুনিককালের কবিদের কাছে অনুপ্রেরণা হয়ে উঠেছে। মঙ্গালকাব্যের কবিরা মুক্ত দৃষ্টি দিয়ে যে আখ্যান রচনা করেছেন এবং সেই আখ্যান রচনা করতে গিয়ে জীবন ও প্রকৃতি মিলিয়ে যে শাশ্বত বাংলার ছবি এঁকেছেন তাই একালের কবি জীবনানন্দ দাশকে বড়ো বেশি আকর্ষণ করেছে। তাঁর 'রূপসী বাংলা' কাব্যগ্রন্থটি এদিক থেকে উল্লেখযোগ্য দৃষ্টান্ত।

'রূপসী বাংলা' কাব্যটি গ্রন্থাকারে প্রকাশ পায় ১৯৫৭ সালের ৩১ জুলাই। কিন্তু এ কাব্যের কবিতাগুলি রচিত হয়েছিল কবির জীবিত অবস্থায় ১৯৩২ সালে। এ সময় কবিমানস কেমন ছিল তা জানাতে গিয়ে কবিভ্রাতা অশোকানন্দ দাশ জানিয়েছেন—

> পঁচিশ বছর আগে খুব পাশাপাশি সময়ের মধ্যে একটি বিশেষ ভাবাবেগে আক্রান্ত হয়ে কবিতাগুলি রচিত হয়েছিল। এ-সব কবিতা 'ধূসর পাণ্ডুলিপি' পর্যায়ের শেষের দিকের ফসল।[৩]

'ধূসর পাণ্ডুলিপি' কাব্য রচনাকালে বাংলাদেশে তখন স্বাদেশিকতার আন্দোলন চলছে। ১৯৩০ সালে সত্যাগ্রহ আন্দোলন জোরালো হয়ে উঠেছে। চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠন এবং সন্ত্রাসবাদী আন্দোলনের দাবানল তখনও জ্বলছে। যে বরিশাল শহরে কবি মানুষ হয়েছেন সেই শহরই রাজনৈতিক আন্দোলনে উত্তাল। কবির আত্মীয়স্বজনও রাজনীতির সঙ্গো প্রত্যক্ষভাবে জড়িত। অথচ কবি আপন মুদ্রাদোষে তখন একা, অর্ন্তমুখী, নির্জনতাপ্রিয়। পূর্ববাংলার গ্রামীণ রূপ-সৌন্দর্যে কবি তখন বড্ড বেশি নিমগ্ন, 'বনলতা সেন' পর্বে কবি যদি নাটোরের বনলতা সেনের কাছে দু-দণ্ড শান্তি পেয়ে থাকেন, তাহলে 'রূপসী বাংলা'র কবিতাগুলি রচনাকালে কবি গ্রামের নদী, মাঠ-ঘাট, গাছপালা সমস্ত কিছুর মধ্যে দীর্ঘ শান্তি খুঁজে পেয়েছেন। সেখানে কবি প্রাণে সাড়া পেয়েছেন। তাই বলেন—

> নরম ধানের গন্ধ—কল্‌মীর ঘ্রাণ,
> হাঁসের পালক, শর, পুকুরের জল, চাঁদা সরপুঁটিদের
> মৃদু ঘ্রাণ, কিশোরীর চাল ধোয়া ভিজে হাত—শীত হাতখান,
> কিশোরের পায়ে-দলা মুথা ঘাস,—লাল লাল বটের ফলের
> ব্যথিত গন্ধের ক্লান্ত নীরবতা—এরি মাঝে বাংলার প্রাণ :
> আকাশে সাতটি তারা যখন উঠেছে ফুটে আমি পাই টের।

এক নিভৃততম অবকাশে, সন্ধ্যার অন্ধকারে এ সবের মাঝেই কবি যেন বাংলার প্রাণ-স্পন্দন শুনতে পান আর কবিও যেন বাংলার শাশ্বত সৌন্দর্যের গভীর অনুভবে সমৃদ্ধ হয়ে ওঠেন। এই প্রসঙ্গো, বিশিষ্ট সমালোচক, সাহিত্যিক নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় জানিয়েছেন—

> রূপসী বাংলায় জীবনানন্দ এক বিশ্রান্ত হৃদয় বাংলার প্রকৃতির মধ্যে এলিয়ে দিয়ে ধীরে ধীরে তার মধ্যে জারিত হয়ে যাচ্ছেন।[৪]

বস্তুত এই জারিত অবস্থাতেই কবি পৌরাণিক পরিমণ্ডলে বিশেষত, মঙ্গালকাব্যের

পরিবেশে বাংলার শাশ্বত সৌন্দর্যকে আবিষ্কার করেন, অখণ্ড সময়চেতনায় কবির চোখে দেখা বাংলা মঙ্গলকাব্যের পটভূমিকায় বিস্তার লাভ করে। কবির অনায়াস বিচরণ ঘটে বেহুলা, লহনা, সনকা, চাঁদ সদাগরের জগতে। প্রকৃতির ঋতুরঙ্গশালায় জীবনের স্বাভাবিকতা, প্রকৃতির অকৃপণ দাক্ষিণ্য ঐতিহ্যসচেতন কবি জীবনানন্দকে গভীরভাবে আকৃষ্ট করেছে। তাই বারে বারে 'রূপসী বাংলা' কাব্যের বিভিন্ন কবিতায় মঙ্গলকাব্যের অনুষঙ্গ আসে। রবীন্দ্রনাথের দেখা বাংলার সঙ্গে জীবনানন্দের দেখা বাংলার পার্থক্য দেখাতে গিয়ে কবি সমালোচক সঞ্জয় ভট্টাচার্য বলেছেন—

> রবীন্দ্রনাথের স্বপ্ন প্রসারিত মন স্বর্গ থেকে বাংলার মাটিতে অবতরণ করেছে মাত্র। জীবনানন্দের স্বপ্ন গভীর চোখ করুণ কোমল বাংলাকে মঙ্গলকাব্যের বাংলায় মিশিয়ে স্বর্গে নিয়ে গেছে।[৫]

'বাংলার মুখ আমি দেখিয়াছি, তাই আমি পৃথিবীর রূপ খুঁজিতে যাই না আর' শীর্ষক কবিতায় কবি গ্রামবাংলার শাশ্বত রূপকে ধরতে চেয়েছেন। পৃথিবীর অন্তহীন রূপ যতই চিত্তাকর্ষক হোক, কবি বাংলার জাম-বট-কাঁঠাল-হিজল প্রভৃতি গাছপালার মধ্যে দেখেছেন বাংলার চিরন্তন ঐশ্বর্যকে যার বিকল্প হতে পারে না পৃথিবীর রূপ। বাংলার রূপকে কবি বিস্তৃতি দিলেন মঙ্গলকাব্যের পরিমণ্ডলে। বাংলার প্রকৃতি সেই মঙ্গলকাব্যের যুগের বাঙালি মানুষের সুখ-দুঃখের সঙ্গে জড়িত হয়ে আছে। তাই কবি 'ফণীমনসার ঝোপে শটি বনে' বাংলার গাছপালার যে ছায়া দেখেছেন তাই একদিন চাঁদ সদাগরও দেখেছিলেন মধুকর ডিঙা থেকে। শুধু তাই নয়, বেহুলাও গাঙুরের জলে মৃত স্বামীর ভেলা নিয়ে যাবার সময় এমনই অশ্বত্থ-বট আচ্ছাদিত বাংলার রূপ দেখতে পেয়েছিলেন। আবার ইন্দ্রের সভায় ছিন্ন খঞ্জনার মতো বেহুলার নাচ আর তার পায়ে ঘুঙুরের মতো নাচের ছন্দে বাংলার নদী-মাঠ-ভাঁটফুলের কান্না শোনা গিয়েছিল। কবির দেখা গ্রামবাংলার শ্যামলরূপ মঙ্গলকাব্যে বেহুলা চরিত্রের মধ্যে দিয়ে যেন সমৃদ্ধ হয়ে উঠেছে। বেহুলা এবং বাংলার প্রকৃতি অভিন্ন হয়ে উঠেছে। মঙ্গলকাব্যের মধ্যে দিয়ে ঐতিহ্যপুষ্ট বাংলা-ই কবির চোখে মায়াকাজল পরিয়ে দিয়েছে। পৃথিবীর রূপ তাঁর কাছে একেবারেই মূল্যহীন হয়ে গেছে।

রবীন্দ্রনাথ বর্ষার প্রথম দিনে রুদ্ধগৃহে একলা বসে 'মেঘদূত কাব্য' পাঠ করেছেন আর কল্পলোকে বিহার করেছেন কালিদাসীয় জগতে। এ কবি 'বাদলের কোলাহলে মেঘের ছায়ায়' ধলেশ্বরী নদীতীরে গাংশালিখের ঝাঁককে নিবিষ্ট মনে দেখছেন আর বাংলার রূপ উপভোগ করতে করতে সেই চাঁদ সদাগর, কালীদহের সময়ে চলে গেছেন। 'হায় পাখি, একদিন কালীদহে ছিলে না কি—দহের বাতাসে' শীর্ষক কবিতায় কবির এই মানসবিহারই আমরা দেখি। বর্ষণমুখর দিন আমাদের নিয়ে যায় সেই কালিদহে যেখানে প্রচণ্ড ঝড়ে ডুবেছিল চাঁদের মধুকর ডিঙা। আজকের এই সব গাংশালিখ সেদিনও ছিল। কবি সেই দূর জগতে দৃষ্টি নিক্ষেপ করে দেখতে পান সনকার মুখ। সেই ফণীমনসার বনে স্থিতা মনসাকে। এই কবি বর্তমান বাংলা মঙ্গলকাব্যের পটভূমিকায় তাৎপর্যময় হয়ে ওঠে।

'তোমার বুকের থেকে একদিন চলে যাবে তোমার সন্তান' শীর্ষক কবিতাটি মৃত্যু-চেতনায় বড়ো পাণ্ডুর। বিষণ্ণ ভাবাতুর কবি টেনে এনেছেন আবার কালীদহকে। জীবন বড়ো অনিশ্চিত—'কখন মরণ আসে কেবা জানে।' প্রতিরোধহীন প্রচণ্ড এক শক্তি নিয়ে মৃত্যু দেখা দেয়। সাধের সংসার তছনছ করে দেয়। মানুষ সেখানে বড়ো অসহায়। কবি এই মৃত্যুর প্রচণ্ডতাকে তুলনীয় করলেন কালীদহে উদ্ভূত প্রচণ্ড ঝড়ের সঙ্গে। সেই ঝড়ে পদ্মের নাল বা ডাঁটা ভাঙে। গাংচিল, শালিখের প্রাণ নিমেষে শেষ হয়ে যায়। মৃত্যুরূপী ঝড়ের দাপটে কবিও একদিন চলে যাবেন, কিন্তু সেই শেষের দিনে রূপসী বাংলার বুকের উপরেই চিরনিদ্রায় শায়িত হতে পারেন। আর কৃষ্ণা, যমুনা নয়, গাঙুর নদীর ঢেউয়ের আঘ্রানই তাঁর চোখে-মুখে লেগে থাকে। বলাই বাহুল্য এ গাঙুর, মঙ্গলকাব্যে উল্লিখিত বাংলার নদী গাঙুর যার ঢেউয়ে ঢেউয়ে বেহুলাও আন্দোলিত হয়েছিলেন।

অপর একটি কবিতায় কবি গ্রাম বাংলার প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের কথা তুলে ধরতে গিয়ে জাম, লিচু, কাঁঠালের বনে দুপুরের রোদ কেমন করে তার 'সুচিক্কণ চুল' নিঙড়ে দেয়—তার অনবদ্য ছবি তুলে ধরেছেন। দুপুরের উপর ব্যক্তিত্ব আরোপ করে কবি অনুভব করেছেন রহস্যময়ী রোদের সঞ্চরণ; 'দহে বিলে চঞ্চল আঙুল বুলায়ে বুলায়ে ফেরে এইখানে জাম লিচু কাঁঠালের বন/ধনপতি, শ্রীমন্তের বেহুলার, লহনার ছুঁয়েছে চরণ।' জাম-লিচু-কাঁঠালবনে রোদের এই খেলা করে যাওয়া যেন মঙ্গলকাব্যের পাত্র-পাত্রীদের শ্রীচরণস্পর্শে কবির কাছে পবিত্র হয়ে উঠেছে। আর মেঠো পথে যে কাক-কোকিলের শরীরের ধুলো মিশে আছে সে-ও তো কবির কাছে মনে হয়েছে সে-ই ষোড়শ শতকে যখন কবি মুকুন্দ 'চণ্ডীমঙ্গল' রচনা করেছিলেন, 'যখন মুকুন্দরাম হায়/লিখিতেছিলেন ব'সে দু'পহরের সাধের সে চণ্ডিকামঙ্গল'। যে কোকিলের ডাক শুনে কবি মুগ্ধ হয়ে যান সেই ডাকই একদিন কবি মুকুন্দকেও থামিয়ে দিয়েছিল 'চণ্ডীমঙ্গল' রচনা অবস্থায়। আরও এগিয়ে, সন্ধ্যার অন্ধকারে যখন গাঙুরের জল কেটে কেটে বেহুলা মৃত লখিন্দরকে নিয়ে ভেসে চলেছিল তখন হয়তো সেও ধানক্ষেতে, আমবনে, অস্পষ্ট শাখায় কোকিলের মিষ্টি ডাক শুনেছিল। কী আশ্চর্য মন্ত্রবলে কবি কোকিলের মিষ্টি ডাককে মঙ্গলকাব্যের বাংলার সঙ্গে যুক্ত ক'রে অনন্য করে তুললেন!

বাংলার স্নিগ্ধ সজল মাটি থেকে কবির বিদায় যেদিন আসন্ন হয়ে উঠবে, মরণ যেদিন তাঁকে জীবনপ্রবাহ থেকে বিচ্ছিন্ন করবে সেদিন 'নীল বাংলার তীরে' কবি দু'দণ্ড একা একা শুয়ে ভাববেন বাংলার সোঁদা ঘাস, বাঙালি নারীর চালধোয়া ভিজে হাত, কস্তা পাড় শাড়ি অথবা বাঙালির নিজস্ব সংস্কৃতি—কীর্তন, ভাসান, রূপকথা, যাত্রা-পাঁচালি—যার মধ্যে দিয়ে 'নরম নিবিড় ছন্দে' জীবন শ্রাবণধারায় সিক্ত হয়ে উঠেছিল। বাংলার মাঠ-ঘাট- বাট সর্বত্র কবির স্বচ্ছন্দ বিচরণ। যে বাংলা তাঁর শ্যামল সৌন্দর্যে কত ঐতিহ্যের সাক্ষ্য বহন করছে তা ছেড়ে কি কবি অন্য কোথাও স্বস্তি পেতে পারেন? কবি তাই বলেন, 'কোনো দিন রূপহীন প্রবাসের পথে/বাংলার মুখ ভুলে খাঁচার ভিতরে নষ্ট শুকের মতন/কাটাই নি দিন মাস।' কবিসত্তায় যেন আচ্ছন্ন হয়েছিল বাংলার নদী, ঘাস, তরু, লতা, মাঠ-ঘাট-বাট।

আর এই সূত্রেই চোখের সামনে ভেসে উঠেছে 'বেহুলার লহনার মধুর জগতে/তাদের পায়ের ধুলো মাখা পথে বিকায়ে দিয়েছি আমি মন।' কবির দেখা এই বর্তমান বাংলা বেহুলা-লহনার মধুর স্মৃতি বহন করে আশ্চর্য রমণীয় হয়ে উঠেছে। আবার কখনো কবি, অন্ধকারে খড়ের ছাউনি দেওয়া ঘরের ভিতর থেকে দেখেন ছিন্ন ভিজে খড় বুকে নিয়ে প্রশস্ত প্রান্তর পড়ে আছে। কবির মনে হয়েছে পুত্রহারা সনকার মতো একরাশ হতাশা বুকে নিয়ে এই প্রান্তর বুঝি টিকে আছে। সনকা যেন সব হারিয়ে বেদনার প্রতিমূর্তি হয়ে দেখা দিয়েছিলেন, তেমনি প্রান্তরকেও কবির মনে হয়েছে সব হারানো বেদনার প্রতিমূর্তি রূপে। প্রান্তরের নিঃস্ব অবস্থাকে সনকার প্রতীকে আশ্চর্য রূপ দেওয়া হয়েছে। সনকা এখানে যেন মিথ (Myth) হয়ে কাজ করছে।

জীবনানন্দ কাব্যটি উৎসর্গ করেছেন 'আবহমান বাংলা-বাঙালিকে'। গ্রামবাংলার রূপ অঙ্কন করতে গিয়ে স্বভাবতই তিনি অতীত বাংলার সহজ অনাড়ম্বর জীবনচর্যাকে অস্বীকার করতে পারেন নি। বাংলার ফুল-ফল, ঘাস, লতা-পাতা, গ্রামীণ মানুষের সহজ জীবনকথা, বাঙালি নারীর ঘরোয়ারূপ তাঁকে অতীতের প্রেক্ষাপটে উপলব্ধি করতে সাহায্য করেছে। আর সেই অতীত হয়েছে মুখ্যত মঙ্গলকাব্যের বাংলা। বাংলার শাশ্বত রূপকে কবি আবিষ্কার করেছেন মঙ্গলকাব্যের আবহে।

'রূপসী বাংলা'র গভীরে তাই রয়েছে মঙ্গলকাব্যের ঐতিহ্য। মধ্যকালীন বাংলা মঙ্গলকাব্য 'রূপসী বাংলা'র কবির কাছে কি অমূল্য প্রাণের বার্তা বহন করে নিয়ে আসে! আধুনিক জীবন-যন্ত্রণায় পিষ্ট যে কবি, যে কবি কেবলই জীবনের বিস্বাদ অনুভব করেছেন, জীবনের 'সমুদ্র সফেন'-এ যিনি 'ক্লান্ত প্রাণ', যাঁর 'সুচেতনা' আজ দূরতর দ্বীপ, বিপন্ন বিস্ময়ের তাড়নায় যিনি অবসাদগ্রস্ত তিনি যে মঙ্গলকাব্যের বাংলার অনাবিল সহজ সুন্দর জীবনে মুক্তি পেতে চান তা বলাই বাহুল্য। রবীন্দ্রনাথ যেমন বারবার কালিদাসের জগৎ পরিক্রমা করে মানসিক মুক্তি পেতে চেয়েছেন, তেমনি এই কবিও মঙ্গলকাব্যের জগতে মানসপরিক্রমা করে তাঁর ক্লান্তি দূর করতে চেয়েছেন। কবির রূপসী বাংলা হয়ে উঠেছে এক অখণ্ড শাশ্বত বাংলা। কবি জীবনানন্দের কাছে মঙ্গলকাব্য যে সহজ-সরল-অনাড়ম্বর জীবনের প্রতীক হয়ে দেখা দিয়েছে পরবর্তী কবিদের কাছে তা দেশকালের প্রেক্ষিতে বিশেষ বিশেষ মনোভাবের প্রতিচ্ছবি হয়ে ওঠে। তাঁরা সমাজসচেতন দৃষ্টিভঙ্গি নিয়েই মঙ্গলকাব্যের সংস্কারকে কাজে লাগিয়েছেন। মঙ্গলকাব্যের পাত্র-পাত্রী, জীবনচর্যা একালের কবিদের কাছে ভিন্ন দ্যোতনা নিয়ে আসে। এরকম তিন বিশিষ্ট কবি হলেন—বিষ্ণু দে, বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ও সব্যসাচী দেব।

জীবনানন্দের সমকালীন কবি বিষ্ণু দে। তিনি যুগজীবনের জটিলতায় আত্মসচেতন, প্রাণচঞ্চল, গতিশীল কবি। 'বলাকা' কাব্যে 'চঞ্চলা' নাম দিয়ে বিরাট নদীর প্রতীকে রবীন্দ্রনাথ যেমন জীবনের গতিকেই রূপ দিয়েছেন, বিষ্ণু দেও 'স্রোতস্বিনী'-কে সম্বোধন করে 'এবং লখিন্দর' কবিতায় গতিকে একমাত্র কাম্য মনে করেছেন। স্রোতস্বিনী বা নদী আপন বেগে, আপন উর্মি দোলে কত জীবন দেয়, ভাষা দেয়, সৃষ্টি করে। স্রোতস্বিনীর

এই সতত গতিময়তায় অনিবার্যভাবেই কবির মনে হয়েছে মনসামঙ্গল কাব্যের বেহুলা চরিত্রের কথা। বেহুলা কবির কাছে কেবল চরিত্র নয়, গতির তথা জীবনীশক্তির প্রতীক। বেহুলাও তার জীবনীশক্তির জোরেই লখিন্দরকে বাঁচিয়ে তুলেছিল। এখানে স্রোতস্বিনীর নামান্তরই যেন বেহুলা হয়ে যায়। কবিতার শেষে কবি স্রোতস্বিনী ও বেহুলাকে এক করে দিয়েছেন—

তোমার চলায় ভাসাও, স্রোতস্বিনী
কাঠ খড় ফুল—এবং লখিন্দর।

কবি বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মাটির কাছাকাছির কবি, জীবনের কবি, সমাজের প্রতি দায়বদ্ধ কবি। তাঁর কাছে তথাকথিত ভদ্র সমাজকে মনে হয়েছে চেতনাহীন মৃত লখিন্দর। সে সমাজে আছে যৌনতার বিকৃতি, লালসার অতিরেক। এই চেতনাহীন শব লখিন্দর- সমাজকে কবি নিজেই বেহুলা হয়ে নৃত্যের উদ্দামতায়-চেতনায় জাগিয়ে তুলতে চেয়েছেন তাঁর বিখ্যাত 'বেহুলা' কবিতায়। 'লখিন্দর' নামেই একটি কাব্যগ্রন্থের অন্তর্গত এই কবিতা। কবিতাটিতে চিত্রিত হয়েছে ভদ্রতার মুখোশধারী রিরংসাপরায়ণ হায়না, শকুন, শেয়াল প্রভৃতি জন্তু-মানুষের লালসা। কবি দেখতে পান উদগ্র দেহজ কামনায় অন্ধ হয়েছে সমাজ। এ সমাজ তাই লখিন্দরের মতোই মৃত। আর এই সমাজকে কবি তাঁর চেতনারূপিণী বেহুলাকে দিয়ে জাগিয়ে তুলবেন—

গান দেব, জ্বলব, কিন্তু হব না অঙ্গার
সে জাগবে, জাগবেই, লখিন্দর সে আমার।

এ কবিতায় মঙ্গলকাব্যের বেহুলা হয়ে উঠেছে চেতনার প্রতীক, সুস্থ জীবনবোধের প্রতীক, কল্যাণময় সমাজের প্রতীক।

আবার 'মহাদেবের দুয়ার' কবিতায় কবি বেহুলাকে জীবন ফিরে পাওয়ার সবচেয়ে বড়ো প্রেরণা হিসাবে দেখেছেন। সেই প্রেরণা যখন থাকে না, তখন কী চরম অসহায়তার মধ্যে মৃতের গতি হয় কবি তা উপলব্ধি করেছেন। সেই সত্তর দশক বা তার কাছাকাছি সময়ে কত তাজা তরুণ প্রতিক্রিয়াশীল শক্তির চক্রান্তে মৃতদেহে পরিণত হয়েছে। সেই তরুণরা যেন এখানে লখিন্দর। তারা পরিত্যক্ত, অসহায়, নরকের দিকে তাদের গতি। তাদের বাঁচাতে, সান্ত্বনা দিতে, সঞ্জীবিত করতে সেই প্রেরণাদাত্রী বেহুলা কোথায়? গভীর বেদনায় কবি বলে ওঠেন—

পরিত্যক্ত মৃতদেহগুলি
হঠাৎ বাতাসে
কেঁপে ওঠে, আর
শূন্য বেহুলার ভেলা ভেসে যায়
নরকের দিকে, দারুণ দুর্ভিক্ষে,
অসহায়।

'কালকেতু-ফুল্লরার গল্প' নামক কবিতাটি মুকুন্দরামের 'চণ্ডীমঙ্গল' কাব্যটিকে মনে

রেখেই বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায় রচনা করেছেন। এ কবিতায় 'ফুল্লরার বারোমাস্যা'কে কবি আজকের দরিদ্র মানুষের বারোমাস্যারূপে চিত্রিত করেছেন। কবির কাছে মনে হয়েছে ফুল্লরা-কালকেতু আজও দারিদ্র্যপিষ্ট দুই ক্ষুধার্ত মানুষের প্রতিচ্ছবি—

ফুরায় না ফুল্লরার বারোমাস্যা
আর, শূন্য হাতে কালকেতুর ফিরে আসা
ঘরে
মুখোমুখি দারুণ উপবাসে;
ফুরায় না
দুটি অসহায় মানুষের
সারাদিন
ক্ষুধায় জ্বলতে থাকা
সারারাত...

চণ্ডীমঙ্গাল কাব্যে কালকেতু তবু রাজা হয়েছিল, ফুল্লরা ঐশ্বর্যের মুখ দেখেছিল। কিন্তু একালের কালকেতু-ফুল্লরা শুধু মাঠভর্তি ধানের স্বপ্ন দেখে, শুধু স্বপ্নই দেখে বুকভর্তি ভালোবাসার; কিন্তু তা বাস্তবায়িত হয় না।

স্বপ্ন দেখতে দেখতে
কালকেতু রাজা হয়, ফুল্লরার মুখে
আবির লাগে।

আশির দশকের বিশিষ্ট কবি সব্যসাচী দেব তাঁর বিখ্যাত 'বেহুলা ভাসান' কবিতায় নিজেকেই বেহুলা বলে কল্পনা করে দেশপ্রেমের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত রেখেছেন। লখিন্দর এখানে যেন প্রিয় স্বদেশ ভারতবর্ষ, আর মনসা সেই সাম্রাজ্যবাদী শক্তি যার ছোবলে ছোবলে স্বদেশ হয়েছে মৃত্যুনীল শবমাত্র। দেবতারা অর্থাৎ আগ্রাসী শক্তি বারবার লুব্ধ দৃষ্টি দিয়ে তীক্ষ্ণ তীক্ষ্ণ নখের আঘাতে স্বদেশের কমনীয় প্রতিমাকে মলিন করেছে, আঘাতে আঘাতে শবমাত্রে পরিণত করেছে। আগ্রাসী শক্তির চরিত্রই তাই! মনসামঙ্গালের দেবী মনসা যেন তারই সূচনা—

বারবার শক্তির আস্ফালনে অপ্রাপনীয়কে ছিনিয়ে নেওয়ার
যে কুটিল ইতিহাস তোমাদের সৃষ্টি
মনসা শুধু শুরু করেছিল তার নতুন অধ্যায়।

তবু যে কোনো মূল্য দিয়ে হোক, এ যুগের দেশপ্রেমিকা বেহুলা স্বদেশকে বাঁচাবেই। সে তার যৌবন দিয়ে, নিজেকে একেবারে নিঃস্ব করে মৃত লখিন্দর-রূপী স্বদেশকে বাঁচায়। নিজেকে নগ্ন করে সর্বস্ব বিসর্জন দিয়ে একালের বেহুলা বলে ওঠে—

আর এই নামিয়ে রাখলাম মৃতদেহ।
এসো দেবতারা, দেখো, এই আমার দেহ দুলে উঠছে
নাচের ছন্দে, দুলে উঠছে বিসর্জনের প্রান্ত থেকে বোধনের সীমানায়;

দুলে উঠছে জীবনের নেশায়।
এসো, দেবতারা, তোমাদের দৃষ্টি লেহন করুক
আমার নগ্নতা আমার নারীত্ব
আমার কামনীয় নেই কিছুই, প্রাণ ছাড়া।

এ কবিতায় বেহুলা হয়ে উঠেছে পণ্যরূপী এক জীবন্ত দেশপ্রেমিকা। দেশ যে ভূখণ্ডমাত্র নয়, আগ্রাসী শক্তির রক্তচক্ষুর সামগ্রী নয়, তা যে দেহ-মন-প্রাণ দিয়ে অনুভবের বিষয়। তাই যেন 'বেহুলা ভাসান' কবিতায় মূর্ত হয়ে উঠেছে। ব্যথিত কবিচিত্ত স্বদেশের অসহায় অবস্থাটি মঙ্গলকাব্যের পরিমণ্ডলেই যেন ভাষা পেয়েছে এ কবিতায়।

সেই মধ্যযুগে রচিত মঙ্গলকাব্যে প্রতিফলিত সমাজজীবন ও কবিভাবনা একালের বাংলা কবিতাতেও নতুন মূল্য নিয়ে ধরা দিয়েছে। নতুন নতুন স্বাদবৈচিত্র্যে সমৃদ্ধ হয়েছে। নিছক মধ্যযুগের মধ্যেই মঙ্গলকাব্যের প্রয়োজন শেষ হয়ে যায়নি। একালের কবিরা সমকালের দাবি মেনে মঙ্গলকাব্যের স্বাদগত রূপান্তর ঘটিয়েছেন। মহৎ রচনার গুণই এই যে তা নিজের মধ্যে সীমাবদ্ধ না থেকে বিষয়ভাবনায় অন্তহীন প্রেরণা হয়ে কাজ করে। সেদিক থেকে মঙ্গলকাব্যকে 'বাংলার পুরাণ' বলাই শ্রেয়। এই পুরাণের নবীকরণ ঘটিয়েছেন একালের কবিরা।

তথ্যের সন্ধানে

১. মহাকাব্যের লক্ষণ
২. একাল ও সেকাল
৩. ভূমিকা, 'রূপসী বাংলা'
৪. শিলীন্ধ্র, জীবনানন্দ সংখ্যা
৫. কবি জীবনানন্দ

লোকায়ত পাঠ
নিম্নবর্গের বিচিত্র জীবনের সন্ধানে

বাংলা মঙ্গালকাব্যে লোকজ উপাদান

বরুণকুমার চক্রবর্তী

মঙ্গালকাব্যে লোকজ উপাদান সম্পর্কে তথ্যভিত্তিক আলোচনার সূচনাতেই যে কথাটি স্পষ্টভাবে জানিয়ে দেওয়া প্রয়োজন তা হল মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের এই সমৃদ্ধ শাখাটিকে অনেকেই লোকসাহিত্য বলে মনে করেন। এই মনে করাটা যথাযথ নয়, যেমন অনেকেরই ধারণা যাত্রা বুঝিবা লোকনাট্যের অন্তর্গত একটি বিশিষ্ট আঙ্গিক, কিন্তু যাত্রা মোটেই লোকনাট্য নয়। বিস্তারিত আলোচনায় না গিয়েও এইটুকু বলাই যথেষ্ট যে লোকসাহিত্যের প্রাথমিক শর্ত মঙ্গালকাব্য পূরণ করে না। লোকসাহিত্যের মতো মঙ্গালকাব্যগুলি মোটেই লৌকিক রচনা নয়, oral creation-এর মর্যাদা মঙ্গালকাব্যের প্রাপ্য নয়। লোকসাহিত্যের রচয়িতার যেমন সচরাচর সন্ধান মেলে না, মঙ্গালকাব্য তেমনটি নয়, এর রচয়িতার সন্ধান লভ্য। লোকসাহিত্য প্রাথমিক ভাবে ব্যষ্টির রচিত হয়েও তা সমষ্টির রচনা রূপেই বিবেচিত হয়—মঙ্গালকাব্যের ক্ষেত্রে তেমনটি বলা যাবে না। এগুলি ব্যক্তির রচিত এবং কখনই সমষ্টির রচনার মর্যাদা পায় না। মোদ্দা কথা হল মঙ্গালকাব্য শিষ্ট সাহিত্য। লোকসাহিত্যের ক্ষেত্রে যে Re-creation Theory প্রযোজ্য, মঙ্গালকাব্যের ক্ষেত্রে সেই পুনঃসৃষ্টির তত্ত্ব প্রযোজ্য নয়। তবে একথাও সত্য যে লোকজ সংস্কৃতির নানা উপাদানে মঙ্গালকাব্যগুলি সমৃদ্ধ। কী রকম?

মঙ্গালকাব্যগুলির উদ্ভব হয়েছে ব্রতকথা থেকে। ব্রতকথাগুলি লোকসাহিত্যের গুরুত্বপূর্ণ বিভাগ লোককথার সংসারের এক মান্য সদস্য। এই প্রসঙ্গো অধ্যাপক আশুতোষ ভট্টাচার্যের মন্তব্যটি স্মর্তব্য : ‘ব্রতকথা হইতেই মঙ্গালকাব্য রচনার প্রেরণা ও বিষয়বস্তু সংগৃহীত হইয়াছে...।’ অধ্যাপক ভট্টাচার্য আরও বলেছেন, ‘ব্রতকথার মধ্যে সূত্রাকারে যে সকল বিষয় অবস্থান করিয়াছে, মঙ্গালকাব্যে তাহাই বিস্তৃততর বর্ণনা লাভ করিয়াছে।’

মঙ্গালকাব্যের চরিত্রের পরিকল্পনাতেও ব্রতকথার দেব-চরিত্র পরিকল্পনার প্রভাব দুর্নিরীক্ষ্য নয়।

মঙ্গালকাব্যে আমরা বারোমাস্যা বা ছয়মাস্যার যে অন্তর্ভুক্তি লক্ষ করি সেগুলির মূল কিন্তু লোকসংগীত। সংস্কৃত বা অন্য কোনো অভিজাত সাহিত্য প্রভাবিত তা নয়।

মঙ্গালকাব্যগুলি এককথায় দেব-দেবীর মাহাত্ম্যসূচক কাহিনি। কিন্তু আর্য সংস্কৃতির প্রেক্ষিতে দেব-দেবীর চরিত্রে যে আভিজাত্য পরবর্তীকালে আরোপিত হয়েছে, অনার্য সংস্কৃতি সঞ্জাত লৌকিক দেবদেবীরা সেই আভিজাত্যের বাতাবরণ বিযুক্ত। চণ্ডী, মনসা, শিব এবং অন্যান্য লৌকিক দেবদেবী যাঁদের মঙ্গালকাব্যগুলিতে উপজীব্য করা হয়েছে, দেখা যায় তাঁরা যত না গুণের আধার তদপেক্ষা অনেক বেশি নিন্দনীয় বৈশিষ্ট্যের সমাহারে তাঁরা কলঙ্কিত। এঁরা বলপূর্বক ভক্তি ও পুজো আদায় করেন। এঁরা প্রতিহিংসাপরায়ণ, মিথ্যাবাদী, স্বার্থপর, কেউ কেউ তো আবার ভ্রষ্ট চরিত্রের অধিকারী। লৌকিক দেবদেবীরা জাগতিক স্বাচ্ছন্দ্য বিধানে পটু, নির্বাণে, মুক্তি কিংবা মোক্ষ লাভের সহায়ক শক্তি নন। এদিক দিয়ে মঙ্গালকাব্যগুলি চারিত্রধর্মে অনেকখানিই লোকজ, কবিরা যতই কেন শাস্ত্রজ্ঞ ও অভিজাত হোন। আরো কয়েকটি তথ্যের উল্লেখ করা যাক। মনসা গাছ নামে পরিচিত 'সিজবৃক্ষ' মনসা-জ্ঞানে পূজিতা হন। মনসা গাছেই বা সিজবৃক্ষেই মনসার অধিষ্ঠান। বিপ্রদাস পিপলাইও উল্লেখ করেছেন, 'জাগিয়া জাগুলি নাম সিজবৃক্ষে স্থিতি।' সিজবৃক্ষের পূজা বৃক্ষপূজারই নামান্তর মাত্র। মুকুন্দ চক্রবর্তীর কাব্য সম্পর্কে আচার্য সুকুমার সেনের মন্তব্য—

'আখেটিক খণ্ডের কাহিনি মুকুন্দ লৌকিক গল্পের মধ্যে পাইয়া থাকিবেন।' শুধু তাই নয়, তিনি মনে করেন, 'ফুল্লরা নামটিও সাক্ষাৎ লৌকিক হইতে নেওয়া বলিয়া বোধ করি।' আশুতোষ ভট্টাচার্যও মনে করেছেন 'ধৃদুরুকুনী ওষা' নামীয় ওড়িয়া ব্রতকথার সঙ্গো গোধিকা-কালকেতুর আখ্যানের গভীর সাযুজ্য। ড. ভট্টাচার্যের অনুমান মনে হয় ব্রতকথার আকারে কাহিনিটি বাংলা এবং উড়িষ্যা উভয় প্রদেশেই প্রচলিত ছিল। এই আখ্যানই পরবর্তীতে মঙ্গালকাব্যের রূপ প্রাপ্ত হয়। ধনপতির উপাখ্যানে বাকপটু শুক-সারীর প্রসঙ্গা পাই, Talking bird-এর নিদর্শন রূপেই তারা গৃহীত হবার যোগ্য। ধনপতির আখ্যানে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা খুল্লনার। আসলে খুল্লনা সফল কনিষ্ঠার নিদর্শন ব্যতীত কিছুই নয়। ধর্মমঙ্গালে লাউসেনের পালিত পাখি শুক talking bird-এর নিদর্শন। এবারে আরও কিছু অন্তরঙ্গা পরিচয় নেওয়া যাক মঙ্গালকাব্যগুলির লোকসংস্কৃতির প্রেক্ষিতে—

মঙ্গালকাব্যে প্রবচন

আমরা প্রবাদ এবং প্রবচন শব্দ দুটিকে এক নিঃশ্বাসে উচ্চারণে অভ্যস্ত। দুটি শব্দেরই উৎপত্তি 'প্র' উপসর্গ যোগে। 'বাদ' এবং 'বচন'-এর আভিধানিক অর্থ এক। কিন্তু প্রবাদ বললে বুঝি ইংরেজি Proverb শব্দটির বঙ্গীয় প্রতিশব্দকে, প্রবাদ হল দীর্ঘদিনের অভিজ্ঞতার সংক্ষিপ্ততম বাঙ্ময় প্রকাশ— 'A Proverb is a short sentence based on long experience'; পরম্পরা এবং ঐতিহ্যকে আশ্রয় করেই প্রবাদের আত্মপ্রকাশ। কিন্তু 'প্রবচন' তা নয়, প্রবচন হল প্রবাদ-অনুসারী কিন্তু ঐতিহ্য-বিমুক্ত, শিষ্টজনের বা বিজ্ঞ ব্যক্তির রচনা, প্রথমাবধিই যার লিখিত রূপে আত্মপ্রকাশ ঘটে। প্রবাদের মত তা কখনই Oral creation নয়, বাচিক শিল্প নয়। প্রবাদের স্রষ্টা কে জানা যায় না, কিন্তু প্রবচনের স্রষ্টা কে জানা যায়। দীর্ঘকাল পরে প্রবচনই প্রবাদের স্বীকৃতি পেতে পারে, সে সম্ভাবনা সমূহ। যাইহোক,

বিভিন্ন মঙ্গালকাব্যে শিষ্ট কবিরা কেমন প্রবচনের ব্যবহার করেছেন তার কিছু পরিচয় নেওয়া যাক—

ক। সহজে ঘটক জাতি বড়ই চতুর।
খ। বিধির নির্বন্ধ কভু খণ্ডন না যায়।
গ। পুত্রশোক সম দুঃখ পৃথিবীতে নাই।
ঘ। বিধি বিমুখ হইলে বুদ্ধি হয় নাশ।
ঙ। পরমায়ু শেষ হইলে অবশ্য মরণ।
চ। কপাল লিখন কভু না যায় খণ্ডন।
ছ। ঊর্দ্ধ আঙুলে কভু বাহির না হয় ঘি। (বিজয় গুপ্তের পদ্মাপুরাণ)
জ। বামন হৈয়া চাহ ধরিতে আকাশ।
ঝ। কাটিলে বৃক্ষের ডাল মূল যদি রয়।
মঞ্জরিতে পুনরপি বহুদিন হয়।।
ঞ। যেই যারে হয় মিত সেই তার করে হিত
ইতিহাসে কর অবধান।। (কেতকাদাস ক্ষেমানন্দ রচিত মনসামঙ্গাল)
ট। পড়িল সাগরে মোর আঁচলের সোনা। (কবি জগজ্জীবন ঘোষাল রচিত মনসামঙ্গাল)
ঠ। কাকের বাসাতে কুকিল থাকে কতকাল।
ড। আপদ পড়িলে দেখ বল বুদ্ধি ছাড়ে।
ঢ। মৎস্য হইয়া কুম্ভিরের সনে কর বাদ। (নারায়ণদেব রচিত পদ্মাপুরাণ)
ন। পিঁপড়ার পাক উঠে মরিবার তরে।
ত। জনম হইলে হয় অবশ্য মরণ।
থ। নীচ কি উত্তম হবে পাইলে বহুধন। (মুকুন্দ চক্রবর্ত্তী রচিত অভয়ামঙ্গাল)
দ। মিথ্যা বচন জান জলের তিলক।
ধ। সৎপন্থেতে থাকিলে আপদ নহে তার।।
ন। বিধির নির্বন্ধ কভো না যায় খণ্ডন। (দ্বিজমাধব রচিত চণ্ডীমঙ্গাল)
প। সুখ দুঃখ যত হয়ে কর্ম্মের অধীন।
ফ। পুরুষ কঠিন জাতি হীরার কাঠারী। (দ্বিজ রামদেব রচিত অভয়ামঙ্গাল)
ব। মিছা বাণী সেঁচা পানি কতক্ষণ রয়।
ভ। না পারে খণ্ডাতে লোক কপালের লেখা। (ঘনরাম চক্রবর্ত্তীর ধর্ম্মমঙ্গাল)
ম। কপালের লেখা তার না যায় খণ্ডন।
য। অসত্য সমান পাপ নাহিক সংসারে। (রূপরাম চক্রবর্ত্তী, ধর্ম্মমঙ্গাল)

মঙ্গালকাব্যে ধাঁধা

মঙ্গালকাব্যের একটি নির্দিষ্ট আঙ্গিক লক্ষ করা যায়। মধ্যযুগের বিজ্ঞ কবিরা দেব-দেবীর

মাহাত্ম্য প্রচারমূলক যে মঙ্গালকাব্য ধারার অবতারণা করেন সেখানে পাই পতিনিন্দার মত বিষয়, পাই বিস্তৃতাকারে রন্ধন তালিকা, বারোমাস্যা, প্রবচনের বহুল ব্যবহার সেইসঙ্গেই পাই ধাঁধার ব্যবহার। ধাঁধার ব্যবহার কেন? কবিরা মঙ্গালকাব্যের ধরাবাঁধা গতানুগতিক আখ্যানে কিছুটা বৈচিত্র্য সৃষ্টির কারণে ধাঁধার ব্যবহার করেছেন। তাছাড়াও প্রশ্নকর্তার মননশীলতা এবং উত্তরদাতা চরিত্রের বুদ্ধিবৃত্তিকে উপস্থাপন করাও ছিল অন্যতর উদ্দেশ্য। মঙ্গালকাব্যের কবিরা তাঁদের কাব্য রচনাকাল নির্দেশেই প্রহেলিকা সৃষ্টি করে গেছেন। বিজয় গুপ্ত তাঁর মনসামঙ্গালের কালজ্ঞাপক শ্লোকে বলেছেন—

ঋতু শূন্য বেদ শশী পরিমিত শক
সুলতান হোসেন শাহ নৃপতি তিলক।

১৪০৬ শকাব্দে বা ১৪৮৪ খ্রিস্টাব্দে কাব্যটির রচনাকাল বলা হয়েছে। দ্বিজ মাধবের চণ্ডীমঙ্গালের রচনাকাল উল্লিখিত হয়েছে এভাবে—

ইন্দু বিন্দু বাণ ধাতা শক নিয়োজিত
দ্বিজ মাধবে গায় সারদা চরিত।

'ইন্দু বিন্দু বাণ ধাতা'র অর্থ হল ১০৫১ সাল। বাম দিক থেকে পাঠ করলে দাঁড়ায় ১৫০১। আচার্য সুকুমার সেন বলেছেন—'অপভ্রংশ-অবহট্টের কাল হইতে প্রহেলিকা-বিলাস লৌকিক আখ্যায়িকা কাব্যের একটি বিশিষ্ট অঙ্গা ছিল।' এখন প্রশ্ন হল মঙ্গালকাব্যে যে সব প্রহেলিকা বা ধাঁধার ব্যবহার সেগুলির পরিচিতি কী? এগুলি নিঃসন্দেহে সাহিত্যিক ধাঁধা, লৌকিক ধাঁধার মর্যাদা লাভের অধিকারী নয়। মঙ্গালকাব্যগুলি যেমন শিষ্ট কবির রচনা, তেমনি এই কাব্যের জন্য তাঁরা যে ধাঁধা রচনা করেছেন সেগুলিও শিষ্ট চরিত্রের। অবশ্য ধাঁধাগুলি মঙ্গালকাব্যের শিষ্ট কবিদের মৌলিক রচনা নয়, এগুলির মূলে ছিল লৌকিক মন বা Folkmind । আশুতোষ ভট্টাচার্য যথার্থই বলেছেন, 'লৌকিক স্তর হইতে ইহাদিগকে সংগ্রহ করিলেও মঙ্গালকাব্যের কবিগণ তাহাদের রচনা শক্তি অনুযায়ী ইহাদের বহিরঙ্গো একটি পরিণত সাহিত্যিক রূপ দিয়া লইয়াছেন।' ধাঁধার আঙ্গিকটি যে লৌকিক সে বিষয়ে কোনো সন্দেহের অবকাশ নেই।

ক। মরণ হুতাশে তার জীবন প্রকাশে। / হস্ত পদ নাই তার সভা মধ্যে বৈসে।।
একমুখে উগারএ আর মুখে খায়। / বুঝ ২ পন্ডিত হিয়ালি সভায়।।
(উনুন, মানিক দত্তের চণ্ডীমঙ্গাল)

খ। বিধাতা নির্মাণ ঘর নাহিক দুয়ার। / জুগি পুরুষ তাহে আছে অনাহার।।
জখন পুরুষ তাহে হয় বলবান। / বিধাতার ঘর ভাঙ্গ্যা করে খান খান।।
(ডিম, মুকুন্দ চক্রবর্তীর চণ্ডীমঙ্গাল)

গ। বেগে ধায় রথ নাহি চলে এক পা। / নাচয়ে সারথি তাহে পসারিয়া গা।।
হেঁয়ালি প্রবন্ধে পন্ডিত দেহ মতি। / অন্তরীক্ষে চলে রথ ভূতলে সারথি।।
(ঘুড়ি, মুকুন্দ চক্রবর্তীর চণ্ডীমঙ্গাল)

ঘ। তরু নয় বনে রয় নাহী ধরে ফুল। / ডাল পল্লব তার অতি সে বিপুল।।
পবনে করিয়া ভর করয়ে ভ্রমণ। / বনেতে থাকিয়া করে বনের দোষণ।।
(দাবানল, মুকুন্দ চক্রবর্তীর চণ্ডীমঙ্গাল)

ঙ। কটিতে ঘাঘর ঘন রুণু ঝুনু বাজে। / কান্ধে চাপি শিকার সন্ধানে নিত্য সাজে।।
সুরিক্ষা বলেন রায় শুনে লাগে ধান্দা। / আপনি প্রবেশে বনে জট থুয়ে বান্ধা।।
বন বেড়ে পড়ে বেগে শিকার সন্ধানে। / জনেক পুরুষ তার জট ধরে টানে।।
সুরিক্ষা কহেন কহ হেঁয়ালির সন্ধি। / বিরল কাটে বন পালাল জলজন্তু বন্দী।।
(ধীবরের জাল, ঘনরাম চক্রবর্তী রচিত ধর্মমঙ্গাল)

চ। কমলে কমল রিপু জন্ম লয়ে উঠে।
দেবতার মাথার মুকুটে বৈসে ছুটে।।
(অর্ধচন্দ্র, ঘনরাম চক্রবর্তী রচিত ধর্মমঙ্গাল)

ছ। নটিনী জিজ্ঞাসে শুন শুন হে নাগর। / চতুর্ভুজ মূর্তি তার দেখিতে সুন্দর।।
শূন্যপথে সদাগতি সংসারের সার। / সুর নর সকলে প্রসাদ খায় তার।।
সদাই সন্তুষ্ট তার সংহার কারণ। / সত্য বল সুনাগর সেই কোন্ জন।।
(শশিমুখী শ্বেত মৌমাছি; মানিকরাম গাঙ্গুলীর শ্রীধর্মমঙ্গাল)

জ। যোগী নহে জটা ধরে তোমার লক্ষণ। / গঙ্গা নহে জল বহে এ তিন লোচন।।
নারী সম্বোধন মাত্র নহে স্ত্রীজাতি। / শস্য উপজে তাহে নহে সেই ক্ষিতি।।
(নারিকেল, কবিচন্দ্র রামকৃষ্ণ রায় বিরচিত শিবায়ন)

ঝ। একত্রে বসতি করে দুই সহোদর। / মাথায় টোপর পরে নহে তারা বর।।
রাজা নহে তবু তারা না চাইতে পায় কর। / বল দেখি হয় তার কোন্ দেশে ঘর।।
(নারীর স্তন, কবিচন্দ্র রামকৃষ্ণ রায় বিরচিত শিবায়ন)

ঞ। এক রূপে দুই ভাই বৈসে দুই দেশে। / চিনা পরিচয় নাঞি জন্মের বয়সে।।
ও চলিতে এই চলে তার পাছে পাছে। / দেখাদেখি নাঞি মাত্র থাকে কাছে কাছে।।
(চক্ষু, কবিচন্দ্র রামকৃষ্ণ রায় বিরচিত শিবায়ন)

ছন্দ নির্মিতি-কৌশল এবং শব্দ প্রয়োগ-নৈপুণ্যে স্বতঃই প্রমাণিত যে এগুলি শিষ্ট জনের রচনা। লৌকিক ধাঁধায় এমন মার্জিত উপস্থাপনা সুলভ নয়। লৌকিক ধাঁধা সর্বদাই যে বৃহদাকৃতির অর্থাৎ বেশ কয়েকটি পংক্তি সম্বলিত হয় তা নয়। কিন্তু মঙ্গালকাব্যের রচয়িতারা যেহেতু কবি, তাই স্বভাবগত কারণেই তাঁরা লৌকিক বিষয়কে উপজীব্য করেও নিজেদের মত করে সেগুলির কাব্যিক প্রকাশ ঘটিয়েছেন। লৌকিক ধাঁধায় সচরাচর এমনতর কাব্যিক উপস্থাপনা চোখে পড়ে না।

মঙ্গালকাব্যে লোকবিশ্বাস লোকসংস্কার

সচরাচর লোকবিশ্বাস এবং লোকসংস্কার অভিন্ন রূপে বিবেচিত হয়, কিন্তু দুইয়ে যথেষ্ট মিল থাকলেও অমিলকেও অস্বীকার করা যায় না। বিশ্বাস যখন দৃঢ় হয়ে মনে প্রভাব

বিস্তার করে, ব্যক্তির আচরণকে নিয়ন্ত্রিত করে তখন তা আর বিশ্বাসের পর্যায়ে থাকে না, সংস্কারে পরিণত হয়। বলা যায়, বিশ্বাসের ফলিত রূপ হল সংস্কার। বিশ্বাস এবং সংস্কারকে যতই কেন irrational কিংবা unfounded বলা হোক, লোকসমাজে এগুলি দীর্ঘকাল ব্যাপী চলিত রয়েছে— 'a superstition is something which is 'left over' from the past and which continues to prevail without being understood'. (Martin Lings, Ancient Beliefs and Modern Superstitions)

বিশ্বাস-সংস্কার হল 'living relics of ways of thought much older then our own...' মঙ্গালকাব্যগুলিতে লোকবিশ্বাস ও লোকসংস্কারের রাজকীয় আধিপত্য। মঙ্গালকাব্যে ব্যবহৃত অথবা প্রযুক্ত প্রবচন ধাঁধা যতই কেন সাহিত্যিক বা শিস্ট রচনা হোক, বিশ্বাস-সংস্কারগুলি মোটেই অর্বাচীন কালের নয়। এগুলি লৌকিক। কেননা ব্যক্তিগত বিশ্বাস বা সংস্কারের পরিবর্তে মঙ্গালকাব্যে উল্লিখিত হতে দেখা গেছে লোকসমাজে স্বীকৃত বিশ্বাস ও সংস্কারগুলি। এগুলি প্রাচীন ও ঐতিহ্যাশ্রিত।

ক। শুভ লক্ষণ সম্পর্কিত বিশ্বাস

১। চাঁদ সদাগরের দৃষ্টিতে ধরা পড়া মাঙ্গালিক লক্ষণ—

জায় সাধু পথ মেলি সমুখে দেখিল মালি
শ্রীকাল দেখিল বাম পাশে।
দক্ষিণে জায় বিষধর দেখিয়া কৌতুক বড়
কার্য্যসিদ্ধি দেখি চান্দো হাসে।

(নায়ারণ দেব রচিত পদ্মাপুরাণ)

২। কালকেতু স্নানাহার শেষ করে বনে গমনোদ্যত, উদ্দেশ্য পশু শিকার। তার চোখে ধরা পড়েছে মাঙ্গালিক দৃশ্য, উজ্জীবিত হয়েছে সে, ভেবে নিয়েছে অসংখ্য পশুর দেখা মিলবে—

দধি লইয়া গোয়ালিনী ডাকে ঘন ঘন।। / বামেতে দেখএ শিবা চাহে মহাবলে।
দেখএ খঞ্জনযুগ খেলে শতদলে।। / কেতু বলে দেখি আজি অতি শুভ চিন।
পাইমু অসংখ্য পশু পশিলে কানন।।

(দ্বিজ রামদেবের অভয়ামঙ্গাল)

৩। শ্রীমন্তর যাত্রারম্ভ বন্দি পিতাকে উদ্ধারের উদ্দেশ্যে। তার গন্তব্যস্থল সিংহল। যাত্রারম্ভে তার দৃষ্ট কিছু মাঙ্গালিক দৃশ্য—

পূর্ণকুম্ভ লইয়া আসে সীমন্তিনীগণ।।
বামেতে শ্রীকালি দেখে ধাএ যুতে যুতে। / সুরজ লইয়া আইসে নট শুভে॥
মাহুত চালাএ দেখে মত্ত করিবর। / সদ্য মৃগ মাংস আনে বেচিতে নগর।।
মালা লইয়া উপনিতি হৈল মালাকার। / আশীর্বাদ করে তানে দৈবজ্ঞকুমার।।
দধি লৈবা দধি লৈবা ডাকে গোয়ালিনী। /মধু লৈবা মধু লৈবা ডাকে মধু মানী॥

পূর্ণকুম্ভ সহ নারীদের গমন, মাহুত কর্তৃক হস্তী চালনা, মৃগ মাংস বিক্রয়ের জন্য যাত্রা,

গোয়ালিনীর দধিবিক্রয়, বৎসসহ ধেনু এসবই মাঙ্গালিক, এগুলি দেখে যাত্রা করা মানে যাত্রা শুভ হবে বলে বিশ্বাস করা হত।

৪। ভবানন্দ মজুন্দারের দিল্লীযাত্রা বর্ণনা প্রসঙ্গো যাত্রাকালীন নানা মাঙ্গালিক বস্তু ও দৃশ্যের বর্ণনা দিয়েছেন কবি ভারতচন্দ্র—

ধেনু বৎস একস্থানে বৃষক্ষুরে ক্ষিতিটানে
দক্ষিণেতে ব্রাহ্মণ অনল।

(মানসিংহ, অন্নদামঙ্গালকাব্য)

◆ এবার কয়েকটি অশুভ লক্ষণ প্রসঙ্গা (ব্যক্তি সম্পর্কিত)

১। খণ্ড-কপালিনী তুই বেহুলা চিরুণদাঁতী
বিভা দিনে খাইলি পতি না পোহাতে রাতি ।। ২১

(সনকার ক্রন্দন; কেতকাদাস ক্ষেমানন্দের মনসামঙ্গাল)

২। নগরের কুলকামিনীরাও বেহুলাকে একইভাবে ভর্ৎসনা করেছে—
তুই উচ্চ কপালিনী হও চিরুণদাঁতিনী
বাসরে খাইলে প্রাণনাথ ।। ৩৬

(বেহুলার কলার মান্দাসে ভাসিবার প্রস্তাব, ঐ)

◆ অশুভ লক্ষণ প্রসঙ্গা (যাত্রাকেন্দ্রিক)

১। চলিলেক সদাগর দক্ষিণ সদর
হরসিত করিল গমন।
বামনাকে বহে সর প্রাণ করে ধড়পড়
বামচক্ষু কম্পীঞে ঘন ঘন।।
দুই হস্ত জোড় করি বোলে সোনাঞী সুন্দরী
শুন প্রভু নারির বচন।
প্রহিত বৃহস্পতি বারে দক্ষিণে জায় জেবা নরে
জাতি প্রাণ নষ্ট হয় ধন।।
মঙ্গাল বুধ দুই বার দুই করী গেলে সংসার
ইয়াতে যে যায় সফরে।
ধনে বংশে নিদ্ধন কয় জত মুনীজন
ভাগ্যে সে তাহার প্রাণ ধরে।।

(নারায়ণ দেব রচিত পদ্মাপুরাণ)

২। সমুখে যোগীনি মাগে হাতে লইয়া থাল। / এবার উজানি গেলে না হইব ভাল।।
দক্ষিণে কুলির কণ্ঠে বাহে গড়াগড়ি। / যাত্রাকালে যাত্রা ঘট বাহে গড়াগড়ি।

(বিজয় গুপ্তের পদ্মাপুরাণ)

৩। দক্ষিণ লোচন নাচে স্বর নহে ভাল। / চরণে উঝাটি লাগে মাথে লাগে চাল।।
বামে সর্প দক্ষিণে শৃগালী রঞ্জা ডাকে। / সগুনি গৃধিনী শিরে ফিরে ঘন পাকে।
স্থানে স্থানে বিদ্যাধরী দেখে অমঙ্গাল। / জগতজীবন গায় সুন্দরী বিকল।।

(জগজ্জীবন ঘোষাল বিরচিত মনসামঙ্গাল)

মঙ্গলকাব্যে লোকাচার

লোকাচার হল সমাজ-স্বীকৃত কিছু কৃত্য বা পদ্ধতি যেগুলির সঙ্গে ব্যক্তি বা পরিবারের যত না শুভাশুভের যোগ তদপেক্ষা সমাজের প্রতিকূল সমালোচনাকে অতিক্রমণের প্রয়াসই এক্ষেত্রে মুখ্য। লোকাচারের সঙ্গেও বিশ্বাস-সংস্কারের যোগ। তবে বিশ্বাস-সংস্কার সম্পৃক্ত আচরণ সমাজের চোখে তেমন পড়ে না, কিন্তু লোকাচারের সঙ্গে সমাজের একাংশের অথবা বৃহদংশের যোগ থাকায় সমাজের অজান্তে বা অগোচরে লোকাচার অনুষ্ঠিত হয় না, হতে পারে না।

বিবাহিতা রমণীর হাতে আর কোনো আভরণ না থাকুক, অন্তত একটি লোহার চুড়ি বা বালা থাকেই, কেননা এটি যেমন এয়োস্ত্রীর চিহ্ন, অন্যদিকে এতে স্বামীর কল্যাণ সাধিত হয় বলে বিশ্বাস। পদ্মিনী নাম্নী এক দুঃস্থা রমণী সম্পর্কে বলা হয়েছে—

আয়তের চিহ্ন হাতে লোহা একগাছি। (অন্নদামঙ্গল, ভারতচন্দ্র)

কেউ হাঁচলে 'জীব' শব্দটি উচ্চারণ করতে হয়। সুন্দরের আচরণে ক্ষুব্ধ রাজকুমারী বিদ্যার মান ভাঙানোর জন্য কুমার সুন্দর ইচ্ছাপূর্বক নাকে কাঠি দিয়ে হেঁচেছে, যাতে বিদ্যাকে তার কল্যাণের জন্য 'জীব' বলতে হয়—

চতুর কুমার ভাবে জীব বাক্যে মান যাবে
হাঁচিলেন নাকে কাঠি দিয়া।
চতুর কুমারী ভাবে জীব কৈলে মান যাবে
জীব কব কথা না কহিয়া।।

(বিদ্যাসুন্দর, ভারতচন্দ্র)

সন্তান জন্মগ্রহণের পর ছয়দিনের দিন নবজাতকের মাথার কাছে দোয়াত, কলম, মিষ্টি ইত্যাদি রেখে দিতে হয়। বিধাতা-পুরুষ স্বয়ং এসে ঐদিন নাকি নবজাতকের ভাগ্যলিপি রচনা করে যান। লখিন্দরের জন্মের পর ছয় দিনের দিন সনকা এই বিশ্বাসের বশবর্তী হয়ে নির্দিষ্ট আচার পালন করেছিলেন বলে মনসামঙ্গলে বর্ণিত হয়েছে—

সনকা সুন্দরী ষষ্ঠী পূজা করি
যাহার যে রীতি আছে।
হাতে অস্ত্র লৈয়া রহিল বসিয়া
মসিপত্র লৈয়া কাছে।।
অর্ধরাত্রি গেলে বিধি হেনকালে
লিখিতে আইল ভালে।

(লখিন্দরের জন্ম, কেতকাদাস ক্ষেমানন্দের মনসামঙ্গল)

আজকের সমাজ বহুবিবাহ প্রথা প্রত্যাখ্যান করলেও কিছুকাল পূর্বেও বহুবিবাহ প্রথার চল ছিল। নারী সচেষ্ট হত স্বামীকে অন্যান্য পত্নীর কাছ থেকে সরিয়ে এনে নিজের বশীভূত করতে, এজন্য বশীকরণের সহায়তা গ্রহণ করার রেওয়াজ ছিল। খুল্লনা-জননী রম্ভাবতীর বশীকরণ ঔষধ সংগ্রহের বিস্তৃত বিবরণ কবিকঙ্কণ-চণ্ডীতে লভ্য—

কাটা মহিষের আনে নাসিকার দড়ি। / দুর্গার প্রদীপ ছুঁতে রেখেছিল চেড়ী।।
সাধুর কপালে যবে দিব পুনর্বসু। / খুল্লনার হবে সাধু নাক বিন্ধা পশু।।
আনিল পাকড়ি ডাল হাই আমলাপাতি। / আকুল কুন্তল করি আনে মধ্য রাতি।।
সাপের আঁটুলি আনে খুঁজে বেদের ঘরে। / কই মৎস্য পিত্ত আনে মঙ্গল বাসরে।।
কাপাসের ক্ষেত হৈতে আনিল গোমুণ্ড। / দাণ্ডাইয়া রবে সাধু তায় দুই দণ্ড।।
(ধনপতি সদাগরের উপাখ্যান, মুকুন্দ চক্রবর্তী)

এইবার দেখব সতীনের প্রতি স্বামীকে বীতশ্রদ্ধ করে তোলার আয়োজন—

পত্রিকার কলাগাছ রোপিয়া অঙ্গানে। / ঘৃতের প্রদীপ তাহে দিবে রাত্রি দিনে।।
নিরামিষ অন্ন খাবে তার পত্র পাড়ি। / সাধু হবে কিঙ্কর খুল্লনা হবে চেড়ী।।
শ্মশানের ক্ষীরা আর কবর বিছাতি। / বসন ত্যজিয়া তাহা আন শেষরাতি।।
ইহাই বাঁধিয়া দেহ খুল্লনা বসনে। / খুল্লনা পড়িবে তার বিষের নয়নে।।
(লহনার প্রতি লীলাবতীর ঔষধ ব্যবস্থা, মুকুন্দ চক্রবর্তী)

খুল্লনা যাতে সাধুর বিষ নজরে পড়ে, সেজন্য লীলাবতী লহনাকে এইসব কৃত্যাদির পরামর্শ দিয়েছে। শুধু বশীকরণ নয়, জলপড়ার মাধ্যমে মৃত ব্যক্তি বা মুমূর্ষু ব্যক্তিকে বাঁচিয়ে তোলার প্রয়াস সমাজে চালু ছিল। মন্ত্রপূত 'জলপড়া'র সাহায্যে লখিন্দরকে পুনর্জীবিত করার প্রয়াস বর্ণিত হয়েছে মনসামঙ্গল কাব্যে—

যাগ মন্ত্র পড়ি পদ্মা জলপড়া দিল। / অস্থি চর্ম লখাইর যে একত্র হইল।।
(পদ্মাপুরাণ, নারায়ণ দেব)

প্রবাদে বলা হয় 'মেয়ে যেন আমের ডাল ধরেছে'— আসলে মৃত পতির চিতায় সহমরণে ইচ্ছুক সতী নারী তার সহমরণের ইচ্ছা প্রকাশ করত আমের ডাল ধরে। এই লোকাচারের উল্লেখ পাই কেতকাদাসের কাব্যে। শিবের মৃত্যু সংবাদ অবগত হয়ে ভগবতী আম ডাল নিয়ে মৃত পতির কাছে উপনীত হয়েছেন—

ভাঙ্গিয়া আমের পাতা   চণ্ডিকা হৈম সুতা
প্রভুর উদ্দেশ্যে ভগবতী।
বিষপান কৈল যথা   সেখানে জগত মাতা
আসিয়া দেখিল প্রাণপতি।।
(মনসামঙ্গল, কেতকাদাস ক্ষেমানন্দ রচিত)

চৌর্যবৃত্তির সঙ্গে যুক্ত যারা তারা নিজেদের জীবিকার স্বার্থে ইঁদুরের মাটি মন্ত্রপূত করে ব্যবহার করত, এতে গৃহস্থরা নিদ্রাভিভূত হয়ে পড়ত—

পড়িছে ইন্দুর মাটি ধরি উভকরে॥
জাগ জাগ জাগ মাটি কাজে লাগ মোর। / ময়না নগর জুড়ে এস নিদ্রা ঘোর।।
আগম ডাকিনী তন্ত্রে মন্ত্রে পড়ে মাটি। / কালিকা দেবীর আজ্ঞা লাগ লাগ নিদাটী।
লাগ লাগ নিদাটি নগর জুড়ে লাগ। / যেখানে যেরূপে যেবা জাগে বীর ভাগ।।
(জাগরণ পালা, ঘনরাম চক্রবর্তীর ধর্মমঙ্গল)

নবজাতকের নামকরণ করার দায়িত্ব ন্যস্ত ছিল দৈবজ্ঞের ওপর। কালকেতুর নামকরণ করেছিল দৈবজ্ঞ—

দৈবজ্ঞ আনিয়া নাম থুইল কালকেতু। / গণকে দক্ষিণা দিল কল্যাণের হেতু।।
(কালকেতু উপাখ্যান, অভয়ামঙ্গাল, মুকুন্দ চক্রবর্তী)

যে কোনো শুভ কাজের সূচনা করা হত, গণকের গণনা করা শুভদিনে। কালকেতুর ব্যাধজীবনে প্রবেশ ঘটেছিল এই লোকাচার মেনেই—

গণকে আনিয়া ঘরে শুভদিন শুভবারে
ধনু দিল ব্যাধসুত করে।
(কালকেতু উপাখ্যান, অভয়ামঙ্গাল, মুকুন্দ চক্রবর্তী)

পুরুষতান্ত্রিক সমাজে যেমন বরপণের চল, মাতৃতান্ত্রিক সমাজে তেমনি কন্যাপণের চল ছিল। মাতা রম্ভাবতী কন্যাকে দোজবরের সঙ্গো বিবাহ দিতে অনিচ্ছুক ছিলেন। তাঁর যুক্তি ছিল—

নাগ্রিঃ লব কন্যা পণ
কেনি ঝিয়ে করাবে দুর্গতি।
(বণিক খণ্ড, অভয়ামঙ্গাল, মুকুন্দ চক্রবর্তী)

মঙ্গালকাব্যে উপাদান-নির্ভর সংস্কৃতি (Material Folklore) প্রসঙ্গা

মঙ্গালকাব্যগুলিতে Material Folklore-এর বহু নিদর্শন লভ্য— কি নেই তাতে? লোকবাদ্য, লোকঅস্ত্র, লোকআভরণ, লোকযান, লোকতৈজস, লোকপ্রযুক্তি—কিছুই বাদ যায়নি।

● **লোকবাদ্য—** ১। বাজে শিঙ্গা কাড়া ঢোল নৌবত ঝাঁঝর রোল
শঙ্খ ঘণ্টা বাজে ঘড়ি ঘড়ি।
(অন্নদামঙ্গাল, ভারতচন্দ্র)
২। মৃদঙ্গা মন্দিরা বায় কেহ নাচে কেহ গায়
(অভয়ামঙ্গাল, মুকুন্দ চক্রবর্তী)

লোকশিল্প— নৌকা, ডিঙ্গা ইত্যাদির নির্মাণ প্রসঙ্গা তো বটেই, তাছাড়া কাঁচুলি, টোপর, বিবাহে ব্যবহৃত শোলার মুকুট, যুদ্ধের ফলা বা ঢাল প্রভৃতিতে চিত্রকার্যের বিস্তৃত বিবরণ পাই। প্রাচীন বাংলায় লোকচিত্রকলার সাধনা যে ছিল এ থেকেই তা প্রমাণিত হয়। লক্ষণীয়, মঙ্গালকাব্যে সব শিল্পকীর্তিই বিশ্বকর্মার নামে উৎসর্গীকৃত। বর্ণিত হয়েছে বিশ্বকর্মা চণ্ডীর জন্য যে কাঁচুলি নির্মাণ করেছিলেন তাতে সমগ্র রামায়ণ, মহাভারত তথা পুরাণ কাহিনি চিত্রিত হয়েছিল। এ বর্ণনায় নিঃসন্দেহে আতিশয্য আছে, তাই বলে তা একেবারে আজগুবি এমনটিও বলা যাবে না।

● **লোকতৈজস—**"সমুখে যোগীনি মাগে হাতে লইয়া থাল।" (পদ্মাপুরাণ, বিজয় গুপ্ত) কিংবা, "কাঁচা হাঁড়ি কাঁচা সরা আনাইয়া তখন।/সন্ধ্যা করিয়া পোজে পদ্মার চরণ।।"মৃণ্ময় পাত্রের ব্যবহার

ছিল। কাঁচা হাঁড়ি এবং কাঁচা সরার উল্লেখ তারই প্রমাণ।

● **লোকপ্রযুক্তি—**

১। মন্ত্র পড়ি জাগায়ে ছোঁয়াল সিঁদকাঠি॥ (ধর্মমঙ্গল কাব্য, ঘনরাম চক্রবর্তী)
এছাড়াও জাঁতা, শাল, হাল ও অন্যান্য নানা লোকপ্রযুক্তির উল্লেখ লভ্য।

২। হাল প্রতি এক তঙ্কা না করিহ কারে শঙ্কা

৩। নতুন পরাণ ত্যজি শালে দিয়া ভর।।

● **লোকখাদ্য—**

নানাবিধ লোকখাদ্য উল্লিখিত হয়েছে মঙ্গালকাব্যগুলিতে—

নিধানী করিয়া খই তথি মহিষের দই
কুল করঞ্জা প্রাণসম বাসি।
যদি পাই মিঠা ঘোল পাকা চালিতার ঝোল
প্রাণ পাই পাইলে আমসী।।
আমার সাধের সিমা হেলঞ্চ কলমী গিমা
বোয়ালী কুটিয়া কর পাক।
ঘন কাটি খর জ্বালে সান্তলিবে কটু তেলে
দিবে তাতে পলতার শাক॥
পুঁই ডগা মুখী কচু তাহে ফুলবড়ি কিছু
কাঠালের বিচি গণ্ডা দশ।
বান্ধিবে চিঙ্গুড়ি মিনে শাতুলিবে কটু তেলে
অবশেষে দিবে আদারস॥

(নিদয়ার সাধভক্ষণ)

● **লোকআভরণ—**

কর্ণাভরণ—বেড়াইমু যোগিনী হইয়া পরিয়া কুন্তল॥ (ধনপতি উপাখ্যান) কুন্তল কর্ণাভরণ, অন্যান্য কর্ণাভরণের মধ্যে পাই কড়ি (ঘনরাম চক্রবর্তী, ধর্মমঙ্গাল)। নাসিকাভরণের মধ্যে পাই বেউলী (ধর্মমঙ্গাল, ঘনরাম চক্রবর্তী), নাকমাছি (রূপরামের ধর্মমঙ্গাল), হস্তাভরণের মধ্যে পাই কঙ্কণ (ধর্মমঙ্গাল, ঘনরাম চক্রবর্তী), **বাহুর আভরণ**— সোনার বাজু (ঘনরাম চক্রবর্তী, ধর্মমঙ্গাল), সোনার তাড় (রামেশ্বর ভট্টাচার্য, শিবায়ন), ডাঙ্গা (দ্বিজ রামদেব অভয়ামঙ্গাল), **কণ্ঠাভরণ**—শতেশ্বরী হার (রূপরামের ধর্মমঙ্গাল), মোহনমালা (রামেশ্বর ভট্টাচার্য, শিবায়ন), হাঁসুলী (দ্বিজ রামদেব, অভয়ামঙ্গাল), আঙ্গুলে পরিধেয় অঙ্গুরীয়র উল্লেখও লভ্য (ঘনরাম চক্রবর্তী, ধর্মমঙ্গাল)। পায়ে পরার অলঙ্কার ছিল মল (রামেশ্বর ভট্টাচার্য, শিবায়ন), কোমরের অলংকার ছিল কিঙ্কিণী (ঘনরাম চক্রবর্তী, ধর্মমঙ্গাল)।

মঙ্গালকাব্যগুলিতে Motif-এর ব্যবহার—মঙ্গালকাব্যগুলি যে লোকঐতিহ্যকে আশ্রয় করে শিষ্ট কবিদের দ্বারা রচিত তার অকাট্য প্রমাণ এগুলিতে লোকসাহিত্যের বিভিন্ন মোটিফের প্রাচুর্য।

ক। অপ্রাকৃত জন্মবৃত্তান্ত : মনসামঙ্গাল কাব্যে বর্ণিত হয়েছে শিবের বীর্যপাত হয়ে তা গিয়ে পড়ে পদ্মপাতায়, এরই পরিণামে অযোনিসম্ভবা মনসার জন্ম। অর্থাৎ স্বাভাবিক জৈবিক নিয়মানুসারে মনসার জন্ম হয়নি। লোককথাতেও দেখি সাধু বা সন্ন্যাসী প্রদত্ত শিকড় বা কোনো ফল ভক্ষণ করে অথবা কোনো পাখীর মাংস ভক্ষণ করে বন্ধ্যা রানিরা সন্তানসম্ভবা হয়েছে। মনসার জন্মবৃত্তান্তটি Supernatural birth motif-এর নিদর্শন। নেতার জন্মেও Supernatural birth motif লক্ষণীয়। চণ্ডী মনসাকে গৃহে আশ্রয় দান করতে অসম্মত হলে শিব কন্যাকে নিয়ে আশ্রয়ের সন্ধানে নির্গত হলেন। পথিমধ্যে পর্বতোপরি একটি সিজবৃক্ষের তলে মনসা ক্লান্তিতে নিদ্রাভিভূত হল। শিব এই অবস্থায় মনসাকে ত্যাগ করে চলে আসার সময় বেদনাশ্রু নির্গত হল। এই বেদনাশ্রু থেকেই জন্ম হল নেতার। নারায়ণ দেবের কাব্যে নেতার জন্মবৃত্তান্ত অন্যরূপ, তবুও তা Supernatural birth motif-কেই সূচিত করে। শিব নাকি তাঁর স্খলিত বীর্য একখণ্ড বস্ত্র বা ন্যাতায় মুছে ছুঁড়ে ফেলে দিলে সেই ন্যাতা থেকেই নেতার জন্ম হয়।

খ। লোককথার একটি সাধারণ মোটিফ হল কনিষ্ঠ পুত্র অথবা কনিষ্ঠা কন্যা কিংবা কনিষ্ঠা পুত্রবধূর দ্বারা অসাধ্যসাধন। মনসামঙ্গালকাব্যেও এই মোটিফটি লভ্য। চাঁদ সদাগরের সাত সাতটি পুত্র, সাত সাতটি পুত্রবধূ। চাঁদ সদাগরের কনিষ্ঠ পুত্র লখিন্দর এবং কনিষ্ঠা পুত্রবধূ বেহুলার দ্বারাই কিন্তু অসাধ্য সাধিত হয়েছে। Successful youngest son এবং daughter-in-law মনসামঙ্গালে লভ্য। চাঁদ সদাগরের কনিষ্ঠ পুত্র লখিন্দর এবং কনিষ্ঠা পুত্রবধূ বেহুলাই সমগ্র আখ্যানে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করেছে। এদের নিয়েই সমগ্র আখ্যান আবর্তিত, বিশেষত বেহুলার দ্বারাই অসাধ্যসাধন হয়েছে। সাতজন ছেলে বেঁচে উঠেছে। নিমজ্জিত নৌকাগুলি ভেসে উঠেছে। চাঁদ সদাগরের ব্যক্তি ও পারিবারিক জীবন থেকে অশুভ মেঘের ছায়া অপসারিত হয়েছে। মনসা প্রসন্না হয়ে চাঁদ সদাগরের আনুকূল্য করেছেন।

গ। লোককথার আর একটি সুলভ মোটিফ হল পুনর্জীবন লাভ— Resuscitation motif। চাঁদ সদাগরের সাতটি পুত্রেরই মৃত্যু হয়েছিল, সাতটিরই পুনর্জীবন লাভ ঘটে। বিশেষত লখিন্দরের ক্ষেত্রে তার বিকৃত মৃতদেহ শেষে জীবন্ত হয়ে Resuscitation motif এর উল্লেখযোগ্য নিদর্শন হয়ে উঠেছে। প্রসঙ্গাত উল্লেখ্য, Thompson তাঁর 'The Folktale' (1946)-এ উল্লেখ করেছেন 'The parts of the dismembered corpse are brought together and revived' (page 255)।

ঘ। লোককথার আর একটি মোটিফ হল Revengeful Serpent motif বা প্রতিহিংসাপরায়ণ সাপের প্রসঙ্গা। সমগ্র মনসামঙ্গাল কাব্যটিই তো সর্পের অধিষ্ঠাত্রী দেবী মনসার প্রতিহিংসার আধারে গড়ে উঠেছে। চাঁদ সদাগর মনসার পূজা করতে অনিচ্ছুক, পরিণামে ক্ষুব্ধ মনসা যতভাবে সম্ভব চাঁদ সদাগরকে বিড়ম্বনায় ফেলেছে। সাতটি পুত্র, তাদের বাণিজ্যতরী সব নিমজ্জিত হয়েছে। শেষ পর্যন্ত বেহুলার মধ্যস্থতায় মনসার প্রতিহিংসাপরায়ণতা চাঁদ সদাগরের আনুকুল্যে রূপান্তরিত হয়েছে।

৬। বেহুলার সাফল্য লাভের পশ্চাতে কার্যকরী হয়েছে তার সতীত্বের জোর। বারংবার সে প্রলুব্ধা হয়েছে কখনও ধনামনা, কখনও ঘাটোয়াল, আবার কখনও গোদা বা টেটন তাদের অশুভ অভিলাষ ব্যক্ত করেছে। কিন্তু কর্তব্যে অবিচল বেহুলাকে কিছুই টলাতে পারেনি। মনসামঙ্গালে বেহুলার সতীত্বের পরীক্ষা আখ্যানকে নূতন মাত্রা দিয়েছে, বেহুলা অষ্ট পরীক্ষায় উত্তীর্ণা হয়েছে, তবেই শেষ রক্ষে হয়েছে। একেই বলা হয় Chastity test motif।

এসব ছাড়াও অনিরুদ্ধ ও উষার অগ্নিকুণ্ডে আত্মত্যাগের পর তাদের আত্মাদ্বয়ের ভ্রমর-ভ্রমরীর রূপ পরিগ্রহ, চাঁদ সদাগর ও শঙ্কর গারড়ীর মহাজ্ঞান লাভ, সমুদ্র মধ্যস্থ পুরীর বর্ণনা, কমলে-কামিনীর বর্ণনা (চণ্ডীমঙ্গাল) ইত্যাদি বিষয় লোককথার সঙ্গো নৈকট্য স্থাপিত করেছে।

উৎসের সন্ধানে

১। ‘বাংলা মঙ্গালকাব্যের ইতিহাস’, আশুতোষ ভট্টাচার্য, ষষ্ঠ সংস্করণ (১৯৭৫)
২। ‘বাংলা মঙ্গালকাব্যে লৌকিক উপাদান’, ইন্দুভূষণ মণ্ডল, ১৯৯৯
৩। ‘মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে বাংলা ও বাঙালি সমাজ’, মহম্মদ আবদুল জলিল, ১৯৯৬
৪। বিজয় গুপ্তের ‘পদ্মাপুরাণ’, অমৃতলাল বালা সম্পাদিত, ১৯৯৯
৫। ‘মধ্যযুগের কাব্য সংগ্রহ’, আহমদ শরীফ সম্পাদিত, ১৩৬৯
৬। ‘মধ্যযুগের সাহিত্যে সমাজ ও সংস্কৃতির রূপ’, আহমদ শরীফ, ১৯৭৭
৭। ‘বাঙালী ও বাঙলা সাহিত্য’, ঐ, ১৯৮৩
৮। ‘বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস’, সুকুমার সেন, ১ম খণ্ড, পূর্বার্ধ, ১৯৬৩ ও ১ম খণ্ড অপরার্ধ ১৯৬৩

মঙ্গলকাব্যে নিম্নবর্গের শ্রমজীবী নারীরা

কামরুজ্জামান

খ্রিস্টীয় ত্রয়োদশ শতাব্দী থেকে আরম্ভ করে অষ্টাদশ শতাব্দী পর্যন্ত বঙ্গসাহিত্যে যে বিশেষ একশ্রেণির ধর্মবিষয়ক আখ্যান কাব্য প্রচলিত ছিল, তাই বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে মঙ্গলকাব্য নামে পরিচিত।

সুপ্রাচীন কাল থেকেই বাংলার লোকসাধারণ তাদের নিজস্ব আদর্শ অনুসারে নিজের নিজের লৌকিক দেবতাদের পূজাপদ্ধতি ও মহিমাদ্যোতক কাহিনি রচনা করেছিল। বলাবাহুল্য যে, পূজাপদ্ধতি এবং মহিমাবোধ প্রকাশের ভাব এবং ভাষা দুই-ই কালের অগ্রগতির সঙ্গে পরিবর্তিত হয়েছে। অনুমান করা যায়, বাংলা সাহিত্যের আদিযুগে অসম্পূর্ণ ভাষায়, অ-গঠিত কাব্যে ঐ সকল লৌকিক দেব-দেবীদের মহিমাগাথা পাঁচালির আকারে রচিত হয়েছিল। অনেকে আবার মনে করে থাকেন, 'ত্রয়োদশ শতাব্দীর যুগপ্লাবী প্রয়োজনের প্রভাবে, এই পাঁচালিকাব্য পূর্ণাঙ্গ মঙ্গলকাব্যের আকার ধারণ করেছে।'

বাংলাদেশ হল আর্দ্রভূমির দেশ। এখানে ডাঙায় বাঘ, জলে কুমীর এবং সব জায়গাতেই সাপের উপদ্রব। সুতরাং মনসার বন্দনা করলে সর্পাঘাত থেকে রক্ষা পাওয়া যাবে, চণ্ডীর উপাসনা করলে সমস্ত আপদ কেটে যাবে, দক্ষিণ রায়-কালুরায়ের পূজায় শিরনি দিলে ভক্তকে বাঘ, কুমিরের আক্রমণে আর প্রাণ হারাতে হবে না। এমনি করে উপদ্রুত অসহায় কৃষকসমাজ, নিম্নবর্ণ ও নারীরা ভয়ে-ভক্তিতে মনসার ভাসান গান গেয়েছে, চণ্ডীর মঙ্গলগান বেঁধেছে, রঞ্জাবতী-লাউসেন-কানড়ার অদ্ভুত কাহিনি শুনেছে।

মঙ্গলকাব্যে চিত্রিত সাধারণ মানুষের দারিদ্র্য এবং তার জন্য মানবিক সম্পর্কের অবনতি, বাংলার লোকজীবনের সবচেয়ে বড়ো দৃষ্টান্ত। অরবিন্দ পোদ্দার লিখছেন, 'সেকালের সম্পাদিত আচার-আচরণ, চলন-বলন ইত্যাদি থেকে আরম্ভ করে ভাবাকাশ পর্যন্ত অর্থাৎ সমাজ-সংস্কৃতির একটা পূর্ণাঙ্গ চিত্র এই কাহিনি থেকে সংগ্রহ করা যেতে পারে। আর লক্ষ করার বিষয় এই যে, এই জীবন ও সংস্কৃতি নগর-জীবন ও নগর-সংস্কৃতি নয়। নগরের হৃদয়হীন পরিবেশে যে কৃত্রিম জীবন, সংস্কৃতি ও আচার আচরণ গড়ে ওঠে, তার সম্পর্ক থেকেই এই জীবন ও সংস্কৃতি মুক্ত। নগরের বাইরে সহজভাবে যে জীবন নিজেকে সৃষ্টি করে চলেছে নিজেরই সত্তা ও প্রকৃতির একান্ত তাগিদে, মঙ্গলকাব্যগুলো সেই জীবনেরই স্বাক্ষর।'

মঙ্গালকাব্যের প্রধান প্রধান চরিত্রগুলো আলোচনা করলে দেখা যাবে, চরিত্রগুলোর মানসলোক গঠিত হয়েছে লোকায়ত বিশ্বাস ও সংস্কারের দ্বারা। গ্রামীণ বারব্রত ও দেবী-ভজনা মূলত লৌকিক সমাজের নারীদের মধ্যেই প্রচলিত ছিল। মঙ্গালকাব্যগুলো মধ্যযুগীয় বাংলার সমাজে প্রচলিত ব্রতচারেরই সংস্কৃত রূপ। মঙ্গালকাব্যগুলোর উৎস হল ব্রতকথা। আর ব্রতকথা লোকসমাজের নিজস্ব সম্পদ। ইস্টদেব বা গ্রামদেবতার মাহাত্ম্য কীর্তনই ব্রতকথার লক্ষ্য। স্বাভাবিকভাবেই মঙ্গালকাব্যের চরিত্রগুলোর মধ্যেও দেখা যায় লৌকিক দেব-দেবীর ওপর গভীর আস্থা। প্রকৃতপক্ষে এই সব নারীজীবনের ভিত্তিভূমি 'ব্রতপালন' ও 'আচার অনুশাসন' মঙ্গালকাব্যের নারী চরিত্রগুলোও তাদের লৌকিক উৎসের সত্যতাকেই স্পষ্ট করে তোলে।

মঙ্গালকাব্যের সংজ্ঞা নির্ণয় করতে গিয়ে অধ্যাপক আশুতোষ ভট্টাচার্য অনুমান করেছেন 'মঙ্গাল' নামক রাগ থেকে 'মঙ্গালকাব্য' নামের উৎপত্তি হয়েছে। আর মূল 'মঙ্গাল' শব্দটি নাকি 'অনার্য' উৎস সম্ভূত। প্রাচীনকালে কাব্য-কবিতা বিশেষত দেব-দেবী বিষয়ক সংগীত মাত্রই মঙ্গাল রাগে গাওয়া হত। কাব্যে নামের সঙ্গো আবার 'মঙ্গাল' শব্দটি যুক্ত থাকলেই যে তা মঙ্গালকাব্য, এমনটাও নয়। তাহলে চৈতন্যমঙ্গাল, কৃষ্ণমঙ্গাল, গোবিন্দমঙ্গাল কাব্যকেও 'মঙ্গালকাব্য' শ্রেণির অন্তর্ভুক্ত করা হত। আসলে, এক বিশেষ শ্রেণির কাব্যগোষ্ঠীর বিশেষ ভাবাদর্শ ও রূপগত বৈশিষ্ট্যের প্রতি দৃষ্টি রেখেই এই ধরনের নামকরণ করা হয়েছে। আশুতোষ ভট্টাচার্য লিখছেন, 'যে গানে মঙ্গালকারী দেবতার মাহাত্ম্য বর্ণনা করা হয়, যে গান মঙ্গাল সুরে গাওয়া হয়, যে গান 'যাত্রা' বা 'মেলায়' (হিন্দিতে মঙ্গাল শব্দের অর্থ যাত্রা, মেলা) গাওয়া হয় তাকেই মঙ্গালকাব্য বলা হয়ে থাকে।' যেখানে দেবতার আরাধনা, মাহাত্ম্যকীর্তন শুনলে মঙ্গাল হয়, না শুনলে অমঙ্গাল হয়, এমনকি যে কাব্য ঘরে রাখলেও মঙ্গাল হয়, তাই-ই মঙ্গালকাব্য। সমাজে যেখানে অস্থিরতা, শান্তিহীন জীবন সেখানেই এই অবিশ্বাস মানুষকে বেঁচে থাকার উপায়-বল-ভরসা সবই দিয়েছে। এখানেই মঙ্গালকাব্যের শ্রেষ্ঠত্ব। ধর্মীয় পটভূমিতে সৃষ্টি হলেও চতুর্দশ থেকে অষ্টাদশ শতকের মধ্যে রচিত মঙ্গালকাব্যগুলোতে সমকালীন যুগজীবন ও গণচেতনার স্বরূপ বিদ্যমান। মঙ্গালকাব্যে প্রতিফলিত হয়েছে অর্থনৈতিক ও সামাজিক জটিল জীবনের ঘাত-প্রতিঘাতময় চিত্র। ফলত সম-সাময়িক কালে প্রচলিত অন্যান্য কাব্য থেকে মঙ্গালকাব্য প্রচার, প্রসার ও জনপ্রিয়তায় এগিয়ে ছিল বহুগুণ। উমা সেন যথার্থই বলেছেন, 'অক্ষর পরিচয়হীন কর্ষণজীবী যে সমাজ সারাদিন কঠোর পরিশ্রম করে, যারা সুন্দরবনে গাছ কেটে জমি আবাদ করে, সাপ-বাঘ-কুমির তাড়িয়ে বসবাস করে এই কাব্যে তাদেরই জীবন প্রতিফলিত। মঙ্গালকাব্য বাংলার মাটির সম্পদ এবং একটি আদিম সরলতাই এর মূল সুর।' তবে একটা কথা, মঙ্গালকাব্য যে একটি 'মিশ্র শিল্প' তাতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই। প্রতিটি মঙ্গালকাব্যের মধ্যে এক জায়গায় একটা আশ্চর্যরকম মিল (সাদৃশ্য) লক্ষ করা যায়। সেখানে দেবতা ও মানুষ ভেদে নিম্নবর্গের

উত্তরণই মূল কথা। মঙ্গালকাব্যগুলোর মূলে ছিল রাজনৈতিক অরাজকতার ইতিহাস। যে ইতিহাসের মধ্যে সাংস্কৃতিক সম্মেলন ও প্রতিরোধের বিষয়টি গুরুত্ব পেয়েছে। আর্য-অনার্য মিলিত এক প্রচেষ্টার উদাহরণ এই মঙ্গালকাব্যগুলো। বিশেষ করে মনসামঙ্গাল, চণ্ডীমঙ্গাল, ধর্মমঙ্গাল, শিবমঙ্গাল; উৎপত্তির মূলে এই ইতিহাস প্রচ্ছন্ন থাকলেও পরবর্তীকালে অষ্টাদশ শতাব্দীতে প্রাপ্ত ভারতচন্দ্র রায়গুণাকারের অন্নদা মঙ্গালের উৎপত্তির ইতিহাস স্বতন্ত্র। সেখানে রাজনৈতিক অরাজক অবস্থা কাহিনিধারার বিভিন্ন অংশে ছাপ ফেলেছে। মূলত প্রতিটি মঙ্গালকাব্যের সৃষ্টিকল্পে রয়েছে মানুষের সমাজজীবনের বিবিধ সমস্যা মেটানোর প্রয়োজন। অনার্য পূজিত দেব-দেবীরা যে প্রাধান্য পেয়েছেন, সেও একধনের বৃহত্তর প্রয়োজনে। আবার সাধারণ মানুষের ভয়-ভীতি, ভাবনা-চিন্তা থেকে উদ্ভূত হয়েছেন এই সব দেব-দেবী। প্রকৃতির বিবিধ প্রতিকূলতার প্রতিষেধক রূপে এইসব দেবতার জন্ম হয়েছে নিম্নবর্গের মানুষের ভাবনায়। প্রতিটি মঙ্গালকাব্যের মূল লক্ষ্য হল পূজা প্রচার।

মধ্যযুগের সমাজে নারীর শ্রমবৃত্তি একটি উল্লেখযোগ্য দিক। মঙ্গালকাব্যের কবিরা তাঁদের কাব্যে যে সকল 'শ্রমজীবী' নারীদের উপস্থাপন করেছেন তাদের মধ্যে— নেতা, অনান্নী (সনকার দাসী), ফুল্লরা, খুল্লনা, শুঁড়িনী, দুর্বলা, ধাত্রী (দাই), নটী (নটিনী), লখাই ডোমনী, কলিঙ্গা, নয়ানী, সুরিক্ষা, কানড়া, ধুমসী, ঈশ্বরী পাটনী, হীরা মালিনী বিশেষ উল্লেখযোগ্য। সে যুগের সমাজে নারী শুধু গৃহবধূই ছিল না, তারা পারিবারিক জীবনে অনেক ক্ষেত্রে ছিল স্বামীর সহকারিণী। নিম্নবর্গের, অন্ত্যজশ্রেণির প্রায় সকল নারী-পুরুষের সঙ্গো সাংসারিক কাজ-কর্ম থেকে শুরু করে অর্থোপার্জনেও অংশ গ্রহণ করত। অভাব এবং দারিদ্র্যের কারণে তাদের ভূমিকা ছিল বিশেষ অগ্রগণ্য। সমাজের নিম্নবর্গের মানুষ বলে তাদের মধ্যেকার সামাজিক বিধি-নিষেধ ছিল একটু শিথিল।

বাংলা মঙ্গালকাব্য ধারায় পরিচিত এই সব নিম্নবর্গের শ্রমজীবী নারীরা সমাজে বেশিরভাগ সময় 'দাসীবৃত্তি' থেকে শুরু করে পতিতাবৃত্তি পর্যন্ত করত। অন্যরা যারা সাবলম্বী হওয়ার চেষ্টা করত, তারা কেউ পসরা-সাজিয়ে হাটে বাজারে গমন করত, কেউ বা নৌকার হালের পাশে দাঁড়িয়ে রোদ-বৃষ্টি এবং প্রাকৃতিক দুর্যোগকে উপেক্ষা করে খেয়া পারাপার করত, কেউ অন্যের ময়লা কাপড় কেচে দিয়ে টাকা রোজগার করত, কেউ মাতাল-জুয়াড়িদের পাশে বসে নেশার সামগ্রী পরিবেশন করত, কেউ স্বামীর কথা মেনে দেহ বিক্রি করে সংসার চালাত, কেউ যোদ্ধা সেজে দেশ-রক্ষার কাজে আত্মনিয়োগ করত— এমন দৃষ্টান্তও আছে। মধ্যযুগের সমাজে নারীর এই যে শ্রম, ত্যাগ, সাহস— বিনিময়ে তার ভাগ্যে কেবল অবহেলা আর বদনাম। কেননা, এই পুরুষ-শাসিত সমাজে নারী যেখানে কেবলমাত্র পুরুষের সম্ভোগ আর বিলাসিতার বস্তু ছাড়া আর কিছুই নয়, সেখানে নারীর ভাগ্যে এমন 'পুরস্কার' ব্যতীত আর কি-ই বা মিলতে পারে।

মনসামঙ্গাল, চণ্ডীমঙ্গাল, ধর্মমঙ্গাল, অন্নদামঙ্গাল, শিবমঙ্গাল ইত্যাদিতে প্রাপ্ত নিম্নবর্গের শ্রমজীবী নারীচরিত্রগুলোকে কয়েকটি বর্গে ভাগ করা যেতে পারে—

মঙ্গলকাব্য	শ্রমজীবী নারীদের নাম	শ্রমজীবী নারীদের স্বরূপ
মনসামঙ্গাল	নেতা	অযোনিসম্ভূতা, দূরদর্শিনী
	অনাম্নী (সনকার দাসী)	দাসী, সাহসিনী
	ফুল্লরা	গৃহবধূ, দারিদ্র্যক্লিস্ট
	খুল্লনা	রূপমতী গৃহবধূ, চতুরা
চণ্ডীমঙ্গাল	শুঁড়িনী	দেহপসারিণী,সমাজ বহির্ভূতা অস্পৃশ্য
	দুর্বলা	দাসী, চতুরা
	ধাত্রী	দাই, কর্তব্যপরায়ণ
	নটী	দেহ পসারিণী, নৃত্যগীত পরিবেশনী
	লখাই ডোমনী	গৃহবধূ, বীরাঙ্গানা
	কলিঙ্গাা	পাটরানি, যুদ্ধ বিদ্যায় পারদর্শিনী
ধর্মমঙ্গাল	নয়ানী	দুশ্চরিত্রা, দেহ পসারিণী
	সুরিক্ষা	রূপমতী দুশ্চরিত্রা, বহুবিধ কলায় নিপুণা
	কানড়া	প্রেমিকা, বীরাঙ্গানা
	ধুমসী	দাসী, বীরাঙ্গানা
অন্নদামঙ্গাল	ঈশ্বরী পাটনী	গৃহবধূ, সহজ-সরল-বিশ্বাসযোগ্য
	হীরা মালিনী	স্বামীহীনা নিঃসন্তান, অর্থপিপাসু

১. নেতা : কন্যাকে সিজুয়া পর্বতে রেখে আসতে শিবের চোখে আসে জল, আর সেই নেত্রজল থেকে জন্ম নেয় নেতা। শিবের বরে নেতা মনসার প্রিয়পাত্রী আর নেতার কথা শুনে চলবে মনসা, কিন্তু নেতার আক্ষেপ—

নেত্রে জন্ম হইল না গেলাম দেবপুরী।
সকলে বলিবে মোরে রজক কুমারী।।

মহাদুঃখের প্রতিরূপ একনারী নেতা, কিন্তু বাস্তব ক্ষেত্রে দেখা যায়, নেতা তার আকৃতি-প্রকৃতিতে সম্পূর্ণ বিপরীত। কাব্যের ঘটনা-প্রবাহে দেখা যায়, চাঁদ ও সনকার যত কিছু ক্ষতি হয়েছে, তা নেতারই প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষ প্রচেষ্টায়। নেতা অযোনি সম্ভূতা, অবহেলিতা ও সমাজবর্হির্ভূতা এক অসামান্যা নারী। সে সমাজে প্রতিষ্ঠা পাওয়ার জন্য পিতার ওপর নির্ভরশীল। সম্ভবত সে জন্যই সে দেবতাদের কাপড় কাচায় নিয়োজিতা। অপরদিকে, মনসার সুখ-দুঃখের অংশীদার হয়েই যেন সে এ পৃথিবীতে জন্ম নিয়েছে।

নেতার জীবন এক গতিশীল আবর্তনে ঘুরপাক খেয়েছে। ফলে জীবনের প্রতি পদক্ষেপে এসেছে তার চরিত্রে অভাবনীয় রূপান্তর। এরকম রূপান্তর মঙ্গালকাব্যের কোনো নারী চরিত্রের মধ্যে দেখা যায়নি। মনসাকে চম্পক নগরে যাবার পরামর্শ দান, মৃত্যুরাজ যমকে পরাস্ত করার জন্য মনসাকে বুদ্ধি দেওয়া, চাঁদকে প্রাণে না মারার জন্য মনসাকে পরামর্শ

প্রদান, মনসাকে মাতার রূপ ধারণ করার জন্য যুক্তি প্রদান, মনসার প্রতিটি কার্যসিদ্ধিতে অভয় দান ও পরামর্শ প্রদান প্রভৃতি নেতা নিজেই গ্রহণ করেছে।

চাঁদ ও মনসার দ্বন্দ্বের একসময় পরিসমাপ্তি হবে এবং মনসার জয় বিঘোষিত হবে— এরূপ ভবিষ্যৎবাণী করে নেতাই সর্বপ্রথম মনসাকে আশ্বস্ত করেছে—

নেতা বলে বিষহরি চিন্তা কেন কর।
হইবে তোমার পূজা পৃথিবী মাঝার।।

চাঁদকে যে ভাবেই হোক বাঁচিয়ে রাখতে হবে। নেতার দৃঢ় বিশ্বাস, চাঁদের পুত্রবধূ বেহুলার দ্বারাই মর্ত্যলোকে মনসার পূজা সম্ভব হবে, সেজন্য চাঁদের ধন-জন রক্ষায় অগ্রণী ভূমিকা নিতে মনসাকে নির্দেশ দিয়েছে—

চান্দর যত ধন রাখ গঙ্গার স্থান।
যখন বেহুলা চায় দিবা ততক্ষণ।।

অপরদিকে, চাঁদের মৃত্যু হলে মর্ত্যলোকে মনসার পূজা-প্রচার হবে না— এ সত্যটি নেতা সঠিকভাবে উপলব্ধি করেছে। তাই সে চাঁদের জীবন রক্ষায় মনসাকে সতর্ক করে দিয়েছে—

নেতা বলে পদ্মাবতী চাঁদের প্রাণ যাবে।
চাঁদ মরিলে তোমার পূজা নাহি হবে।।

আসলে, নেতার দূরদর্শিতার জন্যই মনসার মর্ত্যলোকে প্রতিষ্ঠা পাওয়া সম্ভব হয়েছে।

২. অনাম্নী (সনকার দাসী) : মধ্যযুগের বর্ধিষ্ণু পরিবার-জীবনে দাসী ও ভৃত্যের বিশিষ্ট ভূমিকা ছিল। বিজয় গুপ্তের মনসামঙ্গলে চাঁদ সদাগরের স্ত্রী সনকার প্রধান পরিচারিকা একটি বিশিষ্ট চরিত্ররূপে খুব অল্প অবকাশে প্রকাশ পেয়েছে। চাঁদ সদাগরের দীর্ঘ অনুপস্থিতিতে সনকাই তখন সম্পত্তি ইত্যাদির প্রতি সতর্ক দৃষ্টি রাখছিল। একদিন তার দাসী বাগানের মধ্যে একটি ছিন্নবেশ পুরুষকে দেখতে পেয়ে চোর ভেবে তাড়া করে। লক্ষ করার বিষয়, দাসী দুঃসাহসী, চোর দেখে সে ভয়ে পালিয়ে যায় না। লোকটি বরং ভয়ে লুকোনোর চেস্টা করে। দাসী তাকে ধরে ফেলে প্রহর করতে থাকে। চাঁদ আত্মপরিচয় দেবার চেস্টা করে, দাসী বিশ্বাস করে না, বরং মিথ্যা পরিচয় দেবার জন্য তাকে পদপ্রহারেও কুণ্ঠিত হয় না। শেষ পর্যন্ত সে তাকে কয়েকটি কলা গাছের খোসা একত্র করে বেঁধে ফেলে লাঞ্ছিত করতে করতে সনকার দরবারে বিচারের জন্য নিয়ে যায়। অবলা বাঙালি নারীর এই সবলা রূপ, এই সাহস এবং বলিষ্ঠতা চরিত্রটিকে বিশিস্টতা দিয়েছে।

৩. ফুল্লরা : কালকেতু উপাখ্যানের প্রধান নারী চরিত্র ফুল্লরা। চণ্ডীমঙ্গালের কবি মুকুন্দ চক্রবর্তী এই রমণীর যে চরিত্র-চিত্র অঙ্কন করেছেন তা খুবই বিস্ময়কর। ফুল্লরা কিছু জটিল চরিত্র নয়, কিন্তু অত্যন্ত জীবন্ত। সে কালকেতু ব্যাধের স্ত্রী। কালকেতু বনে বনে পশু শিকার করে বেড়ায়। ফুল্লরা সেই সব পশুর মাংস, চামড়া, গণ্ডার-ঘোড়া-হাতির দাঁত হাটে বিক্রি করে। ফুল্লরা ঘরে-বাইরে সমান পরিশ্রম করে। হাটে-হাটে ঘুরে শিকারের মালপত্র তাকেই বিক্রি করতে হয়, কারণ সেই সময়টা কালকেতুকে ঘুরে বেড়াতে হয় বনে শিকারের

খোঁজে। ফুল্লরা শিকারলব্ধ কী কী দ্রব্য হাটে বিক্রি করে?

১. ফুল্লরা পসরা করে নগর-চাতরে।
হাঁড়িয়া চামর বেচে চারিপণ দরে।।
২. শৃঙ্গোর পসরা দেয় ফুল্লরা বাজারে।
পণ দরে শিঙ্গা জোড়া লয় সিঙ্গাদারে।।
৩. যন্ত্র পাতি ব্যাঘ্র মারে খুলে লয় ছাল।
ব্যাঘ্র নখ ক্ষুদ দিয়া কিনয়ে ছাওয়াল।।
৪. হাটে বাঘ-ছাল বেচে ফুল্লরা রূপসী।
গণ্ডকে মারিয়া তার খঙ্গা লয় ছিণ্ডে।।
৫. ফুল্লরা বেচয়ে খঙ্গা দরে এক পণ।

নানারূপ দ্রব্য বিক্রির জন্য নানারূপ ক্রেতা দরকার। সাধারণভাবে সব বিক্রি হয় না। তবে পশুমাংস মোটামুটি নিয়মিত বিক্রি হয় হাটে। এটাই তাদের প্রধান জীবিকা। অন্ত্যজ শ্রমজীবী রমণী বর্ণ-হিন্দু পরিবারের বধূদের মতো গৃহকোণ-আশ্রয়ী নয়। উপার্জনে সে স্বামীর সমান অংশীদার। কালকেতু যেদিন শিকার পায় না, সেদিন এই দরিদ্র ব্যাধপত্নী ফুল্লরার অন্নচিন্তার পাশাপাশি নিজের দারিদ্র্য দুঃখ-ভারাক্রান্ত ভাগ্যের কথাও ফুটে ওঠে—

বীরে দেখি শূন্যপাণি কপালে আঘাত হানি
দারুণ দৈবের গতি কপালে দরিদ্র পতি
অন্ন বস্ত্র নাই ঘরে বিয়া দিল হেন বরে।

অন্নবস্ত্রহীন ঘরে শ্রম ও দুঃখের মধ্য দিয়ে কবি ফুল্লরার যে দারিদ্র-ক্লিস্ট মুখটি উপস্থাপন করেছেন, তাতে মধ্যযুগের শ্রমজীবী নারীর সাধারণ বৈশিষ্ট্য ফুটে উঠেছে।

৪. খুল্লনা : ধনপতি আখ্যানের প্রধান নারী চরিত্র খুল্লনা। চরিত্রটি বেশ জীবন্ত এবং গার্হস্থ প্রেম, দুঃখভোগ এবং সুচতুর মানসিকতায় উজ্জ্বল। ধনপতি সদাগরের সঙ্গো পায়রা নিয়ে কথাবার্তায় প্রথম পরিচয়। ধনপতির পায়রা খেলছিল। বাজপাখির ভয়ে উড়ন্ত পায়রা গিয়ে খুল্লনার আঁচলে পড়ল। ধনপতি তখন খুল্লনার কাছে পায়রা ফেরত চাইলে, খুল্লনা রসিকতা করে উত্তর দিল—

প্রাণ ভয়ে পারাবত লয়েছে শরণ।
প্রাণ দিয়া রক্ষা করি অনুগত জন।।

রসিকতার অন্তরালে রোমান্টিক হৃদয়ের আবেদন। খুল্লনার জ্যাঠতুতো বোন লহনার স্বামী ধনপতি। তবে ধনপতি একে শুধু শ্যালিকার রসিকতা হিসেবে গ্রহণ করেনি। এতে তার সুপ্ত নারী-লোলুপতা প্রশ্রয় পেয়েছিল। যখন ধনপতি খুল্লনাকে বিয়ে করে নিয়ে এল তার মধ্যে কিন্তু ভগিনীর স্বামী-হরণের জন্য কোনো অপরাধবোধ ছিল না, বরং যে নব-যৌবনের দ্বারা সে বয়স্কা সতীনের উপরে জয় সূচিত করেছে তার জন্য চাপা গর্ববোধ ছিল। নিজের সৌন্দর্যে এবং নিজের যৌবনে তার অতিরিক্ত আস্থা ছিল। সঙ্গো খুল্লনার আরও একটা

অহঙ্কার ছিল। লহনা বন্ধ্যানারী, অনেকদিন হল বিয়ে হয়েছে, কিন্তু এখনও সন্তান হয়নি—

হেদে বলি বাঁজি তুই মোরে নাহি ঘাটা।
গৌরবেতে দিব তোরে গৃহস্থের ঝাঁটা।।

খুল্লনা শুধু মধুর রোমান্টিক নয়, বাস্তববাদীও। কবি খুল্লনাকে মুগ্ধা নায়িকা রূপে চিত্রিত করেননি। খুল্লনা একান্ত বাস্তব জীবনের সঙ্গে জড়িত সৃষ্টিরূপেই প্রতিষ্ঠিত।

৫. শুঁড়িনী : ঘনরাম চক্রবর্তী, মুকুন্দরাম চক্রবর্তী, মানিকরাম গাঙ্গুলি সকল কবিই শুঁড়িনীদের কথা বলেছেন। শুঁড়িনীরা শ্রমজীবী বটে, তবে এরা সাধারণ শ্রমজীবীদের মতো নয়। এরা যে সমাজ-বহির্ভূত অস্পৃশ্য সে কথা মুকুন্দরাম চক্রবর্তী তাঁর 'চণ্ডীমঙ্গল' কাব্যে লিখেছেন। অনুরূপ সামাজিক অবস্থার বর্ণনা দিয়ে মানিকরাম গাঙ্গুলি লিখছেন—

বাস করে একত্রে বাইশ ঘর শুঁড়ি
মদ বেচ্যা সভায় অযুত গেঁটে কড়ি।

একথা থেকে মনে হয় সেকালে শুঁড়িদের অনেকেরই আর্থিক অবস্থা মোটামুটি ভালো ছিল। তবে আর্থিক অবস্থা যেমনই হোক, শুঁড়িনীদের জীবন ও সম্ভ্রমের কোনো নিরাপত্তা ছিল না। খদ্দেরকে সন্তুস্ট রাখার জন্য সকাল থেকে গভীর রাত পর্যন্ত পসরা নিয়ে শুঁড়িনীকে অপেক্ষা করতে হত। সে যুগের সমাজে শুঁড়িনীদের আত্মসম্মানবোধ থাকলেও সতীত্বের নিরাপত্তা ছিল না। ফলে তারা ছিল প্রবঞ্চক। আসলে ছল, চাতুরি, চালাকি, মিথ্যাচার ছিল শুঁড়িনীদের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য।

৬. দুর্বলা : 'চণ্ডীমঙ্গল' কাব্যে বাঙালি পরিবার জীবনের এমন ঘনিষ্ঠ ছবি আঁকা হয়েছে, যাতে তার কোনো প্রান্তই চোখের আড়ালে থাকেনি। পরিবারের 'কর্ত্রী' থেকে 'দাসী' সকলেই ক্যানভাসে জীবন্ত হয়ে উঠেছে। দুর্বলা সামান্য দাসী মাত্র। লহনা বাড়ির বড়ো বউ। তার সঙ্গেই দুর্বলার ঘনিষ্ঠতা। ধনপতি সদাগর খুল্লনাকে বিয়ে করে আনার পর লহনা ও খুল্লনার মধ্যে অহি-নকুল সম্পর্ক স্থাপন করে তাদের মধ্যমণি হয়েছে। কারণ দু'জনের মিলনে নয়, কলহেই তার সুবিধে। বিশেষ করে, ধনপতি প্রবাসে গেলে লহনা-খুল্লনা বিবাদ শুরু হলে সে লহনাকে গুপ্তবুদ্ধি দেবার জন্য লীলাবতীকে ডেকে নিয়ে এসেছে। লহনা যখন খুল্লনার ওপরে সরাসরি অত্যাচার শুরু করেছে, তখন দুর্বলা খুল্লনার কাছে এমন ভাব দেখিয়েছে যাতে মনে হয় সে তারই হিতাকাঙ্ক্ষী। সে ভালোবাসার ছলে খুল্লনাকে উপদেশ দিয়েছে—'ছাগ রক্ষা কর দিন দুই চারি।' দুর্বলা অবশ্য চতুরা দাসী। ধনপতি ফিরে আসার সঙ্গে সঙ্গে সে তার রূপ পাল্টেছে। খুল্লনার প্রতি যেন তার চিরকালীন প্রীতি এমন ভাব দেখিয়েছে। এই দুর্বলা চরিত্রের অন্য একটি দিকও দেখতে পাওয়া যায় শ্রীপতি বা শ্রীমন্তের জন্মের পরে। বাড়ির শিশুটিকে পুরনো এই দাসী হাততালি দিয়ে 'কৃষ্ণগান' গেয়ে নাচাচ্ছে। দুর্বলার বাৎসল্য রসের এই মধুর ভাবটি মুকুন্দ চক্রবর্তী সযত্নে এঁকেছেন।

৭. ধাত্রী : 'ধাত্রীর শ্রম' শ্রমজীবী নারীদের তালিকায় এক বিশেষ সংযোজন। এটি কোনো বংশগত বা জাতিগত বৃত্তি নয়। ধাত্রী বা দাইয়ের কাজ সন্তান প্রসব করানো। ধর্মমঙ্গলে মানিকরাম গাঙ্গুলি ধাত্রীর কর্তব্যকর্ম সম্পর্কে সুন্দর বর্ণনা করেছেন—

লোক দিয়া লঘুতারে নৃপতি আনিল।
প্রসব নিলয়ে ধাই প্রবেশ করিল।।
রঞ্জা কয় দাই দিদি দুঃখ পাই বড়।
বাঁচাও জীবন মোর বলি তোরে দড়।।
যদি ঘুচাতে পার প্রসব বেদনা।
প্রভাবে পরাব কানে পুরটের সোনা।।

রূপরাম চক্রবর্তী ধাত্রীকে সোম ঘোষ কর্তৃক নানা রকম ধন-সম্পদ প্রদানের কথা বলেছেন—

পুত্র হৈল সোম ঘোষ আনন্দিত মন।
ধাত্রীকে বিদায় করে দিয়া নানা ধন।।

রূপরাম চক্রবর্তীর কাব্যে যে ধাই প্রসব করায় তার নাম 'হীরা'। শ্রমজীবী মানুষের মতো সমাজের প্রান্তভাগে ধাত্রীদের বাস। সমাজের নিম্নভাগে ধাত্রীদের অবস্থান হলেও আপন সততা, নিষ্ঠা ও কর্তব্যপরায়ণতার গুণে সমাজের উঁচু-নিচু সবার কাছে তারা শ্রদ্ধার এবং সম্মানের পাত্রী।

৮. নটী : বাংলা মঙ্গলকাব্যে যে সব শ্রমজীবী নারীর পরিচয় পাওয়া যায়, নটী ও দেহ-পসারিণী তাদের মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। অন্ত্যজশ্রেণির অন্যান্য শ্রমজীবী নারীদের মতো এদেরও কোনো পুঁজি ছিল না, তেমনি ছিল না সামাজিক কোনো সম্মান। বাধ্য হয়েই তারা গ্রহণ করেছে এমন হীনবৃত্তি। সমাজে নটীদের কাজ নৃত্যগীত পরিবেশন করা। কলা-বিদ্যার অন্যতম এই নৃত্যকলা পরিবেশনের আগে পা থেকে মাথার কেশ পর্যন্ত নটীকে বিচিত্র পোশাক ও অলংকারে বিভূষিত হতে হয়। তারপর বাদ্যের তালে তাল মিলিয়ে নটী নেচে থাকে। তালভঙ্গ হলে নটীর জীবনে দুর্ভোগের অন্ত থাকে না। অপমান সীমা ছাড়িয়ে শারীরিক নির্যাতনে গিয়ে পৌঁছায়। এমনই এক দৃশ্য রূপরাম চক্রবর্তী উপস্থাপন করেছেন—

প্রভুর চরণে নটী পড়িল কান্দিয়া।
অপরাধ ক্ষেমা কর অভাগী দেখিয়া।।

নটীকে যে নেচে গেয়ে উপার্জন করে জীবিকা নির্বাহ করতে হয়, সে কথা স্পষ্টত ফুটে উঠেছে নিম্নোক্ত চরণে—

কেবা দিল অভিশাপ কোথাকার বুড়ী।
নাচ্যা গ্যায়া উপায় করিতে চল কড়ি।।

নটীদের জীবনে যে প্রেম আসে, আসলে তা ব্যর্থপ্রেম, এই প্রেম পণ্য।

৯. লখাই ডোমনী : লখাই ডোমনী কালু ডোমের স্ত্রী। কালু ডোম স্ত্রী-পুত্র পরিবার নিয়ে কুলপ্রথা মতে বাঁশের ঝুড়ি, চাঙারি বোনার কাজেই লিপ্ত ছিল। অত্যন্ত দারিদ্র্যে তাদের জীবন কাটত। লাউসেন কালু ডোমকে ময়না রাজ্যের প্রধান সেনাপতি নিযুক্ত করলেন। তার নেতৃত্বে এক বিরাট ডোমবাহিনী গড়ে উঠল। লখাই ডোমনীও খুব উঁচু পর্যায়ের বীরাঙ্গনা। বিশেষ করে, কালু ডোম যখন নেশাগ্রস্ত অবস্থায় মূর্চ্ছিত হয়ে পড়ে এবং সেই সুযোগে মহামদ ময়নারাজ্য আক্রমণ করে, তখন লখাইয়ের রণকৌশল, আবার 'জাগরণ পালা'য় তার জাত্যভিমান, বীরাঙ্গনা মূর্তি লক্ষ করার মতো। মহামদ যখন ময়না আক্রমণ করার জন্য অগ্রসর, তখন লখাই নিজের পরিচয় দিয়ে বলে—

> বীরের বণিতা আমি লখে মোর নাম।
> বুঝাব বিশেষ যদি বাধাও সংগ্রাম।।

যুদ্ধ শুরু। ময়নারাজ্যকে মহামদের হাত থেকে বাঁচাতে হবে। লখাই ডোমনীর বীরত্বপূর্ণ সংগ্রাম কবি এভাবে বর্ণনা করেছেন—

> ঠায় ঠায় ডোমনী সবারে ধরে কাটে।
> শত শত সেনার সংহারে ফলাসাটে।।
> বীর দর্পে কোপে তাপে লাফে লাফে লখে।
> ঢাল চালি সম্মুখ সমরে আইল হেঁকে।।

কালু ডোমকে যখন কিছুতেই অচৈতন্যাবস্থা থেকে জাগাতে পারল না, তখন সে একে একে নিজের দুই পুত্রকে যুদ্ধে পাঠাল। পুত্রদের মৃত্যুর পর—

> শুনি শোকে লখের নয়ানে বহে নীর।
> রাজার বিপত্তি ভাবি মন করে স্থির।।

লখাই ডোমনী শুধু বীরত্বে নয়, মাতার স্নেহে, পতিভক্তিতে এবং পালক রাজার প্রতি আনুগত্যে এক অসাধারণ রমণী।

১০. কলিঙ্গা : কলিঙ্গা মূলত বীরাঙ্গনা নয়। লাউসেনের পাটরানি। কিন্তু যুদ্ধ-বিদ্যায় তার আসাধারণ দক্ষতা ছিল। সকলে কানড়াকেই বীরাঙ্গনা বলে জানত, কলিঙ্গাকে নয়। কিন্তু লাউসেনের অনুপস্থিতিতে মহামদ যখন ময়নাগড় আক্রমণ করল, তখন কলিঙ্গা পাটরানি হিসেবে নিজেই প্রথম যুদ্ধে যাত্রা করল। সে বেঁচে থাকতে কানড়াকে বিপদের মুখে পাঠাবে না। রাজার রানি যুদ্ধবিদ্যায় পারদর্শিনী হলেও, রাজ্যের পাটরানি হিসেবে কলিঙ্গা অনায়াসে যুদ্ধযাত্রার জন্য রাজি হয়ে গেল, কলিঙ্গা যুদ্ধে নৈপুণ্য দেখাল, শত্রুবাহিনীকে প্রথম পর্যুদস্ত করল। কিন্তু শেষপর্যন্ত মহামদের সৈন্যরা তাকে ঘিরে ফেলল। শত্রুদের হাতে নির্লজ্জ বন্দি হওয়ার কলঙ্কময় অধ্যায় রচিত হওয়ার আগেই কলিঙ্গা আত্মহত্যা করল।

১১. কানড়া : কানড়া রণরঙ্গিণী দুঃসাহসী রাজকন্যা। তিনি পিতার প্রতি আনুগত্য প্রকাশ

করলেও বিবাহের ব্যাপারে সম্পূর্ণ স্বাধীনচেতা। তিনি মনে মনে লাউসেনকে স্বামী হিসেবে বরণ করে রেখেছিলেন। কিন্তু বৃদ্ধ গৌড়নৃপতি তাঁকে বিয়ের প্রস্তাব পাঠাল। কানড়া প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করে শর্ত দিলেন আশি মন ওজনের লোহার গণ্ডার যে বীর এক কোপে কাটতে সক্ষম হবে, তাঁর গলায় তিনি মালা দেবেন। তখন গৌড় নৃপতির নির্দেশে তাঁর সামন্ত লাউসেন এসে এক কোপে লোহার গণ্ডার কেটে ফেললে কানড়া গৌড় নৃপতির নিজের কৃতিত্ব বলে একে মেনে নিলেন না। তখন গৌড় নৃপতি কানড়ার পিতৃরাজ্য আক্রমণ করলেন। কানড়া যুদ্ধে গৌড় নৃপতিকে পরাজিত করে তাঁর দৈহিক ক্ষমতা, মানসিক দৃঢ়তা ও সুকঠিন ব্যক্তিত্বের পরিচয় দিলেন।

একইসঙ্গে কানড়া বীর লাউসেনের প্রতি তাঁর প্রণয় ও আনুগত্য ব্যক্ত করলেন। জানালেন, লাউসেনকেই তিনি চিরকালের জন্য হৃদয় সমর্পণ করে বসে আছেন। কিন্তু লাউসেন রাজানুগত্যে কানড়ার আবেদন প্রত্যাখ্যান করলেন। শর্ত দিয়ে জানালেন, কানড়া তাঁকে যুদ্ধে পরাস্ত করতে পারলে তবেই তাঁকে বিবাহ করতে সম্মত হবেন। উত্তরে কানড়া বললেন—

মরিলে তোমার হাতে পাব যে বিধাতা।
হানিলে তোমার শির হবে সমমৃতা।।

কানড়ার এই কথার মধ্যে একইসঙ্গে প্রকাশ পেয়েছে তাঁর বীরত্ব, আত্মসম্মানবোধ এবং প্রেমের গাঢ়ত্ব।

১২. নয়ানী : জামতিনগর নারীপ্রধান স্থান। এখানে গৃহস্থ বধূরাও মনের মতো পুরুষ খোঁজে। আর এই 'জামতি পালা'র বিশিষ্ট নারী চরিত্র নয়ানী। অর্থ, সম্পদ নয়, সুস্থ সুঠাম দেহী যুবককে (লাউসেন) নয়ানী তার অবদমিত যৌনক্ষুধা নিবৃত্তির কারণেই চেয়েছে। কিন্তু তার যাত্রাপথের প্রতিবন্ধক তারই শিশুপুত্র। শিশু স্বভাবতই মায়ের কোলে থাকতে চায়। লাউসেন নয়ানীর কোনো প্রলোভনেই সাড়া দিলেন না। নিদারুণভাবে ব্যর্থ হল নয়ানী। প্রণয় ব্যর্থতা অপেক্ষা যৌন চাহিদার ব্যর্থতা মারাত্মক। নয়ানী ছেলেকে কুয়োর মধ্যে ফেলে, লাউসেনের বিরুদ্ধে শিশুহত্যা এবং চরিত্র নষ্টের অভিযোগে রাজ দরবারে তুলল। আবার সুযোগ বুঝে বন্দি লাউসেনকে বোঝাবার চেষ্টা করল, তার প্রস্তাবে সম্মত হলে ছাড়াও পেয়ে যাবেন। ধর্মের দয়ায় নয়ানীর হাত থেকে উদ্ধার পেয়ে লাউসেন বলেন—

ও জানি কালান্ত বটে লাজ ভয় খেয়ে।
কি রূপ গড়েছে বিধি এ দেশের মেয়ে।।

নয়ানী মনের খোরাক হিসেবে নয়, দেহের খোরাক রূপে লাউসেনকে চেয়েছিল।

১৩. সুরিক্ষা : গোলাহাট রাজ্যটি আসলে একটি বড়ো বেশ্যাপল্লী। এখানে প্রধান রমণী সুরিক্ষা। তার এক পরিচারিকা গুরিক্ষা। বাজারে পানের পসরা নিয়ে বসা এবং তার জন্য শিকার সংগ্রহ তার প্রধান কাজ। সুরিক্ষা শুধু রূপে, যৌবনে নয়, বুদ্ধিতে, বিদ্যায়, চাতুর্যে এবং বহুবিধ কলায় নিপুণা রমণী। সে বহু পুরুষকে বশ করে নিজের অধীন করে রেখেছে

(কবির ভাষায় ছকুড়ি নাগর)। তার বেতনভুক কোনো চাকর নেই, তার রূপ-যৌবনে মত্ত হয়ে বহু পুরুষ বশীভূত হয়ে স্বেচ্ছায় সুরিক্ষার দাসে পরিণত হয়েছে। এরা প্রয়োজনে তার রক্ষীবাহিনীর কাজ করে এবং সর্বদা সর্ববিধ গৃহকর্ম করে। আর তাদের ওপর সুরিক্ষার সম্পূর্ণ কর্তৃত্ব। সাধারণ পুরুষ-শাসিত সমাজে পুরুষেরই প্রাধান্য থাকে। এখানে উল্টো, সুরিক্ষার প্রাধান্য। লাউসেনের অসাধারণ সৌন্দর্য সুরিক্ষাকে মুগ্ধ করেছিল। তার ওপর পরিচারিকা গুরিক্ষা যখন জানায়, লাউসেন নারীর প্রলোভনে ভোলবার পাত্র নয়, তখন সুরিক্ষা লাউসেনকে জয় করাটাকে একটা চ্যালেঞ্জ হিসাবে গ্রহণ করল। লাউসেন একটা কপর্দককে যেভাবে স্বর্ণমুদ্রায় পরিণত করেছিল, তাতে লাউসেনকে 'যাদুকর' মনে হয়েছিল সুরিক্ষার। আর ভেবেছিল একে অধীন করতে পারলে অর্থ-সম্পদের অভাব হবে না। তাই সুরিক্ষা বশীভূত করতে চাইল লাউসেনকে। লাউসেনের সঙ্গে হেঁয়ালি (বুদ্ধির) প্রতিযোগিতায় অবতীর্ণ হল সুরিক্ষা। বুদ্ধিমতী হলেও শেষ পর্যন্ত সুরিক্ষা পরাজিত হল। পাপের ফলস্বরূপ তার নাক-কান কাটা গেল। সুরিক্ষা শুধু কামের প্রতীক নয়, তার মধ্যে নানাবিধ মানবিক গুণও সঞ্চারিত হয়েছে।

১৪. ধুমসী : আক্ষরিক অর্থে ধুমসী দাসী নয়। সে কোনোদিন কানড়ার দৈহিক সেবা করেনি, তার মানসিক সেবায় জীবন উৎসর্গ করেছে। কানড়ার এই খাসদাসী কানড়াকে সমস্ত খবর জোগাড় করে দেয় এবং কানড়ার ইচ্ছামতো কাজ করে। বিফলকাম ও অপমানিত গৌড় নৃপতি ময়নাগড় আক্রমণ করলে, ধুমসী তা প্রতিহত করার জন্য মরণপণ সংগ্রাম করেছে। সে রণক্ষেত্রে প্রবেশের পূর্বে অদ্ভুত রণসাজে ভীম মূর্তি ধারণ করেছে। তার আকৃতি-প্রকৃতির মধ্যে ভীষণতা প্রকাশ পেয়েছে। নিজেকে রক্ষা করার উপকরণ ও শত্রুপক্ষকে আঘাত হানার অস্ত্র-শস্ত্র ধারণ করেছে—

ধুমসী দাসীকে রাখিবে নিজ করি।
ধরে সংহারিণী মূর্তি সংহারিতে অরি।।

লাউসেনের ময়নাগড়ে অনুপস্থিতির সুযোগে গৌড়ের সেনাপতি ময়না রাজ্য আক্রমণ করলে, সে সময়ও যুদ্ধক্ষেত্রে ধুমসীর ভীষণ মূর্তির পরিচয় মেলে—

ধাইল ধুমসী দাসী যেন মত্ত গজ।
বচন বলিতে পাইল বাহির দলজ।।

ধুমসী প্রকৃত বীরাঙ্গানার মতো যুদ্ধক্ষেত্রে প্রবেশ করেছে এবং প্রতিপক্ষকে ভীমনাদে আহ্বান করে তাদের মধ্যে ভীতির সঞ্চার করেছে—

ধুমসী উড়িল রণে ত্রাস লাগে ত্রিভুবনে
পতঙ্গ পর্বত কাঁপে ডরে।

ধুমসীর উদ্দাম ব্যক্তিত্বের সার্থক আস্ফালন, তার দৈহিক শক্তিকে অনেক গুণ বাড়িয়ে দিয়ে তাকে স্মরণীয় বীরাঙ্গানার মর্যাদা দিয়েছে।

১৫. ঈশ্বরী পাটনী : প্রথমেই বলে রাখা দরকার যে অন্নদামঙ্গালের ঈশ্বরী পাটনীর

লিঙ্গাপরিচয় নিয়ে পণ্ডিতমহলে বিতর্ক আছে। মনসামঙ্গালে দেবী চণ্ডীকে নদী পারাপারের মাঝি হিসেবে পাওয়া যায়। অন্ত্যজ বত্বর্গের নারীরা এমন দৈহিক কাজে পটু ছিল। অন্যদিকে আপন সন্তানের প্রতি যে স্বভাব-বাৎসল্য প্রকাশ পেয়েছে ঈশ্বরীর চরিত্রে, তা আমাদের কাছে নারীসুলভ বলে মনে হয়েছে। তাই নারী চরিত্রের আলোচনায় এই শ্রমজীবী নারীকে আমরা ঠাঁই দিয়েছি। ঈশ্বরী চরিত্রটি একান্ত বাস্তব। তার মধ্যে বাংলার নিম্নশ্রেণির এক শ্রমজীবী নারীর চরিত্র জীবন্ত হয়ে উঠেছে। কোথাও কোনোরূপ কল্পনা বা আতিশয্যের বর্ণপাত ঘটেনি। সে তার কাজ জানে, তার রীতিনীতিও জানে। একা কুলবধূ অন্নপূর্ণাকে দেখে সে তার পরিচয় জানতে চাইল, কারণ পরিচয় না জেনে তাকে নদী পার করলে পাছে দোষের ভাগী হতে হয়! এইটুকু পেশাগত সর্তকতা থাকলেও সে সরল এক মাঝি। অন্নপূর্ণা যখন চাতুর্যের সঙ্গো দ্ব্যর্থবোধক ভাষায় নিজের পরিচয় দিলেন, তার ভিতরে লুকোনো নিগূঢ় অর্থটি বুঝে ওঠা নিরক্ষর ঈশ্বরীর পক্ষে সম্ভব হয়নি। সে সহজ বুদ্ধিতে, সহজ অর্থ করে নিয়েছে—"যেখানে কুলীন জাতি সেখানে কোন্দল।" কুলীনদের ঘরের কোনো বধূ হয়ত সংসারের কলহ, যন্ত্রণা সহ্য করতে না পেরে অন্যত্র যাচ্ছেন। ঈশ্বরী তাঁকে নৌকায় বসতে বলল। সতর্ক মাঝি যাত্রীকে সাবধান করে বলেছে নৌকার বাইরে পা ঝুলিয়ে না রাখতে, নদীর কুমির এসে টেনে নিয়ে যেতে পারে। অন্নপূর্ণা নৌকার গলুইয়ে কোথায় পা রাখবেন? ভিতরের জলে তাঁর পায়ের আলতা ধুয়ে যাবে একথা বললে মাঝি জবাব দিল, তিনি যেন কাঠের সেঁউতির ওপর পা রাখেন। কাঠের সেঁউতি দেবীর পায়ের স্পর্শে সোনা হয়ে যাওয়ায় ঈশ্বরী চমকে ওঠে। সে বলে ফেলে—

সোনার সেঁউতি দেখি পাটনীর ভয়।
এ মেয়ে তো মেয়ে নয় দেবতা নিশ্চয়।।

নদীর ওপারে গিয়ে অন্নপূর্ণা চলতে লাগলেন। ভয়ে-ভক্তিতে বিমূঢ় মাঝি সেঁউতি হাতে নিয়ে পেছনে পেছনে চলল। গরীব মাঝি ঈশ্বরী সেই সেঁউতি পেয়েও বেমালুম আত্মসাতের চেষ্টা করল না, এতেই তার স্বভাবের অন্তর্লীন সততার প্রমাণ পাওয়া যায়। সে এই রমণীর সত্য পরিচয় জানার জন্য ব্যাকুল হয়ে উঠল। এই সবকিছু মিলে ঈশ্বরী পাটনী সহজ, সরল, বিশ্বাসযোগ্য—

সভয়ে পাটুনী কহে চক্ষে বহে জল।
দিয়াছ যে পরিচয় সে বুঝিনু ছল।।
হের দেখ সেঁউতিতে থুয়েছিলা পদ।
কাঠের সেঁউতি মোর হৈলা অষ্টাপদ।।
ইহাতে বুঝিনু তুমি দেবতা নিশ্চয়।
দয়ায় দিয়াছ দেখা দেহ পরিচয়।।

অবশেষে দেবী পরিচয় দিলেন এবং ঈশ্বরী পাটনীকে বর দিতে চাইলেন। ঈশ্বরী বিরাট রাজ্য, প্রচুর সম্পত্তি চাইতে পারত, অথবা মোক্ষ-মুক্তি চাইতে পারত। সে ভোগীর মতো

ধন-সম্পদ চাইল না, সাধকের মতো মুক্তি চাইল না, এক সাধারণ গরীব জননীর মতো চাইল—

প্রণমিয়া পাটুনী কহিছে জোড় হাতে।
আমার সন্তান যেন থাকে দুধে ভাতে।।

দেবী ঈশ্বরীর সন্তানের 'দুধে ভাতে' থাকার প্রতিশ্রুতি দিয়ে অদৃশ্য হলেন। একান্ত সাধারণ এই প্রার্থনার দ্বারাই ঈশ্বরী পাটনী অসাধারণত্ব এবং অমরত্ব লাভ করেছে।

১৬. হীরা মালিনী : 'বিদ্যাসুন্দর' কাব্যের একটি প্রধান চরিত্র হীরা মালিনী। সে ফুল বিক্রি করে যা আয় করে, তা তার নিজের ভরণ পোষণে ব্যয় করে। কিন্তু ভবিষ্যতের জন্য তার অর্থ সঞ্চয়ের প্রগাঢ় ঝোঁক দেখা গেছে এবং অর্থাগমের অনুকূল পরিবেশ পেলেই, সে অর্থ উপার্জনের জন্য তৎপর হয়েছে। ফলে শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত তার চরিত্রের গতিপথ প্রায় একই রকম থেকেছে। স্বামীহীনা, নিঃসন্তান, নিঃসম্বল হীরা রাজবাড়িতে ও বিভিন্ন বাড়িতে ফুল বিক্রি করে তার জীবিকা নির্বাহ করে। নিঃসঙ্গ জীবনের জন্য তার কোনো ক্ষোভ নেই। বৈধব্য যন্ত্রণা ও সন্তানহীনতা তাকে একটুও স্পর্শ করতে পারেনি। কিন্তু রাজপুত্র সুন্দরকে দেখে তার বিগত যৌবনের স্মৃতি বিজড়িত দিনগুলোর কথা মনে পড়ে। সে এক সুখ-নেশার উদ্দামতায় সুন্দরকে পরম আদরে তার গৃহে স্থান দিয়েছে—

কথায় হীরার ধার হীরা তার নাম।
দাঁত ছোলা মাজা দোলা হাস্য অবিরাম।।...
চূড়াবান্ধা চুল পরিধান সাদা শাড়ী।
ফুলের চুপড়ী কাঁখে ফিরে বাড়ী বাড়ী।।...
মন্দ মন্দ গতি ঘন ঘন হাত নাড়া।
তুলিতে বৈকালে ফুল আইল সে পাড়া।।

সুন্দর হীরার উদ্দেশ্য বুঝতে পেরে তাকে 'মাসী' সম্বোধনে তার আশার আগুনে জল ঢেলে দেয়। পরে তার গোপন মনের বিকৃত আশা পুত্রস্নেহে রূপান্তরিত হয়ে তাকে ভিন্ন এক চেতনার জগতে উন্নীত করেছে। ফলে তার চরিত্রে বৈচিত্র্যের সৃষ্টি হয়েছে। বেসাতির জন্য বারোটি টাকা পেয়ে তার মধ্যে এক নতুন আশা জন্ম নিয়েছে। সে ভবিষ্যতের জন্য টাকা সঞ্চয়ের তৎপরতা দেখিয়েছে। এখন অর্থবান রাজপুত্র সুন্দরকে হাতের মুঠোয় পেয়ে 'আরও চাই.... আরও চাই' মনোভাবের সৃষ্টি হয়েছে। রাজকুমারী বিদ্যাও তার হাতে। সে এখন বিদ্যার তারিণী। সে বিদ্যার প্রেমসাগরে ঝড় তুলে দিয়ে নিজেই তার জীবন-তরীর মাঝির ভূমিকায় অবতীর্ণ। একদিকে টাকার প্রতি মোহ, অপরদিকে বিদ্যার প্রতি স্নেহ। এই সঙ্গে অর্থলোলুপতা, নীতিভ্রষ্টতা, ভয়-বিহ্বলতা, চিত্ত-ব্যাকুলতা তার চরিত্রে এক বৈচিত্র্য এনেছে। হীরা কালের স্রোতে আবেগ তাড়িত হয়ে প্রতি পদক্ষেপে পোষাক পরিবর্তন করেছে। সে জীবনের রঙ্গমঞ্চে অবতীর্ণ হয়ে সার্থক নায়িকার অভিনয়ে কৃতকার্য হয়েছে। সে সুন্দরের কাছে দাসী থেকে মাসী, বিদ্যার কাছে মালিনী থেকে তারিণী, সমাজের কাছে

সদাচারিণী থেকে বাদাচারিণী এবং রাজার কাছে কৃতজ্ঞ থেকে কৃতঘ্ন হয়েছে। দরিদ্র ঘরের নারীদের ঘরে-বাইরে, হাটে-বাজারে, মাঠে-ঘাটে, ক্ষেতে-খামারে কাজ করতে হত জীবিকার কারণে, স্বামীর সাহায্যকারী হিসেবে। সেজন্য সমাজে কোনো নিন্দা হত না, বরং না গেলেই নিন্দার কারণ ছিল। স্বামী কর্তৃক, সমাজ কর্তৃক পরিত্যক্ত হওয়ার সম্ভাবনা ছিল। ঈশ্বরীর সকাল থেকে সন্ধ্যা এমনকি গভীর রাত পর্যন্ত খেয়াঘাটে অবস্থান নিয়ে সমাজে কোনো নিন্দা ছিল না। সুরিক্ষার গোলাহাট রাজ্য পরিচালনা এবং লখাই ডোমনীর যুদ্ধে গমন-দৃশ্য দেখে বলা যেতে পারে, সেকালে নারীরা শুধু গৃহধর্মই পালন করেননি, তাঁরা দেশ শাসনের মতো গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালনেরও যোগ্যা ছিলেন। কলিঙ্গা, কানড়া, ধুমসীর সাহস ও বীরত্বের কথা মধ্যযুগের মঙ্গালকাব্যগুলোকে আধুনিক নারীভাবনার কাছাকাছি এনে দিয়েছে।

তবে এটাও ঠিক, মধ্যযুগের সমাজ ব্যবস্থায় নারীদের কোনো নিশ্চিন্ত জীবন ও নিরাপদ আশ্রয় গড়ে ওঠেনি— কী স্বামীগৃহে, কী সমাজে। পুরুষ-শাসিত সমাজে তাদের চিরকালই মানসিক যন্ত্রণার শিকার হতে হয়েছে বিভিন্নভাবে। তা সত্ত্বেও তারা তাদের প্রাণপ্রাচুর্য ও স্বতন্ত্রতা নিয়ে ‘মঙ্গালকাব্য’ ধারায় শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে অস্তিত্বের পরিচয় টিকিয়ে রেখেছে। শৌর্যে-বীর্যে, কঠিনে-কোমলে, সুখে-দুঃখে, প্রেমে-প্রতিবাদে সেকালের নারীরা অনন্যা।

অন্ত্যজ মানুষের পরিবার-বৃত্ত : মঙ্গালকাব্যের দর্পণে

গার্গী বন্দ্যোপাধ্যায়

মানবসভ্যতা গড়ে ওঠার আদিলগ্নে আদিম মুক্ত জীবনের অনিশ্চয়তা থেকে আত্মরক্ষার তাগিদে মানুষের ঐক্যবদ্ধ হওয়া এবং সেই সূত্রেই নর-নারীর পারিবারিক বৃত্তবন্ধন। ছোটো ছোটো এই পরিবারগুলির জীবনধারণের স্বাভাবিক প্রয়োজনে সৃষ্ট নানাবিধ পারিবারিক অনুশাসনাদির সন্নিবেশেই ক্রমশ তৈরি হয় সমাজকাঠামো। ফলত সমাজ ও পরিবার পরস্পরের পরিবপূরক। বৃহত্তর সমাজরীতির অনিবার্য প্রভাব থেকে সেই সমাজের বুকে স্থাপিত পরিবারগুলি কখনওই নিজেদের বিচ্ছিন্ন রাখতে পারে না। তাই সমাজনীতির বা সমাজতত্ত্বের বা সমাজচিত্রের সামগ্রিক পরিচয় দিতে গেলে পারিবারিক জীবনচর্যার প্রসঙ্গা চলেই আসে। এভাবে আদিম লগ্ন থেকে শুরু করে সমাজ পরিবারে বিবর্তন-পরিবর্তনের পথরেখা ধরেই ক্রমশ আধুনিক-আধুনিকোত্তর সমাজ পরিবারের জন্ম। আজকের সমাজ পরিবারের উন্নত পাটাতনে দাঁড়িয়ে কালপ্রবাহের চপলতায় চাপা পড়ে যাওয়া প্রাগাধুনিক যুগের বাংলা সাহিত্যে চিত্রিত বহুবিচিত্র পরিবারগুলিকে মনে হয় যেন আধুনিক সভ্যতার এক একটি জীবাশ্ম। বলাবাহুল্য, এগুলির মধ্যে রাজপরিবার, বণিক পরিবার, সাধারণ বাঙালি পরিবার, অন্ত্যজ পরিবার ইত্যাদি পরিবারগুলি তৎকালীন সমাজ-অর্থনীতির এক একটি জীবন্ত দলিল। সংক্ষিপ্ত পরিসরে আলোচনা সীমিত রাখতে আলোচ্য বিষয় হিসাবে চণ্ডীমঙ্গাল ও ধর্মমঙ্গালের অন্ত্যজ সমাজভুক্ত ব্যাধ ও ডোম— এই দুটি অন্ত্যজ পরিবারকে বেছে নেওয়া যেতে পারে।

ত্রয়োদশ শতাব্দীতে তুর্কি আক্রমণের পর যখন বহিরাগত শত্রুর হাতে বর্ণবিভক্ত হিন্দুসমাজে উচ্চবর্ণের একচ্ছত্র কর্তৃত্ব ভেঙে পড়ে, ব্রাহ্মণ্যবাদের বিষদাঁত যখন ভেঙে যায়, তখন ক্ষমতাহারা শক্তিহীন বর্ণহিন্দু সম্প্রদায় তাদের হৃত ক্ষমতা পুনরুদ্ধারের জন্য নড়ে চড়ে বসে এবং কৌশল প্রয়োগে তৎপর হয়। তারা এতদিনের উপেক্ষিত নিম্নসম্প্রদায়কে পাশে তুলে এনে এক বৃহত্তর সামাজিক প্রতিরোধ গড়ে তোলার তাগিদ অনুভব করে। কিন্তু এতকালের বঞ্চনার জ্বালায় জর্জরিত অন্ত্যজ সমাজ যে আজ ব্রাহ্মণ-স্বার্থসিদ্ধির আহ্বানে সাড়া দেবে না, তা তারা জানত। ফলে সাহিত্য-সংস্কৃতিকে অবলম্বন করে দুটি পৃথক ধারায় তারা তাদের সেই কৌশলকে প্রয়োগ করে। সৃষ্টি হয় অনুবাদসাহিত্যের ধারা ও মঙ্গালসাহিত্যের ধারা। প্রথম ক্ষেত্রে দুরূহ সংস্কৃত ভাষায় লেখা

রামায়ণ-মহাভারত-পুরাণের সহজ সরল বঙ্গানুবাদের মাধ্যমে সমাজের নিম্নতর শ্রেণির কাছে উচ্চবর্ণশাসিত ভারতবর্ষের মহৎ আদর্শ ও মাহাত্ম্যের কথা দৃষ্টান্তসহ তুলে ধরা হয়। আর দ্বিতীয় ক্ষেত্রে দুভাবে নিম্নসম্প্রদায়ের মন-জয়ের প্রয়াস করা হয়। প্রথমত, দেবনির্ভরতার যুগে ব্রাহ্মণ্যশাসিত সমাজ কর্তৃক এতদিনের উপেক্ষিত অনার্য দেব-দেবীদের পৌরাণিক দেবতাদের সঙ্গে কোনো-না-কোনো সম্পর্কের সূত্রে আবদ্ধ করে সমাজের উচ্চস্তরে তুলে আনা। আর দ্বিতীয়ত, নিম্নসম্প্রদায়ের মানুষকে সাহিত্যে গুরুত্বপূর্ণ স্থান দিয়ে সমাজের মূলস্রোতে ফিরিয়ে আনা। সমগ্র প্রাগাধুনিক বাংলা সাহিত্যের মধ্যে কেবলমাত্র মঙ্গলকাব্যেই ইতরশ্রেণির মানুষ ও তাদের পরিবার এভাবে স্থান পেয়েছে। অবশ্য বর্ণবিভাজিত সমাজে দৈবনির্ভরতার বাতাবরণের মধ্যে দাঁড়িয়ে যুগের প্রয়োজনে তথা পরিস্থিতির দাবিতে এহেন দুঃসাহসিক ও প্রথালঙ্ঘনকারী কৌশল অবলম্বন করতে গিয়ে কবিদের কাব্যের শুরুতেই স্বপ্নাদেশ বা দৈবাদেশের সাহায্যে দোষ খণ্ডনের চেষ্টা করতে হয়েছে। সেই সূত্রে উঠে এসেছে ব্যাধ কালকেতু-ফুল্লরার অথবা ডোম কালু-লখাইয়ের পরিবারচিত্র —একেবারে উঠোন থেকে অন্দরমহল হয়ে হেঁসেল পর্যন্ত।

এইভাবে মঙ্গলকাব্যের আখ্যানভাগে প্রধান-অপ্রধান নির্বিশেষে যে পরিবার-পরিচিতি তুলে ধরা হয়েছে, তার সূত্র ধরে কাব্যে চিত্রিত পরিবারগুলিকে কেন্দ্র করে বিভিন্ন শ্রেণির মানুষের প্রাত্যহিক জীবনচর্যা, সামাজিক অবস্থান ও সেই সামাজিক অবস্থানের বিবর্তন-পরিবর্তন সূচিত হয়েছে।

চণ্ডীমঙ্গলকাব্যে ব্যাধ ধর্মকেতুর পরিবার তার একমাত্র পুত্র কালকেতুর বধূ হয়ে আসে সঞ্জয়কেতু-কন্যা ফুল্লরা। দারিদ্র্যদীর্ণ সংসারে সদস্য বৃদ্ধিতে চিন্তান্বিত ধর্মকেতুকে বলতে শোনা যায়—

দুঃখিত করিল হরি তিনজন পুষিতে নারি
কেমতে পুষিব চারিজন।।

(মঙ্গলচণ্ডীর গীত : দ্বিজমাধব)

দ্বিজরাম দেবের ‘অভয়ামঙ্গল’-এ দেখা যায়, পরিবার প্রতিপালনের জন্য অর্থোপার্জনের তাগিদে পূর্ণ গর্ভাবস্থাতেও ডান হাতে ডালা ও মাথায় পসরা নিয়ে মাংস ফেরি করতে যেতে হয় ধর্মকেতু-পত্নী নিদয়াকে, যার ফলস্বরূপ পথমধ্যেই কালকেতুর জন্ম দেয় সে। বিবাহের পর ওই একই গুরুদায়িত্ব বর্তায় বধূ ফুল্লরার ওপর। ঝড়-বৃষ্টি-রৌদ্রদাহকে অতি কষ্টে সহ্য করতে করতে মাথায় মাংসের পসরা নিয়ে অবসন্ন দেহে গোলাহাটে মাংস বিক্রি করতে যেতে হয় তাকে। তারপর সেই অর্থে শাশুড়ির নির্দেশ মতো বাজার-হাট সেরে বাড়ি ফিরে এসে শুরু হয় তার বিবিধ ব্যঞ্জন প্রস্তুতের পর্ব। একদিন স্বামীকে খালি হাতে শিকার থেকে ফিরতে দেখে, ফুল্লরা যখন বোঝে যে সেদিন তাদের কপালে অন্নের সংস্থান নেই, তখন আপন ভাগ্যকে দোষারোপ করে সে বলে—

দারুণ দৈবের গতি বিফল আমার পতি
পড়িল সম্বল-চিন্তা-ফান্দে।।

অন্ন বস্ত্র নাহি ঘরে বিভা দিল হেন বরে
কর্ণবেধ জাতির বেভারে।

(কবিকঙ্কণ চণ্ডী)

দিন আনা দিন খাওয়া পরিবারে উপার্জনকারী পুরুষও নিজের ব্যর্থতার দিকে তাকিয়ে আক্ষেপ করে বলে ওঠে—

তৈল লবণের কড়ি ধারি ছয় বুড়ি।
শ্বশুর ঘরের ধান্য ধারি দুই আড়ি।
পড়স্যা ঘরের আষ্ট পণ ধারি ঋণ।
শর ধনু বান্ধা লইতে আইসে অনুদিন।।
কিরাত পাড়ায় বসি না মিলে উধার।
হেন বন্ধুজন নাহি যেবা সহে ভার।।

(কবিকঙ্কণ চণ্ডী)

ফলে 'বিষম সম্বল চিন্তা'য় কাতর কালকেতু 'এক চক্ষে নিদ্রা যায় আর চক্ষে জাগে'। শেষপর্যন্ত ফুল্লরাকে তার সখী বিমলার মা'র কাছে থেকে 'দু-কাঠা খুদ' ধার চাইতে হয়। এমনকি, দ্বিজ রামদেবের 'অভয়ামঙ্গাল' কাব্যে দেখা যায়, গোধিকা কাটার মতো বঁটিও তাদের নেই। তাই যে সখীর কাছে ইতিমধ্যেই পঞ্চ বুড়ি কড়ি ধার নিয়ে শোধ দিতে পারেনি, সেই সখীর কাছেই বঁটি ধার চাইতে গিয়ে তার বিরক্তির শিকার হয়। এই ব্যাধ পরিবারের দারিদ্র্য দুর্দশার কথা বিস্তারিতভাবে পাওয়া যায় ফুল্লরার বারমাস্যায়। পাতার ছাওনি আর ভেরেণ্ডার থাম সম্বলিত তাদের কুঁড়েঘর প্রথম বৈশাখের ঝড়েই ভেঙে পড়ে। মানের পাতা মাথায় দিয়ে বর্ষার জল নিবারণ করতে হয়। ফুল্লরার 'শিরে দিতে নাহি আঁটে অঙ্গের বসন।' কার্তিক মাসে হরিণের ছড় পরে অথবা পুরানো দোপাটা গায়ে দিয়ে শীত নিবারণ করতে হয়। পৌষ মাসে তাদের সম্বল কেবল 'তুলিপুরী পাছড়ি' অথবা পুরানো খোষলা। মাঘ মাসের প্রচণ্ড শীতে তাকে 'খইয়া' পেতে শুতে হয়। আহার্যের ক্ষেত্রেও অন্নের অভাবে তারা 'বেঙচির ফল খায়্যা করি উপবাস।' যেদিন মাংসের বদলে কিছু খুদ পায়, সেদিনও সেটুকু খুদ-কুঁড়া খেয়ে 'উদর না পুরে'। শিকার না জুটলে কচুশাক খেয়ে কোনোক্রমে ক্ষুন্নিবৃত্তি করতে হয়। কখনও বা তাদের আমানি খাবার একমাত্র পাত্র 'মাটিয়া পাথরা' বন্ধক রেখে কিছু চাল জোগাড় করতে হয় এবং পাত্রের অভাবে মাটিতে গর্ত খুঁড়ে তাতে আমানি ঢেলে খেতে হয়। ফুল্লরার দেওয়া এই দুঃখ বর্ণনায় ছদ্মবেশিনী দেবী চণ্ডীকে সতীন আশঙ্কায় বিতাড়নের উদ্দেশ্যে কিছুটা নারীসুলভ কৌশলী অতিরঞ্জন থাকলেও অভিজাত সমাজ কর্তৃক পরিত্যক্ত অন্ত্যজ পরিবারের অন্ন-বস্ত্র-বাসস্থান সংক্রান্ত এই দীনতা তৎকালীন সমাজ-প্রেক্ষিতে যে অনেকাংশেই সত্য, সে কথা বলাই বাহুল্য।

অনুরূপ দারিদ্র্যচিত্র ফুটিয়ে তোলা হয়েছে ধর্মমঙ্গাল কাব্যের ডোম পরিবারের বর্ণনাতেও। এখানেও পারিবারিক অভাব পূরণের প্রয়াসে নারী-পুরুষ উভয়েই অর্থোপার্জনে তৎপর হয়। কালু ডোম-পত্নী লখাই কুলা চেটা ধুচনি বেঁধে তা হাটে বিক্রি করে। রূপরাম চক্রবর্তীর বর্ণনায়—

কুলা চেটা ধুচুনি ডুমনি বসি বান্ধে। শাখা সুখা দুটি পুত্র অন্নহেতু কান্দে।।
মউরা মলিনমুখী বনে তাল পাত। হাটে নিঞা বেচিলে বৈকালে জোড়ে ভাত।।

তাদের কুঁড়ে ঘরে 'তালপত্রের ছাওনি।' তাদের পরিধানে 'ছিঁড়া কানি'। আর তাদের আহার্য লবণবর্জিত লাউশাক সেদ্ধ-র মতো ইতর খাদ্য। পরিবারের সদস্যদের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক ছিল অম্ল-মধুর। সম্ভ্রান্ত সমাজের তুলনায় অন্ত্যজ সমাজে পরিবার প্রতিপালনে নারী-পুরুষের সমান ভূমিকা থাকায় এবং অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে তারা পরস্পরের পরিপূরক হওয়ায় পরিবারে তাদের প্রায় সমকর্তৃত্ব চোখে পড়ে। তাই একদিকে যেমন নারী ঘরে সতীন নিয়ে আসার সন্দেহে দৃঢ়ভাবে স্বামীর কাছে কৈফিয়ৎ চায়—

পিঁপড়ার পাখা উঠে মরিবার তরে।
কাহার যোড়শ্যা কন্যা আনিয়াছ ঘরে।।

অথবা নেশায় মত্ত নিষ্ক্রিয় স্বামীকে বজ্র চাপড়ে কম্পিত করে তোলে, তেমনি পুরুষশাসিত সমাজে 'দণ্ডে রাজা বনিতার পতি।' ফলে সে স্ত্রীর 'দোষ দেখি নাক কাটে'। অপরদিকে শত অভাবেও পরিবারের সদস্যদের মধ্যে আত্মার আত্মীয়তা অক্ষত থাকে। তাই বধূ সযত্নে স্বামী-শ্বশুর-শাশুড়ি সকলের জন্য রন্ধন করে সসম্ভ্রমে সবাইকে খাইয়ে শেষে নিজে খেতে বসে। স্বামীও পরম তৃপ্তি ভরে সেই আহার করে এবং রান্নার প্রশংসা করে বলে—

প্রিয়া নিত্য করাঅ যদি এমন ভোজন।
বাম হস্তে ধরিতে পারি পড়িতে গগন।।(দ্বিজরাম দেব : অভয়ামঙ্গাল)

ব্যাধপরিবারে বাবা-মা পুত্রবধূর হাতে সংসারের ভার দিয়ে বারাণসী গমন করলে কালকেতু ফুল্লরাকে লুটিয়ে পড়ে কাঁদতে দেখা যায়। এমনকি তারা মাসে মাসে বাবা-মাকে অর্থ-সাহায্যও পাঠায়। তবে এধরনের বর্ণনায় কবির নিজস্ব ধারণার আরোপণ অস্বাভাবিক নয়। ধর্মমঙ্গালে চিত্রিত ডোমপরিবারে চণ্ডীমঙ্গালের ব্যাধপরিবারের মতো এতটা আন্তরিকতা দেখা যায় না। আবার চর্যার অন্ত্যজ পরিবারের মতো সম্পর্কের শৈথিল্যও সেখানে নেই। দশম-দ্বাদশ শতাব্দীর উপেক্ষিত অন্ত্যজ সমাজ-পরিবারে সামাজিক-পারিবারিক নীতি-পদ্ধতির সুপরিকল্পিত নির্মাণ-বিনির্মাণ পূর্ণাঙ্গা রূপ পায়নি। ফলে পারিবারিক বন্ধন, পারস্পরিক নির্ভরতা, আপন কর্তব্যের প্রতি সচেতনতা অপেক্ষাকৃত পরবর্তীকালের চণ্ডীমঙ্গালের অন্ত্যজ পরিবারের মতো দৃঢ়বদ্ধ হয়ে ওঠেনি। তুর্কি আক্রমণোত্তর বাঙালি সমাজে আপন অস্তিত্ব ও সংস্কৃতি রক্ষার তাগিদে অভিজাত শ্রেণির আচরণে যে সহনীয়তা ও নমনীয়তার ছোঁয়া লাগে তার প্রভাব সমকালীন মঙ্গালকাব্যে অনুভূত হয়। আরও পরবর্তীকালের ধর্মমঙ্গালকাব্যে চিত্রিত অন্ত্যজ পরিবার আপন আপন অস্তিত্ব ও অধিকার সম্বন্ধে অধিকতর সচেতন। তাই এখানে স্বাধিকারপ্রমত্ত পুরুষ একাধিক বিবাহ করে। এক স্ত্রী স্বামীসোহাগিনী, আর এক স্ত্রী স্বামীসোহাগবঞ্চিতা। সতীন জ্বালায় ব্যাধপত্নীকে জ্বলতে হয়নি, জ্বলেছে ডোমপত্নী সনকা। 'ভাতারের ভাত' কাকে বলে সেটুকু জানার সৌভাগ্যও হয়নি স্বামী-সংসার বিচ্ছিন্না এই নারীর। স্বামীর বৈষম্যমূলক আচরণ তাকে করে তুলেছে সতীন-বিদ্বেষী।

মঙ্গালকাব্যের অভিজাত অন্ত্যজ নির্বিশেষে সব ধরনের পরিবারচিত্রেই রন্ধন-ভোজনের অতিরঞ্জিত বর্ণনা পাওয়া যায়। তবে অনিবার্যভাবেই অভিজাত আহারের সঙ্গে অন্ত্যজ আহার্যের বিস্তর ফারাক নজরে পড়ে। অন্ত্যজ পরিবারের খাদ্যতালিকায় রয়েছে লবণবর্জিত পাকা কলার মূল, শূকরের তেলে সাঁতলানো পাকা পুঁই শাক, টক লেবুর রস মাখানো মাছ পোড়া, মূলো-বেগুন-সীম-নিমে ডুমুর মেশানো তেতো পদ, সরষের তেলে সাঁতলানো- হেলঞ্চা-পলতা-গিমা-কুলথ শাক-ফুলবড়ি ও মরিচ দিয়ে রাঁধা পুঁইডগা ও ছোটোকচু-কলমী শাক, থোড়, কাঁচকলা, লাউ, আলু-ওল পোড়া ইত্যাদি আমিষ খাদ্যের মধ্যে ছিল হরিণ, গোসাপ, নকুল, সজারুর মাংস, হাঁসের ডিম, চিংড়ি, খয়রা প্রভৃতি মাছ। অম্বল তৈরি হত চালতা, আমসি, আমড়া, করঞ্জা, জামীর বা টক লেবু দিয়ে মেখে। এছাড়াও ছিল ঘি, মুড়ি, মোষের দুধের দই, ঘোল ইত্যাদি খাদ্য। অন্ন বলতে ছিল খুঁদ-ঘাঁটা ও আমানি। নেশার জন্য ছিল কুচিলা, ধুতুরা, ভাঙ। এই সমস্ত নিম্নমানের খাদ্যও অন্ত্যজ মানুষের ভাগ্যে প্রায়ই জুটত না, ধার করে আনতে হত। তাই তো এই সমস্ত খাবার খেতে কখনো গর্ভবতী রমণীর 'সাধ' হত, কখনও বা ক্ষুধার্ত পুরুষ যতবেশি পেটে ধরতো ততটাই গোগ্রাসে খেত। দারিদ্র্যদীর্ণ পরিবারে নিত্য ব্যবহার্য দ্রব্যাদি বলতে বিশেষ কিছুই ছিল না। পেশার প্রয়োজনে ব্যাধপরিবারে তীর-ধনুক, বাগুরাজাল, দড়ি, আর নগর-রক্ষক ডোমপরিবারে ছিল ঢাল, খাঁড়া, তরোয়াল। আমানি খাওয়ার জন্য ছিল মাটিয়া পাথরা। জল খাওয়া হত ভাঙা নারকেল মালায়। খুঁদ ঘাঁটা বা আমানি রাখা হত হাঁড়িতে, ব্যঞ্জন রাখা হত খাপরায়, আর আনাজ রাখা হত ঝুড়িতে। বসার জন্য ব্যবহৃত হত গাম্ভারী কাঠের তৈরি পিঁড়ি। সবজি ও মাছ-মাংস কাটা হত বঁটিতে। পরিধান বলতে ছিল নারীর জন্য ছেঁড়া কানি বা শাড়ি, পুরুষের জন্য 'বীর-ধড়ী' বা ছোটো ধুতি। তারা গলায় পরত জালের কাঠি, মাথায় জালের দড়ি, কানে স্ফটিক কুণ্ডল।

প্রাগাধুনিক বাঙালি সমাজে শাস্ত্রীয় ধর্মের চেয়ে আচারিক ধর্মের প্রাধান্যই বেশি ছিল। জন্ম-মৃত্যু-বিবাহ উপলক্ষ্যে সমাজের পালিত আচার-অনুষ্ঠানাদি অন্ত্যজ পরিবারেও অনুসৃত হত। সন্তান জন্মানোর সময়ে সূতিকাগৃহে অগ্নিশিখা জালনো, নাভিচ্ছেদের সময়ে উলুধ্বনি দেওয়া, শিশু ভূমিষ্ঠ হওয়ার পর তাকে তীর্থবারিতে স্নান করানো, তিন দিনে সুপথ্য পাচন খাওয়ানো, ছয় দিনে সূতিকাষষ্ঠী, আট দিনে অষ্টকলাই, নয় দিনে নবনত্তা, একুশ দিনে ষষ্ঠীপুজো, ছয় মাসে বলিদান সহযোগে শিশুর অন্নপ্রাশন ও নামকরণ, পাঁচ বছরে কর্ণবেধ প্রভৃতি অনুষ্ঠান পালন করা হত। বিবাহের ক্ষেত্রেও গণক ডেকে পাঁজি-পুথি দেখে বিবাহের দিনক্ষণ স্থির করা হত। বিবাহের জন্য পঞ্চদেবতার পূজা, অধিবাস, মঙ্গালসূত্র বন্ধন, জল সওয়া, নান্দীমুখ প্রভৃতি প্রাক্‌বিবাহ আচারাদির পর ছাদনাতলায় স্বস্তিবাক্য উচ্চারণ, কন্যাসম্প্রদান, শুভদৃষ্টি, গ্রন্থিবন্ধন, শুভনক্ষত্র দর্শন ইত্যাদির মধ্যে দিয়ে বিবাহ সুসম্পন্ন হত। শ্বশুর গৃহে ধান দূর্বা পান দিয়ে বধূকে বরণ করা হত। কালকেতু উপাখ্যানে এই সমস্ত আচার-অনুষ্ঠানের বিস্তারিত বর্ণনা পাওয়া যায়। মৃত্যুর ক্ষেত্রেও শবদাহের পর প্রেতকর্ম সমাধান করা হয়। প্রতিটি ক্ষেত্রেই ব্রাহ্মণ পুরোহিত ডেকে এই সমস্ত অনুষ্ঠান

পালন করার চিত্র এঁকেছেন প্রাগাধুনিক যুগের মঙ্গাল কবিরা, যা তৎকালীন সমাজকাঠামোয় ছিল কষ্টকল্পনা। এক্ষেত্রে একাধারে অন্ত্যজ পরিবারের খুঁটি-নাটি সম্পর্কে অনভিজ্ঞ ব্রাহ্মণ কবির কাব্য বর্ণনায় আপন অভিজ্ঞতার সূত্রে ব্রাহ্মণ্য আচারাদির আরোপণ, অপরদিকে সামাজিক-সাংস্কৃতিক ঐক্য স্থাপনের প্রয়াস— এই উভয় দিকই সক্রিয় ছিল।

মঙ্গালকাব্যে প্রদত্ত অন্ত্যজ পরিবারের এমন পুঙ্খানুপুঙ্খ বর্ণনা নিশ্চিতভাবে কিছুটা লোকশ্রুতি প্রসূত, কিছুটা কবির খণ্ড অভিজ্ঞতার প্রকাশ, আর কিছুটা কল্পনা ও ধারণাজাত, যার অনিবার্য ফলস্বরূপ অন্ত্যজ পরিবারের আনুষ্ঠানিক প্রথাদিতে ব্রাহ্মণ্য সংস্কারের আরোপণ সুস্পষ্ট। ভোজনরসিক বাঙালি পুরুষ কবি রন্ধন বা ভোজনের যে বর্ণনা দিয়েছেন, তা বাস্তবে প্রায় অসম্ভব। ব্রাহ্মণ কবিদের পক্ষে পরিবারের, বিশেষ করে অন্ত্যজ পরিবারের অন্তঃপুরে তথা হেঁসেলে প্রবেশ করা কস্টকল্পনা মাত্র। এমনিতেই তৎকালীন সমাজে অভিজাত পরিবারগুলিতে পুরুষের কর্মতৎপরতা যেমন গৃহের বাইরে নির্ধারিত ছিল, তেমনি গৃহাভ্যন্তরে নির্দিষ্ট ছিল নারীর কর্ম তৎপরতা। কেবল ভোজনের ক্ষেত্রে পুরুষের বিবিধ ব্যঞ্জন আস্বাদন-পটুতা লক্ষ করা গেলেও রন্ধনের ক্ষেত্রে তাদের কোনো প্রকার ভূমিকা দেখা যায় না।

এইভাবে তৎকালীন অন্ত্যজ পরিবারগুলিতে ভালোমন্দে মেশানো জীবনচর্যায় সার্বিক দারিদ্র্যচিত্রই লক্ষ করা যায়। প্রাগাধুনিক বাংলা সাহিত্যে প্রতিফলিত আদি-পর্বের অন্ত্যজ মানুষের জীবনযাত্রার পরিচয়দান প্রসঙ্গো অধ্যাপক নীহাররঞ্জন রায় তাঁর 'বাঙ্গালীর ইতিহাস' (আদিপর্ব) গ্রন্থে বলেছেন, "দরিদ্র নিম্নবৃত্ত সমাজে বাঙালীর সনাতন দুঃখকষ্ট লাগিয়াই ছিল; ...'ক্ষুধায় শিশুদের চোখ ও পেট বসিয়া গিয়েছে, তাহাদের দেহ শবের মতো শীর্ণ', 'ভাঙা কলসীতে একফোঁটা মাত্র জল ধরে', 'পরিধানে জীর্ণ ছিন্ন বস্ত্র, সেলাই করিবার মতো সুঁচও নাই ঘরে', 'ভাঙা কুঁড়েঘরের খুঁটি নড়িতেছে, চাল উড়িতেছে, মাটির দেয়াল গলিয়া পড়িতেছে' —এইসব ছবি সমসাময়িক সাহিত্যে দুর্লভ নয়।" এই সমস্ত ইতর পরিবারের জীবনযাত্রা ছিল অনাড়ম্বর, আহার্য ছিল নিম্নমানের, বসন-ভূষণ ছিল যৎসামান্য এবং ব্যবহারপযোগী উপকরণ ছিল নামমাত্র। মঙ্গালকাব্যে চিত্রিত অন্ত্যজ পরিবারগুলি বর্ণহিন্দু সমাজ কর্তৃক কিছু পরিমাণে উপেক্ষিত হলেও আর্যপ্রয়াসে ঐক্যবন্ধ হিন্দুসমাজ গঠনের তাগিদ থেকে একেবারে বিচ্ছিন্ন ছিল না। তাই অনেক ব্রাহ্মণ কবির কল্পনায় এই অন্ত্যজ পরিবারগুলিকে কর্মসূত্রে ও ধর্মসূত্রে ক্রমশ বাঙালি সমাজের সাধারণ স্তরে উঠে আসতে দেখা যায়।

উৎসের সন্ধানে

১। আদক, রামদাস : শ্রীধর্ম্মপুরাণ বা অনাদিমঙ্গাল, শ্রীবসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত, বঙ্গীয় পরিষদ মন্দির, ১৩৪৫ বঙ্গাব্দ।

২। খালেক, মুহম্মদ আব্দুল : মধ্যযুগের বাংলা কাব্যে লোকউপাদান, বাংলা একাডেমি, ঢাকা, ১৯৮৫ খ্রিস্টাব্দ।

৩। গঙ্গোপাধ্যায়, শম্ভুনাথ : মধ্যযুগের বাংলা কাব্যে সমাজতত্ত্ব, পুস্তক বিপণি, কলিকাতা, প্রথম প্রকাশ, ১৪০৪ বঙ্গাব্দ।

৪। গাঙ্গুলী, মাণিক : শ্রীধর্ম্মমঙ্গল, মহামহোপাধ্যায় শ্রী হরপ্রসাদ শাস্ত্রী ও শ্রী দীনেশচন্দ্র সেন সম্পাদিত, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, ১৩১২ বঙ্গাব্দ।

৫। গাঙ্গুলী, মাণিক : ধর্মমঙ্গাল, বিজিত কুমার দত্ত ও সুনন্দা দত্ত সম্পাদিত, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৬০ খ্রিস্টাব্দ।

৬। চক্রবর্ত্তী, ঘনরাম কবিরত্ন : শ্রীধর্ম্মমঙ্গাল, বঙ্গাবাসী স্টীম মেশিন প্রেস হইতে মুদ্রিত ও প্রকাশিত, দ্বিতীয় সংস্করণ, ১৩০৮ বঙ্গাব্দ।

৭। চক্রবর্ত্তী, ঘনরাম : ধর্মমঙ্গাল, পীযূষকান্তি মহাপাত্র সম্পাদিত, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৬২ খ্রিস্টাব্দ।

৮। চক্রবর্ত্তী, মুকুন্দরাম : কবিকঙ্কণ চণ্ডী, ড. ক্ষুদিরাম দাস সম্পাদিত, দে'জ পাবলিশিং, প্রথম খণ্ড, দ্বিতীয় সংস্করণ, ১৯৯৯ খ্রিস্টাব্দ।

৯। কবিকঙ্কণ চণ্ডী, শ্রীশ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় ও শ্রীবিশ্বপতি চৌধুরী সম্পাদিত, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, প্রথম ভাগ, নূতন সংস্করণ, পুনর্মুদ্রিত, ২০০২ খ্রিস্টাব্দ।

১০। চক্রবর্ত্তী, রূপরাম : ধর্মমঙ্গাল, অক্ষয়কুমার কয়াল সম্পাদিত, ভারবি সংস্করণ, কলকাতা, ১৯৮৬ খ্রিস্টাব্দ।

১১। জলিল, মুহম্মদ আবদুল : মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে বাংলা ও বাঙালি সমাজ, বাংলা একাডেমি, ঢাকা, প্রথম পুনর্মুদ্রণ, ১৯৯৬ খ্রিস্টাব্দ।

১২। দত্ত, মানিক : চণ্ডীমঙ্গাল, শ্রীসুনীল কুমার ওঝা সম্পাদিত, উত্তরবঙ্গা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৩৮৪ বঙ্গাব্দ।

১৩। দ্বিজ মাধব : মঙ্গালচণ্ডীর গীত, শ্রীসুধীভূষণ ভট্টাচার্য্য সম্পাদিত, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৫২ খ্রিস্টাব্দ।

১৪। দ্বিজ রামদেব : অভয়ামঙ্গাল, শ্রী আশুতোষ দাস সম্পাদিত, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৫৭ খ্রিস্টাব্দ।

১৫। নস্কর, সনৎকুমার : মুঘল যুগের বাংলা সাহিত্য, রত্নাবলী, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ, ১৯৯৫ খ্রিস্টাব্দ।

১৬। পণ্ডিত, রামাই :শূন্যপুরাণ, নগেন্দ্রনাথ বসু সম্পাদিত, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, ১৩১৪ বঙ্গাব্দ।

১৭। পণ্ডিত, রামাই : শূন্যপুরাণ, ভক্তিমাধব চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত, ফার্মা কে. এল. এম. প্রাঃ লিঃ, কলকাতা, ১৯৭৭ খ্রিস্টাব্দ।

১৮। পণ্ডিত, রামাই : শূন্যপুরাণ, শ্রী চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত, বসুমতী সাহিত্য মন্দির, কলকাতা, ১৩৩৬ বঙ্গাব্দ।

১৯। পোদ্দার, অরবিন্দ : মানবধর্ম ও বাংলা কাব্যে মধ্যযুগ, পুস্তক বিপণি, দ্বিতীয় সংস্করণ (পরিবর্ধিত), চতুর্থ মুদ্রণ, ১৯৯৪ খ্রিস্টাব্দ।

২০। বন্দ্যোপাধ্যায়, কালীপ্রসন্ন : মধ্যযুগে বাঙ্গালা, কমল চৌধুরী সম্পাদিত, দে'জ পাবলিশিং কলকাতা, প্রথম সংস্করণ, ২০০২ খ্রিস্টাব্দ।

২১। রায়, নীহাররঞ্জন : বাঙ্গালীর ইতিহাস (আদিপর্ব), দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, দ্বিতীয় সংস্করণ, ১৪০২ বঙ্গাব্দ খ্রিস্টাব্দ।

২২। রায়, নীহাররঞ্জন : প্রাচীন বাংলার দৈনন্দিন জীবন, বিশ্ববিদ্যাসংগ্রহ, বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়, ১৩৫০ বঙ্গাব্দ।

২৩। রায়, নীহাররঞ্জন : মধ্যযুগের বাংলার দৈনন্দিন জীবন, বিশ্ববিদ্যাসংগ্রহ, বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়, ১৩৫০ বঙ্গাব্দ।

২৪। শরীফ, আহমদ সম্পাদিত : মধ্যযুগের সাহিত্যে সমাজ ও সংস্কৃতির রূপ, ঢাকা, ১৯৭৭ খ্রিস্টাব্দ।

২৫। শরীফ, আহমদ : বাঙালি ও বাঙলা সাহিত্য, নিউ এজ পাবলিকেশন্স, ঢাকা, পুনর্মুদ্রণ, ২০০৪ খ্রিস্টাব্দ।

২৬। শরীফ, আহমদ : বাঙালি ও বাঙলা সাহিত্য, দ্বিতীয় খণ্ড, নিউ এজ পাবলিকেশন্স, ঢাকা, দ্বিতীয় প্রকাশ, ২০০৩ খ্রিস্টাব্দ।

২৭। সেন, সুকুমার : মধ্যযুগের বাংলা ও বাঙালী, বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়, কলিকাতা, ১৩৫০ বঙ্গাব্দ।

২৮। Majumdar, R.C : Ancient India, Motilal Banarsidass Publishers Private Limited, Delhi, Eighth Edition, Re-print, 2003.

ক্ষেমানন্দের মনসামঙ্গালে লৌকিক উপাদান

মুনমুন গঙ্গোপাধ্যায়

মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের বৃহৎ অংশ জুড়ে আছে মঙ্গালকাব্য। এক ধর্মীয়, রাজনৈতিক ও সামাজিক অস্থিরতার মধ্যে মঙ্গালকাব্যগুলির সৃষ্টি। অভিজাত ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতি আত্ম-রক্ষার উদ্দেশ্যে লোকায়ত সংস্কৃতির সঙ্গো সমন্বয়ের প্রয়োজন অনুভব করায় অনার্য এবং গ্রাম্য বা লৌকিক দেবদেবী উচ্চকোটিতে গৃহীত হয়। বিশ্বাস এই যে, এরা মানুষের সামগ্রিক কল্যাণ করে, পার্থিব সুখ-সমৃদ্ধি দান করে। মঙ্গাল দেবদেবীর কথা মঙ্গালকাব্যের মূল বিষয় হলেও এর মধ্যেই 'বাংলা কাব্যভাষার প্রথম আত্মোপলব্ধির অভিব্যক্তি' দেখা যায়।

মঙ্গালকাব্যেই লৌকিক ও পৌরাণিক দেবকল্পনার মিশ্রণ ঘটেছে। স্বর্গের দেবতাদের মর্ত্যে বিচরণ, তাঁদের মানবীয় স্বভাব, মর্ত্যবাসীর সঙ্গো তাঁদের সম্পর্ক-সংযোগ ইত্যাদির মূলে আছে লোকভিত্তি। বাংলার লোকজীবনের বাস্তবচিত্র মঙ্গালকাব্যগুলিতে লভ্য। মঙ্গালকাব্য কাহিনিকাব্য হলেও এর সঙ্গো ব্রতকথার ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ আছে। কারণ ব্রতানুষ্ঠানের মূলে আছে আদিম টোটেম-বিশ্বাস এবং লোককল্পনার বিস্তার। মঙ্গালকাব্যে ইতিহাসের প্রাচীন প্রসঙ্গা লোক-ভাবনায় পল্লবিত হয়ে কল্পকাহিনিতে রূপান্তরিত হয়েছে বহুযুগ ধরে। তার সঙ্গো মঙ্গালকাব্যের কাহিনি, উৎস বা উৎপত্তির কেন্দ্রেই আছে লোকভিত্তি, লোকজীবন ও লোকায়ত উপাদান। কিন্তু মঙ্গালকাব্যে লৌকিক উপাদান থাকলেও মঙ্গালকাব্য যে কোনোভাবেই লোকসাহিত্য নয়, একথা লোকসাহিত্যের সংজ্ঞা ও বৈশিষ্ট্য আলোচনা করলে সহজেই উপলব্ধি করা যায়। অধ্যাপক আশুতোষ ভট্টাচার্য তাঁর 'বাংলার লোকসাহিত্য' গ্রন্থে এই বিষয়ে আলোচনা করেছেন। একথা ঠিক যে, আমাদের কোনো কোনো 'ধর্মসংগীতের রাগিণী লোক-সাহিত্যের সুরে বাঁধা' এবং মঙ্গালকাব্যে বারোমাস্যা, হেয়ালি, ধাঁধা ইত্যাদি লোক-সাহিত্যের নানা উপকরণও লভ্য। তথাপি মনে রাখতে হবে মঙ্গালকাব্য মূলত ধর্মকেন্দ্রিক এবং তা ব্যক্তিবিশেষের সৃষ্টি—গোষ্ঠীকৃত প্রয়াস নয়। লোক-সাহিত্যের বৈশিষ্ট্য আলোচনায় দেখি ব্যক্তির রচনা লোক-সাহিত্যরূপে গণ্য হতে পারে যদি তা গোষ্ঠীর দ্বারা পুনর্লিখিত না হয়। অর্থাৎ 'Communal recreation after individual creation'-এর দ্বারাই তা

লোক-সাহিত্যের বৈশিষ্ট্য লাভ করে। কিন্তু সাহিত্যসৃষ্টির প্রবহমানতায় একটি বিশেষ ধারার সঙ্গো আর একটি ধারার সংযোগসূত্র লক্ষ করা যায়। তাই মঙ্গালকাব্যের মধ্যেও লোকসাহিত্য, লোককথার প্রচুর উপাদানের সন্ধান মেলে। এ প্রসঙ্গো ড. আশুতোষ ভট্টাচার্যের অভিমতটি উল্লেখযোগ্য; তিনি লিখেছেন—

> মঙ্গালকাব্য লিখিত (Written) সাহিত্য-ধারার অন্তর্গত এবং লোককথা মৌলিক (Oral) সাহিত্য-ধারার অন্তর্গত হইলেও উভয়ের মধ্যে বিষয়গত কতকগুলি সাদৃশ্যও দেখিতে পাওয়া যায়, ইহার কারণ লোক-সাহিত্যের মৌখিক ধারা (Oral tradition)-র উপর ভিত্তি করিয়াই মঙ্গালকাব্যের লিখিত (Written) ধারার সৃষ্টি হইয়াছে।[২]

মঙ্গালকাব্যের ভিত্তি ব্রতকথা হলেও এতে লোককথা (Folk-tale)-র বিভিন্ন উপকরণের সংমিশ্রণও ঘটেছে। কেতকাদাস ক্ষেমানন্দের ‘মনসামঙ্গাল’-এ লোক-উপাদানের আলোচনায় এই বিষয়গুলি স্মরণে রাখতে হবে।

মঙ্গালকাব্য ব্যক্তিবিশেষের রচনা হলেও এর বিষয় পরিকল্পনায় কবিদের ‘পুচ্ছগ্রাহিতা’ লক্ষ করা যায়, যার দ্বারা লোক-সাহিত্যের ধারাবাহিকতা বা Continuity-র দিকটি স্পষ্ট হয়ে ওঠে। মনসা সর্পকুলের অধিষ্ঠাত্রী দেবী—‘নাগজাতি কন্যা’। তিনি ‘নাগমাতা’। অনেকে মনে করেন দ্রাবিড় দেবী মনে-মাঞ্চী বা মঞ্চাম্মা থেকে মনসা নামের উৎপত্তি। ভারতের নানা প্রান্তে এখনও সর্পপূজার প্রচলন আছে। মনসার প্রতীক হিসাবে স্নুহি বা সিজবৃক্ষ (তেলেগু চেঙমুডু বা ডেমুডু) ও পূজিত হয়। বৃক্ষের সঙ্গো সর্পের সম্পর্ক অত্যন্ত প্রাচীন। কারণ এর সঙ্গো জড়িয়ে আছে উর্বরতাবাদ বা ‘fertility cult’-এর লোকবিশ্বাস। মনসামঙ্গালের মূলকাহিনি মনসা ও চাঁদ সদাগরের দ্বন্দ্বকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে। যদিও শেষপর্যন্ত চাঁদের বাঁ-হাতে মনসা পূজার মধ্য দিয়ে সেই কাহিনির সুখকর পরিসমাপ্তি ঘটেছে। তবে মূলকাহিনিতে শঙ্কর গারুড়ী-নেতার কাহিনি এবং চাঁদ সদাগর-বেহুলার কাহিনি,—দু’টি স্বতন্ত্র লৌকিক কাহিনির ধারা একত্রে এসে মিলেছে। শঙ্কর গারুড়ীর কাহিনি সম্পর্কে মনে করা হয়—এটি সম্ভবত লৌকিক ছড়া বা লোকগাথার আকারে লোকসমাজে প্রচলিত ছিল। সাঁওতাল পরগণার অধিবাসী সাঁওতাল জাতির মধ্যে কামরু ওঝার যে কাহিনি প্রচলিত আছে তা শঙ্কর গারুড়ীর কাহিনির অনেকটা অনুরূপ (Memoirs of the Asiatic Society, X, I p. 124-142), এবং এই কাহিনির লৌকিক দেবচরিত্র নেতা। ইনি রজককুমারী নামে পরিচিত। কেতকাদাসের কাব্যে শঙ্কর গারুড়ী অবশ্য ধন্বন্তরী নামে পরিচিত। এই ধন্বন্তরী শুধু চাঁদের বন্ধু নয়, সে তার বিপদের সবচেয়ে বড়ো সহায়। ধন্বন্তরী নেতার শিষ্যও। এখানেই ওঝা ও নেতাধোপানীর লৌকিক কাহিনির সংযোগসূত্রটি লক্ষ করা যায়। ক্ষেমানন্দের মতে মনসার আর এক নাম কেতকা। এর কারণ হিসাবে তিনি মনসার কেয়াপাতায় জন্ম হওয়ার কথা বলেছেন—‘কি আ পাতে জন্ম হৈল কেতকা সুন্দরী।’ তবে মনসার কেয়াপাতায় জন্ম হওয়ার বিবরণ আর কোনো মনসামঙ্গাল কাব্যকারের রচনায় পাওয়া যায় না।

মঙ্গালকাব্যগুলির মধ্যে সর্বাধিক প্রচারিত ও জনপ্রিয় হল ‘মনসামঙ্গাল’। এর কারণ

হিসাবে মনসাপূজার ব্যাপকতাই শুধু নয়, এই কাহিনির ঘটনা ও চরিত্রগুলির আকর্ষণও বিশেষ গুরুত্ব পায়। গ্রাম-বাংলার বাস্তব জীবন ও সেই জীবনকেন্দ্রিক সমাজ, সংস্কার, ধর্মবিশ্বাস এসবের উপস্থিতিও এই আকর্ষণের উল্লেখযোগ্য কারণ বলে মনে করা যেতে পারে। এখনও বাংলাদেশের কোনো কোনো অঞ্চলে শ্রাবণ মাসে বিবাহ নিষিদ্ধ। কারণ প্রচলিত ধারণা হল শ্রাবণ মাসে বিবাহ হলে কন্যা বিধবা হয়, যেমন হয়েছিল বেহুলার ক্ষেত্রে। 'মনসামঙ্গাল'-এ বেহুলা-লখিন্দরের কাহিনির প্রভাব এত গভীর যে এখনও বর্ধমান জেলার কসবা চম্পকনগরে প্রতি বৎসর সতীবেহুলার স্মৃতি-উৎসব বলে পরিচিত এক বিরাট মেলার আয়োজন করা হয়। বাংলার সর্বত্র সাপ খেলাবার সময় সাপুড়িয়ারা সুর করে টেনে টেনে যে গান করে, 'তাহাতেও অভাগিনী বেহুলার অকাল বৈধব্যের করুণ কাহিনিই শুনিতে পাওয়া যায়।'[৩] এসব তথ্য লোকজীবন ও লোকসমাজের সঙ্গো মনসামঙ্গাল কাব্যের সম্পৃক্তিই প্রকাশ করে।

মধ্যযুগের প্রায় প্রতিটি কাব্যের মতো মঙ্গালকাব্যেও অলৌকিক নানা বিষয়ের উল্লেখ আছে। মনসামঙ্গালেও মনসার জন্ম থেকে শুরু করে এরকম অলৌকিক বহু উপাদানের ব্যবহার লক্ষ করা যায়। মনসার জন্ম 'লোকশ্রুতিবিদ্‌গণে'র ভাষায় 'Supernatural birth motif'। শিবের বীর্যস্খলনে পদ্মপাতায় অযোনিসম্ভবা মনসার জন্ম হয়েছে। তিনি জননী-গর্ভজাত নন। দেবীর এই জন্মবৃত্তান্ত অনেকটা রূপকথা (fairy tale)-র মতো। মনসা বা সর্পের প্রতিহিংসাকে 'revengeful serpent motif' বলে যেমন উল্লেখ করতে পারি, তেমনি 'Injured snake avenges' নামে লোকসাহিত্যের আর একটি যে 'motif' আছে 'তাহাও মনসামঙ্গাল কাহিনির ভিত্তি বলিয়া স্বীকার করা যায়।'[৪] তবে এই আঘাত শারীরিক ও মানসিক দু-ভাবেই এসেছে। একের পর এক পুত্রদের মৃত্যুর ঘটনা চাঁদের মানসিক কষ্টের কারণ যে হয়েছিল সেকথা নিশ্চিত বলা যায়। যদিও তার প্রকাশ ছিল না। যত কষ্ট যত আঘাত পেয়েছে চাঁদ ততই মনসার বিরুদ্ধে তার লড়াইয়ের মনোভাব দৃঢ় হয়েছে। প্রতিহিংসার বিরুদ্ধে প্রতিহিংসা ও প্রতিরোধ—এটাই ছিল চাঁদ সদাগরের লক্ষ্য। তার প্রতিরোধ পুরুষকার। আর মনসাকে প্রতিনিয়ত তুচ্ছ ও উপেক্ষা করার মধ্য দিয়ে চাঁদ তার প্রতিহিংসা চরিতার্থ করেছে। দেবীর মতো তার কোনো অলৌকিক শক্তি ছিল না, ছিল শুধু মনোবল, মানসিক দৃঢ়তা। তাই দেবতা ও মানুষের এই অসম লড়াইয়ে চাঁদের ব্যক্তিত্ব ও পুরুষকারের অপূর্ব প্রকাশে আমরা যত বেশি মুগ্ধ হয়েছি, মনসার অলৌকিক শক্তি তার কাছে নগণ্য হয়ে গেছে। তবে চাঁদ বণিকও মহাজ্ঞানের অধিকারী ছিল। নেতা মনসাকে জানিয়েছে—

মহাজ্ঞান জানে ভালো চাঁদ সদাগরে।
এই অহংকারে তোমা পূজা নাহি করে॥

কিন্তু এই মহাজ্ঞান আসলে কি? ক্ষেমানন্দ ও অন্যান্য মনসামঙ্গালের কবিদের লেখা থেকে জানতে পারি শিবের কাছ থেকে পাওয়া এই মহাজ্ঞান 'মৃত্যুঞ্জয় কবচ'-এর মতো। এতে শুধু প্রাণ ফিরে পাওয়া নয়, ক্ষতিগ্রস্ত সকল জিনিসেরই উদ্ধার সম্ভব। চাঁদের মতো

ধন্বন্তরীও 'মহাজ্ঞান'-এর অধিকারী ছিল। তাই মনসা চাঁদের 'মহাজ্ঞান' হরণ করলে ধন্বন্তরির কাছ থেকে সে আবার এই শক্তি ফিরে পায়—'মহাজ্ঞান দিয়া যায় ওঝা ধন্বন্তরি'।[৫] এবং এই শক্তির জোরে দেবীর নষ্ট করা নাখরা বন চাঁদ পুনরুদ্ধারও করে।—'কাটা নাখেরার বন জীয়াইল বান্যা'।[৬] সুতরাং মহাজ্ঞানের অলৌকিকতা নিয়ে সন্দেহের কোনো অবকাশ নেই। পাশ্চাত্য-লোক-সাহিত্যে একে 'magic power' বা 'magic wisdom' বলে। Thompson 'The Folktale' গ্রন্থে বলেছেন—

> One can acquire magic wisdom from eating something, particularly from a part of a serpent.[৭]

রূপকথার গল্পে মন্ত্রপূত জল ছিটিয়ে মৃতদেহে প্রাণের সঞ্চার অত্যন্ত পরিচিত একটি বিষয়। ঠিক সেইভাবে সর্প-বিষক্রিয়ায় মৃত্যু বা প্রাণসংশয়ের যে ঘটনা মনসামঙ্গালে আছে তার মধ্যে পান্তাভাতে বিষের উদ্গীরণে চাঁদের ছয়পুত্রের হত্যা 'টোটেম-কৃষ্টি'র অঙ্গ। ক্ষেমানন্দের কাব্যে দেখি মনসার নির্দেশে বিঘতিয়া সাপ চাঁদের পুত্রদের মারার জন্য ভাতে বিষ ঢেলে দিয়েছে—

চাঁদবান্যার তিলেক নাহিক মায়া মো।
বিষ খায়্যা মরুক তাহার ছয় পো॥
চাঁদের ভবনে তুমি চল বিঘতিয়া।
ওদন-ব্যঞ্জনে বিষ উগারহ গিয়া॥
বিঘতিয়া গেল তথা দেবীর বচনে।
উগারিল কালকূটি ওদন-ব্যঞ্জনে॥[৮]

এবং তারই পরিণামে—

মধ্যাহ্নের কালে ভুঞ্জে তনয় সকল।
ছয় পুত্র মৈল তার খাইয়া গরল॥[৯]

এছাড়া বিষদধি খেয়ে ধন্বন্তরির ছ-কুড়ি শিষ্য জ্ঞান হারালে ওঝা তাদের 'চাপড়ে' পুনরুজ্জীবিত করে। নেতার পরামর্শে মনসা প্রথমে পুষ্পের মালায় বিষ ভরে ও পরে গোয়ালিনী সেজে দধিতে বিষ ঢেলে ধন্বন্তরির শঙ্খিনী নগরের উদ্দেশে যাত্রা করে। কিন্তু পুষ্পমালা পরে ধন্বন্তরির শিষ্যদের "বরণ হৈল কালা : কেহ মৈল, কেহ মুরছিত।" তারপর মঙ্গাল্যা বোড়ার বিষে দেবী যখন 'সাজাইল বিষ-দধি দিয়া কালকুটি॥'—তখন সেই বিষদধি খেয়ে ছ-কুড়ি শিষ্যের 'নাহিক চৈতন্য কার, মুখে গোটা নাল।'[১০]—ইত্যাদি বর্ণনায় বিষ বিষয়ক টোটেমের অভিক্ষেপ দেখি। সর্পদংশনে কাজলা মালিনীর দুই পুত্রের মৃত্যু ও মনসার 'বিষ ঝাড়নে' তাদের পুনর্জীবন লাভ লোকচিকিৎসা ও লোকবিশ্বাসজাত ঘটনা। তবে এর মূলে আছে magical power। এই বিষ ঝাড়ানোর বর্ণনাটি লক্ষ করার মতো—

দুই শিশু বেড়ি দিল কাপড় কাণ্ডার।
সঘনে ডাকিল দেবী আস্তিক ভাণ্ডার॥
মনে মনে জপে মাতা মৃত-সঞ্জিবনী।

মনসা আপনে ঝাড়ি বিষ করে পানি॥
শ্বেত শিম্বলের গাছ আগে তার বঙ্ক।
তাহে বস্যা কাঁকিনী ঘন পাড়ে ডাক।
উল উল বিষ তোরে দেবী দিল হাঁক॥
জপিয়া মারেন তবে গামছার বাড়ি।
ফণীন্দ্রে ধরিল যেন খগ তাড়াতাড়ি॥
পাতিয়া যুগল হাত মাগেন গরল।
মনসার মন্ত্রে বিষ হয়্যা গেল জল॥[১১]

তবে এই পুরো প্রক্রিয়াটির মধ্যে চিকিৎসা অপেক্ষা মন্ত্র-তন্ত্রের প্রভাবই অধিক লক্ষণীয়। প্রায় একই রকম চিত্র পাই লখিন্দরের পুনরুজ্জীবনের ঘটনায়—

ধড়ে প্রাণ নাই যেন চিত্রের পুতলি।
মনসা ঝাড়েন তায় মহামন্ত্র বুলি॥
কি কর শিমলি ডালে ধুকড়িয়া কঙ্ক।
মোর পুত্রে হইয়াছে সাপিনীর ডঙ্ক॥
সাপিনী ধরিয়া খাহ বিষহরি বলে।
কঙ্ক সঙরণে বিষ ধিকি ধিকি উলে॥
হাড় রজ মাংস বিষ হাড়ে কর বাসা॥
খেদারিয়া দেহ বিষ বলেন মনসা॥...
পাতিয়া যুগল কর মাগেন গরল।
মনসার মন্ত্রে বিষ ফুঞে হৈল জল॥[১২]

ছোটনাগপুরের অন্তর্গত রাঁচি জেলার ওরাওঁ নামক আদিম জাতির মধ্যে সর্পদেবী মনসার নাম শোনা যায়। এদের মধ্যে সাপের ওঝাকে 'নাগমতি' বলে। মনসা পূজার সময় তাঁর মহাত্ম্যকীর্তনমূলক গান গাওয়া হয় এবং তালে তালে হাতে তালি বাজানো হয়। এই উপলক্ষ্যে সাপের বিষ ঝাড়ার মন্ত্র আবৃত্তি ও নানা জাতের সাপের নাম করা হয়।[১৩] তবে লখিন্দরের পুনর্জীবনলাভের বিষয় লোককথারই সাধারণ বিষয় বা motif। মার্কিন দেশের লোকসাহিত্যে 'Enchanted Prince'-এর যে রূপকথার কাহিনি প্রচলিত আছে তার সঙ্গে লখিন্দরের প্রাণ ফিরে পাওয়ার ঘটনা-সাদৃশ্য যুক্ত।[১৪] বস্তুতপক্ষে সব দেশের লোকসাহিত্যের সতীনারীকে কতকগুলি অলৌকিক শক্তির অধিকারী বলে কল্পনা করা হয়। বেহুলা তেমনই এক শক্তিসম্ভবা নারী;—যে লোহার কলাই সিদ্ধ করতে পারে, স্বামীর মৃতদেহ নিয়ে ভেলায় করে অনির্দেশের পথে বেরিয়ে পড়তে পারে ; ধনামনা, গোদা, টেটন প্রমুখের লোভাতুর দৃষ্টিকে অতিক্রম করে আপন লক্ষ্যে উপনীত হতে পারে। চাঁদ তো এমনই এক নারীকে পুত্রবধূরূপে চেয়েছিল। তার লোহার কলাই সিদ্ধ করার ঘটনা উর্বরা শক্তির 'লোক মোটিফ' ছাড়া আর কিছু নয়। লক্ষণীয় যে সাপও উর্বরা বা প্রজনন শক্তির প্রতীক। নারীকে উর্বরা শক্তিরূপে কল্পনায় সর্বাগ্রে মনে পড়ে রামায়ণের সীতার কথা।

সীতা ভূমিকন্যা। শস্যশ্যামলা ধরিত্রীর প্রতিশ্রুতি তিনি নিয়ে এসেছেন। নারীই সৃজনী ও পালনী শক্তি। দুর্গাও এই পূর্ণশস্যভূমি ও সমৃদ্ধির প্রতীকী দেবতা। বেহুলার চরিত্র কল্পনায় নারী-সম্পর্কিত এই 'মিথ'টি কার্যকর হয়েছে।

লোহার কলাই যদি করিল রন্ধন।
চাঁদেরে অনিঞা দিল সায়ের নন্দন॥
লোহার কলাই দেখি সাধু পরিতোষ।
পতিব্রতা বটে কন্যা নাহি কোনো দোষ॥[১৫]

প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য নারীর সতীত্ব পরীক্ষা লোকসংস্কারের একটি প্রচলিত রীতি হিসাবে বেহুলার ক্ষেত্রেও ব্যবহৃত হয়েছে, যেমন দেখেছি আমরা সীতার ক্ষেত্রেও। একে লোকসাহিত্যের ভাষায় 'Chastity test motif' বলে।

> Many forms of testing are found in folklore and legend; they are generally connected with ordeal. The test by fire is the most common'...মনসামঙ্গলে সর্প-পরীক্ষা (snake-ordeal), ক্ষুরধার-পরীক্ষা (razor's edge ordeal), জল-পরীক্ষা (water-ordeal), শূন্য-পরীক্ষা, জৌঘর-পরীক্ষা (fire-ordeal), তুলা-পরীক্ষা ইত্যাদি বিবিধ পরীক্ষার উল্লেখ আছে। ইহার অর্থ এই যে মনসামঙ্গলের প্রত্যক্ষ প্রেরণা রামায়ণ, মহাভারত, পুরাণ হইতে আসে নাই—লোক-সাহিত্যের বিস্তৃততার ক্ষেত্র হইতে আসিয়াছে।[১৬]

পূর্বে উল্লেখিত মনসার বিষ ঝাড়ন মন্ত্রে লোকসাহিত্যের অন্তর্গত ছড়ার নির্যাস পাওয়া যায়। তাছাড়া এই জাতীয় মন্ত্র হেঁয়ালিতে ভরা। এই হেঁয়ালির অর্থ মন্ত্রউচ্চারক ও তাঁর শিষ্য অনুচরেরাই একমাত্র বোঝেন। কারণ মন্ত্রগুলি গূঢ়ার্থব্যঞ্জক। সমুদ্রমন্থনে উত্থিত হলাহল পান করে শিব চেতনা হারালে মনসাই মন্ত্রশক্তির সাহায্যে পিতা মহেশ্বরকে জীবনদান করেছেন। এই মন্ত্র-তন্ত্র আসলে একপ্রকার ঐন্দ্রজালিক শক্তি (magical power), প্রাচীন লোক-সমাজের এইরকমই বিশ্বাস, এর সৃষ্টির মূলে আছে লৌকিক মন (popular mind)। বলাবাহুল্য, বেহুলা-লখিন্দর 'মনসামঙ্গাল'-এর সবচেয়ে আকর্ষণীয় অংশ। ঘটনাগত ঘাত-প্রতিঘাত, উৎকণ্ঠা ও ক্লাইম্যাক্স, চরিত্র-চিত্রণ, আদর্শের জয় এবং কাহিনির আনন্দময় পরিণতি—এসবই এর জনপ্রিয়তার কারণ। লখিন্দর ও বেহুলা চাঁদের কনিষ্ঠ পুত্র ও পুত্রবধূ। লোককথার সাধারণ বিষয় এই যে এখানে কনিষ্ঠ পুত্র, কনিষ্ঠ পুত্রবধূ ও কনিষ্ঠ কন্যা অসাধ্য সাধন করবে। রূপকথাতেও কনিষ্ঠরানি, তার পুত্রকন্যারা গুরুত্বপূর্ণ চরিত্র হয়ে উঠেছে। কনিষ্ঠরানি প্রায় সব সময়েই দুয়োরানি। বড়ো, মেজো এরা তার প্রতি ঈর্ষাপরায়ণ বলে ছোটোরানিকে অনেক প্রতিকূল পরিস্থিতির মধ্যে দিয়ে যেতে হয়। যদিও শেষপর্যন্ত জয়ী হয় সে-ই। কনিষ্ঠ পুত্র-কন্যা-বধূ বা রানিই এসব কাহিনির মধ্যে নায়কত্ব লাভ করে। মনসামঙ্গালে বেহুলা-লখিন্দর যে গুরুত্ব পেয়েছে অন্য চরিত্রগুলি একেবারেই তা পায়নি। পাশ্চাত্য লোকশ্রুতিবিদ্গণের বিশ্লেষণে এটি 'Successful youngest son (daugher or daughter-in-law) motif.'[১৭]

মনসামঙ্গাল কাব্যে ব্যক্তি ও পরিবার জীবনের পাশাপাশি গোষ্ঠীজীবনের চিত্রও আছে।

যেমন রাখাল-বালক, মাঝিমল্লা প্রমুখ। গোষ্ঠীজীবন লোকমানসের বিশেষ প্রবণতাই পরিস্ফুট করে। এদের কর্মজীবন, সাধ-আহ্লাদ, পূজা-পার্বণ, সংস্কৃতি সবই একপ্রকার। চাঁদের বাণিজ্য-তরি ডুবে যাওয়ায় 'বাঙ্গাল' মাঝিরা 'পোস্তর হুলা' ভেসে গেল বলে বিলাপ করেছে। তাদের জীবন-রক্ষার চিন্তা অপেক্ষা পোস্ত-প্রীতি অনেক বেশি। রাখাল-বালকেরা যেমন একসঙ্গে খেলা করে, মনসার পূজা করে, তেমনি তারা একসঙ্গে ছদ্মবেশী পদ্মার নিগ্রহ করে এবং পরে দলবদ্ধভাবে হাসন-হোসনের বিরুদ্ধে লড়াই করতেও প্রস্তুত হয়। তাদের ক্রীড়া, তাদের গান নিঃসন্দেহে লোকক্রীড়া ও লোকসংগীত। তারা গোচারণের সময় শিঙা ও বেণু বাজায়—'শুনি শিঙ্গা বেণু ধ্বনি বাথানেরে চলি।'[১৮]

ক্ষেমানন্দ তাদের ক্রীড়ার বর্ণনায় বলেছেন—

কেহ টিকডাড়ি খেলে কেহ ভাঁটাকড়ি।
কার লাগ ধরে কেহ করে রড়ারড়ি॥[১৯]

কবির কাব্যে লোকচরিত্রের যথেষ্ট সমাগম আছে। রাখাল-বালকরা ছাড়াও আছে মৎস্যজীবী জালু-মালু, চাঁদের প্রজারা, মাঝি-মল্লার দল, ধন্বন্তরির শিষ্যদল, চাঁদের প্রতিবেশী বিবাহসভায় উপস্থিত অতিথি-অভ্যাগতগণ—এদের সামগ্রিকভাবে জনতা চরিত্রের অন্তর্ভুক্ত করা যায়। আছে বিভিন্ন বৃত্তিধারী মানুষ—ভৃত্য থেকে শুরু করে নটী, ধোপা, ঘাটিয়াল, ঘটক, মালিনী প্রমুখ নানা পেশাভিত্তিক চরিত্রের সমাবেশ ঘটেছে কেতকাদাসের কাব্যে। কবি কিছু লোকযানেরও উল্লেখ করেছেন। যেমন শিবের গমনাগমনের একমাত্র মাধ্যম বলদ। বিজয় গুপ্ত তাঁর 'পদ্মাপুরাণ'-এ চমৎকার দক্ষতায় মহেশের বলদের পৃষ্ঠে আরোহণের চিত্র এঁকেছেন। ভেলা এবং নৌকা এই দু-ধরনের লৌকিক জলযান। তবে মনসামঙ্গালে কলার ভেলা বা মান্দাসে বেহুলার ভাসান-যাত্রা সর্পাঘাতে মৃত ব্যক্তিকে ভাসিয়ে দেওয়ার লোকাচারের সঙ্গে সম্পর্কিত। ক্ষেমানন্দ লিখেছেন—

বেহুলা কান্দিয়া কয়   ব্যগ্র হয়্যা অতিশয়
ঝাট গড় কলার মান্দাস,
জীয়াইব মৃত পতি   রাখিব কুলের খ্যাতি[২০]

জনৈক সমালোচক বলেছেন—

> বেহুলার ভাসান যাত্রার মধ্যে সামান্য অন্তর্বাণিজ্য, নৌপরিবহনের দৃশ্য আছে।... মূল প্রসঙ্গে উর্বরতার ভাবসত্য (fertility cult) থাকতে পারে।... বিবাহরাত্রে স্বামীর মৃত্যু ফসলের দেবকল্প আশ্রয়ের বপন কর্ম আর ছ'মাস ধরে সেই স্বামীর দেহ রক্ষার চেষ্টা সম্পূর্ণই শস্যপ্রাণ দেবত্বের পরিকল্পনা—আকল্প বা archetype... শস্যপ্রাণ দেবতা আর তার সঙ্গিনী মিলে শস্যের দেবদেবীর দাম্পত্য কল্পিত হয়। এর পিছনে কৃষিকর্মের আদি আবিষ্কারক নারী সমাজ ও কৃষি-উৎপাদন চক্রের আন্তঃসম্পর্ক বিজড়িত থাকে। বাংলার বেহুলা-লখিন্দরের কাহিনি এই শস্যপ্রাণ দেবতা ও তার পবিত্র সঙ্গিনীর কাহিনি। বাঙালির নিজস্ব পুরাকথা—মহাকাব্য। মৌখিক মহাকাব্য oral epic-এর রচয়িতা কোনো ব্যক্তি কবি নন, গোটা বাঙালি সমাজ।[২১]

দেবসভায় নৃত্য-গীত পরিবেশনে বেহুলা দেবতাদের তুষ্ট করেছে। তার রূপ ও অপূর্ব নৃত্যভঙ্গিমায় মহাদেব শুধু তুষ্ট হননি, মুগ্ধ চিত্তে তাকে কামনাও করেছেন। বিজয় গুপ্তের 'পদ্মাপুরাণ'-এ এই অভিব্যক্তির চিত্র আছে—

নানাগতি করে বেহুলা কটাক্ষ সন্ধান।
কামে মোহিত হৈল মহাদেবের প্রাণ॥...
ভাবিয়া দেখিলাম আমি তোমার গতি নাই।
যৌবন দান কর মোরে ভজ মোর ঠাঁই॥[২২]

পিতৃতুল্য ব্যক্তির কন্যাস্থানীয়ার প্রতি এই কামনা 'electra complex',—শিবের বেহুলার প্রতি আচরণে যার প্রকাশ লক্ষ করি। কিন্তু শিব শুধু বেহুলাকে নয়, নিজের কন্যা মনসাকেও কামনা করেছেন, অবশ্য তাঁকে কন্যা বলে চিনতে না পেরে। মনসার সমস্যা তিনি অযোনীসম্ভবা। সমাজে মাতৃত্ব নিয়ে কোনো সমস্যা না থাকলেও পিতৃত্ব বা পিতৃপরিচয় নিয়ে একটা সমস্যা থেকেই যায়। তাই সেই ব্যাপারটা সুনিশ্চিত করার তাগিদও মেয়েদের মধ্যে কম থাকে না। লখিন্দরের জন্মের পূর্বেই চাঁদ সদাগর সন্তানসম্ভবা স্ত্রীকে গৃহে রেখে বাণিজ্যে বেরিয়ে পড়ে। ক্ষেমানন্দের কাব্যে দেখি সনকা চাঁদের যাত্রার পূর্বে তাকে অত্যন্ত স্পষ্টভাবে শুনিয়ে রেখেছে—

হের করি নিবেদন মোর ভদ্রাভদ্র শুন
পঞ্চমাস আমি গর্ভবতী।[২৩]

বিজয় গুপ্তের কাব্যে সনকা চাঁদকে দিয়ে পত্র লিখিয়ে নিয়েছে—

লিখিয়া দিবা মোরে পত্র একখানি।
লোকে যেন নাহি বলে দ্বিচারিণী॥...
পত্র লিখিও নানা হেতু।
মাঘ মাসের পাটন আশ্বিন মাসের ঋতু॥[২৪]

কিন্তু তা সত্ত্বেও গৃহে ফিরে সুদর্শন লখিন্দরকে দেখে চাঁদ সনকার চরিত্র সম্বন্ধে সন্দিগ্ধ হয়ে ভেবেছে—

মিছামিছি দোষী আমি লঘুজাতি কানি।
সোনেকার পাপেতে পুড়িয়া মরি আমি॥[২৫]

আর সেই সময় চাঁদের স্বহস্তে লিখিত পত্রই সনকার রক্ষাকবচ হয়েছে—

যেইকালে যাও প্রভু করিতে সফর।
পঞ্চমাস গর্ভ ছিল আমার উদর॥
সুবুদ্ধি মাসী ভাল যুক্তি দিল মোরে।
লিখন লিখিয়া দিলা সবার ভিতরে॥[২৬]

লক্ষণীয় যে, বিজয় গুপ্ত ও ক্ষেমানন্দ উভয়ের কাব্যেই সনকাকে পাঁচমাস গর্ভবতী বলা হয়েছে। উদ্ধৃত অংশে চাঁদের ব্যবহারে সামন্ততান্ত্রিক সমাজব্যবস্থায় পুরুষতন্ত্রী মনোভাবের প্রকাশ ঘটেছে। এই মানসিকতার পরিচয় লখিন্দরও দিয়েছে ছ-মাস একাকী

পথপরিক্রমারত বেহুলার সতীত্ব সম্বন্ধে সন্দিগ্ধতার প্রকাশ ঘটিয়ে। বিজয় গুপ্তের 'পদ্মাপুরাণ'-এ লখিন্দরের এই স্বার্থপর পুরুষবাদী ভাবনার পরিচয় আছে। বেহুলার জন্যই প্রাণ ফিরে পেয়ে সে বেহুলার প্রতিই সন্দেহের তীর নিক্ষেপ করেছে—

মনসুখে একেশ্বর ভ্রমে ছয়মাস।
হেন নারী ঘরে নিলে লোক করিবে উপহাস।।[২৭]

সুতরাং লোক বা লোকসমাজই লখিন্দরের চিন্তার কারণ। সমগ্র 'মনসামঙ্গাল'-এ লোকসমাজ ও লোকপ্রবাদের প্রসঙ্গা একাধিকবার এসেছে। তবে নারীর সতীত্ব বা পিতৃপরিচয়ের আলোচনায় মনে রাখতে হবে, মনসামঙ্গালে মনসা বা নেতার জন্ম কিম্বা মনসার নাভিস্থলে জরৎকারুর হস্তস্পর্শে আস্তিকের জন্ম ইত্যাদি ঘটনায় রূপকথার প্রসঙ্গা জড়িয়ে আছে। রূপকথার গল্পে দেখি নিঃসন্তান বা অপুত্রক রাজা পূজা, যজ্ঞ ইত্যাদির দ্বারা সন্তান লাভ করেছেন, কিম্বা শিকড়-বাকড় বা মন্ত্রপূত জল খেয়ে রানিরা পুত্রবতী হয়েছেন। অর্থাৎ এই অলৌকিকতার বিস্তার রূপকথা—লোককথার খুব সাধারণ বিষয় ছিল। মনসামঙ্গালে অলৌকিক ঘটনার প্রভাব আরও আছে বেহুলার ভাসানযাত্রার বর্ণনায়। সেখানে মনসার শ্বেতকাক বেশে আগমন এবং তার 'বিপরীত বাণী' লোকসংস্কারই শুধু নয়, মানবেতর প্রাণীর উপর মানুষের বৈশিষ্ট্য আরোপে রূপকথাধর্মিতার প্রকাশ ঘটেছে। রূপকথা, পুরাকথায় পশু-পাখিরা মানুষের মতো আচরণ, বাক্যালাপ ইত্যাদি করে থাকে। প্রাচীনকালে পাখির মাধ্যমে বার্তা পৌঁছে দেওয়ার বাস্তব ভিত্তিও ছিল। ক্ষেমানন্দের কাব্যে বেহুলার অনুরোধে তারই প্রকাশ দেখি—

শুন শুন শ্বেত কাক। আমার মিনতি রাখ।
তোমার চরণে পড়ি। চল মোর বাপ-বাড়ী।।[২৮]

মনসার বাহন সাপেদের উপরও মানবত্ব আরোপিত হয়েছে যখন স্বামীর প্রাণরক্ষায় সারারাত অতন্দ্র প্রহরায় থেকেছে বেহুলা এবং লোহার বাসরকক্ষে ছিদ্রপথে প্রবিষ্ট এক একটি সাপকে 'খুড়ো', 'জ্যেঠা', 'দাদা' বলে সম্বোধন করেছে ও তাদের কাঞ্চনের পাত্রে দুধ-কলা খেতে দিয়েছে। সাপকে কাঁচা দুধ-কলা খাওয়ানো অতি প্রাচীন প্রথা বা সংস্কার হিসেবে আজও লোকসমাজে প্রচলিত আছে—যদিও সাপের লেহন বা চর্বণ-ক্ষমতা কোনটাই নেই। কেতকাদাসের 'মনসামঙ্গাল'-এ এই অংশের চমৎকার বর্ণনা আছে—

কপাটের আড়ে দেখি ভুখল ভুজঙ্গা।
চমকিত বেহুলার বহিল তরঙ্গা।।
ব্যথিত হইয়া বলে মধুর বচনে।
কাঞ্চনের বাটি দিল কাঁচা দুগ্ধ সনে।।
বেহুলা কহিল খুড়া কোথা আছ তুমি।
তোমা সভা না দেখিয়া নিত্য কান্দি আমি।।[২৯]

তবে সাপের খাদ্য দুধ-কলা—এই বিশ্বাসের মূলে লোক-প্রচলিত যে বিশ্বাস বর্তমান, তার উৎস কি নিহিত আছে গরুড় পুরাণে? সেখানে মনসাপূজার নৈবেদ্যে দুগ্ধজাত ক্ষীর প্রদানের কথা বলা হয়েছে, কারণ ক্ষীর সর্পবিষ নষ্টকারী। মনসা লখিন্দরের বাসরে যে

অষ্টনাগকে পাঠিয়েছিলেন তারা হল—অনন্ত, বাসুকী, পদ্ম, মহাপদ্ম, ভক্ষক, কুলীর, কর্কট ও শঙ্খ। বেহুলা স্বামীর নিষ্প্রাণ দেহ নিয়ে কলার ভেলায় একের পর এক গ্রাম-অঞ্চল-জনপদ ছাড়িয়ে ভেসে গেছে দূরে। তার এই যাত্রার চিত্রে গ্রাম্য প্রকৃতির বাস্তব বর্ণনা জীবনানন্দের কবিতার মতো কোনো শ্যামল-স্নিগ্ধ জীবনের আশ্বাস বহন করেনি, বরং তাতে যাত্রাপথের কাঠিন্য ও দুর্গমতা প্রকাশিত—

বনে বনচারী শার্দূল কেশরী
শশক হরিণ চরে।[৩০]

তবে বেশ কিছু স্থান-নাম এই যাত্রার বিবরণে উঠে আসে, যা এই কাব্যের লোক-জীবনচারী প্রবণতাই ব্যক্ত করে। পথে হিংস্র-পশু ও মানুষের আদিম প্রবণতা—সবই বেহুলা জয় করতে করতে গেছে। বিজয় গুপ্তের কাব্যে দেবীর ছলনার দ্বারাও বিড়ম্বিত হয়েছে বেহুলা—

পদ্মাবতী বলে নেতা সমুদ্রকূলে যাও।
ব্যাঘ্ররূপে ধরিয়া লখাইর অস্তি খাও।।[৩১]

তথাপি বেহুলা আপন সংকল্পে স্থির থেকেছে। তার এই কষ্টসাধ্য-প্রচেষ্টার মধ্যেও উর্বরাশক্তি বা সৃজনীশক্তির পরিচয় নিহিত আছে। নারীর কুলরক্ষা তো এক অর্থে তার উর্বরাশক্তিরই পরিচায়ক। সে তার সতীত্ব, পতিনিষ্ঠা ইত্যাদির দ্বারা এবং সন্তানের জন্ম দিয়ে শ্বশুরকুলের শ্রীবৃদ্ধি ঘটায়। লখিন্দরের জীবন-লাভে যা সম্ভব হয়ে উঠেছে। এই বেহুলার কথা আমাদের লোকসংস্কৃতির সঙ্গো মিশে আছে। মনসামঙ্গালে লোকজীবনের নানা উপাদানের মধ্যে একান্তই নারী জীবনকেন্দ্রিক দু-একটি প্রসঙ্গোর উল্লেখ করা যেতে পারে। প্রথমত, মনসা, চণ্ডী বা শিব—এঁরা দেবতা হলেও সাধারণ মানুষের মতোই আচরণ করেছেন। শিবের কামব্যাকুলতা, অন্ত্যজ ডোম রমণীর প্রতি লুব্ধতা এই চরিত্রটিকে একান্তভাবে লৌকিক করে তুলেছে। বিজয় গুপ্ত আবার ডোম রমণীর হাতের রান্না খেয়ে উল্লসিত শিবের নৃত্যরত চিত্রও এঁকেছেন। শিবের ডোমনী-বিলাস তাঁর অস্পৃশ্য নারীসঙ্গা 'কোচনী-বিলাস'-এর অন্তর্গত বলেই মনে হয়। এই ঘটনা গৌরীকে স্বভাবতই ক্ষুব্ধ করেছে। তাঁর ক্ষোভ-প্রকাশক উক্তিগুলি বিজয় গুপ্তের কাব্যে প্রকাশিত হয়ে নারীর মুখের বিশেষ ভাষাবৈশিষ্ট্য ও বাচনভঙ্গিকে ফুটিয়ে তুলেছে—

হাতে হাতে কচালে দেবী দন্ত কড়মড়
অতি কোপে বলে দেবী ক্ষে যা রে ভাঙ্গড়।।[৩২]

মনসাকে সতীন সন্দেহে চণ্ডী তাঁর সঙ্গো যেভাবে কলহে লিপ্ত হয়েছেন তাতে তাঁদের চরিত্রে কলহপরায়ণ বঙ্গাললনার বৈশিষ্ট্য প্রকাশ পেয়েছে—

আমরা সতিনী হইয়া কালিনী
আইলি আমার ঘরে।[৩৩]

আর এরপর—

দাহন-অঙ্গারে দেবী মনসারে
বামচক্ষু কৈল অন্ধ।

তাঁর এই দুর্ব্যবহার ও অন্যায় আচরণের প্রতিশোধ গ্রহণের সুযোগ পেয়েছিলেন মনসা সমুদ্রমন্থনে উত্থিত গরলপানে শিবের চেতনা হারানো এবং পার্বতীর সহমৃতা হওয়ার সময়। পিতার মৃত্যু-সংবাদ শুনে কার্তিক-গণেশের মুখের ওপরই বলেছেন—'ভাল হৈল মৈল বাপ খাইয়া গরর।'[৩৪] পিতার মৃত্যুতে দেবীর একটাই লাভ—

যত দুঃখ দিল মোরে কালিনী সতাই॥...
কহিতে সেসব কথা বাড়ে শোকানল।[৩৫]

তবু নারদের অনুরোধে শিবের কাছে এসেছেন দেবী; আর সেই সময় চণ্ডীকে উচিত শিক্ষা তিনি দিয়েছেন—

চণ্ডিকা পুড়িতে যান জলন্ত আনলে।
মনসা ঠেলিয়া তারে পেলে হেনাকলে॥
অঙ্গার দাহনে সতা মোরে কৈল অন্ধ।
শুধিব পূর্বের ধার বিধির নির্বন্ধ॥[৩৬]

ফলে মনসার প্রতিহিংসা চরিতার্থতার উন্মাদনায়, 'রহিল চণ্ডীর পৃষ্ঠে চিহ্ন চিরকাল।।'[৩৭] চণ্ডী-মনসার বিবাদের জের পুনর্বার লক্ষিত হয় মনসার বিবাহে পার্বতীর নানাভাবে সমস্যা তৈরির চেষ্টায়। নারদ ও শিবের কথোপকথনের মাঝখানে চণ্ডী অকস্মাৎ বলে ওঠেন—

পাতাল-কুমারী বর নাঞি চলাচলে॥...
জন্মের নাহিত স্থিতি, কেবা মতা-পিতা।
ভিখারী ভাঙ্গার কহে আমার দুহিতা॥[৩৮]

চণ্ডীর এই মন্তব্যে স্বামী ও পদ্মাবতী দু'জনেই শ্লেষবিদ্ধ হয়েছেন। আবার মনসার বিবাহের দিন 'পিঠালি বেটে' মণ্ডূক তৈরি করে সাপেদের উত্তেজিত করেছেন দেবী—

চণ্ডীর কৌতুক দেখিয়া মণ্ডূক
ভুজঙ্গ উঠিল গর্জ্জ্যা।[৩৯]

নারীর প্রতি নারীর এই বিদ্বেষচিত্র প্রায় প্রতিটি মঙ্গলকাব্যেই লক্ষ করা যায়, মনসামঙ্গলে যা দেব-চরিত্রের ক্ষেত্রে বিশেষ মাত্রা পেয়েছে। তবে এগুলি সবই নারীর মনস্তত্ত্বের উপর প্রতিষ্ঠিত। যার মধ্য দিয়ে লোকসমাজ ও সমাজ-মানসের সংকট-সমস্যা প্রাধান্য পেয়েছে। দেব-দেবীর চরিত্রের মধ্য দিয়ে রূপায়িত হয়েছে অতি সাধারণ নর-নারীর জীবনচিত্র।

দ্বিতীয়ত, মনসামঙ্গলে মনসা ও বেহুলা অর্থাৎ ভক্ত এবং ভক্তদাসী উভয়ের বিবাহের বর্ণনা আছে। বিবাহ-প্রসঙ্গে প্রায় প্রতিটি মঙ্গলকবিই স্ত্রী-আচারের বিস্তৃত বিবরণ দিয়েছেন—যেগুলি দীর্ঘ-প্রচলিত লোকবিশ্বাস, প্রথা ও সংস্কারেরই রূপায়ণ। বিবাহ-অংশেও নারীর জীবন এবং তার মানসিকতার বিশেষ প্রকাশ ঘটেছে। যেমন 'নারীগণের পতিনিন্দা'

অংশটি। বিজয় গুপ্তর কাব্যে এই অংশটি বেশ চিত্তাকর্ষক। সেখানে শুধু স্ত্রীদের পতিনিন্দা নয়, তাদের অচরিতার্থ জীবনের বেদনাও রূপায়িত হয়েছে।

হেনকালে আসিল বুড়ি কয়জন।
বার্ধক্যে বিকল অঙ্গা বিগত যৌবন॥...
গেল গেল যৌবন মোর ছারখার হইয়া।
মোর আঁখির ঠার কেবা দেখেছ চাহিয়া॥[৪০]

মনসামঙ্গালে বিবাহ-প্রসঙ্গো নারীর বেশভূষা, অলংকার, প্রসাধন, বরযাত্রা প্রভৃতির যেমন বিস্তৃত পরিচয় আছে, তেমনি আছে পুরুষের (বরের) সাজসজ্জার বিবরণ। এছাড়া পুরোহিত, ঘটক, এয়ো প্রমুখ বিবাহের সঙ্গো যুক্ত পেশাভিত্তিক ও আচার সম্পাদনকারী কিছু চরিত্রের উল্লেখও লক্ষণীয়। কেতকাদাস বেহুলার সাজসজ্জা প্রসঙ্গো বলেছেন—

হরিদ্রা বাটিয়া দিল বেহুলার গায়।
নারায়ণ তৈল দিল তাহার মাথায়॥
সোনার চিরণি দিয়া আঁচড়িল কেশ।
বিবিধ বন্ধানে সভে করে তারা বেশ॥[৪১]

বিবাহের আচার-সংস্কার থেকে চলে যাওয়া যাক অন্য এক সংস্কার-প্রসঙ্গো। এই জাতীয় সংস্কার কু-সংস্কার হিসাবে আমাদের জীবনের পরতে-পরতে জড়িয়ে আছে। লক্ষ করার বিষয় এই যে, আমাদের অধিকাংশ সংস্কারের মধ্যে পরবর্তী সম্ভাব্য ঘটনার আভাস থাকে যা মূলত নিষেধাত্মক বা অকল্যাণকর কোনো ঘটনার ইঙ্গিতবাহী। অর্থাৎ একটি ঘটনা থেকে আর একটি ঘটনার সম্ভাবনাকে কুসংস্কাররূপে চিহ্নিত করে আমরা তার মধ্যে Anticipating Incident-এর প্রতিচ্ছবি প্রত্যক্ষ করি। যেমন বারবার হাই ওঠা, চোখ নাচা, অকারণে কণ্ঠহার ছিঁড়ে যাওয়া এগুলি অমঙ্গালসূচক। আবার চাঁদের বাণিজ্যযাত্রার সময় এই জাতীয় সংস্কারের উল্লেখ করে সনকা তাঁকে বাণিজ্যে যেতে যখন নিষেধ করে তখন এর সঙ্গো নিষেধমূলক (taboo) অনুরোধ মিশে যায়—

আজি নিশি দেখিলাম স্বপন বিকট।
যাত্রাকালে তোমার ভাঙ্গিল পূর্ণঘট॥
বেলা দুই প্রহরে শৃগালের কোলাহল।
এবার পাটনে গেলে মজিবে সকল॥
অষ্টমে রাহু তোমার নবম ঘরে জীব।
এবার পাটনে গেলে না রাখিবে শিব॥
সম্মুখে যোগিনী মাগে হাতে লয়ে থাল।
এবার পাটনে গেলে ঘটিবে জঞ্জাল॥[৪২]

এসব নিষেধ-বচন (Taboo) বিজয় গুপ্তের 'পদ্মাপুরাণ'-এ বিস্তৃতভাবে বর্ণিত হয়েছে। অপরপক্ষে ক্ষেমানন্দের কাব্যে সনকার উদ্বেগের বাস্তব ভিত্তিটিকেই লক্ষ করা যায়—

সলিলে সরণী   এ ভার তরণী

কেমনে বাহিয়া যাবে
লোকমুখে শুনি খায়্যা নোনা পানি
অধিক যন্ত্রণা পাবে॥[৪৩]

ক্ষেমানন্দ অবশ্য গরল পানে শিবের হতচেতন অবস্থার সঙ্গো সংশ্লিষ্ট চণ্ডী-কথিত কিছু সংস্কারের উল্লেখ করেছেন—

ভবানী বলেন আমি দেখি অলক্ষণ।
আঁখির পুতলী আজি নাচে ঘনে ঘন॥[৪৪]

শিবের মৃত্যুতে পার্বতীর সহমৃতা হওয়ার উদ্যোগে আবার সাধারণ লোকজীবনের প্রচলিত সামাজিক প্রথার প্রতিফলন দেখি। দেবতা ও মানুষে এখানে কোনো পার্থক্য নেই। বিজয় গুপ্তের 'পদ্মপুরাণ'-এ লখিন্দরের মৃত্যু হলে চাঁদ বেহুলাকে লখাই-এর সঙ্গো সহমরণে যাওয়ার কথা বলেছে। এ বিষয়ে সনকার প্রতি তার নির্দেশ—

বধূর ঠাঁই জিজ্ঞাস কর আছে কি সাহস।
লখাইর সঙ্গো পুড়িয়া মরুক ঘুচুক অপযশ॥[৪৫]

মঙ্গালকাব্যে দেবদেবীর ছলনার অন্ত নেই। মনসামঙ্গালও তার ব্যতিক্রম নয়। এই ছলনায় ছদ্মবেশ ধারণ একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছে। মনসা ও নেত একাধিকবার বহু বিচিত্র ছদ্মবেশ নিয়েছে। সেই তালিকায় মানুষ থেকে মানবেতর প্রাণী কেউই বাদ পড়েনি। ধন্বন্তরীকে বধ করার জন্য মনসা শেষ উপায় হিসাবে ওঝার পত্নী কমলার সঙ্গো সখ্যতা পাতিয়েছেন। 'সই পাতানো'র এই বিষয়টিও বহু প্রচলিত একটি লোককৃত্য। হুগলির আরামবাগে কয়েক বছর অন্তর-অন্তর মনসাপূজা উপলক্ষে মনসাকে সাক্ষী রেখে সয়লা বা সখ্যতা পাতানোর রীতি প্রচলিত আছে অনুষ্ঠানটির নাম 'সয়লা'।[৪৬] এই সয়লা স্থাপনের প্রসঙ্গাটি ক্ষেমানন্দের কাব্যে বেশ স্পষ্টভাবে উল্লেখিত হয়েছে। এই অংশে কমলাকে স্বামীর মৃত্যু-রহস্য জানার জন্য প্ররোচিত করে মনসা শ্বেতমাছি হয়ে তা জেনে নিয়েছেন। এছাড়াও তিনি শঙ্খচিল, শ্বেতকাক প্রভৃতির বেশ ধারণ করেছেন। এদের মানুষের মতো আচরণে লোককথার 'Animal Tale'-এর আভাস যেন পরিস্ফুট। অধ্যাপক আশুতোষ ভট্টাচার্যের মন্তব্যটি এক্ষেত্রে উদ্ধারযোগ্য বলে মনে করি—

> একটি উপজাতীয় লোককথায় শুনিতে পাওয়া যায় : 'in the beginning of things, men were as animals and animals as men.' (Folk-Lore, Lx 1949 p. 309)...[৪৭]
> 'এইভাবে উপকথার জগতে নরনারী ও পশুপাখী একাকার হয়ে বাস করছে।'

মনসামঙ্গালে লোককথা, লোকপুরাণ ও রূপকথার প্রচুর উপাদান লভ্য। ধন্বন্তরী নিজেই মৃত্যুর পর তার শির চারটুকরো করে চারদিকে পোঁতার যে নির্দেশ দিয়েছিল শিষ্যদের তা মনসার ছলনায় শেষপর্যন্ত সম্ভব হয়নি। দেবী ওঝার শিষ্যদের উদ্দেশে বলেছেন—

গুরু মহাজন তুল্য নারায়ণ
তাহারে কাটিব কেনি।।
যত ভাই মেলি অনুজ অঙ্গুলি

কাটিল সত্যের পাকে।
যতন সহিতে পরম পীরিতে
ঈশানে পুতিয়া রাখে॥[৪৮]

স্পষ্টই বোঝা যায় এই ঘটনায় রূপকথা ও লোকপুরাণের উপকরণ নিহিত আছে। 'মনসামঙ্গল'-এ ঘর-গৃহস্থালীর বর্ণনায় খাদ্য ও আহারের বিবরণ যেমন আছে, তেমনি আছে নানা লোক-খাদ্যের উল্লেখ। যদি পান্তাভাতকে লোকখাদ্য বলি তাহলে বোধহয় বিশেষ কোনো ভুল হয় না। চাঁদের ছয়পুত্রের প্রাণনাশের ষড়যন্ত্রে বিষতিয়া সাপ পান্তাভাতে বিষ উগরে দিয়েছে—'ওগারিল কালকূটি ওদন-ব্যঞ্জনে'।[৪৯] আর কলাপাতায় মৎস্যপোড়া দিয়ে পান্তাভাত খাওয়া শুধু লোকখাদ্য নয়, ঐটি একটি আঞ্চলিক লোকাচার। পুত্রদের মৃত্যু সংবাদে চাঁদ ভৃত্যকে বলেছে—

অবিলম্বে কাট্যা আন রামকলা-পাত।
মৎস্যপোড়া দিয়া আজি খাব পান্তাভাত॥[৫০]

ক্ষেমানন্দের কাব্যে লোকবাদ্যের বিশেষ পরিচয় আছে বেহুলার বিবাহ-অংশে। সেখানে মাদল, সানাই, মৃদঙ্গ, পিনাক, দন্ডিম প্রভৃতির উল্লেখ আছে। দেবসভায় বেহুলার নৃত্যে কাংস্য করতাল খয়ের কাঠের খোল ইত্যাদি বাদ্যযন্ত্রের পরিচয় পাই। লখিন্দরের জীবনলাভের পর পিত্রালয়ে যাওয়ার সময় বেহুলা চিপট মুড়কি, ঝাল নাড়ু, পাকাকলা, পানের বিড়া প্রভৃতি সঙ্গে নিয়েছে। কেতকাদাস নৌকা ও ভেলা ছাড়াও 'ঝাপান' নামক একপ্রকার লোকযানের কথাও বলেছেন। ঝাপান পালকির মতো—মনুষ্যবাহিত যান। কলার মান্দাসে স্বামীর মৃতদেহ নিয়ে নদীপথে ভাসার পূর্বে বেহুলা শাশুড়ীকে বলেছিল—

কড়ার তৈলেতে দীপ ছমাস জ্বলিবে।
তবে সে জানিবে মনে লখীন্দর জীবে॥
সিজানা ধান্যেতে যদি অঙ্কুর নিঃসরে
মরা পুত্র জীয়ন্ত বসিয়া পাবে ঘরে॥[৫১]

এসব আশাব্যঞ্জক উক্তি অলৌকিকতা নির্ভর। এগুলি সম্ভব হওয়ার পিছনে magical power-এর অস্তিত্ব নিশ্চয় থাকবে। রূপকথার গল্পে ফুলের গন্ধ শুঁকিয়ে, রক্ত বা মন্ত্রপূত জল ছিটিয়ে বা অন্য নানা উপায়ে পুনর্জীবনদানের গল্প প্রচলিত আছে এবং যদি তলোয়ারে মরচে ধরে, যদি বিশেষ কোনো বস্তু মলিন হয়ে যায়, যদি গাছে ফুল না ধরে বা মালার সব কটি ফুল শুকিয়ে যায় ইত্যাদি নানা শর্তের উল্লেখে মঙ্গাল-অমঙ্গালের নির্দেশ রূপকথার রহস্যময় অসম্ভাব্য জগতের পরিচয় উদ্‌ঘাটিত করে, যার সঙ্গে লখিন্দরের মৃত্যুর পর বেহুলার কাহিনির উক্ত অংশের প্রচুর সাদৃশ্য আছে। এসবই লোকবিশ্বাস যা ধারণ করে আছে লোকসমাজ (Folk Society)।

'মনসামঙ্গল' ও 'চণ্ডীমঙ্গল' উভয় কাব্যেই বাণিজ্যযাত্রার উল্লেখ আছে এবং বাণিজ্যে পণ্য হিসাবে গৃহীত বস্তুগুলি সেই স্থানে তা প্রাপ্তির প্রতুলতার উপরই সাধারণভাবে

নির্ভরশীল হয় বলে কৃষিনির্ভর বঙ্গাদেশে কৃষিজ বস্তুই মূলত বাণিজ্য-সম্ভারে স্থান পেয়েছে। আছে বিভিন্ন স্থানের উল্লেখ। চাঁপাতলা পেরিয়ে বাঁকা দামোদর ঘুরে বর্ধমান, দেপুর, নোয়াদা, বৈদ্যপুর প্রভৃতি স্থান ছুঁয়ে চাঁদের সপ্তডিঙা এগিয়ে চলেছে। ত্রিবেণী, নবহট্ট, কুমারহট্ট, ভাটপাড়া, মুড়াজুলি, কালীঘাট, বেতড় ছাড়িয়ে ডিঙা নীলাচলে পৌঁছেছে। শেষপর্যন্ত কালীদহে তা দেবীর ছলনায় প্রবল ঝঞ্ঝার মধ্যে পড়েছে। এই বাণিজ্যে বস্তুবদল বা বিনিময় প্রথাই মূলত প্রচলিত ছিল। কিছুটা অসঙ্গাতিপূর্ণ হলেও বিজয় গুপ্ত বাণিজ্যদ্রব্য ও বস্তুবদলের বিস্তৃত এবং চিত্তরঞ্জক বর্ণনা দিয়েছেন। ক্ষেমানন্দ চাঁদের বাণিজ্য-তরণী ডুবে যাওয়ার চরম সংকট মুহূর্তে বাঙাল মাঝিদের পোস্তর বস্তা ভেসে যাওয়ার বিলাপের বর্ণনা দিয়ে হাস্যরস সৃষ্টি করেছেন যার অভিনবত্ব নিয়ে সন্দেহের অবকাশ নেই—

পোস্ত-হোলা ভাস্যা গেল, ছাকনার কানি।
আর বাঙ্গাল বলে গেল ছিড়া কাথাখানি॥[৫২]

এখানে বাঙ্গাল-মাঝির মুখের ভাষাটিও চমৎকার ফুটিয়ে তুলেছেন কবি, তাতে বাস্তবতার ও স্বাভাবিকতার মাত্রাটি স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। বিভিন্ন চরিত্রের মুখের ভাষা প্রচলিত লোকাচার রীতি-নীতির পাশাপাশি এই কাব্যে ব্যবহৃত বহু প্রবাদ বা প্রবাদপ্রতিম বাক্যও উল্লেখের অপেক্ষা রাখে—

১. শ্রীরাম-তুলসী জন্ম
শুনিলে রাঢ় এ ধর্ম।
২. গয়া গঙ্গা বারাণসী মথুরা প্রয়াগ কাশী
যত তীর্থ আছে ত্রিভুবনে।
৩. সূর্যের কিরণ নাশে শরীরের বর্ণ
কুমারের চক্র আঁখি উভ দুই কর্ণ॥
৪. গহনে গমন যার নাঞি চিরকাল।
ব্যাঘ্র ভল্লুক গণ্ডা চলে পালে পাল॥
৫. মোর ভাঙ্গা ঘর গোটা
চৌদিগে মৎস্যের কাঁটা।
৬. ভাঙ্গিলে সোনার পাত্র পুনু গড়া যার মাত্র
ভাঙ্গিলে না গড়া যায় মন।
৭. বিধি বাম হয় যাকে
দুঃখ পায় নানা পাকে।
৮. রক্তমাংস যেই ধরে রোষে ফোঁসে কলেবরে
জ্ঞানভঙ্গা হয় যেই জন॥
৯. দেবতার বচনে সকল হয় লয়।
দেবতার শত্রু চিরকাল নাঞি রয়।
১০. ইচ্ছায়-অনিচ্ছায় যেবা অগ্নি করে হাথে।
বিদ্যমানে দেখ হস্ত পোড়া যায় তাথে॥

১১. রাবণ ধরিয়াছিল জানকীর কেশে।
সীতার শাপেতে রাজা মরিল সবংশে॥
১২. কালসর্প ধরে যেবা হয়্যা মন্ত্রহীন।
দেবতা তাহারে বৈরী, তার দিন ক্ষীণ॥
১৩. জ্ঞানহত পুরুষের কোন্ কার্য জীবনের
নয়ন থাকিতে সেই অন্ধ।
১৪. গুরু মহাজন
তুল্য নারায়ণ
১৫. গুরু মহাজন ব্রহ্ম সনাতন
গুরুর গরিমা শক্তি।
১৬. সেই বড় ধর্ম্ম ঃ সভারপর কর্ম্ম ঃ যে করে গুরুরে ভক্তি।
১৭. দেখিয়া শুনিয়া মনে বাড়িল উল্লাস।
হাথ বাড়াইয়া যেন পাইল আকাশ॥
১৮. মেঘে হব অল্প জল বৃক্ষ হরিবেক ফল
ব্রাহ্মণ শূদ্রেতে হব ঘর।
১৯. কলিযুগ অন্তকালে ক্ষিতি যাব রসাতলে
না থাকিবে চন্দ্র সূর্য তারা॥
২০. গঙ্গাজল পরশিলে পাপ দুঃখ ঘুচে।

এখানে পুরাণকেন্দ্রিক, পারিবারিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক অবস্থা এবং অবস্থান-কেন্দ্রিক, ধর্মীয় ও মনস্তত্ত্বমূলক এবং ভবিষ্যৎ ঘটনার সম্ভাবনাসূচক বিভিন্ন প্রবাদের ব্যবহার লক্ষণীয়। 'চণ্ডীমঙ্গাল'-এ নিদয়ার সাধভক্ষণের মতো ক্ষেমানন্দের 'মনসামঙ্গাল'-এও সনকার সাধভক্ষণ থেকে শুরু করে লখিন্দরের জন্ম, বিধাতা কর্তৃক লখাই-এর ভাগ্যলিখন, ষষ্ঠীপূজা, অন্নপ্রাশন সবই বর্ণিত হয়েছে। তবে সনকার সাধভক্ষণের খাদ্য-তালিকা নিদয়ার মতো নয়। এখানে নেউল পোড়া ও চিঙড়ির বড়ার পরিবর্তে সনকা সুমিষ্ট পায়েস ও ঘি দিয়ে সাঁতলানো শাক ইত্যাদি খেয়েছে। বলাবাহুল্য, এই দু'টি আহার্য তালিকার বৈপরীত্য অন্ত্যজ ও অভিজাত সমাজের আহার-বিহার, আচার-আচরণগত পার্থক্যকে পরিস্ফুট করেছে, যার সমাজ-অর্থনীতিগত মূল্য অনস্বীকার্য।

একথা আমাদের সকলেরই জানা যে, মনসা প্রাথমিক পর্যায়ে পূজা পেতেন অনার্য, অন্ত্যজ বা নিম্নবর্গীয় সমাজে এবং নারীমহলে। মনসা নামক নারী-দেবতার পূজায় কোনো বাধা ছিল না। 'মনসামঙ্গাল'-এ মনসাপূজার বিধি-পদ্ধতির কথাও বলা হয়েছে। দেবীর ছলনায় জালু-মালুর জালে মনসার বারা বা ঘট উঠলে জালু তা সাধারণভাণ্ড বা ভাঁড় বলে মনে করে জননী নিছনিকে নিয়ে গিয়ে দেখায়। কেতকাদাস লিখেছেন, 'নিছনি জালুর মাতা চিনিলেক বারি।'[৫৩] তারপর সে—

পূজিব পূজিব মনে মনসাকুমারী।
মনসার বারা লয়্যা গেল অন্তঃপুরী॥

আতব তণ্ডুল কলা নানা আয়োজন।
আখণ্ড সিজের ডাল করিয়া রোপণ॥
ধূপধনা নৈবেদ্য খাজুর তালফল।
গঙ্গাজল তুলসী বাঙন নারিকেল॥[৫৪]

সমগ্র বাংলাদেশের মধ্যে রাঢ়ভুমির অন্তর্গত বীরভুমের সর্বত্র মনসাপূজা করা হতো ঘট স্থাপন করে। নিম্নশ্রেণির মানুষের বাড়িতে মাটির দেয়াল দেওয়া 'খড়ো ঘরে' মৃত্তিকা নির্মিত ঘট প্রতিষ্ঠিতরূপে দেখা যায়। ঘটের মাথায় পূজারী রোজ একটি সিজ-মনসার ডাল এনে স্থাপন করেন। ঘটের গায়ে কতকগুলি সর্পফণা গড়ে তোলা হয়। দশহরা, শ্রাবণ-সংক্রান্তি, ভাদ্র-সংক্রান্তি ও নাগপঞ্চমীতে মহাসমারোহে পুজো হয়। ব্রাহ্মণ পুরোহিতরাই এই পূজা করেন।[৫৫] বিজয় গুপ্তের 'পদ্মাপুরাণ'-এ 'হাসান-হুসন পালায়' হাসানের মনসা-পূজায় ব্রাহ্মণ পুরোহিতকেই পূজা করতে দেখি—"ব্রাহ্মণে পূজে ঘট প্রণাম করে কাজি।।"[৫৬] জাল-মালুর বৃত্তান্তে অন্ত্যজ জেলেদের জীবনের বেশ কিছু বিস্তৃত চিত্র আছে। সেই চিত্রে তাদের জীবিকা, সামাজিক ও অর্থনৈতিক অবস্থান, ধর্মীয় বিশ্বাস ইত্যাদি নানা বিষয় স্থান পেয়েছে। এই অংশে অনেক-অনেক মৎস্যের নামও পাওয়া যায় যা মৎস্যজীবীদের মৎস্যকেন্দ্রিক জীবনযাপনের সঙ্গে মানানসই—

অগাধ সলিলে পেলিল জাল।
ধরিল মদ্‌গুর শকুল শাল॥...
ন্যাঠা চিতি ধরে খয়রা কই।
ধানচাকু মাছ ধরিয়া লই॥[৫৭]

এছাড়া কাতলা, ভেটকি, সরল পুঁটি, রুই, মৃগেল, পাবদা প্রভৃতি মাছেরও উল্লেখ আছে। প্রকৃতপক্ষে, শুধু মনসামঙ্গল বা কেতকাদাস ক্ষেমানন্দের মনসামঙ্গল নয়, প্রায় প্রতিটি মঙ্গলকাব্যই লোকজীবনের নানা উপাদান-উপকরণে পূর্ণ। সাহিত্য জীবন-নির্ভর— আর যে সাহিত্যের লেখক, কথক, গায়ক, শ্রোতা সকলেই লোক-সাধারণ, সেখানে লৌকিক উপাদানে কাব্য পূর্ণ থাকাই স্বাভাবিক। মঙ্গলকাব্য যেসব মঙ্গল দেবদেবীর কাহিনি-কেন্দ্রিক তাঁদের উৎপত্তিও সাধারণ লোকস্তর এবং লোক-মানস থেকে, সেখানেই তাঁদের পূজা প্রচলিত। সর্পদেবী মনসার পূজা অনার্যধর্ম সম্ভূত মাতৃকা পূজা বা শক্তিপূজা (Cult of Mother Goddess)। এ-প্রসঙ্গে মনসামঙ্গাল কাব্যের উপস্থাপনাতেও (সব মঙ্গালকাব্যের ক্ষেত্রেই একথা প্রযোজ্য) লোকরীতির বৈশিষ্ট্য-সন্ধান করা যায়। বীরভূমে সুবর্ণবণিকদের বিবাহ অনুষ্ঠানে 'গাছবেড়া' নামক লৌকিক আচারকে কেন্দ্র করে কয়েকদিন ধরে প্রতি সন্ধ্যায় মনসামঙ্গাল গাওয়া হয়; মূল গায়েন এবং দু'জন খোল ও দু'জন মন্দিরা-বাদক—মোট পাঁচজন দলে থাকেন, বাদক চারজন দোহারে অংশ নেন। বাংলায় সর্পদেবী জাঙ্গুলীর মতো দাক্ষিণাত্যেও বিভিন্ন নামীয় সর্পদেবীর অস্তিত্ব ছিল এবং এখনও আছে। 'জাঙ্গুলী' শব্দটি জঙ্গাল বা বন থেকে উদ্ভূত। অন্ধ্রপ্রদেশের বিশাখাপত্তনম্ থেকে শুরু করে নেলোর প্রভৃতি জেলায় নিম্নশ্রেণির লোকদের মধ্যে নাগম্মা-কাহিনি প্রচলিত আছে। পুতুলনাচ সহযোগে

নাগাম্মার মাহাত্ম্যসূচক কাহিনি গান করে অন্ধ্রপ্রদেশের এক শ্রেণির ব্যবসায়ী জীবিকা অর্জন করেন। যদিও এর সঙ্গে বাংলার মনসা-কাহিনির যোগ নেই।[৫৮]

মধ্যযুগের সব কাব্যের মতো মনসামঙ্গলও ছিল গেয়। এর শ্রোতা ছিল সাধারণ জনসমাজ। মনসামঙ্গল গান পরিবেশিত হতো আট দিন ধরে। এর উপস্থাপনরীতি ছিল সম্পূর্ণ পাঁচালির মতো। কিছু অংশ আবৃত্তিও করা হতো। গানের সঙ্গে মৃদঙ্গ, ঢাক ইত্যাদি বাজানো হতো। এখানে নৃত্যেরও স্থান ছিল। শিকলি বা ছিকলির ছন্দে পদ বা পয়ারের মাঝে লাচারি প্রয়োগ করে নাটকীয়তাও আনা হতো মনসামঙ্গালের গানে। মঙ্গল-পাঁচালি প্রকৃত অর্থে 'সঙ্গীত নাট'। এই 'সংগীত নাট' শুরু হওয়ার আগে দেবী বা দেবতার ঘট স্থাপন করা হতো, যার দ্বারা ভক্তির আবহ রচনা করা হতো। বন্দনা বা নিবেদনের মধ্য দিয়ে ধীরে ধীরে পালা-গায়েন মূল বিষয়ে প্রবেশ করতেন। মনসামঙ্গালের সঙ্গে 'ভাসান' কথাটি যুক্ত। লখিন্দরের মৃতদেহ নিয়ে কলার মান্দাসে বেহুলার ভেসে যাওয়াই হল 'ভাসান'। তাই একে 'ভাসান গান'ও বলে। আগেই বলেছি, মনসামঙ্গল পাঁচালির রীতি-পদ্ধতি এমনভাবে পরিবেশিত হতো যার দ্বারা একটি নাট্যব্যাপার স্পষ্ট হয়ে উঠতো। কেউ কেউ মনে করেন পাঁচালি গীত নয়, গীতাভিনয় আবার কারো মতে পাঞ্চালিকা হল পুতুলনাচের সঙ্গে নৃত্যগীতাভিনয়। এই পাঁচালির পরিবেশনরীতির পাঁচটি অঙ্গ নির্দেশ করা যায়—

১. পা-চালী অর্থাৎ পদচালনাপূর্বক ঘুরে ঘুরে গান।
২. ভাবকালি বা হাবভাব সুরসহ পদের ব্যাখ্যা।
৩. নাচাড়ি কে নৃত্যসংযোগে আবৃত্তি ও গান বলা যায়।
৪. বৈঠকী হল উপবেশনপূর্বক সংগীতালাপ এবং
৫. দাঁড়া কবি—অর্থাৎ দাঁড়ানো অবস্থায় দোহারের সমবেত সঙ্গীত।[৫৯]

মোটকথা 'পাঁচালি' পুতুলনাচ বা গীতনাট্য যা-ই হোক না কেন, লোকজীবনের সঙ্গে তা একান্তভাবে সম্পৃক্ত। এগুলি সবই আমাদের প্রাচীন লোকসংস্কৃতির অঙ্গ। তাই 'মনসা-মঙ্গল' কাব্যের দেব-চরিত্র কল্পনা থেকে শুরু করে পরিবেশন পদ্ধতি পর্যন্ত সবক্ষেত্রেই লোক-উপাদান ও লোক-ঐতিহ্যের নিবিড় উপস্থিতি লক্ষণীয়।

উৎসের সন্ধানে

১. ড. ক্ষেত্র গুপ্ত : 'বাংলা সাহিত্যের সমগ্র ইতিহাস', ২০০৫ পৃ. ৭১
২. ড. আশুতোষ ভট্টাচার্য : 'বাংলা মঙ্গালকাব্যের ইতিহাস', ৭ম সং, ১৯৮৯ পৃ. ১২১
৩. তদেব, পৃ. ৪১৯
৪. তদেব, পৃ. ১২৬
৫. অক্ষয়কুমার কয়াল ও চিত্রা দেব সম্পাদিত : 'ক্ষেমানন্দের মনসামঙ্গল', ১৩৮৪ পৃ. ১৬৬
৬. তদেব, পৃ. ১৬৭
৭. ড. আশুতোষ ভট্টাচার্য : 'বাংলা মঙ্গালকাব্যের ইতিহাস', পৃ. ১২৪

৮. মনসামঙ্গাল : তদেব, পৃ. ১৮৭
৯. তদেব, পৃ. ১৮৭
১০. তদেব, পৃ. ১৮০
১১. তদেব, পৃ. ১৫৬
১২. তদেব, পৃ. ২৭৭
১৩. ড. আশুতোষ ভট্টাচার্য : 'বাংলা মঙ্গালকাব্যের ইতিহাস', পৃ. ১২৪
১৪. কেতকাদাস ক্ষেমানন্দ : 'মনসামঙ্গাল', পৃ. ২৪৫
১৫. ড. আশুতোষ ভট্টাচার্য : 'বাংলা মঙ্গালকাব্যের ইতিহাস', পৃ. ১২৫-২৬
১৬. তদেব, পৃ. ১২২
১৭. কেতকাদাস ক্ষেমানন্দ : 'মনসামঙ্গাল', পৃ. ৮৭
১৮. তদেব, পৃ. ১৮
১৯. তদেব, পৃ. ২৬৯
২০. ড. অচিন্ত্য বিশ্বাস সম্পাদিত : 'বিজয় গুপ্তের মনসামঙ্গাল', পৃ. ২৩
২১. তদেব, পৃ. ৩০৮
২২. তদেব, পৃ. ৩০৮
২৩. 'কেতকাদাস ক্ষেমানন্দ : মনসামঙ্গাল', পৃ. ২২২
২৪. তদেব, পৃ. ২২৩
২৫. তদেব, পৃ. ২৪১
২৬. তদেব, পৃ. ২৪১
২৭. ড. অচিন্ত্য বিশ্বাস সম্পাদিত : ƒবিজয় গুপ্তের মনসামঙ্গাল', পৃ. ৩২২
২৮. 'কেতকাদাস ক্ষেমানন্দ : মনসামঙ্গাল', পৃ. ২৬১
২৯. তদেব, পৃ. ২৫৫
৩০. তদেব, পৃ. ২৬৯
৩১. ড. অচিন্ত্য বিশ্বাস সম্পাদিত : 'বিজয় গুপ্তের মনসামঙ্গাল', পৃ. ৩০১
৩২. তদেব, পৃ. ৯২
৩৩. 'কেতকাদাস ক্ষেমানন্দ : মনসামঙ্গাল', পৃ. ২০
৩৪. তদেব, পৃ. ৬৬
৩৫. তদেব, পৃ. ৬৭
৩৬. তদেব, পৃ. ৬৭
৩৭. তদেব, পৃ. ৬৭
৩৮. তদেব, পৃ. ৭৩
৩৯. তদেব, পৃ. ৭৯
৪০. ড. অচিন্ত্য বিশ্বাস সম্পাদিত : 'বিজয় গুপ্তের মনসামঙ্গাল', পৃ. ২৬৯
৪১. কেতকাদাস ক্ষেমানন্দ : মনসামঙ্গাল, পৃ. ২৫০
৪২. ড. অচিন্ত্য বিশ্বাস (সম্পাদিত) : বিজয় গুপ্তের মনসামঙ্গাল, পৃ. ২০৩
৪৩. 'কেতকাদাস ক্ষেমানন্দ : মনসামঙ্গাল', পৃ. ২২৩
৪৪. তদেব, পৃ. ৬২

৪৫. ড. অচিন্ত্য বিশ্বাস সম্পাদিত : 'বিজয় গুপ্তের মনসামঙ্গল', পৃ. ২৯২
৪৬. তদেব, পৃ. ৪৬
৪৭. ড. আশুতোষ ভট্টাচার্য : 'বাংলার লোক-সাহিত্য', প্রথম খণ্ড, পঞ্চম সং পৃ. ২৩৫
৪৮. কেতকাদাস ক্ষেমানন্দ : 'মনসামঙ্গল', পৃ. ১৮৭
৪৯. তদেব, পৃ. ১৮৭
৫০. তদেব, পৃ. ১৮৮
৫১. তদেব, পৃ. ২৬১
৫২. তদেব, পৃ. ২৩১
৫৩. তদেব, পৃ. ১৪৪
৫৪. তদেব, পৃ. ১৪৪
৫৫. ড. আশুতোষ ভট্টাচার্য : 'বাংলা মঙ্গলকাব্যের ইতিহাস', পৃ. ৩০৮
৫৬. ড. অচিন্ত্য বিশ্বাস সম্পাদিত : 'বিজয় গুপ্তের মনসামঙ্গল', পৃ. ৫৬
৫৭. কেতকাদাস ক্ষেমানন্দ : মনসামঙ্গল, পৃ. ১৪২
৫৮. ড. আশুতোষ ভট্টাচার্য : 'বাংলা মঙ্গলকাব্যের ইতিহাস', পৃ. ২৭২
৫৯. সেলিম আলদীন : 'মধ্যযুগের বাংলা নাট্য', বাংলা একাডেমী ঢাকা, ১৯৯৬, পৃ. ৭৭

বিজয় গুপ্তের মনসা : আত্মপ্রতিষ্ঠার ইতিবৃত্ত

অন্তরা মিত্র

খ্রিস্টীয় অষ্টাদশ শতাব্দীর ক্রীতদাসী রাবীয়া চাবুক আর শেকলে বাঁধা জীবনের যন্ত্রণায় ক্ষতবিক্ষত হতে হতেও লিখেছিলেন কতগুলি প্রতিবাদী 'মোনাজাত'—

> হে প্রভু আমার নরকের ভয় নাই, স্বর্গেরও আশা নাই আমি ঈশ্বরকে ভালোবাসিনা, কারণ তিনিই আমায় ভালোবাসেন। আমি শত শত যন্ত্রণা সহ্য করেও নারী হবার অধিকার ছাড়ব না, কারণ আমি জানি আমিই জল, আমিই অগ্নি, আমিই মৃত্তিকা, আমিই বায়ু আমার যন্ত্রণাই আমার প্রতিবাদ। এই প্রতিবাদই আমার ঈশ্বর প্রেম, আমার সৌন্দর্য।[১]

এই বিদ্রোহিনী চেতনা সময়ের শিরায় শিরায় বহমান হয়ে পঞ্চদশ শতাব্দীতে নারী স্তুতিবাদে পরিণত হয়েছে। কবি বিজয় গুপ্তের 'পদ্মাপুরাণ'-এ নতমস্তক চাঁদ সদাগরের শ্রদ্ধাঞ্জলিতে—

> নমোনমো জগৎমাতা সর্ব্বসিদ্ধিদায়িনী।
> তুমি বৃক্ষ তুমি মোক্ষ তুমি বিশ্বজননী।
> তুমি জল তুমি স্থল চরাচরবন্দিনী।
> সৃষ্টি স্থিতি প্রলয় তুমি তুমি মূলধারিনী।

কিন্তু এই প্রতিষ্ঠার পথ মসৃণ ছিল না। সেই প্রসঙ্গে প্রবেশ করার পূর্বে মনসার উৎপত্তি সংক্রান্ত ইতিহাসটা একটু ঝালিয়ে নেওয়া দরকার। তুর্কি বিজয়ের পর বাংলার সামাজিক জীবন অবৈদিক, অনার্য যে স্বর, তার সঙ্গে স্মার্ত বৈদিক পৌরাণিক আর্য স্তরের একটা সমন্বয় প্রয়োজন দেখা দেয়। ইসলামের প্রভাব প্রতিপত্তিকে রুদ্ধ করে হিন্দু ধর্মকে একটা সুস্থির চেহারা দেবার চেষ্টায় এই মিশ্রণ প্রক্রিয়ার সূত্রপাত। সমস্ত দেবদেবীকে নিয়ে নয় আমাদের আলোচনা শুধুমাত্র মনসার মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকবে। প্রাক্‌বৈদিক যুগেই মাতৃকাপূজা বিশেষভাবে প্রচলিত ছিল। সর্পদেবী মনসার পরিকল্পনা এই শক্তি পূজারই অন্যতম বিকাশ। বৃক্ষ ও সর্পের সঙ্গে উর্বরতাবাদ বা Fertility Cult-এর সম্পর্কটি অত্যন্ত স্পষ্ট। মনসা পূজার আবশ্যিক অঙ্গ স্নুহী বৃক্ষের উপস্থিতি। দেবীপুরাণে আছে—

> সুপ্তে জনার্দনে কৃয়ে পঞ্চম্যাং ভবনাঙ্গনে
> পুঁজয়েন্মনসাদেবীং স্নুহী বিটপ সংস্থিতাম-দেবীপুরাণ

প্রকৃতপক্ষে এটিও উর্বরতাবাদেরই অন্যতম প্রকাশক। বিজয় গুপ্তের মনসামঙ্গালে দেখি স্বয়ং মনসাই অনিরুদ্ধের ভ্রুণ সোনেকার উদরে প্রবেশ করাচ্ছেন—

অঞ্চল হইতে আইল অনিরুদ্ধের জীব।।
প্রত্যেক বলিয়া দেবী হস্তের মুষ্টি এড়ে।
বায়ুরূপে প্রবেশাল সোনেকার উদরে।।

রূপে ও স্বরূপে মনসার ওপর প্রভাব লক্ষ্য করা আছে বৌদ্ধতন্ত্রের দেবী জাঙ্গুলীর। তিনি পূর্ব ভারতের মহাযান সম্প্রদায়ের পূজিতা। এই জাঙ্গুলী 'বিষবিদ্যা'। ড. সুকুমার সেন বলেছেন—

> এই নাম পরে মনসাতে বর্তিয়াছে—জাগুলী... জাঙ্গালী বিষবিদ্যা বলিয়া বিষবৈদ্যের নাম হইয়াছিল 'জাঙ্গালিক' বা 'জাঙ্গালি'। জাঙ্গালী পরে মনসার সঙ্গো মিলিয়া যায়, তাই মনসার নামান্তরে হয় জাগুলি। মনসামঙ্গালের প্রাচীনতম কবি বিপ্রদাস 'জাগুলি' নামের লোক ব্যুৎপত্তি দিয়াছেন, জাঙ্গিয়া জাগুলি নাম সিজবৃক্ষে স্থিতি।[২]

ড. আশুতোষ ভট্টাচার্য এই জাঙ্গুলী দেবীকে অথর্ব বেদে উক্ত সর্পবিষনাশিনী দেবীর সঙ্গো তুলনা করেছেন। মহাযান বৌদ্ধ তান্ত্রিক সম্প্রদায়ের মধ্যে জাঙ্গুলী দেবীর যে ধ্যান মন্ত্রটি উল্লেখ করেছেন তাতে স্পষ্টতই তিনি বিষহরি মনসার সঙ্গো অভিন্ন—

কান্ত্যা কাঞ্চনসন্নিভাং সুবদনাং পদ্মাননাং শোভনাম্
নগেন্দ্রৈঃ কৃতশেস্মরাং ফনীময়ীং দিব্যাঙ্গারাগাল্মিতাম্।
চার্বক্ষীং দধতীং প্রসাদমভয়ং নিত্যং করাভ্যাং মুদা
বন্দে শঙ্কর-পুত্রিকাং বিষহরীং পদ্মোদ্ভবাং জাঙ্গুলীম্।

এই মনসার মধ্যে আছে নানা পশু পূজার ঐতিহ্য, যা, একসময় তার বাহন রূপ নিয়েছে। সর্প বা মাছ পুরুষ জননাঙ্গোর সঙ্গো উপমিত। ঘট মাত্রই উপমিত গর্ভবতী নারীর সঙ্গো। যর্জুবেদের যুগে সংগীত বিদ্যার মতো সর্পবিদ্যাও একটি অবশ্য পাঠ্য বিশেষ বিদ্যা ছিল। দেবী মনসার মধ্যে প্রাণদায়িনী এবং নৃত্যগীত বাদ্যের তুষ্টি এবং ধনদায়িনী সমস্ত রূপই লক্ষ্য করা যায়। বিজয় গুপ্ত এই সমস্ত বৈশিষ্ট্যকে স্বীকৃতি দিয়েছেন—

সুন্দর মণ্ডপ ঘরকরহ ত্বরিত।
নানাবিধ প্রকারে কর, নৃত্য-গীত।।
সকল রাখালে মিলি করে দিব্য ঘর।
এই ঘট স্থাপ নিয়া পিড়ীর উপর।।

দক্ষিণ ভারতের 'চেংমূড়' নামে এক দেবীর উল্লেখ পাওয়া যায়। ক্ষিতিমোহন সেনশাস্ত্রীর মতে—

> বাংলাদেশে মনসাকে 'চেংমুড়ী' বলা হয়। আবার দাক্ষিণাত্যের কানাড়া প্রদেশে সর্পদেবী 'মনে মনচাম্মা'। এই 'মনচা'ই বাংলাদেশে হয়েছে 'মনসা'। এই পূজোতেও চেঙ্গুর ডাল পোঁতা হয়।[৩]

অবশ্য বিজয় গুপ্ত মনসার নামকরণের দায়িত্ব সমগ্র নাগজাতির ওপরেই আরোপ করেছেন—

ভাগিনী দেখিয়া নাগ মনে মনে আশা।
বাছিয়া খুইল নাম জয় মনসা।।
উপজিল বিষহরী জগতের মাও।
দশদিক প্রসন্ন শীতল বহে বাও।।
দয়া কর পদ্মাবতী পুরাও মনের আশা।
জোকার দেও আযোগন জন্মিল মনসা।।

মনসার জন্মবৃত্তান্তে সংস্কৃত উপপুরাণগুলির সঙ্গে মনসা মঙ্গালের যথেষ্ট পার্থক্য বিদ্যমান। ড. আশুতোষ ভট্টাচার্যের মতে—সংস্কৃত উপপুরাণগুলিতে মহাভারতের প্রভাববশত মনসা নাগ-পিতা কশ্যপ কর্তৃক সৃষ্ট বলিয়া সর্বত্রই উল্লেখ করা হইয়াছে—

সা চ কন্যা ভগবতী কশ্যপশ্য চ মানসী।
চেনৈব মনসা দেবী মনসা যা চ দীব্যতি।।[৪]

কিন্তু লৌকিক মঙ্গালকাব্যে তিনি অযোনি সম্ভবা শিবের কন্যা—"অযোনি সম্ভবা কন্যা পরম সুন্দরী।" লৌকিক পুষ্পাঞ্জলি মন্ত্রেও অপ্রাকৃত সংস্কৃত বলা হয়েছে—

ওঁ অযোনিসম্ভবে মাতর্মহেশ্বর সুতে শুভে।
পদ্মালয়ে নমস্তভ্যং রক্ষ মাং বৃজিনার্ণবাৎ।।

আসামের বোড়ো জাতিরা মনসারই একটি রূপকে পুজো করে 'বুড়ি মা' নামে। বিজয় গুপ্তের মনসামঙ্গালে ঘটনার নাটকীয় বাঁক পরিবর্তনের মুহূর্তেও দেখি দেবী পদ্মাবতী বারংবার বৃদ্ধার রূপই গ্রহণ করেছেন। যেমন—'ডিঙ্গা বুড়ার পালা' অংশে চাঁদ সদাগরের কাছে তিনি এসেছেন বৃদ্ধার রূপে—

কোথা হইতে এক বুড়ী আসিল আচম্বিত।।
অতি বৃদ্ধ হয় আসে লড়ি করি ভর।
মাথায় আঙ্গুল চুল করে ফর ফর।।

আবার বেহুলাকে দিকভ্রান্ত করার সময়ও বৃদ্ধা রূপেই তিনি ছলনা করেছেন—

নেতার সনে যুক্তি করে দেবী পদ্মাবতী।
তখনে ধরিল রূপ ব্রাহ্মণের যতী।।

এই পরিকল্পনা অবশ্যই পূর্ব উদ্দেশ্যমূলক পরবর্তী ঘটনাকে ত্বরান্বিত করার জন্য—

একে ত নাগরী বেহুলা তাহে আছে বল।
লাফ দিয়া পড়িলেক সরোবরের জল।।
চরণ গোখালি গেল ব্রাহ্মণীর আয়।
শাপ দিয়া ব্রাহ্মণী বলিল উচ্চরায়।।
শুদ্ধভাবে হই যদি ব্রাহ্মণের যতী।
বিবাহের রাত্রিতে খাইও নিজ পতি।।

বিজন গুপ্ত অবশ্য পদ্মাবতী, বিষহরী এবং মনসা এই তিনটি নামকেই গ্রহণ করেছেন—

পদ্মবনে উৎপত্তি, নাম থুইল পদ্মাবতী
মনসা নাম থুইল নাগরাজে।।

সুতরাং দেবী মনসার আবির্ভাব ও বিকাশে বিভিন্ন বিশ্বাস এবং ধর্মভাবনা ও রূপকল্পনা মিশে গেছে। মনসা বিজয় গুপ্তের মঙ্গালকাব্যের মূল দেবী। অন্যান্য মঙ্গালকাব্যের কোনো দেবদেবীই মনসার মতো এত সন্ত্রাসমূলক আচরণ করেন নি। চাঁদ এবং মনসার বিরোধকে কেন্দ্র করে এই কাব্যকাহিনি বিকশিত। পাঠক যদি তীক্ষ্ণ অন্তর্দৃষ্টির সাহায্যে এই হিংস্র নারীর চরিত্রের গভীরে প্রবেশ করেন তাহলে মনস্তাত্ত্বিক কার্যকারণের হদিশ হয়তো পেতে পারেন। মনসার জন্মবৃত্তান্তেই আছে অস্বাভাবিকতা। সে পিতামাতার পবিত্র সন্তান কামনা থেকে উৎপন্ন হয় নি। কামনায় উন্মত্ত অসংযমী শিবের বীর্য স্খলনের ফলে তার জন্ম—

কামে ব্যাকুল শিব, কাতর চঞ্চল জীব
রতিরসে করে ঢসমস।
অতি কাম লইয়া ভোল, শ্রীফল বৃক্ষেরে দিল কোল,
আচম্বিতে খসিল মহারস।।

এ কোনো আনন্দ-এ এক দুর্ঘটনা। এই কন্যার জন্ম হল পাতালে। এই ঘটনা হয়ত মধ্যযুগে বাংলা সমাজের ধর্মদ্বন্দ্ব এবং সমন্বয়ের ইতিহাস বহন করে। উচ্চ কুলীন ব্রাহ্মণ পিতার কামনাজাত কন্যা অকুলীন, সমাজে কখনোই বরণীয় নয় তাই তার স্থান হল নাগরাজ্যে পাতালে। পাতাল এখানে সমাজ পরিত্যক্ত স্থানের দ্যোতক হতেই পারে—

পদ্মপত্রে হইয়া বন্দী, পাইয়া মৃণাল সন্ধি,
পাতলে নামিল মহারস।
পাইয়া পাতাল পুরী, জন্মিল নাগিনী নারী
দেবকন্যা দেখিতে রূপস।।
বার্ত্তা পাইয়া নাগরাজে, পাতালে বাজনা বাজে,
সম্ভ্রমে পূজিল নাগগণে।
যাহার যেই ব্যবহার, দিয়া বস্ত্র-অলংকার,
বাড়াইয়া থুইল পদ্মবনে।।

সুতরাং মনসার মধ্যে আর্য-অনার্য উভয় সংস্কৃতির মিশ্রণ ঘটে গেল—

দেবকন্যা হইয়া পদ্মা না জানে আপনা
নাগিনীর লক্ষণ ধরে কেশ মধ্যে ফণা।।

শিরোপরি এই নাগ অনার্য সংস্কৃতির লক্ষণ বহন করছে। মনসামঙ্গালের সমগ্র কাহিনিটির সংক্ষিপ্তসার 'স্বপ্নধামে' অংশেই স্বয়ং দেবীর সংলাপেই বিস্তারিত—

পুষ্পবনে জন্ম আমার পৃথিবীর অধঃ।
বাপের সনে পরিচয় সৎ মায়ের বধ॥
আমার বিবাহের পর স্বামীর বিচ্ছেদ।...
অস্ট নাগের জন্ম গাইও ক্ষীরোপ মথন।

বিষ খাইয়া মহাদেব হল অচেতন॥
মোর দুঃখের কথা শুনি বা পাইও হতাশ।
সৎ মায়ের বাক্যে বাপে দিল বনবাস॥
বাপের বিচ্ছেদে মোর প্রাণ দহে শোকে।
যেন মতে পৃথিবীতে পূজিল নরলোকে॥
মোর পূজা করি লোকে পাইল নানা ধন।
যেন মতে বিড়ম্বিলাম হোসেন হাসান॥
চান্দর সনে বাদ মোর ছিল জান রীত।
ভাল ক্রিয়া যচিও বাপু সেই সব গীত॥
প্রথম বাদে কাটিলাম চান্দর গুয়াবাড়ী।
ধন্বন্তরি ওঝা বধি শঙ্কুর গাড়রী॥
মহাজ্ঞান হরিলাম চান্দর বধিলাম ছয় পো।
ঝালুয়ার মণ্ডপে সোনেকা লুকাইয়া পূজে মো॥
পুত্রবর দিয়া তারে পাঠাইলাম ঘরে।
ধনে জনে চৌদ্দ ডিঙ্গা ডুবাইলাম সাগরে॥
অনিরুদ্ধ উষা হরণ যমের সঙ্গে রণ।
যেন মতে লজ্জা পাইল রবির নন্দন॥
লখাই বেহুলার জন্ম বিয়া লোহার ঘরে বাস।
যেন মতে কালিনাগে প্রাণ করিল নাশ॥
সাহস করিয়া বেহুলা সাধিল সকল।
যেন মতে চান্দ মোরে দিল ফুল জল॥
যেন মতে দিব্য রথ পাঠাইল দেবে।
স্বর্গপুরে চান্দ বানিয়া গেল সবান্ধবে॥
কহিলাম সকল কথা যে জানি বৃত্তান্ত।
গীত নহে জানিও এ মনসার মন্ত্র॥

এই ঘটনাগুলি শুধুমাত্র তথ্য। রুদ্ধশ্বাস বিরোধিতার মুহূর্তগুলি, মানসিক বিপর্যয়ের ঘাত-প্রতিঘাত এই বর্ণনায় অধরা। সেই বিশ্লেষণ আমাদের লক্ষ্য। মাতৃস্নেহ বঞ্চিতা মনসার সঙ্গে পিতার প্রথম সাক্ষাতের মুহূর্তটিও স্বাভাবিক নয়। প্রত্যাশিত প্রীতি-সম্ভাষণের পরিবর্তে শিব কামনা করেছেন তাঁর যৌবন—

কামভাবে মহাদেব বলে অনুচিত।
লজ্জায় বিকল পদ্মা শুনিতে কুৎসিত॥
বাপ হইয়া না চেন আপনার ঝি।

কাহিনির প্রথম অংশে মনসা ভীতা কোমলস্বভাবা এক নারী। যার একমাত্র সম্বল অনুনয় এবং আশ্রয় ভিক্ষা। স্নেহ পরবশ পিতা মনসার প্রকৃত পরিচয় পেয়ে তাকে গ্রহণ করলেন আনন্দে কিন্তু সভয়ে—

লুকায়ে রাখিব পদ্মা চণ্ডিকা না দেখে॥
...ভাবিয়া চিন্তিয়া শিব স্থির করে মতি।
পুষ্পের করণ্ডী মধ্যে খুইল পদ্মাবতী॥

পথিমধ্যে শিষ্য বচাইয়ের বাড়িতে বিশ্রামের জন্য কিছুকাল অবস্থান করেন শিব। তখনই প্রথম বচাইয়ের দৃষ্টি থেকে আত্মরক্ষার জন্য নৃশংস সর্পপ্রকৃতি কোমল নারী হৃদয়ের অন্তঃস্থল ছিন্ন করে আবির্ভূত হয়েছে—

অমৃত নয়ন দেবী রাখিল ঝাঁপিয়া।
বিষচক্ষে তাহারে দেখিল নিরমিয়া।।
তখনি ঢলিয়া পড়ে বচাই হালিয়া।

এই ক্রূর সর্পস্বভাব মনসার কোমল নারী স্বভাবকে আচ্ছন্ন করে বিকট রূপ ধারণ করেছে। শুধু বচাইয়ের ক্ষেত্রে নয়, বিমাতা চণ্ডীর ক্ষেত্রেও দেখি চণ্ডীর অসহ্য শারীরিক অত্যাচার আর মনসার অসহায় আর্তনাদ—

কোপে ব্যাকুল দেবী বলে অহংকারে।
চুলে ধরি মনসারে মারে আরবারে।।
চণ্ডীর প্রহারে দেবীর শরীর জর্জ্জর।
সহিতে না পারে পদ্মা চলে খরতর।।

তখন আত্মরক্ষার সহজাত প্রবৃত্তি বশতই মনসার সর্পরূপ ধারণ ও চণ্ডীর প্রাণ সংহার।

মোর প্রাণ রক্ষা হেতু নানা বুদ্ধি শিখি।
না বুঝিয়া মোরে মারে মোর দোষ কি।।
কহিতে কহিতে পদ্মার পূর্ণিত সম্ভ্রম।
তখনই প্রকাশ করে আপন বিদ্রম।।

দেব মূর্তি গড়িয়া পদ্মা নাগ মূর্ত্তি ধরি।।
কাহার প্রাণে সহিতে পারে মনসার ঘা।
বিষের জ্বালায় চণ্ডীর পোড়ে সর্ব গা।।

নিদারুন লাঞ্ছনাই মনসার অন্তরের সমস্ত শুভ বুদ্ধিকে আচ্ছন্ন করে তাকে হিংস্র আক্রমণে উদ্যত করেছে। কিন্তু বারংবার এই সত্যটিও উজ্জ্বল যে মনসা যেমন প্রাণঘাতিনী তেমনই প্রাণদাত্রীও বটে। এ প্রসঙ্গে মহাভারতে এবং মনসা স্তোত্রে আমরা পাই—

বিষং সংহর্তুমীশা সা তেন বিষহরিতি চ।
অজ্ঞানজ্ঞানদাত্রীঞ্চ মৃত সঞ্জবনীং পরাম্।

মহাভারতেও বলা হয় মনসা সহস্র বৎসর কটোর তপস্যা করে চন্দ্রশেখরকে তুষ্ট করে মহাজ্ঞান লাভ করেছেন—

নানা বিদ্যা জানে পদ্মা গুরুর প্রতাপে।
চণ্ডীর বুকে হাত দিয়া মূল মন্ত্র জপে।।

কিন্তু কুলীন সমাজে পদ্মার প্রতিষ্ঠা হয় নি। চণ্ডীর সঙ্গে বিরোধ এড়াতে জয়ন্তী নগরে পদ্মার বাসস্থানের নির্দেশ দিয়েছেন শিব। পদ্মাবতীর দুর্ভাগ্য তিনি স্বামীসুখেও বঞ্চিতা। স্বামীর সঙ্গে বিবাহের প্রথম রাত্রিতেই তাঁর বিবাদ—

বনবাসী মুনী আমি ফলমূল খাই।
পদ্মা হেন ঘরনীতে মুনীর সাধ নাই।।

তবুও নারী হিসেবে পদ্মার জীবনে প্রথম সার্থকতা এসেছে স্বামী জরৎকারুর আর্শীর্বচনের সূত্র ধরেই—

অষ্ট পুত্র জন্মিবে ঘুচিবে দুঃখ শোক।।
বর দিয়া জরভকারু মনে মনে গণি।
পদ্মার পেটে হাত দিয়া করে বেদধ্বনি।
আশীর্ব্বাদ করি বনে গেল তপোবন।
সেইক্ষণে হইল পদ্মার গর্ভের লক্ষণ।।

এই সদ্যোজাত সন্তান ক্রোড়ে ধারণ করেও মনসাকে চণ্ডীর বিরোধিতার সম্মুখীন হতে হয়েছে। চণ্ডীর অভিশাপ অষ্টনাগ মাতৃদুগ্ধ পানে বঞ্চিত হয়েছে। তখন অবশ্য পিতা মহাদেবের দয়ায় ধবল নদী ক্ষীরে পরিপূর্ণ হয়ে অষ্টনাগের তৃষ্ণা মোচন হয়েছে। এই সন্তানের সুবাদে বলে রাখা ভালো যে শিশুগণের সঙ্গে মনসার সংযোগ বারংবার দেখা যায়। লখিন্দরের জন্ম, বেহুলার জন্ম, চন্দ্রধরের ছয় পুত্রের জন্ম সমস্তই পদ্মার বরে—

সোনেকারে দয়া করি পদ্মা দিলেন বর।
ছয় পুত্র হইল তার যেন বিদ্যাধর।।

লক্ষ্য করা যায় ঘটনাক্রমের অগ্রগতিতে ক্রমশ মনসা হয়ে উঠেছে ঐশ্বর্যময়ী, ব্যক্তিত্বময়ী রমণী। তাঁর সহায় নাগ পুত্রগণ। মনসার সর্পসজ্জায় এই ঐশ্বর্যের সাড়ম্বর প্রকাশ—

কাণে কর্ণফুল পরে নাগের মুকুট।
পদ্মনাগের হার পরে শঙ্খনাগের শাঁখা।।
আড়াই নাগের কাঁচলি পরে সহজে তিন বেঁকা।।
কোটিতে কিঙ্কনী ভালো শোভিয়াছে ধোড়া
চরণে নূপুর পরে বিঘতিয়া বোড়া।।
ত্রিভুবন মোহ যায় পদ্মার প্রতাপে।
সর্ব্বাঙ্গ ঢাকিল দেবীর আভরণ সাপে।।

সমাজে নিম্নবৃত্ত শ্রমজীবী স্তরে বচাইয়ের মতো কৃষক অথবা রাখাল বাড়িতে অল্প আয়াসেই মনসার প্রতিষ্ঠা ঘটেছে। এমনকি 'হাসান হোসেন সংবাদ' অংশে নাগ সন্তানদের সহযোগিতায় মনসা তার পূজা আদায় করে নিয়েছেন—

প্রথমে পূজিল ঘট ভক্তি করি আজি।।
ব্রাহ্মণে পূজে ঘট প্রণাম করে কাজি।।

এই দৃশ্য অবশ্যই ধর্ম সমন্বয়ের স্মারক। কিন্তু চাঁদ-মনসার বিরোধ একটি দীর্ঘস্থায়ী প্রক্রিয়া। অনার্য স্তরে পূজিতা দেবীকে প্রশ্রয় দিতে চাঁদ কখনোই রাজি হয়নি। মনসাকে বারংবার সহ্য করতে হয়েছে চাঁদের কটূক্তি। পত্নী সনকার অন্তরালের মনসা পুজোকে ক্রুদ্ধ চাঁদ ভণ্ডুল করেছে—

কোপেতে আসিল চান্দ নিজ অন্তপুরী।
হেতালের বাড়ি দিয়া ঘট করে শুড়ি।।
যতেক রচনা ছিল ফেলাইল দূরে।
খাইল রচনা কলা কাকে আর কুকুরে।।
সুবর্ণের ঘটখানা ফেলায় দিয়া গড়া।
মাটির গঠন ঘট করিল চুরমুড়া।।

বারংবার এই বিরোধ মনসার অন্তরের অকল্যাণী ঘতিকা শক্তিকে প্রকট করেছে। ছল-বল-কলা-কৌশল কিছুতেই সে পিছুপা হয়নি। চাঁদের মিত্র শঙ্কর গাড়ুরীকে হত্যা করা থেকে শুরু করে চাঁদ সদাগরের ছয় বালককে বিষাক্ত অন্ন দ্বারা গুপ্ত হত্যা, সম্পদে পরিপূর্ণ বাণিজ্য নৌকাগুলিকে ধ্বংস করা, সদ্য বিবাহিত লখিন্দরকে হত্যা করা এ সমস্তই মনসার অভিশপ্ত প্রতিহিংসার স্মারক। সমাজে প্রতিষ্ঠিত প্রবল বিরোধীদের কাছে বারংবার অপমান এবং আঘাতে বিপর্যস্ত মনসা চিনে নিয়েছিলেন প্রতিপক্ষের মূল দুর্বলতাকে—বেশিরভাগ পুরুষই প্রথম রিপুর বশ তাই গুরুত্বপূর্ণ কার্য-সাধনে সর্বদাই ধারণ করেছেন মোহিনী মূর্তি। লক্ষণীয় প্রতিটি ছদ্মবেশই অনার্য নিম্নবৃত্ত সম্প্রদায়ের স্মারক-মালিনী গোয়ালিনী অথবা নটী বেশ। যেমন—চাঁদের মহাজ্ঞান হরণের ক্ষেত্রে—

সাধিতে বিষম কাজ, মনসার নাহি লাজ,
দেবকন্যা হইলেন নটী।

এই নটিনীর বেশ ধারণ একদিকে যেমন সামাজিক পুরুষ চরিত্রের সার্বিক অবক্ষয়ের স্মারক ঠিক তেমনই অপরদিকে পরিণত বুদ্ধিসম্পন্না মনসার কূটনীতির দ্যোতক—

কহিল নটীর কাণে মহাজ্ঞান সকল।।
আঁচলের নিধি চান্দ ফেলিল সরবে।
নটীর কানে মন্ত্র কহি আপনা পাসরে।।

কাহিনির প্রথম অংশে যে নারী বিমাতা চণ্ডীর কাছে ভীতা, সন্ত্রস্ত হয়ে বিলাপ করেছেন—

জনম দুঃখিনী আমি দুঃখে গেল কাল।
সেই ভালো ধরি আমি ভাঙ্গে সেই ডাল।।
শীতল ভাবিয়া যদি পাষাণ লই কোলে।
পাষাণ আগুন হয় মোর কর্ম্মফলে।

ঘটনা পরম্পরায় জীবনের তিক্ত হলাহল মন্থন করে তিনি ক্রমশই হয়ে উঠেছেন রুদ্ররূপিনী, কুটিল বুদ্ধিসম্পন্না, প্রবল শক্তিশালী রমণী। জল-স্থল-অন্তরীক্ষ সর্বত্র তার প্রবল

প্রতাপ। উনোকোটি নাগ তার আজ্ঞাধীন শুধু নয় তার রক্ষক এবং শক্তি—

স্মরণ করিয়া আনে যত নাগগণ।।
আসিল অনন্ত নাগ মাথায় হাজার ফণা।
পদ্ম, মহাপদ্ম, আসে ভাই দুই জনা।।
আসিল ভক্ষক নাগ নাগের প্রধান।
কোটি কোটি নাগ আসি করিল যোগান।।

পদ্মার সাক্ষাতে নাগ আসে আখে ব্যাখে।
যোড়হস্তে দাঁড়াইল পদ্মার সাক্ষাতে।।

মোহিনী মূর্তি ব্যতীত মনসার ঐশ্বর্যশালিনী রণরঙ্গিনী মূর্তিটি দৃষ্ট হয় যমরাজের সঙ্গো প্রত্যক্ষ যুদ্ধে। একদিকে উনোকোটি নাগসহ মনসা অন্যদিকে যুদ্ধাস্ত্রে সজ্জিত চতুর্দশ যম। এখানে বিষরে ভয়ঙ্করত্বের যে প্রকাশ ঘটেছে তা প্রকৃতপক্ষে মনসার শক্তিরই তেজোদৃপ্ত রূপ—

বিষ পানে মত্ত হইল নাগ মহাবলী
সমুদ্রের জল যেন লইল কলোকলি।

গর্বিতা মনসার দর্প ভরা উক্তি—

আমার বিষের তেজে নীলকণ্ঠ দেবরাজে
আপনে হইল অচেতন
কিসেরে না কয় রাও মাথায় পুলিয়া চাও
যুদ্ধে হারিলা রবির নন্দন

যমরাজকে মনসা নাগপাশে বন্দি করেছেন আবার নারদের অনুরোধে তাকে মুক্তও করেছেন। উল্লেখ্য মনসার ধনদাত্রী পুত্রদাত্রী রূপটি বিজয় গুপ্ত বারংবার উল্লেখ করেছেন—

অপুত্রার পুত্র হয় নির্ধনের ধন,
কদাচ নাহিক তার অকালে মরণ।।

মনসার এই পুত্রদায়িনী রূপটি প্রসঙ্গো কিছু তথ্য উল্লেখ করা আবশ্যক। ড. আশুতোষ ভট্টাচার্য উল্লেখ করেছেন যে ময়মনসিংহ জেলা থেকে ধাতুনির্মিত একটি মনসা- মূর্তি আবিষ্কৃত হয়েছে—

> দেবীর মস্তকের উপর সাতটি সর্প ফণাছত্র বিস্তার করিয়া আছে, তাঁহার ক্রোড়স্থিত শিশুর মস্তকটিও একটি সর্পফণায় আচ্ছাদিত। ক্রোড়স্থ শিশু যে আস্তিক তাহা সহজেই বুঝিতে পারা যায়। দেবীর দুই স্কন্ধের উপরের দুইটি সীজ-মনসাবৃক্ষের শাখা। 'ইহা মূর্তিটির অন্যতম বৈশিষ্ট্য'।।[৫]

সুতরাং ক্রুর, ছলনাময়ী, হিংসাত্মক প্রকৃতির অন্তঃস্থলে যে কোমল মাতৃরূপা এক প্রসন্নময়ী কল্যাণী চেতনা বিরাজমান, এই সন্তানসহ মাতৃ মূর্তিটি তারই স্মারক। বিজয় গুপ্তের মনসামঙ্গলেও আমরা তাই কতকগুলি অতিরিক্ত তথ্যের সন্ধান পাই। যেসব

মানব-মানবীর সে প্রাণ হরণ করেছে তাদের প্রত্যেককেই সে পুনর্জীবন দান করেছে যেমন—ধন্বন্তরি ওঝার কিংবা চাঁদের ছয় পুত্র সকলেই পদ্মার বরে পুনর্জীবন লাভ করেছে এবং দেবী গঙ্গার কাছে তাদের সকলকে সুরক্ষিত রেখেছে—

ধন্বন্তরি জীয়াইয়া থুইয়া বিষহরী।
এইরূপে রহে ওঝা ভাঙ্গা দেবীর পুরী।।

এইভাবেই চাঁদ সদাগরের ছয় পুত্রের জীবনদান ব্যতিক্রমী ঘটনা নয়—

এ মন্ত্রবলে জীয়াইল কুমার ছয়জন।।
প্রত্যেক দেখিয়া পদ্মার কৌতুক বিস্তর।
গঙ্গার পুরী লইয়া চলিল ছয় কুমার।।
যত্ন করিয়া রাখিবা তোমার ঠাঁই।।
যখনে চাহিব আমি তখন যেন পাই।।

এতদসত্ত্বেও মনসা মনুষ্যকূল এবং দেবকুল সকলেরই শুধুমাত্র বিরাগভাজন হয়েছে। নিরালম্ব শূন্যতায় ঘেরা তার জগৎ। স্নেহ-মায়া-দয়াহীন অবিচারের বলি হয়েছে বারংবার। চাঁদ সদাগরের বিপক্ষে যতবারই সে মহাদেবের নিকট সাহায্য প্রার্থনা করেছে ততবারই সে হেনস্থা আর কটুক্তির সম্মুখীন হয়েছে—

এতেক শুনিয়া করিলেন শুলধর।
তুমি মর নহে মরুক চাঁদ সদাগর।।
তোমাদের যন্ত্রণা আর সহিতে না পারি।
মনে ইচ্ছা হয় মোর হই দেশান্তরি।।

লাঞ্ছিতা মনসার একমাত্র সহায় রজকিনী নেতা। মনসার সু এবং কু সকল কর্মের পরামর্শদাত্রী, সুখ-দুঃখের সমান অংশভাগিনী। শিবের অশ্রুপাতে নেতার জন্ম মহাদেবের আদেশই নেতা মনসার ছায়াসঙ্গিনী—

বুদ্ধিতে প্রবীণ নেতা মোর নেত্রে জন্ম।
তাহারে জিজ্ঞাসি তুমি ক'র সব কর্ম।।

কাহিনি মধ্যে যতবার প্রবল সংকটে মনসা বুদ্ধিভ্রষ্টা হয়েছে প্রত্যেক বারই তার উদ্ধার কর্ত্রী নেতা। সংকটকালে মনসার মুখে শুধুই নেতার নাম—

নেতা নেতা বলে ডাকে ঘন ঘন।
নেতা আসি হেনকালে দিল দরশন।।
নেতা বচনে মনসা পাইল সন্ধি।
এড়িলেক নাগপাশ যম হইল বন্দী।।

নেতার মন্ত্রণাতেই জলমধ্যে এবং আকাশপথে সমস্ত নদনদী এবং মেঘ পদ্মার আজ্ঞাবহ হয়েছে। বাণিজ্যকালে শুরু হয়েছে সংহারক মনসার উদ্দাম ক্রোধশীলা—

বায়ুকোণে ডাকে মেঘ যেন দেখি নীল।

ঝড় বরিষণ হইল আর পড়ে শিল॥
মেঘের দারুণ চীৎকারে কাঁপে সর্ব্ব গা।...

এস্থলেও মনসার কোণ থেকে চন্দ্রধরকে রক্ষা করেছে নেতা—

নেতা বলে পদ্মাবতী চান্দর প্রাণ যাবে।
চান্দ মরিলে তোমার পূজা নাহি হবে॥

মনসার একমাত্র আত্বিক পরাজয় বেহুলার সতীত্বের কাছে। পদ্মাবতী দেখেছে বেহুলার সতীত্বের তেজ। মনসা নিজে স্বামীসঙ্গ পরিত্যক্তা অথচ বেহুলা মৃত স্বামীর পুনর্জীবনের জন্য আত্মাহুতি দিতে উন্মুখ। এই পাতিব্রত্য পদ্মার কাছে অভিনব—

বেহুলার চরিত্রে পদ্মা ভয় পাইল চিতে।
আখেব্যখে পদ্মাবতী ধরিলেন হাতে॥

সম্ভবত বেহুলার ব্যক্তিত্বের তেজ, ধৈর্য, পরিবারের প্রতি আনুগত্য মনসাকে জীবনের মাঙ্গালিক দিকটির সন্ধান দিয়েছে। সদ্য বিধবা যুবতী সমগ্র সন্তাপ উপেক্ষা করে শুধুমাত্র মৃত স্বামীর পুনরুজ্জীবনের জন্য নৃত্য-গীতের আদেশ পালন করেছে-এ ঘটনাও মনসার কাছে অপার বিস্ময়। লখিন্দরের পুনর্জীবন দানের আগে মনসার প্রস্তর কঠিন হৃদয় বিদীর্ণ করে উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠেছে সারাজীবনের দাবদাহের কাহিনি। 'বারোবাসের সংবাদ' অংশে মনসা যেন সমব্যথী স্বমীর কাছেই করেছে আত্মবিলাপ। একে একে উঠে এসেছে তার সামাজিক অস্বীকৃতি, অন্তেবাসী হয়ে থাকার বেদনা, সামাজিক প্রতিষ্ঠা না পাওয়ার দুঃখ থেকে শুরু করে চন্দ্রধরের অস্বীকৃতি, অকথ্য কটূক্তি ইত্যাদি হৃদয় বিদারক যন্ত্রণার কাহিনি—

নগর-মণ্ডল চান্দ চম্পকের রাজা।
চম্পক নগরে মোর মানা করে পূজা॥
এত ধন দিলাম বেটা তবু নহে বুঝে।
আমা বই আর যত দেবগণ পুজে॥
দুই হস্ত পাতিয়া আমি মাগিলাম ফুল পানি।
হেলায় না দিল ফুল আরো বলে কানী॥
হাঁটিতে বসিতে বলে ধামনা ভাতারী।...
লুকাইয়া খাইতে গেলাম তার পুজো।
চান্দ মোর কাঁকল করিল কুঁজো॥
তিলেক না করি তার হানি।
মোরে হাঁটিতে বসিতে ডাকে কাণী॥

এই বর্ণনা কোনো অপরাধিনী মনস্তত্ত্বের কৈফিয়ৎ নয়। গ্লানিময় জীবনের নৈবেদ্য যেন মনসা নিবেদন করেছেন বেহুলার কাছে। এখানে আমাদের মনে পড়ে যেতে পারে আধুনিক কবি মল্লিকা সেনগুপ্তের পঙ্ক্তিগুলি—

আমি দলিত মেয়ে কালো রং ত্বক
যেরকম ভারতের লক্ষ কোটি মেয়ে

তাই বলে মাটি জলে এতটুকু অধিকার চেয়ে
কি ভুল করেছি বলো হে মহানায়ক।।

ভাবতে আশ্চর্য লাগে শত শত মেয়ের সংগ্রাম যেন দলিতা ভূজঙ্গীর মতো অনাধুনিক কাল থেকে বয়ে চলেছে আধুনিক সময়ে। মনসাকে, বলা যায় কোনো পুরুষই সাহায্য করেন নি। পিতার করুণার, অনিচ্ছুক অনুগ্রহের কণামাত্র ভিক্ষা করতে হয়েছে তাকে। বর্তমানকালের কবির কণ্ঠেও সেই বিদ্রোহের উচ্চকিত স্বরই শ্রুত হয়—

আমিই সংহার তবু আমি রুদ্র কালী
বেহমাই বেরহোরে রুক্ষ মাটি কঠিন পাথরে
আমারই ত্রিশূলে কত রাক্ষসেরা মরেছে বেঘোরে
তবু আমি অনর্গল ছুটে মরি খালি।
শেষ যুদ্ধে সকলের সামনে পাঁড়াই।

মনসাও দাঁড়িয়েছেন সকল দেবতার সম্মুখে, তাঁর বঞ্চনার, আত্মপ্রতিষ্ঠার তাগিদ উচ্চকণ্ঠে তুলে ধরেছেন দেব সমাজের সামনে। এখানে বলা যায় নিরুপায় সন্ধি স্থাপন করতে বাধ্য হয়েছেন দেবাদিদেব। অবশ্য বেহুলার প্রতি মনসার শ্রদ্ধাও অনুঘটকের কাজ করেছে। কারণ সে জানে লখিন্দরের পুনর্জীবনেই দেবসমাজ ও মানব সমাজ তার অপবাদের খণ্ডন—

পদ্মা বলে বেহুলা শুনহ বচন
অপযশ খণ্ডে যেন তোমার কারণ

এই সন্ধি স্থাপনের পর পদ্মার স্থান হয়েছে দেব সমাজে, এক আসনে—

ধ্যানেতে বসিয়া পদ্মা তক্ষকের মাতা।
বাম পাশে বসিলেন ধোপাছী নেতা॥
ডাইনে ধবল নদী বামে গঙ্গাদেবী।
পদ্মাবতী মন্ত্র পড়ে শিবের পদ ভাবি॥
কাণে মূলমন্ত্র জপে দেবী ততক্ষণ।
পদ্মার প্রসাদে হইল লখাইর চেতন॥

এ দেবী মনসার প্রায়শ্চিত্তও বটে। সে একমাত্র অসংকোচ নতিস্বীকার করেছে বেহুলার কাছে—

তোমার তরে আইলাম মুই দেবতার সমাজ।
লক্ষ্মীন্দর জীয়াইয়া সাধিলাম তোমার কাজ॥
শিশুকাল হইতে আমা পূজ নিরন্তর।
আপন সুখে সেই চাহ সেই দিব বর॥

আশ্চর্যের বিষয় দেবসমাজ পদ্মাকে স্বীকৃতি দিলেও তৎকালীন মানব-সমাজপতি চাঁদ সদাগর তখনও বিরূপ। পুত্রবধূ বেহুলার বারংবার অনুরোধেও তাঁর প্রতিজ্ঞা অটল—

পদ্মা না পূজিব আমি পুষ্প জল দিয়া।
যে হস্তে পূজি মুই ত্রিদশ দেবতা॥
সেই হস্তে মুই কাণিরে করিব পূজা।...

দেবসমাজ নিরুপায় হয়ে দৈববাণীর সাহায্যে মনসার পূজায় চাঁদকে নিয়োজিত করিয়েছেন প্রায় জবরদস্তি করেই। স্বয়ং চণ্ডী চাঁদকে নির্দেশ দিয়েছেন—

একই মূর্ত্তি দেখ সব না ভাবিও পর।।
সেই জন দেখ বিষ্ণু সেই মহেশ্বর।
কুবের বরুণ দেখ চন্দ্র দিবাকর।।
যেই জন ভগবতী সেই বিষহরি।
পদ্মার প্রসাদে আমি ভবসিন্ধু তরি।।

সমস্ত সংকটের মীমাংসা হল চাঁদের পুজোর মাধ্যমে। কিন্তু সেই পূজা অতি তাচ্ছিল্যের—

বাম হস্তে দিব পুষ্প মার্গে দিব সেবা

অর্থাৎ বাম হস্তের পুষ্পাঞ্জলি দেবীর চরণে নয় ধুলি ধূসরিত পথেই পড়েছে। এ যেন মনসার দীর্ঘ লড়াইয়ের পর ক্লান্ত সান্ত্বনা—

ঘটে অধিষ্ঠান হইল দেবী পদ্মাবতী।
প্রণাম করিল চান্দ করিয়া ভকতি।।

সবশেষে এটাই বলা যায় দলিতা অবহেলিতা কন্যা মনসা সমস্ত অপযশের উর্দ্ধে উচ্চবর্ণে স্বীকৃতি পেয়েছে। চাঁদের স্তব মন্ত্রটির মধ্যেই মনসার সমস্ত অপমানের নির্মোক খসে পড়ে দেবীত্বের অমৃত উৎসার ঘটেছে—

নমস্তে বিষহরী সর্ব্বদুঃখনাশিনী।
নমস্তে জগৎমাতা ভবভয়নাশিনী।।
নমোনমঃ নাগরূপা নাগবংশরক্ষিনী।
নমস্তে মনসাদেবী সর্বশত্রুনাশিনী।।

উৎসের সন্ধানে

১. Tadhkirat-al-Awliya-Faridal-Din Attar-1, 278,8 (Niobol-Son)
২. বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস ১ম খণ্ড।
৩. ক্ষিতিমোনহ সেনশাস্ত্রী : বাংলার মনসা পূজা, প্রবাসী আষাঢ় ১৩২৯ পৃ. ৩৯১
৪. বাংলা মঙ্গালকাব্যের ইতিহাস
৫. বাংলা মঙ্গাল কাব্যের ইতিহাস

তথ্যের সন্ধানে

১. পণ্ডিত কালীকিশোর বিদ্যাবিনোদ সম্পাদিত : ‘পদ্মাপুরাণ’ ।
২. আশুতোষ ভট্টাচার্য : ‘বাংলা মঙ্গালকাব্যের ইতিহাস’।
৩. মিহির চৌধুরী কামিল্যা : ‘আঞ্চলিক দেবতা ও লোকসংস্কৃতি’।

বিজয়গুপ্তের বেহুলা : প্রতিবাদে, প্রতিরোদে, প্রতিস্পর্ধায়

দীপঙ্কর মল্লিক

লোকায়ত দেবদেবীনির্ভর মঙ্গালকাব্যগুলির মধ্যে সর্বাধিক জনপ্রিয়তা পেয়েছে মনসামঙ্গাল কাব্য। এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই যে, পঞ্চদশ ও সপ্তদশ শতাব্দী হল মনসামঙ্গাল কাব্যের একাধিপত্যের কাল। ঠিক অনুরূপে ষোড়শ শতাব্দীতে চণ্ডীমঙ্গাল এবং অষ্টাদশ শতাব্দীতে ধর্মমঙ্গাল ও অন্নদামঙ্গাল কাব্যের অসামান্য সব আখ্যান তৈরি হয়েছিল। এই অষ্টাদশ শতাব্দীতেই পাওয়া যায় অপ্রধান মঙ্গালকাব্যগুলি। জলাজঙ্গাল পরিবেষ্ঠিত বাংলার ভৌগোলিক যে পরিবেশ, সেখানে মনসামঙ্গাল কাব্যের একাধিপত্য হওয়াই স্বাভাবিক। পঞ্চদশ শতাব্দীর কবি বিজয়গুপ্ত মনসামঙ্গল কাব্যধারার অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবি রূপে চিহ্নিত। তাঁর কাব্য মূলত করুণরসের। এই কাব্যে চিত্রিত বেহুলা সমস্ত প্রতিকূলতার বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে ক্রমাগত সংগ্রাম করেছেন। প্রাক্-বিবাহ জীবন থেকে উত্তর-বিবাহ জীবন পর্যন্ত বেহুলা ক্রমান্বয়ে সমস্ত প্রতিকূলতাকে চ্যালেঞ্জ হিসেবেই গ্রহণ করেছেন। সর্প সম্রাজ্ঞী মনসার বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে মৃত্যুপুরী থেকে স্বামীকে উদ্ধার করে আনার বিরল কৃতিত্বের অধিকারী হয়ে উঠেছেন বঙ্গের বধূ বেহুলা। এই বেহুলা চরিত্রটিকে আমরা এভাবে আলোচনায় আনতে পারি।

১.

'বেহুলাও একদিন গাঙুরের জলে ভেলা নিয়ে'

'কৃষ্ণা দ্বাদশীর জ্যোৎস্না যখন মরিয়া গেছে নদীর চড়ায়' তখন ছোট্ট একটি ভেলায় মৃত স্বামী লখিন্দরকে সঙ্গে নিয়ে ভেসে চলেছে চাঁদসদাগরের পুত্রবধূ বেহুলা। বুকে তার দুর্বার সাহস। মনে অবিশ্বাস্য প্রতিরোধী শক্তি। দুটি প্রত্যয়ী চোখে অফুরান বিশ্বাসের আলো। 'সোনালি ধানের পাশে অসংখ্য অশ্বত্থ বট' দেখতে দেখতে অসহায় বেহুলা চলেছে অনিকেত জীবনে—স্বর্গপুরীর দিকে। শ্যামা নরম সুরে গান গেয়ে বেহুলাকে প্রবোধ দিচ্ছে। ইতিমধ্যে অমরাবতীর সমীপে উপস্থিত বেহুলা মহাদেবের অশ্রুভারাক্রান্ত মন থেকে জাত কন্যা 'নেতা'র অলৌকিক অবিশ্বাস্য গুণে অভিভূত হয়। তার সঙ্গো আত্মীয়ের সম্পর্ক করে নেয়।

মূলত নেতো বা নেতার প্রশ্রয় ও প্রস্তাবে বেহুলা দেবসমাজে নৃত্য দেখাতে সমর্থ হয়। পতি পরম দেব—এ বিশ্বাসে নয়, নারী-ব্যক্তিত্বের চৌম্বক শক্তিতে শ্বশুরগৃহ, পিতৃগৃহ ও স্বর্গের কল্পিত গৃহের বিরুদ্ধে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে বেহুলা অসম্ভব ভালো নৃত্য করে। কবি জানান, 'ছিন্ন খঞ্জনার মতো সে নেচেছিল ইন্দ্রের সভায়'। তার নৃত্যে মোহিত হয়ে পড়েন দেবসমাজ। সেদিনের নৃত্যে তার সাফল্যের মূলে জীবনানন্দ লক্ষ করেছিলেন 'বাংলার নদী মাঠ ভাঁটফুল ঘুঙুরের মতো তার কেঁদেছিল পায়।' অর্থাৎ 'রূপসী বাংলা'র সার্বিক ঐতিহ্য পরিস্ফুট হয়েছিল বেহুলার নৃত্যে। তাই অমরাবতী থেকে অমর বার্তা নিয়ে আসতে সক্ষম হয়েছিল ব্যক্তিত্বময়ী বঙ্গ ললনা বেহুলা।

মনসার কোপে অনাবশ্যক ও অযৌক্তিক শাস্তি ভোগ করেছে বেহুলা। অনেকটা 'মরে পুত্র জনকের পাপে'র মতো মনসার রোষে বেহুলার স্বর্গপতন, মর্ত্যজীবন, বাসরঘর; সমাজ-সংসারে সংস্কারাবদ্ধ মানুষের তির্যক ব্যঙ্গ, দেবসভায় নৃত্য, স্বামীর পুনর্জীবন প্রাপ্তি ঘটেছে। এই সব ঘটনার মূল কেন্দ্রভূমিতে বেহুলা নয়; মনসার অবস্থান। ঠিক এভবে মধুসূদন দত্তের 'মেঘনাদবধ কাব্য' এবং গিরিশন্দ্র ঘোষের 'জনা' নাটকে পিতা রাবণ ও মাতা জনার কারণে পুত্র মেঘনাদ ও প্রবীরের মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী হয়েছে। অর্থাৎ কেন্দ্রকে বেষ্টন করে উপকেন্দ্রের যা কিছু ক্ষয়-ক্ষতি ও ব্যর্থ পরিণাম। 'পদ্মাপুরাণ' কাব্যে আমরা দেখেছি, বেহুলাকে একই সঙ্গে একাধিক জনের বিরুদ্ধে দাঁড়াতে হয়েছে। বিষয়টি এমন—

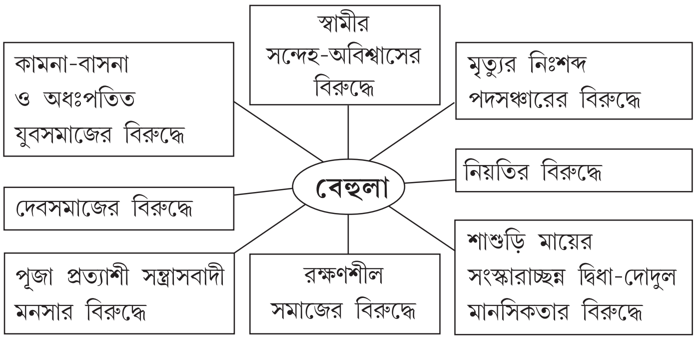

২.

মনসার ইচ্ছাপূরণের যন্ত্র হিসেবে বেহুলার জন্মগ্রহণ

মঙ্গলকাব্যে দেখা যায় বিশেষ কোনো দেব-দেবীদের ইচ্ছাপূরণের নির্মমতায় আক্রান্ত হয় মর্ত্যবাসী বা স্বর্গবাসীরা। বিজয়গুপ্তের 'অনিরুদ্ধ ঊষা হরণ এ যমযুদ্ধ' শীর্ষক অংশে 'সোনেকার পুত্র আমি পাইব কোথাএ'—এই জিজ্ঞাসা চিহ্নের সূত্র ধরে নেতা পদ্মাবতীকে পরামর্শ দেয় 'অবিলম্বে যাও তুমি শিবের গোচর।।' 'শিবের গোচর'-এ যাওয়ার কারণ—'অনিরুদ্ধ ঊষা গিয়া আন দুই জন।' অপ্সরীর নৃত্যে মুনি-ঋষির ধ্যানভঙ্গের কাহিনি অলীক কল্পনা নয়। আমোদপ্রিয় ও বিলাসী দেবতাদের সংগীত-নৃত্যানুষ্ঠানের প্রস্তুতি,

আয়োজন, অংশগ্রহণ মঙ্গলকাব্যের অন্যতম আলোচ্য বিষয়। বিজয়গুপ্তের 'পদ্মাপুরাণ' কাব্যে দেবতাদের মনোরঞ্জনের জন্যে নৃত্য করছে ঊষা। তাল-লয়ে সে নৃত্য অসাধারণ মাধুর্যের সৃষ্টি করেছে। এই প্রসঙ্গে স্মরণ করা যেতে পারে, তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'জলসাঘর' গল্পের কথা। বিত্তশীল ধনতান্ত্রিক সভ্যতার প্রতিভূ মহিম গাঙ্গুলিকে বিদ্রুপ করতে পুরাতনের স্মৃতিচিহ্ন 'জলসাঘর'-এ ফিরে আসে ক্ষয়িষ্ণু জমিদার বিশ্বম্ভর রায়। একদা জমিদার এবং শহুরে ধনীদের ইচ্ছেতে নৃত্য করে মন যোগাতে হতো সুন্দরী নর্তকিদের। দেবতারাও মর্ত্যবাসী মানুষের মতো বিলাসে মত্ত হতেন। আহ্বান জানাতেন কোনো রম্ভা, ঊর্বশী কিংবা তিলোত্তমাকে। কখনও আশীর্বাদ, কখনও অভিশাপ পেতেন এই নর্তকীরা। বিজয় গুপ্তের 'পদ্মাপুরাণ' কাব্যে দেখা যায়, মহাদেবসহ স্বর্গের দেবতাদের সজ্জিত আসরে 'অনিরুদ্ধ গীত গাহে নাচে দেবী ঊষা'। এমত সময়ে সর্বাঙ্গে নাগবেষ্টিত দেবী মনসা মূর্তিমতী সর্বনাশা রূপ নিয়ে সভাস্থলে উপস্থিত হন। তিনি কুপিত দৃষ্টিতে দেখেন ঊষাকে। মনসার প্রাণনাশী দৃষ্টির প্রতিক্রিয়াতে—

ভয় পাইয়া ঊষা ছাড়ে নৃত্য গীত।
কোপ করি মহাদেব শাপে বিপরীত॥[১]

ঊষার নৃত্য ত্যাগের কারণ মনসা সম্পর্কে 'ভয়'। দেবসমাজ ও মানবসমাজের কাছে সন্ত্রাসবাদিনী দেবীরূপে চিহ্নিত হয়েছেন মনসা। তাঁর দিকে তাকাতেই ভয়ে ওষ্ঠাগত প্রাণ ঊষা নৃত্যের তাল থেকে সরে গিয়েছেন। এখানে ঊষাকে দোষ দেওয়া চলে না। ফলে মহাদেব ঊষাকে অযথা শাস্তি দিয়েছেন। মহাদেবের শাপ দেওয়ার কারণস্বরূপ তিনি জানিয়েছেন, ঊষা তাঁকে 'অবহেলা' করেছেন—'অবজ্ঞা করহ তুমি দেখিয়া পাগল'। মহাদেব যে 'পাগল' মাত্র নন; তিনি কালেরও কাল—অর্থাৎ মহাকাল— স্বয়ং মৃত্যুর নামান্তর তা তিনি বোঝাতে চেয়েছেন ঊষাকে। মহাদেবের অভিশাপ বর্ষণের কারণ যদি শিল্পীর শিল্প কর্ম থেকে মন বিচ্যুত হওয়া হয়ে থাকে, তাহলে দোষ দেওয়া চলে না। কিন্তু সমস্যা হল এই—ঊষা বিনা দোষে অভিশপ্ত হয়েছেন। আসলে ঊষার অভিশাপ হওয়ার মধ্যে রয়েছে মনসার মনোবাসনা পূরণ হওয়ার একটি যোগসূত্র। কেননা, মনসার পূজা প্রাপ্তির ইচ্ছাকে বাস্তবায়িত করতে হলে ঊষাকে বেহুলারূপে জন্মগ্রহণ করতে হবে। সুতরাং মনসার প্রয়োজনে মহাদেবের অভিশাপ প্রদান ছিল অবশ্যম্ভাবী। বলাবাহুল্য, মহাদেবের অভিশাপ দেওয়ার মধ্যে মনসামঙ্গালের কাহিনি স্বর্গলোকের দরজা থেকে মর্ত্যলোকের পথে চলে। মহাদেবের অভিশাপ—

মনুষ্য যোনিতে জন্ম লভ দুইজন।
ভোগিবা অনেক দুঃখ দুই মহাজন॥
বাপ শ্বশুর কুল করিয়া উদ্ধার।
আমার নিকটে দুই আসিবা আরবার॥[২]

ঊষার পায়ের নূপুর মধুর ধ্বনি তুলেও মনসার কোপে স্তব্ধ হয়ে যায় তার সৌন্দর্যের সাধনা, বাক্‌রুদ্ধ হয় অনিরুদ্ধর। অর্থাৎ আর কন্যা মনসার মর্ত্যে পূজা পাইয়ে দেওয়ার

জন্যে রীতিমতো স্বার্থপর পিতা হিসেবে শিব ঊষা ও অনিরুদ্ধকে স্বর্গচ্যুত করেছেন। এখানে ঊষা-অনিরুদ্ধের কোনো শিল্প সাধনায় ত্রুটি ছিল না। বোঝা যায় ক্ষমতাভোগীরা কীভাবে ক্ষমতার অপব্যবহার করে দুর্বলদের উপরে চূড়ান্ত মাৎস্যন্যায় চালায়। 'জন্ম লভ দুইজন'—এই কারণে যে, লখিন্দরের মৃতদেহ পুনরুজ্জীবিত হবে বেহুলার অবিরাম নৃত্য-চর্চার সাধনায়। অর্থাৎ নৃত্যপটিয়সী ঊষা স্বর্গ ছাড়ল ঠিকই কিন্তু নৃত্য ছাড়েনি।

অনিরুদ্ধ ও ঊষা মর্ত্য-সংসারে লখিন্দর ও বেহুলারূপে জন্মগ্রহণ করে। দু'জনেই শৈশব ও কৈশোর অতিক্রম করে যৌবনের কুসুম-কাননে পা রাখে। পুত্র লখিন্দরের বিবাহে তৎপর পিতা চন্দ্রসদাগর অন্বেষণ করলেন 'অতি সর্ব্বগুণা কন্যা।' কিন্তু পুত্রের বিবাহে অনিচ্ছুক সনকা জানালেন—বিধি-নিয়ন্ত্রিত পুত্রের মৃত্যুর কথা। অর্থাৎ পুত্র লখিন্দরের বিবাহ যে মৃত্যুর নামান্তর তা শোনালেন পুত্র-চিন্তায় সদা শঙ্কিত জননী সনকা। তিনি দৈব-নির্ধারিত সাবধানবাণী শোনালেন চন্দ্রসদাগরকে—

বিবাহের দিনে নাগে দংশিব লখাই।
এহি কথা কহিয়াছে জগৎগৌরী আই॥[৩]

কিন্তু বিধির ইচ্ছাকে ব্যক্তিত্বের প্রখরতায় একেবারেই ধিক্কৃত করে নিজের অসম্ভব ইচ্ছাশক্তির ওপরে আস্থাশীল চন্দ্রসদাগর উজানী নগরে গমন করলেন পুত্রের জন্যে উপযুক্ত পাত্রী নির্বাচন করতে।

৩.

বেহুলার স্বপ্নদর্শন : 'শিয়রে বসিয়া স্বপ্ন কহে বিষহরি'

মনসা তাঁর সুখ-দুঃখের একমাত্র নির্ভরযোগ্য সঙ্গিনী নেতার সঙ্গে যুক্তি করে বেহুলাকে স্বপ্নে জানালেন—পিতা সাহ বেনের মুক্তসার পুকুরে স্নান করবার কথাটি। বেহুলা যদি মুক্তসার পুকুরে স্নান করতে যায় তবে পুরস্কার স্বরূপ—'জন্মে জন্মে হবে তোমার লখিন্দর দাড়া'; আর যদি না যায় তবে তিরস্কারের কুফলস্বরূপ 'তবে বিহা না হইব এ বারো বৎসর।' দেবী পদ্মার নির্দেশিত স্বপ্নানুযায়ী পিতা সাহবেনের সম্মতিক্রমে বেহুলা মুক্তসারে গমন করেন। বলা বাহুল্য বিজয় গুপ্তের 'পদ্মাপুরাণ' কাব্যে ঊষার বেহুলা রূপে জন্মগ্রহণ করার পর এই কাব্যের আখ্যান চাঁদসদাগরের হাত থেকে সরাসরি বেহুলার হস্তগত হয়েছে। 'পদ্মাপুরাণ' পাঠ করার সময় আমার বার বার মনে হয়েছে, এ কাব্যে চাঁদ সদাগরের সঙ্গে মনসার বিরোধ শেষ পর্যন্ত আখ্যানকে টেনে রাখতে পারেনি। কেননা, মনসার সর্ববিস্তারী প্রভাবের পাশে চাঁদ সদাগর দাঁড়াতে পারেননি। কবি কালিদাস রায় তাঁকে নিয়ে কবিতা লিখেছেন। সেই কবিতা আমরা পড়েছি। খুব খুশি হয়েছি এইভেবে যে, মধ্যযুগে অন্তত একজন প্রতিস্পর্ধী পুরুষ ছিলেন, যিনি মাথা তুলে প্রতিবাদ করতে পেরেছেন, মুখের উপরে 'না' বলতে পেরেছেন। অর্থাৎ, চাঁদের স্পর্ধা দেখে আমরা অবাক হই। কিন্তু কখনও কখনও কাব্য পাঠ করার সময় মনে হয়েছে, চাঁদের স্পর্ধাকেও

অতিক্রম করেছে বেহুলা প্রবল-প্রখর-প্রতিস্পর্ধী ব্যক্তিত্ব। মনসার সঙ্গো বেহুলার দ্বন্দ্ব এই আখ্যানের সবথেকে বড়ো গুরুত্বপূর্ণ অংশ। মনসা চাঁদের বিরুদ্ধে দাঁড়াতে পারেন, কিন্তু বেহুলার সামনে নিজের শক্তিকে প্রতিষ্ঠিত করার মতো কোনো স্পর্ধা দেখাতে পারেন না।

৪.

মনসার অভিশাপ : 'বিবাহের রাত্রে বেহুলা খাইয় নিজ পতি'

সাহের কুমারী বেহুলা মুক্তসার পুকুরে গমন করলে পূর্ব পরিকল্পনা অনুসারে অভিশাপে মনস্থ দেবী 'ঘাটে নামিলা দেবী হরিষ অন্তর'। 'যতি'-বেশিনী দেবী মনসাকে স্বাভাবিক বালিকাসুলভ ব্যবহারে ঘাট ত্যাগের কথা জানালেন বেহুলা—

নিকট আসিয়া বেউলা যতির তরে বলে।
ঘাট ছাড়ি সেও যতি স্নান করি জলে॥[৪]

অভিশাপ বর্ষণের সুতীব্র আকাঙ্ক্ষায় উন্মুখ দেবী মনসা ঘাট পরিত্যাগে রাজি নন। বরং তার নির্দেশাত্মক ভঙ্গিতে জোরাল বক্তব্য—

আর ঘাটে কর স্নান আপনার মনে।
এ ঘাটে আসিলা তুমি কিসের কারণে॥[৫]

পিতার উত্তরাধিকারিণী কন্যা বেহুলা স্পষ্টই জানে, মুক্তসারে স্নানের অবাধ অধিকার একমাত্র তারই। সুতরাং বৃদ্ধার বক্তব্যে অখুশি ও বিরক্ত বেহুলা আপন মনে মুক্তাসারে নামে। স্নান করে। সাঁতার কাটে। সাঁতার কাটার সময় পাশাপাশি ও কাছাকাছি কেউ থাকলে তার গায়ে জল ছিটে লাগতে পারে। বেহুলার স্নানের সময় অনিচ্ছাকৃতভাবে মনসার গায়ে পায়ের জল লাগে—

জলকেলি করে বেউলা গোলুনি মারে পায়ে।
গোলানির জল গেল মনসার গায়ে॥[৬]

'একাদশীর উপবাসী' করা মনসার গায়ে বেহুলার পায়ের জল লাগলে মনসা শাপ-শাপান্ত করেন এই ভাষায়—

শুদ্ধভাবে হই যদি ব্রাহ্মণের যতি।
বিবাহের রাত্রে বেউলা খাইয় নিজ পতি॥
স্বামীর পাতে না দিয় ভাত না পুড়িয় হাঁড়ি।
বিবাহের রাত্রে তুমি হইয় কাঁচা রাঁঢ়ী॥[৭]

পদ্মার অকারণ অভিসম্পাতে হতবাক হয় বেহুলা। এই অভিসম্পাতের কোনো মানে নেই। কোনো অন্যায় সে করেনি। তাহলে কেন তাকে অভিশাপের ভাগী হতে হবে। অত্যন্ত ব্যথিত বেহুলা বলে—যতির যে ধর্মসাধনা তা মিথ্যা। কেননা, এমন অল্প বয়সে তার চারিত্রিক ভ্রষ্টতার কারণেই এই বৈধব্য। আর বৈধব্য অবস্থায় পরপুরুষ সংগ্রহের

আশায় তার অকারণ রাজপথে আগমন। গভীর খেদোক্তিজনিত এই উক্তিগুলি তৎকালীন বিধবাদের চারিত্রিক শুদ্ধতা বিষয়ে প্রশ্ন তোলে—

যত যতি সন্ধ্যা করে তারা সব রহিছে ঘরে
রাজপথে কেন অকস্মাৎ।
যার তার ঘরে যাও মৎস্য লুকাইয়া খাও
বৎসরে বৎসরে গর্ভপাত॥[৮]

শ্লেষমিশ্রিত এই অভিযোগে কুপিত হন দেবী; তবুও তিনি নিরুপায়। কারণ তাঁর নিজেরই স্বার্থসিদ্ধির জন্যে অকারণ অভিশাপ প্রদান যে অমানবিক আচরণ, তা তাঁর থেকে স্পষ্ট করে আর কেউ জানেন না।

৫.

চন্দ্রসদাগরের পাত্রী নির্বাচন : 'হেন গুণবতী কন্যা বড় ভাগ্যে পাই'

উজানিনগরের মধ্যে বিত্তশীল সাহে বেনে-কন্যা বেহুলার শুধু রূপে নয়, অসম্ভবকে সম্ভব করবার মতো গুণেও বিস্মিত হন চন্দ্রসদাগর। দুটি অসাধ্যকর্ম বেহুলাকে দিয়ে তিনি সম্পন্ন করান। যথা—

ক॥ মৃত শোল মাছকে পুনর্জীবন দান করা।
খ॥ লোহার কলাই সিদ্ধ করা।

বেহুলার অসম্ভব সম্ভবপর ক্ষমতায় অভিভূত চম্পকনগরের বণিক শ্রেষ্ঠ চাঁদ সদাগর। এই কন্যা অপূর্ব সুন্দরী। কল্যাণকামী। সর্বগুণান্বিতা। সর্ব কর্মে সে নিপুনা। সুতরাং চাঁদের সিদ্ধান্ত এই কন্যার সঙ্গেই তিনি তাঁর কনিষ্ঠ পুত্রকে বিয়ে দেবেন। পাত্রীকে পছন্দ ও নির্বাচন করে চিন্তিতা সনকাকে বণিক চন্দ্রসদাগর জানান—

সোনাইগ নিকটে আসিয়া কথা শোন।
কত কহিব বেউলা বধূর গুণ॥
বেউলা আসিছিল জল ভরিতে।
দেখিলাম তাহারে সাক্ষাতে॥
বেউলা আমার পরম সুন্দরী।
সাক্ষাতে স্বর্গ বিদ্যাধরী॥
মরা সউল দিলাম বেউলার হাতে।
তাহা বেউলারে জিয়ার সাক্ষাতে॥
বেউলায়ে মরিলে জিয়াইতে পারে মড়া।
ডুবিলে তুলিতে পারে ভরা॥
বেউলার গুণ দেখহ সাক্ষাত।
লোহার কলাই হইয়াছে ভাত॥[৯]

পুত্রের উপযুক্ত পাত্রী সম্পর্কে পত্নীকে জানানো চন্দ্রসদাগরের প্রশংসাপত্র থেকে কতকগুলি

সূত্র বেরিয়ে আসে। যেমন—

১. বেহুলা অসম্ভব গুণবতী। সেই গুণ দু'একটি নমুনার মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। তাই চন্দ্রসদাগর জানালেন, 'বধূর গুণ' 'কত কহিব'।

২. বেহুলার রূপ বর্ণনায় বিজয়গুপ্ত লেখেন, তার মুখখানি পূর্ণিমার চাঁদের মতো সুন্দর। সুন্দর দাঁত কুন্দকুসুমকে পরাভূত করে। এলায়িত কেশদাম। ললাটে সুদৃশ্য তিলক। অধরে তাম্বুলের রক্তিম বর্ণ। সুতীক্ষ্ণ নাসিকা। নয়নে কাজল সুশোভিত। 'হিয়ার' মধ্যে রক্ষিত স্তন 'সরোবরের মধ্যে যেন কমলের কড়ি'। হাঁটার গতি গজেন্দ্রের সঙ্গে তুলনীয়। জল ভরতে আসা বেহুলাকে দেখে ভাবী শ্বশুর চাঁদের অনুভব : 'বেউলা আমার পরম সুন্দরী।'

৩. বেহুলা মৃতের পুনর্জীবন দানে সমর্থ। বণিক চন্দ্রসদাগর তার প্রমাণ পেয়েছেন মৃত শোল মাছের জীবন দানের ঘটনায়।

৪. বেহুলা নিমজ্জিত লোহাকে অস্বাভাবিক সাধনায় জলের উপরে তুলে আনতে পারে। অর্থাৎ একদিন ভাবী শ্বশুরের নিমজ্জিত বাণিজ্যতরীও অতি স্বাভাবিক ঘটনার মতো বাস্তব সত্যে ফিরিয়ে আনতে পারবে। তাই 'লোহার কলাই হইয়াছে ভাত।' —এ ঘটনাও বেহুলার অন্যতম অসম্ভব-সম্ভব-ঘটন পটীয়সী গুণের নিদর্শন।

৬.

বেহুলার বিবাহ : 'কে যায়ে অভাগিনির প্রাণ লইয়া বেউলায়ে'

চম্পক নগর ও উজানি নগর—দুটি নগরের ভৌগোলিক দূরত্ব কমিয়ে আনা হয়েছে লখিন্দর ও বেহুলার বিবাহের মধ্যে দিয়ে। বণিক হিসাবে চন্দ্রসাগর ও সাহে—দু'জনেই প্রতিপত্তিশালী। বহুবিধ আয়োজনে বিবাহকার্য সম্পন্ন করছে দুই পরিবার। দেবতারা পর্যন্ত এই বিবাহ পরিদর্শনে উৎসুক। অনাহূত দেবী পদ্মাও উপস্থিত হন বিবাহে। তাঁর ইচ্ছা, অন্তত তখনও বণিক চন্দ্রসদাগর অহংকারের প্রাচীর অতিক্রম করে তাঁকে দেবীরূপে পরিবারে ও সমাজে মর্যাদা দান করুক। কিন্তু চাঁদ মনসা সম্পর্কে সম্পূর্ণ উদাসীন, নীরব, আগ্রহশূন্য। এখানে চাঁদ ও মনসার দ্বন্দ্ব আসলে ব্যক্তিত্বের পরাভবের দ্বন্দ্ব, প্রতিষ্ঠার দ্বন্দ্ব, অহংসত্তার দ্বন্দ্ব। সেই দ্বন্দ্বের নিরুপায় শিকার বেহুলা। মনসার নাগছত্র লখিন্দরের মাথার ওপর দুলতে থাকলে অত্যন্ত ভীত লখিন্দর মূর্ছা যায়। মূর্ছিত পুত্রকে দেখে বণিক চন্দ্রসদাগর বিলাপ শুরু করেন। মনসার কাছে বেহুলা অনেক সাধ্য-সাধনা করে লখিন্দরের প্রাণ ফিরিয়ে দেওয়ার প্রার্থনা করেন—

দেবী বিষহরি শিবের কুমারী
তিলেক দয়া নাহি তোমা।

কর জোড়ে তোমা করম স্তুতিং
একবার কর ক্ষমা॥[১০]

ক্ষমাহীন দুর্বাশা মুনির মতো মনসাও প্রথমে নিরুত্তাপ থাকে। পরে অবিচল প্রত্যয়ী বেহুলা 'নরসিংহ কাটারি দিয়া দুই স্তন কাটে'। এমনকি, শেষপর্যন্ত 'নরসিংহ কাটারি দিয়া কাটিতে চাহে গলা'। অতঃপর বেহুলার অসম্ভব আত্মপ্রত্যয় ও মানসিক জোর সম্পর্কে সচেতন দেবী মনসা 'স্ত্রীবধ' হওয়ার মতো পাপ থেকে মুক্ত হওয়ার ইচ্ছায় বেহুলাকে আত্মহত্যা থেকে নিরস্ত্র করেন—

বেউলার চরিত্রে পদ্মার ভয় লাগে চিত্তে।
রহো রহো বলি পদ্মা ধরে বেউলার হাতে॥[১১]

বেহুলার চরিত্রের দৃঢ়তা সম্পর্কে মনসার ধারণা স্বচ্ছ হওয়ায় দেবী পদ্মা 'রহো রহো বলি' একপ্রকার নাটকীয় উৎকণ্ঠায় বেহুলার হাত চেপে ধরেন। বেহুলার আত্মসম্মানজ্ঞান লক্ষণীয়। দেবীর আশীর্বাদে বক্ষস্থল পূর্ণ হল। কিন্তু শূন্য বক্ষস্থলে লোকের সামনে কি যাওয়া যায়। সেখানে আমন্ত্রিত অতিথিরা রয়েছেন। চম্পক নগর থেকে আসা বরযাত্রীরাও রয়েছেন। তাদের সামনে বেহুলা দাঁড়াবেন কী করে! তাই মনসার কাছে বেহুলার বক্তব্য—

না বুজিয়া কাছালি ছিঁড়িলাম বড় কোপে।
শূন্য বুক দেখিয়া কি বলিব লোকে॥
বিহার কালে ছিল এখন কেন নাই।
দেখিয়া না করিব বিহা সুন্দর লখাই॥[১২]

বেহুলার কথা শুনে পদ্মাবতী বিশ্বকর্মাকে কাঁচুলি নির্মাণের আদেশ দিলেন। বিশ্বকর্মা তাঁর শৈল্পিক নৈপুণ্যে উন্নত মানের কাঁচুলি নির্মাণ করলে 'কাছালিতে লিখিলেক নানা দেবগণ।' হরষিত মনে বেহুলা নানাবিধ মূল্যবান অলংকারে সজ্জিত কাঁচুলি পরিধান করলেন। মনসাকে আত্মতৃপ্ত বেহুলা প্রণাম নিবেদন করলে চাঁদের অনিষ্টকারী মনসা সাবধান বাণী উচ্চারণ করলেন—

পদ্মা বলে বেউলা কহিলাম তোর ঠাঁই।
চম্পকনগরে গিয়া দংশিব লখাই॥[১৩]

লখাই দংশিত হবে—এ খবর রয়েছে চন্দ্রসদাগর, সনকা, বেহুলা এবং স্বয়ং লখাইয়ের কাছে। মৃত্যুভয়ে কে না আতঙ্কিত হয়? মৃত্যু নিশ্চিত জেনেও বিবাহের পূর্ব থেকেই নিষ্ঠুর মৃত্যুকে চ্যালেঞ্জ জানিয়েছে বেহুলা। তাই লখিন্দরের মৃত্যুবিধান জেনেও তার অমর প্রেমের বার্তাকে মৃত্যুর কাছে নতি স্বীকার করানোর মতো মানসিক কার্পণ্য দেখায়নি বেহুলা। এখানেই তার ব্যক্তিত্ব, চরিত্র ও মানসিক দৃঢ়তা পদ্মাপুরাণের প্রতিটি চরিত্রকে অতিক্রম করে যায়; এমনকি বণিক চন্দ্রসদাগরকেও। বণিক চন্দ্রসদাগর পুত্রবধূকে উজানিনগর থেকে চম্পকনগরে আনবার সময় বেহুলা জননী সুমিত্রাকে কথা দিলেন বেহুলার কোনো অমঙ্গল হবে না। বরং সুখেই থাকবে। একথাও জানালেন যে, পুত্র

ও পুত্রবধূকে তিনি লোহার বাসর ঘরে রাখবেন। তবু তনয়াকে পরের ধন হিসেবে স্বীকৃতি দিলে পাষাণ জননীর হৃদয়েও বর্ষার ঢেউ ওঠে। চোখে জল আসে। আর তখন সামাজিক কবির হৃদয় থেকে উৎসারিত হয় এই ধুয়া—যা জননী মাত্রই উচ্চারণ করেন নীরবে কিংবা সরবে—'কে যায়ে অভাগিনির প্রাণ লইয়া বেউলারে।'

৭.

রতি দমনের অনুরোধ : 'আজুকা থাকহ প্রভু চিত্তে ক্ষমা দিয়া।'

লোহার বাসরে যদি লখিন্দরের মৃত্যু না হয় 'তবে (তার) মৃত্যু নাহি আর শতেক বৎসর।' এজন্যে মনসা অষ্টনাগকে প্রেরণ করলেন বাসর ঘরে। কিন্তু সাহের কুমারীর প্রখর বুদ্ধিতে অষ্টনাগ বন্দি হল।

সাহের কুমারী বেউলা বুদ্ধিতে আগুলি।
দুগ্ধ আর কলা সমুখে দিল ঢালি॥[১৪]

'দুগ্ধ আর কলা' খেয়ে অষ্টনাগ বন্দি হলে মনসা চিন্তিত হন। অবশ্য কবি বিজয়গুপ্ত নাগের সঙ্গে বেহুলার বাকপটু খেলার জয়-পরাজয়ের বিস্তর বর্ণনায় তাঁর পাঠককে ক্লান্ত না করিয়ে বাসরের রাত জাগা দুটি স্বাধীন প্রাণের বহু স্বপ্নের দু'একটিকে তুলে ধরেছেন। লখিন্দর দুটি প্রার্থনা করেছে নব পরিণীতা বধূর কাছে। প্রার্থনা দুটি হল—

ক॥ 'উঠিয়া রন্ধন কর বেউলাগ'= ক্ষুণ্ণিবৃত্তি দূর করা = শারীরিক চাহিদা।

খ॥ 'হেন কালে লখিন্দর আলিঙ্গন চায়ে' = যৌনক্ষুধা দূর করা = জৈবিক চাহিদা।

লোকজনহীন লৌহনির্মিত বাসর ঘর এবং সংগতই তা নিশ্ছিদ্র। বাইরে প্রহরায় রয়েছেন সচেতন শ্বশুর চন্দ্রসদাগর। উজানিনগরের মানুষগুলি নিশ্চিন্তে ঘুমে আচ্ছন্ন। এমতাবস্থায়—

১. লোহার ঘরে রান্না করা অসম্ভব। রান্না প্রস্তুত করবার নির্দেশদানও অসংগত। কারণ রান্নার কাঠ, জল, চাল, কিছুই লোহার বাসর ঘরে নেই। তবুও স্বামীর প্রথম অনুরোধ পূরণের আপ্রাণ প্রচেষ্টায় বেহুলা তৎপর। তার তৎপরতার নিদর্শন—"বরণ ঘটের চাউল লইয়া পূর্ণ ঘটের জল।/নেত্রের আঁচল চিরি জ্বালিল আনল॥/তিন দিকে দিল বেউলা তিন নারিকেল।/চাউল যুখিয়া বেউলা হাঁড়িতে দিল জল॥"[১৫]

স্বামীর একান্ত অনুরোধে বেহুলা রান্নার আয়োজন সম্পূর্ণ করতে মনোনিবেশ করলে পুনরায় তার কাছে উপস্থিত হয় দ্বিতীয় প্রার্থনাটি। সেই প্রার্থনা অবশ্যই জৈবিক।

২. একাকী বাসরঘরে পরমাসুন্দরী নববধূকে দেখে লখিন্দরের মনে কামনার উদ্রেক হয়। কাছে ডেকে সে নববধূর আলিঙ্গন চায়। কিন্তু হিন্দু নারীর

বিবাহের পরের রাতকে 'কালরাত' বলে চিহ্নিত করা হয়। এই সংস্কারকে লোকসমাজ ও শিক্ষিত সমাজ উভয়েই মানে। তাই লখিন্দরের দ্বিতীয় অনুরোধও অসংগত। বলাবাহুল্য সমাজ-নির্দেশিত এই বিষয়টি 'ট্যাবু' বা 'মানা'র অন্তর্ভুক্ত। তাই তীক্ষ্ণধী বেহুলা স্বামীর অনুচিত দ্বিতীয় এই প্রার্থনার প্রত্যুত্তরে জানিয়েছে—"নহে নহে প্রভু নহেত উচিত।/বিবাহের রাত্রে নারী হয়ে গৌরবিত॥/প্রভু তুমি হও আপনে পণ্ডিত।/বিবাহের রাত্রে কেন বল বিপরীত॥"[১৬]

সদ্য বিবাহিতা বধূরা অবশ্যই চায় যেভাবেই হোক স্বামীর প্রত্যাশা পূরণ হোক। বেহুলাও তাই চেয়েছে। কিন্তু লখিন্দরের দুটি প্রার্থিত বস্তু অসম্ভব-সম্ভব গুণধর্মে আরোপিত হওয়ায় বেহুলা শঙ্কিত হয়েছে; তবে বুদ্ধিমত্তা ও প্রখরতার গুণে সে প্রথম চাহিদা পূরণের লক্ষ্যে এগিয়েছে এবং দ্বিতীয় চাহিদাও যে ভবিষ্যতে পূরণ করা যাবে তার ইঙ্গিত দিয়েছে—

> অহে প্রভু সুজন কাণ্ডারী।
> তোমার যতেক ধন আমি সে ভাণ্ডারী॥
> আজুকা থাকহ প্রভু চিত্তে ক্ষমা দিয়া।
> পরশু ভুঞ্জিয় রতি পালঙ্কে বসিয়া॥[১৭]

স্বামীর কাছে নিজেকে সমর্পণ করবার সমস্ত ব্যবস্থাগুলি সত্ত্বেও সামাজিক বিধিনিষেধ ও সংস্কারকে অবনত মস্তকে মেনে নিয়েছে বেহুলা।

৮.
লখিন্দরের মৃত্যু ও বেহুলার করুণ ক্রন্দন : 'না পুরিল মনের সাধ বিধি করিল নৈরাশ'

লোকবিশ্বাস এটাই, সাপের গায়ে ইচ্ছায় বা অনিচ্ছায় কেউ আঘাত না করলে সে দংশন করে না। এই বিশ্বাস বিজয়গুপ্তের মধ্যে ছিল প্রোথিত। কালনাগিনীর গায়ে ঘুমন্ত লখিন্দরের হাত পড়লে দেহে অনিচ্ছাকৃত আঘাতের দায়ে 'বারবার ব্রহ্মা বিষ্ণু সাক্ষী করিয়া' কাল নাগিনি 'লহিল বজ্র কামড় অঙ্গুলি জুড়িয়া'। নাগিনির উজাড় করে দেওয়া সমস্ত বিষের জ্বালায় যন্ত্রণাকাতর লখিন্দর মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ে। নেতার 'আড়াই অক্ষর' পঠিত মন্ত্রের কার্যকারিতার ফল হল বেহুলার অকাল ঘুম এবং তা নিয়তি নির্ধারিত কালঘুম।

লোকায়ত চেতনানুযায়ী, প্রিয়জন দেহ ও মনের কোলটি ঘেঁষে থাকলে মৃত্যু কখনও ঝটিকা আক্রমণের দুঃসাহস পায় না। এ বিশ্বাসে সত্যবান ফিরে আসে সাবিত্রীর কাছে। মরণের হার হয় প্রেমের কাছে। তাই প্রেমের প্রদীপ জ্বালিয়ে বেহুলা বসেছিল বাসরঘরে। দুটি চোখের পাতা তার মুদে আসছিল। তবুও জেগেছিল। কারণ মনসার কুটিল ইচ্ছে তাকে ব্যর্থ করতেই হবে। এ তার সতীত্বের গৌরব। ব্যক্তিত্বের লড়াই। অস্তিত্বের সংকটের কারণ। যে কোনো মূল্যে তন্দ্রার বিরুদ্ধে বেহুলার কঠিন সংগ্রামকে চালিয়ে যেতেই হয়।

কিন্তু নিয়তির মতো ভয়ংকর মনসার জেদের কাছে নতি স্বীকার না করতে বদ্ধ-পরিকর অপরিণত বয়সের বধূ বেহুলা। তন্দ্রাচ্ছন্ন ঘুমের কাছে, মৃত্যুর নির্মম বিধানের কাছে যুদ্ধে অপরিণত বধূ বেহুলা পরাভূত হয়। যেমন পরাভূত হয় একালের নিতাই। বেহুলার বাসর ব্যর্থ হওয়ার মতো তারাশঙ্করের 'কবি' উপন্যাসের নিতাইও তন্দ্রাচ্ছন্ন হলে বসন্ত হারিয়ে যায় মৃত্যুর কোলে। তারাশঙ্কর লিখেছেন—

> রাত্রি তখন শেষ প্রহর। নিতাই তন্দ্রাচ্ছন্ন হইয়া দেওয়ালে ঠেস দিয়া বসিয়াই ঘুমাইয়া পড়িয়াছিল।

রাত্রির শেষ প্রহরে বাসরঘরে বসে কাঁদছে বেহুলা। যে স্বামীর শেষ ইচ্ছে পূরণ করতে ব্যর্থ হয়েছিল—সেই বেহুলা কাঁদছে—উচ্চৈস্বরে। নিজেকে মনে মনে ধিকৃত করেই কাঁদছে। ধিক্কারের কারণও স্বাভাবিক। বেহুলার অতৃপ্ত বাসনাগুলি তাকে তারস্বরে চিৎকার করে প্রতিবাদ জানাতে থাকে। নিজের মনের দিকে তাকিয়ে বিবশা বেহুলা চিন্তা করতে থাকে: 'না পুরিল মনের সাধ বিধি করিল নৈরাশ'। এভাবে নিরাশ হয়েছিল নিতাই কবিয়ালের অতি প্রিয় বসন্ত। তারও সাধ মেটেনি। নিতাই-এর মর্মজ্ঞ গানের ভাষায় বসন্তের উপলব্ধি প্রতিধ্বনি হয়ে ফিরেছিল—

> এই খেদ মোর মনে,
> ভালবেসে মিটল না আশ, কুলাল না এ জীবনে।'

৯.

লখিন্দরের মৃত্যুর কারণ-বিবেচনায় বেহুলার প্রতি তির্যক মন্তব্য—'চান্দে বলে দুষ্টু বধূ না বলিয় আর'।

একটি নারীর কাছে যে দুটি চাহিদার গুরুত্ব সর্বাধিক, তা হল—

> একটি॥
> স্বামীর হৃদয়ের কোলটি ঘেঁষে থাকা।
> অন্যটি॥
> সন্তানের মুখে চিরপ্রত্যাশিত 'মা' ডাক শোনা।

অতি স্বল্পবয়স্কা বেহুলার এই দুটি চাহিদার একটিও পূরণ হয় না, যেহেতু একটির সঙ্গে অন্যটির সম্পর্ক ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে। যে বহু প্রতীক্ষিত রাতটির জন্য একটি মেয়ের কামনাময় প্রতীক্ষা এবং ভালোবাসার কুঁড়ি থেকে ফুলে ও ফলে পরিণতির জন্যে আকাঙ্ক্ষা ব্যক্ত করা, সেই আকাঙ্ক্ষা ব্যর্থ হওয়ার যন্ত্রণা বেহুলাকে অস্থিরচিত্ত করে তোলে। তার বাসর গড়ার সাধ পূর্ণ হয় না। বিদ্যুৎ যেমন নিজের আগুনে নিজেকেই দগ্ধ করে রবীন্দ্রনাথের 'চতুরঙ্গ' উপন্যাসের দামিনীও তেমনি নিজের আকাঙ্ক্ষার অগ্নিতে দগ্ধ হয়ে জানায়—'সাধ মিটিল না'। শচীশ তার ডায়েরিতে লিখেছে—

দামিনীর মধ্যে নারীর আর এক বিশ্বরূপ দেখিয়াছি, সে নারী মৃত্যুর কেহ নয়, সে জীবনরসের রসিক।

'জীবনরসের রসিক' দামিনী, ইংরেজি সাহিত্যের অধ্যাপক-কবি বিষ্ণু দে'র উপলব্ধিতে পিপাসার্ত প্রেমের অনুভূতিতে মুখর। বিষ্ণু দে'র দামিনী 'প্রেমের সমুদ্রে ফের খুঁজেছিল পূর্ণিমার নীলিমা অগাধ।' 'সমুদ্রের তীরে' আত্ম-উন্মোচনে উৎকণ্ঠিত দামিনীর প্রেম-প্রতীক্ষিত-ব্যথা অনেক আগেই উঁকি দেয় বেহুলার মধ্যে। বিজয়গুপ্তের 'পদ্মাপুরাণে'র বেহুলার প্রেম পূর্ণতা না পেতেই তা মিলিয়ে যায় প্রত্যক্ষে সন্ত্রাসবাদিনী মনসার রোষে এবং পরোক্ষে আভিজাত্যে অনড় শ্বশুর বণিক চন্দ্রসদাগরের অহংকারে। তাই সেদিন বেহুলা অনুভব করেছিল 'মিটিল না সাধ'। সাধ অপূর্ণ থাকার যন্ত্রণা শেষ না হতেই সন্তানহারা শাশুড়ির সমুদয় আক্রোশ বেহুলার প্রতি নিবদ্ধ হয়—

সোনাই বলে বেউলা তুমি লঘুচর জাতি।
বিহার রাত্রে খাইলা পতি নহে বাসি রাত্রি॥[১৮]

আশ্চর্য এ বক্তব্য—'মরে পুত্র জনকের পাপে'। অথচ 'কুলক্ষণা' প্রমাণিত হয় বেহুলা। গিরিশচন্দ্রের জনা মদনমঞ্জরিকে তিরস্কৃত করেন পুত্র প্রবীরকে যুদ্ধে যোগদান করবার উৎসাহের পরিবর্তে নিরুৎসাহ করবার জন্যে। আর সনকার তিরস্কৃত করবার কথা ছিল সব জেনে শুনে পুত্রকে বিয়ে দিয়ে নিম্নশ্রেণির দেবী মনসার বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তুলেছিলেন যে অহংকারী স্বামী চন্দ্রসদাগর—তাঁকে। এমন করে করে একমাত্র ধন বীরবাহু নিধন হলে প্রিয় মহিষী চিত্রাঙ্গদা দুষেছিলেন স্বামী দশাননকে। এখানে পূর্ববঙ্গের কবি বিজয়গুপ্ত লোকসমাজের সংস্কারকে শিরোধার্য করে এবং সাবিত্রীর মতো পরম পুণ্যবতী সতীদের কথা মনে রেখেও বেহুলাকে 'পাপীয়সী' করলেন তাঁর সতীত্বের পরাভব হওয়ার কারণে। বস্তুত, লোকসমাজ অদ্যাবধি বিশ্বাসী এই প্রবাদপ্রবচনে 'বাঁচে পতি সতীর পুণ্যে'। সুতরাং সতী বেহুলার পুণ্যে লখিন্দর বাঁচেনি বলেই সনকা তাকে গালি দিয়েছে 'লঘুচর জাতি' বলে।

বেহুলা চরিত্রের ওপর লৌকিক ও পৌরাণিক—দুই প্রভাব স্পষ্ট। লৌকিক দর্শনানুযায়ী বেহুলা জানায় 'না জানি বিধাতা মোর কি লিখিল কপালে।' এখানে বেহুলা অদৃষ্টবাদী। আবার তার চরিত্রে পুরাণের প্রভাবও লক্ষণীয়—'সর্পাঘাত হইলে অগ্নিতে না পুড়ি।' এই বক্তব্যের প্রমাণে 'পুরাণ কালের কথা' স্মরণ করেছে বেহুলা। কিন্তু বেহুলার পুরাণপ্রিয়তাকে শ্বশুর চন্দ্রসদাগর অস্বীকার করেছেন এবং লখিন্দরকে নদীতে ভাসিয়ে দেওয়ার সংকল্পে লক্ষ করেছেন ভ্রষ্টচরিত্র হওয়ার সুযোগ। কেন পুত্রের সর্পাঘাতে মৃত্যু হওয়ার পরেও পুত্রবধূর করুণ বক্তব্যকে উপেক্ষা করলেন চন্দ্রসদাগর, তার কারণ নিজেই ব্যাখ্যা করেছেন জোরাল ভঙ্গিতে—

চান্দে বলে দুষ্টু বধূ না বলিয় আর।
অগ্নিতে পুড়িয়া লখাই করি ছারখার॥
ভাসাইলে হবে যাহা তাহা বোলম মুই।

অবশ্য লখাইর সঙ্গে যাবা বাঁক দুই॥
কূলে কূলে যাবা তুমি লাগ পাইয়া ঘাটে।
লখিন্দর জলে ফেলি তোমা নিব ঠেটে॥
যার ঘরে যাবা তুমি তার প্রাণেশ্বর।
শিয়াল শকুনে খাবে মোর লখিন্দর॥[১৯]

এর থেকে অপমানকর ও কটূক্তি ইঙ্গিত আর কি হতে পারে! তৎকালীন সমাজও বেহুলাকে কু-বোল ও কু-ইঙ্গিত করতে ছাড়ে না। অসহায়া বেহুলা বড়ো আক্ষেপে সমাজের নিষ্ঠুর মনোভাবকে ব্যক্ত করেছে—

বিধাতা পাষণ্ড হইলে কার্য্যে নাহি ভাস্য।
বিহার রাত্রে স্বামী মরে লোকে উপহাস্য॥[২০]

তাকে 'লোকে উপহাস্য' করে! স্বল্পবয়সে বৈধব্যে মনসার উপহাস্য; সতীত্ব প্রমাণে ব্যর্থ হলে শ্বশুর ও শাশুড়ির উপহাস্য। যদিও বেহুলা উপহাসের পাত্রী নয়। তার সম্মুখে উপস্থিত সমস্ত সংকটের কারণ তার শ্বশুর-পরিবার। বস্তুত, মনসা দেবসমাজ ও মানবসমাজের অকারণ ও অবারণ ক্রূর দৃষ্টির শিকার হয়েছে।

১০.
অনিশ্চিত পথ, একাকী বেহুলা—'ভাসিয়া চলিয়া মাজুষ যথা পদ্মাবতী'

কলাগাছ কেটে 'মাজুষ' নির্মাণ করে এক স্থান থেকে অন্যত্র যাত্রা করা লোকসমাজের মধ্যে আজও দেখা যায়। নদীমাতৃক বাংলাদেশে জলপথে যাত্রার জন্যে ভিন্ন ভিন্ন যানবাহন ব্যবহার করে লোকসমাজ। ব্যবসা-বাণিজ্য, দেশভ্রমণ থেকে শুরু করে বনভোজন পর্যন্ত স্টিমার, লঞ্চ, জাহাজ ব্যবহৃত হয়। খেয়া পারাপার ও অপেক্ষাকৃত স্বল্প দূরত্বের ব্যবধানে নৌকা ব্যবহৃত হয়। ডিঙা ব্যবহৃত হয় বড়শি দিয়ে মাছ ধরবার কাজে। রাজবংশি পাড়ায় তালগাছ চেরাই করে ডিঙা তৈরির প্রবণতা চোখে পড়বার মতো। বন্যার সময়ে ডিঙা ও কলার ভেলার গুরুত্ব তুল্যমূল্য। জলপথে ভেলার ব্যবহার খুবই প্রাচীন। কলার 'মাজুষে' করে সর্পের বিষাক্ত ছোবলে মৃত মানুষকে ভাসিয়ে দেওয়ার প্রথা বহু প্রাচীন। লোকবিশ্বাস, মৃত মানুষকে কোনো গুণী বা ওঝা প্রাণে বাঁচিয়ে দিতে পারে। লোকসমাজ এই বিশ্বাস থেকে এখনও সরলমতি মানুষজন মৃতকে কলার 'মাজুষে' তুলে দেয়।

বেহুলার কলার মাজুষে করে মৃত স্বামী লখিন্দরসহ স্বর্গপুরী যাত্রার কল্পনা বহু প্রাচীন। একমাত্র 'সতী' স্ত্রীর পক্ষেই সম্ভব এই দুর্গম পথে একাকী যাত্রা করা। এক্ষেত্রে 'লোককথা'র মোটিফ অনুযায়ী কনিষ্ঠ পুত্র, কনিষ্ঠ কন্যা কিংবা পুত্রবধূ সফল হয়ে থাকে। চন্দ্রসদাগরের লখিন্দরসহ সাত পুত্রের যে বধূরা ছিল, একমাত্র বেহুলাই তাদের মধ্যে অসাধ্য সাধন করেছে। লোকসাহিত্যে এই বিষয়টি 'Victorious Youngest son' অথবা 'Victorious Youngest daughter' মোটিফের এর অন্তর্ভুক্ত। বেহুলা জানালেন—

বেউলা বলে আমি যদি হই সতী।
ভাসিয়া চলিয় মাজুষ যথা পদ্মাবতী।।[২১]

উজান স্রোতে 'মাজুষ বায়ুগতি যায়ে'—এই অসাধ্য সাধনের কারণ বেহুলা যেহেতু 'সতী' ছিলেন। অর্থাৎ লোকবিশ্বাস সতী-সাধ্বী রমণীর পক্ষেই সম্ভব অলৌকিক ক্ষমতার বাস্তবায়িত করা।

১১.

অধঃপতিত যুবক, বিকৃত হাসি, কদাকার চেহারা

চম্পকবাসীদের বেহুলা কথা দিয়েছিল, 'মড়া স্বামী জিয়াইব ভাসুর ছয় জন'। তিনি সকলের সামনে প্রতিজ্ঞাবাণী উচ্চারণ করেছিল, 'জিয়াইতে না পারি যদি না আসিব আর'। তার অটল প্রতিজ্ঞাপূরণে বাধা স্বরূপ কখনও নেতা, কখনও বা মনসা শ্বেতকাক, ব্যাঘ্র, কুম্ভীরের ছদ্মবেশে উপস্থিত হন তার সামনে। দাবি করেন পচা, গলা, অস্থিসর্বস্ব লখিন্দরকে। বেহুলা নিজের দেহের বিনিময়ে তাঁদের লালসাকে প্রতিরোধ করে। বহুরূপী দেবীকে (লোকসাহিত্যে যাকে 'Transformation motief' বলা হয়, 'রূপবদল' করে পদ্মাবতীর ব্যাঘ্ররূপ ইত্যাদি তারই দৃষ্টান্ত।) দেহদান করা যায়; কিন্তু অধঃপতিত যুবককে কী দেবে বেহুলা? তাদের দাবি তো দেহকেন্দ্রিক যৌনতার সঙ্গে সম্পর্কিত। নিরুপায় বেহুলা দুটি জিনিস দিতে পারে—হয় আশীর্বাদ না হয় অভিশাপ। সুন্দরী যুবতীর আশীর্বাদ প্রত্যাশী মূর্খ আর কে হতে চায়! শুম্ভ-নিশুম্ভের মতো প্রত্যেকেই চায় হয় পাণিগ্রহণ না হয় মৃত্যুবরণ। দেখা যাক বেহুলা কী দিচ্ছে—

বেউলারে ধরিতে গোদা জলে দিল ঝাঁপ।
বেউলার ধরিতে যায়ে মনের সন্তাপ॥
মনসার পায়ে বেউলা কহে করপুটে।
আপন হাতের বড়শি গোটা আপন পায়ে ফোটে॥[২২]

গোদার মতো অধঃপতিত যুবক হল ধনা ও মনা। এরা সহোদর। খেয়া দেওয়া এদের কর্ম। খেয়ার উপার্জন থেকে জীবিকা নির্বাহ হয়। অসহায়া লখিন্দর-পত্নীকে দেখে তাদের লালসার বীজগুলি অঙ্কুরিত হয়। তারা মনসা-কন্যাকে যে কথাগুলি জানায়, তা তৎকালীন যুবসমাজের বিকৃত রুচির পরিচয়। এই প্রসঙ্গে বিজয়গুপ্ত লিখেছেন—

আগা পাছা সুঠান করি সাজাইল নাও।
ধনা মনা বলে কন্যা আর কোথা যাও॥
কোন কার্য্যে মড়া লইয়া জলমধ্যে ভাস।
জলে মড়া ফেলাইয়া আমার ঘরে আইস॥
আমার ঘরে নারী নাহি সবে দুই ভাই।
যখন যে বস্তু পাই দিব তোমার ঠাই॥[২৩]

যৌনক্ষুধায় পরস্ত্রীর হাতকেও অতি কোমল বলে মনে হয়। ধনা ও মনার মতো যুবকের

দৃষ্টি তারই পরিচায়ক। মৃত স্বামীর মাজুষে করে উজান ঢেউয়ে দুর্গম পথাতিক্রমণের সময় বেহুলা আত্মহত্যার সিদ্ধান্তে উন্মুখ যুবক টেটনাকে দেখে। কিছুটা বিচলিত হয় বিবাহিত পুরুষের স্ত্রীকে পর্যন্ত অপরের হাতে পণবন্দি করে খেলা করবার নেশা দেখে। আত্মহত্যার অধিকারকে চূড়ান্ত বলে সিদ্ধান্ত নিয়েছিল যে টেটনা, সে কী শুনিয়েছিল বেহুলাকে দেখা যাক—"টেটনা বলেন মোরে কি জিজ্ঞাস আই।/মোর সমান অভাগিয়া পৃথিবীতে নাই॥/জাতি মালাকার আমি সাধুর নন্দন।/শিশু কালে মৈল বাপ থুইয়া বহু ধন॥/বাপের ধন হারাইলাম করি অবহেলা।/সকল ধন হারাইলাম খেলাইয়া খেলা॥/কাইল খেলায় হারিয়াছি ঘরের নারী।/সেই খেলা অভাগিয়া পাসরিতে নারি॥[২৪]

পঞ্চদশ শতাব্দীর এক 'আলালের ঘরের দুলাল' তার সর্বস্ব হারানোর যে বিবরণ দেয় তা থেকে পরবর্তীকালে মধুসূদনের 'একেই কি বলে সভ্যতা' কিংবা দীনবন্ধুর 'সধবার একাদশী' প্রহসনের মদ্যপ, লম্পট, অর্ধশিক্ষিত ইঙ্গ-বঙ্গ যুবকদের কুৎসিত চেহারাকে চিনে নিতে পারি। বেহুলা তার অদম্য ব্যক্তিত্ব, ত্যাগ-তিতিক্ষা ও ধৈর্যের অফুরান শক্তিতে কামুক ও ইন্দ্রিয় শিথিল যুবকদের দেহসর্বস্ব হাতছানিকে উপেক্ষা করে দেবসভায় পৌঁছতে সমর্থ হয়। যদিও দেবসমাজ লুব্ধ দৃষ্টিতে বেহুলাকে দেখেন। আর তখন শিবকে উদ্দেশ্য করে বুদ্ধিমতী বেহুলার উত্তর—

কি কব আমার কথা আমি নারী পতিব্রতা
তুমি দেব জানহ সকল।
যেই লখিন্দর পতি সেই সে আমার গতি
অন্য লোক বাপের সমান॥[২৫]

'অন্য লোক বাপের সমান' বলে বেহুলা লখিন্দরের সঙ্গে অন্য দেবতার পার্থক্যকে সুনিশ্চিত করতে চেয়েছে।

১২.
'যখন সে নেচেছিল ইন্দ্রের সভায়'

যে নৃত্যের কুশলী পারিপাট্যে বেহুলা দেবসমাজের মন জয় করে নিয়েছিল সেই নৃত্যকে জীবনানন্দ তুলনা করেন 'ছিন্ন খঞ্জনা'র নৃত্যের সঙ্গে। এই নৃত্যচর্চাকে ক্রম অনুশীলন ও সাধনার মধ্যে দিয়ে পুনরায় দেবসমাজের কাছে তুলে ধরেছে বেহুলা। শংসাপত্রস্বরূপ পেয়েছে—

১. মৃত লখিন্দরের জীবন।
২. ছয় ভাশুরের পুনর্জীবনের অঙ্গীকার।
৩. শ্বশুরের হারিয়ে যাওয়া চৌদ্দ ডিঙা।

নৃত্যে তুষ্ট দেবসমাজ মর্ত্য নারীর সাংসারিক জ্ঞান, ত্যাগ, বুদ্ধিমত্তার প্রখরতা দেখে বিস্মিত! বেহুলা মৃত স্বামীর প্রাণ নিয়ে শ্বশুরালয়ে ফিরবে, এতো আনন্দের সংবাদ। কিন্তু

তার সামনে বৈধব্যবেশে চন্দ্রসদাগরের অন্য ছয় পুত্রবধূ রোদন বিবশা চেহারা নিয়ে যখন উপস্থিত হবে; তখন বেহুলার মুখের হাসি কি কৃষ্ণপক্ষের অন্ধকারে মিলিয়ে যাবে না? প্রখর বাস্তববুদ্ধি ও চতুরতার সঙ্গে বেহুলা জানায়—"সব নষ্ট হইছে মোর শ্বশুরের বাদে।/স্বামী লইয়া ঘরে যাই তোমার প্রসাদে।।/ছয়ে জায়ে কান্দিয়া দেখিবে মোর সুখ।/সে সব দেখিয়া মোর বিদরিব বুক।।/ছয়ে জায় রাখিয়া ঘরে আসিল একেশ্বর।/ছয়ে ভাসুর জিয়াইয়া দেও চলি যাই ঘর।।"[২৬] মনসার উদ্দেশ্যে বলা বেহুলার এই বক্তব্য তার সাংসারিক জ্ঞানের সুগভীর পরিচয় বহন করে।

১৩.

বেহুলার উজানিতে আগমন ও চন্দ্রসদাগরের পূজাদান॥

বেহুলার চরিত্র সম্পর্কে দেবসমাজ খুশি; কিন্তু তার শ্বশুর-শাশুড়ি কী ভাবছে তা জানতে সুকৌশলী বেহুলা ডোমনি বেশ ধারণ করে। বেহুলা জানায়—

শ্বশুরে পুজয়ে যদি বিষহরি আই।
ধনজন লইয়া চল ঘরে চলি যাই।।
শ্বশুরে না পূজে যদি দেবী বিষহরি।
ধনজন লইয়া আমি যাব দেবপুরী।।[২৭]

চন্দ্রসদাগর মনসার পূজা দিতে সম্মত হলেন। বেহুলার একাগ্রতা, বুদ্ধিমত্তা ও সাংসারিক অভিজ্ঞতার জয় হল।

স্বামী ও স্বামীর পরিবারকে কেন্দ্র করে নারীর যত আত্মত্যাগের কাহিনি লোককবি, মঙ্গলকবি থেকে একালের আধুনিক কবিরা রূপদান করেছেন বেহুলা তাদের প্রতীকস্বরূপ। পরিবারের কল্যাণ কামনায় অতি স্বল্পবয়স্কা বিবাহিতা কন্যার এত বড় আত্মত্যাগ জগৎ সংসারে দুর্লভ। বস্তুত, বেহুলার যাত্রাপথের নানাবিধ প্রতিকূল প্রতিবন্ধকতা মানুষের লোভ ও কামনাজয়ের কঠিনতম পরীক্ষা।[২৮]

স্বামী বিবেকানন্দ তাঁর 'স্বদেশমন্ত্র' রচনায় আদর্শ, ত্যাগব্রতী ও কল্যাণী নারীরূপে সীতা, সাবিত্রী, দময়ন্তীর কথা উল্লেখ করেন। বেহুলা অবশ্যই সীতা ও সাবিত্রীর যৌথ গুণের একক অধিকারিণী। আবার বলা চলে, দেবসমাজের লোভাতুর দৃষ্টি জয়ের পরীক্ষায় সে দময়ন্তীর অন্য আর এক রূপ। অর্থাৎ বিবেকানন্দ-দর্শিত আদর্শ নারী সীতা, সাবিত্রী, দময়ন্তীর সমস্ত গুণাবলির একত্র সমাবেশ হল বেহুলা। লোকসাহিত্যের বিদগ্ধ গবেষক ও আশুতোষ ভট্টাচার্য যথার্থই বলেছেন—

> বেহুলা একাধারে রামায়ণের সীতা ও মহাভারতের সাবিত্রী, দুঃখে সহনশীলতা সে সীতা ও মৃত্যুর সঙ্গে সংগ্রাম করিয়া শক্তিতে সে সাবিত্রী।[২৯]

বস্তুত, স্বর্গ ও মর্ত্যকে একই সমতলভূমিতে দাঁড় করিয়ে বেহুলা স্পষ্টতই দেখাতে চেয়েছে আদর্শ একান্নবর্তী পরিবারের অস্তিত্বকে দৃঢ়ভিত্তির ওপরে প্রতিষ্ঠিত করবার দায়িত্ব

গৃহবধূদের। গৃহবধূর প্রখর ব্যক্তিত্ব, ত্যাগ, সহনশীলতা ও অপার ঔদার্যের গুণেই সংসারের সুখ-শান্তি ও সমৃদ্ধি নির্ভরশীল—এ প্রমাণের জন্যই হয়তো বেহুলার মর্ত্য থেকে স্বর্গে স্থানান্তর গমন।

উৎসের সন্ধানে

১. শ্রীজয়ন্তকুমার দাশগুপ্ত : বিজয়গুপ্তের 'পদ্মাপুরাণ', "অনিরুদ্ধ ঊষা হরণ ও যমযুদ্ধ", পৃ. ১৯৪
২. তদেব : পৃ. ১৯৪
৩. লখীন্দরের বিবাহের ঘুরানী, পৃ. ৩১৮
৪. তদেব : পৃ. ৩২৪
৫. তদেব : পৃ. ৩২৫
৬. তদেব : পৃ. ৩২৫
৭. তদেব : পৃ. ৩২৬
৮. তদেব : পৃ. ৩২৮
৯. তদেব : পৃ. ৩৪২-৪৩
১০. লখীন্দরের বিবাহ : ৪০২
১১. তদেব : পৃ. ৪০৪
১২. তদেব : পৃ. ৪০৫
১৩. তদেব : পৃ. ৪০৬
১৪. লখীন্দর দংশন, ভাসান, জিয়ান, পৃ. ৪১৪
১৫. তদেব : পৃ. ৪১৬
১৬. তদেব : পৃ. ৪১৬
১৭. তদেব : পৃ. ৪১৮
১৮. তদেব : পৃ. ৪৩৫
১৯. তদেব : পৃ. ৪৩৮
২০. তদেব : পৃ. ৪৩৯
২১. তদেব : পৃ. ৪৪৫
২২. তদেব : পৃ. ৪৫৮
২৩. তদেব : পৃ. ৪৫৯
২৪. তদেব : পৃ. ৪৬২-৬৩
২৫. তদেব : পৃ. ৪৯১
২৬. তদেব : পৃ. ৫১১
২৭. তদেব : পৃ. ৫৩০-৩১
২৮. সনৎকুমার নস্কর : 'প্রাগাধুনিক বংলা সাহিত্য : পরিপ্রশ্ন ও পুনর্বিবেচনা', দিয়া পাবলিকেশন
২৯. আশুতোষ ভট্টাচার্য : 'বাংলা মঙ্গল কাব্যের ইতিহাস', পৃ. ৪২২

বিজয় গুপ্তের 'মনসা' : স্বাতন্ত্র্যের সন্ধানে

কৌশিক ঘোষ

চৈতন্য-পূর্ববতী বাংলা সাহিত্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ মঙ্গালকবি বিজয় গুপ্ত। তাঁর এই বিশিষ্টতা প্রকাশ পেয়েছে তাঁর কাব্যের চরিত্র ভাবনায়, কাহিনি নির্মাণে ও শিল্প নৈপুণ্যে। বিজয় গুপ্তের কাব্যে মনসা চরিত্র আলোচনার পূর্বে একথা স্মরণযোগ্য যে, মধ্যযুগের সাহিত্যে চরিত্রগুলি গড়ে উঠেছে প্রধানত দুটি দিক থেকে—(১) অনুসৃতি সূত্রে অর্থাৎ পূর্বসূরীগণের ভাবনার পরম্পরায় ও (২) কবির নিজস্ব জীবন দৃষ্টিভঙ্গির সংযোজনে। আর অনুসৃতি সূত্রে প্রাপ্ত বলে চরিত্রগুলির মধ্যে গতানুগতিকতা লক্ষ করা যায়। চরিত্রগুলি হয়ে উঠেচে টাইপ চরিত্র। অতএব বলা যায় সেদিনের বাংলা সাহিত্যের চরিত্র সৃষ্টিতে কবিদের সীমাবদ্ধতা ছিল। মনসামঙ্গালের অন্যতম প্রধান নারী মনসা-র চরিত্র সৃষ্টিতেও কবিদের এই সীমাবদ্ধতা লক্ষণীয়। তবে এই সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও কোনো কোনো কবি তাঁদের সহজাত কবিত্বের গুণে মনসা চরিত্র সৃষ্টিতে পারদর্শিতা দেখিয়েছেন। যেমন কবি বিজয় গুপ্ত। তাঁর কাব্যে মনসা চরিত্র অত্যন্ত মনস্তত্ত্ব সম্মতভাবে পরিস্ফুট—যা তার কাব্যকে অন্যদের থেকে স্বতন্ত্র মর্যাদার আসনে বসিয়েছে। আসলে, বিজয়গুপ্ত বস্তুধর্মী কবি। তাঁর এই সহজাত বৈশিষ্ট্যের জন্যই চরিত্রের মনস্তাত্ত্বিক দিককে তিনি পরিহার করতে পারেন নি।

'মনসামঙ্গাল'-এর প্রধান দেবী—দেবীমনসা। এই মনসা চরিত্রটি সমস্ত মঙ্গাল দেবতাদের মধ্যেও সবচেয়ে বেশি সন্ত্রাসবাদী। মঙ্গালকাব্যের দেবতাদের একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য শক্তির প্রয়োগ করেই তাঁরা মানুষকে ভীত করে তাদের কাছ থেকে পুজো আদায় করে নিয়েছে। সম্ভ্রমবোধের যে ক্ষেত্র দিয়ে ভক্তি মানব অন্তরে প্রবেশ করে এখানে সেভাবে ভক্তি আসেনি। ভক্তি এখানে এসেছে সন্ত্রাসের মধ্য দিয়ে। সন্ত্রাস সৃষ্টি করে যেন তেন প্রকারে হীন কৌশলে, নিষ্ঠুর ক্রূরতার মাধ্যমে মনসা মানুষকে বিহ্বল করে নিজ কার্যসিদ্ধি করেছে না। মনসা ভীতির দেবী। নীতি নৈতিকতার কোনো স্থান তাঁর মধ্যে নেই। বিষধর সর্পের ছবির মতো কবি তাঁকে সৃষ্টি করেছেন। নারীরূপী দেবতা সর্পরূপী দেবতা সর্পরূপী ভয়ংকরীতে পরিবর্তিত হয়েই বাঙালির পূজা কেড়েছে। সাপের খল হিংস্রতাকে মনসার সন্ত্রাস-চেতনার তুলনায় কোমল ও স্নেহময় বলে মনে করেছেন কবি। তার প্রমাণ-কালী নাগিনী লখিন্দরকে দংশন করতে গিয়ে মুহূর্তের জন্যে হলেও চোখের জল ফেলতে বাধ্য হয়েছে। সেখানে শঙ্কর গাঙ্গুলি এবং তার শিষ্য, চাঁদের সাত পুত্র, চৌদ্দ ডিঙার ভরাডুবি

ইত্যাদি অজস্র নিষ্ঠুর বিবেকহীন কাজ করেও মনসার মধ্যে বিবেকের দংশন দেখা যায় নি। মনসা বিষকন্যা। তাঁর বিষচক্ষে সবাই জর্জরিত। বিমাতা চণ্ডী, স্বামী জরৎকারু, পিতা শিব সকলেই তাঁর বিষে জর্জরিত। তবে একথা ঠিক মনসা পুনরায় বিষহরণ করেও নিয়েছেন তাই বলা যায় মনসা একদিকে যেমন বিষহরী অন্যদিকে তেমনি বিষকন্যা।

মনসা দ্বিধাহীন হিংস্র চরিত্র। তিনি তাঁর উদ্দেশ্য সাধনে নটীর বেশ ধারণ, কিংবা মালিনীর ভূমিকায় অভিনয় করতেও দ্বিধাবোধ করেননি। তিনি যেন মূর্তিমতী নিষেধ। বেহুলার প্রথম দাম্পত্য মিলনের রাত্রিতে, চাঁদ সদাগরের ভবিষ্যৎ সাফল্যের উদ্দেশ্যে বাণিজ্য যাত্রাকালে মূর্তিমতী নিষেধরূপে আবির্ভূত হয়েছেন। স্বর্গকাহিনির উপর মনসার খল-দুস্ট, ক্রূর চরিত্র সংগঠিত হয়েছে এবং সেই চরিত্রের ফলশ্রুতি প্রকাশ পেয়েছে মর্ত্যভূমির কাহিনিতে। মর্ত্যকাহিনিতে এক কাল অমারাত্রি, নিয়ে মনসা সকলের জীবনে (ব্যতিক্রম-জালু-মালু) আবির্ভূত হয়েছেন। তাঁর সর্বশরীরে বিষের কালকূট প্রবাহিত। সেই বিষ বর্ষণে চাঁদ সদাগর, সনকা, বেহুলা, রাখালগণ, হাসান-হোসেন, শঙ্কর গাঙ্গুলি, তার স্ত্রী-শিষ্য প্রভৃতির জীবনে নেমে এসেছে এক ঘনকালো মেঘের কাল- অন্ধকার। ছলে, বলে, কলে-কৌশলে মনসা তাঁর উদ্দেশ্যসাধন করেছেন। এই উদ্দেশ্যসাধনে যেন কোনো হীন কাজ করতে তাঁর মধ্যে বিবেকের দংশন দেখা যায় নি। মনসা সবচেয়ে নিষ্ঠুর আচরণ করেছেন চাঁদের সঙ্গে—চাঁদ যত প্রতিরোধ সৃষ্টির চেষ্টা করেছেন, যত প্রবলভাবে মনসার বিরুদ্ধাচরণ করেছেন মনসা তাঁর মাথা নোয়াতে ততই হিংস্র হয়ে উঠেছেন। সবদিক থেকেই মনসা হয়ে উঠেছেন খল, দুস্ট, হিংস্র, নিষ্ঠুর, অমানবিক, বিবেকহীন- দ্বিধাহীন, সন্ত্রাসবাদী এক রাক্ষসী দানবী চরিত্র। কিন্তু কেন দেবকুলে জন্মগ্রহণ করেও মনসা মানব অপেক্ষা হীন এমন দানবী চরিত্র হয়ে উঠলেন? কবি বিজয় গুপ্ত একমাত্র মনসা চরিত্রের এই পরিবর্তনকে মনস্তাত্ত্বিকভাবে পরিবেশন করেছেন। আর যার ফলে তাঁর মনসা চরিত্র কার্যকারণ সূত্রে বাঁধা এক বাস্তব চরিত্র হয়ে উঠেছে।

মনসা জন্মলগ্ন থেকেই বঞ্চনার শিকার। তিনি পিতার অযোনীসম্ভূতা সন্তান। জন্মক্ষণ থেকে মাতৃহীন-পিতৃহীন হয়ে পদ্মবনে তাঁর যৌবনপূর্ব জীবন কেটেছে। অযোনীসম্ভূতা বলে দেবসমাজে নিন্দিত হয়েছেন। পিতার স্নেহ তো দূরের কথা পেয়েছেন পিতার কাম-লালসার নিবেদন, সৎমায়ের কাছ থেকে পেয়েছে শারীরিক ও মানসিক অত্যাচার। যার ফলস্বরূপ শুনতে হয়েছে পিতার সঙ্গে অবৈধ সম্পর্কের দুর্নাম, হারাতে হয়েছে এক চক্ষু এবং চক্ষু হারিয়ে উপহসিত হতে হয়েছে 'কালী' নামে। মনসা পিতার পছন্দসই দেবসমাজ বহির্ভূত বৃদ্ধ পাত্রকে মেনে নিলেও তার কাছ থেকে পেয়েছেন নারীত্বের অবমাননা, পিতৃনিন্দা। সর্পকুলে জন্মানোর জন্য শুনতে হয়েছে বিষকন্যা নাম, জারজ সন্তানরূপে দেবসামজে নিন্দিত হতে হয়েছে, অষ্টনাগ পুত্রের জন্ম দিয়ে অসহায় নারী যখন পুত্রস্নেহ নিয়ে বাঁচবার চেষ্টা করেছে তখন বিমাতা চণ্ডীর কোপে তাঁর বক্ষের দুগ্ধ শুকিয়ে গেছে, অসমর্থ হয়েছেন পুত্রদের মাতৃদুগ্ধ দিতে। তাঁকে নিয়ে বিমাতার সাথে পিতার কোন্দল হয়েছে, যা দেখে তিনি মর্মাহত হয়েছেন এবং সবশেষে বিমাতা চণ্ডীর শান্তির জন্য পিতা বাধ্য হয়ে তাকে

সান্তালী পর্বতে নির্বাসনে পাঠিয়ে দিলে তিনি নীরবে সামান্য অভিযোগ করে মেনে নিয়েছেন। এভাবে দেখা যায় মাতৃহীনা বালিকা যেখানে প্রত্যাশ করেছেন স্নেহের, সেখানে পেয়েছেন নিদারুণ অত্যাচার ও লাঞ্ছনা। জন্ম থেকে কোনোদিনই তিনি স্নেহ, মায়া-মমতা পাননি। কেবল সবার কাছ থেকে গ্লানি, অপমান, বঞ্চনার স্বীকার হয়েছেন। যে নারী আজন্ম স্নেহ-মায়া-মমতা থেকে বঞ্চিত, তিনি যে তাঁর সুকুমারি গুণগুলি হারিয়ে নীচ-স্বার্থবুদ্ধি, হিংস্র-ক্রূর নারীতে পরিণত হবেন এতে কোনো আশ্চর্য হবার কিছু নেই। মায়া-মমতা যে কি জিনিস যে কোনোদিনই পেলেন না তিনি বুঝবেন কেমন করে তার মাধুর্য। যো ব্যবহার আপনজন তথা সমাজের কাছ থেকে তিনি পেয়েছেন—তাই তিনি হৃদয়ে সঞ্চিত করে বর্দ্ধিত করে ফিরিয়ে দিয়েছেন। নিদারুণ বঞ্চনার অভিঘাতে তার স্বভাবের অন্তর্লীন ক্রূরবুদ্ধি তাঁর অন্তরের সব শুভ বুদ্ধিকে আচ্ছন্ন করে তাঁকে হিংস্র ও আক্রমণে উদ্যত করেছে। হৃদয়ের যেটুকু স্নেহভক্তি ছিল তাও অবশেষে সকলের বিরুদ্ধ আচরণে ধীরে ধীরে শুকিয়ে এক ভয়ঙ্কর রুক্ষ মরুভূমিতে পরিণত হয়েছে। ব্যর্থতার অবমাননায় তাঁর দু-চোখ থেকে অবশেষে বিষের ঢল নেমেছে। তিনি হয়ে উঠেছেন বিষকন্যা। এইভাবে মনসা এক হীন নারী হিসাবে সকলের কাছে পরিগণিত হয়েছেন।

লক্ষণীয়, দেবসমাজে মনসার যে ভয়ঙ্কর, ক্রুদ্ধ মূর্তি দেখা যায় তা কিন্তু তাঁর পূর্ব কোনো উদ্দেশ্যের ফল নয়। সেখানেই তিনি অপমানিত হয়ে অত্যাচারিত হয়েছেন এবং সীমাহীন অত্যাচারের হাত থেকে নিষ্কৃতি পাওয়ার জন্য সেখানেই বিষমূর্তি ধারণ করেছেন। এই সূত্রে বলা যায় যখনই তাঁর ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য অবমানিত অপমানিত হয়েছে তখনই তাঁর অন্তরের অশুভ বিষশক্তি জেগে উঠেছে। অর্থাৎ এক স্বাতন্ত্র্যময়ী তেজোগর্ভ নারীত্বের বীজ তাঁর অন্তরে সুপ্ত ছিল, অন্তসলিলা ফল্গুধারার মতো প্রবাহিত ছিল। এপ্রসঙ্গে শ্রদ্ধেয় সমালোচক ড. ক্ষেত্র গুপ্তের মতটি প্রণিধানযোগ্য—

> দুর্বল, অন্য-সাপেক্ষ, অবহেলিত নারী-মন হলে বিপরীত ঘটনার প্রবাহে তার হৃদয়ের সুকুমার অমৃতত্ব শুধু লুপ্ত হত, এই হলাহলও জেগে উঠত না। এক অখ্যাত সামান্য সমাপ্তিই তার ভাগ্যে ঘটত।

❑ মনসা চরিত্রের বৈশিষ্ট্য

১. সূক্ষ্মানুভূতি প্রবণতা : মনসার জন্ম হয়েছে পদ্মবনে। তাই তাঁর নাম পদ্মাবতী। মনসা অযোনী-সম্ভূতা নারী, জন্মলগ্ন থেকেই তিনি পিতৃ পরিচয়হীনা। কমল বনে একাকী তিনি বেড়ে উঠেছেন। বঙ্কিমের কপালকুণ্ডলা, কালিদাসের শকুন্তলা, সেক্সপীয়রের মিরন্দার মতো তিনি প্রকৃতি লালিত, প্রকৃতিপ্রেমী নারী। পিতা শিব যখন অজ্ঞাতসারে কন্যা মনসার রূপে মুগ্ধ হয়ে কাম লালসা চরিতার্থ করার জন্য তাঁর কাছে প্রেম নিবেদন করেছেন, তখন মনসা তাঁর সূক্ষ্ম অনুভূতির মাধ্যমে বুঝতে পেরেছেন যে, তাঁরই জন্মদাতা পিতা তাঁর কাছে প্রেম নিবেদন করেছেন। তখন মনসা তাঁর সূক্ষ্ম অনুভূতির মাধ্যমে বুঝতে পেরেছেন যে তারই জন্মদাতা পিতা তরা কাছে প্রেম নিবেদন করছেন। ইহা তাঁর চরিত্রের

একটি বিশেষ অন্তর্নিহিত বৈশিষ্ট্য—"বুঝিয়া কার্য্যের দশা/প্রণাম করি মনসা/যোড় হস্তে বলে তুমি মোর বাপ।"

২. ক্ষমাশীলতা : ক্ষমাহি পরমং ধর্ম—এই শাস্ত্র বাক্যটি মনসার চরিত্রে প্রযোজ্য। একসময় মনসার রূপে মুগ্ধ হয়ে, বচাই নামে এক যুবক মনসাকে বল প্রয়োগে ভোগ করতে চেয়েছে। কিন্তু বচাই যখন শিবকন্যা মনসাকে জেনেছে তখন সে তার ভুল বুঝতে পেরে মনসার নিকট ক্ষমা ভিক্ষা করেছে। ক্রুদ্ধ মনসা সহজেই সংহার মূর্তি ত্যাগ করে তাকে পুত্রস্নেহে ক্ষমা করেছেন।

সন্তুস্ট হইল বড়ো জয় বিষহর।
আইস বাচাই পুত্র বুঝি লও বর॥

আবার, অত্যাচারী বিমাতা চণ্ডীকে, বৃদ্ধ নিন্দাকারক স্বামী জরৎকারু মুনিকে তিনি পুনরায় বিষহরণ করে বাঁচিয়ে দিয়েছেন তাদের পূর্ব অত্যাচারের কথা মাথায় রাখেন নি।

৩. সহনশীলতা : সহ্য শক্তি মানুষের ধর্ম। তবে সহ্যেরও সীমা আছে। বিমাতা চণ্ডী শিবের পত্নী ভেবে মনসাকে প্রচণ্ড মানসিক ও দৈহিক নির্যাতন করেছে যার ফলস্বরূপ পিতার সঙ্গে অবৈধ সম্পর্কের দুর্নাম শুনতে হয়েছে এবং হারাতে হয়েছে এক চক্ষু। তবু প্রথমে তাঁর ধৈর্য্যচ্যুতি ঘটেনি। তিনি সৎমা চণ্ডীকে বোঝাতে চেয়েছেন, তিনি শিবেরই কন্যা—

মন দিয়া শুন মাতা কহি তোমার ঠাঁই—
মহাদেবের কন্যা আমি উদাসিনী নই॥

আবার চণ্ডী তাঁর বুকের দুধ ডাকিনীগণের দ্বারা শুকিয়ে দিলে তিনি সহ্য করেছেন। এই সহ্যশক্তি মানুষের ধর্ম। তবে সহ্যেরও একটা সীমা-পরিসীমা আছে। যখন অত্যাচারের, অপমানের মাত্রা চূড়ান্ত পর্যায়ে চলে গেছে তখনই তিনি অসহ্য হয়ে উঠেছেন এবং বিষ দৃষ্টিতে সংহার করেছেন। আর পরবর্তীকালে অর্থাৎ মর্তকাহিনিতে তাঁর ক্রুর হয়ে ওঠার অন্যতম কারণ আত্মপ্রতিষ্ঠার আকাঙ্ক্ষা। তাই বলা যায় সহ্য করবার গুণ কম-বেশি তাঁর মধ্যে বর্তমান ছিল।

৪. পিতৃভক্তিপরায়ণতা, পিত্রানুকূলতা, পিতৃমর্যাদাবোধ : (১) বিমাতা চণ্ডীর প্রহারে মনসা তাঁর বুকে কামড় দিয়েছে। ফলস্বরূপ কালকূট বিষে চণ্ডীর প্রাণ বিয়োগ ঘটেছে। কিন্তু পিতার আজ্ঞায় সমস্ত অত্যাচার ভুলে গিয়ে রক্তঝরা চক্ষু নিয়েও মনসা বিমাতা চণ্ডীর প্রাণ ফিরিয়ে দিয়েছেন। (২) পিতার নির্বাচিত বিগত যৌবন পাত্র জরৎকারু মুনিকে তিনি নির্দ্বিধায় মেনে নিয়েছেন। আবার জরৎকারু মুনি তাঁর পিতাকে অপমান করলে তিনি তাকে দংশন করেছেন। কিন্তু পিতৃ আদেশে পুনরায় মুনিকে আবার বাঁচিয়ে দিয়েছেন। (৩) সান্তালী পর্বতে পিতা নির্বাসনে পাঠিয়ে দিলে তিনি সামান্য দুঃখ করে চলে গিয়েছেন এবং পর্বতে পিতার সঙ্গে তার কথাবার্তার মধ্যে তাঁর পিতৃভক্তির পরিচয় পাওয়া যায়।—"বাপ হইয়া তুমি মোরে দিলা বনবাস।/কান্দিতে কান্দিতে পদ্মা হইলা অচেতন।"

(৪) অষ্টনাগের বিষপূর্ণ সাগরের দুধ মহাদেব পান করে অচৈতন্য হয়ে পড়লে মনসা পুনরায় বিষ সংহার করে পিতাকে বাঁচিয়েছেন। আবার শৈব চাঁদের সঙ্গে মনসার দ্বন্দ্ব। শিব চাঁদকে সহায়তা করলেও মনসার মধ্যে পিতৃভক্তি কমে যায়নি বরং কন্যার প্রীতি সুলভ ব্যবহার তাঁর মধ্যে সর্বদা লক্ষণীয়।

উপরিউক্ত সমস্ত ঘটনার মধ্য দিয়ে মনসার পিতৃভক্তির পরিচয় পাওয়া যায়। তবে স্বামীকে বাঁচিয়ে তোলার ক্ষেত্রে তিনি যে বৈধব্য যন্ত্রণার দুর্বিসহ অবস্থার কথা ভেবেছিলেন-মনস্তাত্ত্বিক দিক দিয়ে বিচার করলে তা অস্বীকার করা যায় না।

৫. দুঃসাহসিকতা : বিবাহের পর মনসা অর্দ্ধরাত্র বাসরঘরে কাটিয়েছেন। স্বামীর সঙ্গে দেহ মিলনের কোনো সুযোগও তিনি পাননি। অথচ স্বামীর কাছে সন্তান লাভের বর প্রার্থনা করেছেন। স্বামীহীন সন্তানধারণে সমাজে নিন্দার কারণ হতে পারেন অবৈধ সন্তানের জননী বলে সকলের কাছে উপহসিত হতে পারেন, কিন্তু মনসা লোকনিন্দার প্রসঙ্গ অবহেলায় উড়িয়ে দিয়ে মানসিক শান্তির জন্য সন্তানের জননী হয়েছেন। এতে তার দুঃসাহসিকতার পরিচয় পাওয়া যায়।

৬. কৃতজ্ঞতা বোধ : বিশ্বকর্মা মনসাকে অপূর্ব পুরী নির্মাণ করে দিয়েছেন। কৃতজ্ঞতাবশত মনসা বিশ্বকর্মাকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন যে খবর পাওয়া মাত্র বিশ্বকর্মার যে কোনো শত্রুকে তিনি নাগবাহিনীর দ্বারা সংহার করবেন।—"যদ্যপি তোমার শত্রু হয় কোন জন। ততক্ষণে নাগে তার বধিবে জীবন।।" তবে এখানে মনসার ক্রূরতা ও স্বার্থবুদ্ধি কাজ করলেও উপকারীর উপকার স্বীকার করে, তার কাছে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা মনসার চরিত্রের একটি বিশেষ গুণ।

৭. রতিশাস্ত্রে অভিজ্ঞতা : শঙ্কর ওঝার স্ত্রী কমলার কাছ থেকে শঙ্করের মৃত্যু-রহস্য জানার জন্য মনসা যুক্তি দিয়েছেন তাদের পরস্পরের দেহ মিলনের দুর্বল মুহূর্তে জেনে নিতে।—"যখন হরিষে ওঝা চাহে আলিঙ্গন/কোপ করিয়া তুমি বলিও বচন।" স্বামী-স্ত্রীর মিলনের দুর্বল মুহূর্তে পরস্পরের আবদার যে রক্ষিত হওয়ার সম্ভাবনা অধিক মনসা তা জানতেন।

৮. স্বার্থসচেতনতা : ব্যক্তিস্বার্থ চরিতার্থ করার জন্য মনসার এহেন কাজ নেই যা তাঁর দ্বারা সম্ভব হয়নি। দেবকন্যা হয়েও নটীর বেশ ধারণ, এমনকি নিজের ভাই কার্তিক গণেশকেও বিষ প্রয়োগে হত্যা করতে চেয়েছেন—"সাধিতে বিষম কাজ/মনসার নাহি লাজ/দেবকন্যা হইলেন নটী।।"

৯. আত্মসমালোচনা : চাঁদ-সোনেকার ছয় পুত্রকে তিনি যে অন্যায়ভাবে নিধন করেছেন তা তাঁর স্বীকারোক্তিতে বোঝা যায়—"মশার দোষে দিলাম মশারিতে আগুন।/সোনেকার দুঃখে প্রাণ জ্বলিছে দ্বিগুণ।।" আত্ম-সমালোচনার দিকটি হয়ত তাই তাঁর মধ্যে প্রবলভাবে প্রবাহিত ছিল।

১০. ক্রূরতা ও ছলচতুরতা : মনসা মর্ত্যলোকে দেবী রূপে প্রতিষ্ঠা পাওয়ার জন্য নানারকম ছল চাতুরতা ও ক্রূরতার আশ্রয় নিয়েছেন। রাখালগণকে ভয় দেখিয়ে তাদের

গো হত্যা করা, হাসান-হোসেনকে বিব্রত করা, চাঁদের ছয় পুত্রকে দুগ্ধে বিষপ্রয়োগে হত্যা করা, শঙ্কর ওঝাকে ও তার যোলো শিষ্যকে নিষ্ঠুরভাবে হত্যা করা, চাঁদের শেষপুত্র লখিন্দর ও বহুমূল্য বাণিজ্যতরী ধ্বংস করায় চাঁদকে সমুদ্রবক্ষে, স্থলভাগে অনেক কষ্ট দেওয়া এবং বেহুলা-সনকা-কমলা প্রভৃতি নারীকে নানাভাবে নির্যাতন করার মধ্য দিয়ে মনসার ক্রূরতা ও ছলচতুরতার পরিচয় পাওয়া যায়। উপরিউক্ত নিষ্ঠুর কার্যসাধনের জন্য স্বর্গ-মর্ত্যে তিনি কলহপ্রিয়া-দুষ্ট নারী হিসাবে আখ্যাত।

১১. গাম্ভীর্য ও আভিজাত্যের অভাব : মঙ্গলকাব্যের আর কোনো দেবীই মনসার মতো নিজের গাম্ভীর্য ও আভিজাত্য বিসর্জন দিয়ে মানবীকন্যার (বেহুলার) নিকট এমনভাবে আত্মদুঃখের কথা বলেননি। সে যে দুঃখের কথা জানিয়েছে তা চাঁদ সদাগর কর্তৃক তাঁকে অবহেলিত- নির্যাতিত-অপমানিত হওয়ার কাহিনি। এতে পুরুষকারের জয় বিশেষিত হয়েছে। দেবী মনসার মহিমা নষ্ট হয়েছে।

❑ মনসা চরিত্রের বৈচিত্র্য

১. দুহিতারূপে : মনসা অযোনী-সম্ভূতা। পিতা শিব ও বিমাতা মনসার কাছ থেকে কোনো স্নেহ-মায়া-মমতা তিনি পাননি। বরং বিমাতার কাছ থেকে শারীরিক ও মানসিক অত্যাচার ও পিতার কাছ থেকে নির্বাসন দণ্ড পেয়েছেন। তাই বলা যায় দুহিতা হিসাবে তিনি এক প্রবঞ্চিতা নারী। অথচ বিমাতা ও পিতার প্রতি তার শ্রদ্ধাভক্তি ছিল। বিমাতা সম্পর্কে তিনি বলেছেন—"আমি কন্যা সতী ঝি/তাহার করেছি কি/তিলমাত্র নাহি তাহার দয়া।" আবার পিতা নির্বাসন দিতে চাইলে তিনি বলেছেন—

"শিব পুরী থাক তুমি আমি যাই বন।/তোমার নাহিক দোষ কপালের লিখন।।"

২. জননী রূপে মনসা : জননীরূপে মনসা ক্ষমাশীলা, স্নেহময়ী নারী। বচাইকে মাতৃসুলভ ব্যবহারে ক্ষমা করেছেন, অষ্টনাগের জন্ম দিয়েছেন সমাজ ভয়কে অস্বীকার করে আবার বুকের দুধ শুকিয়ে গেলে চিন্তিত হয়েছেন। চাঁদকে অত্যাচারের মধ্যে ফেলে দিলেও তার দুর্দিনে সাহায্য করেছেন। ছয় পুত্র হারিয়ে সোনেকার বিলাপে যে মর্মাহত হয়েছে পুত্রহারা জননীর বেদনা তিনি তাও উপলব্ধি করেছেন।

৩. জায়ারূপে মনসা : স্বামীর সঙ্গে অর্দ্ধরাত্র মোটে তিনি কাটিয়েছে কোনো দেহ ও মনের মিলন হয়নি। মুনিকে তিনি বরং আঘাত করেছেন। এই জায়াসুলভ আচরণে তার অপরিণাম দর্শিতার পরিচয় পাওয়া যায়। অতএব বলা যায় জায়া রূপে তিনি, এক প্রত্যাখ্যাত নারী। তাঁর জায়াসুলভটির পরিপূর্ণ বিকাশ হয়নি।

৪. ভগিনীরূপে মনসা : ভ্রাতার প্রতি ভগিনীর টান অধিক। তা সে বৈমাত্রেয় আর নিজ মাতৃগর্ভ জাতই হোক না কেন। কিন্তু মনসা বৈমাত্রেয় ভাই গণেশ ও কার্তিককে বিষপ্রয়োগে হত্যা করবার কথা বলেছে। অর্থাৎ ভ্রাতার প্রতি ভগিনীসুলভ আচরণ তার মধ্যে দেখা যায় নি বরং ত্রূরতাই দেখা দিয়েছে। অন্যদিকে ভগিনী নেতার প্রতি তাঁর প্রেম-ভালোবাসা লক্ষ করা যায়। তাই বলা যায় ভগিনী হিসাবে তিনি ব্যর্থ ও ব্যতিক্রমী চরিত্র।

৫. কপটিনীরূপে মনসা : মালিনী বেশে, গোয়ালিনী বেশে, সাহেলী ব্রাহ্মণীর ছদ্মবেশে,

নটীর বেশে তিনি তাঁর উদ্দেশ্য চরিতার্থ করেছেন। হীন কৌশল অবলম্বন করতেও তিনি পিছপা হননি। ক্ষুধার্ত চাঁদকে তিনি হেনস্থা করেছেন, ভিমরুলের দংশন তাঁকে যন্ত্রণা দিয়েছে। চোর অপবাদ শুনিয়ে প্রহার খেতে বাধ্য হয়েছেন—এভাবেই নানাভাবে মনসা কপটিনী এক নারী হয়ে উঠেছেন।

৬. সন্ত্রাসবাদিনীরূপে মনসা : রাখালগণ, হাসান-হোসেন, চাঁদ সদাগরের কাছ থেকে পূজা আদায়ের জন্য মনসা সন্ত্রাস ছড়িয়েছে। শঙ্কর গাঙ্গুলি ও তার শিষ্য, চাঁদের সপ্ত পুত্র, বাণিজ্যতরী ডোবানোর জন্য তিনি সন্ত্রাসের আশ্রয় নিয়েছেন নানাভাবে। আর এই সন্ত্রাস কায়েমের তাঁর প্রধান হাত তাঁর ভগ্নী নেতা আর অন্যহাত তাঁর বিষদন্ত। সন্ত্রাসবাদী নারী হিসাবে মনসা এক হীন, স্বার্থবুদ্ধি আত্মসচেতন অমানবী এক দানবী চরিত্র।

এভাবে আদ্যন্ত লক্ষ করলে মানবিক, দৈবিক ও দানবী চরিত্রের দোষ-গুণের মিশ্রণ ঘটেছে মনসা চরিত্রে। অন্যান্য মঙ্গালকাব্যের দেব-দেবীদের তুলনায় তাঁর দৈবী পরিচয় স্বল্প। কৈশোর ও যৌবনের অপ্রাপ্তির বেদনাই তাঁকে হতাশাময় করে তুলেছে। স্বাভাবিক কোমল নারী স্বভাব এবং একটি ক্রূর সর্প স্বভাব—এই দুটো বৃত্তি মনসার চরিত্রে আদ্যোপান্ত লক্ষণীয়। প্রচণ্ড অত্যাচারের মুখেই বারবার তাঁর সর্পস্বভাব কোমল নারীস্বভাবকে আচ্ছন্ন করে প্রবল হয়ে উঠেছিল। বিজয় গুপ্ত বস্তুধর্মী কবি। আমরা জানি বস্তুধর্মী কবি মনস্তত্ত্বকে পরিহার করতে পারেন না। কারণ বস্তুর সাথে মানব মনের চিরন্তন সম্পর্ক। বস্তুর উপরই মানব মনের চৈতন্য গড়ে ওঠে। বিজয় গুপ্তের ওই বস্তুধর্মী গুণের জন্যই মনসা চরিত্র এমন সুপরিকল্পিতভাবেও মনস্তত্ত্বসম্মতভাবে গড়ে উঠতে পেরেছেন তাঁর কাব্যে। অন্যান্য কবিরা মনসাকে যতটা বাহ্যিকভাবে সৃষ্টি করেছেন ততটা মনস্তত্ত্বসম্মতভাবে নয়। মধ্যযুগের মনসামঙ্গল তথা সমগ্র মঙ্গালকাব্যের মধ্যে বিজয় গুপ্তের মনসা এক স্বতন্ত্র নারী চরিত্র হিসাবে চিরদিন অমর হয়ে থাকবে।

<u>তথ্যের সন্ধানে</u>

১. বসন্তকুমার ভট্টাচার্য : পদ্মা-পুরাণ বা মনসামঙ্গাল : বিজয় গুপ্ত, সংকলিত বাণী নিকেতন, কলকাতা।
২. জয়ন্তকুমার দাশগুপ্ত : কবি বিজয়গুপ্তের ‘পদ্মাপুরাণ’, কবি, ২০০৯।
৩. আশুতোষ ভট্টাচার্য : ‘বাংলা মঙ্গালকাব্যের ইতিহাস’, এ. মুখার্জী অ্যান্ড কোং প্রা. লি. ২০০৬, কলকাতা।
৪. সুকুমার সেন : ‘বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস’ (১ম খণ্ড), আনন্দ, ষষ্ঠ সংস্করণ, ১৯৭৮, কলকাতা।
৫. অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় : ‘বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত’ (দ্বিতীয় খণ্ড), মডার্ণ বুক এজেন্সী প্রা. লি. ২০০৬-০৭, কলকাতা।
৬. ক্ষেত্র গুপ্ত : ‘প্রাচীন কাব্য’, সৌন্দর্য জিজ্ঞাসা ও নবমূল্যায়ন।

মনসামঙ্গালে সমাজ ও সংস্কৃতির রূপ

বিজনকান্তি নন্দী

Literature is the mirror of the society'— সমালোচকের এ মন্তব্য বহুলাংশেই সত্য। সাহিত্য সমাজের দর্পণস্বরূপ। কবিরা হচ্ছেন সামাজিক মানুষ। সুতরাং সাহিত্যের মধ্যে সমসাময়িক জীবনের ও সমাজের আচার ব্যবহার রীতি নীতি প্রথা সংস্কারের ছাপ প্রকারান্তরে মুদ্রিত হয়ে থাকে অতি স্বাভাবিক নিয়মে; কোথাও প্রত্যক্ষভাবে, কোথাও অপ্রত্যক্ষভাবে। প্রাচীন বাংলা সাহিত্যের অন্যান্য শাখা অপেক্ষা মঙ্গালকাব্যে সমাজ জীবনের পরিচয় অত্যন্ত বাস্তব আকারে পরিস্ফুট। সেদিক থেকে মঙ্গালকাব্য একাধারে সাহিত্য এবং ইতিহাস। তৎকালীন দেশ-কালের যে পরিচয় আমরা পেয়েছি তার মধ্য দিয়ে ইতিহাসের একটি রূপরেখা অঙ্কন অতি সহজেই সম্ভবপর। প্রাচীন বাংলা সাহিত্যের ক্ষেত্রে মঙ্গালকাব্যগুলির গুরুত্ব যে অপরিসীম সে কথা বলাই বাহুল্য।

আমাদের দেশজ ভাবের একটা খাঁটি কাব্য হচ্ছে মঙ্গালকাব্য। এই দেশজ ভাবের পরিচয় রামায়ণ, মহাভারত ও বৈষ্ণব পদাবলিতে ততটা নেই। কিন্তু মঙ্গালকাব্যের মধ্যে বাংলাদেশের দেশজ আচার আচরণ, ক্রিয়াকলাপ পদ্ধতি প্রভৃতি স্বদেশীয় সমস্ত ভাবের সম্মেলন ঘটেছে মঙ্গালকাব্যে। গৃহজীবন, পারিবারিক জীবন, রাষ্ট্রীয় জীবন, সমাজ জীবনের মোটামুটি পরিচয় মঙ্গালকাব্যে পাওয়া যায়। সমাজ জীবনের ছবি আমরা বিশেষভাবে দেখতে পাই চণ্ডীমঙ্গাল ও ধর্মমঙ্গাল কাব্যে। কিন্তু যদি আমরা গভীরভাবে লক্ষ করি তবে মনসামঙ্গাল কাব্যের মধ্যেও সমাজ ও সংস্কৃতির একটি সুন্দর চিত্রকে দেখতে পাব। আসলে মনসামঙ্গাল কাব্যের মধ্যে একটি বিয়োগান্তক কাহিনি (Tragedy) আমাদের মন-প্রাণকে আচ্ছন্ন করে রাখে বলে অন্যদিকে দৃষ্টি রাখা সম্ভবপর হয়ে ওঠে না। মনসামঙ্গালের কবিগণের বর্ণনায় খণ্ড খণ্ড চিত্রকে অবলম্বন করে তৎকালীন বাংলাদেশ ও সমাজের একটি অখণ্ড চিত্র ফুটে উঠেছে।

১। বিবাহ আচারের বিস্তৃত বর্ণনা মঙ্গালকাব্যগুলির অন্যতম বৈশিষ্ট্য। কবিগণ নিজস্ব সমাজের মধ্যে যে সমস্ত বিবাহানুষ্ঠান প্রত্যক্ষ করেছেন, সেই সকল অনুষ্ঠানের উপকরণ তাঁদের রচনায় প্রতিফলিত হয়েছে। সেজন্য যে কবি যে অঞ্চলে আবির্ভূত হয়েছেন সে কবি সেই অঞ্চলেরই সামাজিক প্রথার একটা পূর্ণাঙ্গা চিত্র তাঁর কাব্যের মধ্য দিয়ে প্রকাশ করেছেন।

তিন অঞ্চলের তিনজন কবি তিনটি বিবাহ প্রথার বর্ণনা করেছেন— তার মধ্যে দিয়ে সমাজ-জীবনের বিবর্তনের পরিচয় পাওয়া যায়। মনসার বিবাহ বর্ণনা করেছেন বিজয়গুপ্ত। তাঁর এই বর্ণনায় বরিশাল অঞ্চলের একটা সামাজিক রূপ দেখতে পাই। বিজয় গুপ্ত বস্তুনিষ্ঠ কবি, ফলে তাঁর বর্ণনায় বিবাহ আচারের একটা নিখুঁত বর্ণনা পাই। দ্বিজ বংশীদাস ময়মনসিংহ অঞ্চলের কবি। তিনি চাঁদ সদাগরের বিবাহ বর্ণনা করেছেন। তখনকার দিয়ে ঘটক পাঠিয়ে বিবাহ স্থির করতে হত, কোষ্ঠী বিচার করতে হত। তখনকার দিনে বর যাত্রা করবার পূর্বে বরের বাড়িতে যে নানারূপ সামাজিক বিধি নিয়ম পালন করা হত তার উল্লেখ আমরা দেখতে পাই—

পৈর্যোদিমাতৃকাপূজা বসুধারা দান।
নান্দীমুখ আদিকর্ম করি সমাধান।।

কেতকাদাস পশ্চিমবঙ্গের কবি। তিনি বেহুলার বিবাহ বর্ণনা করেছেন। এই বিবাহ বর্ণনায় আমরা তৎকালীন সামাজিক আচার প্রথার সাক্ষাৎ পাই। বিবাহাচারগুলি এই মনসামঙ্গাল কাব্যের মধ্যে এত বিস্তৃতভাবে বর্ণিত হয়েছে যে তা থেকে বাংলার মধ্যযুগীয় সমাজ সম্পর্কে খুঁটিনাটি তথ্য জানতে পারা যায়।

২। রূপচর্চা মধ্যযুগের একটা সামাজিক অঙ্গা ছিল। জাতীয় জীবন-সংস্কারের মধ্যেই বাঙালির রূপচর্চা একটা বিশেষ অঙ্গা, বিশেষত বিবাহ প্রভৃতি অনুষ্ঠান উপলক্ষ্যে। হরিদত্তের কাব্যে এই রূপসজ্জা একটি উল্লেখযোগ্য বিষয়। কবির সতর্ক সুরুচিপূর্ণ দৃষ্টিভঙ্গি লক্ষণীয়। তাঁর কাব্য থেকে জানতে পারি মেয়েরা তিন খণ্ড কাপড় পরত। গুজরাটী সদাগরেরা এদেশে বাণিজ্য করতে আসত এবং বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হত। তার থেকে শাড়ি পরা, খাগড়া পরা, কাঁচুলি পরা প্রভৃতি বিষয়ে বৈচিত্র্য লক্ষ করা যায়— যা কিনা গুজরাটি নিয়মের অন্তর্গত। মধ্যযুগের বাংলায় সমাজ জীবনের যে চিত্র তার মধ্যে স্ত্রী চরিত্রের আচরণ-আভরণ অলংকার পরিধান প্রভৃতি লক্ষ করবার বিষয়। শাঁখার কারুকার্য খচিত বর্ণনা করেছেন কানা হরিদত্ত—যা কিনা বাংলাদেশের সাংস্কৃতিক রূপের পরিচয়।

‘কজ্জল শোভে ভাল’—পাঁচশত বৎসর পূর্বেও যে চোখে কাজল পরবার রীতি প্রচলিত ছিল তার পরিচয় পাই মনসামঙ্গালে। ‘দর্পণ হাতে করি দেবী কেশ বানায়’— এই পদটির মধ্য দিয়ে বাঙালির সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্য ফুটে উঠেছে। এ সমস্ত কিছু সৌন্দর্যবোধের উদ্বোধক। কেতকাদাস বেহুলার বিবাহ উপলক্ষ্যে রূপসজ্জার বর্ণনা করেছেন। তাঁর কাব্যে শাঁখা, সিঁদুর ও সোনার চুড়ির উল্লেখ পাই। মোট কথা, প্রাচীন বাংলার রূপসজ্জার এক নিপুণ চিত্র ফুটে উঠেছে মনসামঙ্গাল কাব্যের মধ্যে।

৩। তৎকালীন শিক্ষাব্যবস্থা সম্পর্কে জানতে পারা যায় বিজয় গুপ্তের কাব্য থেকে। এছাড়া শ্রীমন্তের পাঠশালার কথা মুকুন্দরামের কাব্যে পেয়েছি। তখনকার দিনে অর্থবান লোকেরা নিজেদের গৃহে পাঠশালা স্থাপন করত এবং এই সমস্ত পাঠশালায় নানা দেশ থেকে ছাত্র এসে সেখানে অধ্যয়ন করত। প্রবাসী ছাত্ররা পড়তে আসত এবং তারা খরচ বাঁচাবার জন্য একবেলা আহার করত, এমনকি মায়েরা ভিক্ষা করে ছেলের শিক্ষার ব্যবস্থা

করত। যারা গরীব তাদের শীতকালে বস্ত্র থাকত না। অতিকষ্টে দরিদ্র ছেলেরা কেমন করে দিন কাটাত তার পরিচয় বিজয় গুপ্তের কাব্যে পাই গোবর্ধনের বর্ণনায়। কাব্যপাঠ ও কাব্যচর্চা যে তৎকালে ছিল তা জানতে পারি এই সকল দৃষ্টান্তের মধ্য দিয়ে।

৪। সমাজচিত্র ও গৃহস্থালির বর্ণনায় বিজয় গুপ্ত রসরসিকতার পরিচয় দিয়েছেন। চাঁদ সদাগরের ছয় পুত্র এবং হর-গৌরীর সংসার চিত্রের মধ্য দিয়ে সমাজ জীবনের ও গৃহস্থালি জীবনের পরিচয় পাই। সমৃদ্ধ সদাগরের ঘরেও দ্বন্দ্ব, কলহ, ঈর্ষা কম ছিল না। পারিবারিক জীবনের এই চিত্র মনসামঙ্গল কাব্যে হরগৌরীর সংসার চিত্রের অন্যতম বিষয় যার প্রমাণ বিজয়গুপ্ত ও ক্ষেমানন্দের কাব্যে মিলেছে। ষষ্ঠীবর দত্তের কাব্যে পল্লীর সংহত একটা সমাজ জীবনের সুখ-দুঃখের বিচিত্র অনুভূতি প্রকাশ পেয়েছে। এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যেতে পারে বিজয় গুপ্তের কাব্যে জুয়াখেলার একটি সুন্দর চিত্র পাওয়া গেছে।

৫। ক। এছাড়া মনসামঙ্গল কাব্যে তৎকালীন নানারকম বিভিন্ন সামাজিক প্রথার উল্লেখ দেখতে পাই। ভাগ্নে-বধূর মুখ দেখা তখনকার দিনে নিষিদ্ধ ছিল। ষষ্ঠীবরের কাব্যে দেখতে পাই—

অধর্মের চিহ্ন হৈল নরকে গমন
ভাগিনা বধূর মুই দেখিনু বদন।

তখনকার দিনে 'গুয়াপান' দিয়ে অভ্যর্থনা বা বিদায় জানাতে হত। গুয়াপানের একটা বিশেষ সামাজিক মর্যাদা তখনকার দিনে স্বীকৃত ছিল। যেমন, জীবন মৈত্রের কাব্যাংশে পাই— 'ডোমনী বিদায় কর দিয়া গুয়াপান।' কেতকাদাসের কাব্যে এবং বিজয়গুপ্তের কাব্যে এয়োগণ প্রসঙ্গে গুয়াপান, তেল-সিন্দুরের বর্ণনা রয়েছে।

খ। বিষ্ণুপালের কাব্য থেকে জানতে পারি গোহত্যা, ব্রহ্মহত্যা, সুরাপান করা শাস্ত্রীয় পাপ বলে গণ্য হত। একদিন সমাজে নীলবস্ত্র পরলে (অবশ্য শূদ্র না হলে) পাপ হত। একুশ দিন না হলে বাছুর গোয়ালে বেঁধে রাখলে তাও পাপ বলে গণ্য হত।

গ। তৎকালীন সমাজে স্ত্রীর প্রতি স্বামীর অবিশ্বাস বজায় ছিল। বহুবিবাহ প্রথার কুফল মনসা-চরিত্রের মধ্য দিয়ে দেখান হয়েছে। বিষ্ণুপালের মনসামঙ্গল কাব্যে সহমরণ বৃত্তান্তের উল্লেখ পাই।

ঘ। মঙ্গলকাব্যের বিভিন্ন বর্ণনায় প্রায়ই তালিকার মালা গাঁথা হয়েছে। যেমন—রন্ধনের তালিকা, নগরের তালিকা, ফুলের তালিকা—এই বর্ণনাগুলি objective বা বস্তুধর্মী বর্ণনা। রান্নার চিত্রগুলির মধ্যে তৎকালীন সমাজের রন্ধন ব্যবস্থার কথা জানতে পারি। বিজয় গুপ্তের ভোজন তালিকা থেকে বাঙালির ভোজন-বিলাসীরূপ ফুটে উঠেছে। ক্ষেমানন্দের কাব্যেও বিভিন্ন ফুল ও বৃক্ষের বর্ণনা দেওয়া হয়েছে। স্বর্গের বিচিত্র নাম ও নৌযাত্রার বর্ণনা মনসামঙ্গলের একটি বিশেষত্ব।

৬। দ্বিজ বংশীদাসের কাব্যের মধ্যে কাজির বিবরণ মধ্যযুগের বাংলার সামাজিক ইতিহাস রচয়িতাদের পক্ষে একটি মূল্যবান দলিল স্বরূপ। তৎকালীন সমাজের ছবির একটি পরিচয় এর মধ্যে প্রকাশ পেয়েছে।

কান্দে কাজি স্মরিয়া খোদায়।
দারুণ বিষের জ্বালে বুক ভিজে মুখ লালে
ভূমিতলে গড়াগড়ি যায়।।

চৈতন্যভাগবতের কাজির বর্ণনা মনসামঙ্গালের কাজির বর্ণনার অনুরূপ। এই কাহিনির মধ্যে সমাজ জীবনের রাষ্ট্রশক্তির অত্যাচার বা যথেচ্ছ স্বেচ্ছাচারিতার কথা জানা যায় এবং এই বিশেষ সমাজ মানসিকতার বা সমাজ ব্যবস্থার জন্যই তৎকালে মনসার মতো দেবীর আবির্ভাব।

চৈতন্য-পূর্ববতী ও চৈতন্য-পরবর্তী যুগের সমাজ-সংস্কৃতির বহু তথ্য আমরা পাই মনসামঙ্গাল কাব্যগুলি থেকে। অবশ্য এই পাঁচশত বৎসরের সমাজ জীবনের মধ্যে যে ব্যবধান সৃষ্টি হয়েছিল সে কথা বলা যেতে পারে। সমাজ উন্নতির দিকে যাচ্ছে না অবনতির দিকে যাচ্ছে তার বহু প্রমাণ মনসামঙ্গাল কাব্যগুলিতে পাওয়া যাবে। পাঁচশত বৎসরের সমাজের পরিবর্তিত রূপ কবিরা তাঁদের কাব্যে প্রকাশ করেছেন। মনসামঙ্গালের কাব্যমূল্য সংশয়াতীত, তৎসত্ত্বেও একথা বলতে দ্বিধা নেই তার মধ্যে জাতির সমাজ-সংস্কৃতির যে সুন্দর চিত্রল বর্ণনা ফুটে উঠেছে তার মূল্য কোনো অংশেই কম নয়। এর ঐতিহাসিক ও সাংস্কৃতিক মূল্য অপরিসীম।

জগজ্জীবনের মনসামঙ্গল কাব্যে দিনাজপুরের প্রভাব

সমিতকুমার সাহা

প্রাচীন যুগে দিনাজপুর পুণ্ড্রবর্ধন রাজ্যের অন্তর্গত ছিল। পুণ্ড্রগণের রাজধানী ছিল পুণ্ড্রবর্ধন। পুণ্ড্রদের উৎসগত দিক থেকে পৌরাণিক বিভিন্ন কাহিনির মধ্যে যেমন মহাভারত, মৎস্যপুরাণ, বায়ুপুরাণ, ঐতরেয় ব্রাহ্মণ প্রভৃতির মধ্যে পুণ্ড্রদের উল্লেখ আছে। মহাভারত, বায়ুপুরাণ, মৎস্যপুরাণ অনুসারে বলি রাজার স্ত্রী সুদেষ্ণার গর্ভে ঋষি দীর্ঘতমার ঔরসজাত পাঁচটি পুত্র হল অঙ্গ, বঙ্গ, কলিঙ্গ, পুণ্ড্র, সুম্ভ। ঐতরেয় ব্রাহ্মণ অনুসারে পৌণ্ড্ররা ঋষি বিশ্বামিত্রের পুত্র এবং তৎকর্তৃক শাপগ্রস্ত। তারা দস্যু বা বর্বর নামে অভিহিত ছিল। কিন্তু মহাভারত মতানুসারে পুণ্ড্রগণ ছিল ক্ষত্রিয়। পুণ্ড্রগণ শ্রীকৃষ্ণ কর্তৃক পরাজিত হয়েছিল।

জগজ্জীবনের 'মনসামঙ্গল' কাব্যের বানিয়া খণ্ড অংশে— 'বলি রাজার স্থানে প্রভু ভূমি নিল দান'— পংক্তির উল্লেখ আছে। উল্লিখিত পংক্তিতে বলি রাজার উল্লেখ পাই। সুতরাং বলি রাজা সম্পর্কে কিছু বললে দিনাজপুরের প্রাচীনত্ব আরও দৃঢ় হবে। অতীতকালে বলি রাজা ছিলেন শিবভক্ত। পুণ্ড্রবর্ধন রাজ্যের প্রসিদ্ধ নগর কোটিবর্ষ বলিরাজার অধীনে ছিল। বাণগড়ের পৌরাণিক কাহিনি থেকে জানা যায় বলি রাজার পুত্র বাণ রাজা ছিলেন বাণগড়ের নৃপতি। তাঁর কন্যা ঊষা শ্রীকৃষ্ণের পৌত্র অনিরুদ্ধ কর্তৃক অপহৃত হয়। ফলস্বরূপ বাণরাজার সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণের প্রচণ্ড যুদ্ধ হয় এবং বাণরাজা পরাজিত ও নিহত হন। কুশমণ্ডি থানার অন্তর্গত একটি প্রাচীন রাস্তা ঊষাহরণ রোড নামে পরিচিত।

মৌর্যযুগের বিভিন্ন শিলালেখ, তাম্রলেখ থেকে জানা যায় দিনাজপুর জেলার কিছু স্থান যেমন বাণগড় (বর্তমানে গঙ্গারামপুর থানার অন্তর্ভুক্ত) পুণ্ড্রবর্ধনভুক্তির অধীন ছিল। গুপ্তযুগের সময় দিনাজপুর জেলার কিছু স্থান থেকে যে তাম্রশাসন পাওয়া গেছে তা থেকে প্রমাণিত হয় এই সব অঞ্চলও গুপ্ত রাজগণের সাম্রাজ্যের অন্তর্গত ছিল।

মৌর্য, গুপ্তযুগের পর পাল-সেন রাজগণের আমলে পৌণ্ড্রবর্ধন তাঁদের সাম্রাজ্যভুক্ত হয়। দিনাজপুরের মহীপাল দিঘী, মহীপুর, রামাবতী, কালদীঘি ইত্যাদি পাল ও সেন যুগের ঐতিহাসিক নিদর্শন রূপে চিহ্নিত।

এরপর বখতিয়ার খিলজির লখনৌতি জয়ের পর বাংলায় সুলতানি যুগের সূচনা হয়। দিনাজপুরের কিছু কিছু অঞ্চল সুলতানি যুগের ইতিহাসের সঙ্গে জড়িত। বখতিয়ার খিলজি আপনার রাজ্যের দুভাগ করলেন। এর একভাগ দিনাজপুর জেলার দেবকোট (আধুনিক

নাম গঙ্গারামপুর)-এর রাজধানী হল। এই দেবকোট হল প্রাচীন কোটিবর্ষ। কথিত আছে এই দেবকোটেই নাকি আলিমর্দান কর্তৃক তিনি নিহত হন। পরবর্তীকালে ইলিয়াস শাহ বাংলার সুলতান হলে দিনাজপুরে একডালা দুর্গ গড়ে তোলেন যুদ্ধ পরিচালনার কেন্দ্র হিসাবে।

ইলিয়াস শাহী বংশের অবসানে রাজা গণেশ একমাত্র স্বাধীন হিন্দুরাজা রূপে 'দনুজমর্দনদেব' উপাধি গ্রহণ করে কয়েক বৎসর বাংলার শাসক হয়েছিলেন। এই 'দনুজ' কথাটি থেকেই দিনাজপুর নামের সৃষ্টি। রাজা গণেশ এই দিনাজপুর অঞ্চলের বাসিন্দা ছিলেন।

দিনাজপুরের মনসামঙ্গাল কাব্যের কবি জগজ্জীবন ঘোষালের 'মনসামঙ্গাল' কাব্যে তাঁর আত্মপরিচয়জ্ঞাপক ভণিতাংশ সামান্য তুলে ধরা হল—

ঘোষাল ব্রাহ্মণ রাঢ়ী কুচিয়ামোড়তে বাড়ী
মহারাজ প্রাণনাথের দেশ
জগজ্জীবন পদ রচিলেন বিদগদ
কবি দুর্গাচন্দ্রপতির আদেশ।

কবি রাঢ়ী শ্রেণির ব্রাহ্মণ, পদবী ঘোষাল, নিবাস কুচিয়ামোড়। এই অঞ্চল মহারাজা প্রাণনাথের রাজ্যভুক্ত ছিল। কবি যে দুর্গাচন্দ্রপতির উল্লেখ করেছেন তাঁর সম্পর্কে সঠিক তথ্য জানা যায় না। সুতরাং দিনাজপুরের মহারাজা প্রাণনাথ সম্পর্কে কিছু বলা প্রয়োজন। ওয়েস্ট ম্যাকট অনুসরণে জানা যায় ১৬০০ খ্রিস্টাব্দে আকবর তাঁর সাম্রাজ্যকে পনেরোটি সুবায় বিভক্ত করেছিলেন এবং সুবাবাংলার শাসক হলেন আকবর-পুত্র সেলিম। এর মধ্যে দিনাজপুর জেলার অধীনে ছিল ছয়টি সরকার। ঐ সময় দিনাজপুরের বেশ কিছু এলাকা কালী ও কৃষ্ণের পূজারি এক ব্রহ্মচারীর সম্পত্তিভুক্ত ছিল। মৃত্যুকালে ওই ব্রহ্মচারী শ্রীমন্ত দত্তচৌধুরী নামক এক শিষ্যকে ওই সম্পত্তি দান করেন। শ্রীমন্ত চৌধুরী সন্তানহীন হওয়ায় দৌহিত্র শুকদেব ঐ সম্পত্তির অধিকারী হন।

শুকদেবের মৃত্যুর পর তাঁর কনিষ্ঠপুত্র প্রাণনাথ সম্পত্তির অধিকারী হন। মহারাজা প্রাণনাথ চল্লিশ বৎসর রাজত্ব করেন। তিনি শক্তিশালী কিন্তু নীতিজ্ঞানশূন্য রাজা ছিলেন। খুব সম্ভবত তিনি সৈন্যশক্তির বৃদ্ধির দিকে বেশি মনোযোগ দিয়েছিলেন। তাঁর সময়ে বংশীহারী থানার পূর্বাংশ মালিগাঁও পরগনারূপে গঠিত হয়েছিল যা মালদার বিবেচ্য অংশ রূপে গণ্য করা হয়। তিনি তাঁর ভূসম্পত্তিকে বারো ভাগে বিভক্ত করেছিলেন যা রাজসম্পত্তি দ্বারা পরিবেষ্টিত ছিল। জেলার বিভিন্নাংশে তিনি তাঁর স্মৃতিরক্ষার জন্য নানা কাজ করেছিলেন। এই বিষয়ে প্রাণসাগর দীঘি উল্লেখযোগ্য।

উত্তরবঙ্গ ও বিশেষভাবে অবিভক্ত দিনাজপুরের নদীগুলির উল্লেখ জগজ্জীবনের 'মনসামঙ্গাল' কাব্যের বানিয়াখণ্ডে স্পষ্টরূপে রয়েছে। যেমন—

করতোয়া যমুনা চলে মানগড়া সতী॥
পুনর্ভবা আত্রাই ধবলা আর পাঙ্গা।

করতোয়া, যমুনা, পুনর্ভবা, আত্রাই প্রভৃতি নদীগুলিকে বাদ দিয়ে দিনাজপুরের ইতিহাস অসম্পূর্ণ। সুপ্রাচীন কাল থেকে এই নদীগুলি বয়ে চলেছে এবং এখানকার মানুষের জীবনকেও নিয়ন্ত্রিত করেছে।

উত্তরবঙ্গ অর্থাৎ বগুড়া, রাজশাহী, রংপুর, দিনাজপুর, পুণ্ড্রবর্ধন রাজ্যের অন্তর্গত ছিল। ইতিহাসখ্যাত এই করতোয়া নদীর বর্ণনা পুরাণে উল্লিখিত হয়েছে। দিনাজপুরের দক্ষিণপূর্ব প্রান্তীয় সীমা দিয়ে এই নদী বয়ে গেছে।

তিস্তা থেকে উদ্ভুত যমুনা একটি ছোটো নদী। এই নদী রংপুর থেকে উত্তরপূর্ব প্রান্তে পার্বতীপুরে প্রবেশ করেছে এবং হিলির কাছে বগুড়ার মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হয়েছে ও শেষপর্যন্ত রাজশাহী জেলায় আত্রেয়ী নদীর সঙ্গো সংযুক্ত হয়েছে। এই নদী সংকীর্ণ হলেও বর্ষার সময় এতে আশাজনক গভীরতা লক্ষ করা যায়।

পুনর্ভবা নদী পূর্ববঙ্গোর দিনাজপুর জেলার অন্তর্গত ঠাকুরগাঁ থানার ব্রাহ্মণপুকুর নামে একটি বিল থেকে বেরিয়ে এসে বীরগঞ্জ থানার পাশ দিয়ে কোটালী থানায় প্রবেশ করে ধেপা নামক একটি নদীর সঙ্গো যুক্ত হয়েছে। কোটিবর্ষ নগর বা বাণগড় (বর্তমান গঙ্গারামপুর থানার অন্তর্ভুক্ত) এই পুনর্ভবা নদীর তীরে অবস্থিত ছিল। বর্তমানে গঙ্গারামপুর থানার মধ্য দিয়ে এই নদী প্রবাহিত।

আত্রেয়ী পূর্ববঙ্গোর দিনাজপুরের পথে ক্রমে কুমারগঞ্জ থানার মধ্য দিয়ে প্রবেশ করেছে। এই নদী কুমারগঞ্জ এবং বালুরঘাট থানার মধ্য দিয়ে বয়ে গেছে। কুমারগঞ্জ এবং বালুরঘাট আত্রেয়ী নদীর তীরে অবস্থিত। মহাভারতের বনপর্বে আত্রেয়ী নদীর উল্লেখ আছে।

সপ্তদশ শতকের দিনাজপুরের প্রধান সম্পদ ছিল ধান। ব্যবসা-বাণিজ্য যথাসম্ভব চলত অবাধে। জলযান নৌকার মাধ্যমে জেলার উৎপন্ন ও রপ্তানিযোগ্য ভূমিজাত পণ্যাদির প্রসঙ্গা জগজ্জীবনের মনসামঙ্গাল কাব্যে রয়েছে।

চাঁদ সদাগরের ডিঙ্গায় নানা কাঁচামাল পূর্ণ হয়ে জলে ভেসে চলেছে। বানিয়াখণ্ড থেকে তারই অংশ বিশেষ—

কাঁচা হরিদ্রা তোলে পুরাণ সুকুতা
ইহার বদলে নিব পাটনে গজমুক্তা।
মাসকালই আদার সুট আর তোলে জিরা
মরিচ লবঙ্গা দিয়া বদল নিব হীরা।

দিনাজপুরের বাণিজ্য বিনিময়ের চিত্রটি এখানে স্পষ্টভাবে ফুটে উঠেছে। এই বাণিজ্য বিনিময়ের মধ্য দিয়ে দিনাজপুরের আর্থিক অবস্থার যে চেহারা পরোক্ষভাবে ফুটে ওঠে তাতে স্বাভাবিকভাবে মনে হয় জেলার আর্থিক পরিস্থিতি অনুকূল ছিল না।

প্রাচীন যুগে পুণ্ড্রবর্ধনভুক্তির দিনাজপুরে নানা ধরনের বৃক্ষ জন্মেছিল। মধ্যযুগেও এই সব বৃক্ষ স্বমহিমায় বিরাজমান ছিল। এই রকমারি বৃক্ষ ও তৎসংশ্লিষ্ট ফলের উল্লেখ পাই জগজ্জীবনের 'মনসামঙ্গাল' কাব্যের বানিয়াখণ্ডে। উদাহরণ সহযোগে বলা যায় নিম, কাঁঠাল, বকুল, নারিকেল, জলপাই, তাল ইত্যাদি। চাঁদসদাগর বাণিজ্য ক্ষেত্রে এই সব বৃক্ষকে

কেটে তক্তা হিসেবে ব্যবহার করেছিলেন। এর অংশ বিশেষ তোলা যাক জগজ্জীবনের মনসামঙ্গল কাব্যের বানিয়াখণ্ড থেকে—

নিম নারিকেল কাটে জলপাই তাল॥
বৃক্ষ কাটে কামিলা রাখি সারি সারি।
চিরিয়া করিল তক্তা লক্ষ তিন চারি॥
বাছিয়া বসায় তক্তা কর্ম্ম করে ভাল।

রন্ধনপ্রণালী মঙ্গলকাব্যের বৈশিষ্ট্য। এই পাকপ্রণালীর মধ্য দিয়ে কবিগণের বাস্তবতার প্রতি দৃষ্টি অনুভব করা যায়। রন্ধনের মধ্য দিয়ে ভোজন-বিলাসিতার পরিচয় মেলে। জগজ্জীবনের 'মনসামঙ্গল' কাব্যের বানিয়াখণ্ডে রন্ধন চিত্রের যে রূপ ফুটে উঠেছে তার সামান্য অংশ নিম্নরূপ—

সুকুতা কুষ্মাণ্ড ভাজে শাক দিয়া সিম
কুষ্মাণ্ড তেতলি দিয়া করিল অম্বল।

সুকুতা, অম্বল এ জেলার দেশি-পলি-রাজবংশী সম্প্রদায়ের খাদ্য। জনরুচির দিকে লক্ষ রেখে জগজ্জীবন যে লোকখাদ্যের পরিচয় তাঁর রচনায় তুলে ধরেছেন তাতে কবি বাস্তবতার প্রতি নিষ্ঠা দেখিয়েছেন।

লোকনাট্যের নাটুয়া যে মধ্যযুগেও দিনাজপুরে উপস্থিত ছিল তার উল্লেখ পাই বানিয়া খণ্ডে চাঁদ সদাগরের পুত্র লখাইয়ের বিবাহযাত্রা বর্ণনায়—

পছ্রিয়া চালন ধড়া পাইকগণ যায়।
ঢালে বাজে ঘুঘুড়া নুপুর বাজে পায়॥
নৃত্য করে নাটুয়া গায়নে গায় গীত।
ঢাল খাড়া বান্ধিয়া পাইক করে নৃত॥

বাদ্য সহযোগে পাইকদের নৃত্যগীতে নাটুয়াগান পরিবেশিত হয়ে থাকে। ভৌগোলিক দিক থেকে বর্তমানে উত্তর ও দক্ষিণ দিনাজপুর জেলায় দেশি-পলি-রাজবংশী সমাজে লোকনাট্য নাটুয়া এখনও জনপ্রিয়। লোকনাট্য এই জেলায় 'খন' নামে পরিচিত। জেলার দেশি-পলি-রাজবংশী সম্প্রদায় এই লোকনাট্য বা খনের স্রষ্টা।

লোকশিল্প ধোকরা সপ্তদশ শতকের দিনাজপুরে যে প্রচলিত ছিল তার নিদর্শন মেলে জগজ্জীবনের মনসামঙ্গল কাব্যের বানিয়াখণ্ড অংশে—

পাটের ধকরা মেখলা আর যত শাড়ি
যতন করিয়া লেহ কাপড়েত জড়ি।

ধোকরার মূল উপাদান পাট। পাট থেকেই ধোকরা তৈরি হয়। ধোকরা নির্মাণে দেশি-পলি-রাজবংশী নারীগণ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। ধোকরা তৈরি করে উক্ত নারীগণ হাটে হাটে বিক্রি করে। ধোকরা বয়নে সাধারণত পুরুষের কোনো অধিকার নেই। উপরোক্ত পংক্তিদ্বয় কিন্তু এই ইঙ্গিত বহন করে। ধোকরার আরেকটি পাটজাত শিল্পের

নাম 'পাটের মোড়া' এই বানিয়াখণ্ড অংশেই পাওয়া যায়।

জগজ্জীবনের কাব্যে মানুষের সুখ, দুঃখ, যন্ত্রণা, ব্যক্তিহৃদয়ের যে পরিচয় পাওয়া যায় তাতে কবির সমাজভাবনা স্পষ্ট ভাবে ফুটে ওঠে। বানিয়াখণ্ড থেকে এই বিষয়ে সামান্য উদ্ধৃতি দিই—

এক বাঙ্গাল কান্দে মাথে হাত দিয়া
বৃদ্ধ মাতা পিতা আছে পথ পানে চায়া।
পুত্র আসিবেক মোর সদাগরের সঙ্গো
পুত্র সঙ্গো অন্নবস্ত্র পাব নানা রঙ্গো।

এই চরণগুলির মধ্য দিয়ে তৎকালীন মানুষের বেদনা, বিলাপ, খেয়ে-পরে বেঁচে থাকার অদম্য ইচ্ছা কবি যে ভাবে বর্ণনা করেছেন এক কথায় তা সমাজ-দর্পণ রূপে প্রতিভাত হয়েছে।

উপসংহারে বলা যায় এই অঞ্চলের নদী, ব্যবসা-বাণিজ্য, লোকাচার, লোকশিল্প, স্থানীয় প্রচলিত শব্দ যেমন—(ভাতার ছাড়ি, কান্দিয়া, মোর, তাহাক, ধকরা, সুকুতা, অম্বল, চিতর, নিলাজ) প্রভৃতি এবং বিভিন্ন জাতির নাম জগজ্জীবন তাঁর মনসামঙ্গাল কাব্যে যেভাবে তুলে ধরেছেন তাতে দিনাজপুরের খণ্ডিত ইতিহাস, সামাজিক ও নৃতাত্ত্বিক দিকের যথেষ্ট মূল্য রয়েছে।

উৎসের সন্ধানে

১। কবি জগজ্জীবন বিরচিত মনসামঙ্গাল : ড. আশুতোষ দাস ও ৺সুরেন্দ্রচন্দ্র ভট্টাচার্য কর্তৃক সম্পাদিত, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৮৪
২। EASTERN BENGAL DISTRICT GAZETTEERS : DINAJPUR : F.W. STRONG, 1912
৩। WEST BENGAL DISTRICT GAZETTEERS, WEST DINAJPUR (1965) : J.C. SENGUPTA
৪। বাংলা মঙ্গালকাব্যের ইতিহাস : আশুতোষ ভট্টাচার্য
৫। বাঙ্গালীর ইতিহাস (আদিপর্ব) : নীহাররঞ্জন রায়

জাপানে মনসামঙ্গালের বিষয়বস্তু

শংকররঞ্জন মজুমদার

প্রবাদের একটা পরিযায়ী চরিত্র আছে। এই স্বভাব-বৈশিষ্ট্যের জন্য সে দেশে দেশে ঘুরে বেড়ায় ব্যবসায়ী, পর্যটক ও তীর্থযাত্রীদের মাধ্যমে। আবার এই পরিভ্রমণ কালে দেশকাল ভেদে, কিছুটা আবহাওয়ার গুণে তার পরিবর্তনও ঘটে থাকে।

মানুষের উৎপত্তির ইতিহাস বিষয়ে উত্তর মেরুর সঙ্গো গ্রিস দেশের কিছুটা পার্থক্য আছে। উত্তর মেরুতে কাহিনিটা হল প্রথম প্রাণের উৎপত্তি হয়েছিল দৈব গাভী আদুম্লা (Audumla) রূপে যে নাকি শিলীভূত প্রস্তরখণ্ড লেহন করে বেঁচে ছিল। আবার গ্রিক প্রবাদে টাইটান প্রমিথিউস কাদা দিয়ে মানুষের মূর্তি তৈরি করেছিলেন এবং তার মধ্যে প্রাণ প্রতিষ্ঠা করেন। এ হল একই বিষয়ে দেশে দেশে প্রবাদের বিভিন্নতা।

আরেকটি ঐতিহাসিক ঘটনা যা উভয় দেশের প্রবাদ বা উপাখ্যানকে প্রভাবিত করেছিল। সংশ্লিষ্ট দেশ দুটি হল ঘানা ও সুদান। ঘানার অধিবাসী আকানরা বিশ্বাস করত চাঁদের দেবী নাগেম (Ngame) এই পৃথিবীর জন্ম দিয়েছিল এবং প্রতিটি মানুষের ভিতর প্রাণ প্রতিষ্ঠা হল যখন চাঁদের কিরণ তাদের ওপর বর্ষিত হল। প্রাক্-মধ্যযুগে সুদানের অধিবাসী পিতৃতান্ত্রিক নোমাডরা সৃষ্টিকর্তা হিসেবে পুরুষদেবতা ওদোমানকোমা গ্রহণ করতে আকানদের বাধ্য করে। এই দেবতা ছিলেন আকাশের দেবতা। উভয়ের মধ্যে এই মর্মে সন্ধি হয়ে উপাখ্যানের কাঠামোটা দাঁড়াল এই যে পুরুষ দেবতাটি হাতুড়ি ও বাটালি দিয়ে জড় বস্তুতে পৃথিবী সৃষ্টি করলেন আর নাগেম তাতে প্রাণ সঞ্চার করলেন। যদিও অবশেষে আকানরা পিতৃতান্ত্রিক ঐতিহ্যের অনুসারী হয়ে পড়েছিল।[১] প্রসঙ্গত স্মরণীয় যে ভারতীয় পুরাণের ইন্দ্র ও সরস্বতী উভয়েই আকাশচারী। অবশ্য তাঁদের মর্ত্য অবস্থানের কাহিনিও আছে। ভারতীয় পুরাণে সরস্বতী সন্তানহীনকে সন্তান দান করেন। তিনি গর্ভস্থ ভ্রূণকে রক্ষা করেন। সদ্যোজাত শিশুর কানে তিনবার 'বাক্' মন্ত্র উচ্চারণের বিধান আছে। এমনকি শিশুকে কুমির আক্রমণ থেকে রক্ষার জন্যও সরস্বতীর কাছে প্রার্থনা করা হয়েছে।[২]

সরস্বতীকে নিয়ে জাপানে বিবিধ উপাখ্যান ছড়িয়ে আছে। জাপানে সরস্বতী বেনজাইতেন নামে পরিচিত। এ ছাড়াও তার আরও বহু নাম ওই দেশে প্রচলিত আছে।[৩] সরস্বতীকে নিয়ে প্রচলিত একটি কাহিনি হল—এক সন্তানহীন সুজুকি দম্পতি সরস্বতীর কাছে সন্তান কামনা করে এবং দেবী প্রার্থনায় সন্তুষ্ট হয়ে তাদের একটি সুন্দরী কন্যাসন্তান দেন। কিন্তু

কন্যার বিবাহযোগ্য বয়সে উপযুক্ত পাত্র পাওয়া নিয়ে সমস্যা দেখা দিল। যা হোক, বিয়ে ঠিক হওয়ার পর সে পিতামাতার কাছে তার মনোবাঞ্ছা ব্যক্ত করল যে বেনতেন বা সরস্বতীর মন্দিরে সে পূজা দিতে যাবে। বাবা মা তাকে এক সহকারীর সঙ্গে যেতে অনুমতি দিল। মন্দিরে পৌঁছে কন্যা তার ভৃত্যকে ফিরে যেতে আদেশ করল। কিন্তু সে আদেশ পালন না করে সে গোপনে কন্যার কার্যকলাপ পর্যবেক্ষণ করতে লাগল। বালিকা বেনতেন মন্দির সংলগ্ন জলাশয়ে ঝাঁপ দিল এবং এক বৃহৎ সাপে পরিণত হল। ভৃত্যটি বাড়ি ফিরে এসে সব ঘটনা বিবৃত করল এবং মেয়েটির বাবা-মা মেয়ের দৈবী পশ্চাৎপট স্মরণ করে নীরব হয়ে গেল।[৪]

এই কাহিনিটির সঙ্গে আমরা মনসামঙ্গালের বেহুলা উপাখ্যানের মিথ খুঁজে পাই। দ্বিজ বংশীদাস রচিত মনসা মঙ্গালকাব্যে আমরা পাই দেবী মনসার কৃপায় বেহুলার জন্মের কথা। উড়িষ্যার কবি দ্বারিকাদাসের বর্ণনায়—

পদ্মিনী অংশে জন্মিছে সতী।[৫]

জাপানি উপাখ্যানে আমরা দেখি কন্যা তার বিয়ে ঠিক হওয়ার পরে স্নান করতে সরোবরে গিয়েছিল। আর ভারতীয় উপাখ্যানে আমরা দেখি বেহুলা বিবাহ প্রস্তাবের আগেই সরোবরে স্নান করতে গিয়েছিল। বেহুলা দেবী মনসার আশীর্বাদ সম্বন্ধে নিঃসন্দিগ্ধ ছিল। তাই যখন স্নান চলাকালীন বৃদ্ধা অর্থাৎ ছদ্মবেশী মনসার সঙ্গে তার বিবাদ উপস্থিত হল এবং তাঁর দ্বারা অভিশপ্ত বা তিরস্কৃত হল তখন অনায়াসে সে তার সতীত্বের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হল এবং জলতল থেকে শর্তানুসারে শঙ্খ ও সিঁদুর তুলে আনল। কাব্যে আছে, ছদ্মবেশী মনসার অভিশাপে তার স্বামী মারা যাবে আর বেহুলা তার স্বামীর জীবন ছয় মাসের মধ্যে ফিরিয়ে আনবে। এ বিষয়ে তার প্রত্যয়দৃপ্ত ঘোষণা—

মরিবে প্রাণনাথ ভাসিব তাহার সাথ
ছয়মাসে জিয়াইব আমি।।[৬]

সতীত্বের এই পরীক্ষায় মনসামঙ্গালের কবিরা কালিদাসের ‘অভিজ্ঞান শকুন্তলম্’ নাটকের দ্বারা প্রভাবিত বলে মনে হয়। কিন্তু পার্থক্য হচ্ছে কালিদাসের নাটকে দুষ্যন্ত একা নায়িকা শকুন্তলা ও সখীদ্বয় প্রিয়ংবদা ও অনসূয়ার সম্মুখীন হয়েছিলেন (অভিজ্ঞান শকুন্তলম্ ১.২১)। প্রেমের আবহ চিত্রণে কালিদাস যেখানে একশ শতাংশ সার্থক সেক্ষেত্রে মঙ্গালকাব্যের কবিরা পুরোপুরি ব্যর্থ। যদিও সেখানে নায়িকা সখীগণ সহযোগে স্নানার্থে সরোবরে উপনীত হয়েছিল। নায়িকা-সখী ও সরোবর— এত উপকরণ থাকতেও মঙ্গালকাব্যের কবিরা কুঁড়িকে পুষ্পরূপে প্রস্ফুটিত করতে পারেননি।

মঙ্গালকাব্যের কবিরা পারেননি এই কারণে যে মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে ভক্তিবাদের প্রবল উপস্থিতি। কাহিনির গঠনরীতি এই পরিণতির জন্য দায়ী। কালিদাস নাটকের প্রথমেই নাটকের বিষয়বস্তু কী হবে ঠিক করে দিয়েছেন। আর মনসামঙ্গাল কাব্য মনসার বিজয় গীতি হিসেবে রচিত।

প্রবাদ দুটির মধ্যে সাদৃশ্য হচ্ছে যে নায়িকাদের দুজনেই তাদের সংশ্লিষ্ট দেবীর আশীর্বাদ সম্বন্ধে সচেতন ছিলেন। উভয়েই বিয়ের আগে সরোবরে স্নানের আকাঙ্ক্ষা জানিয়েছেন। ভারতীয় পুরাণে সরোবরের নাম হল মুক্তা সরোবর, জাপানি প্রবাদে এই নাম নেই। জাপানি উপাখ্যানে বালিকাটি সরোবরে স্নান করে পার্থিব জীবন থেকে মুক্তি পেয়েছিল। কিন্তু বেহুলার পার্থিব জীবনের সমাপ্তি এসেছিল স্বামী ও ছয় ভাসুরের পুনর্জীবন লাভ ও স্বর্গ থেকে তাদের হারানো ডিঙা ও সম্পদ নিয়ে মর্ত্যে আগমনের পর।

মনে প্রশ্ন ওঠা স্বাভাবিক যে উপাখ্যানে মিথ থাকা সত্ত্বেও পার্থক্য কেন ঘটল। কারণ বোধহয় এটাই যে প্রবাদের দীর্ঘ পরিক্রমা—ভারত থেকে চীন, কোরিয়া হয়ে জাপানে অনুপ্রবেশ। যদিও ভগিনী নিবেদিতা ও আনন্দকুমার স্বামী সম্পাদিত *Myths of the Hindus and Buddhist* গ্রন্থে একে গ্রিক প্রবাদের এশীয় সংস্কৃতায়ন বলা হয়েছে। এছাড়াও আচার্যদ্বয় সুকুমার সেন ও অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় ভিন্ন মত পোষণ করেন।

সংশ্লিষ্ট দেবীরাও দুই দেশে ভিন্ন ভিন্ন। জাপানে দেবী হলেন সরস্বতী আর ভারতে তিনি মনসা নামে অভিহিতা। পন্ডিত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ দেখিয়েছেন সরস্বতী থেকে মনসায় বিবর্তন। বৌদ্ধ ধর্মবিষয়ক বিখ্যাত আলোচক বিনয়তোষ ভট্টাচার্য মন্তব্য করেছেন যে হিন্দুরা মনসাকে বৌদ্ধ দেবতা জাঙ্গুলি থেকে গ্রহণ করেছে।[৭] শতপথ ব্রাহ্মণে সরস্বতীকে সর্পরাজ্ঞী বলা হয়েছে। পরবর্তীকালে সরস্বতী জাঙ্গুলি হয়ে মনসায় পরিণত হয়েছেন।[৮]

এই উপাখ্যানের জাপানে প্রসারিত হওয়ার যে ইতিহাস তা হল জাপানে বৌদ্ধধর্ম প্রবেশ করে চিন ও কোরিয়া হয়ে। এই বৌদ্ধধর্মের মোড়কেই আলোচ্য কাহিনি জাপানে প্রবেশ করে। জাপানি ইতিহাস অনুসারে ৫৩৮ খ্রিস্টাব্দে পেকের (Paekchr) রাজা নিহন-শোকি (Nihon-Shoki) ইয়ামাতোর (Yamato) রাজসভায় দুইজন প্রতিনিধি প্রেরণ করেন। এরপর ১৩ অক্টোবর ৫৩৮ খ্রিস্টাব্দে পেকের রাজা সিয়ং-মিয়ং (Syong-Myong) দ্বিতীয় প্রতিনিধিদল প্রেরণ করেন। প্রতিনিধি দলে ছিল বৌদ্ধ পুরোহিতবর্গ, শক বুৎসু অর্থাৎ শাক্যমুনি বুদ্ধের স্বর্ণ ও তাম্রনির্মিত মূর্তি, রংবেরঙের পতাকা, ছাতা এবং বহুসংখ্যক সূত্র। এই উপহার ও বুদ্ধের বাণী জাপানিদের কাছে একটা নূতন দিগন্ত উন্মোচিত করল। জাপানে বৌদ্ধধর্মের সূচনার এই হল প্রেক্ষাপট। আর ভারতীয় সংস্কৃতি ও সাহিত্যের জাপানযাত্রার শুরুও এটাকে বলা যেতে পারে। সুতরাং আশ্চর্যের কিছুই নেই ভারতীয় ও জাপানি কাহিনিতে মিথ খুঁজে পাওয়াতে।[৯]

এছাড়াও বৌদ্ধ পাবারণ উৎসবে জাপান ও ভারতে পালিত রীতিনীতিতে মিথ আছে। বৌদ্ধ অবদানসূত্রে এর প্রথম উল্লেখ পাওয়া যায়। চীনের তাওবাদের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে এটি জাপানে প্রবেশ করে এবং জাপানে শিন্তো ধর্মের দ্বারা তা প্রভাবিত হয়। সম্রাজ্ঞী সুইকোর (Suiko) আমলে ৬০৬ খ্রিস্টাব্দে এই উৎসব জাপানে প্রথম পালিত হয়।[১০]

অন্যান্য যে সাংস্কৃতিক দিকগুলির মধ্যে মিথ খুঁজে পাওয়া যায় তা হল—সন্তান

জন্মানোর পূর্বে মায়েদের মন্দিরে যাওয়া, শিশুর নামকরণ, বিবাহোৎসব, বড়োদের শ্রদ্ধা করা, সূর্য প্রণাম, ছাত্র-শিক্ষকের শ্রদ্ধাভক্তির সম্পর্ক, ভূমিপূজা, গৃহ প্রবেশ ইত্যাদি ইত্যাদি।[১১]

উৎসের সন্ধানে

১। রবার্ট গ্রেভ্‌স : এনসাইক্লোপেডিয়া অফ মিথোলজি, লণ্ডন, পৃ. v-vi.

২। অরুণকুমার বিশ্বাস : সরস্বতী সারদার অনুধ্যানে, কলকাতা, ১৯৯৪, পৃ. ৩০ উপেন্দ্রকুমার দাস : শাস্ত্রমূলক ভারতীয় শক্তিসাধনা, কলকাতা ১৩৯১ বঙ্গাব্দ, পৃ. ৭৭

৩। ড. ডি. এন. বক্সি : হিন্দু ডিভিনিটিত্ব ইন জাপানিজ বুদ্ধিস্ট প্যান্থিয়ন, কলকাতা, ১৯৭৯, পৃ. ১০৭, ১০৯

শঙ্কররঞ্জন মজুমদার : উদ্বোধন পত্রিকা, কলকাতা, ১৯৯৯ পৃ. ৫৩৬

৪। তদেব : পৃ. ১২০

মক জোয়া : কোয়েন্ট কাস্টমস এ্যান্ড ম্যানারস অব জাপান, পৃ. ৮২-৮৩

৫। শ্রীবিষ্ণুপদ পাণ্ডা সম্পাদিত দ্বারিকাদাসের মনসামঙ্গল, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ড. আশুতোষ দাস সম্পাদিত জগজ্জীবন ঘোষালের মনসামঙ্গল, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৭৯, পৃ. ৩৫

৬। তমোনাশচন্দ্র দাশগুপ্ত সম্পাদিত নারায়ণ দেবের পদ্মাপুরাণ, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৪৭, পৃ. ২৪০

৭। বিনয়তোষ ভট্টাচার্য : দি ইন্ডিয়ান বুদ্ধিষ্ট আইকোনোগ্রাফি, কলকাতা, ১৯৮৭, পৃ. ১

৮। উপেন্দ্রকুমার দাস : পূর্বোক্ত গ্রন্থ, পৃ. ৭৭

৯। ড. ডি. এন. বক্সি : পূর্বোক্ত গ্রন্থ, পৃ. ১-২

১০। শ্রীমতী এস. দাশগুপ্ত : বুদ্ধিস্ট পাবারণ এ্যান্ড ইটস্ অবজারভেসন্স ইন জাপান: রিলিজিয়াস লাইফ ইন এনশিয়েন্ট ইন্ডিয়া : সম্পাদনা ডি. সি. সরকার— ইউনিভারসিটি অফ ক্যালকাটা, ১৯৭২, পৃ ৩৪-৩৬

১১। ড. রাজ বুদিরাজা : জাপান কলিং, নিউ দিল্লি, ১৯৯৯, পৃ. ৮

[প্রবন্ধটি ভারতীয় ইতিহাস কংগ্রেসের ৬২ তম অধিবেশন ভূপালের ভোজ মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ে অনুষ্ঠিত, ডিসেম্বর ২৮-৩০, ২০০১-এ পঠিত পত্রের বঙ্গানুবাদ।]

গৌড়ীয় চণ্ডীমঙ্গাল কাব্যে গৌড়বঙ্গোর সমাজ ও পরিবার জীবন

আদিত্যকুমার লালা

চণ্ডীমঙ্গাল কাব্যধারার আদি কবি মানিক দত্ত। মানিক দত্ত কোন্ সময়ের ও কোথাকার কবি এ নিয়ে বহু তর্ক-বিতর্ক আছে, সে বিষয়ে আমি আমার 'আলোচনার দর্পণে মানিক দত্তের চণ্ডীমঙ্গাল' গ্রন্থে 'মানিক দত্ত : ব্যক্তি-পরিচয় ও কাব্যরচনাকাল' প্রবন্ধে বিস্তৃত আলোচনা করে সিদ্ধান্তে এসেছি যে, মানিক দত্ত পঞ্চদশ শতকের কবি এবং তাঁর আবির্ভাবকাল ১৪৭৫-১৪৮০ খ্রিস্টাব্দের মধ্যবর্তী কোনো এক সময়ে। তিনি এর পরের দশক অর্থাৎ ১৪৯০-১৫০০ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে কোনো এক সময়ে তাঁর চণ্ডীমঙ্গাল কাব্য রচনা করেন। মানিক দত্ত অধুনা মালদহ জেলার কমলাবাড়ি যদুপুরের নিকটস্থ ফুলবাড়ি, মতান্তরে ইংরেজবাজার থানার অন্তর্গত অমৃতির পাশের গ্রাম নঘরিয়া ফুলবাড়ির অধিবাসী ছিলেন। তিনি প্রথম জীবনে ছিলেন কানা ও খোঁড়া। দেবী চণ্ডীর নির্দেশ মতো তিনি চণ্ডীর গীত রচনা করে গানের দল গঠন করে গৌড়বঙ্গোর গ্রামে গ্রামে প্রচার করতেন বলে দেবী প্রীত হয়ে তাঁর অঙ্গা-বিকৃতি সারিয়ে দেন।

মানিক দত্ত যে মালদহের কবি তাঁর কাব্যের নানা অভ্যন্তরীণ প্রমাণ থেকে তা বোঝা যায়। তিনি তাঁর কাব্যে ঝাড়গ্রাম, বড়গাছা, আগলা, কাঞ্চননগর (অমৃতির নিকটবর্তী) সন্ন্যাসী পাটন, ছাত্যাভাতার বিল (বর্তমানে ভাতিয়া বিল নামে পরিচিত), কেন্দুয়ার নালা, গৌড়েশ্বর মন্দির (বর্তমান সাদুল্লাপুর মহাশ্মশানের উত্তর-পূর্ব কোণে অবস্থিত), গৌড়ীগঙ্গা, সাদুল্লাপুর মহাশ্মশান, দ্বারবাসিনী ভগ্নস্তূপ (ইংরেজবাজার থানার চণ্ডীপুর গ্রামে অবস্থিত) প্রভৃতি গ্রাম, নদনদী, মঠ মন্দিরের যে উল্লেখ করেছেন তা সবই মালদহ জেলায় অবস্থিত। সুতরাং মানিক দত্ত মালদহের কবি। মানিক দত্ত পঞ্চদশ শতকে তাঁর চণ্ডীমঙ্গাল কাব্যটি রচনা করেন। তখন মালদহ জেলার স্বতন্ত্র কোনো অস্তিত্ব ছিল না, তা ছিল গৌড়বঙ্গোর অধীনস্থ অঞ্চল। তাই মানিক দত্তকে গৌড়বঙ্গোর কবি বলে উল্লেখ করে তাঁর কাব্যকে গৌড়ীয় চণ্ডীমঙ্গাল কাব্য নামে আখ্যায়িত করেছি। মানিক দত্তের 'চণ্ডীমঙ্গাল' কাব্যের মধ্যে সমাজ-পরিবার জীবনের উপাদান খুবই স্বল্প পরিসরে প্রাপ্ত হওয়া যায়—এর অন্যতম কারণ

হল কাব্যের প্রথাবন্ধ রূপ। মঙ্গলকাব্যের প্রায় সকল কবিদের মতো মানিক দত্তকেও কাহিনি রচনায় একটা বাঁধাধরা ছকের মধ্য দিয়ে এগোতে হয়েছে। ফলে কাব্যে কবির সৃজনী-কল্পনার বিচরণ ক্ষেত্রও সংকীর্ণ ও দুর্লভ হয়ে পড়েছে। আবার একই সঙ্গে তাঁর 'চণ্ডীমঙ্গল' কাব্য দেবমাহাত্ম্য-জ্ঞাপক কাব্য হওয়ার ফলে মানুষের অবস্থান সেখানে নিতান্তই নিমিত্ত রূপে দেখা গেছে। এতে মানুষের জীবন-চিত্রণের অবকাশও গণ্ডিবদ্ধ হয়ে পড়েছে। তা সত্ত্বেও এই সকল অন্তরায়কে অতিক্রম করে কবি নিজেকে যতখানি প্রকাশ করতে পেরেছেন তাকে উপেক্ষা করা যায় না।

আমরা জানি, কোনো দেশ-কালবদ্ধ নরনারীর মনন-কল্পনা তথা ধ্যানধারণা ও চিন্তাভাবনা ইত্যাদির সামগ্রিক পরিচয় সুমুদ্রিত হয়ে থাকে তাদের দৈনন্দিন, ব্যবহারিক ও আচরণীয় জীবনচর্যার মধ্যে। তাই কোনো জাতির পরিচয় ও সমাজকে সম্পূর্ণভাবে জানতে হলে তার প্রাত্যহিক জীবন, যথা— খাদ্য, পোশাক, অলংকার, প্রসাধন, শিক্ষা ও জ্ঞানচর্চা, অবসর বিনোদন, ধর্মচর্চা ও নীতিবোধ, আনন্দ-অনুষ্ঠান ইত্যাদি সুস্থ জীবনধারণের পক্ষে যা আবশ্যক তার সবকটি পরিচয় সম্বন্ধে জানা প্রয়োজন।

১.

মানিক দত্ত তাঁর 'চণ্ডীমঙ্গাল' কাব্যে রান্নাবান্নার যে বিস্তৃত বর্ণনা দিয়েছেন তা থেকে তখনকার মানুষের খাদ্যাভাস, রন্ধনরীতি সম্বন্ধে আমাদের ধারণা স্পষ্ট হয়। তখন বাংলাদেশের সাধারণ মানুষের প্রধান খাদ্য ছিল ভাত, সঙ্গে থাকত ডাল, ভাজা, তরকারি, শাক-সবজি, মাছ, চাটনি, দই, দুধ সবই। তখন রান্নার জ্বালানি-দ্রব্য হিসেবে কাঠের ব্যবহার ছিল। খুল্লনার জন্য লহনা রান্না করেছে কাঠের উনুন জ্বালিয়ে—

> অগ্নি জালি কাষ্ঠ দেয় নাই করে হেলা।
> রন্ধন করিল অন্ন চড়াঞা পাত্রলা।।
> তৈলে বার্তাকী ভাজে কই মাছের গোড়া।
> কলা দিয়া রন্ধন করিল কলা বড়া।।
> রুহিত মাছের ভাজা কিছু কৈল ঝোল।
> নানা জাতি মচ্ছ্য তাজে চিতলের কোল।।
> দালির আম্বল করি কটরা ভরিল।
> নানা জাতি বেঞ্জন রন্ধন করিল।।

দেখা যাচ্ছে, নিরামিষ ও আমিষ দুই ধরনের রান্না গৌড়বঙ্গের সমাজে প্রচলিত ছিল। নিরামিষ রান্নার মধ্যে ছিল ডালের অম্বল, বেগুন ভাজা, পাকা কলার তৈরি বড়ার ঝোল ও শাকের নানারকম পদ। সেসব পদের মধ্যে গিমা, হেলেঞ্চা, কলম্বু (কলমি), তিত পোরলা (তেলেকুচা), গন্ধারি (গন্ধবাদালি), খুরিয়া (নটেশাক) ইত্যাদি শাকের ফেচা ও ঘন্ট সমাজের মানুষের কাছে ছিল খুবই উপাদেয়। মাছের দুই রকম পদ ভাজা ও ঝোল দুই-ই খাবারের তালিকায় থাকত। বড়ো রুই, কাতলা ও চিতল মাছের কোলের (পেটি) কালিয়া (মাখা ঝোল) ভোজন-রসিক মানুষের রসনার তৃপ্তিসাধন করত। ভোজনের শেষ পর্যায়ে

দই, দুধ খাওয়ার রীতি ছিল। খাওয়ার শেষে জল দিয়ে ভালোভাবে মুখ ধোওয়ার পর মুখ শোধনের জন্য কর্পূর ও তাম্বুল গ্রহণ করার রীতি ছিল। তখন তাম্বুলের সঙ্গে মিশ্রিত হত চুন, খয়ের, সুপারিসহ বিভিন্নপ্রকার মশলা ও সুগন্ধি দ্রব্য—

> অবশেষে দধি দুগ্ধ করিল ভোজন।
> ভৃঙ্গারের জলে সাধু কৈল আচমন।।
> কর্পূর তাম্বুল খাঞা মুখশুদ্ধি কৈল।

তবে এই ভোজন-তালিকা ও ভোজন-দৃশ্য সবই ছিল বড়োলোক ও অভিজাতদের জন্য। দরিদ্র ও সাধারণের কপালে জুটত শুধু নুন-লঙ্কাসহ পান্তা ভাত—

> আম্বানি খাইতে প্রভু তোর থাকে সাধ।
> কাটিয়া আনহ খুদিআ মানের পাত।

সংসারের নিত্যপ্রয়োজনীয় বাসনপত্রের অভাবে মানের পাতায় দরিদ্র মানুষের ভাত খাওয়ার চিত্র আমরা সমসাময়িক কবি বিজয়গুপ্তের কাব্যে পাই— 'আনিয়া মানের পাত/ বাড়ি দিল পান্তাভাত'। পরবর্তীকালের কবি মুকুন্দও দরিদ্র মানুষের এই জীবনচিত্র এঁকেছেন। অতএব মানিক দত্তের এই চিত্র একান্তই বাস্তব-জীবনসম্মত।

২.

মানিক দত্তের কাব্য থেকে জানা যায়, সেকালের পোশাকে তেমন কোনো বৈচিত্র্য ছিল না। উচ্চবিত্ত ও নিম্নশ্রেণির মানুষের পোশাকে কিছু প্রকারভেদ ছিল। উচ্চবিত্ত সমাজের পুরুষেরা পরতেন তসরের ধুতি, জামা এবং নারীরা পরতেন তসরের দামী কাপড়।

> সোবন্ন তসর রামা করিল পহ্নন।
> তাহাতে আছেন লেখা হংসা হংসীগণ।।

তবে সাধারণ মানুষের কপালে এসব জুটত না। সাধারণ দরিদ্র মানুষেরা বিশেষ করে পুরুষেরা একখণ্ড ছোটো কাপড়কে মালসাট দিয়ে পরে কোনো রকমে লজ্জা নিবারণ করত। 'মালসাট মারি ছাইলা হস্তে লোফে শোল।' দরিদ্র রমণীরা 'হরিণের ছরা', কখনো বা একখণ্ড বস্ত্র কোনো রকমে গায়ে জড়িয়ে রাখত। বিয়ের সময় এদের কপালে জুটত কমদামী মোটা পাটের কাপড়— 'শাড়িখানি খুলি নিঞা খুঞা পহ্নাইল।' মানিক দত্তের এই বিবরণের সঙ্গে বিখ্যাত পর্যটক স্ট্যাভোরিনাসের বর্ণনার মিল আছে—

> The common people go almost naked. They wear nothing but a piece of Linen wrapped round the waist and passed between the legs.[১]

৩.

মানিক দত্তের 'চণ্ডীমঙ্গল' কাব্য থেকে শুধুমাত্র নারীদের প্রসাধনকলা সম্বন্ধে কয়েকটি কথা জানা যায়। তখন নারীরা দেহের ঔজ্জ্বল্য বাড়ানোর জন্য হলুদ বাটা কাথের সঙ্গে কড়া তেল মিশিয়ে গায়ে মাখতেন, চুল ভালোভাবে আঁচড়ে উঁচু করে খোপা বাঁধতেন এবং চোখে কাজল পরতেন—

কাঁচা হরিদ্রা কটু তৈল আপন গায়ে ঘোষে॥
খোপাটি বান্ধিল বুড়ি সুদৃঢ় করিয়া।
পাইলার কালি দিল চক্ষে কজ্জল করিয়া॥

তারা সোনার তৈরি গয়না পরত। ওপর কানে চাকিবালি, উঝাটিয়ান; লতিতে কড়ি, গলায় শতেশ্বরী হার, দুই বাহুতে মোটা তারের তৈরি নানা গয়না— বাজুবন্ধ, সুবর্ণতাড়, জাম্ফলতার, হাতে কঙ্কণ, নাকে বেশর এবং দুই হাতের আঙ্গুলে সোনার তৈরি একাধিক আংটি পরে তারা নিজেদের রমণীয় করে তুলত।

উপর কানের চাকি গড়ে নাম্ভ কর্ণের কড়ি।
ঝাঁক মল গড়িয়া গড়ে পায়ের পাছলি॥
গলায় গণিয়া গড়ে শতেশ্বরীর হার।
দুই বাহায় গড়িল জাম্ফল দুই তার॥
উঝাটিয়ান গড়ে লেখা নাই তারে।
নাসার বেশর গড়ে ঝলমল করে॥

এর অতিরিক্ত সধবা নারীরা হাতের শাঁখাতে সোনার কারুকার্য করা নানাখণ্ড বসিয়ে শাঁখার সৌন্দর্য বৃদ্ধি করতেন— 'শঙ্খের মুখেতে শোভে মাণিক কঙ্কণ।' তবে সাধারণ নারীর প্রসাধনকলা বিষয়ে মানিক দত্তের কাব্যে কোনো তথ্য পাওয়া যায় না।

৪.

মানিক দত্তের কাব্য থেকে তৎকালীন গৌড়বঙ্গের বিদ্যাচর্চা সম্বন্ধে একটি ধারণা পাওয়া যায়। তখন শিশুদের পাঠশালায় যেতে হত পাঁচ বছর বয়সে। পাঠশালায় যাওয়ার আগে বাড়িতে পণ্ডিত ডেকে শুভক্ষণ নির্ধারণ করে হাতে-খড়ি অনুষ্ঠান করা হত। 'হাতে-খড়ি' হওয়ার পর শিশু গুরুগৃহে গিয়ে পড়াশোনা শুরু করত। শিক্ষাগুরু হতেন কোনো পণ্ডিত ব্যক্তি, প্রথমে অক্ষর পরিচয়, তারপর উচ্চারণ করে পড়া শেষে ক, খ, গ এরূপে চৌত্রিশটি অক্ষর লিখিয়ে লিখিয়ে পড়াতেন। ছাত্রের অক্ষরজ্ঞান সম্পূর্ণ হ'লে বারোফলা পড়িয়ে বিভিন্ন শাস্ত্র পাঠ করাতেন। শাস্ত্রপাঠ শেষে নানা সংস্কৃত কাব্য, ন্যায়, জ্যোতিষশাস্ত্র, তর্কশাস্ত্র ইত্যাদি বিষয়ে পড়াশোনা করতে হত। সবশেষে অভিধান পড়ে ছাত্র পড়াশোনায় পারঙ্গাম হয়ে উঠত।

দুবলা ডাকিয়া আনে পণ্ডিত শ্রীহরি।
শুভক্ষণ গণিঞা ছাল্যাকে দিল খড়ি॥
ক খ পড়েন সাধু গুরুর মন্দিরে।
বারফলা পড়ি সাধু শাস্ত্র পাঠ করে॥
পিঙ্গাল পড়িল আর পড়িল সুবন্ত।
অভিধান পড়িয়া শব্দের পাল্য অন্ত্য॥

তবে গুরুগৃহে ছাত্রেরা পড়াশোনা করলেও সম্পন্ন পরিবারে অধিক পয়সার বিনিময়ে

পড়াশোনায় বাড়তি যত্নের জন্য বাড়িতে অতিরিক্ত শিক্ষক নিয়োগ করা হত। শ্রীমন্তের শিক্ষার জন্য খুল্লনা এরূপ গৃহশিক্ষক রেখেছিলেন—

দিবসে পড়ান সাধু গুরুপাট স্থানে।
রাত্রে পড়ান দুর্গা আসিঞা আপনে॥

সমসাময়িক মনসামঙ্গাল কাব্যের কবি বিপ্রদাস পিপিলাইয়ের কাব্যেও মানিক দত্তের বর্ণিত বিদ্যাচর্চার অনুরূপ চিত্র পাওয়া যায়। কাজেই অনুমান করা যায় তখন সমগ্র বঙ্গো এই ধরনের শিক্ষাচর্চাই বিদ্যমান ছিল।

৫.

মানিক দত্তের 'চণ্ডীমঙ্গাল' কাব্য থেকে জানা যায়, তখন সমাজ ছিল যৌথ-পরিবার ভিত্তিক। ক্ষেত্র বিশেষে শাশুড়ি ননদীহীন স্বামী-স্ত্রীর (কালকেতু-ফুল্লরা) একক পরিবারের উল্লেখ থাকলেও ধনপতির দুই স্ত্রী, পুত্র, গৃহবধূ, দাসদাসী সমৃদ্ধ বৃহৎ সংসার যৌথ পরিবারভিত্তিক জীবনের কথা জানায়। তখন যৌথ পরিবারে বাড়ির পুরুষেরা বাইরে বিভিন্ন কাজে ব্যস্ত থাকলেও বাড়ির মেয়েরা অবসর কাটাতেন প্রতিবেশিনীদের সঙ্গো সুখ-দুঃখের গল্প করে। ভদ্রেতর সমাজের রমণীরা অবসর সময় কাটাত বান্ধবীর মাথায় উকুন বেছে। তখন সাধারণ মানুষ যাতায়াত করত পদব্রজে। সম্পন্ন লোকেরা দোলায় চড়তেন—

এ সকল বলি সাধা দোলাএ চড়িল।
দোলাঞ চড়িঞা সাধু জাত্রা করিল।।

স্থলপথ ছাড়া নদীমাতৃক বাংলাদেশে তখন জলপথেও মানুষ যাতায়াত করত। নদীপথে পারাপার বা গমনাগমনের রীতিটি ছিল অতিপ্রাচীন। প্রাচীনকালের চর্যাপদ থেকে মধ্যযুগের মঙ্গালকাব্যে এর উল্লেখ আছে।

৬.

যাত্রাকালে শুভাশুভ নির্ণয় ছিল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। পুরুষের একাদশী তিথিতে কোথাও যাত্রা, যাত্রাকালে অঙ্গাহীন বানরের সাক্ষাৎলাভ করা, পথের সামনে বা মাথার ওপর দিয়ে শকুনের উড়ে যাওয়া, রাস্তার বামপাশে সর্প ও ডানপাশে শৃগালের দর্শন সবই ছিল অমঙ্গালের চিহ্ন—

ভদ্রাকালে ধনপতি জাত্রা করিল।।
জাত্রা করি ধনপতি রহিল পুরের বাহিরে।
মোসানীতে ঠুটা বানর নাচায়ে।।
আকাশেতে সর্ব্ব কয়ে মার কাট।
সম্মুখে গৃধিনী পাখার মারে সাট।।
বামে সর্প দেখিল সাধু ডাহিনে জাম্বুকি।
জাত্রাকালে অমঙ্গাল দেখি মনে হৈল দুখি।।

নারীরা বামঅঙ্গ ও ডানচোখ নাচা এবং কালপেঁচার ঘন ঘন ডাক শুনতে পাওয়াকে অমঙ্গলসূচক বলে মনে করতেন।

বামঅঙ্গ কাঁপে মাতার দক্ষিণ লোচন।
কৈলাসেতে কালপেঁচা ডাকে ঘন ঘন।।
অমঙ্গল দেখি দুর্গা পদ্মাকে ডাকিল।
শুনিঞা দুর্গার বাক্য ভাবিতে লাগিল।।

৭.

সেকালে গৌড়বঙ্গের ধর্মপ্রাণ বাঙালির সকালবেলার ঘুম ভাঙত পাখির কলতানে। ঘুম থেকে উঠে প্রাতঃকর্ম সেরে মুখ হাত ধুয়ে ধর্মপ্রাণ বাঙালি ঈশ্বরের নাম স্মরণ করে রোজকার কাজে মনোনিবেশ করত।

রাত্রি প্রভাত হইল কুকিলার ধ্বনি।
শর্জ্জা হইতে শ্রীয়মন্ত উঠিল আপনি।।
ভৃঙ্গারের জলে সাধু মুখ পাখালিল।
দুর্গা স্মরণ করি নৌকা খেয়াইল।।

মধ্যযুগে বাঙালির স্নানপর্বটি ছিল অতি গুরুত্বপূর্ণ। প্রতিদিন স্নান করা ছিল বাঙালির কাছে মর্যাদাসূচক। বিনা স্নানে কেউ দুপুরের ভোজন সারলে সমাজে তার নিন্দা হত।

আপন বড়াই এথা কর উচ্চারণ।
বিনা স্নানে তোর পিতা করিত ভোজন।।

স্নানের আগে গায়ে তেল মালিশ করা ছিল অতি আবশ্যিক কর্ম। সম্পন্ন বয়স্ক ব্যক্তিরা তেল মাখানোর জন্য লোক রাখতেন আর ছোটো শিশুদের তেল মাখিয়ে দিতেন জননীরা। তখন স্নান করা হত প্রশস্ত পুষ্করিণী কিংবা নদীতে। স্নানের সময় সাধারণ লোকে তর্পণ, সূর্যপ্রণাম ইত্যাদি সেরে লাগোয়ো মন্দিরে পূজা দিয়ে বাড়ি ফিরতেন।

স্নান করিল শ্রীরাই আপনার সুখে।
সূর্য্যের নামে অর্ঘ্য ধরিল পূর্ব মুখে।।
লেহ লেহ জন্মরাজ তর্পণের জল।
অন্তকালে শ্রীমন্তে চরণে দেহ স্থল।।
সেহি জলে শ্রীমন্ত জল বিস্যারিয়া।
প্রপিতামহ নাম মনে পাইল গিয়া।।...
অবশেষে জল নিল হস্তে করিয়া।
জননীর নাম শ্রীরাই মনে পাইল গিয়া।।

নারীরা কায়মনোবাক্যে স্নান সেরে বাড়িতে ফিরে পূজা করতেন—

স্নান তর্পণ করি আপনার সুখে।
সূর্য্যের নামে য়র্ঘ্য ধরিল পূর্ব্বমুখে।।

কায় মন বাক্যে স্নান করিল যুবতী।
গৃহে জাগ্রিয়া বামা পহিল শুকলধুতি।।
জয় দিয়া স্থাপিল দুর্গার ঘটবারা।
মণিমুক্তা দিঞা কৈল বাধঝারা।।

মানিক দত্তের কাব্য থেকে জানা যায়, তখন শিব, দুর্গা, গণেশ, কার্তিক, কালী, চামুণ্ডা ইত্যাদি দেবতার পূজা প্রচলিত ছিল। তবে বিশেষভাবে পুরুষশাসিত উচ্চবংশীয় বণিক সমাজে শিব দেবতা সম্ভ্রম আদায় করে নিলেও চণ্ডী, দুর্গা প্রভৃতি নারী-দেবতার ঠাঁই হয়নি।

সোবন্নের ঘট সাধু তথাএ থুইল।
মিত্তিকার পঞ্চ শিব তথাএ স্থাপিল।।
নানাদ্রব্য দিয়া সাধু শিব পূজা কৈল।
পূজা করি ঘট সাধু মাথা নোয়াইল।।

নারীসমাজে এই সব নারী-দেবতার কিছু প্রাধান্য ছিল। ধনপতির বাণিজ্য যাত্রার পরে খুল্লনা বহুবার দেবী চণ্ডীকে পূজাপাঠে তুষ্ট করেছে—

পুষ্প ধূপ দিয়া করিল অন্ধকার।
স্তুতিভাবে দুর্গাক লাগিল পূজিবার।।
করজোড়ে খুলুনা হইল একমন।
কৈলাসে ভগবতীর নড়িল আসন।।

দেবদেবীর পূজার জন্য বহু মন্দির ছিল। মন্দিরের কেন্দ্রস্থলে একটি উঁচু বেদীতে সোনার ঘট স্থাপন করে তার চারপাশ বিভিন্ন পুষ্পে সুসজ্জিত করা হত। অগরু ধূপ চন্দনের গন্ধে মন্দিরের ভিতরের পরিবেশ যেন এক স্বর্গীয় বিভায় পরিপূরিত হয়ে যেত। তারপর ঘটের সামনে পিতলের রেকাবিতে ফল, মূল, আতপ চাল দুধের মিশ্রণে তৈরি নৈবেদ্য কলা ইত্যাদি সাজিয়ে রাখা হত। নিবিষ্ট চিত্তে বিভিন্ন মন্ত্রপাঠের মাধ্যমে পূজা সম্পন্ন হত, পূজার শেষে বলিদান ছিল পূজার অপরিহার্য অঙ্গ—

একান্ত করিঞা রামা করএ স্মরণ।
মোর পূজাঘটে আসি হও অধিষ্ঠান।।
নম নম নম মাতা নম নারায়ণী।
ভৈরবী ভবানী বন্দো সিদ্ধা যোগিনী।।
আদ্যমন্ত্রে খুলুনি চণ্ডীকে স্মরিল।
পূজা ঘটে আস্যা মাতা দরশন দিল।।
শত শত পাড়া পাঁঠা শীঘ্র কর্যা আনে।
মন্ত্র পড়িঞা তাহা উচ্ছর্গা ব্রাহ্মণে।।
শত শত পাঁঠা কাটে আর কাটে ভেড়া।
শত শত কাটিলেন মহিষের পাড়া।।
ছাগ মহিষ বলি দিলেন খুলনি।
আনন্দে নাচেন রামা দিঞা জএধ্বনি।।

বলিদান সহযোগে অনুরূপ জাঁকজমক সহকারে পূজার বর্ণনা সমকালীন মনসামঙ্গল কাব্যগুলিতেও পাওয়া যায়।

৮.

মানিক দত্তের ‘চণ্ডীমঙ্গল’ কাব্যে তৎকালীন বাংলাদেশের জনজাতির একটা বিস্তৃত ছবি মেলে। কোচ, ব্রাহ্মণ, দোসাউদ, কায়স্থ, বৈদ্য, ব্যাধ, যবন, চাঁই, কেওট, গুড়ি, পরি, কুড়ি, বারুই, তিওর, চাঁড়াল, বাঙ্গালী, উড়িয়া, তৈলঙ্গা, পাঠান, হাড়ি, মীর, কাজী প্রভৃতি জাতির পাশাপাশি অবস্থান থেকে বাংলাদেশে বসবাসকারী মিশ্রজাতির পরিচয়টি স্পষ্ট হয়ে উঠেছে।

৯.

বাদ্যযন্ত্র বাজিয়ে, বরযাত্রী সঙ্গে নিয়ে তখন বিবাহের শোভাযাত্রা যেত। দুন্দুভি, ঢাক, ঢোল, রায়বাঁশ, দামা, দগড়া, বাঁশি, সিঙা, করনাল, তাম্বুর, রণকাড়া, কাড়া, খোল, করতাল, মৃদঙ্গ, জয়ঢাক, কাঁসি, রণশিঙা, রবাব, খঞ্জনি, দোতারা ইত্যাদি বাদ্যযন্ত্রের ব্যবহার ছিল সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। বিবাহ উপলক্ষ্যে বাজি পোড়ানোরও একটা রেওয়াজ ছিল। বিয়েতে জামাইকে বহু দানসামগ্রী যৌতুক হিসেবে উপহার দেওয়া হত—

বিবাহ করিল তবে সাধুর নন্দন।
দানে জৌতুকে বসিল দুইজন।।
জামাতাকে দিল দান রজত কাঞ্চন।
মণিমুক্তা প্রবাল দিল বহুমূল্য ধন।।

মানিক দত্তের কাব্যের অভ্যন্তরীণ বিভিন্ন সূত্র থেকে অনুমান করা যায়, পুরুষশাসিত সেই সমাজে পুরুষেরা বহুবিবাহ করতেন। ধনপতির একাধিক বিবাহ, ষোড়শী চণ্ডীকে দেখে কালকেতুর প্রতি ফুল্লরার ব্যঙ্গোক্তি সেকথা প্রমাণ করে। সমাজে শাশুড়ি, ননদী, সতীনের অত্যাচারও ছিল লক্ষণীয়। পুরুষেরা বহুগামী হলেও নারীদের সতীত্বের ব্যাপারে তারা কঠোর ছিল। নারীরা একথা বুঝত বলে কোনো নারীর গর্ভাবস্থায় স্বামী বাণিজ্যে বা বাইরে কোনো কাজে গেলে গর্ভপত্র লিখিয়ে নিত।

লিখিঞা দেহরে পত্রখানি।
মোকে য়াসিঞা বোলেন দুচারিণী।।
জ্ঞাতিগণ ডাকিয়া আনিল শীঘ্রগতি।
জয়পত্র লেখে সাধু হেট করে মতি।।

ধনপতি গর্ভবতী স্ত্রীকে ছেড়ে দীর্ঘদিন পাটনে থাকবেন। পাটন থেকে ফিরে তিনি যদি তাঁর গর্ভের সন্তান নিয়ে কোনো কটু কথা শোনান বা সমাজ তার প্রতি কোনো কু-ইঙ্গিত করে সে ব্যাপারে সচেতন হয়েই খুল্লনা স্বামীকে দিয়ে এরকম পত্র লিখিয়ে নেয়। পুরুষ-শাসিত সমাজ তখন কী চোখে নারীকে দেখত গৌড়েশ্বরের এই কথায় তার স্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়—

রাজা বলে প্রাণমিতা আমি নিবেদি।
নারীর কারণে ভাবি ধিক তার জী।।
এক হিত কথা শুন মিতা মহাশএ।
নারীলোক আপনার কোন যুগে নয়।।
পরপুরুষে আশ করে সর্ব্বথায়।
নারী কি আপন হয় কুন শাস্ত্রে কয়।।

নারীকে তখন বিভিন্ন ছুতোয় নিজ সতীত্ব পরীক্ষা দিয়ে আপন চরিত্রের বিশুদ্ধতা প্রমাণ করতে হত। নারীর এই অবমাননার চিত্র সমসাময়িক দুই মনসামঙ্গলকার নারায়ণ দেব ও বিজয়গুপ্তের মতো মানিক দত্তও বর্ণনা করেছেন।

মানিক দত্ত 'চণ্ডীমঙ্গাল' কাব্যের আদিকবি হওয়ায় কাব্যের কাহিনি রচনার দিকে তাঁকে বেশি মনোনিবেশ করতে হয়েছিল। তা সত্ত্বেও কাহিনির বিভিন্ন ভাঁজে ভাঁজে সমাজ-পরিবার জীবনের বিচিত্র অভিজ্ঞতার রেণুগুলিকে ছড়িয়ে দিয়ে তার সুচারু উপস্থাপনা করেছেন। তাঁর কাব্য থেকে প্রাপ্ত এইসব অভিজ্ঞতার উপাদানগুলি থেকে সমসাময়িক গৌড়বঙ্গের সমাজ-পরিবার জীবনের বহু তথ্য পাওয়া যায়, যা একটা যুগের সামাজিক-নৃতাত্ত্বিক দলিল রূপে বিবেচিত হওয়ার দাবি রাখে।

উৎসের সন্ধানে

১। J.S. Stavorinas : Voyages to the East (Trans. by Samuel Hall Will Cocke from Dutch) Vol. 1. London, p. 414.

অন্য মুকুন্দের সন্ধানে : চণ্ডীমঙ্গালের দাম্পত্যবৃত্ত ও জীবনরসের ভাষ্যান্তর

ছন্দা রায়

ঔপনিবেশিক আধুনিকতায় উজ্জীবিত শিক্ষিত বাঙালি পাঠকের রসচৈতন্যে চণ্ডীমঙ্গালকার মুকুন্দের বড়ো শুদ্ধসত্ত্ব অধিষ্ঠান। মঙ্গালকাব্যের প্রথানুগ ধারায় ব্যতিক্রমী কবি হিসেবে মুকুন্দ এবং ভারতচন্দ্রের নাম যখনই যুগলে উচ্চারিত হয়েছে, পক্ষপাতের পাল্লাটা ভারী হয়েছে মুকুন্দের দিকেই। এর মুখ্যতম কারণ সাহিত্যরুচি সম্পর্কে তৈরি হওয়া নব্য সংস্কার, যা ভিক্টোরীয় শুচিবাগীশ নীতির ক্রম-সংক্রমণের পরিণাম। পরজাতি-অধীনস্থ হওয়ার বিপন্নতা কাটিয়ে ওঠার জন্য স্বদেশীয় ঐতিহ্যের প্রতি অভিমুখিতা থেকেই যদিও বাঙালি পাঠক ও গবেষকমহলে প্রাগাধুনিক বাংলাসাহিত্যের আস্বাদন ও মূল্যায়নের উৎসাহ জেগেছিল, প্রভুত্বকামী সাংস্কৃতিক আগ্রাসন কিন্তু রোধ করা যায়নি। ফলে দেহসম্ভোগ সম্পর্কে পূর্ববর্তী দেশজ ধারণার ধারাবাহিকতাকে অস্বীকার করে পরিবর্তিত রুচির নিরিখে সিদ্ধ-অসিদ্ধের গণ্ডি টানা শুরু হল। তাতে ভারতচন্দ্র শ্লীলতার সীমা লঙ্ঘনের দায়ে অভিযুক্ত হলেন। মুকুন্দ পেলেন শুদ্ধির ছাড়পত্র।

প্রসঙ্গাক্রমে মনে পড়বে কমলাকান্তের জবানিতে বঙ্কিমচন্দ্রের কাকুবক্রোক্তিমিশ্রিত বাচন : 'ভারতচন্দ্র আদিরস পঞ্চমে ধরিয়া জিতিয়া গিয়াছেন—কবিকঙ্কণের ঋষভস্বর কে শুনে?' বস্তুত ভারতচন্দ্র তাঁর 'অন্নদামঙ্গাল' কাব্যের দ্বিতীয় খণ্ডে শ্রবণবিলাস বিদ্যাসুন্দর কাহিনির অবতারণা করে পঞ্চমের চড়া সুরের রতিরসকথায় যেভাবে রাজদরবার থেকে আমদরবার পর্যন্ত মাতিয়েছিলেন, মুকুন্দের প্রতিবেশ, মানসিকতা এবং মঙ্গালকাব্যের প্রথানুসারী কাহিনি-কাঠামো তেমন চিত্তোত্তেজক রসদ যোগানোর অনুকূল ছিল না। কালান্তরে শীলিত পাঠকসমাজ ভারতচন্দ্রের লোকলোভন অসামাজিক কামোপাখ্যানকে সমাদর জানাতে কুণ্ঠিত হলেন। তুলনায় খাদের স্বর ঋষভে বাঁধা মুকুন্দের পরিবারবৃত্ত কাহিনি পরিবর্তিত মূল্যমানে অনেক স্বস্তিতে গ্রাহ্য হল।

ভারতচন্দ্রের বাগ্‌বৈদগ্ধ্য এবং মণিমণ্ডিত কাব্যশোভা অবশ্য রসিকজনের বাহবা পায়নি এমন নয়। তবু বিশেষভাবে 'আদিরসে'র কবি হিসেবেই মার্কামারা হয়ে গেলেন তিনি। আর ঔপন্যাসিকসুলভ অভিজ্ঞতা, বাস্তববোধ ও পর্যবেক্ষণশক্তির গুণে বহুপ্রশংসিত মুকুন্দ প্রাজ্ঞ সমালোচকের অভিনন্দিত অভিধায় হয়ে গেলেন 'জীবনরসে'র কবি। যেন শৃঙ্গার

বা আদিরসের অস্তিত্ব জীবনের সীমানার বাইরে। অথচ মুকুন্দের নিজের দিক থেকে সত্যিই কি ছিল সেই প্রত্যাখ্যান? সত্যিই কি আদ্যন্ত কাহিনি জুড়ে পাঠকের জন্য তিনি শুধু দেবতার নামে নিরামিষ ভোজ্যের আয়োজন করেছিলেন? আমাদের উত্তর স্পষ্টতই নেতিবাচক। তবে নিছক বিলাসকলাকৌতূহল চরিতার্থ করার তাগিদে নয়, পৃষ্ঠপোষকের মনোরঞ্জনের তাগিদেও নয়, কাহিনির অন্তর্গত চরিত্রদের সামাজিক ও পারিবারিক অবস্থানের কথা মনে রেখেই জৈবিক আকাঙ্ক্ষার ধরন-ধারণগুলো কবি বুঝে নিতে চেয়েছিলেন। পরিস্থিতিভেদে লক্ষণীয় ভাবে তার মাত্রাভেদ ঘটেছিল।

প্রচলিত লোককথার মধ্যে চণ্ডীমঙ্গালের কাহিনি-বীজ কীভাবে ছিল, মুকুন্দের পূর্বসূরী হিসেবে কথিত মানিক দত্তের কাছে কবি কতটা ঋণী, অনুমান-প্রমাণের সেই বিতর্কমূলক জটিলতায় না গিয়ে একটি বক্তব্য বোধহয় নিশ্চিন্তে স্থাপন করা যায়, কাহিনির অন্তর্লীন সামাজিক তাৎপর্যটি মুকুন্দের পূর্ণাবয়ব নির্মাণেই সবচেয়ে সফল ভাবে প্রতিবিম্বিত। তুর্কি আক্রমণোত্তর বাংলায় লোকায়ত সংস্কৃতির সঙ্গো অভিজাত সংস্কৃতির মেলবন্ধনের যে-ঐতিহাসিক আর্তির মধ্যে মঙ্গালকাব্যে জন্ম, চণ্ডীমঙ্গালের নরখণ্ডে দ্বিভাজিত কালকেতু উপাখ্যান ও ধনপতি-উপাখ্যান যেন তারই প্রতীকচিহ্ন। বিপরীত দিক থেকে দেখলে দেবীমাহাত্ম্য প্রতিষ্ঠার অখণ্ড গ্রন্থি ছাড়া খণ্ড দুটি পরস্পরের সঙ্গো সংযোগহীন। সেই বিচ্ছিন্নতাও ইতিহাসের গভীরতর মর্মান্তিক সত্যের ইঙ্গিতবাহী। এভাবে খতিয়ে দেখার জন্য সেই কাল নিশ্চয়ই প্রস্তুত ছিল না। তবে মুকুন্দ তাঁর কাব্যকাহিনির মামুলি বিন্যাসমাত্র না করে বৈষম্যমূলক সামাজিক স্তরায়নের চিহ্নগুলিকে আখ্যানের সর্বাঙ্গো মুদ্রিত করে দিয়েছিলেন। ক্ষেত্রবিশেষে তাঁর ব্রাহ্মণ্য সংস্কার আরোপের অসংগতি মেনে নিয়েও এ সিদ্ধান্তে অবিচল থাকা যায়।

কাব্যসংস্থিত দেবী চণ্ডী স্বমহিমা প্রতিষ্ঠা ও প্রসারণের অবলম্বন হিসেবে যে দুটি পরিবারকে নির্বাচন করেছিলেন তাদের একটি অভাবী অন্ত্যজ ব্যাধ পরিবার, আরেকটি সম্ভ্রান্ত সম্পন্ন বণিক পরিবার। সম্পূর্ণ ভিন্ন সামাজিক মেরুর বাসিন্দা হওয়ার কারণে দুই পরিবারভুক্ত মানুষজনের জীবনের চাহিদা আলাদা, যাপনপদ্ধতি আলাদা, নৈতিক বিশ্বাসের ভিত্তিটাও এক নয়। এই অসমমাত্রিকতার কোনোটা থেকেই নরনারীর সম্পর্ককে বা তাদের দেহাকাঙ্ক্ষাকে বিচ্ছিন্ন করে দেখা যায় না, মৌল প্রবণতায় যতই তা সহজাত বৃত্তি হোক। তাই সার্বিক প্রেক্ষিত সহযোগে যৌনাচারের কার্যকারণ সন্ধান করে নিতে হয়। মুকুন্দ এ বিষয়ে আমাদের নিরাশ করেননি।

কামোপভোগের অনিবার্যতা স্বীকার করেও কামনার যথেচ্ছাচার নিবৃত্ত করার জন্য সমাজশাস্ত্র নরনারীর বিবাহবন্ধন বিহিত করেছে। কিন্তু দাম্পত্যের সহজলভ্য সম্পর্কের প্রাত্যহিকতা বা গতানুগতিকতার মধ্যে কামের বৈচিত্র্য বা চমৎকারিত্ব প্রদর্শন যে কোনো কবির পক্ষেই কঠিন কাজ সন্দেহ নেই। চণ্ডীমঙ্গালের দুটি আখ্যানই যেহেতু মুখ্যত দাম্পত্যকেন্দ্রিক, সুতরাং বর্ণিল মৈথুনচিত্রের বিস্তৃত পরিসর সেখানে না থাকাই স্বাভাবিক। অথচ মুকুন্দের 'কবিকঙ্কণচণ্ডী'র সাক্ষ্যে কালকেতুর কাহিনিকে নীরক্ত দেখালেও ধনপতির

কাহিনি, অন্তত প্রথম পর্বের আখ্যানভাগে, রীতিমতো রক্তিম। তার কারণ এই নয় যে, দেবীর মহিমাগাথা রচনায় 'আখেটিক' খণ্ডে কবি শুচিতা রক্ষার সতর্কতায় সংযমী হলেন আর বণিকখণ্ডে অসহিষ্ণু আবেগে তাঁর সংযমের বাঁধ ভেঙে গেল।

আসলে কবি জানতেন, ভেরেণ্ডার থাম দেওয়া ভগ্ন কুটিরের জীর্ণ শয্যার সঙ্গে বণিকের বিলাসবহুল প্রাসাদের মহার্ঘ পালঙ্কশয্যার তুলনা চলে না। পরিস্থিতিগত বিবেচনাবোধ থেকেই কবির কলম কালকেতু-ফুল্লরার আসঙ্গলিপ্সা বর্ণনায় প্রগল্ভ হতে পারেনি। বিবাহের পর তাদের বাসররাত্রির জন্য কবি ব্যয় করেছেন দুটিমাত্র পংক্তি : 'দুহে প্রবেশিয়া ঘরে/মীনমাংস ভোগ করে/রাত্রি গেল কুসুমশয্যায়।' কুসুমের সুবাস উবে যেতে বেশি সময় লাগেনি। চমৎকারা অন্নচিন্তা সঙ্গে নিয়ে শুরু হয়েছে ব্যাধদম্পতির সংগ্রামের জীবন। অনলস শ্রম। অহরহ অনটন। পশুশিকারে ক্লান্ত কালকেতু। কখনো কখনো জীবিকার অনিশ্চয়তায় শঙ্কিতও বটে। ওদিকে একা হাতে ঘরের কাজ, হাটের কাজ সামলাতে জেরবার ফুল্লরা। শরীরী বিলাসের অবকাশ কোথায়?

ফুল্লরার বারমাস্যাকে আমরা অতিরঞ্জন মনে করি না। সম্ভাবিত সপত্নী বিতাড়নের তাড়না না থাকলে ফুল্লরা নিশ্চয়ই তার অপ্রাপ্তির তালিকা পরনারীর সামনে হাজির করত না। কিন্তু দরিদ্র ব্যাধের ঘরে কামনা পরিতৃপ্তির আশা কতটা দুরাশা, তা ছদ্মবেশী চণ্ডীকে বোঝাতে গিয়ে ফুল্লরার কণ্ঠে যে মর্মান্তিক উচ্চারণ, তার বাস্তবতাকে অস্বীকার করার উপায় কোথায়?

মধুমাসে মলয় মারুত মন্দ মন্দ
মালতিয়ে মধু পান করে মকরন্দ।
বণিতা পুরুষ অঙ্গ পিড়এ মদন
আমার পীড়িত অঙ্গ উদর দহন।

মধুমাসে মধুপের মধুপানের সানুপ্রাস অনুষঙ্গটুকু কাব্যপ্রথার খাতিরেই ছাড়তে পারেননি কবি। কিন্তু ফুল্লরার বিপ্রতীপ আর্তিতে একথাই ঘোষিত হল, উদরদহনের তীব্রতার কাছে কামদহনও পরাজিত। তবু ঋতুচক্রের আবর্তনে পাক খাওয়া সময়ের অজস্র সংকট আর বিপর্যয়ের মধ্যেও কালকেতু-ফুল্লরার শরীরী সংযোগ নিঃসন্দেহে অবধারিত ছিল। কিন্তু তা প্রান্তবাসী আরণ্য মানুষের অশীলিত কাম। তাতে ছিল না কামকলা। ব্যাধদম্পতির সংকীর্ণ ঘরের অনাড়ম্বর নিশীথ শয্যায় কবি তাই দৃষ্টিপাতের স্বতন্ত্র প্রয়োজন অনুভব করেননি।

প্রশ্ন উঠতে পারে, কুলীন ব্রাহ্মণ বংশোদ্ভূত, উচ্চবর্গীয় সংসর্গে লালিত মুকুন্দ অন্ত্যজ মানুষের জীবনস্বভাব সম্পর্কে কতটুকু অবহিত ছিলেন? প্রান্তিক জীবনের ঘনিষ্ঠ অনুসন্ধানী মহাশ্বেতা দেবী কিন্তু এ বিষয়ে মুকুন্দকে অকুণ্ঠ শংসাপত্র দিয়েছেন। নিজের 'ব্যাধখণ্ড' উপন্যাসের মুখবন্ধে মধ্যযুগীয় এক কবির প্রতি তাঁর ঋণ স্বীকার করে বলেছেন : 'ব্যাধজীবন সম্পর্কে মুকুন্দরামের অন্তরঙ্গ পরিচয় তো তাঁর 'অভয়ামঙ্গল' পাঞ্চালীর 'ব্যাধখণ্ড' অংশেই বিবৃত।' নিতান্ত কাণ্ডজ্ঞানহীন নয় এই মন্তব্য। ঘটনাটি ঘটা সম্ভব ছিল। মুকুন্দের

'গ্রন্থোৎপত্তির বিবরণ' থেকে জানা যায়, স্বভূমি দামুন্যা ছেড়ে এসে উদ্বাস্ত অবস্থায় কবি আশ্রয় পেয়েছিলেন মেদিনীপুরের আড়রার ভূস্বামীগৃহে। এই মেদিনীপুরেরই সীমান্তবর্তী অরণ্য অঞ্চল আদিবাসী গোষ্ঠীভুক্ত লোধা শবরদের বাসভূমি। জনজীবনের প্রতি কৌতূহলের বশে হয়তো কবি মুকুন্দ 'ও পাড়ার প্রাঙ্গণের ধারে' পৌঁছতে পেরেছিলেন, ভিতরে প্রবেশ করার শক্তি যদি নাও থেকে থাকে। আর তাতেই হয়তো স্ব-বর্গীয় ধ্যান-ধারণার সঙ্গে মিশে গিয়েছিল নিম্নবর্গীয় মানুষের অকৃত্রিম জীবনবাস্তবতা।

আখেটিক খণ্ডে সম্ভোগের বর্ণহীনতা থাকলেও সম্ভোগ প্রতিরোধের নাটকীয়তা কম উপভোগ্য নয়। সমাজকে স্থিতাবস্থায় রাখার ক্ষমতাতান্ত্রিক প্রয়োজনে শাস্ত্রীয় ও ব্যবহারিক অনুশাসন পরকীয়া যৌন সম্পর্কের ওপর বরাবরই একটি নিষেধাজ্ঞা জারি করে রেখেছে। প্রতিপত্তিশালী পুরুষদের তা না মানলেও চলে। ধনপতি-উপাখ্যান তার প্রমাণ দেবে। কিন্তু যারা দুর্বল, যাদের পায়ের তলায় শক্ত জমি নেই, বাধ্যতামূলক নিয়মবন্ধনে অভ্যস্ত হতে হতে তাকেই তারা নৈতিকতা বলে ভাবতে শেখে। কালকেতু যে-সমাজের মানুষ তা স্মার্ত নিয়ন্ত্রণের বাইরে হলেও সেখানেও গোষ্ঠীপতিদের নিয়ন্ত্রণ ছিল, যদিও সেই আধিপত্য আখ্যানের অলক্ষ্যে থেকে গেছে। অবশ্য সেখানকার বৈবাহিক নিয়মকানুন উচ্চবর্ণীয়ের তুলনায় শিথিল। মহাশ্বেতার 'ব্যাধখণ্ডে'র দ্বারস্থ হলে জানা যায় : 'শবর সমাজে মেয়ে-মরদে খাটে-পেটে, খায়। যেখানে মন বসে, সেখানে বিয়ে করে। ...এমনও হয় যে এ-ওকে ছেড়ে দিল। তখন মেয়ে মরদ দু'জনেই পুনর্বিবাহ করতে পারে।' অর্থাৎ বাঁধন আলগা করেও টেনে ধরার চেষ্টা। স্বাধীনতা দিয়েও স্বেচ্ছাচারের পথ রোধ করতে প্রান্তিক সমাজেও বিবাহই বৈধ সম্বন্ধ হিসেবে গৃহীত হয়েছে।

সেই বৈধতাকে পরিপূর্ণ মান্যতা দিয়েছিল কালকেতু আর ফুল্লরা। অবশ্য মন দেওয়া-নেওয়া নয়, অভিভাবকীয় উদ্যোগেই তাদের বিবাহ। কিন্তু অভাবের ঘরেও প্রেম ছিল। সূক্ষ্ম অনুভবের কাব্যিক প্রেম নয়, পরস্পরকে নিয়ে বাঁচার সাধ। গৃহবন্ধনের প্রতি অবিচল আনুগত্য। কর্মক্লান্ত দিবসান্তে ফুল্লরার প্রতিটি রাতের সোহাগ উথলে উঠেছে কালকেতুর 'কপাটবিশাল বুকে', কবি আমাদের এমনটাই যেন অনুমান করিয়েছেন। অকস্মাৎ ফুল্লরার নিশ্চিন্ত ভুবনটুকু টলোমলো হল যোড়শী রূপসীবেশে দেবী চণ্ডীর আবির্ভাবে। যেমন তেমন রূপ নয়, কালকেতুর মনোবল পরীক্ষার জন্য ইন্দ্রিয়বিলাসের চূড়ান্ত হাতছানি—

ত্রিবলিবলিত মাঝে　　সুবর্ণ-কিঙ্কিণী সাজে
উরুযুগ রম্ভার সমান
জিনিতে কুঞ্জরকুম্ভ　　কুচযুগ করে দম্ভ
কিবা দিব রূপের উপাম।

এ তো ফুল্লরার মতো প্রাকৃত নারীর অযত্নকৃত অঙ্গশোভা নয়। ধনীগৃহের সাভরণা রমণীর অনুপুঙ্খ দেহসৌষ্ঠবের বর্ণনায় সংস্কৃত কাব্যের আলংকারিকতাকে আত্মস্থ করতে মুকুন্দের কলম দ্বিধা করেনি। তাছাড়া অভিজাত পুরাণ এবং লোকপুরাণের ঐতিহ্যক্রমে কবি

জানতেন, উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য কামনার ফাঁদ পাতলে দেবতারা গৌরবভ্রষ্ট হন না। কবি তাই দীর্ঘায়ত চিত্রে প্রলোভনের অজস্র উপকরণ সাজালেন। বোঝা গেল, তিনি নিরর্থক শুচিবাগীশ নন। ব্যাধের ভগ্ন কুটিরে ছদ্মবেশিনীর সঙ্গে প্রথম মুলাকাত ফুল্লরার। স্বামীর দিক থেকে বিশ্বাসভঙ্গের কোনো পূর্ব অভিজ্ঞতা নেই তার। তবু হঠাৎ সমাগত অজ্ঞাতকুলশীলা নারীর মোহিনী মূর্তি দেখে, বিশেষত তাঁর মুখে 'আনিল তোমার স্বামী বান্ধি নিজ গুণে' এমন হৃদয়বিদারী বাক্যশ্লেষের মর্মভেদ করতে না পেরে পুরুষের চরিত্রে ফুল্লরা আর ভরসা রাখতে পারেনি। অগত্যা পরগৃহের এয়োস্ত্রীকে সে শুনিয়েছে সতীধর্মের হাজারো উপদেশ এবং নিজেদের দারিদ্র্যের সাতকাহন। রূপসী তবু অনড়। এবার কোপ গিয়ে পড়ল কালকেতুর ওপর। হাটে স্বামীর সন্ধান পেয়ে ঈর্ষা ও সন্দেহে জর্জর ফুল্লরা তার বিরুদ্ধে সরাসরি চরিত্রচ্যুতির অভিযোগই আনল : 'এতদিনে মহাবীর পাপে গেল মন/আজি হইতে হইলে তুমি লঙ্কার রাবণ'। নারীহরণকারীর সেই সনাতন মিথ তো লোকমানসেও সজাগ।

অতঃপর আহত ক্রুদ্ধ কালকেতু ঘরে ফিরল অজানা রহস্যময়ী সম্পর্কে বিমূঢ় কৌতূহলে। ষোড়শী রামার সামনে ব্যাধের প্রথম প্রতিক্রিয়া লক্ষ করবার মতো : 'প্রণাম করিআ বীর করে নিবেদন।' এই প্রণামের অর্থ—অবৈধ সম্ভাবনাকে শুরুতেই রুখে দেওয়া। 'পরদারেষু মাতৃবৎ' এই আপ্তবাক্যের একটি লোকায়ত সংস্করণ নিশ্চয়ই অন্ত্যজ সমাজেও অপ্রচলিত ছিল না। কালকেতু তাই সাবধানী। উচ্চকুললক্ষণসম্পন্না নারীকে কুলে ফেরাবার জন্য আঁটঘাট বেঁধে নেমেছে সে। তার প্রথম যুক্তি : 'এই ঘরে ঠাকুরাণী/ছুঞিলে উচিত হয় স্নান।' নিজের অস্পৃশ্য জাত-পরিচয় এখানে তার আত্মরক্ষার বর্ম। কালকেতুর দ্বিতীয় যুক্তি : 'যদি হয় পাপনিশা/লোকে গাব দুর্ভাষা/রজনি বঞ্চিলে কার সাথে।' মন নয়, দৈহিক শুচিতার নিরিখে নারীর ধর্মাধর্ম বিচারের আবহমান পুরুষতান্ত্রিক ভাষ্যেই অভ্যস্ত কালকেতু। সমাজের কাছে নারীর পরগৃহে রাত্রিযাপনের একটাই ব্যাখ্যা। তবে গৃহ যেহেতু কালকেতুর, কলঙ্কের দায় থেকে সেও রেহাই পাবে না। আসন্ন সর্বনাশের সীমান্তে দাঁড়িয়ে নিরুপায় ব্যাধ শেষপর্যন্ত রূপসীর হাত থেকে পরিত্রাণ পেতে ধনুর্বাণকে হাতিয়ার করতে চেয়েছে।

মোহিনীর মোহাকর্ষণ জয়ের সামর্থ্যে কালকেতুকে কবি কি বড়ো বেশি আদর্শায়িত করেছেন? আমাদের তা মনে হয় না। চরিত্রটির বাচন ও আচরণের উৎসে রয়েছে তার ধাতুপ্রকৃতি। বিলাসের মুখ দেখেনি বলেই হয়তো ব্যসনের প্রতি তার অনীহা। চেতনায় মিশে থাকা সরল এক নীতিবোধ তাকে পদস্খলন থেকে নিবৃত্ত করেছে। দেহবল সত্ত্বেও মনোবলে ভীরু হওয়ায় কামনাকে লাগামছাড়া করার দুঃসাহস সে পায়নি। অথবা হয়তো উচ্চবর্ণের সঙ্গে নিম্নবর্ণের দুর্লঙ্ঘ্য ব্যবধানের বোধ অন্ত্যজের কামচেতনাতেও সঞ্চারিত। নিতান্ত স্থূল বুদ্ধির স্থূল প্রকৃতির মানুষ সে। নারীর অঙ্গপ্রত্যঙ্গের সূক্ষ্ম কারুকাজ তার নজর টানেনি। আটপৌরে সংসারে সমগোত্রের বনিতাই আরণ্য ব্যাধের সুখদুঃখের নিশ্চিন্ত সাথী। ছদ্মবেশিনীর প্রতি তাই সীমাস্বর্গের নন্দনের পরোয়াহীন প্রত্যাখ্যান—

বড়ার বহুআরী তুমি বড় লোকের ঝি
তোমার মোহন রূপে মোর লাভ কি।

যে-কারণে ফুল্লরার উদরজ্বালার কাছে পুষ্পশরের দহন হার মেনেছিল, সেই একই অভিজ্ঞতা থেকে কালকেতুও বলতে চেয়েছে, রূপের হাটের পশরায় তার অভাবের ঘর ভরবে না।

তবে অযাচিত দাক্ষিণ্যে দেবী স্বয়ং যখন বরদা হলেন, তাঁর ধন গ্রহণে কালকেতুর বিবেক বাধা দেয়নি। দরিদ্রের আকাশকুসুম স্বপ্ন এখন তার মুঠোর মধ্যে। তাই—'পুরিতে জায়ার সাদ/কিনিল পাটের জাদ/মণি মুকুতা তাতে বেড়ি/হিরা নিলা মুতি পলা/কলধৌত কণ্ঠমালা/কুন্তল কিনিল স্বর্ণ-চুড়ি।' প্রসাধনের তালিকা দেখে উৎসুক হতে হয়, রত্নাভরণা চণ্ডীর ধাঁধানো রূপের বাহার তবে কালকেতুর চোখ টেনেছিল? ফুল্লরাকে কি সেই বড়ো ঘরের বৌয়ের সাজে সাজাতে চেয়েছিল সে? ব্যাধের মনের গোপন অভিলাষ কবিই জানেন। তবে দেবীর অনুগ্রহে চূড়ান্ত আর্থিক স্বাচ্ছন্দ্য লাভের পরেও রাজা কালকেতুকে তিনি সম্ভোগলোলুপ করেননি। বিশাল রাজ্যপাট, স্বয়ং বিশ্বকর্মা নির্মিত প্রাসাদপুরী, মধ্যে সরোবরশোভিত অন্দরমহল, সহচরী-পরিচর্যায় লালিত ফুল্লরা—এত সব প্রাপ্তির মধ্যে দুর্দিনের দুঃস্বপ্ন ভুলে কালকেতুর তো সুখবিলাসী হয়ে ওঠারই কথা। সংযমের মাত্রা অতিক্রমও অসম্ভব নয়। অথচ ষড়যন্ত্র, যুদ্ধ, কারাবাসের ক্রমান্বয়ী ঘটনা, দেবীর অনুগ্রহ-নিগ্রহের বিচিত্র টানাপোড়েন—সব মিলিয়ে বিভ্রান্ত বিহ্বল কালকেতু ফুল্লরার সঙ্গে অবকাশরঞ্জিনী প্রমোদে ভাসার সুযোগ পেল কই? সত্যিই যখন স্বস্তি মিলল, সন্তানও এল ঘরে, ঠিক তখনই কলমের স্বল্প আঁচড়ে অনেকগুলো বছর একটানে পার করে প্রৌঢ় ব্যাধদম্পতিকে কবি ফিরিয়ে দিলেন স্বর্গভূমিতে। মর্ত্যজীবনে প্রতিষ্ঠা পেল কালকেতুর পত্নীনিষ্ঠতা এবং ফুল্লরার সতীসাধ্বিতা, যে দুটিই অবাধ যৌনতা অবতারণার পরিপন্থী। বস্তুত পরস্পর সাপেক্ষ এমন সরল দাম্পত্য এতটাই অকৃত্রিম যে, বিত্তবিলাসের অজস্র উপকরণ করায়ত্ত হলেও ভোগের প্রবৃত্তি উদগ্র হয় না।

সম্পূর্ণ বিপরীত অভিমুখের ভিন্ন এক বাস্তবতাকে অনাবৃত করার জন্য কবি মুকুন্দ প্রবেশ করলেন বণিকখণ্ডের কাহিনিতে, পৃথক মেজাজ এবং শরীরী সম্ভারের পৃথক প্রদর্শনীসহ। 'কবিকঙ্কণচণ্ডী'র প্রাক্তন পর্যায়ের সমালোচকদের মধ্যে তাৎপর্যপূর্ণভাবে দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলেন্দ্রনাথ ঠাকুরের কয়েকটি প্রবন্ধপংক্তি— 'বিদ্যাপতি চণ্ডীদাসের মত মুকুন্দরাম হৃদয়ের গভীর ভাব ব্যক্ত করিতে পারেন নাই। তাঁহারও বিরহ-বেদনা আছে, মিলন-আনন্দ আছে, কিন্তু সে বেদনায় দেহই জ্বলিয়াছে অধিক সে মিলনে দেহই বাঁচিয়া গিয়াছে।' কথাগুলো ব্যাধখণ্ড নয়, বণিকখণ্ড সম্পর্কে পুরোপুরি খাটে। দেহের আর্তি সেখানে নারী-পুরুষ নির্বিশেষে প্রকট। কাহিনির চরিত্রদের জন্মের উৎসমূল সন্ধান করলে দেখা যাবে, মুখ্য ভূমিকায় যারা আছে, তারা সকলেই কালকেতু-ফুল্লরার মতো দেবযোনিসম্ভব নয়, নয় সকলেই ইন্দ্রপুত্র নীলাম্বর ও তাঁর অনুগামিনী ছায়ার মতো অচ্ছেদ্য দম্পতি।

'বণিকখণ্ডে' বণিকপুত্র শ্রীমন্ত এবং তার পত্নীযুগলের দৈব পরিচিতি আছে। কিন্তু স্বয়ং ধনপতি এবং তাঁর প্রথমা পত্নী লহনা অপরাপর কবিদের কাব্যে ইন্দ্রপুত্র মণিকর্ণ এবং তাঁর সহধর্মিণী চন্দ্ররেখার পার্থিব রূপ পেলেও মুকুন্দ তাঁদের দিব্যতনুজাত করেননি। ধনপতির দ্বিতীয়া পত্নী খুল্লনা অবশ্য স্বর্গমূলছিন্ন নয়। কিন্তু যার মর্ত্যরূপ পেয়েছে সে, সেই রত্নমালা ইন্দ্রের সভার নটী। এই জাতপত্রগুলি সঙ্গো নিয়েই আমরা মুকুন্দের দ্বিতীয় খণ্ডের কাহিনিতে প্রবেশ করব।

আরণ্য প্রান্তিক জীবন থেকে বহু দূরবর্তী বণিকজীবনের নাগরিক বৃত্তান্তে কবি খুব সচেতনভাবেই দেখিয়েছেন নায়কের নাগরালি বৃত্তি। কালকেতুর বিপরীত কোটিতে অবস্থিত ধনপতির বংশকৌলীন্য আছে। বাণিজ্যের দৌলতে তিনি বিত্তকৌলীন্যেরও অধিকারী। সওদাগরির অবকাশে তাঁর আত্মবিনোদনের সুযোগ আছে এবং সাধও আছে। কৃতদার হওয়া সত্ত্বেও লক্ষপতি বণিকের রূপবতী কন্যা খুল্লনাকে দেখামাত্র অক্লেশে তিনি বলতে পারেন : 'পরাণ বান্ধিআ মোর রাখ্যাচ অঞ্চলে।' আসলে টানটা তো প্রাণের নয়, দেহের। অচিরেই কবি স্পষ্ট করেন, লোকমুখে খুল্লনার বিস্তারিত বিবরণ শুনতে শুনতে 'সাধুর হৃদয়ে লাগে কামশর বেথা।'

শরবিদ্ধ ধনপতি তর সইতে নারাজ। তবে কুলকন্যা খুল্লনাকে মুফতে পাওয়া যাবে না। তাই তাকে স্বকীয়া করার দ্রুত উদ্যোগ। সবটাই গোপনে,লহনার অগোচরে। বল্লালীয় কৌলীন্যপ্রথার দৌলতে ধনপতির একাধিক বিবাহে সামাজিক সমর্থনের পথ প্রশস্ত ছিল। তাছাড়া লহনার সঙ্গো দীর্ঘ বৈবাহিক জীবন যাপনের পরেও ধনপতির মধ্যে এমন কোনো নৈতিক দায়বদ্ধতা তৈরি হয়নি যা তাঁকে অপরাধবোধে পীড়িত করতে পারে। লহনার পক্ষ থেকে প্রতিরোধের আশঙ্কাই তাঁর একমাত্র অস্বস্তির কারণ। অবশ্য তা সামাল দেওয়ার মতো চাতুর্য ধনপতির ছিল। পরের মুখে স্বামীর দ্বিতীয় বিবাহের সংবাদ শুনে লহনা অভিমানিনী হলে 'কপট প্রবন্ধে সাধু লহনা বুঝান।'

নিছক দেহগত চাহিদার ওপর যে দাম্পত্য সম্পর্ক দাঁড়িয়ে আছে সেখানে অভিমানের উৎসেও প্রেম নেই। লহনার ভয়, সতীন ঘরে এলে অন্দরমহলের একচ্ছত্র আধিপত্যে ফাটল ধরবে। আরও বড়ো ভয়, স্বামীর শয্যায় তার প্রাত্যহিক প্রয়োজন ফুরিয়ে যাবে। লহনার এই দুর্বলতার জায়গাটি ধনপতির ভালই জানা। এতকাল পরে হঠাৎই তাই তিনি কপট দরদে উথলে ওঠেন—

রূপনাশ কৈলে প্রিয়ে রন্ধনের শালে
চিন্তামণি নঠ কৈলে কাঁচের বদলে।

প্রতিবস্তু-উপমার কৌশলী প্রয়োগে লহনার নারীদেহকে মণিতুল্য মহার্ঘ প্রতিপন্ন করার চেষ্টা আছে। সেই দেহে যাতে লাবণ্যের ঘাটতি না পড়ে তারই জন্য যেন পরম মমতায় স্বামী বিবাহের নামে একজন পরিচর্যাকারী দাসী আনতে চলেছেন। ধনপতির অভিনয় না বোঝার মতো অনভিজ্ঞ নয় লহনা। কিন্তু দেহদান এবং সেবাদানে স্বামীর পরিতুষ্টি বিধান ছাড়া নিজের অস্তিত্ব টিঁকিয়ে রাখার আর কোন অবলম্বন আছে তার? পুরুষের ইচ্ছায় লাগাম

পরানোর ক্ষমতা রাখে নাকি সে? তাই বঞ্চনার জ্বালা উপেক্ষা করে তাকে বিবাহার্থী স্বামীর জন্য সযত্নে ভোজের আয়োজন করতে হয়। আহারান্তে তাঁর তৃপ্তির উদ্‌গারের জন্য প্রতীক্ষা করতে হয়। তারপর নির্লজ্জভাবে মেলে ধরতে হয় বিগতযৌবনার অবশিষ্ট অঙ্গারাগ। হাতের কাছে বিকল্প নেই বলে লহনার সচেষ্ট ললিত গমনভঙ্গি এবং কটাক্ষেই চঞ্চল হয়ে ওঠেন কামাতুর ধনপতি। অতঃপর 'উদিত কামান/মধ্যে পঞ্চবাণ/কন্দল ভাঙ্গো আপুনি।'

কামের সহকারী ভূমিকায় স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক যে এক ধরনের আপোষরফায় পৌঁছে যায়, 'বণিকখণ্ডে' তার দৃষ্টান্ত নিতান্ত সুলভ। ধনপতির সিংহল যাত্রার পূর্ব পর্যন্ত উপলক্ষ্য পেলেই কবি গার্হস্থ্য পরিসরে দেহোপভোগের বহুবিধ আয়োজন করেছেন। একা ধনপতি নন, তার দুই পত্নীর কণ্ঠেও নিখাদ হৃদয়ের ভাষা প্রায় শোনাই যায়নি। তবে তফাত এখানেই যে, দেহবিলাসী ধনপতির বাসনা স্বকীয়াতে সীমাবদ্ধ থাকেনি। লহনা-খুল্লনার শরীরী কামনা সমাজ-শাস্ত্রবিহিত সতীত্বের সীমা লঙ্ঘন করেনি। ধনপতির দ্বিতীয় বিবাহের পর স্বামীর দখলদারি নিয়ে দুই সতীনের অসম প্রতিযোগিতা যে ধরনের নগ্ন রুচির প্রশ্রয়ে আত্মপ্রকাশ করেছে, তাতে পতিনিষ্ঠার চেয়ে তাদের অবস্থানগত সংকটই বেশি প্রকট।

নবীন বয়সের আকর্ষণীয় দেহসৌষ্ঠব খুল্লনাকে অনেক বেশি সুবিধার জায়গা করে দিয়েছে। তার পাশে নিজেকে তুলাদণ্ডে স্থাপন করতে গিয়ে পারিবারিক জটিলতা বাড়িয়ে তুলেছে ঈর্ষাকাতর লহনা। ভগিনী সম্পর্কের সতীনের প্রতি তার প্রাথমিক স্নেহের কারণ ধনপতির অনুপস্থিতি। বখরা নিয়ে কাড়াকাড়ি নেই, তাই বিরাগও নেই। কিন্তু গোল বাধাল অভিসন্ধিপরায়ণ দুর্বলা দাসী। দুই সতীনে ভাঙন ধরাবার জন্য সে লহনাকে উত্তেজিত করল তার নিঃস্ব হয়ে আসা দেহভাণ্ডারের দিকে কুৎসিতভাবে আঙুল তুলে—

কলাপির কলা জিনি খুল্লনার কেশ
অর্দ্ধপাকা চুলে তুমি কি করিবে বেশ।
খুল্লনার মুখশশী করে ঢলঢল
মাছাত্যায় মলিন তোমার গণ্ডস্থল।
কদম্বকোরক জিনী খুল্লনার স্তন
গলিত তোমর কুচ হেলএ পবন।
খিন মাঝা খুল্লনার জেন মধুকরি
যৌবন বিহনে তুমি হবে ঘটোদরী।

ফলত গৃহে প্রত্যাবর্তনের পর ধনপতির পক্ষে লহনার প্রতি বিতৃষ্ণ এবং খুল্লনার প্রতি সতৃষ্ণ হওয়া সুনিশ্চিত। এভাবে চৈতন্য জাগিয়ে দেওয়ার পর লহনার কাছে আর সপত্নীপ্রেম আশা করা যায় না। আসন্ন বিপদের ছায়ায় শঙ্কিত লহনা স্বামীর কামনা পূরণে নিজের উপযোগিতা প্রমাণ করার পথ খুঁজেছে। হৃত যৌবন ফিরে পাওয়ার সম্ভাবনা যখন নেই, তখন বিকল্প উপায় প্রতিযোগী খুল্লনার রূপবিনাশ। তারই জন্য নিতান্ত গ্রাম্য পন্থায় সখীর সাহায্যে কপট পত্র লিখন এবং খুল্লনার প্রতি দৈহিক নিগ্রহের নির্মম পরিকল্পনা।

দেহসম্পর্কিত চেতনাই এখানে ঘটনার নিয়ামক।

খুল্লনার লাঞ্ছনাপর্বে দৃশ্যের অন্তরালে থাকা ধনপতির একটু খোঁজখবর নেওয়া যাক। রাজার আদেশে স্বর্ণপিঞ্জর গড়ে আনতে গৌড়দেশে গেছেন তিনি এবং বহাল তবিয়তে আছেন। লহনার কথা দূরে থাক, নবপরিণীতা খুল্লনা সম্পর্কেও তাঁর মনোহুতাশের আভাসমাত্র দেননি কবি। বরং বণিকের স্বপ্নে আবির্ভূত দেবী চণ্ডীর ভর্ৎসনাবাণীতে শুনি:

পরস্ত্রী লুব্ধ হইআ পাসুরিলে নিজ জায়া
সুখে আছে গউড় নগরে।

পরস্ত্রী অর্থে 'বেউশা'—বারবিলাসিনী। দাম্পত্য বিশুদ্ধতা রক্ষায় সদাসতর্ক যে-সমাজ নারীর জন্য পদে পদে লক্ষ্মণরেখা টেনেছে, সেই সমাজেরই পুরুষতান্ত্রিক পক্ষপুটে নিশ্চিন্তে ব্যসনবিলাসে লিপ্ত হয়েছেন ধনপতি। চরিত্রহানিতে পৌরুষের যে অবনমন ঘটে না তার জ্বলন্ত উদাহরণ তো 'মনসামঙ্গালে'র নায়ক চাঁদ সদাগর। অনমনীয় দৃঢ়তার জন্য যে সংগ্রামশীল মানুষটি আজও আমাদের চেতনায় অবিরাম পুনর্নির্মিত হয়ে চলেছেন তিনিও তাঁর চরম প্রতিপক্ষ দেবী মনসার মোহময় নটীরূপ দেখে ভুলেছিলেন : 'একদিষ্টে চান্দ নটীর দিকে চায়।/কামবাণেত ঠাকুর প্রাণ পুড়িয়া জায়।' শরাহত অবস্থায় তাঁর মহাজ্ঞান হরণ করতে দেবীকে বেগ পেতে হয়নি। স্বয়ং চন্দ্রধরের যখন এমন দশা, তখন ধনপতির মতো দুর্বলচিত্ত বণিকের সংগ্রামহীন সচ্ছল সাবকাশ জীবনে নিষিদ্ধ কামনার রন্ধ্রপথগুলি খুলে যাবে এ তো স্বাভাবিক। আসলে ধনপতিকে নায়কোচিত গাম্ভীর্য-গরিমা দানের কোনো অভিপ্রায়ই মুকুন্দের ছিল না। পক্ষান্তরে সামাজিক কৌলীন্যের আপাত গৌরবকে ধূলিসাৎ করাই যেন 'বণিকখণ্ডে'র অন্তর্গত উদ্দেশ্য। বস্তুত, কদাচিৎ পদস্খলন নয়, পরিবারপ্রধানের কামসর্বস্ব যাপনপদ্ধতির পৌনঃপুনিক উল্লেখে কবি উচ্চবর্গীয় জীবনের শিথিলতাকে বে-আব্রু করে দেন। এখানে নিশ্চয়ই ব্যাধখণ্ডের বিপরীত চিত্রটি আরও একবার আমাদের মনে পড়বে।

স্বর্গের দেবীর মহিমাগাথা মধ্যযুগীয় মঙ্গালকাব্যের একটি প্রথাসিদ্ধ ব্যাপার। কিন্তু মহিমার স্থাপনভূমি মর্ত্য। আর স্থাপক যে মানুষ, সে আজন্ম জৈব প্রবৃত্তির সঙ্গো লগ্ন। পরিবেশ-পরিস্থিতি সেই প্রবৃত্তির প্রকাশের রকমফের ঘটায়। জীবনসত্যকে স্বীকার করার সহজ অঙ্গীকারে মুকুন্দ শরীরী যৌনতার প্রবেশ অবারিত রেখেছিলেন, অঙ্গা-প্রত্যঙ্গোর বর্ণনায় দ্বিধা এড়িয়েছিলেন, তা সে সংস্কৃত কাব্যসাহিত্যের পরম্পরা মেনেই হোক, অথবা কামশাস্ত্র পঠনের অভিজ্ঞতা থেকেই হোক। বণিক-উপাখ্যানে তাই-বঞ্চিত কামনার আর্তনাদ যেমন প্রবল, তেমনি সম্ভোগসমর্থ কামনার কলাচাতুর্যও দৃষ্টিগোচর হয়। দাম্পত্যবদ্ধ আনুষ্ঠানিক যৌন সংসর্গের গতানুগতিকতাকে অতিক্রম করার জন্য কবির চমকপ্রদ কিছু পরিকল্পনা লক্ষ করবার মতো। দেবীর স্বপ্নাদেশে গৌড়দেশ থেকে গৃহে ফিরেছেন ধনপতি। সদ্যযৌবনা খুল্লনাকে দেখে বিভোর হওয়ার আগেই স্বামী-বশীকরণের জন্য ভৃঙ্গারবারি নিয়ে প্রস্তুত হল লহনা। কিন্তু দুর্বলা দাসীর কূটচালে সেই বারি নিয়ে স্বামীসকাশে চলল খুল্লনা। ইতিমধ্যে সতীনের দ্বারা নিগৃহীত হওয়ার ফলে নিজেকে সে আরও কঠিন

প্রতিযোগীর ভূমিকায় দাঁড় করিয়েছে। দীর্ঘ বিরহের পর ব্যাকুল আবেগে যোগিনীপারা সে ছুটে যায়নি স্বামীর কাছে। বরং অতি সযত্ন তার প্রসাধন। সাড়ম্বর তার বেশবিন্যাস। কবির বর্ণনানুসারে—

কবরী বান্ধিল রামা কুসুমের গাভা
আষাঢ়িআ নবক্ষণ জেন করে শোভা।
শ্রবণ উপরে করে কনক-বউলি
সজল জলদে জেন পড়িছে বিজুলি।
বাহুযুগে আরোপিল কনক-কেয়ূর
কাঞ্চনে গঠিত পরে বাজন-নূপুর।
মণিবিরাজিত পরে মুখর কিঙ্কিণী
পদে পদে শুনি মত্ত মরালের ধ্বনি।

এতো স্বকীয়ার নয়, যেন পরকীয়া অভিসারিকার মূর্তি। কবির সচেতন প্রয়াসে গড়া। পরবর্তী দুটি ছত্রে তার প্রমাণ মিলবে। পাটশালে ধনপতি সেই মুহূর্তে অন্তত গৃহিণী লহনার জন্যই প্রতীক্ষারত, গৃহের যাবতীয় সংবাদ শোনার আগ্রহে। কিন্তু তাঁকে বিস্মিত করে 'খুল্লনা আইল তথা কুঞ্জরগামিনী/পূর্বে জেমন ছিল ইন্দ্রের নাচনি।' খুব ইঙ্গিতপূর্বভাবেই কবি এখানে খুল্লনার অমর্ত্য পরিচিতি-সূত্রের পুনরুল্লেখ করলেন, তার মোহিনী ভঙ্গীকে বিশ্বাসযোগ্য করার জন্য। তাতে নাটক আরও জমে উঠল। কারণ খুল্লনাকে ধনপতি নিজের স্ত্রী বলে চিনতে পারলেন না। একে বিবাহের পর দীর্ঘ অদর্শন, তার ওপর সময়ের ব্যবধানে খুল্লনা প্রান্ত-কৈশোর থেকে যৌবনে উপনীত। প্রত্যাশিত গৃহবধূজনোচিত নয় তার বেশবাস। অবশ্য তাতে দাম্পত্যে নিষ্ঠাহীন ধনপতির আকর্ষণ বেড়েছে বই কমেনি। অপরিচিতার উদ্দেশে অসংকোচ তাঁর রতি-স্তুতি : 'এ রূপমাধুরি তোর/আমার লোচনচোর/হরিআ মন নিলি বাঁধা।' লহনার ভয়ে ধনপতির আহ্বানে সাড়া না দিয়ে দ্রুত ভিতরমহলে অন্তর্ধান করেছে খুল্লনা। কিন্তু ঘোমটার আড়ালে নিজেকে রহস্যাবৃত্ত রেখে কামনার পারঙ্গমতাই সে প্রদর্শন করেছে। খুল্লনার পর নাটমঞ্চে লহনার আবির্ভাব। সেও সসজ্জ না হয়ে স্বামী সন্দর্শনে যায়নি। কিন্তু জরার স্পর্শলাগা দেহকে প্রসাধিত করার অক্ষম চেষ্টায় বড়ো দীন দেখায় তাকে—

আঁচড়িল কেশভার নানা পরিবন্ধে
তৈলজুত হইআ পড়ে লহনার কন্ধে।
কবরী বান্ধিল রামা নামে শুয়াঠুটী
দর্পণে নেহালি দেখে জেন গুয়াগুটি।

নিজেকে স্বামীর ব্যবহার্য করে তোলার জন্য লহনার আকাঙ্ক্ষা আরও আহত হয় যখন তার সঙ্গে কুশল বিনিময়মাত্র না করে ধনপতি চকিতদৃষ্ট মোহিনীর পরিচয় জানতে ব্যাকুল হয়ে ওঠেন। যে সে নারী তো নয়, 'দেখিতে হরিষ/পরশিতে বিষ/অমৃতে বিষে জড়িত।' কবি মুকুন্দ রসিক কম নন। তিনি জানেন, বিষামৃতের মিশ্রণেই পরকীয়ার স্বাদ। সে স্বাদের

নেশায় প্রমত্ত ধনপতির ভুল ভাঙিয়ে দিল লহনা, সতীনের নামে স্বামীর কানে অনর্গল বিষ ঢেলে। তাতেও কি শেষরক্ষা হল? কামাতুরের শরম নেই। দাসীর প্রতি গোপন ইঙ্গিতে প্রস্তুত হল শয়নগৃহের শয্যা। শয়নঘর তো নয়, যেন বিবাহের পর অভুক্ত বধূকে নিয়ে নতুন করে বাসরযাপনের বাসনা।

কিন্তু দ্বারে আছে উপেক্ষিত উপবাসী লহনা। সাধ্যমতো প্রতিরোধের চেষ্টা সে তো করবেই। যেন অভিভাবকীয় দায়বদ্ধতায় খুল্লনাকে সে নিবৃত্ত করতে চাইল অল্প বয়সে তার সম্ভোগে অনভিজ্ঞতার দোহাই দিয়ে—

তুহু বালা খিনবলা নাহি জান রতিকলা
না জাইহ প্রভুর নিকটে
রাহুর ভোগের বেলা জেন নব শশিকলা
পড়িবে বিষম সঙ্কটে।

লহনা বোধহয় অনুমানও করতে পারেনি, তার ভগিনী ওরফে সতীনটি ইতিমধ্যে দেহমনে কতটা পরিণত হয়ে উঠেছে। টের পেল, যখন রাহুগ্রাসে না পড়ার সতর্ক নিষেধাজ্ঞাকে তির্যক হাসিতে প্রত্যাখ্যান করল নবীন শশিকলা—

শুনগো লহনা দিদি প্রাণের বহিনি
রমণী রমণে মরে কোথাহ না শুনি।
আগে দেখ স্বর্গে মঘ মহাবলবান
কেমনে কামিনী শচী দিল রতিদান।
তবে দেখ রঘুনাথ মহাশক্তি ধরে
কেমনে কামিনী সীতা তাঁর ঘর করে।
সদাই মাদক দ্রব্য হরের ভক্ষণ
ভবানী কেমনে সহে তাঁর আলিঙ্গান!

পুরাণ-তালিকার দৃষ্টান্ত দীর্ঘতর করে লাভ নেই। আদত কথা, লহনাকে খুল্লনা স্পষ্টত বুঝিয়ে দিয়েছে, কামবলী পুরুষের আসঙ্গ-আবেগ বহন করার সামর্থ্য তার আছে। না, খুল্লনার বাচনে কবির রাখঢাকের বালাই নেই। কামবৃত্তি প্রবল হলে লজ্জা আর নারীর ভূষণ নয় এমনটাই কবি জানেন।

ধনপতি-উপাখ্যানে দুই সতীনের পারস্পরিক কলহ এবং বিদ্বেষ সাদামাটা ঘরোয়া সংকট ছাড়িয়ে সর্বত্রই কামকেন্দ্রিক প্রতিদ্বন্দ্বে ঘুরপাক খেয়েছে। যাবতীয় ব্যবহারিক এবং বাচনিক কুটিলতার আশ্রয় নিয়েও দেহগত ভাণ্ডারের ঘাটতিতে বারবার হার মানতে হয়েছে লহনাকে। যৌবনবসন্তে ফুল্ল খুল্লনা পূর্বপ্রাপ্ত নিগ্রহের প্রতিশোধ নিতে নিজের দেহকেই বরাবর আয়ুধ হিসেবে ব্যবহার করেছে। জ্যেষ্ঠা লহনার সামনে ধনপতির প্রসঙ্গে সে নির্বিকারে স্বীকার করেছে, 'ভোজনের কালে আমি কর‍্যাছি ইঙ্গিত/ভাঙ্গিতে তাঁহার সত্য না হয় উচিত।' এ যেন সেকালের ইন্দিরা। পরিণীতা বধূ হয়েও পরনারীর মতো স্বামীর কাছে লীলাময়ী।

মুকুন্দের এই খুল্লনা মুগ্ধা নয়, প্রগল্‌ভা নায়িকা। বৈবাহিক বিধিবন্ধতার মধ্যেও যৌন রসবতী হিসেবে তার সম্মোহন অপ্রতিরোধ্য। ধনপতির কাছে সহজলভ্য হতে চায়নি সে। শয়নগৃহে প্রবেশকালে তাই অভিমানের আবরণ টেনেছে। দেবী চণ্ডীর অভীষ্ট সিদ্ধির কারিকুরিতে সদাগর তখন হতচেতন— মৃতপ্রায়। স্বামীকে এ অবস্থায় দেখে কিন্তু মানিনীর ছলাকলা ভুলেছে খুল্লনা : 'মৃত পতি কোলে করি/কান্দে খুল্লনা নারী/চক্ষে বহে কালিন্দীর নীর।' প্রকৃতপক্ষে কামের সঙ্গে প্রেমের তো অস্তিত্বগত কোনো বিরোধ নেই। কিন্তু যৌন আধিপত্যের কবলে পড়লে প্রেম 'বারোটার বেশি রাতি' জাগতে পারে না। দেবীর বরে চৈতন্য ফিরে পাওয়ার পর ধনপতি পুনরপি মনসিজবাণে বিক্ষত। খুল্লনার তরফেও শুরু হয়েছে রতিকলার পুনর্বিস্তার। শয্যাগৃহের নানান অন্তরালে নিজেকে অধরা রেখে খুল্লনা ধনপতিকে আরো অধীর করে তুলেছে। ধনপতির কাতরোক্তিতে যাবতীয় যৌন লক্ষণেরই প্রকাশ : 'জ্বর নহে অঙ্গে সদাই তাপ/জিম্ভিত মুখ কলেবর কাঁপ।/অঙ্গে জদি লেপি চন্দনপঙ্ক/দহে তনু জেন সাপের ডঙ্ক।' তনুজ্বালা জুড়াবার জন্য খুল্লনার তাগিদও কম নয়। তবে প্রবাস-ফেরত স্বামীর কাছে এতদিনের জমানো ক্ষোভ আর যন্ত্রণা প্রকাশের মোক্ষম সুযোগটি সে ছাড়বে কেন? ছাগল চরানোর মর্মান্তিক অভিজ্ঞতার দিনগুলিকে সে গেঁথেছে তার দুঃখের বারমাস্যায়। গৃহসুখবিচ্যুত খুল্লনার ক্ষুধার রাজ্যে মলয়বসন্ত সমাগমে তার কণ্ঠে যে বিলাপ ফুটেছে, তা পর্ণকুটীরবাসী নিরন্ন ফুল্লরার আর্তস্বরের সঙ্গে অভিন্ন : 'আমার পীড়িত অঙ্গ উদরদহন।'

খুল্লনা-ধনপতির বিশ্রম্ভালাপে আড়ি পেতেছে লহনা। প্রতিক্রিয়া-স্বরূপ নবমধুলোভী রসিক নাগরের প্রতি তীক্ষ্ণ তার আক্রমণের ভাষা : 'পড়া শুন্যা হইলে ভোলা/কামমদে মাতোয়ালা/নৌতন যৌবনে হইলে ভোলে।/না বুঝিয়া রসগন্ধে/লুবধ ভ্রমর অন্ধে/বৈসে জেন শিমুলের ফুলে।' ধনপতির মধুকরী বৃত্তিই যে সমাজকথিত দাম্পত্য সততার প্রতিকূল, লহনা-খুল্লনার-বিষময় সম্পর্কও যে তাঁরই অযত্ন-অমিতাচার-পক্ষপাতের নির্মাণ, সে বিষয়ে কবি কোথাও সন্দেহের অবকাশ রাখেননি। আগ্রহে অথবা অনীহায় তাঁর কামপরতন্ত্রতাই একমাত্র নিয়ামক শক্তি, যার বশবর্তী তাঁর বনিতারাও। তবে আমরা আগেই বলেছি, বণিক পত্নীদের কামনা স্বকীয়ার নির্ধারিত সীমা অতিক্রম করেনি। খুল্লনার চারিত্রিক কলঙ্ক সম্পর্কে ধনপতির কাছে লহনা যে অভিযোগ জানিয়েছে তার সবটাই বানানো। লহনা বলতে চেয়েছে, ধনপতির অনুপস্থিতির সুযোগে লাস্যময়ী হয়ে উঠেছিল খুল্লনা : 'কামসিন্দুরের নিত্য পরে মোহন ফোঁটা/অধরে তাম্বূলরাগ চুয়াচন্দন-ছটা।/হাথে দর্পণ নিরন্তর নেহালে বদন/গনগর্বিত দেখ্যা বুকে না দেই বসন।' এমন নারীর পক্ষে কুলমর্যাদা হানির আশঙ্কা ছিল বলেই যেন লহনা তার বেশ ও আভরণ হরণ করেছিল। কথাগুলোকে অবশ্য বিন্দুমাত্র আমল দেননি ধনপতি। অচিরেই তিনি খুল্লনার শরীরসঙ্গ লাভে প্রমত্ত : 'আলিঙ্গান প্রেমরসে/দুঁহে দুঁহা ভুজপাশে/দুই তনু নিবিড়বন্ধন।'

সঙ্গাম দৃশ্যটিকে রীতিমতো দীর্ঘায়ত করেছেন মুকুন্দ। অবশেষে দিয়েছেন খুল্লনার গর্ভসঞ্চারের সংবাদ। বিন্দুমাত্র দ্বিধাজড়িত নয় তাঁর কলম। অক্লেশে আমরা পূর্বকথিত

সিদ্ধান্তে অটল থাকতে পারি, মুকুন্দের বাস্তবজীবন-সচেতনতাই যৌন প্রসঙ্গকে তাঁর কাব্যে অবাধে জায়গা করে দিয়েছে। তাতে দেবীমাহাত্ম্যকথার গায়ে আঁচ লাগবে এমন সংস্কার মধ্যযুগীয় বহু কবির মতো মুকুন্দেরও ছিল না। কাব্য-প্রয়োজন সিদ্ধির জন্য ঐতিহ্যানুসারী কামোপকরণ সংগ্রহ এবং কামপদ্ধতি প্রয়োগে সংকোচবোধের কোনো প্রশ্নই যেন ওঠেনি। বিবাহ জৈবপ্রবৃত্তির সামাজিকীকরণের এমন একটি প্রক্রিয়া যাতে পুরুষনির্ভর পরিবার-বেষ্টনীতে পুরুষের কাম চরিতার্থ করতে গিয়ে নারীর নিজের কামনা মিটলে আপত্তির কোনো কারণ থাকে না। কিন্তু বিবাহ-বহির্ভূত যৌনসঙ্গ নারীর পক্ষে সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। তার জন্য সে ঘরের নিরাপদ আশ্রয় হারাতেও পারে। নারীকে ঘিরে থাকে পুরুষের নিরন্তর সন্দেহ আর সতর্কতা। বণিক ধনপতির নিজের পরনারীসংসর্গ নিয়ে সমাজে প্রশ্ন ওঠেনি। অথচ তাঁর পিতৃশ্রাদ্ধ উপলক্ষ্যে তাঁর গৃহে আমন্ত্রিত নগরের সম্ভ্রান্ত বণিকজনসভায় সামাজিক মান্যতা নিয়ে প্রতিযোগিতার দলাদলিতে আশ্চর্যভাবেই কলহের কেন্দ্রে চলে এল নারী। শুরু হল নারীর দৈহিক শুচিতা নিয়ে চিরন্তন বিতর্ক। ধনপতিকে জব্দ করার সহজতম পন্থা হিসেবে বিরুদ্ধ পক্ষের অতিথিবৃন্দ প্রশ্ন তুললেন খুল্লনার চরিত্র নিয়ে। পরচর্চার রসদ তাঁদের কাছে মজুত। ধনপতির প্রবাসকালে খুল্লনা বনে বনে ছাগল চরিয়েছে। সেখানে ‘শতেক মাতাল’-এর আনাগোনা। তাদের বাসনার শিকার হওয়া খুল্লনার পক্ষে অসম্ভব নয়। সুতরাং তার বিশুদ্ধতা প্রমাণিত না হলে অতিথিরা ধনপতির অন্ন গ্রহণ করবেন না। রাবণভবনে বসতির কারণে সীতার মতো সতী নারীও কলঙ্কভাজন হয়েছিলেন এবং রামচন্দ্র তাঁর অগ্নিপরীক্ষার আয়োজন করেছিলেন। অতএব ‘রাম রাজা হইতে কিবা সাধু ধনপতি/বনে ছাগল লৈয়া জার ভ্রমিল যুবতী।’

নগরের বণিকদের কথা থাক ধনপতির নিজেরই তো বিশ্বাসের মাটি আলগা। পুরাণ-ইতিহাসের অজস্র অসতী নারীচরিত্র গাঁথা রয়েছে তাঁর পিতৃতান্ত্রিক সংস্কারে। খুল্লনার পরীক্ষাদানের প্রস্তাবে তাই তাঁর শঙ্কা : ‘ঠেকিলে পরীক্ষে/না দেখিব চক্ষে/ভুবন ভরিএ লাজে।’ তাহলে কি এতদিন সন্দেহ বুকে নিয়েই খুল্লনাকে শয্যাসঙ্গিনী করেছিলেন ধনপতি? কামমদে মত্ত হয়ে তার সঙ্গে যাপন করেছিলেন রাতের পর রাত? গোপন পাপে বোধহয় ভয় নেই। ঘরের পাপ প্রকাশ্যে এলে লোকলজ্জার ভয়, সামাজিক প্রতিপত্তি হারানোর ভয়। ধনপতি তাই উদ্বিগ্ন। অন্যদিকে খুল্লনা নিষ্কলুষ বলেই আত্মবিশ্বাসী। স্বামী অর্থ দিয়ে সাময়িকভাবে লোকের মুখ বন্ধ করলে তার কলঙ্ক স্থায়ী হয়েই থাকবে। তাই সে স্বেচ্ছায় পরীক্ষাদানে প্রস্তুত হয়ে কঠিন থেকে কঠিনতর বাধা সসম্মানে উত্তীর্ণ হয়েছে। প্রশ্ন উঠতে পারে, খুল্লনা যখন শুদ্ধচরিত্র, তখন অগ্নিপরীক্ষার জন্য জতুগৃহে প্রবেশকালে তার দেবীর আনুকূল্যের প্রয়োজন হল কেন? প্রয়োজনটা খুল্লনার নয়, স্বয়ং কবির। মঙ্গলকাব্যের ছকের মধ্যে প্রবেশ করলে মাঝে মাঝে তাঁকে দেবতার মহিমাব্যঞ্জক ক্ষমতার নিদর্শন দেখাতেই হবে।

খুল্লনার অগ্নিপরীক্ষায় বণিকখণ্ডের প্রথম পর্বের কাহিনি ক্লাইম্যাক্সে পৌঁছেছে। বস্তুতপক্ষে কামকলার চমক বিস্তারেরও এখানেই ইতি। খুল্লনাকে নিয়ে ধনপতি সামাজিক

অর্থে সম্ভ্রান্ত অথচ লীলাপ্রমত্ত সম্ভোগের সুযোগ আর পাননি। রাজার আদেশে এবার তাঁকে যেতে হয়েছে সুদূর বাণিজ্যে। রতিরসকথায় অকুণ্ঠ হলেও তার আরোপিত কোনো বিস্তার কবির অভীপ্সিত ছিল না। যৌন আবেগকে চেষ্টাকৃত ভাবে অবদমিত রাখার অথবা অন্তরালবর্তী করার মধ্যে যেমন জীবনের স্বভাবদাবি অস্বীকৃত হয় তেমনি নিছক উত্তেজনা যোগানোর রসদ হিসেবে তার গ্রহণীয়তা নিয়েও সংশয় জাগতে বাধ্য। মুকুন্দে এই বোধের ঘাটতি ছিল না। সময় মতো তিনি কলমের রাশ টেনেছিলেন। তবে সম্ভোগের পরিণামী প্রতিক্রিয়ার জের তাঁকে টানতে হয়েছিল অনেক দূর পর্যন্ত।

নারীর জীবন সবটাই যেন চোরাবালির পথ। পুরুষকে প্রীতকাম করার জন্য নিজের অস্তিত্বকে সংকুচিত করে, সন্তান ধারণের যন্ত্রণা এবং সন্তান লালনের দায় বহন করেও তার স্বস্তি নেই। সমাজের কুটিল জিজ্ঞাসা যে-কোনো মুহূর্তে তাকে সংকটে ফেলতে পারে। ধনপতির সিংহল যাত্রাকালে গর্ভবতী খুল্লনা সাংসারিক দূরদর্শিতার গুণে ভাবী সন্তানের পিতৃত্বের সুনিশ্চিত সাক্ষ্য হিসেবে স্বামীকে দিয়ে লিখিয়ে নিয়েছিল প্রামাণিক জায়পত্র। তবু সন্তানজন্মের পর যে-খুল্লনা পরম স্নেহময়ী জননী, স্বামীর শয্যাবিলাসিনী কামিনী বলে যাকে আর চেনাই যায় না, তাকেও দাঁড়াতে হল আত্মজের কঠিন প্রশ্নের সম্মুখে। পাঠশালার গুরুমশাইয়ের কুৎসিত অপবাদে উত্তেজিত পুত্র শ্রীমন্তের মুখে শোনা গেল মায়ের উদ্দেশে কঠিন ভর্ৎসনা : 'তুমি গো বড়ার ঝি/তোমারে বুঝাব কী/কেমনে উদরে দেহ ভাত।/হইআ সাধুর কান্তা/দূর কৈলে তার চিন্তা/লোকলাজে পর্য্যছ আইয়াত।'

সিদ্ধ যৌন সম্ভোগেও নারীর নিস্তার নেই। পুষ্পমধু পুরুষের জন্য, কাঁটাটুকু তার। কোনো উপলক্ষ্য পেলেই নারীকে স্বৈরিণী হিসেবে চিহ্নিত করার প্রবণতা পুরুষতান্ত্রিক সমাজ চৈতন্যের এতটা মূলদেশ পর্যন্ত পৌঁচেছে যে, নির্মল কৈশোরও তার সংক্রমণমুক্ত হতে পারেনি। সিংহল-কারাগারে বন্দি পিতার সাক্ষাৎ পাওয়ার পরে তাঁর উদ্দেশে শ্রীমন্ত যে-প্রশ্ন রেখেছে, তাও তো মাতৃমর্যাদার চরম লাঞ্ছনা—

ছাড়িলে মন্দির বন্দি কেমন সাহসে
কেমনে যুবতি জায়া শূন্য ঘরে বৈশে।

জায়া, জননী—যে-কোনো পুরুষবন্দিত তথাকথিত মহিমান্বিত রূপে নারী শেষ পর্যন্ত নারীই। অনঙ্গের প্রতাপে তার অঙ্গ ঘিরে যতটা রহস্য ততটাই শঙ্কা।

অথচ গার্হস্থ্য বন্ধনে থেকেও কি আশ্চর্য নির্বন্ধন পুরুষ! বৈরাগ্যে নয়, বাসনায়! বারাঙ্গনা বিলাস, স্বকীয়বিলাসের পর বাণিজ্যপথে কমলে-কামিনী দর্শনেও ধনপতির চিত্তবিকারের বিরাম নেই! আর সেই বিকারের উৎস প্রস্তুত করতে গিয়ে কবি মুকুন্দের কলম নারীদেহের আলংকারিক বর্ণনায় উৎসাহ হারায়নি। দেবী চণ্ডীর যে-মায়ারূপ সকলের কাছে অদৃশ্য, তা দৃশ্যমান হল কামুক ধনপতির চোখে—'রাজহংস-মন্দগতি/হেম জিনি দেহজুতি/গজকুম্ভ চারু পয়োধরে/তাহে শোভে অনুপাম/মণিমুকুতার দাম/জেন গঙ্গা সুমেরুশিখরে।' প্রথাসিদ্ধ বর্ণনার ঝোঁকে কবি এতটাই আচ্ছন্ন যে, কমলাসনা কামিনীকেও তিনি রাজহংসের মতো মন্দগামিনী বলেছেন। ভুবনমোহন তনুরুচির উদ্ভাসনে তিনি যেন

নারীদেহের ললিত অনুষঙ্গের কোনোটাই ছাড়তে নারাজ। সামুদ্রিক পরিবেশে কামিনীর গজ-উদ্‌গীরণের ঘটনা অবশ্য ধনপতিকে ধন্দে ফেলেনি এমন নয়, তবে তাঁর লোচনেন্দ্রিয়ের আস্বাদন তাতে থেমে থাকেনি। বণিকের এই রূপাসক্তির সংবাদ রাখেন সর্বজ্ঞা দেবী চণ্ডী। কিন্তু বাণিজ্যতরীর মাঝিমাল্লা অথবা সিংহলরাজ বা তাঁর পারিষদদের মনে ধনপতির দৃষ্টিবিভ্রম নিয়ে প্রশ্ন জাগলেও দৃষ্টি-লুব্ধতা নিয়ে কৌতূহল জাগেনি। জাগলেও তাতে বিশেষ হেলদোল ঘটত না।

ধনপতির মতো কামচাপল্য তাঁর পুত্রের রক্তে নেই, হয়তো অপ্রাপ্ত যৌবনেই জীবনের দুর্বিপাক তাকে তাড়া করেছিল বলে। পিতৃধনে বিলাসী হওয়ার সুযোগ সে পায়নি। তরঙ্গের অভিঘাত যখন থেমেছে, সিংহলরাজকন্যা সুশীলাকে বিবাহ করে সুস্থিত জীবনের স্বাদ পেতে শুরু করেছে শ্রীমন্ত, তখনই তাকে শুনতে হল স্বপ্নে আবির্ভূত দেবী চণ্ডীর ধিক্কারবাণী : 'রাজভোগে পতি ভোলে/কামিনী তোমার কোলে/পাসরিলে অভাগি খুল্লনি।' নবকামরসাসক্তি শ্রীমন্তকে বিবেকরহিত করেনি। অচিরে সে দেশে ফেরার উদ্যোগ নিয়েছে। 'কামিনী' বিশেষণটি কিন্তু সুশীলা সম্পর্কে অনেকটাই প্রযোজ্য। সম্পদের সঙ্গে, স্বাচ্ছন্দ্যের সঙ্গে সম্ভোগবাসনার কার্যকারণ সংযোগ মুকুন্দ বারবারই দেখিয়েছেন। শ্রীমন্তের স্বদেশযাত্রায় বাদ সেধে সুশীলা যে কাতরোক্তি প্রকাশ করেছে তাতে প্রাণের চেয়ে দেহের দাবিই বেশি। নবদাম্পত্যে স্বামীর বিচ্ছেদ-আশঙ্কায় উচ্চারিত সুশীলার বারমাস্যা এই কারণেই সুখের বারমাস্যা যে, তাতে শ্রীমন্তকে বিনোদগৃহের নিশ্চিন্ত নিশ্ছিদ্র ভোগের আশ্বাসে প্রলুব্ধ করা হয়েছে। বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠের দাবদাহ, আষাঢ়-শ্রাবণের দুরন্ত বর্ষণ, ভাদ্রের বন্যা—বাইরের প্রকৃতির যাবতীয় দুর্যোগ দয়িত-দয়িতাকে নিবিড়তর মিলনের সুযোগ দেবে। আশ্বিনের উৎসবে, কার্তিকের পুণ্য তিথিতে সুশীলার পিতার বিপুল বৈভবের অংশীদার হবে শ্রীমন্ত। অঘ্রাণে সে পাবে কর্ষিত শস্যের ভাগ। পৌষ-মাঘে উপাদেয় ভোজ্যসহ নবীনা পত্নীর শরীরী উষ্ণতা তাকে দেবে শীতের আরাম। ফাল্গুনে দোলমঞ্চ নির্মাণ করে উপবনে সহচরীদলসহ চলবে বাসন্তী লীলাবিলাস। আর চৈত্রে ফুল্লরার মতো উদরদহন যেহেতু নেই, মদনদহনে তাদের উত্তেজিত এবং উল্লসিত হওয়ারই কথা। সুশীলা স্বপ্ন দেখিয়েছে শ্রীমন্তকে : 'মালতি মল্লিকা চাঁপা বিছায়্যা শয়নে/মধুমাসে গোঙাইব মুদিত রাত্রিদিনে।' ধনপতি হলে হয়তো এমন প্রলোভন পরিত্যাগ করতে পারতেন না। শ্রীমন্ত পেরেছে। সুশীলাকে সঙ্গে নিয়ে সে ফিরে গেছে স্বগৃহে। উজানীরাজের আদেশে কিছুটা বাধ্য হয়েই তাঁর কন্যাকে গ্রহণ করেছে দ্বিতীয়া পত্নী হিসেবে, প্রথমা পত্নীর অভিমান অগ্রাহ্য করে। তারপরেই অকস্মাৎ নটে গাছ মুড়োনোর পালা। মর্ত্যজীবন সম্ভোগ অপূর্ণ রেখে দুই পত্নীসহ শ্রীমন্তকে ফিরে যেতে হয়েছে স্বর্গে। কবির কলম এখন ক্লান্ত। নববধূযুগলের মধ্যে আসঙ্গের ভাগ-বাটোয়ারায় শ্রীমন্তের পারঙ্গমতার পরিমাপ করতে কবি আর উৎসাহী নন।

বণিকখণ্ডে ধনপতির ভোগবাসনার বর্ণনা বর্ণময় সন্দেহ নেই। কিন্তু পুরুষের ইন্দ্রিয়পরায়ণতার অতিরেকের প্রতি কবির যে সমর্থন ছিল না, কাব্যকাহিনির উপান্তে তার প্রমাণ দুর্লক্ষ্য নয়। বহুকাল প্রবাসের পর গৃহে ফিরেছেন ধনপতি। প্রতীক্ষারত পত্নীদের

কাছে সাদর আবাহনই প্রত্যাশিত। সেই মুহূর্তে লহনাকে রঙ্গমঞ্চে না এনে কবি আনলেন খুল্লনাকে। কী দেখল খুল্লনা? দেখল এক হৃতরূপ বিকলাঙ্গদেহ পুরুষকে। শুধুমাত্র দেবীর প্রতি একদাকৃত অবমাননাই কি ধনপতির দেহবিকৃতির কারণ? তাঁর পূর্বশ্রী ফিরে পাওয়ার পিছনে খুল্লনার ব্যাকুল প্রার্থনা এবং বরদাত্রী দেবীর কৃপামাহাত্ম্যের একটি মঙ্গলকাব্যিক পরিসর কবি যথাযথভাবে তৈরি করে নিয়েছেন। কিন্তু তার আগে কী নির্দয় ভাষায় প্রকাশিত হল খুল্লনার বীতরাগ—

রুগী জার পতি তার রূপে কাজ কিবা
তাহা হইতে ভালে জিএ বণিতা বিধবা।
পূর্বস্বামী ছিল মোর হেমকলেবর
ইবে কাছে সুইতে নারি অঙ্গে পালি জ্বর।

মঙ্গলকাব্যকার হিসেবে মুকুন্দ প্রতিষেধকের যে-ব্যবস্থাই দিন না কেন, আমরা একে বলব প্রকৃতির প্রতিশোধ। ধনপতির রূপবিকার তাঁর মাত্রাতিরিক্ত রূপাসক্তিরই পরিণাম। তবে তাঁর মতো মানুষের দেহবাসনা প্রৌঢ়ত্বেও নির্মূল হওয়ার কথা নয়। কবি বলেছেন, দেবীর অনুকূল দৃষ্টিধন্য অবয়বে 'ধনপতি হইল জেন অভিন্নমদন।' বাচ্যগত এই উৎপ্রেক্ষাটিকে আমরা গূঢ়ার্থেই গ্রহণ করব।

মনসিজের শরসন্ধানে খুল্লনাকে অবশ্য আর নাগালের মধ্যে পাননি ধনপতি। যৌবনে যে রসরঙ্গিণী দারা লাস্যে বিলাসে কামুক স্বামীকে দাম্পত্যের সীমাতেই পরদারিকতার উন্মাদনা যুগিয়েছিল, আজ কিন্তু দেবীর পক্ষ থেকে তার কাছে এসেছে পার্থিব মোহ ত্যাগের নির্দেশ : 'তুমি গো পরমশুচি/তেজ মহিভোগরুচি/অবিলম্বে চল সুরপুরী।' দেবনর্তকীর দেহে বোধহয় অশুচিতার ছায়া পড়ে না। মর্ত্যদেহেই কামনা সখাদ। সেই খাদটুকু অবলীলায় ঝেড়ে ফেলে খুল্লনা পুত্র ও পুত্রবধূসহ স্বর্গে গেছে। কালকেতু-ফুল্লরার মতো সপ্তপদী বন্ধনে প্রত্যাবর্তন নয়। মানবযোনিসম্ভূত ধনপতির সুরলোকে ঠাঁই মেলেনি। লহনারও না। বরং খুল্লনা মধ্যবর্তিনী থাকায় লহনার প্রতি ধনপতি যে-উপেক্ষা ও অমর্যাদা দেখিয়েছিলেন, এবার তার প্রায়শ্চিত্ত করতে হবে। বন্ধ্যা লহনা পুত্রবতী হবে। দেবীর দাক্ষিণ্যই যেহেতু সন্তানজন্মের কারক, সুতরাং বয়সের হিসেব বা সম্ভোগ-সামর্থ্যের বিচার করে অথবা প্রজনন ক্ষমতা নিয়ে প্রশ্ন তুলে লাভ নেই।

মধ্যযুগীয় মঙ্গলকাব্যের প্রথাগত আনুগত্যে মুকুন্দের মতো কবিকে মাঝে মাঝে বড়ো অসহায় দেখায়। দৈব অনুগ্রহ-বিগ্রহের স্বৈরতান্ত্রিক নিয়ন্ত্রণ মানতে গিয়ে অবাস্তবের সঙ্গে তাঁকে আপস করতে হয়েছে। তবে নিজের মূল দৃষ্টিকোণটিকে তিনি বিচলিত হতে দেননি। কামকথা এবং কামকলা প্রসঙ্গের গ্রহণে-বর্জনে শুচিবাই যেমন তাঁর ছিল না, তেমনি আদিরসের প্ররোচনামূলক অভিসন্ধিও তাঁর কাব্যকে পীড়িত করেনি। নির্মিত চরিত্রের আর্থ-সামাজিক অবস্থান তাঁর শরীরী যৌনচেতনার অন্তরঙ্গে সক্রিয় হয়ে বাঞ্ছিত বাস্তবতার স্বাভাবিক শর্ত পূরণ করেছে। সেই বাস্তবতার দিক থেকে মুখ ফেরালে 'জীবনরসের কবি'র

সংজ্ঞা অসম্পূর্ণ থেকে যাবে।

কমলে-কামিনী : দেবী-কল্পনা

গৌরীশংকর দে

মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের এক আশ্চর্য রত্নভাণ্ডার মঙ্গলকাব্য। মনসামঙ্গল এবং চণ্ডীমঙ্গল এই ধারার কাব্যের মধ্যে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের রচয়িতা রূপে কবিকঙ্কণ মুকুন্দ চক্রবর্তীর প্রসিদ্ধি সুবিদিত। মঙ্গলকাব্যগুলির রচনাকাল মধ্যযুগ। তখন সমুদ্রপথে বাঙালির বাণিজ্যযাত্রার দিন শেষ হয়ে গেছে। তবুও বিস্মৃত যুগের স্মৃতি নিয়ে মঙ্গলকাব্যে সমুদ্রযাত্রা বর্ণিত।[১] এই বর্ণনায় স্বাভাবিকভাবেই ঘটেছে স্পষ্ট ও অস্পষ্ট, বাস্তব ও কল্পনার মেশামেশি।

বস্তুত মঙ্গলকাব্যের এক আবশ্যিক অঙ্গ সমুদ্রপথের বর্ণনা। এই পথ ভারত সমুদ্রের উপকূল বাণিজ্যপথ। কালীদহের বর্ণনা এই সমুদ্রপথের বর্ণনার একটি অপরিহার্য বিষয়।[২] কালীদহের (ঘূর্ণাবর্ত) উত্তাল তরঙ্গে চাঁদ সদাগরের ভরাডুবি হয়েছিল। আবার এখানেই চণ্ডীমঙ্গালের কমলে-কামিনী বা সামুদ্রিক মরীচিকার (Sea-mirage) আবির্ভাব।

'চণ্ডীমঙ্গল' কাব্যের বণিক-খণ্ডের একটি অংশ ধনপতির বাণিজ্যযাত্রা। রাজভাণ্ডারের প্রয়োজনে তাঁকে সিংহলে যেতে হয়। সাত ডিঙ্গা নিয়ে বাণিজ্যযাত্রার আগে ধনপতি পত্নী খুল্লনাকে ঘটে চণ্ডীদেবীর পূজা করতে দেখে ক্রুদ্ধ হয়ে ঘটটি পা দিয়ে ঠেলে দেন। এই অপরাধে তাঁকে শিক্ষা দেবার জন্য দেবী সাগরসঙ্গমে সংকট সৃষ্টি করে ও বান ডেকে তাঁর ছয় ডিঙ্গা ডুবিয়ে দেন। অবশিষ্ট এক ডিঙ্গা নিয়ে ধনপতি সিংহলের দিকে যাত্রা করেন। সিংহল বন্দরের অদূরে সমুদ্রবক্ষে দেবী তাঁকে এক মায়াদৃশ্য দেখিয়ে বঞ্চনা করেন। মায়াদৃশ্যটি হল : সমুদ্রের মাঝখানে এক বিপুল পদ্মবন, তাতে এক বিশাল প্রস্ফুটিত পদ্ম। সেই পদ্মের ওপরে বসে এক অপূর্ব সুন্দরী ষোড়শী কন্যা একটি হাতিকে ধরে বারবার গিলছে ও উগরে দিচ্ছে।

কবিকঙ্কণ এইভাবে মায়াদৃশ্যের অবতারণা করেছেন—

দিবানিশি বলে সাধু তিলেক না রহে
উপনীত ধনপতি হইল কালিদহে।
পদ্মাবতীর সঙ্গে যুক্তি করিআ অভয়া
সদাগরে ছলিবারে পাতিলেন মায়া।
আপনি করিল মায়া হরের বণিতা
চৌষট্টি যোগিনী হইল কমলের পাতা।
আমলা কমলা হইল পদ্মা করিকর
হাসিতে লাগিলা শতদলের উপর।
পুষ্পের ধনুকে মাতা পরিআ সন্ধান
সাধুর হৃদয়ে মারিলা পঞ্চবাণ।
মোহ গেল ধনপতি নায়ের উপর

চেতন করাইল তারে নায়ের গাবর।
রাজপদ্মিনী দেখি কমলের বনে
কন্যারে বান্ধিআ নিলে রাখে কোন জনে।
কর্ণধার বলে অবোধ সদাগর
কোথা না দেখিলে কুঞ্জে কামিনী কুঞ্জর।

দৃশ্যটি ধনপতি ছাড়া আর কারো দৃষ্টিগোচর হয়নি। ধনপতি কর্ণধারকে বললেন—

অপরূপ দেখি আর শুন ভাই কর্ণধার
কামিনী কমলে অবতার
ধরি রামা বাম করে সংহারয়ে করিবরে
উগারিআ করএ সংহার।

ধনপতির বয়ানে কবি কমলে-কামিনীর রূপের বিস্তৃত বর্ণনা দিয়েছেন।[৩]

সিংহলে পৌঁছে ধনপতি যথোচিত অভ্যর্থনাই পেয়েছিলেন, তাঁর সওদা ভালোই হয়েছিল। কিন্তু দুর্বুদ্ধির বশে তিনি রাজাকে কমলে-কামিনী দৃশ্যের কথা বলে ফেলেন। রাজা বিশ্বাস করলেন না। ধনপতি এই দৃশ্য দেখাতে ব্যর্থ হলে রাজা ক্রুদ্ধ হয়ে তাঁকে আজীবন কারাদণ্ড দিলেন।

ধনপতির পুত্র শ্রীপতি (শ্রীমন্ত) মায়ের সম্মতি ও রাজার অনুমতি নিয়ে নিরুদ্দিষ্ট পিতার সন্ধানে সাত ডিঙ্গা ভাসিয়ে বাণিজ্য উপলক্ষ্যে সিংহলের দিকে রওনা হলেন। তাঁর পথের অভিজ্ঞতাও হল পিতারই মতো। তিনিও সমুদ্রে কমলে-কামিনী দেখলেন ও রাজাকে বলে বিপদে পড়লেন। রাজা তাঁকে মৃত্যুদণ্ড দিলেন। কিন্তু দেবী রাজসৈন্যকে পরাজিত করে তাঁকে রক্ষা করলেন। পিতা-পুত্রের মিলন হল। রাজা শ্রীপতির হাতে কন্যা সুশীলাকে সমর্পণ করলেন।

পিতা-পুত্র ও পুত্রবধূ বাণিজ্য ও যৌতুক সম্ভার নিয়ে দেশে ফিরে এলেন। আবার এক নতুন বিপদ দেখা দিল। শ্রীমন্ত রাজা বিক্রমকেশরীকে কমলে-কামিনীর কথা বলায় তিনি দেখতে চাইলেন। দেখাতে না পারায় রাজা তাঁকে প্রাণদণ্ডের আদেশ দিলেন। প্রাণদণ্ড বলবৎ হওয়ার পূর্বক্ষণে দেবী মশানে আবির্ভূত হয়ে কমলে-কামিনী রূপ দেখালেন। এই রূপ স্থলে সকলকেই দেখালেন। রাজা সন্তুষ্ট হয়ে শ্রীপতির সঙ্গে কন্যা জয়াবতীর বিবাহ দিলেন। ধনপতি কর্তৃক বর্ণিত কমলে-কামিনী দৃশ্যের সঙ্গে শ্রীপতি কর্তৃক বর্ণিত দৃশ্যের যেমন মিল তেমনি পার্থক্যও আছে।[৪] ব্যক্তি বিশেষে দৃষ্টিভঙ্গি (Perspective) যে পৃথক হতে পারে এই বিষয়ে কবি সচেতনতার পরিচয় দিয়েছেন।

ঋগ্‌বেদের একটি রূপকভাবনা দেবীমূর্তি ধারণ করে। তিনি দুর্গমের, অরণ্যের দেবতা। পৌরাণিক সাহিত্যে তিনি দুর্গতের দেবী দুর্গা (তিনিই পার্বতী, চণ্ডী)। পূর্বে তিনি সরস্বতী শ্রী-র সঙ্গে অভিন্ন ছিলেন। পৌরাণিক যুগের আগেই সরস্বতী-শ্রীর সঙ্গে বাস্তুনাগদেবতার পূজা মিশে যায়। সেই সময় থেকেই মনসা নিজে নাগ না হয়েও সর্পরাজ্ঞী। সরস্বতী ও শ্রী দুই পৃথক দেবতায় (মনসা ও লক্ষ্মী) পরিণত হবার আগেই নাগ-পূজার সঙ্গে দেবীর

যোগাযোগ ঘটে। পরে যখন ভাগাভাগি হল, তখন মনসার ভাগে পড়ল সর্প-নাগ আর লক্ষ্মীর ভাগে পড়ল হস্তি-নাগ। এই ভাগাভাগি মধ্যযুগের আগে পর্যন্ত পাকাপাকি হয়নি। হস্তি আরোহিণী মনসার প্রাচীন মূর্তি পাওয়া গেছে। মনসা ও লক্ষ্মীর মধ্যে বিশেষ সাদৃশ্য। দুই দেবীরই নামান্তর কমলা ও পদ্মা। পদ্মদলে মনসার উৎপত্তি, কমলার আসন পদ্মে। লক্ষ্মীর উৎপত্তি সাগরে, মনসার উৎপত্তি হ্রদে। চণ্ডী-মনসা (শ্রী) আদিতে একই দেবী ছিলেন। তার স্মৃতি রয়ে গেছে চণ্ডীর কমলে-কামিনী মূর্তিতে। এই মূর্তিতে পদ্ম আছে, হাতি আছে, বিলাসিনী নারী আছে আবার ক্রোধও আছে।[৫]

সরস্বতী ও মনসার মধ্যেও সাদৃশ্য যথেষ্ট। সরস্বতী অবিবাহিত (মতান্তরে ব্রহ্মাপত্নী)। মনসাও স্বাধীন নারী (জরৎকারুর সঙ্গে তাঁর বিবাহ দেবসমাজে মুখরক্ষা মাত্র)। সরস্বতীকে স্রষ্টা (ব্রহ্মা) কামনা করেছিলেন। মনসাকে পিতা (শিব) কামনা করেছিলেন। সরস্বতী বিদ্যাদেবী, মনসা প্রথমে বাক্ পরে মূর্তিমতী বিষবিদ্যা। সরস্বতী গীতবাদ্যের দেবী। মনসাও গীতবাদ্যপ্রিয়। গান বাজনা নাচ না হলে তাঁর পূজা হয় না। গীতনৃত্যের মাধ্যমেই বেহুলা তাঁর প্রসাদ লাভ করেছিল।[৬]

মনসা ও কমলে-কামিনী দেবী-ভাবনা প্রাচীন আইরিশ ও জার্মান জাতির ঐতিহ্যে পাওয়া গিয়েছে।[৭] চণ্ডীমঙ্গাল পাঁচালিতে যে দেবীর মহিমা কীর্তিত ও গীত তিনি রুদ্রাণী চণ্ডী নন। পুরাণে বর্ণিত শিবগৃহিণী সতী ও পার্বতী চণ্ডীমঙ্গাল কাব্যের প্রস্তাবনা অংশে শুধু দেখা দিয়েছেন। মূল আখ্যায়িকা যিনি অধিকার করে আছেন তিনি অভয়া দুর্গা। কাহিনির উপসংহারে তাঁরই প্রকাশভেদ, জলদেবী কমলা-মনসা শেষের দিকে রঙ্গামঞ্চ অধিকার করেছেন।[৮] চণ্ডীমঙ্গালের অধিদেবতা দুর্গা অরণ্যানী বা বিন্ধ্যবাসিনী। তবে তিনি চণ্ডমুণ্ডমহিষাসুর- বিনাশিনী নন। তিনি অভয়া। এই কারণে প্রাচীন চণ্ডীমঙ্গাল রচয়িতাগণ অনেকেই তাঁদের কাব্যকে বলেছেন 'অভয়ামঙ্গাল'। এই হল চণ্ডী পাঞ্চালী কাব্যের প্রকৃত নাম।[৯] অভয়া বনদেবী। হিংসা ত্যাগ করলে তাঁর আশ্রয় ও বনভাণ্ডার সকলের জন্য সর্বদা উন্মুক্ত। এই বনদেবীর আবির্ভাব বৈদিক সাহিত্যের শেষ দিকে। ঋগ্‌বেদের দশম মণ্ডলের ১৪৬ নং সুক্তে তাঁর একটি স্তব রয়েছে। এখানে তাঁর নাম অরণ্যানী (অরণ্যের পুণ্য অধিকারিণী)। এই অরণ্যানীই বহু শতাব্দীর ইতিহাসের স্রোতে নানা কবি-কল্পনার রঙে ডুবে ও বিচিত্র লোকভাবনায় জারিত হয়ে প্রাচীন বাংলা সাহিত্যে চণ্ডীমঙ্গালের অধিদেবী মঙ্গালচণ্ডী রূপে দেখা দিয়েছেন।[১০] দুর্গা শব্দের অর্থ পরিবর্তনের ফলে দেবী দুর্গার দুই রূপভেদ দেখা দেয়। ১. পর্বত- দুর্গের অধিষ্ঠাত্রী যোদ্ধ্রী। ২. মরুকান্তারবাসিনী পালয়িত্রী।[১১] দুই রূপ দুর্গারই নামান্তর চণ্ডী। প্রথম দুর্গা চণ্ডবিনাশিনী বলে তাঁর 'চণ্ডী' নাম সার্থক। দ্বিতীয় দুর্গা অভয়া ও জীবধাত্রী। তাই তাঁর নাম-কাহিনিতে দুর্গা-অভয়ার এই দুই রূপই প্রকাশিত।[১২]

ধনপতি ও শ্রীমন্ত সদাগর সমুদ্রে বাণিজ্যযাত্রা-পথে কালিদহে যে কমলে-কামিনী দেবীকে দেখেছিলেন তিনি দুর্গা-চণ্ডী-অভয়া নন। তিনি দেবীর প্রাচীনতর রূপভেদ দুর্গা-মনসা-কমলার বেশান্তর।

কমলে-কামিনী দেবীর ইতিহাস অতি পুরাতন। কেবল ভারতে নয়, বিদেশেও তাঁর আদিরূপের সন্ধান মিলেছে।[১৩] রোমান ঐতিহাসিক টাসিতুস (Tacitus) তাঁর জার্মান-ইতিহাসে (*De Origine et situ germanorum*) যে দেবীর কথা লিখেছেন তিনি কমলে-কামিনীরই মতো (তাঁকে দেখে ফেললেই লোকে বিপদে পড়ত)।[১৪] সাগর মধ্যে কালিদহে (অর্থাৎ ঘূর্ণাবর্তে) কমলে-কামিনী দৃশ্য দর্শনের ফলে ধনপতি ও তাঁর পুত্র শ্রীপতিরও জীবনসংশয় হয়ে উঠেছিল।

কমলে-কামিনী রূপকল্পনায় সম্ভবত প্রথমে ছিল 'নাগ'। এই নাগ হস্তি নায়, সাপ। মনসা—কমলার মুখ থেকে সাপ বের হওয়া ও পুনরায় মুখের ভিতর চলে যাওয়া অসম্ভব বা অশ্রুতপূর্ব ঘটনা নয়। রূপকথার গল্পে এই ঘটনার উল্লেখ আছে।[১৫] কমলে-কামিনীর কাহিনি অংশত রূপকথার কাছে সম্ভবত ঋণী। কাহিনিতে জটিলতা সঞ্চারিত করার জন্য এবং প্রাচীনতর পাঁচালি কাব্য মনসামঙ্গালের ধনপতির দুর্গতির সঙ্গো সামঞ্জস্য রক্ষার জন্য এই উপাদানটি সংযোজিত হয়েছিল।[১৬]

হস্তির সঙ্গো অভয়াচণ্ডীর যোগাযোগ গজলক্ষ্মী কল্পনা থেকে। জিতেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর '*Development of Indian Iconography*' গ্রন্থে বেশ কয়েকটি প্রাচীন গজলক্ষ্মী মূর্তির উল্লেখ করেছেন (পৃ. ১৯৪-১৯৭)।

লক্ষ্মণসেনের তৃতীয় রাজ্যাব্দে নির্মিত চণ্ডীমূর্তির ওপরে দুটি হস্তি জল ঢেলে দিচ্ছে এই দৃশ্য উৎকীর্ণ।[১৭] সুকুমার সেন কমলে-কামিনীর গজগ্রাস কাহিনির একটি সূত্র খুঁজে পেয়েছেন। নবম শতাব্দীর কবি অভিনন্দ তাঁর 'রামচরিত' কাব্যে হনুমানের দেবীমূর্তির মধ্যে একটি শ্লোকে দেবীর গজদলন-কাহিনি ও তার আগে মহিষমর্দন-কাহিনির ইঙ্গিত দিয়েছেন—"জগ্রসে গজতনুর্ দনুসূনুর্/গাঢ়নতবপুষা বপুষা তে।/অব্জ কোশমৃদুণা মহিষং প্রাক্/চুক্ষুদে চ রণে চরণেন।" দেহ অত্যন্ত নত করে তুমি গজশরীরধারী দানবকে গ্রাস করেছিলে। (তার) আগে তুমি রণে পদ্মকেশরের মতো কোমল চরণে মহিষকে বিদলিত করেছিলে।[১৮] চণ্ডীমঙ্গাল কাব্যের মধ্যে ধনপতি সদাগরের কাহিনির দেবতা মঙ্গালচণ্ডী প্রকৃত ভয়ঙ্করী (malignant) দেবী। ধনপতি তাঁকে অপমান করেছিলেন। কমলে-কামিনীর মায়া বিস্তার করে তিনি ধনপতিকে ছলনা করেছেন। কিন্তু শ্রীমন্ত তাঁর কাছে কোনো কারণে অপরাধী নয়, তবু তাকে কমলে-কামিনী মায়া-দৃশ্যের দ্বারা ছলনা করেছেন, তার প্রাণসংশয় উপস্থিত হয়েছিল। যদিও শেষ পর্যন্ত দেবী স্বয়ং আবির্ভূত হয়ে তাকে রক্ষা করেছেন।[১৯]

শশিভূষণ দাশগুপ্ত মন্তব্য করেছেন—'চণ্ডীমঙ্গাল-বর্ণিত কমলে-কামিনী উপাখ্যান গজলক্ষ্মীর কিংবদন্তি অবলম্বন করে গড়ে উঠেছে। এই গজলক্ষ্মীর মূর্তি অতি প্রাচীন, কিন্তু পূর্বভারতে কোনোযুগেই ইহার তেমন কোনো প্রসিদ্ধি দেখিতে পাইনা, ইহার প্রসিদ্ধি দক্ষিণ ভারতে এবং দক্ষিণ-পশ্চিম ভারতে।' তিনি মনে করেন, চণ্ডীর কমলে-কামিনী মূর্তি লোকায়ত মানস থেকে গৃহীত হয়নি। বাণিজ্য সূত্রে দক্ষিণ ভারতে গিয়ে বাঙালি বণিক সম্প্রদায় গজলক্ষ্মী মূর্তির সঙ্গো পরিচিত হয় এবং সেই অভিজ্ঞতা থেকেই কাব্যে এই দেবীর পরিকল্পনা।[২০] কিন্তু পশ্চিমবঙ্গোর দুটি বিখ্যাত প্রত্নস্থল তাম্রলিপ্ত ও চন্দ্রকেতুগড়

থেকে পোড়ামাটির গজলক্ষ্মী শুঙ্গাযুগে নির্মিত মূর্তি (ফলকে উৎকীর্ণ) আবিষ্কৃত হয়েছে।[২১] এর দ্বারা প্রমাণিত হয় বহু কাল আগে থেকেই বাংলার মানুষ গজলক্ষ্মী মূর্তির সঙ্গো পরিচিত ছিল।

সুকুমার সেন লিখেছেন— 'ভারতবর্ষে শ্রীর ও লক্ষ্মীর (অর্থাৎ কান্তির ও পুষ্টির) প্রতীক ছিল পদ্ম এবং পদ্মাশ্রিতা দেবী, আর সঞ্চয়ের প্রতীক ছিল হস্তী (নাগ)। খৃষ্টপূর্ব দ্বিতীয় শতাব্দী হইতে কান্তি ও ঋদ্ধি জ্ঞাপক যে স্থাপত্য চিত্র অবিচ্ছেদে পাওয়া যাইতেছে সে হইল কমলবনে প্রস্ফুটিত পদ্মের ওপরে আসীনা শোভনা নারী, তাহার দুই পাশে দুই হাতি শুঁড়ে জলকুম্ভ লইয়া তাহাকে অভিষেক করিতেছে। পরবর্তীকালে এই মূর্তি মনসার বিকল্প মূর্তি গজলক্ষ্মী বলিয়া গৃহীত হইয়াছিল। মনে হয় গজলক্ষ্মীর মূর্তি বণিকদের জাতিবৃত্তির লাঞ্ছন রূপে স্বীকৃত ছিল এবং পরে ইহাই তাহাদের উপাস্য বিশিষ্ট দেবীমূর্তি রূপে পূজিত হইতে থাকে।'[২২] আশুতোষ ভট্টাচার্য গজলক্ষ্মীর ঐন্দ্রজালিক আচরণের সূত্রে চণ্ডীর উৎস নির্ণয়ে ডাকিনী সংক্রান্ত একটি ব্যাখ্যা উপস্থিত করেছেন। তিনি দেখিয়েছেন খুল্লনার আরাধ্যা দেবী চণ্ডীকে তিনি 'ডাকিনী' রূপেই অভিহিত করেছেন—'তোমার মোহিনীবালা শিখিয়া ডাইনীকলা নিত্যপূজে-ডাকিনী দেবতা।' কমলে-কামিনী রূপিণী চণ্ডীর সঙ্গো ডাকিনীর ভাবসাদৃশ্য বিশেষ কৌতূহলোদ্দীপক। অধ্যাপক ভট্টাচার্য লিখেছেন, "তিব্বতী ভাষায় 'ডাক' শব্দের অর্থ প্রজ্ঞা বা জ্ঞান—তাহার স্ত্রীলিঙ্গ রূপ ডাকিনী। ডাকিনীরা নানাপ্রকার তান্ত্রিক আচার দ্বারা কতকগুলি ঐন্দ্রজালিক ক্রিয়া সম্পন্ন করিতে পারিত। ইহা দ্বারাই তাহারা সাধারণ লোকের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিত। ডাকিনীরা ক্রমে সিদ্ধি লাভ করিয়া তান্ত্রিক বৌদ্ধ সমাজে প্রায় দেবত্বে অধিষ্ঠিত হইত।"[২৩] কবিকঙ্কণের কমলে-কামিনী চণ্ডী তাঁর ঐন্দ্রজালিক ক্ষমতা প্রদর্শনের মাধ্যমে মশানে শ্রীমন্তকে রক্ষা করেন, দুর্ভেদ্য কারাগার থেকে ধনপতিকে উদ্ধার করে অলৌকিক ক্ষমতার পরিচয় দেন। বিশেষ শক্তিসম্পন্ন কোনো ডাকিনীর পরবর্তীকালে মঙ্গালচণ্ডীর সঙ্গো অভিন্ন হয়ে যাওয়াও অস্বাভাবিক নয়।

প্রাচীন পুরাণে উল্লেখ না থাকায় কমলে-কামিনী দেবীকে পৌরাণিক দেবী বলা সম্ভব নয়। মনে হয় 'কালকেতু' উপাখ্যানের চণ্ডী এবং 'ধনপতি' কাহিনির চণ্ডী স্বতন্ত্র দেব পরিকল্পনা থেকে পরবর্তীকালে পালা গ্রন্থনের সময় মিলিত হয়েছে। আশুতোষ ভট্টাচার্য লিখেছেন, 'বাংলার যে সকল লৌকিক দেব-দেবী হিন্দু ধর্মের পুনরুত্থানের যুগে হিন্দুভাবাপন্ন তন্ত্র বা পুরাণ-কর্তৃক প্রভাবিত হইয়াছেন, চণ্ডী বা মঙ্গালচণ্ডী তাঁহাদের অন্যতম।'[২৪]

খুল্লনার দুর্গতিহারিণী ও ধনপতির দুর্গতিকারিণী এবং শ্রীপতির যশোদায়িনী দেবী এক নন। খুল্লনার দেবী স্থলদেবতা, আর ধনপতিকে বিড়ম্বিত করেছিলেন এবং শ্রীপতিকে সৌভাগ্য দিয়েছিলেন যে-দেবী তিনি জলদেবতা। শ্রীপতির দেবীর সঙ্গো কালকেতুর দেবীর যোগাযোগ আছে বৈপরীত্যে। কালকেতুর দেবী স্থলদেবতা, তাঁর প্রতীক গোধা, শ্রীমন্তের দেবী জলদেবতা, তাঁর প্রতীক—কুম্ভীর মকর নয়—পদ্ম ও হস্তী। একজন অভয়া দুর্গা; অন্যজন গজলক্ষ্মী (বা মনসা)। এই দুই দেবতা বাঙালির পুরাণকথায় চণ্ডী ও মনসারূপে দেখা দিয়েছেন। এঁরা প্রথমে একটিই দেবতা ছিলেন—বিষ্ণু-মাধবের শক্তি দেবতা। প্রাচীন

পুরাণকাহিনিতে তিনি একানংসা (যিনি এক এবং স্বতন্ত্র।[২৫] অথবা দেবী স্বাধীন এবং অবিবাহিতা)। গজলক্ষ্মী ও কমলে-কামিনী মূর্তির মধ্যে এক বড়ো রকমের পার্থক্য আছে।[২৬] গজলক্ষ্মী বা অভিষেক লক্ষ্মীর মূর্তিতে দু দিকে দুটি হস্তি দেবীকে বারিবর্ষণে অভিষিক্ত করছে। আর কমলে-কামিনী মূর্তিতে দেবী একটি হাতিকে একবার গিলে খাচ্ছেন, আরেকবার উগরে দিচ্ছেন। গজলক্ষ্মীর মূর্তি প্রাচীনতর ও অধিকতর শিল্পসম্মত। রবীন্দ্রনাথ কমলে-কামিনীর চিত্রটির মধ্যে সৌন্দর্য এবং বীভৎসতা এই দুই পরস্পর বিরোধী চিত্র দেখতে পেয়ে এর নিন্দা করেছেন। তিনি লিখেছেন, 'শিক্ষিত, সংযত, মার্জিত কল্পনায় একটি রূপসী যুবতির সহিত গজাহার এবং উদ্‌গীরণ কোনমতেই একত্রে উদয় হইতে পারে না।... অপার সমুদ্রের মধ্যে পদ্মাসীনা ষোড়শী রমণীই কি যথেষ্ট বিস্ময়ের কারণ নহে?'[২৭]

তবে মুকুন্দরামের সপক্ষে বলা যায়, একটি ঐতিহ্যমূলক কাহিনির ধারা অনুসরণ করে মুকুন্দরাম তাঁর চণ্ডীমঙ্গাল কাব্যের কাহিনি রচনা করেছেন। পূর্ব প্রচলিত কাহিনি বা মধ্যেকার কোনো অংশ পরিবর্তন করা তাঁর সাধ্য ছিল না। ধর্ম এবং অলৌকিকতা মঙ্গালকাব্যের কাহিনির ভিত্তি। ধর্মের ক্ষেত্রে অনেক সময় রূপকের ব্যবহার হয়ে থাকে। কমলে-কামিনীর কাহিনিও রূপকের ওপরে পরিকল্পিত।

পদ্ম ও হস্তি ভারতীয় ধর্ম ও সংস্কৃতির অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। ইতিহাসের প্রায় সূচনাকাল থেকে এই পুষ্প ও প্রাণী ভারতীয় শিল্পে অজস্রভাবে ব্যবহৃত হয়েছে। হিন্দু সংস্কৃতিতে পদ্ম জীবনের প্রতীক, সৃষ্টির প্রতীক। বিষ্ণুর নাভি-পদ্ম থেকে ব্রহ্মার আবির্ভাব। গৌতম বুদ্ধ পদ্মাসনে উপবিষ্ট অবস্থায় বোধি লাভ করেছিলেন। ভারতের মন্দির-ভাস্কর্যে পদ্মের ছড়াছড়ি। বহু দেব-দেবীর পদ্ম-সংশ্রব তাই স্বাভাবিক। দেবীদের মধ্যে লক্ষ্মী ও মনসার সঙ্গো পদ্মের অতি ঘনিষ্ঠ সংযোগ। পদ্ম সৌন্দর্যেরও প্রতীক। কমলে-কামিনী দেবী ভারতীয় ঐতিহ্যের প্রতীক। কমলে-কামিনী দেবী ভারতীয় ঐতিহ্যের সঙ্গো সঙ্গাতি রেখে পদ্মাশ্রিতা।

ভূ-তাত্ত্বিকদের মতে সমুদ্র থেকেই নাকি সুজলা সুফলা শস্যশ্যামলা বঙ্গোর জন্ম। একজন লেখকের ধারণা, কমলে-কামিনী সমুদ্রগর্ভ থেকে উত্থিত বঙ্গাভূমির প্রতীক। পদ্ম যে উদ্ভিদ জগৎ তথা শস্য ও জীবনের প্রতীক, বাংলার বিভিন্ন প্রত্নস্থল, বিশেষত চন্দ্রকেতুগড় থেকে প্রাপ্ত সীলমোহর, মৃণ্ময় পাত্র ও দেব-দেবীর মূর্তিতে প্রদর্শিত পদ্মে তা আভাসিত। দেবী কর্তৃক গজগ্রাস ও ওগ্‌রানোকে সৃষ্টি ও ধ্বংসের প্রতীক বলে ধরা যেতে পারে। এই দিক থেকে কমলে-কামিনী ধ্বংস ও সৃষ্টির দেবী। তাছাড়া, ভারতীয় শিল্পে grotesque বা অদ্ভুত বিষয় বা মূর্তির ব্যবহার নানাভাবে দেখা গেছে। বৈপরীত্য সৃষ্টির উদ্দেশ্যে এই ধরনের ব্যবহার বৈদেশিক শিল্প-সাহিত্যেও দেখা যায়। সুতরাং নান্দনিক বিচারেও কমলে-কামিনী মূর্তিকে তাৎপর্যহীন বলা যায় না। দেব-ভাবনার যে সূচনা বৈদিক যুগে, কমলে-কামিনী তারই একটি পরিণত রূপ। কেবল মঙ্গালকাব্যে নয়, বাংলার মন্দির-টেরাকোটা এবং পটচিত্রেও কমলে-কামিনী দৃশ্য বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে আছে।

উৎসের সন্ধানে

১। সেন দীনেশচন্দ্র, বঙ্গাভাষা ও সাহিত্য, কলকাতা, ১৯৮৬ (নবম সং), পৃ. ৭৫
২। ভট্টাচার্য আশুতোষ, বাংলা মঙ্গালকাব্যের ইতিহাস, পৃ. ৪০
৩। সেন সুকুমার (সম্পাদিত) : চণ্ডীমঙ্গাল, কলকাতা, ১৯৮৬ (সংশোধিত সংস্করণ), পৃ. ২০৬
৪। তদেব, পৃ. ২৪৯-২৫০

৫। সেন সুকুমার : বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস, প্রথম খণ্ড, কলকাতা, ১৯৯৭ (৪র্থ মুদ্রণ), পৃ. ১৫৯
৬। তদেব
৭। তদেব
৮। তদেব, পৃ. ৪১২
৯। তদেব
১০। তদেব
১১। তদেব, পৃ. ৪১৩
১২। তদেব
১৩। তদেব, পৃ. ৪১৪
১৪। তদেব
১৫। তদেব
১৬। তদেব
১৭। তদেব
১৮। তদেব
১৯। ভট্টাচার্য আশুতোষ, বাংলা মঙ্গলকাব্যের ইতিহাস, পৃ. ৬০৩
২০। মণ্ডল ইন্দুভূষণ, বাংলা মঙ্গালকাব্যে লৌকিক উপাদান, কলকাতা, ১৯৯৯, পৃ. ৬৭
২১। Biswas S.S., Terracotta Art of Bengal, Delhi, 1981, p. 84
২২। উদ্ধৃত : মণ্ডল ইন্দুভূষণ, পূর্বোক্ত গ্রন্থ, পৃ. ৬৭
২৩। উদ্ধৃত : তদেব
২৪। তদেব, পৃ. ৬৮
২৫। সেন সুকুমার (সম্পাদনা), চণ্ডীমঙ্গাল, পৃ. ২৩-২৪
২৬। Klein M.R , The Green World, London, 1997, p. 145-147; Zimmer Myths And Symbols In Indian Art And Civilization, Delhi, 1990 (1st Indian edition), P. 90-102
২৭। ঠাকুর রবীন্দ্রনাথ, সমালোচনা, ১২৯৪ সাল, 'নীরব কবি ও অশিক্ষিত কবি'।

মধ্যযুগের নগর-রাষ্ট্র : মুকুন্দরামের গুজরাট-নগর

রাধেশ্যাম সাহা

দ্বাদশ শতকের শেষার্ধে বা ত্রয়োদশ শতকের প্রথমার্ধে (১২০৩-০৪ খ্রি.) বখতিয়ার খিলজির বাংলা-বিহার অভিযান ও আক্রমণ এক অভূতপূর্ব ঘটনা। বিদেশি শক্তি এর আগেও এদেশ আক্রমণ করেছে, কিন্তু এর আঘাত সর্বস্তরে অনুভূত হয়নি। বঙ্গেশ্বর লক্ষ্মণ সেনকে পরাজিত করে তারা মুসলমান শাসনের ভিত্তি প্রস্তুত করে। নদীয়ার পর আক্রমণস্থল হয় গৌড়দেশ, বাংলার সুপ্রাচীন রাজধানী। বরেন্দ্রভূমি দখল করে বখতিয়ার দেবকোটে গড়ে তোলেন নতুন রাজধানী। মুসলিম প্রভাব এইভাবে অপ্রতিহত প্রতাপ নিয়ে গ্রামের প্রত্যন্ত অঞ্চল পর্যন্ত বিস্তৃত হতে থাকে। প্রায় দুই শত বছর ধরে তুর্কি আক্রমণের বিভীষিকা বাংলাদেশকে আচ্ছন্ন করে রেখেছিল। প্রাক্-তুর্কি আক্রমণ কালের বঙ্গসমাজ ছিল জাতি-বর্ণ-শ্রেণির দ্বন্দ্বে জর্জরিত। নিম্নশ্রেণির মানুষ ছিল অবহেলিত। সেন-আমলে বৌদ্ধদের দুর্গতি চরমে উঠেছিল। ড. সুকুমার সেন এই সামাজিক অন্তর্দ্বন্দ্বের কথা স্বীকার করেছেন। বলেছেন—'নবীন স্তরের ব্রাহ্মণেরা ও তাঁহাদের শিষ্য-ভৃত্যেরা ছিলেন সংস্কৃতাশ্রয়ী এবং প্রাচীন ব্রাহ্মণ-অব্রাহ্মণেরা ছিলেন প্রাকৃতাশ্রয়ী এবং কোনো একটি নির্দিষ্ট ধর্মমতে নিষ্ঠাহীন। অনেকেই জৈন, বৌদ্ধ, অথবা যোগপন্থী ছিলেন। মনোধর্মের দিক দিয়া নবীনেরা ছিলেন চিন্তাশীল শাস্ত্রাদর্শবাদী যজ্ঞপরায়ণ তত্ত্বানুসন্ধিৎসু ও সংযমনিষ্ঠ, আর প্রবীণেরা ছিলেন দৈববাদী ব্রতপরায়ণ কর্ম স্পৃহালু ভাববিলাসী সংগীত-সাহিত্য-রসলিপ্সু ও অধ্যাত্মনিষ্ঠ'। তুর্কি আক্রমণে আক্রান্ত হয় হিন্দুরা। তাঁরা 'হিন্দুকে কখনো নির্বিচারে হত্যা' করে বা 'বলপূর্বক ইসলামধর্মে দীক্ষিত' করে এদেশে 'মুসলমানের সংখ্যাবৃদ্ধি করিবার জন্য নানাপ্রকার ছল, বল ও কৌশলের সাহায্য লইতেন।' (অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়)। শ্রমজীবী মানুষ, বর্ণাভিমানী হিন্দুদের অত্যাচারে অত্যাচারিত অস্পৃশ্য মানুষ, অর্থনৈতিকভাবে অনগ্রসর মানুষ, লুব্ধ ও ক্ষমতালোভী মানুষ— এদের অনেকেই ইসলামধর্মে দীক্ষিত হয়। রাষ্ট্রীয় পরিবর্তনের ক্রান্তিকালে শ্রেণি-বিন্যাসের ক্ষেত্রেও প্রচুর পরিবর্তন ঘটে।

শাসকবর্গের পরিবর্তনও ঘটতে থাকে ঘন ঘন। রাজপুরুষ ও দাসদের কুটিল চক্রান্ত, বিদ্রোহ, পাঠান-বলবন-খিলজি-হাবসি সুলতানদের ক্ষমতামত্ততা, ধর্মান্ধতা, রক্তপাত, সংঘর্ষ বাঙালি জনজীবনকে বিপর্যস্ত করে তুলেছিল। 'দেউল ভাঁগি মসীদ বাঁধ', 'হৈয়া যবনরূপী/ শিরে ধরে কালটুপী/ হাতে ধরে ত্রিকচ কামান', 'দেউল দেহারা ভাঙ্গে'—অবাধ অন্যায় হয়ে উঠেছিল নিয়ন্ত্রণহীন। চতুর্দশ শতকের মাঝামাঝি সময়ে সামসুদ্দিন ইলিয়াস শাহ বাংলায় আপাত শান্তি-কল্যাণ ফিরিয়ে আনেন। তাঁর মৃত্যু ১৩৫৮ খ্রিস্টাব্দে। এরপর সিকন্দর শাহ-গণেশ-জালালুদ্দিন-সামসুদ্দিন-মামুদশাহী বংশ-হাবসি বংশ-হোসেনশাহী বংশ একের পর এক রাজত্ব করে। হোসেন শাহও রাজ্যে শান্তি-শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনার প্রয়াস পান। তিনি সাহিত্য-সংস্কৃতির অনুরাগী ছিলেন বলেই বাংলার কবিরা তাঁকে কেউ কেউ

'নৃপতিতিলক' বা 'কৃষ্ণের অবতার' হিসেবেও অভিনন্দিত করেন।

এটা ঠিকই যে, দেশব্যাপী অরাজকতা-সংঘর্ষ-বিশৃঙ্খলার মধ্যে সাহিত্য বা সৃজনমূলক শিল্পের চর্চার সুযোগ জোটে না। কিন্তু সুলতানি আমলে মাঝে-মাঝে সেই রকম সুযোগ এসেছে। বাংলার সমাজজীবন ধর্মশাসিত ও বর্ণশাসিত। উচ্চবর্ণের সঙ্গো নিম্নবর্গীয় মানুষের মিলনের উপায় ছিল না। তুর্কি আক্রমণের ফলে উচ্চ ও নিম্নবর্ণের হিন্দুদের মধ্যে ঐক্যপ্রয়াসের একটি ক্ষেত্র প্রস্তুত হয়। রাষ্ট্রীয় ঘূর্ণি ঝড়ে 'মুসলমান শক্তির মধ্যস্থতায় আর্য ও অনার্যের মিলন হইয়া বাঙালি জাতি বিশিষ্ট রূপ পাইয়া জন্মগ্রহণ করিল।' বহুদিনকার রুদ্ধদ্বার মুক্ত হল। রচিত হল মিলন ও সমন্বয়ের বাতাবরণ। সংস্কৃতাভিমানী অভিজাত শিক্ষিত লোকজন লৌকিক পূজা-পার্বণ, আচার-অনুষ্ঠান, ধর্মবিশ্বাস, লৌকিক-দেব-দেবীকে মান্য ও গ্রহণ করতে শুরু করল। নিম্নবর্গের মানুষও সুযোগ পেল পৌরাণিক দেব-দেবী ও ধর্ম-সংস্কৃতির মধ্যে নিজেদের চিত্ত-প্রসারের।

মঙ্গালকাব্যগুলিতে তুর্কি আক্রমণের প্রত্যক্ষ প্রভাবের কথা বলেছেন ঐতিহাসিকগণ। অনার্য দেবী চণ্ডী-মনসা বা অনার্য দেবতা ধর্মঠাকুর বর্ণহিন্দুদের কাছে শ্রদ্ধার আসন লাভ করে। পৌরাণিকতা ও লৌকিকতা পাশাপাশি হাত ধারধরি করে দাঁড়ায়। পীর বা সত্যপীর হিন্দুদের কাছে বরণীয় হয়ে ওঠে। ব্রহ্মা-বিষ্ণু-মহেশ্বর 'নিরঞ্জনের রুষ্মা'-য় মুসলমানের ছদ্মবেশ ধারণ করে। হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে এই ভাবে মিলনক্ষেত্র রচিত হয়। এই পর্বেই শুরু হয় আদ্বিজ চণ্ডালে প্রেমবিতরণের মাধ্যমে বৈষ্ণবীয় ধর্মের প্রসার। অনুবাদ-রচনার ধারা পুষ্ট হতে থাকে। স্থাপত্যরীতিতে, সাহিত্যে, পোশাক-পরিচ্ছদে, ভাষায় মিলনের সুর ফুটে ওঠে। ইতিহাসে এ সবই তাৎপর্যপূর্ণ দিক।

গ্রামীণ জীবনধারার মধ্যেও রাষ্ট্রীয় পরিবর্তন ছাপ ফেলতে শুরু করে। তুর্কি আক্রমণে বিধ্বস্ত হয় গ্রামীণ জীবন, বিপন্ন মানুষ নিরাশ্রয় হয়ে শক্তির চরণবন্দনায় রত হয়। মঙ্গালকাব্যের উদ্ভবের মূলে আছে মানুষের বিপন্নতা, ভয়-আতঙ্ক আর নিরাপত্তাহীনতা। দিল্লির কেন্দ্রীয় শক্তির দাপট মাঝে মাঝেই বাংলায় আছড়ে পড়ছিল। আঞ্চলিক রাজ্যসমূহও দ্বন্দ্বে-কলহে-সংঘর্ষে লিপ্ত। পারিবারিক জীবন অনিশ্চিত, অশান্ত, উদ্বিগ্ন। এমন অবস্থায় মানুষ পরিত্রাণের সব রকম চেষ্টা করে, বিকল্প খোঁজে, মুক্তির স্বপ্ন দেখে, মনে মনে বিকল্প ভুবনের তল্লাস করে। গ্রামীণ মানুষ দীন-দরিদ্র-অসহায়; দারিদ্র্য তাদের চরম অভিশাপ। এই অভিশপ্ত মানুষগুলিই দেবীর চরণ আশ্রয় করেছে যেমন, তেমনি মুক্ত-স্বচ্ছন্দ জীবনের ধ্যানও করেছে কেউ কেউ। মধ্যযুগের কোনো কোনো সংবেদনশীল কবি স্বপ্নদ্রষ্টার মতো দারিদ্র্যযুক্ত আনন্দময় জীবনচ্ছবি দেখে থাকলে বিস্ময়ের কিছু নেই। কবি মুকুন্দরাম এমনই ছবি সম্ভবত দেখেছেন। মুকুন্দরাম অস্তিত্বের প্রশ্নে দুর্বার, দুর্মর, জেদি। নিতান্ত নিরুপায়তার মধ্যেও কাব্য রচনার সূত্রপাত করে বুঝিয়ে দিয়েছেন যে, প্রাণধর্মী অস্তিত্ব-বাসনাকে কোনো শাসকই রুদ্ধ করে রাখতে পারে না। প্রাণধর্মের জয় অবশ্যম্ভাবী। হয়তো-বা এই অসম্ভবের নেশাই কবিদের প্রেরণা দেয়, স্বপ্ন দেখতে প্ররোচিত করে, প্রভাবিত করে কল্পনার দ্বিতীয় ভুবন নির্মাণ করতে। গ্রাম্যজীবনের অস্বাচ্ছন্দ্য-দারিদ্র্য-অসহায়তার ছক ভেঙে প্রথা ভেঙে

মুকুন্দরাম সহসাই নাগরিক জীবনের সুস্থ-সুন্দর-মুক্ত ছবি দেখে ফেলেছেন, দেখে ফেলেছেন মানুষের আর এক রূপ। গ্রাম থেকে শহর, অরণ্য কেটে বসত গড়ার একটি পরিকল্পিত নগর-রাষ্ট্রই তাঁর ভাবনার কেন্দ্রে উপস্থিত। ধুরন্ধর ইঞ্জিনিয়ারের প্রকল্পিত দৃষ্টিভঙ্গির সঙ্গে তাঁর তুলনা চলে। এই নগর-রাষ্ট্রই গুজরাট নগর।

মানুষ নগরজীবনের স্বপ্ন দেখতে শুরু করেছে তখন। গ্রামীণ জীবনে যা কিছু অভাব-অভিযোগ, ক্ষুধা বা দারিদ্র্য, অসহায়তা বা শাসন-শোষণ-অবিচার—নগরজীবনে তার যেন প্রতিফলন না ঘটে, এমনই একটি স্থির বিশ্বাসের জমি তৈরি হয়েছে নাগরিক জীবনের পটে, অন্তত একটি পরিকল্পিত নগর-রাষ্ট্রে। এই মানুষ নগরমনস্ক মানুষ। নাগরিক-চৈতন্যই বস্তুত এমন নগর-রাষ্ট্রের কল্পনার হেতু। ভারতীয় গ্রামীণ জীবনধারার বিপরীতে নগর-সভ্যতার এমন অনুপম আলেখ্য আর কোথাও আছে কিনা, জানা নেই। ধীর-মন্থর-বিলম্বিত গ্রামীণ জীবনধারা, বোঝা যায়, সকলের কাম্য ছিল না, স্বস্তিরও কারণ ছিল না। তাই লোকজীবনধারায় ব্রত-প্রার্থনাও বদলে গেছে, জীবনের ঐকান্তিক সত্য নাগরিক জীবনের স্বাচ্ছন্দ্যে-লাবণ্যে-ছন্দে ধরা পড়েছে।

ভারতের গ্রামীণ জীবনের প্রধানতম সমস্যা দারিদ্র্য। মুসলিম আমলকে স্বর্ণযুগ মনে করবার কারণ নেই। পঞ্চদশ-ষোড়শ শতকও স্বর্ণশস্যপূর্ণ ছিল না। এখানে অমর্ত্য সেনের একটি কথা ধার করতে চাই : 'কিছু ভারতবাসী ধনী; কিন্তু অনেকেই গরিব। কিছু লোক আরামে জীবন কাটায়; বেশিরভাগ লোক কঠোর পরিশ্রম করেও খুব বেশি অর্জন করতে পারেন না। ....এ সবগুলো হচ্ছে বৈষম্যের নানা রূপ।' (ভারতে শ্রেণিবিভাগের তাৎপর্য' অমর্ত্য সেন, দেশ, ১৮ জানুয়ারি ২০০৩)। আধুনিক ভারতের শ্রেণিবিশ্লেষণ, কিন্তু আবহমানেরই এই বিশ্লেষণ। ছ'শো বছর আগেকার অবস্থা আরও শোচনীয়। দারিদ্র্য আর দারিদ্র্যজনিত সমস্যা মঙ্গালকাব্যেরও গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। কবিরা চণ্ডীর দ্বারস্থ হয়েছেন এই সব সংকটের হাত থেকে পরিত্রাণ পেতেই। এবং এই প্রয়াস বলা চলে, অন্তহীন।

'দেবখণ্ডে' হরগৌরীর দাম্পত্য কলহের মূল কারণই তো দারিদ্র্য। মা-মেয়ের কলহে দারিদ্র্যই মস্ত বড়ো প্রশ্নচিহ্ন। মেনকার অভিযোগ—

তোমা ঝিএ হৈতে মজিল গিরিয়াল।
ঘরে জামাই রাখিয়া পুষিব কতকাল॥
প্রভাতে খাজাড়ি মাগে কার্তিক গণাই।
চারিপণের সম্ভাবনা তোমার ঘরে নাই॥

ভাত-কাপড় জোগানোর সামর্থ্য নেই শিবের, মেনকার খোঁটা বিদ্ধ করে গৌরীকে—

মিছা কাজে ফিরে পতি নাহি চাষবাস।
ভাত কাপড় কত না জোগাব বারমাস॥

মহাদেব নিজ দারিদ্র্যে নিজেই বিব্রত—

দেশে দেশে ফিরি কত ভিক্ষা করি

ক্ষুধায় অন্ন না মিলে।
গৃহিনী দুর্জন ঘর হইল বন
বাস করি তরুতলে।।

গৌরী এই দারিদ্র্যকে 'দারুণ করম দোষ' বলেছেন, ভিক্ষার ভাতেই তাঁর বিধিলিপি, ধার করেন অথচ পরিশোধের উপায় জানা নেই : 'পায়ে ধরি ঋণ করি শুধিতে কোন্দল।/পুনর্বার উধার করিতে নাহি স্থল।' 'চণ্ডীমঙ্গালে' দারিদ্র্য-ই এক 'সর্বব্যাপিনী ক্ষেত্র'। দারিদ্র্যই ডেকে আনে অসম্মান-লাঞ্ছনা-গঞ্জনা-কলহ-বিবাদ। সুখ নয়, স্বস্তিই তখন সাধারণ্যের পরম বাসনা হয়ে ওঠে। 'পদ্মা কর্তৃক ভবিষ্যৎ পূজার বর্ণনা' অংশে আভাসিত হয়েছে বেঁচে থাকার এক চিরন্তন স্বপ্ন : 'পূজা লবে দৈন্য-দুঃখ-হরা'। কাম্য প্রার্থনা হল— 'দিবে গো সম্পদ তুমি/ দারু দূর্বাকর ভূমি/ কাননে স্থাপিবে পশুগণে।' দৈন্যের হাত থেকে মুক্তি কিংবা সম্পদ সন্ধানই সাধারণ মানুষের আবহমানের ব্রত প্রার্থনা। তুর্কি-আক্রমণের পরবর্তী কয়েকশ' বছরের মধ্যে দেশের রাজনৈতিক অস্থিরতার কারণে মানুষের ভাগ্যের বিশেষ কোনো পরিবর্তন ঘটেনি। কৃষিকর্মের সঙ্গো যুক্ত মানুষের অর্থনৈতিক স্বাচ্ছন্দ্যের প্রশ্ন অবান্তর। একটি জাতির জাগতিক উন্নতি রুদ্ধ হলে যে সমস্ত দুর্লক্ষণ সমাজে প্রকট হয়, মঙ্গালকাব্যে তার যথেষ্ট ইশারা রয়েছে। দারিদ্র্যের হাত থেকে এরা পরিত্রাণ পেতে চেয়েছে, দুঃখকে অতিক্রম করতে চেয়েছে। কিন্তু কীভাবে? মানুষের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের কামনা ব্রতকথায়-ছড়ায়-গীতে যেমন প্রকাশ পেয়েছে, তেমনি মঙ্গালকাব্যেও প্রকাশ পেয়েছে নানা আখ্যানের মধ্য দিয়ে। তুর্কি শাসনে আর সুলতানি নিষ্পেষণে মানুষ দিশেহারা হয়ে পড়েছিল। দিল্লির কেন্দ্রীয় শাসন যত দুর্বল হয়ে পড়েছে, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্যগুলি, করদ রাজ্যগুলি ততই আধিপত্য কায়েম করতে চেয়েছে, স্বৈরাচারের মাত্রা বৃদ্ধি করেছে। শোষণের উপায়গুলির অন্যতম হল রাজস্ববৃদ্ধি। নিরুপায় মানুষ এসবই মেনে নিয়েছে। প্রতিবাদ কার কাছে? প্রজা বিক্ষোভের ইতিহাস যৎসামান্য যা আছে, সেখানে কখনো দেখা যায়নি সংগঠিত প্রজাবিদ্রোহে অত্যাচারী শাসকের সমাপতনের ইতিবৃত্তান্ত। সামন্ততন্ত্রে এ প্রশ্নটিও অবান্তর। তাই মানুষ বিকল্প মুক্তির সন্ধান করেছে রচিত কাব্যে-গানে-গীতে। নিরুদ্ধ আবেগ ধর্ম বা ঈশ্বরকে অবলম্বন করেছে। আবেগের মুক্তি ঘটেছে আখ্যানে, কল্পনায়, দেবতার কৃপা-প্রত্যাশায়। মঙ্গালকাব্য এক ধরনের স্বপ্নকাব্য, মঙ্গাল-কামনার কাব্য। হয়তো-বা, এই স্বপ্নই গ্রামীণ মানুষকে পৌরজীবনের দিকে আকর্ষণ করে থাকবে। তারা এক নতুন নগর-রাষ্ট্রের মুক্ত নাগরিক জীবনের মধ্যে প্রত্যাশার, স্বাধীন সত্তার, স্বাচ্ছন্দ্যের, গণতান্ত্রিকতার, উদার এক জীবনের স্বপ্নও এই অবকাশে দেখে থাকবে। দারিদ্র্যমুক্ত স্বাস্থ্যোজ্জ্বল আনন্দময় সমাজ কি 'চণ্ডীমঙ্গালে'র কবি মুকুন্দ চক্রবর্তীও এক ঝলক অবলোকন করে নিতে চাননি 'গুজরাট নগরী' পত্তনের মধ্য দিয়ে? অন্তত, একটি ধূসর সম্ভাবনার কথা তো ভাবাই যেতে পারে!

দুই

বাঙালি জাতির ইতিহাস নেই। বঙ্কিমচন্দ্র বাংলার ইতিহাস লিখতে চেয়েছিলেন। তাঁর মনে হয়েছিল, 'বাঙ্গালার ইতিহাস চাই। নহিলে বাঙ্গালী কখন মানুষ হইবে না।' তাঁর অভিজ্ঞতালব্ধ ধারণা : 'বাঙ্গালার সৌভাগ্য মোগল কর্তৃক বিলুপ্ত হইয়াছে।' সপ্তদশ অশ্বারোহী নিয়ে বখতিয়ারের বঙ্গাবিজয়ের আখ্যানকে তিনি অস্বীকার করেছেন। বিজিত জাতি হিসেবে ভারতীয়রাও ইতিহাস লেখার কথা কখনো ভাবেনি। এই নিশ্চেস্টতা বঙ্কিমের কাছে পীড়াদায়ক বলে মনে হয়েছে। ঐতিহাসিক তথ্য ও তত্ত্বের সাহায্যে বাংলার অতীত গৌরব পুনরুদ্ধার করা আজও সম্ভব হয়নি। তবে কী এই গৌরব তথ্য ও তত্ত্বের মধ্যে নয়, খুঁজে নিতে হবে অন্য কোনো উপাদানের ওপর ভর করে? 'চণ্ডীমঙ্গালকাব্যে'র গুজরাট নগরীর বিবরণে বাঙালির অবলুপ্ত কোনো ইতিহাস কি নীরব হয়ে নেই? বন কেটে বসত গড়েছেন এ-দেশের জনজাতি সম্প্রদায়ভুক্ত কালকেতু, হয়েছেন রাজা, গড়ে তুলেছেন একটি পরিকল্পিত নগর, স্বাচ্ছন্দ্যবিধান করেছেন, মানুষের স্বপ্নকে বাস্তবায়িত করেছেন—এও তো এক গৌরবময় বিষয়। 'নগর' শব্দটি ব্যবহার করেছেন কবি, গ্রামজীবনের থেকে তুলনায় এক স্বতন্ত্র সমাজজীবনধারার প্রসঙ্গ এনেছেন, আরো একটু অগ্রসর হয়ে সেদিকে তাকালে দেখা যাবে রাষ্ট্র-চেতনার গূঢ় বীজ সূক্ষ্ম সম্ভাবনা নিয়ে সেখানে উপস্থিত। সম্ভবত কালকেতুর নির্মিত নগর-রাষ্ট্রে (City-State) রাষ্ট্র-চেতনার প্রাথমিক কিছু শর্ত পালনের লক্ষণ দেখা গেছে। এক গ্রাম্য ব্যাধ দৈবী কৃপায় সুপ্রচুর ধনলাভ করে, এক বিশাল ভূখণ্ড দখল করে (অথবা পত্তনি নেয়)। ভূখণ্ডের সীমানা চিহ্নিত করে যে নগর-রাষ্ট্রের পত্তন করেছে, তা স্বপ্নচ্ছবি মনে হলেও কবির মনোভূমি অযোধ্যাভূমির চেয়েও সত্য বলে মানতে হয়। ব্যাধ ধনপ্রাপ্তির পর ক্রমে ক্রমে নগরমনস্ক হয়ে উঠেছে। এর ইঙ্গিত রয়েছে কাব্যে। মুরারি শীল নামে 'পোত্‌দার', ধনরত্নের বিশেষ কারবারি, যার চোখ পাকা জহুরির মতো, তাঁর মন্তব্য : 'তাহা হইতে ভাইপো তুমি হয্যাছ সেয়ানা'। 'সেয়ানা' কথাটার দু'রকম অর্থ হতে পারে— প্রথমত, নীচ ও ব্যাধ জাতীয় মানুষ ক্রমশ চালাক-চতুর হয়ে উঠছে; দ্বিতীয়ত, নগরীর মানুষের মধ্যেকার সুলভ গুণটি কালকেতু ধীরে ধীরে রপ্ত করেছেন। দ্বিতীয় অর্থটি নেওয়া যেতে পারে। কালকেতু সেয়ানা, অর্থাৎ নগরমনস্ক মানুষ হয়ে উঠছে। কিছুটা এগিয়ে থাকা, চালাক-চতুর,—এই অর্থে সেয়ানা। অর্থ এনে দিয়েছে মনের পরিবর্তন, এনেছে বাহিরেরও পরিবর্তন। কালকেতুর উক্তি : 'হয্যা মোর অনুকূল উচিত করিবে মূল'—'উচিত মূল্য' দাবি করার মধ্যে তাঁর ব্যক্তিত্বের দৃঢ়তাই চোখে পড়ে। নগরমনস্কতার মূলে এই দৃষ্টিভঙ্গিও বর্তমান।

তিন

মোগলদের নিয়ন্ত্রণে থাকা বেশিরভাগ রাজ্যই ছিল করদরাজ্য। কালকেতু একটি ক্ষুদ্র রাজ্যের রাজাও নন, সম্ভবত কলিঙ্গের অধীন কোনো অতিক্ষুদ্র অঞ্চলের সামন্তরাজ (লক্ষণীয় : 'এক রাজ্যে দুই রাজা বড় অবিচার') বলে ঐতিহাসিকের অনুমান। আমরা

এখানে ইতিহাস নয়, কবির বিবরণকে সাক্ষ্য হিসেবে গ্রহণ করতে চাই। কাব্যের বিবরণে পাই, কালকেতু অত্যন্ত সচেতনভাবে একটি নগর-রাষ্ট্রের পত্তন ঘটিয়েছেন। এমন নগর-রাষ্ট্র শুধু গ্রিসে নয়, ষোড়শ-সপ্তদশ শতকে ভারতেও গড়ে উঠেছিল বলে মনে হয়। গ্রিসের রাষ্ট্রগুলি মূলত নগরকেন্দ্রিক বা নগর-রাষ্ট্র (City State) বলে অনুমান করা হয়। এথেন্সে এক-একটি নগরই রাষ্ট্রে পরিণত হয়েছিল এবং তা স্বতন্ত্র রাষ্ট্র, এমন রাষ্ট্রে রাজা-ই ছিলেন সর্বময় প্রশাসক ও বিচারক। আধুনিক রাষ্ট্রচেতনা গ্রিসে অথবা এথেন্সের নগর-রাষ্ট্রে খোঁজাটাই অবান্তর। আধুনিক রাষ্ট্র আয়তন, জনসংখ্যা, প্রশাসন, বিচার, সামরিক সামর্থ্য নিয়ে নির্দিষ্ট ভূখণ্ডে বিধিমত গড়ে ওঠে।

গ্রিসে অথবা এথেন্সের নগর-রাষ্ট্রে সমাজ-বিন্যাস প্রাথমিক স্তরের তথা নিম্নস্তর সম্পন্ন বলে অনুমান করা চলে। প্রজাদের স্বাধিকার বা গণতন্ত্রের প্রশ্ন সেখানে ওঠে না। সর্বময় কর্তৃত্ব রাজার। গ্রিসে ও এথেন্সে দাসতন্ত্র ছিল অনিবার্য। সমাজে ছিল একাধিক শ্রেণি-স্তর; রাজার হাতে সর্বোচ্চ ক্ষমতা, কিন্তু এর কিছুটা দায়ভার চাপত ধনী-অভিজাত পৃষ্ঠপোষকবর্গের হাতে, অর্থাৎ তখনই আমলাতন্ত্রের সূচনা-ও। প্রজার কাছ থেকে নিয়মিত রাজস্ব আদায় এবং অন্যান্য কর আদায় করা হত। এই কর উৎপাদন-ব্যবস্থা ও স্বাধীন ব্যবসার মধ্য থেকে আদায় করা হত। রাজার অধীনে ছিল সামরিক বাহিনী, পরামর্শদাতা-কূটনীতিবিদ বা পুরোহিত-পণ্ডিতবর্গ, আমলা, শুল্ক আদায়কারী, হিসাবরক্ষক ও অন্যান্য।

নগর-রাষ্ট্রের প্রকৃতি গ্রামের তুলনায় অবশ্যই ভিন্ন। উন্নত সুযোগ-সুবিধা ও স্বাচ্ছন্দ্য এর অন্যতম বৈশিষ্ট্য। নগর-রাষ্ট্রে ভিড় জমাত বৃত্তিধারী নানা মানুষজন, সৌখিন মানুষ, সুবিধাভোগী ও সুযোগসন্ধানী মানুষ। নগর-রাষ্ট্র মোটামুটি পরিকল্পিতভাবে গড়ে তোলা হত। রাস্তাঘাট নির্মাণ, পয়ঃপ্রণালী, পানীয় জল, পান্থশালা, চিকিৎসাব্যবস্থা, সংগীত-নৃত্য-নাটকের মতো বিনোদন-ব্যবস্থা, ধর্মচর্চার সুযোগ, বিচার-ব্যবস্থা, ব্যবসা-বাণিজ্যের সুযোগ, নাগরিকদের মতামত বিনিময়ের মতো সংস্থার সমিতি জাতীয় প্রতিষ্ঠান নগর-রাষ্ট্রের প্রয়োজনীয় শর্ত। এইসব শর্ত সর্বত্র প্রায়োগিক-সার্থকতা লাভ করত এমন নয়। নাগরিকরাও এই সুযোগগুলির সদ্ব্যবহার করত এটাও ভাববার অবকাশ কম। প্রাথমিক ধরনের নগর-রাষ্ট্রে মোটামুটি ব্যবসা-বাণিজ্যের সুবিধা ছিল, মনোরঞ্জনের বন্দোবস্ত ছিল, প্রলোভনের উপকরণ ছিল—যা বলাই বাহুল্য। নতুন নগর-রাষ্ট্রের বাসিন্দারা অনেকেই ভিন্‌দেশ থেকে আগত বা বিদেশি। এলাকার অধিবাসীরাও যে থাকত না এমন নয়। সুবিধাভোগী শ্রেণির মধ্য থেকে কখনো কখনো রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানও গড়ে উঠত। এই প্রতিষ্ঠান ক্বচিৎ প্রতিস্পর্ধী হয়ে দেখা দিত। তবে এমন প্রতিষ্ঠান প্রায়শ রাজার অন্নদাস হয়ে উঠত। এ-জাতীয় প্রতিষ্ঠানের মধ্যে অন্তর্দ্বন্দ্বজনিত গোষ্ঠীতন্ত্রের আবির্ভাব ঘটত। স্বাধিকার-চেতনা কথার কথা হলেও কখনো কখনো তা ভয়াবহ-সংকট ডেকে আনত। সি. ডি. বার্নস এথেন্সের ব্যাপারে মন্তব্য করেছেন— 'Athenian Liberty became unproductive'। নগররাষ্ট্রে এর সম্ভাবনা সচরাচর ক্ষীণ। স্পার্টাতে সে সময় কিছুটা শৃঙ্খলা ছিল, কিন্তু এথেন্সে তার অভাব ছিল। নগর-রাষ্ট্রে স্বার্থপর গোষ্ঠীগুলি অন্তর্কলহে লিপ্ত

ছিল বলেই শৃঙ্খলার এই হতশ্রীদশা।

নগর-রাষ্ট্রের আলোচনায় এ প্রশ্ন সঙ্গত যে, নাগরিক কে। নগর-রাষ্ট্রের সকলেই কি সমান অধিকার সমান সুযোগ পেত? নাগরিক বলতে রাজশক্তির অধীন ক্রিয়াকর্মে যুক্ত থেকে নিয়মিত রাজস্ব দিয়ে অংশত স্বাধীন মতামত জ্ঞাপনের অধিকার লাভ করেন যিনি, তিনিই নাগরিক। তাঁর সামনে সমান সুযোগ ও অধিকার থাকে। নাগরিক রাষ্ট্রের ভাগ্যের সঙ্গে নিজের ভাগ্যকেও জড়িয়ে ফেলে। শুধু আনুগত্য বা স্বাতন্ত্র্য বা সম-অধিকারই নাগরিকের পরিচায়ক নয়, সামাজিক শৃঙ্খলার অনুকূলে তাঁর উপস্থিতি এক ধরনের রাজনৈতিক ক্রিয়াকলাপের অঙ্গীভূত সত্যও বটে। এমন বিশিষ্ট চরিত্রই নাগরিকের মধ্যে কাম্য।

অ্যারিস্টটলের বহুচর্চিত উক্তি : ‘State is prior to the individual’—এই মতটি অনেকে পছন্দ করেন না। তাঁর উক্তির ভিন্ন অর্থ সম্ভব। রাষ্ট্রের ধারণা একটি আধুনিক ধারণা। পৃথিবীর যে কোনো অংশে, নির্ধারিত ভূ-খণ্ডে, একটি ভৌগোলিক পরিবেষ্টনীতে মানুষের বসবাস-জীবনযাপনের রীতি-নীতি প্রক্রিয়ার মধ্য থেকে উদ্ভূত হয় রাষ্ট্রের প্রাথমিক ধারণা। এমন ধারণা কিছুটা অধিবিদ্যামূলক বা মেটাফিজিক্যাল ধারণার সমগোত্রীয়। আধুনিক রাষ্ট্রের মূলে দেখা যায় জনগণের মনে কর্তৃত্বের ধারণার আবির্ভাব। এমন ধারণার প্রতি তাদের আনুগত্য (obligation) তৈরি হয়। ভারতের প্রাচীন ইতিহাসের উপাদান দুর্লভ, তাই রাষ্ট্রচেতনার প্রাথমিক রূপটি অনুমাননির্ভর। ভারতের পুরাতন প্রতিষ্ঠানগুলি সম্পর্কে সাধারণ ধারণা হল, সেগুলি ধর্মনির্ভর ও আধ্যাত্মিকভাবনাপুষ্ট। তবে এ-ধরনের প্রতিষ্ঠানের রাজনৈতিক গুরুত্ব কম নয়। বি. এ. সেলটারের ভাষায়... ‘...some of the ideas which came latter on to have a profound political significance, were nothing but concepts couched in a religious mould.’ ‘স্টেট এ্যান্ড গভর্নমেন্ট ইন এনসিয়েন্ট ইন্ডিয়া’য় এ. এস. অ্যালটেকার প্রাচীন ভারতের অধিকাংশ প্রতিষ্ঠানকে ‘Divine agency’ হিসাবে লক্ষ করতে বলেছেন, তাই ‘রাষ্ট্র’ও এমন ধারণার বাইরে নয়। ভারতে রাষ্ট্র-ধারণার সঙ্গে বিজড়িত সমাজ সম্পর্ক। সমাজের সঙ্গে সমষ্টির সম্পৃক্তি। আবার, সমাজ বললেই বুঝতে হয় অর্থনৈতিক-রাজনৈতিক- ধর্মনৈতিক গূঢ় সম্পর্কও। বৃহৎ শক্তিগোষ্ঠী ও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শক্তিগোষ্ঠীর পারম্পর্যে সম্পর্কানুগ তথা সমন্বিত যে রাষ্ট্র-সত্তা, তার প্রকৃতি ও স্বাতন্ত্র্যের মধ্যেই রয়েছে রাষ্ট্র-ধারণার সুপ্ত বীজ।

ভারতে রাষ্ট্র-ধারণা খুব পরিষ্কার নয়। তত্ত্বগত দিক থেকে এই ধারণা উপলব্ধিসাপেক্ষ। এই ধারণা আধুনিক। বড়ো জোর তিন-চারশো বছরের পুরনো। ‘State’ কথাটার মধ্যেও এর অর্থ খুঁজে পাওয়া দুরূহ। ‘State’ কথাটার মধ্যে আধুনিককালে রাজনৈতিক সংস্রব দুর্লক্ষ্য নয়। ‘City-State’ কথাটার মধ্যেও এমন অস্পষ্টতা স্বাভাবিকভাবে রয়েছে। গ্রিস বা এথেন্সের ‘সিটি-স্টেট’গুলিও অনুমানমূলক। তত্ত্বের দিক থেকে সিটি-স্টেটের কয়েকটি বৈশিষ্ট্য বোঝা যেতে পারে। জনসমষ্টি, একটি সুসংহত গোষ্ঠী, সংহত সমষ্টিগত সত্তা,

ব্যক্তিক স্বাতন্ত্র্য, বিশেষ মানসিক প্রকৃতি ইত্যাদি ছাড়াও আবশ্যিক উপাদান হল— ব্যবসা-বাণিজ্য-বিদ্যাকেন্দ্র-ক্লাব-সভা-সংস্থা-মন্দির-সংগঠন ইত্যাদিক্র সিটি-স্টেটে এই বিষয়গুলি গুরুত্বপূর্ণ। সিটি-স্টেটে সংগঠিত জনসমষ্টির ভূমিকা মূল্যবান। জনসমষ্টি, কিন্তু এরা ভিড়ের জনতা নয়, সচেতন মানুষ, সিদ্ধান্ত নিতে সক্ষম, নিজস্বতা প্রকাশ করতে পারে। কথা বলতে পারে। 'রাষ্ট্র' তাই একটি সংগঠিত, সুসংহত ও পরিকল্পিত গোষ্ঠীরই ধারণা বহন করে।

ভারতে রাষ্ট্র-ধারণার পেছনে সম্পত্তি, পরিবার, জাতি-বর্ণ-শ্রেণির কর্তৃত্ব ছিল বলে রোমিলা থাপারের অভিমত। সামাজিক স্তরবিন্যাসের ক্ষেত্রে কেন্দ্রীভূত রাজনৈতিক শক্তির আত্মপ্রকাশের মধ্যে রাষ্ট্র-ধারণা বিদ্যমান ছিল। নানা গোষ্ঠী শক্তি-অর্জনের পথে কেন্দ্রীয় নিয়ন্ত্রণের ভারগ্রহণের মধ্য দিয়ে রাজনীতির যেমন উন্মেষ, তেমনি রাষ্ট্রেরও উন্মেষ। রাষ্ট্র-ধারণায় জনসংখ্যার গুরুত্ব অপরিসীম— রোমিলা থাপারের এমন অভিমত অত্যন্ত যুক্তিপূর্ণ। জনসংখ্যা রাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রক তথা চালিকাশক্তি হয়ে দাঁড়ায়। উৎপাদন-ব্যবস্থা ও উৎপাদন-সম্পর্কের সঙ্গে এরা যুক্ত থেকে রাষ্ট্রের অস্তিত্ব প্রকাশ করে, 'Surplus' তৈরি করে, এক অব্যাহত প্রক্রিয়ায় অটুট রাখে রাষ্ট্রশক্তিকে। প্রয়োজনীয় উৎপাদনে লিপ্ত থেকে জনগণ রাষ্ট্রকে গতিসম্পন্ন করে তোলে। অ্যালটেকার রাষ্ট্রের একাধিক রূপের (form) কথা তুলেছেন— যেমন, 'republics', 'oligarchies', 'diarchies', 'monarchies' ইত্যাদি। প্রাচীন ভারতে 'monarchies' -এর প্রাধান্য সর্বজনস্বীকৃত। হিন্দুরাজ্যগুলি 'ট্রাস্ট' হিসেবে গণ্য হয়ে এসেছে। কালকেতুর গুজরাট নগরীতে নগর-রাষ্ট্রের এমনই একটি ছায়ার দেখা মেলে।

চার

ধর্ম-জাতি-বর্ণ-শ্রেণি বিন্যাস

কালকেতু সাত কোটি তঙ্কা লাভের পর গুজরাটের জঙ্গাল পরিষ্কার করে শুরু করেছেন নগর নির্মাণের কাজ। রাজা কালকেতু সকলকে আহ্বান জানিয়েছেন তাঁর নগরীতে বসবাসের জন্য। সাদর সম্ভাষণ জানিয়েছেন বিভিন্ন জাতি-গোষ্ঠী-বর্ণের প্রতিনিধিদের পান দিয়ে। তাঁর আবেদন প্রচারিত হয়েছে বেশ কিছু শর্ত ও 'কনসেশন'সহ—

আমার নগরে বৈস যত ইচ্ছা চাষ চষ
তিন সন বহি দিহ কর।
হালে হালে এক তঙ্কা কাহারে না কর্য় শঙ্কা
পাট্টায় নিশান মোর ধর॥
নাহি লব বাউড়ি দেড়ি রয়্যা বস্যা দিহ কড়ি
ডিহিদার নাহি দিব দেশে।
সালামি বাঁশগাড়ি নানা বাবে যত কড়ি
নাহি লব তো সভার পাশে॥

তখনকার শাসকবর্গ যে-ভাবে বা যে-পদ্ধতিতে খাজনার ব্যাবৃদ্ধি ঘটিয়ে প্রজাশোষণ করত, ব্যাধ-বংশীয় রাজা কালকেতু তার বিরুদ্ধ দৃষ্টান্ত রাখতে তৎপর হয়েছেন সর্বপ্রথমে। কিছু সুবিধে, কিছু আশ্বাস, কিছু শর্তাদি দিয়ে প্রজাপত্তনের অভিনব নমুনা রেখেছেন কালকেতু। সেই সঙ্গে তাঁর ঘোষণা : 'অঙ্ক নাহি বাড়াইব পুরে।' অর্থাৎ মানুষের ওপর ট্যাক্সের বোঝা চাপাবেন না। আন্তরিক এই আবেদনে যথেষ্ট সাড়া পড়েছে, সন্দেহ নেই। মানুষ আশ্বস্ত হয়েছে এবং নতুন নগরীতে ধাতস্থ হতে চেয়েছে।

বহু জাতি বহু ধর্ম বহু বর্ণের মানুষ একত্র বসবাসের অভিলাষে হাজির হয়েছে গুজরাট নগরীতে। বিচিত্র জাতি ও বর্ণের মানুষের একত্র অবস্থান ও বসবাস গ্রামে বোধকরি সম্ভব নয়, নগরে যা সম্ভব। হিন্দু ও মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ই কালকেতুর নগর-রাষ্ট্রে উপস্থিত। বহু বৃত্তি ও জীবিকার মানুষ নগর-রাষ্ট্রে এসেছে অর্থনৈতিক উন্নতির অভিপ্রায় নিয়ে। এক ব্যাধ প্রতিষ্ঠিত নগর-রাষ্ট্রে বিবিধ বৃত্তি ও জাতি-বর্ণের উপস্থিতি মনে করিয়ে দেয় যে কোনো বিশেষ সম্প্রদায়ের জন্য নয় এই নগর, এ-এক নবতম আধুনিক নগর-রাষ্ট্র। আধুনিক নগর-রাষ্ট্রে হিন্দু-মুসলমান বসবাস করছেন একত্রে, এর অর্থ পাশাপাশি বাড়িতে বাস করছেন এমন নয়। স্বতন্ত্র বসতি-গঠনের পুরাতন ভারতীয় ঐতিহ্য মেনে নিয়েই এই নগরী প্রতিষ্ঠা। হিন্দুদের বর্ণ-জাতি-শ্রেণিস্তর যেমন মান্য করা হয়েছে তেমনি মুসলমানদের শ্রেণি-বর্ণ-স্তর মান্য করা হয়েছে। ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয় ('বৈসে যত রাজপুত'), বৈশ্য ('বৈসে বৈশ্য মহাজন'), শূদ্রাদি বিবিধ জাতিস্তর (caste) পাড়ায় পাড়ায় বসতি গড়েছে। নগরীর পশ্চিমদিকে কালকেতুর আমন্ত্রণে 'বৈসে যত মুসলমান'। 'সৈয়দ মৌলানা কাজি' অভিজাত মুসলমান। সৈয়দ ফতিমার বংশধর; 'আলিম' হলেন বিশেষ পণ্ডিত; শেখ, পীরগণ সাধারণের শ্রদ্ধার পাত্র। অনিলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় লিখেছেন, 'তুর্কি, পাঠান এবং আরবজাতীয় সৈয়দ ও শেখ শ্রেণিভুক্ত উচ্চস্তরের মুসলমানেরা নিম্নস্তরের মুসলমানদের সঙ্গে বৈবাহিক সম্বন্ধ স্থাপন করত না। হিন্দুদের জাতিভেদ প্রথার মত সামাজিক বৈষম্য মুসলমান সমাজেও প্রচলিত ছিল, কিন্তু মুসলমান সমাজে এই বৈষম্যের কঠোরতা অপেক্ষাকৃত কম ছিল।... বহিরাগত মুসলমান এবং ভারতীয় মুসলমানদের মধ্যে রাজনৈতিক ও সামাজিক প্রতিদ্বন্দ্বিতা মধ্যযুগের ইতিহাসের একটি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য।' (মধ্যযুগে বাংলা ও বাঙালী, কে, পি বাগচী এ্যাণ্ড কোং, ১ম সং, পৃ. ৪১) নগররাষ্ট্রে অনভিজাত মুসলমান সম্প্রদায়ের বেশিরভাগই এসেছে বিশেষ বিশেষ বৃত্তি নিয়ে জীবিকার অন্বেষণে। রোজা-নামাজ রক্ষা করে না যারা, তাদের 'গোলা' বলে। তাঁত যারা বোনে তারা জোলা। বলদ গোরু-বেয়ে যাদের জীবিকা তারা মুকেরি। পিঠে বিক্রি করে পিঠারি। হিন্দু হয়ে মুসলমানধর্ম গ্রহণকারী 'গরসাল'। এমনতর কত বৃত্তি— সানাকার-তীরকর-কাগজি-দরজি-বেনটা প্রভৃতি। নগর-রাষ্ট্রে প্রাথমিক চাহিদাগুলি পূরণের জন্যে বৃত্তিধারীদের ভূমিকা অতীব মূল্যবান।

ভারতীয় ঐতিহ্যই নতুন নগর-রাষ্ট্রের চারিত্র্য। হিন্দু নিয়মতন্ত্রের অনুশাসনই তার স্বরূপ। তবু এর অন্য রকম বৈশিষ্ট্য— অসাম্প্রদায়িক মনোভঙ্গি।

পাঁচ

এখানে নগর-রাষ্ট্রের অন্যান্য বৈশিষ্ট্যগুলি আলোচনা করা হল—

রাজস্ব

এই নতুন নগর-রাষ্ট্রের রাজস্ব আদায়ের দুটি প্রধান ক্ষেত্র হল— কৃষি ও ব্যবসা-বাণিজ্য। কৃষি-মনস্কতার পাশাপাশি বাণিজ্যিক-মনোভাবের উন্মেষ এই নগর-রাষ্ট্রের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। সামন্ততন্ত্রের পরিপোষক এই বাণিজ্য-শিল্প। কালকেতু সামাজিক শোষণ-সম্পর্ককে অগ্রাহ্য করেননি। তবে পূর্বতন রাজা বা জমিদারদের থেকে তিনি যে কোনো কোনো ক্ষেত্রে স্বতন্ত্র, এটা বোঝা যায় জনসাধারণের জন্যে ছাড়-ঘোষণায়, প্রজাদের সঙ্গে মানবিক-সম্পর্কে। সাময়িক 'কনসেশন' যেমন সাধারণের অর্থনৈতিক উন্নয়নের হেতু, তেমনি তা বাণিজ্য বৃদ্ধিরও কারণ।

জনসংখ্যা

কালকেতুর ছাড়-ঘোষণার লক্ষ্য ছিল জনসংখ্যাবৃদ্ধি। এবং জনসংখ্যা বৃদ্ধির অর্থ হল প্রচুর জমির বণ্টন, রাজস্ব আদায়ের ক্ষেত্র প্রস্তুত করা এবং উৎপাদন-সম্পর্কে জনসাধারণকে বিজড়িত করা। তাছাড়া রাষ্ট্রের স্থায়িত্বকরণের ক্ষেত্রে জনসংখ্যাবৃদ্ধির বিষয়টি তাৎপর্যপূর্ণ। উৎপাদনবৃদ্ধি, উৎপাদন-সম্পর্কের প্রসারণ, উৎপাদক ও বৃত্তিজীবী মানুষের আগমনে রাষ্ট্রের ধনবিকাশের শর্ত-সম্পূরণও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এই সম্পর্ক তাই নির্ণায়ক ভূমিকার দাবি রাখে। গুজরাট নগরে দ্রুত জনসংখ্যা বৃদ্ধি ঘটেছে বলে মনে হয়। কেননা, পার্শ্ববর্তী কলিঙ্গনগরে অকস্মাৎ বন্যায় অসংখ্য মানুষ গৃহহারা ও সর্বস্বান্ত হয়ে পড়েছিল। ঠিক সেই সময় কালকেতু নগর-রাষ্ট্রে বসবাসের জন্য বিশেষ ছাড় ঘোষণা করেছিলেন। দৈবী-বিপর্যয়কে সাধারণ মানুষ রাজার অভিশাপও ভেবে থাকবে। তাই অভিশপ্ত দেশ ত্যাগ করে উদ্বাস্তুপ্রায় হয়ে কালকেতুর নগর-রাষ্ট্রের বাসিন্দা হওয়ার বাসনা প্রকাশ করেছিল। গুজরাট নগরী যে সত্যই নগর-রাষ্ট্র এটা বোঝা যায় লক্ষাধিক মানুষের আগমনে : 'ত্যাগ করি কলিঙ্গে/ লক্ষ ঘর প্রজাসঙ্গে/ একস্থানে করিব বসবাস।' 'লক্ষ' শব্দটি বাচনিক অর্থে গ্রহণ না-করার যুক্তি নেই। গ্রাম-গঞ্জ পত্তনের জন্যে লক্ষ লোকের প্রয়োজন হয় না। কিন্তু নগর-রাষ্ট্রের জন্যেই চাই লক্ষ লক্ষ জনতা। ঘন-বসতিপূর্ণ একটি নগর-রাষ্ট্র। নানা দেশ থেকে আগত অসংখ্য অধিবাসী 'একস্থানে' নিবাস করতে চেয়েছে, সমাজবদ্ধ হতে চেয়েছে, সামাজিক অভিজ্ঞতা তো ছিলই তাদের, তবু তারা নতুন করে নগর-অভিমুখী হতে চেয়েছে, সুখ শান্তি স্বাচ্ছন্দ্যের সচ্ছলতার কারণে। সেই কারণে এই ভিড়।

পারিপার্শ্বিকতা, যোগাযোগ ইত্যাদি

গুজরাট নগরী জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে। লোকজনের আগমন শুরু হয়েছে। যোগাযোগ-ব্যবস্থা গড়ে তোলা হচ্ছে। স্থল-যোগাযোগ ও জল-যোগাযোগ দুই-ই ব্যবস্থার ওপর ঝোঁক পড়েছে। যাতায়াতের গুরুত্ব বাড়ছে। যানবাহন বলতে সাবেককালের গোরু-মোষ গাড়ি,

নৌকা, পাল্কি ইত্যাদি। 'বেরুনিঞা জন আনি বান্ধে নদী পানী'— গোলাহাটের কাছেই নদীর জল বাঁধার কাজ চলছে। এর দুটি কারণ অনুমান করা চলে। প্রথাগত নদী-জল বাঁধার কারণ সেচ-কাজের সুবিধা গ্রহণ এবং দ্বিতীয়ত মনে হয়, নদী যেহেতু দূরে, সেইহেতু খাল কেটে তা গোলাহাটের সংলগ্ন করে তোলা। হাটুরে লোক যাতে নৌকা করে মালপত্র সহজে বহন করতে পারে। প্রসঙ্গত প্রশ্ন উঠতে পারে, ভারতের নগর-গঞ্জগুলি গড়ে উঠেছে বিশেষত নদ-নদীকে কেন্দ্র করে। কিন্তু কালকেতুর নগর-রাষ্ট্র নদী থেকে দূরে গড়ে তোলা হল কেন? অনুমান করা চলে, এর আসল কারণ হল বন্যা। পার্শ্ববর্তী কলিঙ্গ নগরী প্রবল বন্যায় ভেসে গেছে। অভিজ্ঞাতাটি বেশি দিনেরও নয়। তাই নদীর থেকে কিছুটা দূরেই গড়ে তোলা হয়েছে এই নগর-রাষ্ট্রটি। আমোদর-দামোদর-সরযূ-সিলাই-চন্দ্রভাগা-কুবাই-দাবাই-বগাটির খাল-মুণ্ডাই-গোদাবরী-বুড়া মন্তেশ্বর-অজয়-কংসাবতী-বামন্যা-স্বর্ণরেখার সময়বিশেষের জলস্ফীতি কী ভয়াবহ পরিস্থিতি তৈরি করতে পারে, সেই অভিজ্ঞতাই বোধহয় কালকেতুকে নদী থেকে দূরে নগরী নির্মাণে উৎসাহিত করেছে।

বাণিজ্যকেন্দ্র

গোলাহাটকেন্দ্রিক ব্যবসা-বাণিজ্য কেন্দ্র হিসেবে এই নগর-রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠা। গোলাহাটকে ঘিরে নগরায়ণ। হাটে আসে এলাকার বাইরের ব্যাপারীরা। আমদানি-রফতানির মস্ত কারবার চলে। বাণিজ্যকেন্দ্র থেকেও অর্জিত হয় রাজার রাজস্ব ও কর। হাটের পণ্যাদির অন্যতম হল লবণ। এ ছাড়া পাওয়া যায় দৈনন্দিনের প্রয়োজনীয় উপকরণ— তৈল-দধি-শাক-সব্জি-গুয়া-পান-গুড়-ধান-সরিষা-মসুর; এই গোলাহাট থেকেই কালকেতু ক্রয় করেন 'হীরা-নীলা-মোতি-পলা'। ক্রয় করেন সহজলভ্য যুদ্ধাস্ত্রও— 'কেনে বীর কামান কৃপাণ', 'কিনিল অভেদ্য চর্ম্ম', 'কিনিল মহিষা ঢাল'। হাতি-ঘোড়াও গোলাহাটের অন্যতম পণ্য। সাধারণভাবে বলা চলে যে, গোলাহাটের বাণিজ্যকেন্দ্রটি কৃষিজীবী মানুষকে কেন্দ্র করেই গড়ে উঠেছে। গোলাহাট আগে থেকেই ছিল, কালকেতুর রাজা হওয়ার আগে থেকেই। নগরসভ্যতার বিকাশ স্বভাবতই বাণিজ্যকেন্দ্রকে অবলম্বন করে গড়ে উঠেছে। গ্রামীণ জীবনধারার বিপরীতে হাঁটতে চেয়েছে নগরীর মানুষ। 'বাণিজ্যে বসতে লক্ষ্মীঃ'। নৌকা সাজিয়ে 'কেহ নানা দেশ যায়, শঙ্খ চন্দন কিনি আনে'; নতুন নগর-রাষ্ট্রে 'বৈশ্যজন সুখী', বাণিজ্যের শ্রীবৃদ্ধিই এর কারণ : 'এক বেচে আর কেনে নিতি নিতি বাড়ে ধনে।' বণিক মানুষের আগমনে নতুন নগর-রাষ্ট্রের ধনবিকাশের প্রচলিত শর্তই পালিত হয়েছে। বৈশ্য-মহাজনরা অবশ্য প্রথমদিকে কৃষিকর্ম, গোরক্ষণ আর কৃষ্ণভজনায় মনোনিবেশ করেছিল। বসতি স্থাপনের প্রস্তুতিপর্বে ঋণদানের সম্ভবত প্রয়োজন পড়েনি। রাজা কিছু কিছু সুযোগ দিয়েছিলেন। ধীরে ধীরে তারা নগরে জাঁকিয়ে বসে এবং ধনবৃদ্ধির ক্ষেত্রে সদর্থক ভূমিকা পালন করে।

উৎপাদক শ্রেণি তথা শ্রমজীবীর ভূমিকা

নতুন নগর-রাষ্ট্রে নগরায়ণের প্রয়োজনে হাজির হয়েছে অসংখ্য বৃত্তিজীবী মানুষের

সঙ্গে সঙ্গে শ্রমজীবী মানুষ। শ্রমজীবী মানুষেরাই তো নগরের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা। তাদের অবদানে অতি দ্রুত নগরীর নির্মাণ কার্য সম্পন্ন হয়েছে। 'বেরুনিঞা জন'ই প্রথম জঙ্গল কেটে বসতি-নির্মাণ প্রকল্পে যোগ দেয়। এই বেরুনিঞারা কোনো বিশেষ জাতি-গোষ্ঠী বা সম্প্রদায়বিশেষ নয়। হাফরমালী-ভরদ্বাজী-মারাটি—এরাই দরিদ্র শ্রমজীবী মানুষ। এরা জন-মজুর। বেরুনিঞারাও সম্ভবত দিনমজুর এবং কাজের আশায় 'আইসে তারা নানা দেশ হৈতে।' রাজা তাদের 'গুয়া পান' দিয়ে স্বাগত অভ্যর্থনা জানিয়েছেন। উত্তরদিক থেকে এসেছে 'দাসমন', 'দক্ষিণদেশ থেকে এসেছে 'বিকর্তন', পশ্চিম দিক থেকে এসেছে মুসলমান শ্রমজীবীরা। মোটামুটিভাবে এদের একটা পরিসংখ্যানও পাওয়া যাচ্ছে—উত্তরদিকে কর্মরত 'শতেক জন'; দক্ষিণ দিকে 'পঞ্চশতজন'; পশ্চিমপ্রান্তে দফর মিঞার ঠিকেদারিতে ও নেতৃত্বে বাইশ হাজার। সম্ভবত পঁচিশ হাজার ঠিকা-মজুর-শ্রমিক লাগাতার বনকর্তনে অংশ নিয়েছিল। এরা ঠিকাদারের অধীনে শ্রমশক্তি ব্যয় করেছে। নতুন নগরে প্রচুর শ্রমজীবী গৃহনির্মাণে, রঞ্জনকর্মী রঙ করার কাজে এসেছে। 'কবি বিশ্বকর্মা ওরফে বিশাই, বিশ্বকর্মাপুত্র দারুবর্মা এবং সঙ্গে 'বন্ধু-জ্ঞাতি-নাতি'-দের গৃহনির্মাণে দায়িত্বশীল ভূমিকার কথা উল্লেখ করেছেন। 'পোড়াইল ইঁট-পাঁজা'—পাকা বাড়ির প্রয়োজনীয়তা নতুন নগর-রাষ্ট্রে দেখা দিয়েছে। অনুমান করা চলে, ইঁট-ভাটার কাজেও বহু মজুর ও মেহনতি জনতা এসেছে। ইতিমধ্যেই মন্দির-মসজিদ-নাটশালা-বিষ্ণুর দেউল-অনাথ মণ্ডপ-পাকশালা ইত্যাদি গড়ে তোলা হয়েছে। সূত্রধরও নগরী গড়তে বড়ো ভূমিকা নিয়েছে। নগরের গৃহনির্মাণে 'বেরুনিঞা জন'-এরও বিশেষ ভূমিকার কথা উল্লেখ করেছেন কবি। নতুন নগর-রাষ্ট্র নির্মাণে এইসব শ্রমজীবী মানুষের উপস্থিতি ও পরিশ্রম, বন্য জন্তুদের বিরুদ্ধে ভয়ানক লড়াই, ঘর-বাড়ি-রাস্তা-ঘাট নির্মাণে দক্ষতা—নগরায়ণের প্রস্তুতিতে তাদের এই ভূমিকা কাব্যে শ্রদ্ধার সঙ্গে স্বীকৃতি লাভ করেছে। মজুরির উল্লেখ নেই, তবু অনুমান করা চলে যে, মজুরি-মূল্য নির্ধারিত হয়েছে রাজা কর্তৃক। আমলাতন্ত্রের উল্লেখ প্রস্তুতি পর্বে নেই।

সামরিক-পরিকাঠামো

নগর-রাষ্ট্রের প্রধান প্রতিষ্ঠাতা রাজা। রাজাই সামরিক বাহিনীর সর্বাধিনায়ক। কালকেতুকে প্রথমেই মনোনিবেশ করতে হয়েছে সামরিক পরিকাঠামো নির্মাণে। কালকেতু গোলাহাট বাণিজ্যকেন্দ্র থেকে সহজপ্রাপ্য কিছু সামরিক সরঞ্জাম ক্রয় করেছেন। পার্শ্ববর্তী রাজন্যবর্গের কারণে কালকেতুর একটা আশঙ্কা ছিল। তাই এই সতর্কতা। 'লইয়া টাকার পাট' কালকেতু ছুটেছেন গোলাহাটে। কিনেছেন হাতি ও ঘোড়া— 'গজ কেনে পর্বতের চূড়া' আর 'পার্বত্য টাঙ্গন তাজি'। যুদ্ধের জন্য তো বটেই, দ্রুত যান হিসেবে এর গুরুত্ব বুঝেছেন এবং 'যুদ্ধের জানিয়া মর্ম্ম কিনিল অভেদ্য চর্ম্ম'। অস্ত্রাদির মধ্যে তেমন নতুনত্ব নেই। পুরোনো ধরনের অস্ত্র—

কিনিল মহিষা ঢাল তাড়িপত্র করবাল

মুঠ যার রচিত পুরট।
তবক বেলক টাঙ্গি ভিন্দিপাল শেল সাঙ্গি
ভূষণ্ডী দারুণ খরশান।
হীরামুটি যমধর পট্টিশ খেটক শর

ব্যতিক্রম রয়েছে— 'কেনে বীর কামান কৃপাণ'। এদেশে প্রথম কামান ব্যবহার করেন সম্রাট বাবর। পানিপথের যুদ্ধে এই কামান ব্যবহৃত হয়েছিল। কোনো নগর-রাষ্ট্রে কামানের ব্যবহার আধুনিকতার পরিচয় বহন করে। নগরে এসেছে এক শ্রেণির অস্ত্র-বিক্রেতা, জাতিতে তারা বাগদি। অস্ত্রবিক্রেতারা 'দশ বিশ পাইক সঙ্গে' করে ফিরছে। গুজরাটে, মনে হতে পারে, অস্ত্রের খোলা বাজার রয়েছে। আমরা মনে করতে পারি যে, জনসাধারণও প্রয়োজনে অস্ত্রাদি কিনতে পারত। মহাজন-ব্যবসায়ী-অভিজাত ধনী সম্প্রদায় প্রয়োজনে বাগদিদের ভাড়াটে সেনা হিসেবে নিয়োগ করতে পারত। এরা হল ব্যক্তিগত সেনা। কলিঙ্গা-যুদ্ধে কালকেতু এদেরই ব্যবহার করে থাকবেন। প্রথমদিকে সামরিক-সামর্থ্য সেভাবে অর্জন না করলেও কয়েকটি জরুরি ক্ষেত্রে নজর দিয়েছেন।

গড় হল সামরিক দিক থেকে সবিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। উল্লেখ আছে—

পাষাণে রচিত গড় দ্বারে মত্ত হাতী বড়
নিয়োজিত চৌদিকে কামান।
পদাতি সারথি রথী কত শত সেনাপতি
সেনা ভরে মহী কম্পমান॥

দ্বারে হাতি অর্থাৎ হাতির পিঠে সেনারা সজাগ। গড়ে বসেছে কামান। গড়ে তোলা হয়েছে পদাতিক সেনা। 'কত শত সেনাপতি'— এক একজন সেনাপতির নেতৃত্বে বিশেষ বিশেষ বাহিনী। কালকেতু সামরিক শক্তিতে কিছুটা আস্থাবান হয়েছেন— 'কাহারে না করে শঙ্কা'। তবে পার্শ্ববর্তী কলিঙ্গা-রাজ্যের সেনাসংখ্যার উল্লেখ পাওয়া যায়— 'সঙ্গে নব লক্ষ কাল'। কালকেতুর সেনা-সংখ্যার উল্লেখ নেই।

নতুন নগর রাষ্ট্রে জনসংখ্যার বিষয়টি মনে রাখা দরকার। পার্শ্ববর্তী রাজ্যের মতো এতো সেনা সংগ্রহ তাঁর পক্ষে সম্ভব নয়। কালকেতু খুব সম্ভব এত সেনা সংগ্রহ করতে পারেননি বলেই কলিঙ্গা-যুদ্ধে পরাজয় এড়াতে পারেননি। নগর-রাষ্ট্রের পত্তনের পরে পরেই এই যুদ্ধাভিযান কালকেতুর যথেষ্ট ক্ষতি করেছে এবং রাষ্ট্রের প্রচুর সম্ভাবনা বিনষ্ট করেছে। কালকেতুর নগর-রাষ্ট্রে সামরিক পরিকাঠামো নির্মাণের পাশাপাশি আরো কয়েকটি দুর্বলতা দৃষ্টি এড়ায় না। যুদ্ধের কৌশল, গুপ্তচর নিয়োগ ইত্যাদি ক্ষেত্রে কালকেতু ততটা তৎপরতা দেখাতে সমর্থ হননি। গুপ্তচর-প্রথা যে-কোনো রাষ্ট্রের গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। যুদ্ধ-কৌশলও একটি অনুশীলনধর্মী অভ্যাসের বিষয়। কালকেতু ব্যক্তিগতভাবে যথেষ্ট বীর হলেও তাৎক্ষণিক কৌশল ও বুদ্ধি-চাতুর্যের ক্ষেত্রে পরিণত ভাবনার পরিচয় দিতে পারেননি। অবশ্য কালকেতু স্বল্পসময়ে এই দিকে মন দেবার হয়তো অবকাশও পাননি।

প্রশাসন ও বিচার

প্রশাসনিক কাঠামোর মধ্যেই রাষ্ট্রচিন্তার বীজ খোঁজা যেতে পারে। কিন্তু কালকেতু কি প্রাচীন ভারতীয় সপ্তাঙ্গতত্ত্ব বা অষ্টাঙ্গিকাতত্ত্ব সম্পর্কে অবহিত ছিলেন? সপ্তাঙ্গতত্ত্বে রাজা ছাড়াও অমাত্য, জনপদ, দুর্গ, কোষ (রাজকোষ), দণ্ড, মিত্র— এসব অতীব গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। পাত্র-মিত্র-অমাত্য-এর কাঠামো কালকেতুর নগর-রাষ্ট্রে সুলভ নয়, অর্থাৎ আমলাতন্ত্র সেভাবে গড়ে ওঠার সংবাদ নেই। ভাঁড়ু দত্তকে হাটের তোলা আদায়ের ভার দেওয়া হয়েছিল, পরে তাকে ভর্ৎসনা করে বিতাড়িত করা হয়। মিত্র-রাষ্ট্র গড়ে না তুললে, বৈদেশিক নীতি গড়ে না তুললে, কোষাগার গড়ে না তুললে, বিচার ব্যবস্থা গড়ে না তুললে— রাষ্ট্রতত্ত্বের প্রাথমিক ধারণাই ব্যাহত হতে বাধ্য। রাজস্ব আদায়ের জন্য প্রশাসনিক কাঠামো নির্মাণের চেস্টা হয়েছে। সম্ভবত বিচার-ব্যবস্থাও গড়ে তোলার প্রয়াস শুরু হয়েছে। দণ্ডদানের ক্ষমতা তখনো রাজার হাতে ন্যস্ত। মোগল আমলে প্রত্যন্ত অঞ্চলেও কাজীর বিচার কায়েম ছিল।

ধর্মচর্চাকেন্দ্র

হিন্দু-মুসলমানের সম্মিলিত নগর-রাষ্ট্রে হিন্দুদের জন্যে মন্দির আর মুসলমানদের জন্যে গড়ে তোলা হয়েছে মসজিদ। কালকেতুর সপ্তমহল রাজপ্রাসাদে গড়ে তোলা হয়েছে চণ্ডিকার দেউল। দেবমন্দির নানাচিত্র শোভিত : 'নানাচিত্র লিখে...।' নগরচত্বর মাঝে গড়া হয়েছে শিবমন্দির। নতুন নগরে আগত নাগরিকগণ স্বচ্ছন্দে যেন পূজা-উপাসনা করতে পারে সেজন্যে 'বাসাড়ি জনের তরে/ দিঘল মন্দির করে।' হীরা-নীলাখচিত বিষ্ণুদেউলে বিচিত্র শীর্ষকলস স্থাপন করা হয়েছে রীতি অনুসরণ করে। মন্দিরের পাশাপাশি গড়ে তোলা হয়েছে অনাথমণ্ডপ আর অন্নশালা। রচিত হয়েছে দোলপিণ্ড বা দোলমঞ্চ। গুজরাট নগরী মন্দিরসমৃদ্ধ হয়েই গড়ে উঠেছে। গড়ে উঠেছে মসজিদ। 'পশ্চিমদিকেতে সেহ/ তুলিলা নমাজ-গৃহ/ দলিজ-মসজিদ নানা ছন্দে।' ধর্মভীরু মুসলমানগণ ফজর-সময়ে উঠে লাল মাদুর পেতে 'পাঁচ বেরি নামাজ' পড়ে। পীর-পয়গম্বরকে স্মরণ করে 'পীরের মোকামে দেয় সাঁজ।' কোরান পাঠ, রোজাপালন এসবও তাদের ধর্মচর্চার অঙ্গ। ধর্মান্তরিত গরসালগণও ধর্মচর্চার সঙ্গে জড়িত। ধর্মচর্চা নগর-রাষ্ট্রের নাগরিকের ঐতিহ্যিক ও স্বাধীন অধিকার হিসেবেই গণনীয়।

শিক্ষাচর্চা

নগর-রাষ্ট্রের প্রস্তুতি পর্বে শিক্ষা-দীক্ষার প্রয়োজন বিশেষভাবে অনুভূত হয়েছে। বেদবিদ্যা বহন করে সাড়ে নয়শত বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ নগরে উপস্থিত হয়েছেন। সামাজিক সম্মান ও মর্যাদা প্রাপ্ত হয়েছেন। এঁদের বিদ্যা-বুদ্ধি-পাণ্ডিত্যের খ্যাতি অচিরে ছড়িয়ে পড়েছে দেশের ভেতরে ও বাইরে। বাইরে থেকে তাই বহু পড়ুয়ারও আগমন ঘটেছে—

নানা দেশ হইতে আইসে পড়ুয়া বিদ্যার আশে

দেই বীর হয় গজদান।

নগর-রাষ্ট্রে বিদ্যাকেন্দ্র অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার। কালকেতু ব্যাধ জাতির মানুষ হয়েও, আপন শিক্ষার অসম্পূর্ণতা সত্ত্বেও এই দিকে মনোযোগী হয়েছেন। হিন্দুদের কাছে বেদবিদ্যা-শাস্ত্র-পুরাণ ব্যাকরণ ও নানাবিধ অলঙ্কারশাস্ত্র, ন্যায় ইত্যাদি পঠন-পাঠন বহুদিনের প্রাচীন ঐতিহ্য। সেই ঐতিহ্য এখানে অনুসৃত। মুসলমানের জন্যেও শিক্ষার সম্প্রসারণ শুরু হয়েছে। মাদ্রাসা-মক্তবের মাধ্যমে শিক্ষার সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে। শিশুশিক্ষার ভাবনাও এখানে লক্ষণীয়—

জত শিশু মুসলমান করিয়া দলিজখান
মকদ্দম পড়ায়ে পড়ানা।

বিনোদন

নগর-রাষ্ট্রের নাগরিকের জীবনে অবকাশ যাপনের বা বিনোদনের প্রয়োজনীয়তা কম নয়। 'গুণিজন ভাসে গীতনাটে'। গান আর নাটক—এই দুটির প্রতিই বিশেষ আগ্রহ। গুণিজন মনোরঞ্জনের উপকরণ হিসেবে গান ও নাটক বেছে নিয়েছেন ঠিকই, কিন্তু এসব কোথায় গীত হত বা মঞ্চস্থ হত তার হাল-হকিকৎ জানা দুঃসাধ্য। জনগণ কীভাবে কোথায় রসোপভোগ করত তাও জানার উপায় নেই। কী বিষয়ে লেখা হত নাটক? কোন্ পালা? কী গান গাওয়া হত? নগরে এসেছেন নানা লোকশিল্পীরা। 'গোহাল্যে গাইয়া গীত/ কোয়ালি ফিরয়ে নিত'—কোয়ালিরা কপিলাগীতি গাইত। এসেছে নাটুয়ার দল। এরা অঙ্গভঙ্গিসহকারে বাচিক অভিনয়ে অভ্যস্ত। 'পরমরঙ্গে' জনচিত্তে আনন্দলহর তুলত তারা। বোঝা যায়, সংস্কৃতির দু'রকম ধারা : অভিজাত ধারা—গীত ও নাট্যের মধ্যে রসোপভোগ চরিতার্থ করত, এবং অনভিজাত ধারা—লোকশিল্পীদের লোকায়ত সঙ্গীতে-নাটকে অবগাহন করত। বেণু-বীণা-তুরী-ভেরী-ধ্বনিমুখরিত নগরে প্রতি মঙ্গলবার নাট-গীতের আসর বসে। নগর-রাষ্ট্রের নাগরিকরা একটি সংহত জনগোষ্ঠী। মনোরঞ্জনের ব্যবস্থা তারা নিজেরাই করে নিতে সমর্থ। মনোরঞ্জনের জন্য আরও দুটি অন্যতম উপকরণ—মদ ও বারাঙ্গানা। নগর-রাষ্ট্রে এ এক নতুন অভ্যাস। শুঁড়িরা মদের পসরা বসিয়েছে নগরে। ঘরে জারে ভরা মদ। গ্রাম্যজীবনে সাধারণত মদ্যপানের খোলামেলা রেওয়াজ নেই। নগরে এই সুবিধে যথেষ্ট। বারবধূরাও এসেছে জীবিকার তাড়নায়—'লম্পট পুরুষ আশে/ বারবধূগণ বৈসে।' বারাঙ্গানা বৃত্তি ভারতে বহু পুরাতন পেশা।

স্বাস্থ্য-পরিষেবা

নতুন নগর-রাষ্ট্রে স্বাস্থ্য-সচেতনতা লক্ষ করার মতো। রোগ-শোকের বালাই নেই : 'যত বৈসে লোক/ নাহি রোগ শোক'। হাতুড়িয়া ডাক্তারের অভাব নেই নগর-রাষ্ট্রে। সেই সঙ্গে অসংখ্য বৈদ্যজন—সেন-গুপ্ত-দাশ-দত্ত-কর। বৈদ্যকজন বটিকার নির্দেশ দেয় আর ওঝারা তন্ত্র-মন্ত্রের মাধ্যমে প্রয়োগ-কৌশল দেখায়। কাঁখে খুঙ্গিপুঁথি নিয়ে রাঙা বস্ত্র পরে

একদল বৈদ্যক এসেছে। এরা তুক-তাক করে জ্বর-জ্বালা সারায়। দুরারোগ্য ব্যাধি দেখলে কৌশলে পলায়ন করে। দু'রকম চিকিৎসা-ব্যবস্থা : একটি চিরাচরিত আয়ুর্বেদ (বংশ পরম্পরায় দাশ-গুপ্ত-সেন প্রমুখ এই শাস্ত্রে পারঙ্গম), অন্যটি হল টোটকা-মুষ্টিযোগ। মারাঠা-রা এসেছে শল্যবিদ্যা নিয়ে। এরা চোখের ছানি কাটে : 'সুলঙ্গো পিলুই কাটে/ ছানি ফোঁড়ে চক্ষে দিয়া কাঁটা'। এখানে বলা দরকার যে, স্বাস্থ্য ক্ষেত্রে রাষ্ট্রীয় উদ্যোগের, পরিষেবার, কোনো উল্লেখ নেই। সবই ব্যক্তিগত উদ্যোগ। সচেতনতাই এখানে গুরুত্বপূর্ণ। নাগরিক-সচেতনতাই এখানে বড়ো কথা।

পানীয় জল-পরিষেবা

পানীয় জলের প্রয়োজন সবার আগে। তাই সপ্তমহল প্রাসাদের 'অন্তঃপুরে সরোবর করিল নির্মাণ'। ঘাট পাথরে বাঁধানো হল। 'সিংহদ্বার পূর্বে জলাশয়'— যেন কৌটিল্যের বিধি-নির্দেশ মেনে মূল তোরণের পূর্বে জলাশয় নির্মাণ করা হয়েছে। শুধু প্রাসাদকে কেন্দ্র করে নয়, 'প্রতি বাড়ি কূপের সঞ্চয়'ও লক্ষণীয়। রাষ্ট্র জমি দিয়েছে, বাড়িও গড়ে দিয়েছে অনেকের। কূপখননের বিষয়টিও মনে হয় রাষ্ট্রীয় উদ্যোগের ফল। নদী দূরে থাকায় দৈনন্দিনের ব্যবহার্য জলের প্রয়োজনে কূপখনন অনিবার্য হয়ে পড়েছে। জলের প্রয়োজন মেটানোই নগর-রাষ্ট্রের আশু-কর্তব্য, সন্দেহ নেই, কিন্তু সৌন্দর্য ও শোভাবৃদ্ধির কথাও নাগরিকেরা ভেবেছেন। তাই গড়ে তোলা হয়েছে 'সুরম্য-দীঘিতট'। নগর-রাষ্ট্রে দীঘি ও কূপ— এই দু'ধরনের পানীয়জল পরিষেবার বন্দোবস্ত করা হয়েছে। দীঘির জল সেচ-কাজেও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কৃষিজীবী মানুষেরা বরাবর দীঘির জল সেচের জন্যে ব্যবহার করেছে।

পরিবেশ সুরক্ষা তথা সচেতনতা

কালকেতু অরণ্যবাসী ছিলেন বলেই অরণ্যের মর্মটুকু বুঝেছিলেন। অরণ্য তাঁকে দিয়েছে অনেক। বেরুনিঞারা বন কেটে নগর গড়ে তুলতে সাহায্য করেছে তাঁকে। কালকেতু কিন্তু সমগ্র বনাঞ্চল ধ্বংস করেননি বলেই অনুমান। শোভা-সৌন্দর্যের কারণে ও পরিবেশগত কারণে গাছ-পালা-ফল-ফুল কিছু সংরক্ষণ করা হয়েছে। মানুষের প্রয়োজনকে আদিম জাতির মানুষ অগ্রাহ্য করেননি। শঙ্কর দেবতার জন্যে সম্পূর্ণ বেলবনই সংরক্ষিত।

কাঁটাল কদলি রাখিল গুআ
অশ্বত্থ রাখিল মূল বান্ধিয়া
রাখিল রুদ্রাক্ষ জায়ফল লবঙ্গ।
মালতী মল্লিকা নেহালী চাঁপা
ভুজঙ্গকেশর রাখিল জবা
টকর তুলসী রাখিল রাঙ্গান।
করুণা কমলা ছোলঙ্গা টাবা
তাল নারিকেল নগরে শোভা

শঙ্কর পূজিতে রাখিল বেলবন।
বটতরু রাখিল ষষ্ঠীর ধাম
মহাতরু রাখিল জনবিশ্রাম।।

জনগণই যে নগর-রাষ্ট্রের লক্ষ্য, এটা বোঝা যায়। জনবিশ্রামের জন্য 'মহাতরু' সংরক্ষণও এই লক্ষ্যেরই অন্তর্গত। প্রয়োজনগত, ঐতিহ্যগত, পরিবেশগত কারণ নগর-রাষ্ট্রে যথোচিত মর্যাদা পেয়েছে।

নাগরিক মৌল অধিকারসমূহ

রাজ-কর্তৃত্বে গণতান্ত্রিক বাতাবরণ প্রত্যাশা করা অবান্তর। কিন্তু নগর-রাষ্ট্রের ক্ষেত্রে এটাই কাম্য। নাগরিকের মৌলিক অধিকার সংরক্ষণের প্রশ্ন প্রাচীন ভারতে উত্থাপিত হয়নি, এমন নয়। প্রজাদের অভিযোগ ও ক্ষোভ সম্পর্কে রাজার সচেতনতা সর্বাগ্রে কাম্য। হাটুরিয়াদের আবেদনে কালকেতু তৎক্ষণাৎ ব্যবস্থা গ্রহণ করেছেন। এই সুসম্পর্কটুকুই কল্যাণকামী রাষ্ট্রের অন্যতম লক্ষ্য। 'চণ্ডীমঙ্গল কাব্যে' গণতান্ত্রিকতার একটি মূলমন্ত্র অন্তত ধ্বনিত হয়েছে—

যেজন যাহার শত্রু থাক মিত্রভাবে।
থাকিবে আনন্দে সবে কেহ না হিংসিবে।।

ভেদকে অস্বীকার করে, মিত্রত্ব স্থাপন করে, অহিংসাকে মূলমন্ত্র করে নগর-রাষ্ট্রে বসবাসের আয়োজন করা হয়েছে। গণতান্ত্রিকতার তথা ব্যক্তি-মর্যাদার কথাও এই রাষ্ট্রে উপেক্ষিত নয়— 'আপনি রাখিলে রহে আপন মহত্ত্ব'। আত্মবিকাশের লক্ষ্যও সামনে রয়েছে। সামন্ততন্ত্রে মানুষের মহিমাকে পুরোপুরি মুছে ফেলা সম্ভব হয়নি।

নাগরিকের বিবরণ

নাগরিকগণ সুস্থ-স্বস্থ-স্বচ্ছন্দ জীবনেই আগ্রহী। গ্রামীণ জীবনে যে শতচ্ছিন্ন মালিন্য আর দারিদ্র্য, নাগরিক জীবনে তার অপনোদন কামনা করেছে মানুষ। নাগরিক মানুষ আত্মপ্রাধান্য দাবি করে, তাকে প্রতিষ্ঠা করে। নাগরিক মানুষ যে বিলাসী প্রকৃতির, তার পরিচয় এ-কাব্যে যথেষ্ট—

জত বৈসে লোক তার নাহি শোক
সভার কৌশল বাসে।

সুগন্ধি চন্দন অঙ্গে বিলেপন
মাল্য শোভে কেশপাশে॥

রোগ-শোক নেই, দারিদ্র্য নেই, চাকচিক্যময় এই নাগরিক। গায়ে সুগন্ধি চন্দনের গন্ধ। কেশে মালা-জড়ানো। এবং—

নগরে নাগরি জনা কানে নম্রমান সোনা
বদনে কর্পূর সনে পান।
চন্দনে চর্চিত তনু জেন দেখি হেমভানু
তসর বসন পরিধান॥

নাগরিকের কানে সোনা। মুখে কর্পূরসহ পান। পরিধানে তসরের বস্ত্র। পোশাক-আশাক-অলংকারাদির মধ্যে দিয়ে গ্রামজীবন থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন এক মানুষকে খোঁজা চলে, যে রুচি ও সৌন্দর্যবোধে, আভিজাত্যে আর আত্মবোধে আপাদমস্তক নাগরিক মানুষ।

মুকুন্দ চক্রবর্তী ও রামানন্দ যতির ‘চণ্ডীমঙ্গল কাব্য’ : প্রসঙ্গ সামাজিক স্তরবিন্যাস ও গোষ্ঠীজীবন

বর্ণালী প্রামাণিক

মধ্যযুগীয় বাংলা সাহিত্যে ধর্মকেন্দ্রিক আখ্যানকাব্যের একটি জনপ্রিয় ধারা হল মঙ্গালকাব্য। মনসামঙ্গাল, চণ্ডীমঙ্গাল, ধর্মমঙ্গাল, অন্নদামঙ্গাল ইত্যাদি নানান কাব্যধারাকে ঘিরে মঙ্গালকাব্যের জনপ্রিয়তা বহুলাংশে বৃদ্ধি পেয়েছে। এই প্রত্যেকটি ধারাতে লক্ষ করা যায় অসংখ্য প্রতিভাবান কবিদের আনাগোনা। এরমধ্যে ‘চণ্ডীমঙ্গাল’ কাব্যধারায় কয়েকজন উল্লেখযোগ্য কাব্য রচয়িতা হলেন— দ্বিজমাধব, মুকুন্দ চক্রবর্তী, রামানন্দ যতি প্রমুখ। তাঁরা প্রত্যেকেই ‘চণ্ডীমঙ্গাল’কে সমৃদ্ধির এক অন্যস্তরে পৌঁছে দিয়েছিলেন। তবে বাইরের ছাঁদের পৌরাণিক প্রচ্ছদ এক হলেও রাষ্ট্রিক বিশৃঙ্খলা, অর্থনৈতিক বিপর্যয়, সামাজিক দুর্গতি ও ধর্মসংকটের কারণে তাঁদের প্রত্যেকের কাব্যে অন্তর্নিহিত কিছু সূক্ষ্ম পার্থক্য দেখতে পাওয়া যায়। ষোড়শ শতাব্দীর কবি মুকুন্দের সঙ্গে অষ্টাদশ শতাব্দীর কবি রামানন্দের কাব্যেও সেরূপ সূক্ষ্ম পার্থক্য থাকাটাই স্বাভাবিক। তবে আলোচ্য রচনার উদ্দেশ্য এই উভয় কবিদের কাব্যে সমকালীন সামাজিক স্তরবিন্যাস ও গোষ্ঠীজীবনকে প্রত্যক্ষ করা।

❐ কবি মুকুন্দ চক্রবর্তী

বাংলায় মুকুন্দ-চর্চার ইতিহাস প্রায় দেড়শো বছর অতিক্রান্ত হতে বসেছে। ফলে কবির জীবনতথ্যের অনেকটাই এখন আমাদের কাছে জানা। মুকুন্দের জীবনীর বেশিরভাগ তথ্য আমরা জানতে পারি ‘গ্রন্থোৎপত্তির কারণ’ নামক অংশের কবিকৃত আত্মবিবরণী থেকে। তাছাড়াও কাব্যের নানান ভনিতায় আরো কিছু তথ্য পাওয়া যায়। এসব তথ্য থেকে যা জানা যায় তা হল—বর্ধমান জেলার রত্না নদীর তীরে সিলিমাবাজ পরগনার অন্তর্গত দামিন্যা গ্রামে কবির সাতপুরুষের বসবাস ছিল। কবির পিতার নাম হৃদয় মিশ্র, মাতার নাম দৈবকী। কবির পিতামহ জগন্নাথ মিশ্র গ্রামদেবতা চক্রাদিত্য শিবের উপাসক হলেও বৈষ্ণবমতে বিশ্বাসী ছিলেন। তবে কবিও শিশুকাল থেকেই শিবভক্ত ছিলেন—

‘তপস্বী হইয়া কবি শিবপদ আশা।
মুকুন্দ রচিল গীত লৌকিকের ভাষা।[১]

চক্রবর্তী ব্রাহ্মণের কুলধর্ম পূজার্চনা হলেও চাষবাসই ছিল কবির প্রধান জীবিকা। কবির ‘দামিন্যায় চাষ চষি’ উক্তিটি থেকে মনে হয়, নিজের কৃষিজীবী পরিচয়ে মনে মনে বোধহয় বেশ গর্বই ছিল তাঁর।[২] দামিন্যার তালুকদার গোপীনাথ নন্দী ছিলেন অতি সজ্জন। স্বগ্রামে বেশ স্বস্তিতেই কবির দিন কাটছিল। এমন সময় মানসিংহের সুবেদারিতে ডিহিদার মামুদ শরিফের অত্যাচারে দেশের শান্তি নষ্ট হল। এইসময়ে দেশের ‘উজির’ হলেন ‘রায়জাদা’। বিধর্মী শাসকের আজ্ঞায় ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণবের উপর অত্যাচার শুরু হল। ব্যাপারীরাও হল

উৎপীড়িত। অত্যাচারী রাজকর্মচারীরা পনেরো কাঠায় এক বিঘা জমি পরিমাপ করে জবরদস্তি খাজনা বাড়িয়ে দেয়। গোপীনাথ নন্দী কারারুদ্ধ হলেন। সাতপুরুষের ভিটেমাটি ছেড়ে রাতের অন্ধকারে রাজপ্রহরীদের চোখ এড়িয়ে স্ত্রী, শিশু-পুত্র ভাই রমানাথ ও একজন বিশ্বস্ত অনুচর দামোদর নন্দীকে সঙ্গে নিয়ে মুকুন্দ যাত্রা করলেন নিরাপদ আশ্রয়ের খোঁজে হিন্দু অধ্যুষিত অঞ্চলের দিকে। পথে দস্যু রূপ রায় সব ছিনিয়ে নেয়। এই অপ্রত্যাশিত বিপদে কবিকে যদু কুণ্ডু রক্ষা করলেন। তাঁর বাড়িতে তিনদিন সপরিবারে কাটিয়ে আবার যাত্রা শুরু করলেন। এবার পথে বেশ কয়েকটি নদী পড়ল। পথে মামাতো ভাই গঙ্গাদাস নানাভাবে কবিকে সাহায্য করলেন। সেখান থেকে কবি এসে পৌঁছলেন কুচট্যা গ্রামে এক পুকুরপাড়ে। বেলা তখন গড়িয়ে গেছে। ক্ষুধার্ত শিশুপুত্র অন্নের জন্য কাঁদছে। কবি তৈলহীন রুক্ষ মাথায় স্নান সেরে পুকুরপাড়েই পূজা করলেন ইষ্টদেবতাকে। তারপর ক্ষুধা-ভয় পরিশ্রমে সেই পুকুরপাড়েই ঘুমিয়ে পড়লেন। সেখানে নিদ্রারত অবস্থায় দেবী চণ্ডী তাঁকে দেখা দিলেন—

ক্ষুধা ভয় পরিশ্রমে নিদ্রা গেলে সেই ধামে
চণ্ডী দেখা দিলেন স্বপনে।
মাতা করিল পরম দয়া দিলা চরণে ছায়া
আজ্ঞা দিলা রচিতে কবিত্ব
হাথে লইয়া পত্র মসী আপনি কলমে বসি
নানা ছন্দে লিখিল সঙ্গীত।[৩]

তারপর কবি ও তাঁর পরিবার শিলাই নদী পেরিয়ে আড়রায় উপস্থিত হন। সেখানে 'ব্রাহ্মণ' নরপতি বাঁকুড়া রায় তাঁকে আশ্রয় দিলেন। রাজসভায় গিয়ে মুখে মুখে শ্লোক রচনা করে রাজাকে সম্ভাসিত করলেন। মুকুন্দের পাণ্ডিত্যে মুগ্ধ হয়ে বাঁকুড়া রায় কবিকে পাঁচ আড়া ধান দিলেন এবং পুত্র রঘুনাথের শিক্ষকরূপে নিযুক্ত করলেন। পরবর্তীতে ব্রাহ্মণভূমির অধীশ্বর হয়ে কবি তরুণ শিষ্য রঘুনাথের উৎসাহে বহু পরিশ্রম করে কাব্যরচনা সমাপ্ত করেন।

মুকুন্দের কাব্যে সামাজিক স্তরবিন্যাস ও গোষ্ঠীজীবন

কাহিনিগত ও সমাজতাত্ত্বিক এই উভয় দিক থেকেই আর্য-অনার্যের মিলন ইতিহাসের কাহিনি যেন 'চণ্ডীমঙ্গল' কাব্যের কাহিনিধারায় এসে মিলে মিশে এক হয়ে গেছে। চণ্ডীমাতার উৎপত্তির ইতিহাস থেকে জানা যায় অরণ্যবাসীদের অনার্য দেবতা চাণ্ডী বা চাণ্ডী শিলা, পুরাণের চণ্ডী প্রভৃতি (অনার্য ও আর্য দেবতা) মিলে চণ্ডীর নতুন রূপ লাভ করেছে। ভৌগোলিক কারণে মানুষের সভ্যতা-সংস্কৃতি বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে সমাজ- জীবনের রূপ যেমন বদলেছে, তেমনি রাষ্ট্রনৈতিক পরিবর্তন এই পরিবর্তমান সমাজের রূপকে আরো বদলে দিয়েছে। এই পরিবর্তনের খেলায় সভ্য মানুষের সঙ্গে অরণ্যবাসী মানুষের সহাবস্থান ঘটেছে বহু সংঘর্ষের মধ্য দিয়ে। রাষ্ট্রনৈতিক প্রয়োজনে জাতিকে বাঁচাতে

উপাস্য-দেবতারাও সাময়িক বিবাদ মিটিয়ে এক আসনে বসেছেন। তাই আখেটিক খণ্ডে অনার্য সিংহবাহিনী এক চণ্ডী এবং বণিকখণ্ডে মঙ্গলচণ্ডী এক অপার মহিমায় এক স্রোতে প্রবাহিত হয়েছে।

মুকুন্দের 'চণ্ডীমঙ্গল কাব্য'-এ মধ্যযুগীয় বাংলার আর্থ-সামাজিক-রাজনৈতিক ইতিহাসের বহু উপাদান নানান জায়গায় ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে। বস্তুত ষোড়শ শতাব্দীর বাংলাদেশ তথা বাঙালি জাতির এক শৈল্পিক দলিল হল এই কাব্যটি। ষোড়শ শতাব্দীর বাংলাদেশের সামাজিক স্তরবিন্যাস, শ্রেণিচেতনা, ভূমিরাজস্ব ব্যবস্থার বৈশিষ্ট্য, শিক্ষাব্যবস্থা, ব্যবসা-বাণিজ্য, রাজনৈতিক স্বেচ্ছাচারিতা, সামন্তবাদী শোষণ, নগরায়ণ ইত্যাদি বিষয়গুলির একটি জীবন্ত ছবি ফুটে উঠেছে। সমাজ বিজ্ঞানী A. K. Nazmul Karim-এর মতে—

> The description of how the different functional groups within the village maintained a hier archial relationship is to be found in the writings of the Bengali poet Mukundaram, who composed his epic probably in the sixteenth century (between 1578-1589A.D) at Bardwan (in West Bengal). The picture drawn by Mukundaram is unique, because there is no other contemporary account giving the details of village - life, as is existed before it was substantially affected by the impact of the Muslim rule.[৪]

ঐতিহাসিক দৃষ্টিকোণ থেকে বিবেচনা করে সমাজবিজ্ঞানীরা চার প্রকারের সামাজিক স্তরবিন্যাসের কথা উল্লেখ করেছেন— (ক) দাস প্রথা (খ) মধ্যযুগীয় এস্টেট (গ) জাতি-বর্ণ প্রথা বা Cast System (ঘ) সামাজিক শ্রেণিবিভাগ ও মর্যাদা। মুকুন্দের 'চণ্ডীমঙ্গল'-এ প্রধানত দু'ধরনের সামাজিক স্তর বিন্যাস লক্ষণীয়— (১) জাতি-বর্ণ প্রথা বা Cast System (২) সামাজিক শ্রেণিবিভাগ ও মর্যাদা। Cast System বা জাতি-বর্ণ প্রথা ভারতবর্ষে যে অপরিবর্তনীয় রূপ লাভ করেছিল তা 'চণ্ডীমঙ্গল কাব্য'-এ সুস্পষ্টভাবে চিত্রিত হয়েছে। জাতি-বর্ণগুলির মূলত বিভাজন হয়েছে পেশাগতভাবে এবং আন্তঃবিবাহমূলক ভাবে। অভিন্ন গোষ্ঠীর অন্তর্গত প্রতিটি মানুষ নিজস্ব জীবনধারায় তাদের জীবনকে অতিবাহিত করেছে। সনাতন গ্রামীণ অর্থনীতিতে ভারতবর্ষে জাতি ও বর্ণব্যবস্থার মাধ্যমে জিনিসপত্রের আদান-প্রদান চলত। গবেষকের মতে—'চণ্ডীমঙ্গাল' কাব্যের সামাজিক স্তরবিন্যাসের মূল ভিত্তিই হল জাতি-বর্ণব্যবস্থা। সমগ্র 'চণ্ডীমঙ্গল কাব্য'-এ বিশেষত, 'গুজরাটনগর প্রতিষ্ঠা' অংশে মধ্যযুগের বাঙালি জাতির সামাজিক স্তরবিন্যাসের যে চিত্র পাওয়া যায় সমাজবিজ্ঞানীর কাছে তা গভীর তাৎপর্যপূর্ণ বলে বিবেচিত হয়েছে।[৫] প্রখ্যাত ঐতিহাসিক আল-বেরুনী লিখেছেন—

> এদেশে ব্রাহ্মণ, কায়স্থ ও বৈশ্যরা হচ্ছে উচ্চ-শ্রেণিভুক্ত। আর মেহনতি বা শ্রমজীবী মানুষ হচ্ছে নিম্ন শ্রেণিভুক্ত। নিম্নশ্রেণির মানুষকে কোনো বিশেষ বর্ণ বলে গণ্য করা হয় না। পেশা বা জীবিকাই এদের বর্ণ। সমাজে এরা অন্ত্যজ, উচ্চশ্রেণির মানুষকে সেবা করাই এদের কর্তব্য।[৬]

তাই হয়তো চণ্ডীর কৃপায় প্রচুর ধন-সম্পদ প্রাপ্তির আশ্বাস পেয়েও, সমাজের উচ্চস্তরে

ওঠার সম্ভাবনা সত্ত্বেও কালকেতুর মনে জাগ্রত হয় সংশয়—

এমন শুনিঞা কালু চণ্ডীর বচন
কৃতাঞ্জলি করি কীছু করে নিবেদন।
হিংসামতি ব্যাধ আমি অতি নিচু জাত
মোর ঘরে কি কারণে আসিব পার্বতী।[৭]

গুজরাট নগর নির্মাণের প্রসঙ্গো কালকেতু বলে—অতি নিচ কুলে জন্ম জাতিতে চোহাড় কেহো না পরশ করে লোকে বলে রাঢ়।

পুরোহিত কেবা মোর হইবে ব্রাহ্মণ
নিচ উত্তম হয় পাইলে কিবা ধন।[৮]

এই প্রশ্ন ও সংশয় মধ্যযুগের এক সামাজিক বাতাবরণে কালকেতু করেছিল। অর্থনৈতিক উত্তরণ ঘটলেও সামাজিক উত্তরণ ঘটবে কিনা সে বিষয়ে কালকেতুর মনে ঘোর সংশয় ছিল। সমাজজীবনের এই বাস্তব সমস্যাগুলি বহুযুগ ধরে চলে আসছে। তাতে কোনো সন্দেহ নেই। তবে এ সামাজিক প্রথা থেকে যে বেরোনো সম্ভব তা কালকেতুর মাধ্যমে মুকুন্দ পাঠকের সামনে তুলে ধরেছেন। কালকেতুর নব-নির্মিত গুজরাট নগরে মধ্যযুগের স্তরবিন্যাসের এক বাস্তবচিত্র ফুটে উঠেছে। একদিকে রাজা কালকেতু, অন্যদিকে সাধারণ মানুষ। এই নগরে সাধারণ মানুষের সামাজিক পরিচয় চিহ্নিত হয়েছে পেশা নির্বাচনের মধ্য দিয়ে। এদের মধ্যে গোলা, জোলা, মুকেরি, পিঠারি, কাবাড়ি, গয়মাল, সানকার, হাজাম, দর্জি, বেনটা, রঙ্গারেজ, হালান, কসাই সব ধরনের কাজের মানুষ রয়েছে। এদের প্রত্যেকের বৃত্তি উল্লেখ করেছেন কবি। মুসলমান সৈয়দ মৌলানা, কাজি, এইভাবে জায়গা করে নেয়। মধ্যযুগে মুসলিম-সমাজের পেশাগত শ্রেণিবিন্যাস যেভাবে রূপায়তি হয়েছে, সমগ্র মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে তা বিরল। আবার কবি গুজরাট নগরীতে আগত হিন্দুদের সামাজিক স্তরবিন্যাস প্রধানত সেন যুগের হিন্দুধর্মের বর্ণভেদ প্রথাকে সামনে রেখে চিত্রিত করেছেন। হিন্দুসমাজে প্রধানত ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র এই বর্ণাশ্রম প্রথা লক্ষণীয়। দেবীর আজ্ঞায় ব্রাহ্মণ শূদ্রের ঘরে পূজা করতে রাজি হবেন। তার উল্লেখ কবি করেছেন—

তোমার পুরোহিত পাব আমার দরশন
নিবেক তোমার দান উত্তম ব্রাহ্মণ।[৯]

কাব্যের প্রতিটি বর্ণের বা জাতির মধ্যে সূক্ষ্ম ভেদও মুকুন্দ উল্লেখ করেছেন। এ প্রসঙ্গো Muhammad Abdur Rohim বলেছেন—

> Mukundaram refers to another class of Brahmins of his time. They were called Agardanis. They were & low class Brahmins, who lived in one corner close to the locality of vaidyas.[১০]

ব্রাহ্মণ ছাড়াও অন্যান্য হিন্দু শ্রমজীবী মানুষের মধ্যে চাষি, খনা, কামার, তাম্বুলী, কুম্ভকার,

তন্তুবায়, মালী, বারুই, নাপিত, আগুরি, মোদক, সরাক, কাঁসারি, গোপ, কলু, বাইতি, বাগদি, মাছুয়া, ধোবা, দর্জি, সিউলি, ছুতার, পাটনী, ভাট, মাঝি, মাল, চণ্ডাল, কোল, কিরাত, হাড়ি, চামার, ডোম ইত্যাদি বৃত্তিজীবী জাতির পরিচয় পাওয়া যায়। এদের পেশা ছিল মানুষের নিত্য প্রয়োজনের যাবতীয় জিনিসপত্র তৈরি করা। এই নির্দিষ্ট পেশার বিভিন্ন দলগুলিকে বিশিষ্ট জাতি হিসাবে ধরা হয়। কিন্তু এই সময়কালে কৃষক ব্যবসায়ী, সেবকজাতিগুলি শূদ্র বলে পরিচিত ছিল। বাংলা জাতি ব্যবস্থার এই চিত্রই মুকুন্দ চক্রবর্তী চিত্রিত করেছেন তাঁর কাব্যে।

মুকুন্দের 'চণ্ডীমঙ্গল'-এর বণিকখণ্ডের মূল বিষয় বণিক সমাজে দেবী চণ্ডীর পূজা প্রচার করা। এইখণ্ডে বণিক সমাজের চিত্র ব্যাপকভাবে উপস্থাপিত করা হয়েছে। সেকালে বণিকরা ব্যবসা-বাণিজ্য করে প্রচুর অর্থ উপার্জন করেছিল। তবে প্রতারক মুরারি শীলের মতো বণিকরাও যে সমাজে উপস্থিত ছিল তা আখেটিক খণ্ডে কবি উল্লেখ করেছেন। এই ধরনের বণিকেরা সুদের বিনিময়ে টাকা ধার দিয়ে নিম্নশ্রেণির মানুষদের সম্পদ আত্মসাৎ করেছে। ব্যাধসমাজে বহু বিবাহের আভাস থাকলেও কোনো দৃষ্টান্ত নেই; কিন্তু উচ্চবিত্ত বণিক ধনপতি ও শ্রীমন্ত উভয়েই একাধিক বিবাহ করে ও পত্নীরা তাদের পতিগৃহেই থাকে। বাংলাদেশে তুর্কি আক্রমণের পরবর্তীকালে সমাজে কুলাঙ্গানাদের মধ্যে নানাবিধ রক্ষণশীলতা আরোপিত হয়েছিল। সেরূপ কিছু খণ্ডিত চিত্র কাব্যের নানাস্থানে ছড়িয়ে রয়েছে। যেমন—খুল্লনার সতীত্বের নানাবিধ পরীক্ষা। ছ'মাসের গর্ভ নিয়ে খুল্লনা যখন প্রোষিত ভর্তৃকা, তখন অনাগত সন্তানের জন্য ধনপতির পরিচয়পত্রের মূল্য তার কাছে অনন্ত।

এসব ঘটনা একান্তভাবেই পিতৃতন্ত্রের স্মারক। তবে বণিক সম্প্রদায়কে দিয়ে অনার্য মেয়ে দেবতার পূজা আদায় করা থেকে মনে হয় যে, তৎকালীন সমাজে বণিক সম্প্রদায় সামাজিক প্রতিপত্তি অর্জন করেছিল এবং এই সম্প্রদায়ই ছিল ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতির প্রধান সহায়ক। এও কথিত আছে যে সেন আমলে বণিক ও অন্যান্য ধনোৎপাদক সম্প্রদায়ের সামাজিক মর্যাদা হানি হয়েছিল এবং পরবর্তীতে তারা পুনরুদ্ধার করতে সমর্থ হয়েছিল। তাই তাদের দিয়ে হয়তো অনার্য দেবতা ও দেবতার অন্তরালে অনার্যদের সামাজিক স্বীকৃতি লাভের চেষ্টা প্রবল। আসলে কাহিনির প্রথম পর্বে যার আরম্ভ, দ্বিতীয় পর্বে তার পরিণতি। এভাবেই মুকুন্দ চক্রবর্তী একটি আদর্শ সমাজের পরিকল্পনা করেছেন। চণ্ডীর আশীর্বাদ পাওয়া সমাজে কল্যাণধর্মীতা ও ন্যায় প্রতিষ্ঠার বিপুল সম্ভাবনা প্রত্যক্ষ করে বিভিন্ন বর্ণ ও সম্প্রদায়ের মানুষকে এক ছাদের তলায় দাঁড় করিয়েছেন। মধ্যযুগের এক বিস্তৃত বিচলিত সমাজ পরিবেশ, ষোড়শ শতাব্দীর সামাজিক স্তর ও গোষ্ঠীজীবনকে সুনিপুণভাবে তুলে ধরেছেন তাঁর 'চণ্ডীমঙ্গল' কাব্যে।

❒ কবি রামানন্দ যতি

বাংলা সাহিত্যে মধ্যযুগের একেবারে অন্তিমলগ্নের কবিদের মধ্যে একজন প্রচারবিমুখ

কবি হলেন রামানন্দ যতি। তিনি ছিলেন একজন সন্ন্যাসী। তবে প্রায় পঞ্চাশটি পুস্তক তিনি রচনা করেছিলেন। 'চণ্ডীমঙ্গাল' কাব্যটি মূলত মুকুন্দের সমালোচনা করার উদ্দেশ্যেই তিনি রচনা করেন। স্বল্প পরিচিত কবি রামানন্দ তাঁর রচিত 'চণ্ডীমঙ্গাল' কাব্যে নিজের ব্যক্তিপরিচয় সম্পর্কে খুব বেশি কোনো তথ্য দিয়ে যাননি। কাব্যপাঠে গবেষণার দ্বারা যেটুকু জানা যায় তা হল—কোনো রাজচ্ছত্রছায়ায় তিনি তাঁর কাব্য রচনা করেননি। 'চণ্ডীমঙ্গাল' রচনাকালে সর্বপ্রকার স্থূলরুচিকে তিনি বর্জন করেছিলেন। আদিরস তাঁর কাব্যে না থাকায় এই কাব্য সাধারণ পাঠকের মন জয় করতে পারেনি। তবে তিনি সমকালীন সমাজকে একেবারে উপেক্ষাও করেননি। ভক্তিরসের অন্তরালে কিঞ্চিত ইতস্তত ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে সমকালীন সামাজিক জীবনযাত্রা ও সমাজ ব্যবস্থার খণ্ড খণ্ড চিত্রকল্প।

'রামানন্দ যতি' নামটিতে 'যতি' শব্দটি 'সন্ন্যাসীসূচক'। রামানন্দ নামটি তাঁর নিজস্ব নাম না হওয়ার সম্ভাবনাই বেশি। এশিয়াটিক সোসাইটি থেকে প্রাপ্ত পুথিখানিতে কবির নাম লেখা ছিল—'রামানন্দ গোস্বামী'। তার নীচে ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের শীলমোহর। শীলমোহরের উপরে প্রথমে পারসিক ভাষার হরফে লেখা— কিতাব কালিজ ফোর্ট উইলিয়াম। এসব দেখে মনে হতে পারে যে সন্ন্যাসী হওয়ার সময় তিনি নাম পরিবর্তন করেছিলেন এবং প্রিয় দেবতা রামকে নামাগ্রে ধারণ করে হয়তো সন্ন্যাস জীবনে প্রবেশ করেছিলেন। তাঁর রামভক্তির বহু নিদর্শন কাব্যের নানাস্থানে ছড়িয়ে রয়েছে—

শ্রীরামানন্দের বিরচন।
যিনি রাম তিনি চণ্ডী ভেদ নাহি জানে দণ্ডী
সংস্কৃত ভাষাও তেমন।।[১১]

দাতারাম ঠাকুরের মুখে তিনি ভক্ত তুলসীদাসের রামদর্শনের অপূর্ব কাহিনি পরিবেশিত করেছেন। রামানন্দের 'রামতত্ত্ব' তথা রামভক্তি দেখে বিন্দুমাত্র সন্দেহের অবকাশ নেই যে তিনি রামের একনিষ্ঠ ভক্ত ছিলেন। বণিকখণ্ডে খুল্লনার অগ্নিপরীক্ষার সঙ্গো রামায়ণের সীতার অগ্নিপরীক্ষার প্রসঙ্গাটির মিল দেখতে পাওয়া যায়। কবি ছিলেন মনে প্রাণে বৈষ্ণব তাই খুল্লনা বিপদের সময় উদ্ধারকর্তারূপে চণ্ডীকে স্মরণ না করে বহিরূপী কৃষ্ণকে স্মরণ করেছে। কাব্যমধ্যে ব্যক্তি পরিচয়ের কোনো সুস্পষ্ট উল্লেখ রামানন্দ না করলেও কাব্য রচনাকাল জ্ঞাপক একটি শ্লোক তিনি নির্মাণ করে গেছেন। যা থেকে বুঝে নিতে অসুবিধা হয় না যে কাব্যটি অষ্টাদশ শতাব্দীর অন্তিম লগ্নে রচিত। তিনি তাঁর কাব্য সমাপ্ত করেছেন ১৬৮৮ শকে (১৭৬৬ খ্রিস্টাব্দে)। ভারতচন্দ্রের 'অন্নদামঙ্গাল' রচনার ১৪ বছর পরে—

গজ বসু ঋতুচন্দ্র শশাঙ্ক গ্রন্থ হয়।
চণ্ডীর আদেশ পায়্যা রামানন্দ কর।।[১২]

গজ = ৮, বসু = ৮, ঋতু = ৬, চন্দ্র = ১ = ১৮১৬ অঙ্কস্য বামা গতি। এটি উল্টে দিলে হবে ১৬৮৮ শকাব্দ। সঙ্গো ৭৮ যোগ হবে ১৭৬৬ খ্রিস্টাব্দ। এই তথ্যটি ছাড়া কবি আর কোনো ব্যক্তি পরিচয় কাব্যমধ্যে রেখে যাননি। তবে কাব্যমধ্যে তিনি নিজেকে

আত্মীয়হীন নিঃসঙ্গ বলেছেন। একস্থানে তিনি নিজেকে নিমাইচরণ রায় বলেছেন। ধরে নেওয়া যেতে পারে তিনি চৈতন্যের একনিষ্ঠ ভক্ত ছিলেন বলেই হয়তো নিজেকে এই নামে অভিষিক্ত করেছেন। তিনি ছিলেন মূলত রাঢ়বঙ্গের কবি। রাঢ়বঙ্গের নদ-নদীর নাম থেকে সে বিষয়ে কিছুটা অনুমান করা যায়। সেই সঙ্গে রাঢ়বঙ্গের বহু স্থানের নাম এমনকি 'রাঢ়' শব্দটিরও উল্লেখ কবি করেছেন—

১. ইছানী নগর নাম রাঢ় দেশে এক গ্রাম
গজ বান্যা আছে লক্ষ্মীপতি।[১৩]

২. তপ্ত বালুকাতে পদ বাঁঝাইয়া যায়
রাঢ় দেশে পাথর কুরাই কত আর।[১৪]

৩. সপ্তগ্রাম বর্ধমান এত নিকটে স্থান
বীরভূমি রাজসৈ অবদী।[১৫]

৪. দ্বারী হৈয়া দামোদর রইলেন তথায়।
কত পুন্য না জানি কর‍্যাছে বলি রায়।।[১৬]

কাব্যে নির্দিষ্টভাবে কোনো ব্যক্তি পরিচয়ের উল্লেখ না করলেও এসব পদগুলি পাঠ করলে আমাদের বুঝে নিতে কোনো অসুবিধা হয় না যে কবি রাঢ়বঙ্গের মানুষ ছিলেন। যদিও সন্ন্যাসজীবন গ্রহণ করে তিনি ভারতের নানাস্থানে ভ্রমণ করেছিলেন।

রামানন্দের কাব্যে সামাজিক স্তরবিন্যাস ও গোষ্ঠীজীবন

রামানন্দ মূলত ছিলেন একজন বৈষ্ণব কবি। গৌরাঙ্গের একনিষ্ঠ ভক্ত। মুকুন্দের কাব্যের সমালোচনা করার জন্য তিনি 'চণ্ডীমঙ্গাল কাব্য'টি রচনা করেন। তবে তিনি মধ্যযুগীয় মঙ্গালকাব্যের প্রথাবদ্ধ রীতিকে মেনেই তাঁর কাব্যটি নির্মাণ করেছিলেন। তাই বৈষ্ণবভক্তি ও চণ্ডীভক্তি এখানে মিলেমিশে একাকার হয়ে গেছে। 'চণ্ডীমঙ্গল'-এর মূল অবয়বকে সামনে রেখে কাব্যে ভক্তিরসের প্রাবল্য দেখা গেলেও সমকালীন সমাজের কিঞ্চিৎ চিত্রও আমরা প্রত্যক্ষ করে থাকি। যদিও তা মুকুন্দের কাব্যের মতো অত বিস্তারিত রূপ লাভ করতে পারেনি।

রামানন্দের কাব্যটি অষ্টাদশ শতাব্দীর অন্তিমলগ্নে রচিত। তিনি তাঁর কাব্যটি সমাপ্ত করেছেন ১৬৮৮ শকে (১৭৬৬ খ্রিস্টাব্দে)। ভারতচন্দ্রের 'অন্নদামঙ্গাল' রচনার ১৪ বছর পরে। মঙ্গালকাব্যগুলি রচিত হওয়ার যে ইতিহাস লক্ষ করা যায় রামানন্দের কাব্যে সে আকাঙ্ক্ষার তীব্রতা ততটা নেই। অষ্টাদশ শতাব্দীর রাজনৈতিক পালাবদলের ইতিহাস এখানে থাকতে পারে। সাধারণ মানুষ অরাজকতার সম্মুখীন হলেই দেবতাকে আশ্রয় করতে চায়। ১৭১৩-১৭৬১ এই সময়ের মধ্যে ঘটে গেছে নানা ঘটনা। মোগল সাম্রাজ্যের পতন, নবাবি আমলের বিপর্যয়, বর্গীর আক্রমণ, জমিদারি উৎপীড়ন। সর্বোপরি কোম্পানির আমলে এই ধরনের ঘটনাগুলির সঙ্গে সেদিনের সাধারণ বাঙালি পরিচিত ছিল। রামানন্দের কাব্যের

পটভূমি জুড়ে সে ইতিহাসের কিঞ্চিত আবহাওয়া লক্ষ করা যায়। এ সময়েও ব্রাহ্মণ, কায়স্থ ও বৈশ্যরা সমাজের উচ্চশ্রেণিভুক্ত মানুষ আর শ্রমজীবী মেহনতি মানুষেরা নিম্নশ্রেণির মানুষ বলে পরিচিত ছিল। ব্যাধজাতিকে নিচুজাতি রূপেই গণ্য কার হতো—

আমি ব্যাধ নীচ অতি তুমি মাগ কুলবতী
পরিচয় চাহে কালকেতু।[১৭]

কিংবা—

কিরাত হিংসক রাঢ় মাংস চর্ম নাড়ী হাড়
শ্মশান সমান এই স্থান।[১৮]

নিম্নশ্রেণির শ্রমজীবী মানুষদের মধ্যে বহুবিবাহের প্রবণতা না থাকলেও কুলীনদের মধ্যে একাধিক বিবাহের প্রবণতা ছিল—

গঙ্গা নামে সতা মোর কল্লোল তরঙ্গা ঘোর
স্বামীতে মাথায় কর্‍্যা নাচে।[১৯]

আধুনিক শিক্ষিত নগরসভ্যতার প্রভাব রামানন্দের কাব্যে রয়েছে। সে সময় ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতির একচেটিয়া আধিপত্য কিছুটা হলেও ক্ষুণ্ণ হয়েছে। জপ-তপের দ্বারা ব্যাধ কালকেতুর পূজা করা সে সাক্ষ্যই বহন করে—

হরের পূজার খেদ না করিও আর।
এই লও মন্ত্র যন্ত্র সকলি তোমার।।
কর‍্যে তুমি আপনার জাত্যের আচার।
জপ পূজা কর‍্যো তুষ্টি হইবে আমার।।[২০]

সমাজে এইসময় জাতপাত নিয়ে খুব একটা মাথাব্যাথা ছিল না—

জাতি কুল আমরা বিচার নাহি করি।
আচার না লই কিন্তু ভক্তিমাত্র ধরি।[২১]

মুকুন্দের 'গুজরাট' একটি বড়োসড়ো দামন্যা বা আড়রা-সেই ব্রাহ্মণ, কায়স্থ, মুসলমান, ধীবর গোপ, কাঁসারিদের বাস। কিন্তু যতির ছক কিছুটা আলাদা। তাঁর গুজরাটে 'কতেক ব্রাহ্মণ' এবং 'ক্ষাত্র বৈশ্য বৈদ্য বটে' কিন্তু বেশিরভাগই শূদ্রের বসবাস—'শূদ্র নানা পদ্য'—

নট বাটধান সৈরিন্ধ্র যবন
কম্বোজ দ্রাবিড় ওড্র।
কিরাত পারদ সধন্মা দরদ
সোপাক পহ্নিব পৌণ্ড্র।।
সুধন্বা সাত্বৎ মৈত্র আদি কত
পাণ্ডু সোপাক মধুক।
আহিন্তিক চীন অন্ধ্র মেদহীন

মনু দেখ্যা পাবে সুখ।
গুজরাট দেশে জাত্যের বিশেষে
নাম আছে ভাগে ভাগে।[২২]

বিপুল স্নেহে যদি তাদের ব্যাধশাসিত গুজরাটে স্থান দিয়েছেন এবং আমাদের সমাজ-পিতা জাতি বিভাগের ধ্বজাধারী মানুষ বিরক্ত বিস্মিত মুখচ্ছবি কল্পনা করে মৃদু হেসে বলেছেন—'মনু দেখ্যা পাবে সুখ'। শূদ্রমন নিবেশের কারণগুলি বিশ্লেষণ করলে যতির বুদ্ধির সক্ষমতায় বিস্মিত হতে হয়। অস্পৃশ্যদের ডাক দিয়েছেন যতি। মহাপ্রভু চৈতন্যের মতো চণ্ডালদের কোলে নিলেন। একজন লাঞ্ছিত-নিপীড়িত-অবজ্ঞাত মানুষ দেবীর প্রসাদে ঐশ্বর্য পেয়ে নতুন নগর সাজিয়েছে। আর এই খবর পেয়েই তারা বন্যার মতো বেগে ছুটে এল। বহুদর্শী যতি তাঁর অভিজ্ঞতা থেকে জানতেন উন্নাসিক সমাজপতিরা ব্যাধের রাজত্বে গিয়ে কখনোই নিজেদের মর্যাদা ক্ষুণ্ণ করবে না। তাই এদের মধ্যে অর্থলোভী গৃধ্রজাতীয় কয়েকটি (কালকেতুর পুরোহিত এদের মধ্যে একজন) নমুনা বেছে নিয়ে বাকিদের তিনি রেহাই দিয়েছেন। রামানন্দের বণিকখণ্ডের কাহিনি বেশ বড়ো ও জটিল। বণিকসমাজের চিত্রই এখানে উপস্থাপিত তবে ষোড়শ শতাব্দীর তুলনায় অষ্টাদশ শতাব্দীর বণিকসমাজে এসেছে নগরায়ণ। বাংলাদেশে ষোড়শ শতাব্দীতে দেখা যায় এক মুসলমান শাসকের হাত থেকে রাজনৈতিক অধিকার চলে যাচ্ছে আর এক মুসলমান শাসকের হাতে। পাঠানদের কাছ থেকে মোগলদের কাছে। আর অষ্টাদশ শতাব্দীতে পাশ্চাত্য ঐতিহ্যানুসারী নগরসভ্যতা পুরনো কালকে গ্রাস করে ফেললো। তাই সাহিত্য ক্রমশ ধুঁকছে Feudal Morality থেকে Commercial Society-র দিকে। রামানন্দের বণিকসমাজে তার প্রভাব পড়াটাই স্বাভাবিক। ধনপতির সন্তান না হওয়ার কারণে দ্বিতীয় বিবাহে আগ্রহ প্রকাশ করেছেন। রামানন্দ অষ্টাদশ শতাব্দীর পালাবদলের প্রেক্ষাপটে তাঁর 'চণ্ডীমঙ্গাল' কাব্যটি রচনা করেছিলেন। সেক্ষেত্রে যুগের প্রভাব পড়াটাই স্বাভাবিক। যতির কাব্যে লোকায়ত জীবন বা গোষ্ঠীজীবনের উল্লেখ খুব একটা দেখতে পাওয়া যায় না।

পরিশেষে বলা যায়—রামানন্দের 'চণ্ডীমঙ্গাল'-এ দেবকথার স্বচ্ছ আবরণেও আভাসিত হয়েছে এক ভিন্ন ইতিহাস। তবে এ ইতিহাস আরো বেশি প্রত্যক্ষ করা যায় মুকুন্দে। সামাজিক জীবন তথা গোষ্ঠীজীবনকে তিনি যেভাবে প্রত্যক্ষ করে চিত্রিত করেছেন রামানন্দ তা করেননি। হয়তো যুগের প্রয়োজনেই বিরত থেকেছেন। তবে কবি হিসেবে যতির দীনতারই প্রকাশ ঘটেছে বলা চলে। 'চণ্ডীমঙ্গাল'-এর ধারায় মুকুন্দ এ বিষয়ে সর্বাগ্রগণ্য। বাস্তব সচেতনতায় তিনি অপ্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন, কবিত্বের দূরদৃষ্টি তো ছিলই। বাস্তব সচেতনতাই মুকুন্দের ক্ষেত্রে সমাজ-সচেতনতার আসল ভিত্তি।

তথ্যের সন্ধানে

১. সুকুমার সেন সম্পাদিত : কবিকঙ্কণ মুকুন্দ বিরচিত চণ্ডীমঙ্গাল, সাহিত্য আকাদেমি, রবীন্দ্র ভবন, ৩৫ ফিরোজ শাহ রোড, নতুন দিল্লি ১১০০০১, পৃ. ১৯
২. সনৎকুমার নস্কর : কবি পরিচিতি, অবতরণিকা, তৎসম্পাদিত কবিকঙ্কণ চণ্ডী, কালকেতু পালা দ্বিতীয় সংস্করণ আশ্বিন ১৪০৬, রত্নাবলী, পৃ. ১৫

৩. সুকুমার সেন সম্পাদিত : 'কবিকঙ্কণ মুকুন্দ বিরচিত চণ্ডীমঙ্গাল', সাহিত্য অকাদেমি, রবীন্দ্র ভবন, ৩৫ ফিরোজ শাহ রোড, নতুন দিল্লি, পৃ. ৪
৪. A.K. Nazmul Karim : 'Changing Society in India', Pakistan and Bangladesh, Dacca, Nawroze Kitabistan, 1976, P. 16
৫. মুহম্মদ আব্দুল হাই এবং আনোয়ার পাশা সম্পাদিত : কালকেতু উপাখ্যান, ঢাকা, স্টুডেন্ট ওয়েজ, ১৩৯৬, পৃ. ১১
৬. আবু মহামেদ হবিবুল্লাহ অনুবাদক : আলবেরুনীর 'ভারতবর্ষ', ঢাকা, বাংলা একাডেমি, ১৯৮২, পৃ. ৬৭-৬৮
৭. সুকুমার সেন সম্পাদিত : কবিকঙ্কণ মুকুন্দ বিরচিত চণ্ডীমঙ্গাল, সাহিত্য অকাদেমি, রবীন্দ্রভবন, ৩৫ ফিরোজ শাহ রোড, নতুন দিল্লি ১১০০১, পৃ. ৬৬
৮. তদেব, পৃ. ৬৫
৯. তদেব, পৃ. ৬৫
১০. Muhammad Abdur Rahim : Social and Cultural History of Bengal, Vol. II, Karachi : Pakistan Publishing House 1967 P. 359
১১. অনিলবরণ গঙ্গোপাধ্যায় (সম্পাদিত) : রামানন্দ যতি বিরচিত চণ্ডীমঙ্গাল, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৬৯, পৃ. ১৫৪
১২. তদেব, পৃ. ৪০১
১৩. তদেব, পৃ. ২১৩
১৪. তদেব, পৃ. ২২৪
১৫. তদেব, পৃ. ২৪১
১৬. তদেব, পৃ. ২৯১
১৭. তদেব, পৃ. ১৬৯
১৮. তদেব, পৃ. ১৬৯
১৯. তদেব, পৃ. ১৬২
২০. তদেব, পৃ. ১৭১
২১. তদেব, পৃ. ১৭১
২২. তদেব, পৃ. ১৭১
২৩. তদেব, পৃ. ১৭৯

ধর্মমঙ্গাল
বীরত্বে-সংকল্পে-মহাকাব্যের বিন্যাসে

রূপরাম চক্রবর্তীর অনাদ্যমঙ্গাল—অর্থনীতির সূত্র সন্ধান

অন্তরা মিত্র

মানুষের দীনতম আকাঙ্ক্ষা থেকে শুরু করে অতি দুরন্ত দুরাশাকেও তিনি সফল করেন। অনাবৃষ্টিকালে সুবৃষ্টি দেন। কুষ্ঠরোগীকে নিরাময় করেন। অর্চনার তৃপ্তি হলে বরদান করেন সার্বিক সমৃদ্ধির—

একমনে শুন সভে ধর্মের কথন।
অপুত্রের পুত্র হয় নির্ধনের ধন॥[১]

ইনিই ধর্ম। এই দেবতা রূপরাম চক্রবর্তীর আরাধ্য। অনাদ্যরূপী ধর্মের বন্দনা করেছেন কবি—

আমাদের পদরেণু ভরসা কেবল।
দ্বিজ রূপরাম গান অনাদ্যমঙ্গাল॥[২]

অনাদ্য অর্থাৎ আদি নন। গবেষকগণ দীর্ঘ সমীক্ষার মাধ্যমে সিদ্ধান্তে এসেছেন—

> ধর্মঠাকুর একাধারে ব্রাহ্মণ্যদেবতা, বিষ্ণু ও শিব, আবার বৌদ্ধস্তূপেরও প্রতীক। নামহীন এক অনার্যদেবতা—যাহার বাহন উলুক অথবা বানর।[৩]

অর্থাৎ মঙ্গালকাব্যের যাবতীয় দেব-দেবীর উদ্ভব মূলে যে আর্য-অনার্য সংস্কৃতির সমন্বয়সাধন প্রচেষ্টা লক্ষণীয়, তার প্রভাব পূর্ণমাত্রায় পড়েছে ধর্মঠাকুরের স্বরূপ বর্ণনায়। তাই রূপরাম চক্রবর্তীর রচনাতেও কখনো দেবতা ব্রাহ্মণ-বেশধারী, তার গলায় সুবর্ণ পৈতা, কখনো কচ্ছপ অবতাররূপে আবির্ভূত, কখনো 'ধবল বরণে দেখা দিলেন নিরঞ্জন'।[৪] আর ধর্মের গাজনে রাঢ় অঞ্চলেই জাঁকজমকটা বেশি হলেও—

ধর্মের গাজনে বাদ্যবাজে নানা ঠাঁই।
ঘরে ঘরে ব্রাহ্মণ চণ্ডাল ভেদ নাই॥[৫]

কবি রূপরাম চক্রবর্তীর কাব্য রচনাকাল সংশয়াচ্ছন্ন। সময় নির্দেশক শ্লোকটির পুঁথি-ভেদে পাঠান্তর ঘটেছে—

সাকে সিমে জড় হয়্যা যত সন হয়।
তিন বাণ চারি যুগ বেদে যত রয়॥[৬]

'তিনবাণ চারিযুগ' কখনো 'চারবাণ তিনযুগ' কখনো বা 'পাঁচ বাণ চারি যুগ' হয়েছে। যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি সাকে সিমে জড় করে চারি বাণ তিন যুগ ধরে প্রথমে ১৫২৬ শক গণনা করেন। কিন্তু আত্মপরিচয় নির্দেশক অপর একটি সূত্রও দিয়েছেন রূপরাম—

রাজমহলের অঙ্কে যবে ছিল শুজা।

পরম কল্যাণে তাঁর বৈসে যত প্রজা॥
সেই হৈতে গীত গাই আসর ভিতর॥[৭]

এই শাহসুজার উপস্থিতি লক্ষ করে যোগেশচন্দ্র পুনরায় গণনা করে ১৬৬৪ খ্রিস্টাব্দ কালটি নির্ধারণ করেন। এই মতটি সমর্থন করেছেন সুখময় মুখোপাধ্যায়। অর্থাৎ কাব্য রচনার কালটি ধোঁয়াটে মনে হলেও কবির নিজ বক্তব্য অনুযায়ী এটা বোঝা যায় তাঁর রচিত 'অনাদ্যমঙ্গাল' শাহসুজার বঙ্গাদেশে স্থিতিকালে (১৬৩৯ এপ্রিল—১৬৬০ এপ্রিল) প্রচারিত হয়েছিল। ধর্মমঙ্গালের উপক্রমণিকায় আত্মকাহিনি বিবৃত করেছেন রূপরাম। রস সৃষ্টির সঙ্গো কবিচিত্তের বাস্তব অভিজ্ঞতার মেলবন্ধন ঘটেছে সেখানে। সপ্তদশ শতাব্দীতে রাঢ় বাংলার রাজনৈতিক অশান্তি সম্পর্কে আলোকপাত করেছেন ড. আশুতোষ ভট্টাচার্য। বারো ভুঁইয়াদের দমনের জন্য যুদ্ধবিগ্রহ, প্রতিবেশী অঞ্চলগুলির সংঘর্ষ, ইউরোপীয় বণিকদের প্রতিদ্বন্দ্বিতা ইত্যাদি অভ্যন্তরীণ পরিস্থিতিকে ক্রমশই অস্থির করে তুলেছিল। রূপরামের নিজের জীবনও সঙ্কটের মুখে—অস্তিত্বের সঙ্কট। পরম পণ্ডিত পিতা গৃহেই শিক্ষালয় স্থাপন করেছিলেন। গ্রাসাচ্ছাদনের অভাব থাকার কথাই নয়। তবুও বড়ো দাদা রত্নেশ্বরের নিদারুণ বাক্যবাণ তাঁকে ঘরছাড়া করেছে। কপর্দকশূন্য তিনি। সাহায্য পেয়েছেন সম্পূর্ণ অনাত্মীয় হীনজাতির কাছ থেকে—

ঠাকুরদাস পাল দিল আড়াইসের ধান।...
মণিরাম রায় দিল পরিবার ধুতি।[৮]

নানা দুর্বিপাকের পর স্থায়ী আশ্রয় লাভ করেছেন গোয়ালাভূমের রাজা গণেশ রায়ের কাছে। তাঁরই পৃষ্ঠপোষকতায়, উৎসাহে রচিত হল অনাদ্যমঙ্গাল—

গোয়ালাভূমের রাজা গণেশ রায় নাম।
বিপ্রকুলচূড়ামণি বড় ভাগ্যবান॥
প্রতিষ্ঠা করিল মোরে দিয়া নানা ধন।
আচম্বিতে দুই পালি দিল দরশন॥
পালি দেখি মহারাজ আনন্দিত মনে।
বারমতি গীত জোড়াইল শুভক্ষণে॥[৯]

নিজের পোড়খাওয়া জীবন দিয়েই রূপরাম চক্রবর্তী বুঝেছিলেন বিষয়মহিমা। তাঁর লেখনী থেকে তাই ছিটকে বেরিয়ে এসেছে এই পংক্তিগুলি—

এতদিনে জানিলাম বিষয় বড় ধন।
মদে মত্ত মাতঙ্গা বিষই ধনী জন।।[১০]

'ধর্মমঙ্গাল'-এর মূল কাহিনির আঁকে বাঁকেও অর্থনৈতিক নানা সঙ্কেত দ্যোতিত। 'অনাদ্যমঙ্গাল'-এর বিভিন্ন পর্যায় পাঠে খণ্ড সূত্রগুলিই আমরা উদ্ধারের চেস্টা করবো।

সপ্তদশ শতকের শেষার্ধে ১৬৫৬ থেকে ১৬৬৮-র মধ্যে পর্যটক বার্নিয়ার ভারতে ভ্রমণ করেন। বঙ্গাভূমির শস্যশ্যামলতা ও সমৃদ্ধি সম্বন্ধে প্রশংসায় মুখর তিনি—

The Soil was luxuriant and agriculture though not raised by improvements was not also hurt by any blameable neglect or in attention.[১১]

রূপরামের কাব্যেও কৃষির দীর্ঘপ্রশস্তি বা চাষের বিস্তৃত বিবরণ পাই না। তবে বঙ্গদেশের সুজলা সুফলা রূপটির আভাস মেলে। অধীনস্থ প্রজা সোম ঘোষ ভূমি রাজস্বদানে অপারগ, তাই সে বন্দি হয়েছে এই তথ্য গৌড়রাজ সুধর্মপাল রায়কে ক্রুদ্ধ করেনি বরং তিনি বিস্মিত হয়েছেন, কারণ—

বারো মাসে তের বার ঘূর্ণি মেঘে জল।
তবে কেন চাষ নাই তাঁর কথা বল।।[১২]

প্রধান কৃষিজ সম্পদ অবশ্যই ধান। এছাড়া তিল, সরিষা, ধনে, জিরা, মৌরী, হিং, লঙ্কা, পালংশাক, বেগুন, কুমড়ো সবই উপস্থিত। রন্ধনশালায় উঁকি দিলে বোঝাই যায় রসনালোভন খাদ্যসামগ্রী সবই ক্ষেতজ ফসল। ধনী-দরিদ্র নির্বিশেষে পান-সুপারিও জনপ্রিয় ব্যসন। কালু ডোমের দ্বিতীয়া স্ত্রী সনকা ভর্ৎসনা করেছে সপত্নী লখ্যাকে—

গাগা গুয়া খাইলে ঘরে গুছিলেখা পান।
বলি বলি নাঞি দিলে চির্‌্যা অর্ধখান।।[১৩]

ফসল সংরক্ষণের ব্যাপারটিও উপেক্ষিত হয়নি। মরাই ভরা ধান, তিলের সঙ্গেই স্থান পেয়েছে কাপাসের মালু।

ক্ষুদপূর্ণ হাঁড়িটিও সম্পদের প্রতীক। 'শালে ভর পালা' অংশে শূর্পণখা প্রচণ্ডঝড়ে বিপর্যস্ত হয়েছে, সর্বস্ব হারিয়েও সে প্রাণপণে রক্ষা করেছে ক্ষুদ্র হাঁড়িটি—

উলঙ্গা হইয়া কান্দে সূর্পনখা রাঁড়ী।
প্রাণপণ ধরিয়া রাখিল ক্ষুদ্র হাঁড়ি।।[১৪]

চরম বিপদেও লক্ষ্মীর প্রতীকটিকে রক্ষা করেছে কুলটা নারীটি। ফলে ধর্মঠাকুরও হার মেনেছেন তার কাছে—

ধর্ম বলে শাপ দিয়া অকার্য হইল।
পুনরাপি তাহারে আপনি ধন দিল।।
সম্পদে বাড়িল পুনঃ ধর্মের কৃপায়।।[১৫]

কৃষিকর্মের সঙ্গে সঙ্গে নিজ দেশের মাটির প্রতিও জনসাধারণের অকৃত্রিম ভক্তি। লাউসেন যখন কালু ডোমকে নিজ রাজ্যে নিয়ে যেতে চেয়েছে তখন অভিজ্ঞা লখ্যা ডুমনি আপত্তি জানিয়েছে—

রমিতি নগরে সাত পুরুষের মাটি...
অনেক দিবস আছি ডোম তের ঘর॥
ইবে তত্ত্ব নাই লয় রাজা গৌড়েশ্বর॥[১৬]

শেষপর্যন্ত গৌড়েশ্বরের আদেশেই দেশের মাটির সঙ্গে সম্বন্ধ ছিন্ন করতে বাধ্য হয়েছে তারা।

দেশের মাটিতে কৃষিকাজ আর বিদেশের মাটিতে সওদাগরি মধ্যযুগের রোজগেরে বাঙালির এই দুটিই ছিল প্রধান পথ। কিন্তু রূপরামের কাব্যে বহির্বাণিজ্যের রম্‌রমা নেই।

সমৃদ্ধ নগরের অন্যতম লক্ষণ হিসাবেই বাণিজ্যের উল্লেখ—

নানাধনে পরিপূর্ণ দক্ষিণ ময়না।
লক্ষপতি নিবসে লঙ্কায় লেনাদেনা।।[১৭]

একই সুরে এটাও বলে দেওয়া হয়েছে—

দুর্বার পাটন লঙ্কা সমুদ্রের পার।[১৮]

বাণিজ্য সম্পর্কে এই দ্বিধার হেতু ইতিহাস ঘাটলে কিছুটা আভাসিত হয়। গবেষক বলেন—

> সপ্তদশ শতকের প্রথম থেকেই বাঙালী বণিকদের দুর্দিন ঘনিয়ে আসে। ইংরেজ কুঠিয়ালদের কাগজপত্রে দেখা যায় যে, সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথমে বাঙালীরা নৌকায় করে কার্পেট নিয়ে সিংহলে বিক্রি করতে যাবার সময় পোর্তুগীজরা সেগুলো ধ্বংস করে দেয়। ১৬২০ খ্রিস্টাব্দেও পোর্তুগীজরা বাংলা থেকে পাঠানো রেশম দখল করে নেয়। সেজন্য বাণিজ্য করতে গিয়ে সর্বস্বান্ত হবার ঝুঁকি নেবার বদলে ঘরে বসে ফড়েগিরি করে তাঁরা যা পেতেন তাতেই সন্তুষ্ট থাকতেন।[১৯]

কবি রূপরামও অন্তর্বাণিজ্যের জমজমাট বাজারগুলিই উপস্থিত করেছেন কাব্যে। রাজা কর্ণসেনের ময়নারাজ্যের সীমানায় বাজারের জাঁকজমক সারা দিন-রাত্রিব্যাপী—

প্রমাণ অবধি ক্রোশ রাজার বসত।
পরিসর বাজার আঠার গণ্ডা পথ॥
তিনসন্ধ্যা বিকায় বাজারে নানা ধন।
সের সের বেচে চুয়া চামর চন্দন।।[২০]

এই বাজারেই দরিদ্র ডোমজাতি তালপাতার মাদুর বিক্রি করে প্রাত্যহিক অন্নসংগ্রহ করেছে। রমতি নগরের হাটে যায় কালুডোমের পুত্রবধূ মউরা—

মউর্যা মলিনমুখী বোনে তালপাত।
হাটে লঞা বেচিলে বৈকালে জোটে ভাত।।[২১]

নগরের প্রান্তদেশেই স্থানীয় হাটবাজারের অবস্থিতি। দৈনন্দিন গৃহস্থালির প্রয়োজন মেটাতো দোকানিরা। কিন্তু বাণিজ্য স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করেছে গোলাহাটের শাসিকা সুরীক্ষা সুন্দরী। সমগ্র দেশকেই সম্মোহিত করে আয়ত্তহীন করেছে সে। হাটে বিক্রি করেছে ওষুধযুক্ত খাদ্যসামগ্রী—

চন্দন কস্তুরী চুয়া উপহার পানগুয়া
এসব বাজারে নিতে মানা।
মুড়কি সন্দেশ মুড়ি তায় ওষুধের গুঁড়ি
বারমাস নগরে বিকায়।।[২২]

শাসকের এইসব উপদ্রব সত্ত্বেও মুনাফা অর্জনের সুযোগটুকু পূর্ণমাত্রায় সদ্ব্যবহার করতো বণিকরা। ‘লৌহগণ্ডার পালা’য় বিমলা নদীর তীরে সিমুলের গড় ঘিরে গৌড় রাজা সেনাবাহিনী নিয়ে আক্রমণের উদ্যোগ করছেন। সারি সারি সৈন্য শিবিরের পরেই দোকানিরা বসে গেল পসরা সাজিয়ে—

বাজার বসিল মাঝে রাত্রে বেচাকেনা।
ঘাটি ঘাটি লোক বৈসে জাপাইয়া থানা।।[২৩]

বাজারগুলি গৃহস্থের প্রয়োজনীয় দ্রব্য ক্রয়ের স্থল। দোকানির লাভের জায়গা, আবার নিঃসম্বল ভিক্ষুকের সাহায্য প্রার্থনাও গতানুগতিকতায় অন্য রং এনে দেয়—

বাজারে মাগয়ে ভিক্ষা সম্বলের তরে।
চালু কড়ি দেই কেহ দয়া অনুসরে।।
বসনবিহীন ঘোষ ছেঁড়া কাঁথা গায়ে।[২৪] (আদ্য ঢেকুর পালা)

ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কুটির শিল্পেরও বিক্রয়কেন্দ্র এই হাট-বাজারগুলি। আমরা শিল্পকলা প্রসঙ্গেও দুএকটি কথা আলোচনা করে নিই। 'ধর্মমঙ্গাল' কাব্যে বাঙালি কৃতিত্ব রেখেছে শিল্পকলায়। বয়নশিল্প, ধাতুশিল্প, স্থাপত্য, ভাস্কর্য সর্বত্রই তার কুশলী কারিগরি দক্ষতা ধরা পড়েছে। বস্ত্রশিল্পে বাঙালির খ্যাতি সুদূরপ্রসারী প্রাচীনকাল থেকেই। সে খ্যাতি অক্ষুণ্ণ থেকেছে এই আখ্যানেও। যুবতী বধূ রঞ্জাবতী স্বামী কর্ণসেনের মনোরঞ্জনের জন্য পরিধান করেছে মহার্ঘ কাঁচুলি। ভারত পুরাণ থেকে কালীয়দমন, দানখণ্ড, সবই সূচীশিল্পের ফাঁকে ফাঁকে মূর্ত হয়ে উঠেছে সেই বস্ত্রখণ্ডে—

লক্ষ টাকার কাঁচুলি করিল পরিধান।
বিচিত্র লিখন তার ভারত পুরাণ।।
... ...
কাঁচলি উপরে লেখা নানা অবতার।
কালিয়া দমনে লেখা জগতের সার।।[২৫]

'পামরি' অর্থাৎ রেশমি বস্ত্রের কদর কমেনি একবিন্দু। শিশু লাউসেনকে চোরের কবল থেকে উদ্ধার করে হনুমান তাকে রেশমি বস্ত্র দ্বারা সুরক্ষিত করেছে—

লাউসেন করিয়া কোলে উঠে হনুমান।
পামরি বসন চির্‍্যা করে খান খান।।[২৬]

অভিজাত ভূস্বামী, প্রজার আনুগত্যে সন্তুষ্ট হয়ে বস্ত্রবিতরণ করেছে—এমন নজিরও বাদ যায়নি। বিশ্বস্ত প্রজা কালুডোম আর তার পত্নীর প্রতি লাউসেনের অকৃপণ দাক্ষিণ্য—

লখ্যাকে ইনাম দিল পদুমপুরা শাড়ি।
কালুর মাথায় রাজা বান্ধিল পাগড়ী।[২৭]

দরিদ্র গৃহে পাটের পাছুড়ি, কাঁথা ভুনিরই চাহিদা বেশি—"ডুমনি সকল পরে পদ্মপুরী ভুনি।"[২৮] মিশ্রসংস্কৃতির প্রভাবও পড়েছে পরিচ্ছদে। 'জাগরণ পালা'-য় কানড়ার যুদ্ধ সাজ পুরোপুরি মুসলমানি ধাঁচের—

পায়ে পরে ইজার আখ্যান মেঘমালা।
জামাজোড়া পরিতে অবনী হৈল আলা।।
কোমর কসিল রাণী বাইশ গজ পাগে।

দুসারি পটুকা বান্ধে অস্ত্র দুইভাগে॥[২৯]

ধাতুশিল্পেও বৈচিত্র্য এনেছে লাউসেনের হস্তধৃত শলাকাটি। বিশ্বকর্মার আশীর্বাদে নন্দ কামার কিভাবে নির্মাণ করেছে তীক্ষ্ণধার অস্ত্রটি, সারা 'কলানির্মাণ পালা' জুড়ে তারই বিবরণ। রামায়ণ, ইতিহাস, কাব্যকলা, মহাভারত, রাধাকৃষ্ণলীলা সবই ফুটিয়ে তোলা হয়েছে ছেনি বাটালির সাহায্যে। শুধু শলাকাই নয়; নানা জাতের বন্দুক, কামান, খঙ্গা, কাড়া, নাকাড়াশিঙা ইত্যাদি রণবাদ্য আর যুদ্ধাস্ত্র নির্মাণেও সফল ধাতুকার—

ডিগি ডিগি শব্দে কাড়ায় ঘন কাঠি।
কুড়ি হাত কাঁপা গেল গৌড়ের মাটি।।[৩০]

সোনা-রূপার নানা অলঙ্কারের শিঞ্জনও অভিজাত অন্দরমহলে সুর তুলেছে। কাটাকড়ি কর্ণভূষণ, গলায় গরুড়মণিহার, পায়ে পাশুলি, হাতে রসকাঁটি চুড়ি—রাণী, রাজকন্যাদের অঙ্গশোভা। দরিদ্র গৃহে—শোলার অলঙ্কারও যথেষ্ট সমাদৃত। 'জামতিপালা'য় মালীকন্যা শোলার অষ্টাভরণ নির্মাণ করেছে অপূর্ব দক্ষতায়—

টাঁড়বালা পাসুলি বউলি করে সাজ।
গড়িল শোলার শঙ্খে সাক্ষাৎ কবচ॥[৩১]

তবে সব কৃতিত্বকে ছাড়িয়ে গেছে কামিল্যা বিশ্বম্ভরের তৈরি নকল মুণ্ডটি। 'অনুমৃতা-পালা'য় মহামদ এক কুটিল চক্রান্ত করেছে। লাউসেনের মায়ামুণ্ডের সাহায্যে সমগ্র ময়না-নগরবাসীর মনোবল ভেঙে দেবার চেষ্টায় মেতেছে সে। তারই নির্দেশে বিশ্বম্ভর হিঙ্গুল, জউ, রূপা আর সোনা দিয়ে নির্মাণ করেছে মুণ্ড—

কল্পনা কুটিল তথি গড়ন সরস।
তখনি কাটিলে রক্ত পড়ে টসটস্।।[৩২]

এছাড়াও কারিগর-শ্রেষ্ঠ বিশ্বকর্মা 'লৌহগণ্ডার পালা'য় আশি মণ লোহার সাহায্যে নির্মাণ করেছেন বিশালদেহী গণ্ডারটিকে। সে গণ্ডার বহন করতে দশটি বলদের প্রয়োজন—

ধুমসী লোহার গণ্ডা তুলিল শকটে।
গোটা দশ বলদ আনিঞা তায় জোটে।।[৩৩]

স্থাপত্যশিল্পেরও বেশ কিছু নমুনা আমরা পাই। সাধারণ গৃহস্থের চৌচালা, জলটুঙ্গি, কামটুঙ্গি ইত্যাদির সঙ্গে পাচ্ছি কাঁচ নির্মিত ঘর-বাড়ি, যা আভিজাত্যের স্মারক—

দিনে দিনে ঘোষের বাড়ির ঠাকুরাল।
তোলা ঘর বাড়ী পাল্য কাঁচের দেওয়াল।।[৩৪]

অর্থাৎ আমরা দেখছি, কৃষি-শিল্প-বাণিজ্য এই ত্রিধারাতেই উৎপাদনের গতি স্বচ্ছন্দে বহমান। সুতরাং সমাজ-সদস্যের জীবিকা অর্জনের প্রচুর সুযোগ। তাঁতী, রজক, নাপিত, চাল-কলা বাঁধা দৈবজ্ঞ, বেদ পাঠকারী ব্রাহ্মণ ইত্যাদি বিভিন্ন বৃত্তিধারীর সাক্ষাৎ মেলে ধর্মমঙ্গলে। সমবৃত্তিধারীরা সাধারণত গোষ্ঠীবদ্ধ জীবনযাপনেই অভ্যস্ত ছিল। মল্লপাড়া, নিষাদপাড়া, শুঁড়িপাড়ার প্রসঙ্গ আখ্যান বর্ণনায় এসেছে। 'জামতিপালা'য় কর্পূরপাতর দাদা লাউসেনকে বলছে—

জামতি নগর দাদা অই দেখ চায়্যা
সর্বকাল সতন্তর এদেশের মায়্যা।
যোলশ বারুই এদেশে করে ঘর।[৩৫]

এই বারুজীবীদের মধ্য থেকে ধর্মপূজার পুরোহিতের দেখা মেলে। পুত্রলাভের আশায় রানি রঞ্জাবতী অনুরোধ করেছেন পুরদত্ত বারুইকে—

পুরদত্ত বারুই ধর্মের পূজা করে।।
সম্মুখে মোহর রাখি দণ্ডবৎ করে।
গলায় বসন রঞ্জা রহিলেন দূরে।।[৩৬]

ধর্মের পাণ্ডা কখনো মহিলা। যেমন সামুল্য আমিনী। আরক্ষা বিভাগে কোটাল, চৌকিদারের দেখা মেলে। লোহাটা বজ্জর, সারেঙ্গাধর মাল প্রমুখ বেতনভোগী মল্লবীরেরও কদর করতেন রাজারা। তবে সর্বাপেক্ষা সরগরম রাজার সেনাবাহিনী। জাতিধর্ম-নির্বিশেষে উপযুক্ত লোকমাত্রেই স্বাগত সেখানে। মুরারি বাগদি, গোবিন্দ মল্ল, সাতশত ঢালীর সর্দার হীরা রায়, রায়মল্ল কৈবর্ত উপস্থিত। লাউসেনের সর্বক্ষণের পার্শ্বচর কালু ডোম তার তের দলুই ডোম বাহিনী আর পত্নী লখ্যাকে নিয়ে সর্বদাই অতন্দ্র—"তুমি রাজা আমি প্রজা তুমি অধিপতি।/মোর হাতে সঁপি দিল্যা এ চারি রাউতি॥"[৩৭]

যোল ক্রোশ জুড়ে মার্-মার্ শব্দে রাজার ঠাট অগ্রসর হয়েছে, তার দীর্ঘ বর্ণনা করেছেন রূপরাম। সেখানে মুসলমান সৈন্যরাও বাদ পড়েনি—

হাসান হুসন সাজে পায়ে দিয়া মোজা।
যাহার ভিড়নে সাজে বাইশ হাজার খোজা॥...
বচন বলিতে কেহ সঙরে খোদায়।
এক রুটি পাইলে হাজার মিঞা খায়॥

প্রসঙ্গত বলে নেওয়া যায় যে, পশুজ সম্পদের কদর করতেন রাজারা। যুদ্ধবাহিনী সর্বদাই হাতির বৃংহন আর ঘোড়ার হ্রেষা রবে সচকিত থাকতো। মাণিকরাজ হস্তী চুরি যাওয়ায় পাত্র মহামদ সেই চুরির গুরুত্ব বোঝাতে বারবার বলেছে—

পাটরানী পাটহস্তী একুই সমান।[৩৯]

লাউসেনও যুদ্ধে যাওয়ার আগে কর্পূর পাতরকে বারংবার সচেতন করেছেন—

তিনসন্ধ্যা ঘোড়ার তত্ত্ব নিবে।
নিয়ম করিয়া তারে দানাপানি দিবে॥[৪০]

প্রশ্ন হল, মানুষ আর পশু মিলিয়ে বিশাল সৈন্যদল, প্রাসাদের অসংখ্য দাসদাসী, অগণিত আত্মীয়স্বজন এদের ভরণপোষণের অর্থ আসত কীভাবে? রাজারা প্রত্যক্ষভাবেই নির্ভরশীল ছিলেন আদায়ীকৃত করের উপর। এবার আসি খাজনা প্রসঙ্গে।

ঐতিহাসিক যদুনাথ সরকার সপ্তদশ শতাব্দীতে ভূমি-রাজস্ব প্রসঙ্গে বিস্তৃত আলোচনা করেছেন। সে আলোচনায় দেখছি, মীরজুমলা ১৬৫০-৫৩ খ্রিস্টাব্দের মধ্যভাগে ক্রমশই করের পরিমাণ বাড়াতে থাকেন। নিষ্কর জমিগুলি রাষ্ট্রের অধিকারভুক্ত করেন, ফলে

জনজীবনে ত্রাহি রব ওঠে। মীরজুমলার পদাঙ্ক অনুসরণ করে শায়েস্তা খাঁও খাজনা হিসেবে সংগ্রহ করেন প্রায় আটত্রিশ কোটি টাকা। কেন্দ্রের প্রত্যক্ষ হস্তক্ষেপের ফলে এই শতাব্দীতে সর্বত্রই ভূমিরাজস্ব আদায়ের আরম্ভ ও তখন থেকেই জামিদারি, পত্তনি- দারের ব্যবস্থা। যার ফল জমিদার বংশের সূচনা। তাঁদের কেউ কেউ 'রাজা' উপাধিও লাভ করেন।[৪১]

'অনাদ্যমঙ্গল'-এ এই ভূস্বামীরাই অধিকার বিস্তার করেছেন। কর আদায় প্রসঙ্গেও তাঁরা নিষ্ঠুরভাবে সক্রিয়। লাউসেন ময়নানগর ইজারা পেয়েছে গৌড়েশ্বরের কাছ থেকে। কিন্তু তার পরিবর্তে 'রাজার লবণ খাই রাজার চাকর' এই বোধটাই তাঁর মধ্যে সদাজাগ্রত। গৌড়েশ্বরও সময় বুঝে মালিকানা জাহির করেন, নানা বিপজ্জনক যুদ্ধের মুখে এগিয়ে দেন পুত্রসম লাউসেনকে। কামরূপ যাত্রাকালে লাউসেন দ্বিধান্বিত, গর্জে উঠেছেন গৌড়রাজ—

তবে যদি কাঙুর মহিম নাঞি যাবে।
পরিণামে হেলায় প্রলয় দুঃখ পাবে॥
তিনসন ময়নার বেবাক কর নিব।
তারপর দারুণ পাথর বুকে দিব॥[৪২]

ঐ গৌড়রাজই যখন নিজভূমিতে কর ধার্য করেন তখন ঘনিয়ে এসেছে দুর্যোগ—

গৌড়ের বিগা প্রতি এক আনা কর।
পুত্রের দ্বিগুণ প্রজা গেল দেশান্তর॥[৪৩]

বার বৎসরের বাকি রাখা খাজনার হিসাবও কাগজে কলমে আদায় করা হয়েছে—

বার বৎসরের কর হিসাব করিল।
সম্মুখে বেবাক করে কর্পূর ধবল দিল॥[৪৪]

বিদেশি পথিকদের উপরও খাজনা আদায়ের জন্য জুলুম করেছে সুরীক্ষা সুন্দরী—

শুনহ বৈদেশী দুই রাজার নন্দন।
কড়ি নাঞি দিলে কেবা ছাড়া দিবে গণ॥[৪৫]

ধর্মপূজার নামেও আদায় করা হতো দেহারা। 'শালে ভর পালা'য় জয়পতি মণ্ডল অনিচ্ছা সত্ত্বেও রানি রঞ্জাকে দিয়েছে ধর্মের দেহারা—

এত শুনি মণ্ডল বদন করে ভারি।
ঘর হৈতে ধান মাপ্যা দিল পাঁচ আড়ি॥[৪৬]

অর্থাৎ কড়ি ছাড়াও ধানের পরিমাপেও দেয় কর গ্রাহ্য হতো।

কর আদায়ের জন্য নিযুক্ত থাকতো রাজকর্মচারী। রাজার লিখিত পরওয়ানা নিয়ে তারা অধীনস্থ জায়গিরদারদের কাছ থেকে প্রাপ্য খাজনা আদায় করতো। এমন এক কর্মচারী সোমঘোষ, গৌড়রাজের পরওয়ানা নিয়ে ঢেকুর গড়ে উপস্থিত—

রাজার কবজপত্র সোম ঘোষ দিল।
কর্ণসেন পড়্যা মনে চিন্তিত হৈল॥

হাথে ধরি সোমঘোষে বসায় দরবারে।
হিসাব করিয়া কর দিলেন ঘোষেরে।।[৪৭]

এই সোমের পুত্র ইছাই বিদ্রোহ ঘোষণা করেছে গৌড়ের বিরুদ্ধে। তারই নিযুক্ত লোক গৌড়ের রাজকর লুট করে নিয়েছে—

গৌড় শহরে যায় লয্যা ইরসাল।
রাজকর লুট্যা নিল ব্যালিশ চণ্ডাল।।[৪৮]

সাধারণত টাকা আর কড়ির এককেই কর নির্ধারিত হতো। অন্যান্য বৃত্তির ক্ষেত্রেও কড়ির প্রয়োগ দেখা গেছে। লাউসেনের গৃহশিক্ষকের সম্মান-দক্ষিণা মাস প্রতি বিংশতি কাহন কড়ি, দিনমজুরদের দৈনিক বরাদ্দ—'পাঁচ কুনি চাল আর কুড়ি সাত পন'। দরিদ্র ভাজনবুড়ী তার বাড়ি বিক্রি করে পেয়েছে মাত্র দশপন কড়ি। মহার্ঘ বস্তুর মূল্য নির্ধারিত হতো মোহরে। 'জামতি পালা'য় মালিনী বিনা সুতার যে-মালা গেঁথেছে তার দাম পঞ্চাশ মোহর, কারণ—

বসন্ত খরায় পুষ্প হয় না মলিন।
গলায় পরিলে গন্ধ থাকে দশদিন।।[৪৯]

মোহরের একচেটিয়া ব্যবহার অবশ্য ধনী গৃহেই। দক্ষিণা প্রদান কালে, রাজকর্মচারীদের বিভিন্ন কার্যে নিয়োগের বায়না ছাড়াও উৎকোচ প্রস্তাবেও মোহর উপস্থিত। কুচক্রী মহামদ লাউসেন হত্যার চক্রান্তে সামিল করতে চেয়েছে গদা মাহুতকে। লোভ দেখিয়েছে—

দু'হাতে টোডর দিব দুই কানে সোনা।
আর দিব বক্‌শিস গা এর খাসা জামা।।[৫০]

অনুগত প্রজাদের প্রায়ই তালুক উপহার দেওয়া হতো। লাউসেনও হস্তীবধের পুরস্কার স্বরূপ ইনাম পেয়েছেন ময়নাশহর। অর্থাৎ রাজা-প্রজার সম্পর্কটা শুধুই শোষক-শোষিতের নয়। নানা উপলক্ষ্যদানের নজিরও আছে। পুত্রমুখ দেখে কর্ণসেনের প্রতিক্রিয়া—

নাপিত রজকের রাজা দিল জামাজোড়া।
ইনাম করিল দুই চড়নের ঘোড়া।।
পথে রাখে চউকি পথিক ধর‍্যা আনে।
তৈল মাখাইয়া তার সোনা দেই কানে।।
নয়ন ভরিয়া রাজা দেখে পুত্রমুখ।
বৃদ্ধকালে পুত্র হৈল মনে বড় সুখ।।[৫১]

তীর্থভ্রমণ ও ধর্মের পূজা করে স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করেছেন রঞ্জাবতী। স্বজন-পরিজনকে দিয়েছেন অজস্র উপহার—

প্রতি জনে ভূষা দিল বস্ত্র অলঙ্কার।
দণ্ডবৎ প্রণাম করিল বারে বার।।[৫২]

এই আদান-প্রদানের মারফৎ সম্পর্কের ভিতটি মজবুত হয়েছে। প্রজাকণ্ঠে সোচ্চার হয়েছে আনুগত্য—

রাজ আজ্ঞা পাইলে বাপের মাথা কাটি॥[৫৩]

আর সদাশয় নৃপতির কণ্ঠেও উচ্চারিত উপদেশ—

পুত্র ভাব সমান প্রজার তত্ত্ব নিবে।
সম্পদ না থাকে যদি ঘর হৈতে দিবে॥[৫৪]

এত সচেতনতা সত্ত্বেও দারিদ্র্য দূর হয়নি। সম্পদ বণ্টনের অসাম্য বড়ো মর্মান্তিক ঠেকেছে মাঝে মধ্যেই। পুত্রস্নেহে অন্ধ রানি লাউসেনকে বিদেশে রোজগারের উদ্দেশ্যে যেতে দিতে নারাজ। তাঁর আক্ষেপের মধ্যেও ধনীগৃহে ঐশ্বর্যের ঝলক—

কাঞ্চন মুকুতা কত গড়াগড়ি যায়।
ধনের গৌরবে দাসী অন্ন নাহি খায়।
সুবর্ণের কই মৎস্য রহলি খেলায়।
বিশ কাহন কড়ি তোর ঝাঁটালাতে যায়॥[৫৫]

এরই বিপরীতে কালুডোমের প্রতি ইছাই যে কুৎসা নিক্ষেপ করেছে তা রূঢ় হলেও কঠোর সত্য—

তোমার মাগের নাম লখিয়া ডুমনী।
ঘরে ঘরে সন্ধ্যাকালে মাগিত আমানি॥
পুখুরের পাড়ে ঘর পাত্রের ছায়নি।
বরিষা বাদলে ঘরে নাহি ধরে পানি॥[৫৬]

অর্থবণ্টনের এই যে অসাম্য, তার মূলে অসাধু রাজকর্মচারীদের দায়িত্ব অনেকটাই। ধর্মমন্দির নির্মাণকার্যে গৌড়রাজ যখন মহামদকে বলেন—

দশ লক্ষ তঙ্কা কড়ি তুমি গিয়া লেহ।
অভিমত ধর্মের দেহারা ঘর দেহ।।[৫৭]

তখন কুচক্রী মহামদ সব অর্থই আত্মসাৎ করেছে। কুটিলতার মাত্রা চরমে পৌঁছেছে এই ভাবনায়—

দেহারা তুলিব দেশে বেগার ধরিয়া।
খরচ করিব ধন কিসের লাগিয়া।।[৫৮]

অসাধু কর্মচারীদের সঙ্গেই সমান তালে চলেছে হানাদারদের উৎপাত। 'সিন্দল চোর সিন্দ দেয় গৃহস্থের বাড়ী'—এই জাতীয় ছোটোখাটো চুরি ছেড়ে দিলেও বড়ো বিপর্যয় দেখা গেছে কামদল বাঘের আক্রমণে। দুরন্ত বহিংশত্রু কামদল ব্যাঘ্র যেভাবে অর্থনীতির ভিত নড়িয়ে দিয়েছে তা ভয়াবহ—

লুট কর্যা যায় বাঘ চৌরাশি বাজার।
গরু মহিষ খাইয়া করিল একাকার॥
কুম্ভকার বণিক বারুই ধর্যা খায়।
সন্ধ্যাকালে হইলে তাঁতি বাড়ী যায়॥[৫৯]

অন্ধকারজগতের বাসিন্দাদের আকস্মিক আক্রমণ যে প্রায়ই জনপদকে বিধ্বস্ত করতো

তারই নজির এটি। এর সঙ্গেই যুক্ত হয়েছে প্রাকৃতিক বিপর্যয়।

'অঘোরবাদল পালা'য় প্রচণ্ড বন্যায় গৌড়দেশ বিধ্বস্ত হয়েছে। ক্রুদ্ধ ধর্মঠাকুরের কোপে দেশবাসী সর্বস্বান্ত—

ঢেউ উপরে ঢেউ প্রমাণ পর্বত।
হাথি ঘোড়া ভাস্যা যায় সিংহাসন রথ॥
খাট পাট জলে ভাসে মরাইর ধান।
সরিসা কাপাস তিল গম মুগ পান॥[৬০]

অন্ন-বস্ত্রহীন নাগরিক জীবনে মহামারির প্রকোপ দেখা দিয়েছে। আশা-ভরসাহীন সমাজসদস্যরা এক স্থায়ী বিভীষিকার আশঙ্কায় ত্রস্ত। বীর হনুমান সেই নিরাশা বাণীটি উচ্চারণ করেছেন 'স্বর্গারোহণ পালা'য়—

কলিযুগে সকল হইব একাকার।
কদাচিত না রহিব বর্ণের বিচার॥
ধনী হব নির্ধন নির্ধন হব ধনী।
উন সেরে ধান চালু বেচিবে গৃহিণী॥
অকাল দুর্ভিক্ষ হব অশেষ জঞ্জাল॥[৬১]

এই ভবিষ্যৎবাণীটি কবি রূপরামেরই পোড় খাওয়া জীবনেরই স্বতঃস্ফূর্ত সিদ্ধান্ত, এমনটা মনে করা সম্ভবত ঠিক নয়। হনুমানের উদ্দেশ্য ছিল লাউসেনকে পৃথিবীর মায়া কাটিয়ে পুনরায় স্বর্গে স্থিত করা। সুতরাং তিনি বলতেই পারেন—

শতবর্ষ পরমাউ বিশাশয় ফাঁড়া।[৬২]

কিন্তু রূপরাম জীবনকে ভালোবেসেছিলেন। কর্ম ও কর্মীর প্রতি, উদ্যম আর নিষ্ঠার প্রতি তাঁর শ্রদ্ধা ছিল। ধর্মমঙ্গালে কর্মমুখর বাঙালি বলেছে—

মা বাপের উপায় যে জন বস্যা খায়।
গাধার জহর বলি নাম লেখ্যা যায়।[৬৩]

এ ধরনের পরধন-প্রত্যাশী না হয়ে বংশানুক্রমিক ধন সত্ত্ব ভোগ না করে উপার্জনে ঝাঁপিয়ে পড়াই তাদের রীতি। মঙ্গালকাব্যের অন্যান্য কবিকুলের মতোই রূপরামও স্বপ্ন দেখেছেন সুখ, ঐশ্বর্যে সমৃদ্ধ জীবনের। তাঁর 'অনাদ্যমঙ্গাল'-এ কাঙুর 'স্বর্গপুরী সম শোভাদারী' আর বর্ধমান 'আদ্যের অমরাবতী'। আর গৌড়ের বর্ণনায় বলেছেন—

বার ভূঞা দরবারে বসিয়া সারি সারি।
তরাসে পতঙ্গা কাঁপে প্রতাপে কেশরী॥
নামজাদা সিফাই যতেক জমাদার।
দলে বলে দড় বড় রাজার দরবার॥
খানসামা মিঞা বৈসে সারিয়া কামান।
ষোল ধার বৈসে হিন্দু মগল পাঠান॥
নব লক্ষ সেনা খায় সদর মাহিনা।
ঘরে বস্যা ক্ষেম কায় বিগা প্রতি আনা॥

হারা চুরি ডাকা নাহি নাহি অবিচার।
শ্রীরাম সমান করে ধর্মের বিচার॥[৬৪]

উচ্চ-নীচ ভেদ নেই, নেই অরাজকতা, জাতিভেদ। সুশিক্ষা, সুবিচার, ঐশ্বর্য সমৃদ্ধির এই যে চিরন্তন ছবি এঁকেছেন রূপরাম চক্রবর্তী, তা চিরকালের উদ্যোগী বাঙালিকে স্বপ্ন দেখাবে, উৎসাহ জোগাবে। 'অনাদ্যমঙ্গল' কাব্যও তখন ধর্মপ্রচারের উদ্দেশ্যকে অতিক্রম করে বৃহত্তর ব্যঞ্জনায় সার্থক হয়ে উঠবে।

<u>উৎসের সন্ধানে</u>

১. অক্ষয়কুমার কয়াল (সম্পাদিত) : রূপরাম চক্রবর্তী বিরচিত ধর্মমঙ্গাল, পৃ. ৯৩
২. তদেব, পৃ. ২১৪
৩. আশুতোষ ভট্টাচার্য : বাংলা মঙ্গালকাব্যের ইতিহাস, পৃ. ২৪৬
৪. দ্রষ্টব্য ১ সংখ্যক টীকা, পৃ. ২৮০
৫. তদেব, পৃ. ৪০
৬. তদেব, পৃ. ৭
৮. তদেব, পৃ. ৯
৯. তদেব, পৃ. ৯
১০. তদেব, পৃ. ২০
১১. The History of Bengal. ed. Jadunath Sarkar. p. 20
১২. দ্রষ্টব্য ও সংখ্যক টীকা, পৃ. ১৯
১৩. তদেব, পৃ. ৩২৮
১৪. তদেব, পৃ. ৬৩
১৫. তদেব, পৃ. ৬৩
১৬. তদেব, পৃ. ২০৫
১৭. তদেব, পৃ. ৮২
১৮. তদেব, পৃ. ৮২
১৯. রমেশচন্দ্র মজুমদার : 'বাংলা দেশের ইতিহাস', মধ্যযুগ, পৃ. ১৯
২০. দ্রষ্টব্য ১ম সংখ্যক টীকা, পৃ. ২৭৩
২১. তদেব, পৃ. ২০০
২২. তদেব, পৃ. ৩৩৭
২৩. তদেব, পৃ. ২৮৯
২৪. তদেব, পৃ. ২০
২৫. তদেব, পৃ. ৩৩৮
২৬. তদেব, পৃ. ৮৫
২৭. তদেব, পৃ. ১৮০
২৮. তদেব, পৃ. ১৮০
২৯. তদেব, পৃ. ৩৩৯
৩০. তদেব, পৃ. ২৫
৩১. তদেব, পৃ. ১৬৩
৩২. তদেব, পৃ. ২৭১
৩৩. তদেব, পৃ. ২৪৩
৩৪. তদেব, পৃ. ২০
৩৫. তদেব, পৃ. ১৪৯
৩৬. তদেব, পৃ. ১৯০

৩৭. তদেব, পৃ. ৩৪৮
৩৮. তদেব, পৃ. ২৫
৩৯. তদেব, পৃ. ১৯০
৪০. তদেব, পৃ. ৩৪৮
৪১. তথ্যসূত্রের জন্য দ্রষ্টব্য ১১ সংখ্যক টীকা পৃ. ২৩৪-৩৫
৪২. দ্রষ্টব্য ১ সংখ্যক টীকা পৃ. ২২১
৪৩. তদেব, পৃ. ৪৩
৪৪. তদেব, পৃ. ২২৬
৪৫. তদেব, পৃ. ১৬৭
৪৬. তদেব, পৃ. ৪১
৪৭. তদেব, পৃ. ২০
৪৮. তদেব, পৃ. ২৪
৪৯. তদেব, পৃ. ১৬১
৫০. তদেব, পৃ. ২২০
৫১. তদেব, পৃ. ৭৭
৫২. তদেব, পৃ. ৬৮
৫৩. তদেব, পৃ. ৮৩
৫৪. তদেব, পৃ. ২৯৭
৫৫. তদেব, পৃ. ২৬৪
৫৬. তদেব, পৃ. ২৭০
৫৭. তদেব, পৃ. ২৯৩
৫৮. তদেব, পৃ. ২৯৩
৫৯. তদেব, পৃ. ১২৬
৬০. তদেব, পৃ. ২৯৭
৬১. তদেব, পৃ. ৩৬৭
৬২. তদেব, পৃ. ৩৬৭
৬৩. তদেব, পৃ. ১০৪
৬৪. তদেব, পৃ. ১৮

রূপরামের ধর্মমঙ্গালে লৌকিক উপাদান

বিজনকুমার মণ্ডল

শিল্পের মধ্য দিয়ে শিল্পীর যে ভাবের প্রকাশ ঘটে তা পারিপার্শ্বিক গণ্ডিকে আবর্তন করেই। শিল্পী নিজস্ব ব্যক্তিত্ববোধ ও উপলব্ধিতেই সমাজকে প্রকাশ করেন। তাই বারে বারে সমাজের নানান দিক এই ধরনের রচনায় উঠে আসে। দেব-দেবীকেন্দ্রিক মঙ্গালকাব্যের রচনাতেও তার ব্যতিক্রম ঘটেনি। দেব-দেবীর মাহাত্ম্য বর্ণনা কিংবা ঘটনাপ্রবাহের সঙ্গো খণ্ড খণ্ড ভাবে সংযোজিত হয়েছে সমাজের নানাবিধ উপাদান। রূপরামের 'ধর্মমঙ্গাল' কাব্যেও সেই উপকরণই নানাভাবে আবর্তিত হয়েছে।

মঙ্গালকাব্যের ইতিহাসে ধর্মমঙ্গালের কাব্যধারার আবির্ভাব প্রায় শেষ পর্যায়ে; যদিও বাংলা মঙ্গালকাব্য ধারার শেষ কবি রায়গুণাকর ভারতচন্দ্র। মঙ্গালকাব্যের কাহিনি, চরিত্র, অভিপ্রায় প্রভৃতি বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় এগুলি হল লোকসাহিত্যের লিখিতরূপ— যার উৎস নিহিত রয়েছে প্রাচীন মৌখিক সাহিত্যের মধ্যে। মঙ্গালকাব্যগুলিতে লক্ষ করা যায় সামাজিক একাধিক উপাদানের অবস্থান। মূলকাহিনি কিংবা চরিত্রের মধ্যে স্পষ্টভাবেই দৃষ্টিগোচর হয় সমাজ-জীবনের প্রচলিত উপকরণ, যেমন— ধাঁধা, প্রবাদ-প্রবচন, আচার-আচরণ, রীতি-নীতি ইত্যাদি।

'ধর্মমঙ্গাল' কাব্যের কাহিনি ও চরিত্রগুলি কবির কল্পনায় জারিত হয়ে সাহিত্যরূপে প্রকাশিত হয়েছে। কল্পনার আলোকে ঐতিহাসিক চরিত্রগুলির বীরত্বব্যঞ্জক দিকটি বিশেষভাবে প্রকাশিত হয়েছে। ধর্মমঙ্গালের কাহিনিতে ইতিহাসনির্ভর জনশ্রুতিই কাব্য-সৃষ্টির মূল আঙ্গিক। রাঢ় অঞ্চলের ঐতিহাসিক ঘটনাই এর মূল বিষয়।

'ধর্মমঙ্গাল'-এ মোট চব্বিশটি পালা রয়েছে, যেখানে নায়ক লাউসেনের 'জন্ম থেকে স্বর্গারোহণ' পর্যন্ত কীর্তিকলাপ বর্ণিত হয়েছে এবং প্রচার করা হয়েছে ধর্মঠাকুরের মহিমা। ধর্মমঙ্গালের পালাগুলির মধ্যে রয়েছে—স্থাপনা, ঢেকুর, রঞ্জাবতীর বিবাহ, হরিশচন্দ্র, শালে ভর, লাউসেনের জন্ম, আখড়া, ফলা নির্মাণ, গৌড়যাত্রা, কামদল বধ, জামাত, গোলাহাট, হস্তিবধ, কাঙুর যাত্রা, কামরূপ যুদ্ধ, কানাড়ার স্বয়ম্বর, কানাড়ার বিবাহ, মায়ামুণ্ড, ইছাই বধ, অঘোর বাদল, পশ্চিমে সূর্য উদয় আরম্ভ, জাগরণ, পশ্চিমে সূর্য উদয় ও স্বর্গারোহণ। ধর্মমঙ্গালের কাহিনি বর্ণিত রয়েছে একাধিক কবির রচনায়। তাদের মধ্যে ঘনরাম, মানিকরাম ও রূপরাম প্রধান। ঘনরামের বর্ণনার সঙ্গো মানিকরাম কিংবা রূপরামের কাব্যের বর্ণনার বিশেষ কোন পার্থক্য পাওয়া যায় না—কেবল দু-একটি নামের পার্থক্য ছাড়া। আত্মপরিচয়ের বর্ণনায় অবশ্য কিছু পার্থক্য লক্ষ করা যায়। বিস্তৃত আত্মপরিচয় ঘনরামের কাব্যে পাওয়া না গেলেও রূপরাম ও মানিকরামের কাব্যে পাওয়া যায়।

'ধর্মমঙ্গাল' কাব্যের রূপরাম চক্রবর্তী হলেন আদিকবি। তাঁর কাব্যের রচনাকাল সপ্তদশ শতকের মাঝামাঝি। এঁর রচনা থেকে জানা যায় যে, তিনি ধর্মঠাকুরের দেখা পেয়েছিলেন—

আধা-সন্ন্যাসী, আধা-ফকিররূপে তেপান্তরের মাঠে। আসলে ধর্মমঙ্গালের ধর্মঠাকুর হল অর্বাচীন ও অন্-আর্য দেবতা, যা রচয়িতাদের নিজস্ব বিশ্বাসে রচিত হয়েছে। অপরাপর মঙ্গালকাব্যের মতো ধর্মমঙ্গাল কাব্যেও দেখা যায় যে, ধর্মের আদেশেই রচয়িতারা কাব্যটি রচনা করেছেন। ধর্মঠাকুরই ভক্ত-কবির একমাত্র আশ্রয়স্থল বা ভরসার কেন্দ্র।

ধর্মমঙ্গালকাব্যের প্রধান বৈশিষ্ট্য হল ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটকে ভিত্তি করে গড়ে ওঠা। রাঢ় অঞ্চলের জাতীয় চরিত্রকে অবলম্বন করেই এর কাহিনি আবর্তিত। রূপরাম চক্রবর্তী তাঁর কাব্যে 'ধর্ম' দেবতার যে পরিচয় দিয়েছেন তা এই রকম—

ধবল অঙ্গোর জুতি ধবল আসনে স্থিতি
ধবল বরণে বাড়ীঘর।
ধবল ভূষণ শোভা অনুপম মুনি লোভা
অলী কৈল পরম সুন্দর॥[১]

রাঢ় ও তার পার্শ্ববর্তী অঞ্চলের অধিকাংশ স্থানের লোকদেবতা হল ধর্মঠাকুর—যা সূর্যদেবতা হিসেবে প্রচারিত। প্রাচীনকাল থেকেই এই দেবতার পূজা প্রচলিত হয়ে চলেছে। কুষ্ঠরোগ থেকে মুক্তি পাওয়ার আশায় স্থানীয় মানুষ ধর্মঠাকুরের পূজা করে থাকে। দেবতার কোন বিগ্রহ থাকে না, শুধু একটুকরো পাথর বা শিলাই এখানে ধর্ম নামে পরিচিত।

আদিম জনগোষ্ঠীর ধর্মীয় আচারের মধ্যে ধর্মপূজা নিহিত,—এটি তাদের বিশেষ ধর্মীয় ক্রিয়াচার। দৈনন্দিন জীবনের সুস্থ ও স্বাভাবিকতা লাভ করাই এই আচারের মূল উদ্দেশ্য। সমাজে নিম্নকোটীর মানুষ, বিশেষ করে ডোম সম্প্রদায়ভুক্ত জনেরা ধর্মপূজার প্রধান পৃষ্ঠপোষক ও পূজক ; এঁরা কৃষিজীবী সমাজের সামগ্রিক জীবন-যাপনের কেন্দ্রীয় শক্তি হিসেবে পরিগণিত। স্বাভাবিকভাবে লৌকিক জীবনের নানা উপাদান এই কাব্যে গৃহীত হয়েছে। লোকায়ত জীবনের প্রতিটি পদক্ষেপ; যেমন— লৌকিক আচার, বিশ্বাস, প্রথা, সংস্কার, ছড়া, প্রবাদ, ধাঁধা প্রভৃতি প্রত্যক্ষ কিংবা পরোক্ষভাবে কাব্যে সংযোজিত হয়েছে। এমনকি চরিত্র-চিত্রণেও বাস্তবের সীমানাকে অতিক্রম করে যেতে পারেনি। তাই চরিত্রগুলি কাব্যে স্থান পেয়েছে বাস্তবতার নিরিখে। মঙ্গালকাব্যের মধ্যে বাংলার মাটির সঙ্গো আদিমতার মূলসুর নিহিত। চরিত্রগুলি বেশিরভাগ ক্ষেত্রে হয়ে উঠেছে একেবারে সর্বতোভাবে লৌকিক। লাউসেন 'ধর্মমঙ্গাল' কাব্যের নায়ক। ধর্মদেবতার পূজা প্রচারের জন্যই এই চরিত্রের সৃষ্টি। লাউসেন ধর্মদেবতাকে খুবই বিশ্বাস করে এবং বিপদের সময় তাঁকে স্মরণ করলেই তিনি লাউসেনের প্রতি সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেন, ধর্মের প্রতি তার বিশ্বাস অগাধ। যেমন—

১. লোহার গণ্ডারের শিরোশ্ছেদ করার পূর্বে—

ধর্মের-সঙরণে নিল দেবীর আতর।[২]

২. কিংবা হাকন্দ তপস্যা লাউসেনের ধর্ম আনুগত্যকে আরও বাড়িয়ে দেয়—

লাউসেন বলে আমি ধর্মের তপস্বী।
শুক্রবার দিনের মোর ধর্ম একাদশী।[৩]

ধর্মের প্রতি আনুগত্য যেমন প্রকটিত হয় ধর্মমঙ্গাল কাব্যে, তেমনি মানবসমাজের জন্য

তপস্যা—কৌম সমাজের যৌথ জীবনাচারের বৈশিষ্ট্যকে ফুটিয়ে তোলে। প্রাকৃতিক দুর্যোগে জনসাধারণের নিরাপত্তার জন্য ধর্মকে সন্তুষ্ট করার চেষ্টা লাউসেন করেছে হাকন্দ তপস্যায়—

ধুপধূনা পরিপাটি ঘোর অন্ধকার।
পূজা করে লাউসেন ঠাকুর খর তার॥
ভারত ভূমেতে যবে এক দণ্ড রাতি।
গাত্র বসাইল সেথ হীরাধার কাতি॥
সহামতো কাট্যা দেই দন্তের উপর।
যূথীপুষ্প হয়্যা পড়ে ধর্মের নিয়ড়॥
সব মাংস কাট্যা দিল অস্থি হৈল সার।
গলে কাতি দিল তবে রাজার কুমার॥
গলে কাল দণ্ড দিয়া বলে রাম রাম।
আপনার মাথা কাট্যা দিল বলিদান॥[৪]

রঞ্জাবতী চরিত্রের মধ্যেও চিরায়ত মাতৃসুলভ দিকটি ফুটে উঠেছে। লোকায়ত বিশ্বাস, ধর্ম উপাসক, সতী-সাধ্বী রমণী এবং পুত্রস্নেহে কাতরা জননী রঞ্জা বৃদ্ধ কর্ণসেনকে নিয়ে সুখী। তার পুত্রস্নেহের রূপটি এই রকম—

রঞ্জাবতী মনে করে ধর্ম পক্ষা বল।
এহার লাগিয়া বাছা কান্দিয়া বিকল॥
কালি হৈতে অন্ন জল না খায় তাম্বুল।
অম্বিকার অস্ত্র পাইয়্যা হয়্যাছে আকুল॥
কোথা গেলে কর্পূর লাউসেন দেখা দেও।
খড়্গোর সমান বাপু ফলা আন্যা লেও॥[৫]

আদিমকাল থেকে সমাজ-জীবনে প্রচলিত রয়েছে নানা ধরনের বিশ্বাস ও সংস্কার। মানুষের জীবনে ঘটে যাওয়া বিভিন্ন ঘটনার মধ্য দিয়ে বিবিধ অভিজ্ঞতা জন্ম নেয়। এই সব অভিজ্ঞতার নিরিখেই নানাপ্রকার বিশ্বাসের জন্ম। সভ্যতা বিকাশের প্রেক্ষাপটে বিশ্বাস ও সংস্কারগুলির অনবরত পরিবর্তন ঘটে চলেছে। লোকাচার, মন্ত্রতন্ত্র, যাদুক্রিয়া ও অনুষ্ঠান, বিধি-নিষেধ, ভাগ্য-গণনা, ভবিষ্যদ্বাণী, আশীর্বাদ, অভিশাপ, ঝাড়ফুঁক, তুকতাক প্রভৃতি লোকবিশ্বাস ও সংস্কারের প্রসঙ্গগুলিকে তুলে ধরেছে। রূপরামের 'ধর্মমঙ্গল' কাব্যে এই ধরনের নানা বিশ্বাস ও সংস্কার নানাভাবে বর্ণিত হয়েছে। 'লাউসেন চুরি পালা'য় লাউসেনকে চুরি করার জন্য পাশাপাশি সকলকে ঘুমে আচ্ছন্ন করে রাখতে মন্ত্রপূত ইঁদুরের মাটি ব্যবহার করা হয়েছিল—

পড়ামাটি সিঁদকাঠি যতনে লইয়া।
ময়না ঈশান কোণে উত্তরিল গিয়া॥
প্রথম নিন্দাটি দেয় ময়নাভুবনে।
মহাবিদ্যা জপ করে হরষিত মনে॥

বাম হাথে নিল নিন্দা ইন্দুরের মাটি।
তিনবার পরশ করিল সিঁদকাঠি॥
মন্ত্র পড়ি নিন্দাচোর ভাবে মনে মন।
ছমাসের নিদ্রা আইস ময়না ভুবনে॥
ময়না নগরে আজি যেইজন জাগে।
আমার নিন্দাটি গিয়া তার চক্ষে লাগে॥
শয়নে যে জন জাগে বস্যা যেবা খায়।
কালিকা দেবীর আজ্ঞা ধর গিয়া তায়॥
যুবতীর দুইচক্ষে দড় কর‍্যা ধর।
মনোজ-আগুনে তারা জাগে চারি পর॥
ইন্দুর-মৃত্তিকা তুমি আমি সিঁদাল চোর।
ময়নার ভিতরে পাড়িবে অঘোর ঘোর॥
ছমাসের নিদ্রা যদি না আস্যে এথাই।
ভোজরাজার আজ্ঞা কুম্ভকর্ণের দোহাই॥[৬]

আঞ্চলিকতার নিরিখে রন্ধনশৈলীর এক বিশিষ্টতাও এখানে দেখতে পাচ্ছি—যা এই সমাজের নিজস্বতাকে তুলে ধরতে সাহায্য করে। রন্ধনশৈলীর অনুরূপ বৈশিষ্ট্য পাওয়া যায় 'গোলাহাট পালা'য়। সুরিক্ষার রন্ধন-প্রণালী সমাজের নিজস্বতাকে তুলে ধরেছে এবং এই রন্ধন-প্রণালী লোকভাবনা জাত—

ভেরাণ্ডার ঢেঁকিতে ভাঙ্গিল উড়িধান।
ভগবতী আপনি সাক্ষাৎ অধিষ্ঠান॥
চালনি করিয়া জল আনিল ভবানী।
কর্পূর লাউসেন দেখ্যা মনে চিন্তা গুণি॥
কর্পূরের কাছে বৈসে করিতে রন্ধন।
লাউসেন মনে করে দেব নিরঞ্জন॥
উড়ি ধানে আতব তন্দুল সমাধিল।
আঙহাড়ি সরা লয়্যা রন্ধনে বসিল॥[৭]

লোকবিশ্বাসের নানা দিকের মধ্যে মৃত্যুর খবরে আমের ডাল ভাঙা বা ধরা উল্লেখ-যোগ্য একটি লৌকিক সংস্কার। এই ঘটনাকে ঘটতে দেখি 'অনুমৃতা পালা'য় লাউসেনের মৃত্যুর খবর শুনে রানিরা আমের ডাল ভেঙেছে বা ধরেছে—

এত বলি মুণ্ডদিল কলিঙ্গার আগে।
রাজার বচন শুনি মনে ভয় লাগে॥
আম ডাল ভাঙ্গিল রাউত চারি জন।[৮]

লোকবিশ্বাসের সঙ্গে লোকাচারও সমাজে প্রচলিত থাকে—যা সমাজ-পরিকাঠামোকে নিয়ন্ত্রণ করে। 'ধর্মমঙ্গল' কাব্যে লোকাচারের নানাদিক উল্লিখিত রয়েছে। শিশুর জন্মের আগে গর্ভধারিণীকে পঞ্চামৃত খাওয়ানোর লোকাচার রয়েছে। শিশুর ভবিষ্যৎ মঙ্গালের জন্য গর্ভধারিণীর

গর্ভের পঞ্চম মাসের লোকাচারটি পালন করার প্রথা এখানে উল্লেখ্য। দুধ, দই, ঘি, মধু ও চিনি—এই পঞ্চামৃত ভাবী শিশুর মাকে খাওয়ানোর রীতি পালিত হয়। 'জন্ম পালা'য় রয়েছে—

পঞ্চামৃত রঞ্জাবতী খায় পঞ্চ মাসে।[৯]

মায়ের গর্ভের শিশুর পূর্ণকলেবরের অস্তিত্ব-স্পন্দন যখন উপলব্ধি হয় তখন আর একটি লোকাচার অনুষ্ঠিত হয়—যার নাম 'সাধভক্ষণ', এই অনুষ্ঠানটি মূলত খাদ্য-বিষয়ক লোকাচার।

ছয় মাস নিবড়িল সাতে পরবেশে।
নানা সাধ খায় রাণী অপূর্ব সন্দেশে॥[১০]

শিশুর জন্মের পর প্রসূতিকে আঁতুড় ঘরে রাখা হয় এবং ওই সময় শিশুর নামকরণ করা হয়!

সাজিল অনেক রাস সুতিকার ধাম।
আঁতুড়ে রাখিল তার লাউসেন নাম॥[১১]

দৈবের প্রতি ভরসা রাখা সাধারণ মানুষের অন্যতম চরিত্র-বৈশিষ্ট্য। 'ধর্মমঙ্গাল' কাব্যে দৈবের প্রতি ভরসা ও নিজের সুখের জন্য দেবতাকে আরাধনা বা পূজা করার দিকটিও লক্ষ করা যায়। 'বিবাহ পালা'য় রঞ্জাবতীর ব্রত করা প্রসঙ্গে রয়েছে—

বার মাসে রঞ্জাবতী তের ব্রত করে।
মিথুন মকর তুলা পূজে মনোহরে॥[১২]

এছাড়াও নানা ধরনের রীতি-নীতি, আচার-আচরণ পালনের প্রসঙ্গও কাব্যের মধ্যে ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে। মৌখিক সাহিত্যের অন্যতম রূপ ধাঁধা ও প্রবাদ 'ধর্মমঙ্গাল' কাব্যে প্রচুর পরিমাণে পেয়ে থাকি। 'গোলহাট পালা'য় সুরিক্ষা গণিকা মুক্তির শর্ত হিসেবে লাউসেনকে একটি ধাঁধা জিজ্ঞাসা করেছে—

কাঙুরের কামিখ্যা কামিনীরূপে আইসে।
সর্বাঙ্গ থাকিতে নারীর ধাউত কোথা বৈসে॥[১৩] (যুবতীর চোখ)

প্রবাদেও সমাজ জীবনের চিত্র ফুটে ওঠে, 'ধর্মমঙ্গাল' কাব্যেও প্রবাদের ব্যবহার দেখতে পাওয়া যায়—যা সমাজের খণ্ড চিত্র তুলে ধরতে সাহায্য করে—

১. 'কপালের লেখা তার না যায় খণ্ডন।'
২. 'পুত্র বিনে ধন গারি জীবন অসার।'
৩. 'ভুজঙ্গ ব্যাকুল যেন হারাইয়া মণি।'
৪. 'জন্মিলে মরণ আছে এড়াবার নাই।'
৫. 'কপালে ঘটিলে কিবা বলা নাঞি যায়।'
৬. 'অসত্য সমান পাপ নাহিক সংসারে।'

লোক-কাব্য আলোচনার প্রেক্ষাপটে দেখা যায়, কাহিনি নির্মাণে, চরিত্র সৃষ্টিতে খণ্ডচিত্র রচনায় বিপুল পরিমাণ তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে সেই সময়কার সাধারণ মানুষের মুখে মুখে প্রচলিত লৌকিক উপকথা, ব্রতকথা, ধাঁধা, প্রবাদ প্রভৃতি থেকে। তাই মঙ্গালকাব্যের অধিকাংশ অংশই লোকসাহিত্যের গর্ভজাত। রূপরামের 'ধর্মমঙ্গাল' কাব্যও তার থেকে ব্যতিক্রম নয়।

<u>উৎসের সন্ধানে</u>

১. অক্ষয়কুমার কয়াল সম্পাদিত : 'রূপরাম চক্রবর্তী বিরচিত ধর্মমঙ্গাল', পৃ. ১
২. তদেব, পৃ. ২৪৫
৩. তদেব, পৃ. ৯৯
৪. তদেব, পৃ. ৩৫১
৫. তদেব, পৃ. ১০৯
৬. তদেব, পৃ. ৮১
৭. তদেব, পৃ. ১৭৪
৮. তদেব, পৃ. ২৭২
৯. ড. সুকুমার সেন ও ড. পঞ্চানন মণ্ডল সম্পাদিত : 'রূপরামের ধর্ম্মমঙ্গাল'; এপিক পাবলিশার্স, পৃ. ৯৭
১০. তদেব, পৃ. ৯৭
১১. তদেব, পৃ. ৯৮
১২. তদেব, পৃ. ৫০
১৩. অক্ষয়কুমার কয়াল সম্পাদিত : রূপরাম চক্রবর্তী বিরচিত ধর্মমঙ্গাল, পৃ. ১৭২

<u>তথ্যের সন্ধানে</u>

১. অক্ষয়কুমার কয়াল (সম্পাদিত) : রূপরাম চক্রবর্তীর বিরচিত ধর্মমঙ্গাল।
২. সুকুমার সেন এবং পঞ্চানন মণ্ডল (সম্পাদিত) : রূপরামের ধর্ম্মমঙ্গাল।
৩. মৃত্যুঞ্জয় গুঁই : প্রাচীন বাংলা সাহিত্যে লোকাচার ও লোকবিশ্বাস।
৪. ইন্দুভূষণ মণ্ডল : বাংলা মঙ্গালকাব্যে লৌকিক উপাদান।

ঘনরামের ধর্মমঙ্গাল কাব্যের বীরাঙ্গানা নারীরা : পরবর্তী কালের সাহিত্যদর্পণে

পিয়ালী খাঁ

মধ্যযুগীয় মঙ্গালকাব্যের ধারায় মনসামঙ্গাল, চণ্ডীমঙ্গাল, ভারতচন্দ্রের অন্নদামঙ্গালের পাশাপাশি ধর্মমঙ্গাল সদর্পে তার নিজস্ব স্থান অধিকার করে রয়েছে। ধর্মঠাকুরের মাহাত্ম্য প্রচারই এই কাব্যের মূল লক্ষ্য। বিষয়বস্তুর প্রাচীনত্বের দিক থেকে এ কাব্য মঙ্গালকাব্যগুলির মধ্যে সর্বাপেক্ষা প্রাচীন এবং অন্যান্য মঙ্গালকাব্যের থেকে বেশ কিছু ক্ষেত্রে স্বতন্ত্রও বটে। অন্যান্য মঙ্গালকাব্যগুলিতে যেখানে স্ত্রী-দেবতাদের পূজা প্রচারিত হয়েছে, সেখানে ধর্মমঙ্গালের উপাস্য দেবতা একজন পুরুষ—ধর্মঠাকুর। এ কাব্যের লাউসেন, ইছাই ঘোষ (ঈশ্বরী ঘোষ)-এর মতো চরিত্রগুলি ইতিহাস-স্পর্শবর্জিত নয় (যদিও অন্নদামঙ্গালেও ঐতিহাসিক চরিত্রের দেখা মিলেছে)। আমাদের বর্তমান উদ্দেশ্য অবশ্য অন্যান্য মঙ্গালকাব্যের সঙ্গো এই কাব্যের সাদৃশ্য-বৈসাদৃশ্য আলোচনা করা নয়, বরং এই কাব্যের নারী চরিত্রগুলির বিশদ আলোচনা প্রসঙ্গো পরবর্তীকালের সাহিত্যে তার প্রভাব কতখানি তা বুঝে নেওয়া। ধর্মমঙ্গাল কাব্যে দুটি কাহিনি আছে হরিশচন্দ্রের কাহিনি ও লাউসেনের কাহিনি। এখন আমরা এই কাব্যধারার দুই জনপ্রিয় কবি রূপরাম চক্রবর্তীর (সপ্তদশ শতাব্দী) 'অনাদিমঙ্গাল' ও ঘনরাম চক্রবর্তীর (অষ্টাদশ শতাব্দী) 'অনাদিমঙ্গাল' (বা 'শ্রীধর্মসঙ্গীত') কাব্য অবলম্বনে আমাদের বক্তব্য তুলে ধরার চেষ্টা করব।

হরিশচন্দ্রের কাহিনি

১. মদনা

হরিশচন্দ্রের কাহিনিতে দেখা যায় রাজা হরিশচন্দ্রের রাণী মদনা নিঃসন্তান হওয়ায় সমাজে লোকনিন্দার সম্মুখীন। বল্লুকা নদীর তীরে ভক্তগণ কর্তৃক ধর্মঠাকুরের পূজা দেখে ও তাঁর মাহাত্ম্যকথা শুনে রাজা ও রাণী ধর্মঠাকুরের পূজায় মনোনিবেশ করেন। জন্মের পর পুত্রকে ধর্মঠাকুরের কাছে বলি দিতে হবে— এই শর্তে তাঁরা পুত্রলাভ করেন। কিন্তু পরবর্তীতে তাঁরা প্রতিশ্রুতি রক্ষা না করলে ব্রাহ্মণের ছদ্মবেশে ধর্মঠাকুর তাঁদের উপস্থিত হন। তিনি রাজা ও রাণীর কাছে তাঁদের একমাত্র পুত্র লুইধরের মাংস ভক্ষণ করতে চাইলে রাজা ও রাণী পুত্রকে হত্যা করে তার মাংস রন্ধন করেন। তাঁদের আনুগত্যে সন্তুষ্ট হয়ে ধর্মঠাকুর লুইধরকে পুনরায় জীবিত করে দেন। সত্যপালনের জন্য নিজের একমাত্র আত্মজকে হত্যা করে তার মাংস রান্না করা একজন জন্মদাত্রীর পক্ষে যে কতটা শক্ত কাজ তা ভাবলেও শিউরে উঠতে হয়। বাংলা সাহিত্যে এ ধরনের চরিত্র সত্যই বিরল।

লাউসেনের কাহিনি

২. কলিঙ্গা ও কানড়া

ধর্মমঙ্গাল কাব্যের লাউসেন কাহিনিটিই সর্বাপেক্ষা জনপ্রিয়। লাউসেনের পাটরাণী কলিঙ্গা যুদ্ধবিদ্যায় অসাধারণ দক্ষ ছিল। সাংসারিক বিষয়বুদ্ধির থেকে এই নারীর বীরাঙ্গনা রূপটিই কাব্যে বেশি উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। সপত্নী কানড়ার সঙ্গে তার সহোদরার মতো সুসম্পর্ক বর্তমান। তাই লাউসেনের অনুপস্থিতিতে মহামদ যখন ময়নাগড় আক্রমণ করে তখন কলিঙ্গা 'রাজ্যপাট সংসার' কানড়াকে সঁপে দিয়ে নিজেই রণাঙ্গানে পা রাখে। বড়ো দিদির মতো বলেই সে কনিষ্ঠা কানড়াকে বিপদের মুখে না পাঠানোর সিদ্ধান্ত নেয়। যুদ্ধক্ষেত্রে কলিঙ্গার রণরঙ্গিণী রূপটিও বড়ো চমৎকার— 'ঘোড়ার রাউত রাণী যম দরশন।/বারভূঞা চায়্যা দেখে কত সেনাগণ।' শত্রুবাহিনীকে সে অসাধারণ দক্ষতায় পর্যুদস্ত করে, কিন্তু শেষে মহামদের সৈন্য দ্বারা আবৃত হয়ে পড়লে তাদের হাতে বন্দি হবার পূর্বেই তাকে আত্মঘাতী হতে হয়। প্রীতিলতা ওয়াদ্দেদার, ঝাঁসীর রাণী লক্ষ্মীবাঈ-এর মতো বাস্তবের চরিত্রগুলিও এভাবেই শত্রুর হাতে লাঞ্ছিতা হবার থেকে স্বেচ্ছামৃত্যুকেই শ্রেয় বলে মনে করেছিলেন। কাব্যে কলিঙ্গা চরিত্র অপেক্ষা কানড়া চরিত্রটিকে অপেক্ষাকৃত বিস্তৃতভাবে উপস্থিত করা হয়েছে। সে দৃঢ় চরিত্রের দুঃসাহসী যুবতি। কবি রূপরাম চক্রবর্তী জানিয়েছেন—

প্রতিজ্ঞা কর‍্যাছে কন্যা শিশুকাল হৈতে।
যেজন লোহার গণ্ডা হানিব জগতে।।
সেই কানড়ার স্বামী করিব বরণ।
অনেক দিবস আছে কানড়ার পণ।।

কুচক্রী মহামদ বৃদ্ধ গৌড়েশ্বরের সঙ্গে কানড়ার বিবাহ দিতে তৎপর হয়ে ওঠে কিন্তু 'বুড়া স্বামী নাঞি লয় কানড়ার মন।' লাউসেন লোহার গণ্ডার ভঙ্গ করলে কানড়া তাকে স্পষ্টভাবে জানায়— 'তোমার বনিতা আমি তুমি মোর স্বামী।' কিন্তু গৌড়েশ্বরের অনুগত লাউসেন এ বিবাহ করতে কিছুতেই সম্মত হয় না। অবশেষে সে জানায় যদি কানড়া তাকে যুদ্ধে পরাস্ত করতে পারে তবেই সে এ বিবাহে মত দেবে, নচেৎ নয়। ঘনরাম চক্রবর্তীর কাব্যে দেখি এর উত্তরে কানড়া যে উক্তি করে তা গোটা মধ্যযুগের কাব্যেই দুর্লভ—

বলে ধরি নিতে পারে কার হেন বুক।
বলিতে বলিতে কোপে ধরিল ধনুক।।
মরি যদি তোমার হাতে মোক্ষফল পাব।
হানিয়ে তোমার শির সহমৃতা হব।।

আর রূপরামের কাব্যে দেখি— 'হাসিতে হাসিতে বলে হেমন্তের ঝি।/বল বাঁট লাউসেন বিলম্বে কাজ কি।।' যুদ্ধে কানড়ার জয় হয় এবং লাউসেনের সঙ্গে সে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয়। শিমুলের রাজা হরিপালের কন্যা কানড়া এক বীর্যবতী রমণী। শক্তিশালী দেবী চণ্ডীর পূজারিণী সে। ভয়কে সে অনায়াসে জয় করেছে। গৌড়েশ্বরের আক্রমণে তাদের রাজ্য যখন বিপর্যস্ত তখন সে তার সঙ্গিনীদের নিয়ে গৌড়বাহিনীকে আক্রমণ করেছে

এবং রাজ্য থেকে বিতাড়িত করেছে। পরবর্তীতে ময়নাগড় রক্ষার জন্যও তার তেজস্বিনী মূর্তি দেখা যায়। গৃহস্থালির ক্ষুদ্রতা তাকে খুব একটা প্রভাবিত করেনি। এই বীরাঙ্গনা নারীর প্রণয়-স্বাতন্ত্র্যের দিকটি ঘনরাম চক্রবর্তীর কাব্যে দারুণভাবে ফুটে উঠেছে। মধ্যযুগের মঙ্গালকাব্যগুলির একঘেয়ে সপত্নী-কোন্দলের মধ্যে ধর্মমঙ্গালের কলিঙ্গা-কানড়ার সম্পর্ক তাজা বাতাসের মতোই মনোহর। তাইতো সতীনের মৃত্যুতে কানড়া সহোদরার মতো শোক প্রকাশ করেছে। সতীন সম্পর্কিত প্রবাদ— 'ময়না ময়না ময়না/সতীন যেন হয় না'— তাই তাদের জন্য নয়। বঙ্কিমচন্দ্রের লেখা 'বিষবৃক্ষ' উপন্যাসের নগেন্দ্রের স্ত্রী সূর্যমুখীও কুন্দনন্দিনীকে ঠিক এরকম বোনের মতোই মেনে নিয়েছিল, যদিও সে উপন্যাসের প্রেক্ষাপটটি ছিল সম্পূর্ণ ভিন্ন। আবার যুদ্ধযাত্রার পূর্বে কলিঙ্গা লাউসেনকে কামনা করলে লাউসেন অরাজি হয়, তখন কলিঙ্গা যুক্তি সহকারে জানায়—

জায়া-পরশনে যদি যাত্রা হয় ভঙ্গা।
বেদ বলে বিশেষ বনিতা অর্দ্ধ অঙ্গা।।

সে লাউসেনকে জিজ্ঞাসা করে বনে যদি স্ত্রীকে স্পর্শই না করবেন তবে 'বনবাসে কেন রাম সঙ্গো নিল সীতা' (ঘনরাম চক্রবর্তী)। মধ্যযুগের চরিত্রে এ ধরনের আধুনিকতা অভিনব। আধুনিক সাহিত্যে তো নারীরা এভাবেই নিজেদের অধিকার ছিনিয়ে নিতে চেয়েছে। আমাদের মনে পড়ে রবীন্দ্রনাথের অনবদ্য উপন্যাস 'চতুরঙ্গো'র দামিনীকে যে প্রতিবাদিনী নারী পুরুষকে অনায়াসে বলতে পেরেছিল যে সে তাদের 'দশ-পঁচিশের ঘুঁটি' নয়। সে যুক্তি দিয়ে শচীশ আর শ্রীবিলাসকে বুঝিয়েছিল যে প্রেমকে উপেক্ষা করে জীবনসাধনা চলে না। এছাড়া, কলিঙ্গা-কানড়ার বীর্যবত্তার দিকটি আমাদের স্মরণ করায় মধুকবির মানসকন্যা প্রমীলাকে। 'মেঘনাদবধ কাব্যে'র এই অসমসাহসী নারী তার বংশমর্যাদা স্মরণ করিয়ে সখী বাসন্তীকে বলেছিল—

রাবণ শ্বশুর মম, মেঘনাদ স্বামী,
আমি কি ডরাই সখি, ভিখারী রাঘবে

প্রমীলাকে দেখে সকলে চমকে উঠেছিল— 'চমকিলা বীরবৃন্দে হেরিয়া বামারে,/চমকে গৃহস্থ যথা ঘোর নিশা-কালে/হেরি অগ্নি-শিখা ঘরে!...' রবীন্দ্রনাথের 'সবলা' কবিতায় নারীর যে উচ্চকিত ঘোষণা, শুধুমাত্র পুরুষের সহধর্মিণী হওয়াই নয়, সহকর্মিণী হয়ে ওঠার যে বাসনা— 'যাব না বাসর কক্ষে বধূবেশে বাজায়ে কিঙ্কিণী—/আমারে প্রেমের বীর্যে করো অশঙ্কিণী' অথবা 'কেন না ছুটাব তেজে সন্ধানের রথ/দুর্ধর্ষ অশ্বেরে বাঁধি দৃঢ় বল্গা-পাশে।'—তা তো কলিঙ্গা-কানড়ার মতো বীরাঙ্গানাদের উত্তরাধিকার সূত্রেই প্রাপ্ত। নারী গৃহসজ্জার সামগ্রী মাত্র— এ ধারণা বহুকাল আগেই এই অমিত শক্তিধারী নারী ভ্রান্ত বলে প্রমাণ করে গেছে। রাজ্যকে শত্রুশূন্য করা তাই শুধু পুরুষের কাজ বলেই বিবেচিত হয়নি, তা সমানভাবে হয়ে উঠেছে নারীর প্রধান কর্ম। আজকের নারীরা অনায়াসে তাই বলতে পারে—'নারীকে আপন ভাগ্য জয় করিবার/কেন নাহি দিবে অধিকার/হে বিধাতা।'

তারা আজ শুধু 'সামান্যা নারী' হয়ে থাকতে চায় না। মণিপুর রাজকন্যা চিত্রাঙ্গাদার (চিত্রাঙ্গাদা, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর) মতো তারা নিজ বলে বলীয়ান হয়ে উঠতে চায়।

৩. লখ্যা ডোমনী

ধর্মমঙ্গাল কাব্যের আর এক বীরাঙ্গানা অন্ত্যজ শ্রেণির কালু ডোমের স্ত্রী লখ্যা (লখাই) ডোমনী। সুখময় মুখোপাধ্যায়ের মতে, রূপরামের ধর্মমঙ্গাল কাব্যের 'সবচেয়ে জীবন্ত ও উজ্জ্বল চরিত্র লখ্যা। তার শৌর্য, সাহসিকতা, কর্তব্যবুদ্ধি, বিশ্বাসপরায়ণতা, নিমকের জন্য কৃতজ্ঞতাবোধ তুলনারহিত। সমগ্র প্রাচীন বাংলা সাহিত্যে লখ্যার চরিত্র নিঃসন্দেহে উল্লেখযোগ্য।' যেমন গৌড় থেকে ফেরার পথে লাউসেন রমতিতে কালুডোমকে ময়নাগড়ে বসতি স্থাপনের প্রস্তাব দিলে লখ্যা তার স্বামীকে বলেছে—

রাজনিন্দা করি কেন যাব পলাইয়া।
সংহতি আপনি লহ রাজাকে বলিয়া।।
রাজাকে বলিলে পরিণাম ভালো হয়।
লবণে জিনিলে তবে ঘরে অন্ন রয়।। (কাঙুর যাত্রা পালা)

লখ্যা চরিত্রের এই বিচক্ষণতা ও যুক্তিবাদ অসাধারণ। সে আপাদমস্তক যুদ্ধ-পটিয়সী এক নারী। স্বামী যখন মদ্যপান করে তার কর্তব্যে অবেহলা করছে তখন লখ্যা তার আপন বুদ্ধি বলে সিদ্ধান্ত নিতে তৎপর হয়েছে। নির্ভয়ে মহামদকে আহ্বান করেছে যুদ্ধে—

বীরের বনিতা আমি লখে মোর নাম।
বুঝাব বিশেষ যদি বাধাও সংগ্রাম।। (অনাদিমঙ্গাল, ঘনরাম চক্রবর্তী)

ঘুমন্ত স্বামীকে যুদ্ধে যাওয়ার জন্য জাগিয়ে তুলে সে বলেছে— 'চাপড়ে চিয়াব পতি না হব পাতকী।' লখ্যা চরিত্রের কর্তব্যবোধ এমনই প্রবল। কিন্তু ঘুম ভাঙার পরও কালু যুদ্ধে যেতে অরাজি হওয়ায় লখ্যা তাকে তার অবশ্যকর্তব্যধর্ম স্মরণ করিয়ে বলেছে—

কোমরে বাঁধিয়া নাথ যুঝ একবার।
রণে রাখ পৌরুষ রাজার শোধ ধার।।

কাজেই কোনোভাবেই লখ্যাকে হীনা ডোমরমণী বলে উপেক্ষা করা যায় না। মহামদ যুদ্ধের সময় তাকে 'রাঢ় জাত' বলায় লখ্যা তাকে জানায় যে সে জাতিতে রাঢ় হতে পারে, কিন্তু মহামদ কর্মে রাঢ় অর্থাৎ নিম্ন প্রকৃতির। এর থেকে লখ্যার প্রতিবাদী রূপটিও আমাদের কাছে গোপন থাকে না। রাঢ়ের অন্ত্যজ শ্রেণির নারী লখ্যা ডোমনীর দেশভক্তি, নীতিজ্ঞান, প্রভুভক্তি খুবই উচ্চস্তরের। রাজ্যরক্ষার্থে এই রমণী শত বিপদের হাতছানিকে অগ্রাহ্য করে নিজের স্বামী, পুত্রকে যুদ্ধাঙ্গানে পাঠিয়েছে। সেখানে তার পুত্রের মৃত্যু ঘটলে সে বেদনায় আকুল হয়েছে—

শাখা বলি ডুমনী ডাকিছে উচ্চস্বরে।
ডম্বুর হারায়্যা যেন বাঘিনী ফুকরে।

পুত্রশোকে সে শোকার্ত হয়ে পড়েছে— 'দারুণ পুত্রের শোক দৈব প্রতিকূল।/লখিয়া ডুমনী কান্দে নাঞি বান্ধে চুল।' কিন্তু পরক্ষণেই তার স্মরণ হল রাজ্যের দুর্দশার কথা—

মনে মনে ডুমনী চিন্তিল ততক্ষণ।
কেমনে রাখিব রাজ্য ময়না ভুবন।।
এক বেটা মৈল যদি আর বেটা ঘরে।
সুখারে পাঠাব রণে সাজন্ত সমরে।

পুত্রশোককে দৃঢ়তার সঙ্গে প্রশমিত করে সে অন্য পুত্রকে যুদ্ধযাত্রার নির্দেশ দিল—

লখ্যা বলে সুখারে বিলম্ব নাঞি সয়।
তুমি রণে হানা দিলে তবে ভাল হয়।।

নারী চরিত্রে বিশেষত মধ্যযুগের আঙিনায় এমন উদাহরণ চোখে পড়ে না বললেই চলে। যুদ্ধে যেতে অপ্রস্তুত ভীত পুত্রকে সে অনায়াসে বলে— 'মোর দুগ্ধ খেয়ে বেটা রণে ভীত হলি।/তু বেটা তখনি কেন হয়ে না মরিলি।।' এখানে লখ্যার মাতৃসত্তাকে ছাপিয়ে গেছে তার দেশপ্রেমী মন। এককথায় এ হল এক সাধারণ রমণীর অসাধারণ হয়ে ওঠার কাহিনি। এ এক অত্যুচ্চ আদর্শ যা যেকোনো কালে যেকোনো যুগে যে কোনো নারীর পক্ষেই শ্লাঘার বিষয়। লখ্যা ডোমনীর নারীত্ব, মাতৃত্ব, দেশপ্রেম সবই তুলনারহিত। পুত্রহারা রমণীর আকুল হওয়া এবং দেশের শত্রুনিধনে নিজের এগিয়ে যাওয়া আমাদের চমকপ্রদ করে। সমরাঙ্গনে তার রণরঙ্গিণী মূর্তিটি এরূপ—

মার মার ডাকে পাছু লখিয়া ডুমনী।
টাঙ্গিখান পেল্যা মারে জ্বলন্ত আগুনি।।

স্বামীর মৃত্যুর প্রতিশোধ নিতে সে তার স্বামীর হত্যাকারীর মুণ্ডচ্ছেদ করেছে। আবার ডোমপাড়ায় সবাই যখন কালুর মৃত্যুতে শোকপালন করছে তখনও শত্রুর আক্রমণের সংবাদ লাউসেনের মহলে পাঠানোকে আগে পালনীয় বলে মনে হয়েছে লখ্যার। প্রেক্ষাপট পুরোপুরি আলাদা হলেও গিরিশচন্দ্র ঘোষের 'জনা' নাটকের মুখ্য চরিত্র জনার পুত্র হারানোর বেদনার সঙ্গে লখ্যার কিছুটা মিল পাওয়া যায়। যুদ্ধে জনার একমাত্র পুত্র প্রবীরের মৃত্যু হলে 'ওই ওই— ওই যে কুমার।/...হা পুত্র, হা প্রবীর আমার' বলে হাহাকার করতে থাকেন জনা। পরমুহূর্তেই তাঁর মনে হয়েছে এখনও তো 'পুত্রঘাতী অরাতি জীবিত', কাজেই প্রতিহিংসা-বৃত্তি জেগে উঠেছে জনার। তখন তাঁর মুখে শোনা গিয়েছে— 'মমতা এস না বক্ষে মম/নখাঘাতে উৎপাটন করিব নয়ন,/বিন্দু বারি যেন নাহি ঝরে।'

৪. রঞ্জাবতী

এরপর ধর্মমঙ্গল কাব্যের যে চরিত্রটি আলোচনা না করলেই নয়, তা হল লাউসেনের মা— রঞ্জাবতী। সুন্দরী রঞ্জাবতীর বিবাহ হয় বৃদ্ধ দোজবরে কর্ণসেনের সঙ্গে। বিবাহ কালে কুণ্ঠিতা, লজ্জিতা রঞ্জাবতীর রূপটি কবি রূপরাম typical বাঙালি বধূর মতো করে

অঙ্কন করেছেন— 'যুবতী লজ্জিত দেখি পতিরে প্রাচীন।' রঞ্জার ভাই মহামদের মত ছিল না এই বিয়েতে। এদিকে বিয়ের পর পিতা-মাতা সংবাদ না নেওয়ার রঞ্জাও মনে বড়ো আঘাত পান। তিনি ভাবেন—

> জনক-জননী আর না করে তল্লাস।
> কোন দোষে ভাই মোর হইল নিরাশ।।

বিবাহের পর বেশ কিছুকাল অতিবাহিত হলেও কর্ণসেন-রঞ্জাবতীর কোনো সন্তান না হওয়ায় তাঁরা মনঃকষ্টে ভুগতে থাকেন। পুত্রের আশায় তিনি বারো মাসে তেরো ব্রত পালন করেন। এরপর রামাঞি পণ্ডিতের উপদেশে ধর্মসেবায় মন দেন। রূপরাম চক্রবর্তী শালে ভর দেবার প্রাক্কালে রঞ্জাবতীর মনোভাবের যে দিকটি তুলে ধরেছেন, তাতে চরিত্রটি জীবন্ত হয়ে উঠেছে। তাঁর মনে খুব স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন জেগেছে—

> আমি যদি প্রাণ দিব শালের উপর।
> কবে তবে সাক্ষাৎ হইবে মায়াধর।।

অবশেষে ধর্মের কৃপায় তিনি পুত্র লাউসেনের জন্ম দিয়েছেন। পুত্রের প্রতি তাঁর অগাধ স্নেহ। লাউসেনের গৌড়যাত্রার সময় রঞ্জা বিচ্ছেদ বেদনায় অধীর হয়েছেন—"গোবিন্দ গমনে যেন যশোদা বিকল।/অবিরত রঞ্জার নয়নে বহে জল।" (ঘনরাম চক্রবর্তী) তাঁর পতিপ্রেম ও সন্তানবাৎসল্য মধ্যযুগের অন্যান্য নারীচরিত্র থেকে খুব একটা স্বতন্ত্র না হলেও পুত্রস্নেহে অন্ধ রঞ্জাবতীর এক বিশেষ উক্তি তাঁকে অন্যদের থেকে পৃথক করেছে। তিনি মল্লগুরু সারেঙ্গা ধলকে বলেছেন—

> বেটার কারণে আমি শালে দিনু ভর।
> দিনে দশবার যাত্যে চায় দেশান্তর।।
> কল্পনা করিয়া তারে শিখাবে সরণ।
> ভাঙ্গিবে দক্ষিণ হাত দক্ষিণ চরণ।।
> খোঁড়া করি লাউসেনে রাখিব নিকেতনে।
> পুত্রমুখ সদা দেখি এই সাধ মনে।। (মল্লবধ পালা, রূপরাম চক্রবর্তী)

এই চরিত্রটিতে রাঢ়ভূমির কাঠিন্য প্রকাশ পায়নি। রঞ্জাবতী গতানুগতিক বাঙালি নারী ও জননী। তিনি চান তাঁর একমাত্র আদরের ধন যেন চিরকাল তাঁর স্নেহাঞ্চলের তলে থাকে। আধুনিক বাংলা সাহিত্যে বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর 'ভালবাসার অত্যাচার' প্রবন্ধে অতিরিক্ত পুত্রবাৎসল্যের জন্য পুত্রের উন্নতির বিরোধিতাকারিণী যে সকল বাঙালি মায়ের কথা উল্লেখ করেছেন, রঞ্জার সঙ্গে তাদের মিল একশো শতাংশ।

৫. সনকা

এরপর আমরা এ কাব্যের গৌণ নারীচরিত্রগুলির আলোচনায় অগ্রসর হব। কাব্যের স্বল্পস্থান অধিকার করে রয়েছে লখ্যার সপত্নী সনকা চরিত্রটি। শত্রু দ্বারা নগর আক্রান্ত হলে লখ্যা (লখাই) তার কাছে সাহায্য চাইতে গেছে। কিন্তু সনকা ছিল স্বামীর উপেক্ষিতা,

কাজেই সে বিপদের সময় সাহায্য করতে নারাজ। শুধু তাই নয়, এই সুযোগে সে তার ও লখাই এর অবস্থার পার্থক্য স্মরণ করাতেও বিস্মৃত হয়নি—

মোর গায়ে উড়ে খড়ি তোর গায়ে চুয়া।
দাসীতে জোগায় পান গালে গোটা গুয়া।।

সতীনে-সতীনে বিবাদ-বিসম্বাদে বাঙালি সংসারের কেমন দুরবস্থা হয় তার অকপট চিত্র আমরা পাই মহাশ্বেতা দেবীর 'বেনে বউ' (১৯৯৪) উপন্যাসে যেখানে গণপতি বেনের বড়ো বউ কনকা ছোটো সতীন অহনার ওপর যারপরনাই নিপীড়ন চালায়।

৬. ইছাই জননী

আর একটি গৌণ চরিত্র হল ইছাইয়ের মা। রণক্ষেত্রে লাউসেন ইছাইকে বধ করলে শোকাতুরা মাতৃহৃদয়ের হাহাকার ঝরে পড়েছে—

আর নাহি বাছারে বসিবি রাজপাটে।
না হেরি বদনবিধু বুক মোর ফাটে।।...
পাতালেতে পশিলাম যাহার লাগিয়া।
সে বাছাকে নিল মোর চোখে ধূলা দিয়া।।

এই চরিত্রটিও পুত্রবিয়োগ-ব্যথায় জনা ('জনা' নাটক, গিরিশচন্দ্র ঘোষ), চিত্রাঙ্গাদা, মন্দোদরী ('মেঘনাদবধ' কাব্য, মধুসূদন দত্ত)-র প্রায় সমতুল। বীরবাহুর মৃত্যুতে 'স্মরি পুত্রবরে' শোক-বিহ্বলা গন্ধর্বনন্দিনী চিত্রাঙ্গাদা, মেঘনাদের মৃত্যুতে 'শিশুশূন্য নীড় হেরি যথা/আকুলা কপোতী'র মতো মন্দোদরী আর ধর্মমঙ্গালের ইছাই জননী—এই তিন পুত্রহীনার কান্নায় পাঠক-হৃদয় দ্রবীভূত না হয়ে পারে না।

৭. ছদ্মবেশিনী ভবানী

অন্যান্য মঙ্গালকাব্যের তুলনায় ধর্মমঙ্গাল কাব্য বেশ কিছু কারণে স্বতন্ত্র। এই কাব্যে দুশ্চরিত্রা নারীদের বিবরণ কিছুটা বিস্তৃতভাবে দেওয়া আছে। লাউসেনকে কামরিপুজয়ী সৎ ও সংযত চরিত্র রূপে প্রতিষ্ঠিত করতেই কবিরা এ ধরনের চরিত্র গড়ে তুলেছেন বলে মনে হয়। যেমন— 'পরম সুন্দরী কন্যা'র ছদ্মবেশে ভবানী লাউসেনকে ছলনা করে নিজের পরিচয় প্রদান করেন—

সনকা বেউশ্যা আমি গোলহাটে ঘর।
বড় বনি আমার সুরীক্ষা বাণেশ্বর।।
তার ছোটো বনি আমি কহিল তোমারে।
নাগর খুঁজিয়া আমি বুলি ঘরে ঘরে।।

'আখড়াপালা'র এই ঘটনার সঙ্গো 'গোরক্ষবিজয়ে'র কিছুটা মিল পাওয়া যায়, সেখানে দেবী চণ্ডী গোরক্ষনাথকে পরীক্ষা করার জন্য এভাবেই ছলনার জাল বিস্তার করেছিলেন। আর ধর্মমঙ্গালকাব্যে ছদ্মবেশিনী দেবী নিজেই জানান— 'বিশে পামরমন পিরিতির মরা।/এহার কারণে হৈল দুই কূল হারা।' ঘনরামের কাব্যে দেবী লাউসেনকে বলেন—

'রতন যৌবন ডালি কোলে উপস্থিত।/রাখিলে আমার ভাবে পাবে মহাপ্রীত।।' কিন্তু সংযমী লাউসেন নিজ চরিত্রের দৃঢ়তায় অটল থাকলে দেবী দশভুজা রূপে অবতীর্ণা হন এবং তাকে বরপ্রদান করেন।

৮. সুরিক্ষা

'গোলাহাট পালা'য় সুরিক্ষা নাম্নী অপর এক গণিকা চরিত্রের পরিচয় মেলে, যে লাউসেনকে বলে— 'আমি হব পদ্মফুল তুমি হবে অলি।' কিন্তু লাউসেন তাকে স্পষ্ট জানায় যে শিশুকাল থেকে কোনোদিনই সে পাপে মন দেয়নি। তখন বুদ্ধিমতী সুরিক্ষা দৈবী সাহায্য নিয়ে লাউসেনের সাথে এক প্রতিযোগিতায় নামে। লাউসেনের জন্য সে একা হাতে 'পঞ্চাশ ব্যঞ্জন' রান্না করে এবং তা খাইয়ে লাউসেনের জাত নষ্ট করতে চায়। পরিশেষে সে Poetic Justice-এর জন্য শাস্তিপ্রাপ্ত হয়। কাব্যের একস্থানে দেখা যায় কর্পূরের দ্বারা অপমানিত হয়ে সুরিক্ষা 'শূর্পনখা সমান মলিন হয়ে রয়।' অর্থাৎ কাব্যের বিশেষ প্রয়োজনে সৃষ্ট চরিত্র হলেও তার মধ্যে স্বাভাবিকতা রক্ষিত হয়েছে।

৯. নয়ানী

'জামতি পালা'র নয়ানী শিবাই দণ্ড বারুয়ের স্ত্রী। জামতি নগরের নারীরা বেশিরভাগই গৃহস্থ ঘরের বধূ ও সন্তানের মা, অথচ তারা 'পথিক পুরুষ পেলে পায় পদ্মমালা' (অনাদিমঙ্গল)। শিশু পিছু ডাকলে নয়ানী তার গালে 'দুই ঠোনা' মেরে 'নিচুপে নিচুপে শীঘ্র' লাউসেনের কাছে যায়। কবির বর্ণনায়— 'পূর্ণিমার চাঁদ পড়ে টসটস মউ।/হাস্যা হাস্যা কথা কয় বারুই-র বউ।।' লাউসেনকে সে বলে— 'অস্থির আমার মন ঘরে নাই স্বামী।/পরিচয় পাইলে তোমার সঙ্গে যাব আমি।।' কিন্তু লাউসেনকে কোনোভাবেই বশে আনতে না পেরে সে এক অদ্ভুত কাজ করে বসে— 'ঘাড় মুচড়িয়া শিশু পেলিল কূয়ায়।' তাকে নিঃসন্দেহে কামোন্মাদিনী চরিত্র বলা যায়। 'একটি খল কামুকা নারীর অসাধারণ চরিত্র হিসাবে নয়ানী বাংলা সাহিত্যে অবশ্য স্মরণযোগ্য।' (শম্ভুনাথ গঙ্গোপাধ্যায়, মধ্যযুগের বাংলা কাব্যে নারী চরিত্র, পৃ. ৪৬)। ছদ্মবেশিনী ভবানী চরিত্রটির সঙ্গে ভারতচন্দ্রের 'অন্নদামঙ্গল'-এর ছদ্মবেশিনী জরারূপিণী অন্নদার কিছুটা মিল রয়েছে। উভয়ক্ষেত্রেই উদ্দেশ্য হল ভক্তকে পরীক্ষা করা। আর সুরিক্ষা, নয়ানী, প্রমুখ চরিত্রগুলির সঙ্গে বঙ্কিমচন্দ্রের 'মহাপাপিষ্ঠা' রোহিণী (কৃষ্ণকান্তের উইল), হীরা (বিষবৃক্ষ)-দের প্রকৃতিগত সাদৃশ্য রয়েছে। রোহিণী যেমন মনে করে 'স্ত্রীলোক পুরুষকে জয় করে— কেবল জয়পতাকা উড়াইবার জন্য।' কামুকা, ছলা-কলায় পারদর্শিনী রূপে এরা সুরিক্ষাদের যোগ্য উত্তরসূরি।

১০. অন্যান্য নারী চরিত্র

এছাড়া অন্যান্য নারী চরিত্রের মধ্যে উল্লেখযোগ্যরা হলেন, কর্ণসেনের প্রথমা স্ত্রী যিনি ছয়পুত্রের মৃত্যুর পর দেহত্যাগ করেন ('বিষ খায়্যা যমুনায় তেজিল পরাণে'), ছয় বধূ

যারা মৃত স্বামীদের অনুমৃতা হন, রঞ্জাবতীর মা মন্থরা যিনি রঞ্জার বিয়ের সময় ঔষধ এনে দেন স্বামীকে বশে রাখার জন্য, লাউসেনের মাসি সামুল্যা যিনি পুত্রলাভের জন্য রঞ্জাকে শালে ভর দেবার পরামর্শ দেন। কল্যাণী, মাণিকী চরিত্রগুলি রঞ্জাবতীর হিতাকাঙ্ক্ষী। রঞ্জাকে তারা বলে সে মারা গেলে তারাও বেঁচে থাকবে না— 'নহে প্রাণ তেজিব গরল বিষ খায়্যা।' কানড়ার দাসী ধুমসী চরিত্রটিও বেশ জীবন্ত।

পূর্বোক্ত আলোচনা থেকে একথা সহজেই বোঝা যায় যে, অন্যান্য মঙ্গালকাব্য থেকে ধর্মমঙ্গাল কাব্য যে স্বতন্ত্র তার অন্যতম কারণ হল এ কাব্যে ব্যক্তিত্বময়ী, দুঃসাহসিনী নারী চরিত্রগুলির উপস্থিতি। কলিঙ্গা, কানড়া, লখ্যা ডোমনী, সামুল্যা, ধুমসী প্রমুখ নারীদের বীরত্বের দিকটি এ কাব্যে চমৎকারভাবে উদ্ভাসিত। যুদ্ধক্ষেত্রে এই সকল বীর্যবতী নারীদের অসাধারণ কীর্তিকলাপই এ কাব্যকে Heroic tale-এর মর্যাদা দান করেছে। অনেকেই ধর্মমঙ্গাল কাব্যকে 'রাঢ়ের জাতীয় কাব্য' বলেছেন। আর রাঢ় অঞ্চলের বিশেষত্বই হল সেখানকার নারী-পুরুষ নির্বিশেষে সকলকেই যুদ্ধবিদ্যায় পারদর্শী হতে হয়। ধর্মমঙ্গাল কাব্যের নারীচরিত্রে বীর্যবত্তা-সৃষ্টি প্রসঙ্গো অধ্যাপক ক্ষেত্র গুপ্ত বলেছেন— 'মধ্যযুগের কাব্যে নারীকে পরিবারতন্ত্রের বাইরে এভাবে দেখা একেবারেই অভিনব' (বাংলা সাহিত্যের সমগ্র ইতিহাস, পৃ. ১৪১)। তবে শুধু রাঢ় অঞ্চলে নয়, সমগ্র বঙ্গোই এই কাব্যের আবেদন রয়েছে।

ধর্মমঙ্গাল কাব্যের ধারায় ময়ূরভট্ট (ধর্মমঙ্গাল কাব্যের আদিকবি), রামদাস আদক (সপ্তদশ শতাব্দী), সীতারাম দাস (অষ্টাদশ শতাব্দী), মানিকরাম গাঙ্গুলি (আনুমানিক অষ্টাদশ শতাব্দী)দের মতো কবিদের আবির্ভাব হলেও জনপ্রিয় কবি হলেন রূপরাম চক্রবর্তী ও ঘনরাম চক্রবর্তী। অধ্যাপক সুকুমার সেনের মতে, 'ধর্মমঙ্গাল রচয়িতাদের মধ্যে সবচেয়ে শিক্ষিত ও দক্ষ ছিলেন ঘনরাম চক্রবর্তী। ঘনরাম সুলেখক ছিলেন। তাঁহার রচনা সর্বাধিক পরিচিত ধর্মমঙ্গাল কাব্য' (বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস, ২য় খণ্ড, পৃ. ১৫১)। অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় ঘনরাম সম্পর্কে লিখেছেন— 'ধর্মমঙ্গালের কবিদের মধ্যে তিনিই সর্বপ্রথম মার্জিত রুচির নাগরিক সমাজে পরিচিত হন' (বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত, তৃতীয় খণ্ড, দ্বিতীয় পর্ব, পৃ. ৯৮)। ঘনরাম সাবলীল দক্ষতায় নারীচরিত্রে তার গৃহচারিণী রূপের পাশাপাশি ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের দিকটিও ফুটিয়ে তুলেছেন। ড. আশুতোষ ভট্টাচার্যের মতে, বাঙালি নারী চরিত্রের এই মহিমাই মৌলিকতাহীন একঘেয়ে কাহিনিতে নতুন বৈশিষ্ট্য দান করেছে। প্রখর বাস্তববোধ ও অন্তর্দৃষ্টি থাকার জন্যই ঘনরাম চরিত্র-চিত্রণে অসাধারণ কৃতিত্বের অধিকারী হয়েছেন। আর রূপরামের রচনাও বেশ সহজ, সুন্দর, বাহুল্য ও অলঙ্কারবর্জিত। জীবনবোধের প্রাচুর্যে তাঁর কাব্য উজ্জ্বল। ধর্মমঙ্গাল কাব্যে নানা অলৌকিক কাহিনির বর্ণনা রয়েছে সত্য, তবু তারই মধ্যে চিরন্তন নারীচরিত্রের প্রকাশ ঘটেছে বারবার। সত্যই এ কাব্য 'চরিত্রের এক বিশাল শোভাযাত্রা।' রবীন্দ্রনাথের সেই উক্তি মনে পড়ে যায়— 'বঙ্গাসাহিত্যে পুরুষ মহাদেবের ন্যায় নিশ্চলভাবে ধূলিশয়ান এবং রমণী তাহার বক্ষের উপর জাগ্রত জীবন্তভাবে বিরাজমান' ('পঞ্চভূত')। ধর্মমঙ্গালের নারীচরিত্রগুলি সম্পর্কে

এ কথা আরও অধিকতরভাবে প্রযোজ্য। আর পূর্বকালীন সাহিত্য পরবর্তী লেখনীফসলে তার ছোঁয়া রেখে যাবে, এ তো স্বাভাবিক। নতুন কবি-সাহিত্যিকেরা অগ্রজপ্রতিমদের থেকে রসদ গ্রহণ করবেন তাও অস্বাভাবিক কিছু নয়। সেই রসদ নতুনের হাতে পড়ে নতুন আঙ্গিকে রঙিন হয়ে উঠবে এটাই কাম্য। তাই তো কানড়া, কলিঙ্গারা হয়ে উঠেছেন কখনো প্রমীলা, কখনো চিত্রাঙ্গদা, কখনো সবলা নারীর প্রতিরূপ।

তথ্যের সন্ধানে

১। সুকুমার সেন : বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস, ২য় খণ্ড
৩। অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় : বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত, তৃতীয় খণ্ড, দ্বিতীয় পর্ব
৪। ক্ষেত্র গুপ্ত : বাংলা সাহিত্যের সমগ্র ইতিহাস
৫। আশুতোষ ভট্টাচার্য : বাংলা মঙ্গলকাব্যের ইতিহাস
৬। শম্ভুনাথ গঙ্গোপাধ্যায় : মধ্যযুগের বাংলা কাব্যে নারী চরিত্র
৭। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : পঞ্চভূত

শিবায়ন
যাযাবর জীবন, কৃষিজীবন, শিল্পজীবন

‘শিবায়ন’ : লোকায়ত জীবন-ভাবনা ও লোকসংস্কৃতির উপাদান

কাননবিহারী গোস্বামী

১.১ আমার বর্তমান আলোচ্য বিষয় মধ্যযুগীয় বাংলা সাহিত্যে ‘শিবায়ন’ বা ‘শিবমঙ্গল’ কাব্যধারায় লোকায়ত জীবন-ভাবনা এবং সেইসূত্রে লোকসংস্কৃতিগত উপাদান-সন্ধান। দেবাদিদেব শিব এই কাব্যধারার নায়ক, নায়িকা তাঁর পত্নী পার্বতী। সম্ভবত খ্রিস্টীয় সপ্তদশ শতাব্দীর তৃতীয় দশকে এই কাব্যধারার উদ্ভব। এই মঙ্গালকাব্যধর্মী দেবকেন্দ্রিক কাব্যে শিবকে প্রধান চরিত্র-রূপে কাব্যের কেন্দ্রে রেখে বাংলা ভাষায় প্রথম সম্পূর্ণাঙ্গ ‘শিবায়ন’ কাব্য লেখেন—পশ্চিমবঙ্গের হাওড়া জেলার আমতার নিকটবর্তী রসপুর গ্রামের কবি রামকৃষ্ণ রায়, আনুমানিক ১৬২৫ খ্রিস্টাব্দে। এর আগে আর কোনো কবি বাংলায় পূর্ণাঙ্গ শিবকাহিনিমূলক কাব্য লেখেননি। ‘ব্রতকথা’, ‘মনসামঙ্গাল’, ‘চণ্ডীমঙ্গাল’ প্রভৃতি কাব্যে শিব ও পার্বতীর যে কাহিনি বর্ণিত, তা অসম্পূর্ণ এবং মূলত বিভিন্ন সংস্কৃত পুরাণাশ্রিত। অবশ্য, তাতে লৌকিক উপাদানও কিছু কিছু আছে। রামকৃষ্ণ রায়ের অল্প পরবর্তীকালে কবি লণদেব বা বিনয়লক্ষ্মণদেব ‘শিবের গীত’ নামে এই ধারার একটি কাব্য লেখেন, যার প্রাপ্ত রূপ খণ্ডিত। মেদিনীপুরের যদুপুর-গ্রামজাত, পরে কর্ণগড়ের সামন্ত রামসিংহ-প্রদত্ত অযোধ্যানগর- গ্রামবাসী কবি রামেশ্বর ভট্টাচার্য (চক্রবর্তী) এই ধারার সর্বাধিক লোকপ্রিয় ও বহুল-প্রচারিত কাব্য ‘শিবসংকীর্তন’ রচনা করেন ১৭১১-১২ খ্রিস্টাব্দে। তিনটি কাব্যেই পৌরাণিক শিব-গাথার সঙ্গো যুক্ত হয়েছে লৌকিক শিবকাহিনি; কোথাও বেশি, কোথাও কম।

১.২ এই ‘শিবায়ন’-কাব্যধারার দ্বিতীয় কাহিনিটির নাম ‘মৃগলুব্ধ’। এর প্রধান কবি রতিদেব। এঁর কাব্য রচিত হয়েছে ১৬৭৪ খ্রিস্টাব্দে। চট্টগ্রামের মগকবি রামরাজার ‘মৃগলুব্ধ’ কাব্যকাহিনি এর কিছু পরবর্তীকালের রচনা। এই কাহিনিকে বলা যায় ‘ব্রতকথা’ বা ‘Ritualistic Tale’ যদিও তাকে পৌরাণিক রূপ দেবার চেষ্টা স্পষ্ট।

১.৩ রামকৃষ্ণ রায়ের ‘শিবায়ন’এর কাহিনি মূলত বিবিধ ‘পুরাণ’ ও কালিদাসের ‘কুমারসম্ভবম্’ মহাকাব্য-আশ্রিত। কিন্তু এতে গৌরীর বিবাহের স্ত্রী-আচার বর্ণনায় লৌকিক আচারের (Folk rituals) পরিচয় পাই। আর বাসরঘরে বর শিবকে এয়োদের ‘ধাঁধা’ বা ‘প্রহেলী’ (Riddles) জিজ্ঞাসা এবং শিবেরও তাদের ‘প্রহেলী’র ভাষায় উত্তরদান লৌকিক ‘বাক্‌শিল্প’রই (Verbal Art-এর) মার্জিত সাহিত্যিক রূপ

(Literary Form)। রামেশ্বরের কাব্যকাহিনির দু'টি ভাগ। প্রথমটি, রামকৃষ্ণের আদর্শে উচ্চবর্গীয় পৌরাণিক শিব-কাহিনি। দ্বিতীয়টি লোকজীবনসম্ভব ভিখারি ও কৃষক শিবের কাহিনি। সঙ্গে আছে নিম্নবর্গীয় কোচ, বাগদী ও শাঁখারিদের কাহিনি। 'মৃগলুব্ধ' কিরাত বা ব্যাধজাতির শিবপূজার কাহিনি। এখানে প্রাগার্য-পশুপতি শিবের অর্চনার সঙ্গে পরবর্তী লিঙ্গোপাসনার (Phallic Worship) ধারা মিশে গেছে। এতে বৈদিক, মহাভারতীয় এবং ধ্রুপদী সংস্কৃত কাব্যেরও ঐতিহ্য রয়েছে।

১.৪ এই তিনটি কাহিনিধারার আলোচনা করতে গেলে প্রথমে 'লোকায়ত' শব্দটির তাৎপর্য বিচার এবং শিব-দেবতার বিবর্তন-জাত প্রকৃতি বুঝে নেওয়া প্রয়োজন।

২. 'লোকায়ত' শব্দের তাৎপর্য-বিচার

২.১ সাধারণভাবে, সংস্কৃত অভিধান অনুসারে, 'লোকায়ত' শব্দের অর্থ—'লোকেষু আয়তঃ', অর্থাৎ 'লোকসমাজ' (Folk Community)-এ 'আয়ত', অর্থাৎ কি না বিস্তারিত বা বিস্তৃতভাবে প্রচলিত। এর মধ্যে থাকছে লোকজীবনে বহুল প্রচলিত 'লোককথা' (Folktale), 'ব্রতকথা' (Ritualistic Tale), 'লোকাচার' (Folk Rituals), 'ধাঁধা' (Riddles) ও প্রবাদ-প্রবচনের (Proverbs and Proverbial Sayings) মতো 'মৌলিক বাক্‌শিল্প' (Verbal Arts), লৌকিক দেব-দেবীর (Folk God and Goddess-এর) স্বরূপ-সন্ধান। শেষের বিষয়টি অনুধাবন করতে গেলে এর সঙ্গে মিলিয়ে নিতে হবে নৃতত্ত্বের (Anthropology-র) 'জাতি-শ্রেণিকরণ'-এর (Race Classification-এর) কথাও। এর সঙ্গে সমাজতত্ত্বের (Sociology-র) কিছু কথাও আসবে।

২.২ সংস্কৃত অভিধানে এবং ভারতীয় দর্শনে 'লোকায়ত' শব্দটির ভিন্ন অর্থ-তাৎপর্যও আছে। V.S. Apte তাঁর '*The Practical Sanskrit-English Dictionary*' গ্রন্থে শব্দটির তিনটি অর্থ নির্দেশ করেছেন। Atheistical বা 'নাস্তিক', Materialistic বা 'জড়বাদী' এবং A fallower of Charvaka বা 'চার্বাকপন্থী'। চার্বাক প্রাচীন ভারতে নাস্তিক 'লোকায়তদর্শন' বা 'বার্হস্পত্য' দর্শনের প্রতিষ্ঠাতা। চার্বাকপন্থীরা জড়বাদী। এঁরা 'প্রত্যক্ষ' (Real Perception) ছাড়া কোনো 'অনুমান' (Inference)-কে প্রমাণ মানেন না এবং 'শ্রুতি' বা 'বেদ'-'উপনিষদ'এর প্রমাণকে স্বতঃসিদ্ধ রূপে গ্রাহ্য করেন না। Rhys Davids অবশ্য চার্বাক-মতাদর্শকে বলেছেন Folklore or Nature-lore মাত্র। (দ্রষ্টব্য: 'চার্বাক'— দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়, 'ভারতকোষ'—তৃতীয় খণ্ড, পৃ. ৩২১-২২ ও লোকায়তদর্শন' (১৯৫৯ খ্রি.) গ্রন্থ—দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়।) আমরা এখানে দর্শন-প্রস্থান, কিংবা 'দার্শনিক-সম্প্রদায়' অর্থে 'লোকায়ত' শব্দটি ধরছি না। বরং রিস্ ডেভিডস যে একে Folklore বা 'লোকশ্রুতি' অথবা Nature-lore বা 'প্রকৃতিগাথা' বলেছেন, সেই দু'টি অর্থ আমাদের বর্তমান প্রয়োজনে 'লোকায়ত' শব্দটিকে গ্রহণ করেছি।

৩. শিব-দেবকল্পনার বিবর্তন ও শিবায়ন-কাব্যধারার শিব

৩.১ ভারতে শিবের প্রাচীনতম পশুপতি মূর্তি পাওয়া গেছে সিন্ধুসভ্যতায়—যা প্রায় পাঁচ হাজার বছরের প্রাচীন। প্রধান উৎসস্থল মহেঞ্জোদরোতে উৎখননে প্রাপ্ত একটি পোড়া মাটির সীলে (Seal-এ)। এটি একটি জটাধারী ত্র্যম্বক, উর্ধ্বলিঙ্গ যোগী-মূর্তি। মূর্তির পিছনে বৃষ ও ত্রিশূল-ধ্বজ উৎকীর্ণ। পরে বৈদিক রুদ্রের ও সোমের সঙ্গে তাঁকে সমন্বিত করা হয়। প্রাচীন মিশর, ব্যাবিলন, নিনেভ, গ্রিস ও রোমে এক রুদ্র বা ভয়ানক দেবতার উল্লেখ নানা স্থানে দেখা যায়। কোনো কোনো পণ্ডিত মনে করেন, বহিরাগত আর্যরা (যাঁরা ককেশীয় জাতির আল্পাইন শাখাভূত) ভারতে এই 'রুদ্র' দেবতার সংস্কার বহন করে আনেন।

৩.২ বৈদিক সাহিত্যে বর্ণিত রুদ্র যুবা পুরুষ, অতি উগ্র, অতীব বলশালী। যাঁর দেহবর্ণ কপিশ, নানা অলঙ্কারে সজ্জিত, অস্ত্র ধনুর্বাণ, তবে বজ্রও নিক্ষেপ করতে পারেন। পৃশ্নি গাভী তাঁর স্ত্রী। 'যজুর্বেদ'-এ তিনি ত্র্যম্বক, 'শতপথ'-এ ব্রাহ্মণ 'মহাদেব'। 'শ্বেতাশ্বেতর উপনিষদ'-এ তিনি ভয়ঙ্কর এবং 'অথর্ববেদ'-এ কল্যাণসুন্দর। তুষ্ট হলেই রুদ্র 'শিব' বা মঙ্গলময় হন।

Apte-এর মতে (P.S.E.D p. 804) বৈদিক 'রুদ্র' একাদশ জন এবং 'শিব' তাঁদের মধ্যে 'গোষ্ঠীপতি'। ড. সুকুমার সেন দেখিয়েছেন—

> রুদ্র ও শিবের দেবকল্পনায় কিছু পার্থক্য আছে। তাঁর কথায়—'শিব যুবা নহেন, প্রৌঢ় অথবা বৃদ্ধ। তিনি অলংকৃত নহেন, সর্প ও বিভূতি তাঁহার ভূষণ, গাভী তাঁহার ভার্যা নহে, বৃষ তাঁহার বাহন ইত্যাদি। তবে বিশেষ মিল আছে তাঁহাদের রোষ ও তুষ্টির সহজসাধ্যতায়।'[১]

ড. সেন এখানে যে শিবের কথা বলেছেন, তিনি পৌরাণিক শিব। বাংলা 'শিবমঙ্গল' বা 'শিবায়ন' কাব্যগুলিতে এই সংস্কৃত সাহিত্যের ঐতিহ্যগত পৌরাণিক শিবের প্রাধান্য, তবে তাতে লৌকিক এবং প্রাগার্য শিবের দেবকল্পনাও মিশেছে। তিনি হয়েছেন কখনো ভিখারী, কখনো নিজে কৃষক এবং কৃষির দেবতা, কখনো বা ব্যাধ বা কিরাতদের পূজিত লিঙ্গারূপী দেবতা। যথাস্থানে আমরা তার পরিচয় নেব।

৪. রামকৃষ্ণ কবিচন্দ্রের 'শিবায়ন'-এ পৌরাণিক ও লোকায়ত উপাদান

৪.১ কবিচন্দ্র রামকৃষ্ণ রায়ের 'শিবায়ন' (১৬২৫ খ্রি.) কাব্যে মার্জিত, সংযত, শিল্পিত ভাষায় পৌরাণিক শিবের কাহিনিই বর্ণিত। কাব্যের ২৬টি পালার মধ্যে ১২, ১৩ ও ১৪ সংখ্যক তিনটি মাত্র পালায় কিছু লোকায়ত উপাদান আছে। এই কাব্যে কাহিনির তিনটি ধারা দেখা যায়।—

১. বিবিধ পুরাণের বিবরণ অনুযায়ী নানা তথ্য, তত্ত্ব, সৃষ্টিরহস্য, মন্বন্তর ইত্যাদির বর্ণনা। ২. শিব, সতী, দক্ষ, পার্বতীর মূল পৌরাণিক কাহিনি, এবং নানা পুরাণ-সূত্রে

মনসা, সমুদ্রমন্থন, বলিরাজা, অগস্ত্য ও সগররাজা, গঙ্গা, ত্রিপুরদাহন ও তারকাসুর বধ, অন্ধক, পরশুরাম, রাবণ ও বানররাজার উপাখ্যানের নানা পার্শ্বকাহিনি। এতগুলি পার্শ্বকাহিনি সংগ্রন্থানায় কাব্যের মূল কাহিনি শিথিল, কেন্দ্রচ্যুত ও অসংলগ্ন হয়ে পড়েছে। কবি এ-সব পৌরাণিক কাহিনি সংগ্রহ করেছেন—'শিবপুরাণ', 'কালিকাপুরাণ', 'স্কন্দপুরাণ', 'বৃহন্নারদীয় পুরাণ', 'হরিবংশ', 'কাশীখণ্ড', মহাভারতের 'শান্তিপর্ব' এবং কালিদাসের 'কুমারসম্ভবম্' ইত্যাদি কাব্য থেকে। ৩. এ কাব্যে পাচ্ছি প্রচলিত সমাজজীবন থেকে আহৃত কিছু 'লোকাচার' ও 'রঙ্গাপরিহাসের কাহিনি'। আমরা শুধু কাব্যকাহিনির শেষোক্ত অংশটিতে লক্ষ করব লোকজীবন ও লোকায়ত উপাদান।

৪.২ এদের মধ্যে প্রথমটি হল 'লোকাচার' এবং সেটিও 'বিবাহ-বিষয়ক লোকাচার'। কাব্যের দ্বাদশ পালায় দেখি, শিবের সঙ্গো গৌরীর বিবাহের প্রাক্কালে গৌরীর মাতা গিরিরানি মেনকা কিছু 'স্ত্রী-আচার' পালন করেছেন। এদের মধ্যে একটি হচ্ছে 'জল সওয়া'—

রাণীর মস্তকে ঝারা তুলিয়া দিলেন তারা
বান্ধিলেন তাহে মুণ্ডিআলা।
রেণুকা আছিলা তথা পরশুরামের মাতা
হাতে কৈল মঙ্গালের ডালা॥
জয় জয় যায় মেনা জল সহিবারে।
আইয় সুইয় শতে শতে চলিলা নগরপথে
মঙ্গাল গাইয়া উচ্চস্বরে॥[২]

পথে কেউ ফুল ছড়ালো কেউ বা চন্দনের ছড়া দিল, কেউ 'পাতে পাটের পছড়া'। তাছাড়া চলল 'আগে পাছে বিবিধ বাজনা।' এখানে কয়েকটি বিচিত্র লোকাচারের পরিচয় পাচ্ছি। এয়োগণ-সহ মেনকা পানের বরজে এসে তার মূলে পঞ্চশস্য দিয়ে অভিষেক করলেন। সেখানে এই বর চাইলেন—'গৌরী যেন হয় হরের মুখের তাম্বুল'। তাঁরা 'আঁসিহাটে' গেলেন এবং আশীর্বাদ চাইলেন—'কন্যা থাকিব আইয়তে।/আমিষ ভোজনে তার যাইবেক কাল।' অর্থাৎ গৌরী যেন চিরসধবা থেকে আমিষ খাদ্য (প্রধানত 'মাছ') খেতে পারে। মৎস্যপ্রিয় বাঙালির চিরন্তন লোকসংস্কার। সবচেয়ে আশ্চর্যের ব্যাপার পৌরাণিক দেবীগণ পথে 'গ্রামদেবতার জাত'ও (অর্থাৎ দেবালয়ের বাইরে দেবতাকে এনে তাঁর বহির্যাত্রায় পূজা) করলেন—'চৌহাটে করিল জাত গ্রামদেবতার।' এখানে দেখি, লৌকিক গ্রামদেবতারা উচ্চতর দেবীদের পূজা পাচ্ছেন। এ হল দুই সংস্কৃতির সমন্বয়—ঐতিহ্যাশ্রিত ও লোকায়ত। সব শেষে—'জল সহিয়া নির্বর্তিলা সব দেবী।' 'মেনকার তখনও মাথায় মঙ্গালঘট।'

৪.৩ চতুর্দশ পালায় হর-গৌরীর বিবাহান্তে ফুলশয্যার রাত্রে শিবকে দেবতারা ও ঋষিপত্নীগণ প্রগল্ভা হয়ে কিছু 'প্রহেলিকা' বা 'ধাঁধা' জিজ্ঞাসা করেছেন। শিবও

তাদের যথারীতি উত্তর দিয়েছেন 'প্রহেলিকা'র ভাষাতেই। এদের মধ্যে কয়েকটি আবার (Erotic Riddles) যৌন-বিষয়ক ধাঁধা। প্রখ্যাত লোকশ্রুতিবিদ্ ড. আশুতোষ ভট্টাচার্য মনে করেন, বিবাহ উপলক্ষ্যে বরপক্ষের উদ্দেশ্যে কন্যাপক্ষের এই ধাঁধা জিজ্ঞাসা উচ্চতর হিন্দুসমাজে এসেছে নিম্নবর্গীয় আদিবাসী 'ওরাওঁ' জাতির 'বিবাহাচার' থেকে। ওরাওঁ-রা আদি-অস্ট্রাল (Proto-Auntraloid) জাতির গোষ্ঠীভুক্ত। ড. ভট্টাচার্যের ভাষায়—

> ওরাওঁ জাতির সমাজে যেমন এখনও কন্যাপক্ষীয়গণ বরযাত্রীদিগকে ধাঁধা জিজ্ঞাসা করিয়া থাকে, তাহার পরিবর্তে কন্যাপক্ষীয়দিগের প্রতিনিধি-স্বরূপে বাসরগৃহে নারীগণ বরযাত্রীদিগের প্রতিনিধি-রূপে স্বয়ং বরকেই ধাঁধা জিজ্ঞাসা করিতে শুনিতে পাওয়া যায়। বলাই বাহুল্য যে ইহা একই প্রথার বিভিন্ন রূপ মাত্র।[৩]

বাসরে শিবকে ঋষিপত্নীগণ ও দেবতাগণ আটটা ধাঁধা জিজ্ঞাসা করেছিলেন। কবি এদের তিনটি সংস্কৃত নাম উল্লেখ করেছেন—'প্রহেলিকা', 'প্রহেলী' এবং 'প্রবল্লিকা', কিন্তু সেই সঙ্গে দু'টি লৌকিক নামও জানিয়েছেন—'হেঁয়ালি' ও 'ফলই'। এর থেকেই বোঝা যায় কবি উচ্চতর ব্রাহ্মণ্য সংস্কারের পাশাপাশি প্রচলিত লৌকিক সংস্কারও জানতেন। আমি এই আটটি ধাঁধার মধ্যে মাত্র দুটি এবং তাদের উত্তর দীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য ও ড. আশুতোষ ভট্টাচার্য-সম্পাদিত রামকৃষ্ণ কবিচন্দ্র রচিত 'শিবায়ন' কাব্য থেকে উদ্ধৃত করছি। বাকিগুলি (চারটি) পাঠকদের ঐ গ্রন্থের যথাস্থানে দেখে নিতে অনুরোধ করি।

৪.৪ ক. যোগী নহে, জটা ধরে তোমার লক্ষণ।
গঙ্গা নহে, জল বহে এ তিন লোচন॥
নারী সম্বোধন মাত্র, নহেক স্ত্রী-জাতি।
শস্য উপজে তাহে, নহে সেই ক্ষিতি॥
হর, বুঝ প্রহেলিকা, হর, বুঝ প্রহেলিকা।
জিজ্ঞাসে তোমারে একপাটলা বালিকা॥[৪]

শিবও এর উত্তর দিলেন প্রহেলিকার ভঙ্গিতেই—

শুন একপটলা তোমার প্রহেলিকা।
নাম কহিয়া দিলে দিবে কুমুদকলিকা॥
যেই অস্ত্র করে ধরে রেবতীর কাণ্ড।
তৃতীয় অক্ষরে তার কর ই-কারান্ত॥
সেই ত বৃক্ষের ফল, শুন গ সুন্দরী॥[৫]

হর ইঙ্গিতে জানিয়ে দিলেন, উত্তরটি হল—'নারিকেল'। সেই সঙ্গে একটু রসিকতাও করলেন—পুরস্কার 'দিবে কুমুদকলিকা', অর্থাৎ 'কুচলিকা', যা যৌন ইঙ্গিতসূচক।

খ. ডিম্ব নাঞি ফুটে, মাত্র করিয়াছে পাখা।
ডিম্বের ভিতরে তার শিশু যায় দেখা॥
দেখিল অপূর্ব্ব ডিম্ব, অনুক্ষণ উড়ে।

সতত চঞ্চল মাত্র ধাঞি নাঞি ছাড়ে॥
বলেন ভৃগুর রমণী। বলেন ভৃগুর রমণী।
একটি ফলইয়ে আমি এক মাস জিনি॥[৬]

এর উত্তরে হর ভৃগুর রমণীকে বললেন—

তোমার ফলইয়ে বিদগ্ধের বুদ্ধি টুটে।
পাখ করিয়া আগে ডিম্ব নাঞি ফুটে॥
শুনিতে আশ্চর্য গ, আদেশ যদি পাই।
শলাকার আগ দিয়া সে ডিম্ব ফুটাই॥[৭]

হর কৌশলে 'ফলই'য়ের উত্তর দিলেন—চক্ষু। এই উত্তরটি নিজেই একটি Challenging Riddle বা 'দ্বন্দ্বাহ্বানের ধাঁধা'। লক্ষণীয় উত্তরে 'শলাকা' কথাটি দ্ব্যর্থক (Equivocal)। এক অর্থে লৌহশলাকা, অন্য অর্থে 'জ্ঞানাঞ্জন শলাকা'। মানেটা দাঁড়াল, "তোমার প্রগলভতার জন্য 'লৌহশলাকায়' চোখ গেলে দিতে পারি", কিংবা 'জ্ঞানাঞ্জন শলাকা'র 'চক্ষুরুন্মীলিত' ('অজ্ঞানতিমিরান্ধস্য জ্ঞানাঞ্জন শলাকয়া/চক্ষুরুন্মীলিতং' ইত্যাদি গুরুপ্রণাম মন্ত্রটি স্মরণ করুন।) করে দিতে পারি।

গ. একত্রে বসতি করে দুই সহোদর।
মাথায় টোপর পরে, নহে তারা বর॥
রাজা নহে, তবু না চাইতে পায় কর।
বল দেখি হর, তার কোন দেশে ঘর॥[৮]

উত্তরে হর অদিতিকে জানালেন—

শুন কশ্যপের প্রিয়া আমার উত্তর।
রাজা নহে কর লএ, সেই সে বর্বর॥
ইঙ্গিত করহ যদি, ঘর আমি জানি।
কর প্রহার করিয়া ধরিয়া তারে আনি॥[৯]

এই ধাঁধার উত্তর—'নারীর যুগল স্তন', 'মাথার টোপর' হল 'স্তনবৃন্ত'। স্পষ্টতই এটি Erotic Riddle বা 'যৌনবিষয়ক ধাঁধা'। 'করপ্রহারে' হস্তসঞ্চালনে পুরুষের সম্ভোগস্পৃহার প্রকাশ।

ঘ. কাল ধল দুই পক্ষ, নহে কাক হাঁস।
আট হাজার লক্ষ পণ জড় কৈলে মাস॥
পালিবে যে দুই পক্ষ কর অঙ্গীকার।
রোহিনী বলেন—তবে করিবে বেহার॥[১০]

এটিও 'Challenging Riddle' কারণ, রোহিণী শর্ত দিচ্ছেন—হর এর উত্তর দিতে পারলে তবেই ফুলশয্যায় পার্বতীর সঙ্গে 'বিহার' করতে পারবেন, নচেৎ নয়। এতে যৌনতার ইঙ্গিতটিও লোভনীয়। রসিক হরের প্রত্যুত্তরটি এই—

সতীর কাহিনী শুন, রোহিনী সুন্দরী।
পক্ষ পালিবারে আমি সত্য নাঞি করি॥
তোমার সাধনে আমি পালিব পক্ষিণী।
হেঁআলির প্রত্যুত্তর দিলা শূলপাণি॥[১১]

এ যেন বাঙালির বাসরঘরেরেই রঙ্গমধুর চিত্র। বাসরঘরে শ্যালিকার সঙ্গে জামাইবাবুর এরকম রঙ্গ-রসিকতা চলতেই পারে। সতীপতি সতীর ভগ্নীকে জানাচ্ছেন—'কাল ধল দুই পক্ষ'যুক্ত, অর্থাৎ শুক্ল ও কৃষ্ণপক্ষযুক্ত চন্দ্রকে তিনি পালন করবেন; তাকে শিরস্থ জটায় ধারণ করে হবেন 'চন্দ্রমৌলি'। এই ধাঁধায় লৌকিক ও পৌরাণিক উপাদানকে মিলিয়ে দেওয়া হয়েছে।

৪.৫ ড. আশুতোষ ভট্টাচার্য মন্তব্য করেছেন : 'যাঁহারা ধাঁধাগুলি জিজ্ঞাসা করিয়াছেন, তাঁহারা প্রত্যেকেই বিদগ্ধ রমণী; ... সেইজন্য শিব প্রহেলিকার অনুরূপ রচনা দ্বারা ইহাদের উত্তর দিতেছেন। ধাঁধার উত্তর দিবার এই প্রণালীটি নিতান্ত অভিনব—... আর কাহারও রচনার ক্ষেত্রেই অনুরূপ আর দ্বিতীয় নিদর্শন পাওয়া যায় না।'[১২] ড. ভট্টাচার্য মনে করেন—'ইহাদিগকে সাহিত্যিক (literary) ধাঁধা বলা যায়।... ইহাদের একটি মৌলিক জনশ্রুতিমূলক ভিত্তি আছে। সেই লৌকিক (Folk) ধাঁধার ভিত্তির উপরই ব্যক্তিবিশেষ রং ও কারুকার্য করিয়া এইভাবে নতুন এক একটি সাহিত্যিক ধাঁধার সৃষ্টি করিয়াছেন।'[১৩]

৪.৬ আলোচ্য চতুর্দশ পালার শেষে আর একটি লোকাচারের বর্ণনা আছে। সেটি বরবধূর নিশি-মিলনের পর বরের কাছে নারীদের শয্যাতোলানী চাওয়া। এর আগে অবশ্য স্বভাবকৌতূহলী রঙ্গপ্রিয়া নারীদের রুদ্ধ বাসরঘরে উঁকি দেবার মজার লৌকিক ব্যাপারটি ঘটে গেছে : 'কেহ আশেপাশে থাকি / গবাক্ষেতে দেয় উঁকি / কেহ হাসে কপাটের আড়ে।' এবার নিশি-প্রভাতে বর ঈশানের কাছে এয়ো দেবকন্যাদের 'বাসি পুষ্পশয্যা' তোলার জন্য উপঢৌকনের দাবি পেশ—

এক এক পাট শাড়ি / পঞ্চাশ কাহন কড়ি / যদি দিতে পার প্রতি জনে।
তবে আইয় তোলে শয্যা / নহে পাবে বড় লজ্জা / রামকৃষ্ণ দাস বিরচনে।।[১৪]

নিজেদের দাবি আদায়ের জন্য—'দুয়ার চাপিয়া বসে যতেক অবলা।' শিবের ভাণ্ডারী ধনাধ্যক্ষ কুবের তখন কৈলাস থেকে এসে এয়োদের 'শয্যাতোলনীয়' দাবি মেটালেন—

বস্ত্র অলঙ্কার দিল যত আইয়গণে।
সুবর্ণের কড়ি দিলা কাহনে কাহনে।।[১৫]

এ কোনো 'দেবকথা' বা 'দেবপ্রথা' নয়, বাঙালির একান্ত নিজস্ব 'লোকাচার'—যা আজও চলছে।

৫. শঙ্কর কবিচন্দ্রের 'শিবায়ন'-এ পৌরাণিক ও লোকায়ত উপাদান

৫.১ বিষ্ণুপুরের রাজা গোপাল সিংহের (রাজত্বকাল ১৭১৮-১৭৪৮ খ্রি.) সভাকবি শঙ্কর কবিচন্দ্র তাঁর রাজ্যলাভের আগেই ১৬৮০ খ্রিস্টাব্দের দিকে তাঁর 'শিবায়ন' বা 'শিবমঙ্গাল' কাব্যটি রচনা করেন। সম্ভবত এ কাব্য রচিত হয়েছিল পূর্ববর্তী 'অবনীতে মহাতেজা/বীরসিংহ মহারাজা'র আমলে।

৫.২ সমগ্র কাব্যের পুথি পাওয়া যায়নি। দুটি মাত্র পালা পাওয়া গেছে—'মর্চ্ছ-ধরা' (মৎস্য ধরা) ও 'শঙ্খ-পরা' পালা। 'মর্চ্ছ-ধরা' পালাটি যেন 'লোকপুরাণ' (Folk-myth) রচনা; কারণ এ কাহিনি সংস্কৃত পুরাণ কিংবা উপপুরাণে নেই। এর কাহিনিতে প্রথম লৌকিক কৃষক শিব এবং বাগ্‌দিনী জেলেনী পার্বতীর কথা পাচ্ছি, যা লোকজীবন-সম্ভব। পার্বতী বা গৌরী নিষ্কর্মা ভিক্ষোপজীবী বৃদ্ধ স্বামী শিবকে তাঁর অলসতার জন্য যৎপরোনাস্তি নিন্দা করেছিলেন; উত্যক্ত শিব ভাগিনা ভীমকে সঙ্গে নিয়ে কৈলাস ছেড়ে মর্ত্যে গেলেন চাষ-বাস করতে। ছয়মাস যাবৎ শিবের কোনো সংবাদ নেই। এদিকে পার্বতী স্বপ্নে শিবকে দেখে ব্যাকুল। সখী-পদ্মার পরামর্শে তিনি মর্ত্যে নেমে, শিবের কৃষিক্ষেত্রে এসে বাগ্‌দিনীর রূপ ধরে ক্ষেতের জলে মাছ ধরতে লাগলেন। বাগ্‌দিনীর রূপে শিবমুগ্ধ ও মিলনচঞ্চল। শঙ্কর কবিচন্দ্রের প্রাসঙ্গিক বর্ণনার কিছু অংশ এইরূপ—

> সাক্ষাতে হইলা মাতা বাগ্‌দিনি বেশ।
> সই সই' বলি প্রভু হাসে ব্যোমকেশ॥...
> বাগ্‌দিনি বেশ করি উভ করি খোঁপা।
> ফুলমালা তাতে শোভে সুবর্ণের ঝাঁপা॥
> কান্ধেতে ঘুনসি জাল ইসাদের কড়ি।
> পরিপাটি কান্ধে সাজে খর্চ্ছের চুপড়ি॥
> ঠমক করি দাণ্ডাইল, শিব পড়ে ভোলে।
> 'সই সই' হাসি প্রভু করিলেন কোলে।[১৬]

৫.২.১ শঙ্কর কবিচন্দ্র এই কৃষক শিব ও বালিকা পার্বতীর ভাবকল্পনা (Concept) কোন সূত্রে পেলেন? প্রথম ভাবনাটি এসেছে লোকজীবনের মূলে প্রোথিত Fertility Cult বা 'উর্বরতা-কেন্দ্রিক' অনুষ্ঠান পদ্ধতি থেকে। এ-বিষয়ে ড. গুরুদাস ভট্টাচার্যের অভিমত—

> শিব শস্য ও উর্বরতার দেবতা।... শিবলিঙ্গপূজা ও শিব-শিবানী পূজা পরবর্তীকালে তত্ত্বরূপ পাইলেও আসলে ইহারা কৃষি-সংস্কৃতির হইতে জাত ও লালিত। উভয়েই শস্য, পৃথিবী ও প্রজননের সহিত ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত।[১৭]

আর পার্বতীর বাগ্‌দিনীবেশ ধারণ ও মাছ ধরার রূপকল্পনা থেকে মনে হয়, এটি মৎস্যপ্রিয় বাঙালির প্রাচীন সংস্কার-জাত। দ্বাদশ শতকের মধ্যভাগে সেনবংশীয় নৃপতি বিজয়সেনের (লক্ষ্মণ সেনের পিতামহ) বারাকপুর তাম্রশাসনের প্রথম

শ্লোকে ধূর্জটির জটামধ্যস্থ চন্দ্রকলাকে 'শৈবালবলিমধ্যবদ্ধ-শফরী' বা শৈবালজালে বন্ধ পুঁটি মাছ বলে ভুল করে গণেশ ও কার্ত্তিক দুই ভাইয়ের খেলাচ্ছলে জটাধরে টানাটানির কথা আছে। শ্লোকটি এই—

ক্রৌঞ্চারি-দ্বিরদাস্যয়োঃ শিশুতয়া তাতস্য মৌলো মিথো
গঙ্গাবারিণি খেলতো শশিকলামালোক্য মধ্যে জটম্।
শৈবালিবালিমধ্যবদ্ধ-শাফরী-বুদ্ধ্যা সমাকর্ষতোর
আক্রন্দস্ফুটস্টকোন্দলেন বিহসন্নব্যাজনুগদ্ ধুর্জটিঃ॥

এখানেই সম্ভবত প্রথম বাঙালির ভাবনায় মাছকে শিবের সঙ্গে সম্পৃক্ত করা হয়েছে। বঙ্গের বিশেষত পূর্ববঙ্গের মৎস্যজীবী সম্প্রদায়ের উপাস্য লৌকিক দেবতা মাখাল ঠাকুরের (বিস্তৃত বিবরণ গোপেন্দ্রকৃষ্ণ বসুর 'বাংলার লৌকিক দেবতা' গ্রন্থ দ্রষ্টব্য) সঙ্গেও শিবের সাযুজ্য কল্পিত হয়েছে। প্রাচীন 'তারকেশ্বর শিবতত্ত্ব' গ্রন্থে উল্লেখ করা হয়েছে যে, ক্ষেত্রপাল, মহাকাল, মাখাল প্রভৃতি লৌকিক দেবতা পৌরাণিক তারকেশ্বর শিবেরই নানা রূপভেদ—

ক্ষেত্রপাল মহাকাল প্রভৃতি দেবতা।
যাহার যেরূপ ভক্তি সেরূপ গঠিতা॥
কোথায় ওলাইচণ্ডী মাখাল জলায়।
বৃক্ষতলে মহাপ্রভু, স্থান দৃশ্যপ্রায়॥[১৮]

৫.২.২ উপরের আলোচনা থেকে সিদ্ধান্ত করা চলে যে, প্রাগার্য ও অন্-আর্য যজ্ঞহবিঃ—বহির্ভূত লৌকিক দেবতা শিব ও শিবানী বঙ্গজীবনে প্রথমে চাষি, জেলে ও বাগ্‌দী সমাজে লৌকিক দেবতা রূপেই গৃহীত ও পূজিত। পরে তাঁদের 'আর্যীকরণ' (Aryanisation) ও 'পৌরাণিক সংস্কৃতায়ন' (Pauranic Sanskritiyatan) ঘটেছে।

৬. রামেশ্বরের 'শিবায়ন' বা 'শিবসংকীর্তন'-এ পৌরাণিক ও লোকায়ত উপাদান : ঐতিহ্যগত কৃষক ও শাঁখারি শিব—

৬.১ পূর্বনিবাস মেদিনীপুর জেলার ঘাটালের কাছে বরদা পরগণার অন্তর্গত স্বগ্রাম যদুপুর থেকে শোভা সিংহের কনিষ্ঠ ভাই হেমৎ সিংহের অত্যাচারে উৎখাত কবি রামেশ্বর ভট্টাচার্য (চক্রবর্তী) কর্ণগড়ের রাজা যশোমন্ত সিংহের আশ্রয়ে থেকে আনুমানিক ১৭১১- ১২ খ্রিস্টাব্দে তাঁর 'শিবায়ন' বা 'শিবসংকীর্তন' কাব্য রচনা করেন। 'শিবায়ন'- কাব্যধারায় এটিই সবচেয়ে জনপ্রিয় ও সর্বাধিক প্রচারিত কাব্য।

৬.২ ড. পঞ্চানন চক্রবর্তী সম্পাদিত ও বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ থেকে প্রকাশিত (১৯৬৪ খ্রি.) 'রামেশ্বর রচনাবলী'র অন্তর্গত প্রথম গ্রন্থ 'শিব-সঙ্কীর্তন বা শিবায়ন'। কাব্যটি সাতটি পালায় বিন্যস্ত। প্রথম ছয়টি পালা প্রতি দিবসীয় নিশা ও দিবা ভেদে আবার দ্বিরূপ। সপ্তম দিবসীয় নিশাপালা সমাপ্ত হবার পর 'জাগরণ' পালা

দিয়ে কাব্যের সমাপ্তি। আলোচ্য কাব্যের কাহিনিগ্রন্থনে স্পষ্ট দু'টি জীবনভাবনার ও দেবকল্পনার বিভাজন রয়েছে। একটি ব্রাহ্মণ্য-সংস্কার-প্রভাবিত 'পৌরাণিক'। দ্বিতীয়টি অষ্টাদশ শতকের দ্বিতীয় দশকের সূচনায় বাস্তব লোকজীবনভাবনা-সঞ্জাত 'লৌকিক'। দুই অংশে দেবাদিদেব শিব এবং তস্য দ্বিতীয়া ভার্যা পার্বতী বা গৌরীর স্বরূপ স্বভাবতই পৃথক। প্রথমটি উত্তম সংস্কৃতজ্ঞ কবির পৌরাণিক জ্ঞানলব্ধ, দ্বিতীয়টি তাঁর গভীর লোকজীবন অভিজ্ঞতার অভিজ্ঞান।

৬.২.১ প্রথম তিনটি পালায় পৌরাণিক শিবকাহিনি বর্ণনায় কবি 'পদ্মপুরাণ', 'স্কন্দপুরাণ', 'নান্দিকেশ্বর পুরাণ', 'লিঙ্গপুরাণ' ও কালিদাসের 'কুমারসম্ভবম্' মহাকাব্যের উপাখ্যানগুলির আশ্রয় গ্রহণ করেছেন। স্থানে স্থানে তাঁর বর্ণনা যেন 'কুমারসম্ভব'-এর আক্ষরিক অনুবাদ। এখানে পুরাণানুসারী সৃষ্টিতত্ত্ব, দেবোৎপত্তি, সতীর দেহত্যাগ শিবের দক্ষযজ্ঞ-নাশ, গিরিরাজ হিমালয় ও গিরিরানি মেনকার কন্যা গৌরী-রূপে সতীর দ্বিতীয় জন্মগ্রহণ, সতীহারা মহাদেবের ধ্যানভঙ্গ, মদনদহন, রতিবিলাপ, গৌরীর তপস্যা, গৌরী ও ছদ্মবেশী শিবের বাক্‌প্রবন্ধ। শিবের গৌরীর সঙ্গে বিবাহ ইত্যাদি সুপরিচিত বিষয়গুলি বর্ণিত। এগুলি (Traditional Tale) বা ঐতিহ্যগত কাহিনি—কোথাও কবির মৌলিক উদ্ভাবনা নেই। এজন্যই গ্রন্থ-সম্পাদক ড. পঞ্চানন চক্রবর্তী মন্তব্য করেছেন :

> পুরাণখণ্ডে তাঁহার কাব্যের বিশেষ কোনো বৈচিত্র্য নাই, কেবল পুরাতনের পুনরাবৃত্তি।[১৯]

৬.২.২ তৃতীয় পালার মাঝামাঝি থেকে রামেশ্বর লৌকিক কাহিনি অনুসরণ করেছেন। এই অংশে শিবের বিবাহযাত্রা, বরবেশী শিবকে দেখে মেনকার বিলাপ, শিবের মোহনমূর্তি ধারণ, হর-গৌরীর বিবাহ ইত্যাদি তৎকালীন লোকজীবন-সংস্কার অনুযায়ী বর্ণিত, যা পুরোপুরি পৌরাণিক নয়। চতুর্থ পালায় শিবের দারিদ্র্যপীড়িত গৃহস্থালীর বর্ণনা। শিবের ভিক্ষাযাত্রা, খাদ্যাভাবে হরগৌরীর কলহ ইত্যাদি বর্ণনায় বাস্তব লোকজীবনের স্পর্শ পাই। কিন্তু এরপর কবি কেন্দ্রীয়-কাহিনি লক্ষ্যচ্যুত হয়ে পঞ্চম ও ষষ্ঠ পালায় আবার শ্রীকৃষ্ণের রুক্মিণী-হরণ ও ঊষা-অনিরুদ্ধের গোপন মিলন প্রসঙ্গে হরি-হরের যুদ্ধ এবং সপ্তম পালায় শিবরাত্রির আখ্যান জুড়ে দিয়ে কাহিনিতে অবান্তর পুরাণ-প্রসঙ্গ এনেছেন।

৬.৩ আলোচ্য কাব্যে কবির যথার্থ লোকজীবন ভাবনার ও লৌকিক উপাদান সংগ্রন্থনায় মুন্সিয়ানা এবং মৌলিকতা প্রকাশ পেয়েছে শেষ দুই ষষ্ঠ ও সপ্তম পালায়। ষষ্ঠ দিবসীয় নিশাপালায় 'শিবের কৃষিকার্যে'র বিস্তৃত বর্ণনা, সপ্তম দিবাপালায় গৌরী কর্তৃক শিবের কৃষিক্ষেত্রে মশা, মাছি, ও ডাঁশ প্রেরণ ইত্যাদি বিষয় একান্ত লৌকিক জীবন-ভাবনাজাত। সপ্তম দিবসীয় নিশাপালায় মহামায়ার বাগ্‌দিনীরূপ ধরে মৎস্য ধরা ও কামোন্মত্ত শিবকে ছলনা করে কৈলাসে প্রস্থান বর্ণিত। পরবর্তী জাগরণ-পালাটিতে শাঁখারি-বেশী শিবের গৌরীকে শাঁখা-পরানো, পার্বতীর

কালীমূর্তিধারণ, হরগৌরীর মিলনবাসর ইত্যাদি বর্ণনার পর কবি ধান্যোপজীবী বাঙালিদের জন্য তৎকাল প্রচলিত প্রচুর ধানের নামের একটি তালিকা দিয়ে কাব্য সমাপ্ত করেছেন। মনে হয়, এই দু'টি পালা শঙ্কর কবিচন্দ্রের খণ্ডিত 'শিবায়ন' কাব্যের 'মর্চ্ছ-ধরা' ও 'শঙ্খপরা' পালা দু'টির প্রসারণ, তবে রামেশ্বরের মৌলিক কবিপ্রতিভার প্রমাণও এখানে আছে।

৬.৩.১ রামেশ্বর তাঁর কাব্যে শিব-দেবতাকে দরিদ্র কৃষকের প্রতিনিধি দরিদ্র কৃষকই করেছেন। ড. সুকুমার সেন বলেছেন—

> রামেশ্বরের শিব এক হেলে চাষী, আর গৌরী তাঁর সেই দরিদ্র একমাত্র সংসারেরই কর্ণধার গৃহিণী। দরিদ্র, তবে ভদ্র এবং দেবতা।[২০]

অলস স্বামী শিবকে পার্বতী ভিক্ষোপজীবিকা ত্যাগ করে কৃষিকার্য করতে বললেন। শিব প্রথমে একটু আপত্তি জানিয়ে বললেন— 'দেবতার পোদবৃত্তি বড়ই লঘুতা।' পার্বতী ভরসা দিলেন—'তুমি চাষ চষিলে কিসের অসম্ভাব।' নিমরাজি শিব দেবরাজ ইন্দ্রের কাছে গিয়ে চাষের জমি প্রার্থনা করলেন। ইন্দ্র বললেন, নিজে ভূস্বামী হয়ে প্রার্থনার দরকার কি?—'যত পার জোত কর, কাজ নাই কয়্যা।' কিন্তু শুধু মুখের কথায় বিশ্বাস নেই। রামেশ্বরের তাঁর অভিজ্ঞতায় জানতেন, সেকালের জমিদারেরা জমির স্থায়ী পাট্টা না থাকলে চাষির জমি কেড়ে নিত। তাই শিবের মুখ দিয়ে ইন্দ্রকে বলিয়েছেন—'পাটাটুকি পাল্যে পরিণাম শুদ্ধ হয়।' তখন 'কশ্যপের বেটা।/দেব-দেবে লিখ্যা দিল দেবোত্তর পাট্টা।' জমি জোগাড় হল। এবার হাল বলদ চাই। শিবের নিজের বাহন ষাঁড়টি তো আছে। আর জুড়ি হিসেবে যমরাজের কাছ থেকে মহিষ ধার করা হল। শিবের ত্রিশূল ভেঙে বিশাই বা বিশ্বকর্মা লাঙ্গল, জোয়াল, কোদাল, দা, লাঙ্গালের ঈষ সব তৈরি করে দিলেন। এবার চাই চাষের বীজধান। শিব গৃহিণীকে বললেন, 'কর্জ্জা কর কাত্যায়নি কুবেরের কাছে।' নারী হয়ে কাত্যায়নী ধার চাইতে যেতে নারাজ। অগত্যা শিব নিজেই গিয়ে কুবেরের কাছ থেকে বীজধান ধার করে আনলেন। এতে সেকালে মহাজনের কাছে নিরুপায় কৃষকের ধানও ঋণ নেবার ছবি স্পষ্ট। শিব ভাগিনা ভীমকে নিয়ে চাষের কাজে নেমে পড়লেন। বর্ষণক্ষান্ত মাঘের পূণ্যদিনে জমিতে শিবের 'হলপ্রবাহ' হল। বৈশাখে শুভদিন দেখে ঠাকুর বীজ বুনলেন। আশ্বিন-কার্ত্তিকে সবুজ ধানে মাঠ আলো হয়ে গেল। তখন—

> হর্ষ হয়ে হর ধান্য দেখে অবিরাম।
> কালিন্দীর কুলে যেন নবঘনশ্যাম॥

পৌষে ঘরে ধান উঠল। গৃহে অন্নাভাব রইল না। পার্বতী রেঁধে বেড়ে স্বামী পঞ্চানন শিব, এবং দুই পুত্র ষড়ানন কার্ত্তিক ও গজমুখ গনেশকে অন্নব্যঞ্জন পরিবেশন করলেন। কিন্তু তাতেও বিড়ম্বনা—

> তিন ব্যক্তি ভোক্তা এক অন্ন দেন সতী।

দুটি সুতে সপ্তমুখ, পঞ্চমুখ পতি॥...
তিন জনে বার মুখে পাঁচ হাতে খায়।
এই দিতে এই নাঞি হাঁড়ি পানে চায়॥...
কার্ত্তিক গনেশ বলে—অন্ন আন মা।
হৈমবতী বলে—'বাছা, ধৈর্য ধরি খা॥

সুখ-পরিতৃপ্ত দরিদ্র কৃষকের একদিনের গৃহস্থালি-সুখের পরিপূর্ণ ছবি।

৬.৪ যুগরুচির ক্লিন্নতা অনুযায়ী রামেশ্বরকে তাঁর কাব্যে পার্বতীকে বাগ্‌দিনী জেলেনি সাজিয়ে মাছ ধরাতে এবং বাগ্‌দিনীর রূপে মোহাবিষ্ট শিবের কামচঞ্চলতার ছবিও আঁকতে হয়েছে। কিন্তু এতে বোঝা যায়, শিব আগে কোচ, বাগ্‌দী, জেলেদের সেবিত অন্-আর্য দেবতা ছিলেন। রামেশ্বর মৎসপ্রিয় বাঙালির জন্য বাগ্‌দিনী পার্বতীকে দিয়ে অনেক রকমের মাছ ধরিয়েছেন। যেমন—পাবদা, পুঁটি, পাঙ্গাস, চিতল, চেলা, চাঁদকুড্যা, মৌরলা, টেঙ্গারা, ভেটকি, ভোলা, খলিস, শোল, রোহিত, মৃগাল ইত্যাদি। এদের মধ্যে ছোটোবড়ো সব ধরনের মাছই আছে। বাঙালি কবি জয়দেবই তাঁর 'গীতগোবিন্দম্' কাব্যে (দ্বাদশ শতক) মাছকে দেবতার মর্যাদা দিয়ে তাকে দশাবতারের প্রথম অবতার বলেছেন— 'কেশবধৃত মীনশরীর জয় জগদিশ হবে।'

৬.৫ কাব্যের শেষাংশে কবি ধান্যোপজীব্য বাঙালির জন্য বহু ধানের নাম জানিয়েছেন। এদের মধ্যে কনকচুর, দুধরাজ, গোপালভোগ, ঝিঙ্গাশালী, সীতাশালী, বাঁকশালী, ছত্রশালী, বাঁকচূড়, পাতসাভোগ প্রভৃতি ধানের চাষ এখনো বাংলায় আছে। ধান যে বাঙালির প্রধান খাদ্যোপকরণের উৎস, তা সেনরাজ লক্ষ্মণ সেনের (রাজত্বকাল ১১৭৯—১২০৪ খ্রি.) আনুলিয়া, তর্পণদীঘি, শক্তিপুর প্রভৃতি গ্রামে প্রাপ্ত তাম্রশাসনের প্রথম শ্লোক থেকে জানা যায়—

বিদ্যুদ্ যত্র খনিদ্যুতিঃ ফইনপতের্বালেন্দুরিন্দ্রায়ুধং
বারি স্বর্গতরঙ্গিনী সিত শিরোমালা বলাকাবলি।
ধ্যানাভ্যাসমীরণোপনিহিতঃ শ্রেয়োহিসুরোদ্ভুতয়ে
ভুয়াজ বঃ ভবার্নিতাপভিদুরঃ শাম্ভোঃ কর্পর্থমুদঃ॥

এখানে শম্ভুজটারূপ মেঘ শ্রেয়ঃ শস্যের অঙ্কুরোদগমের হেতু হোক—এই শুভ প্রার্থনা। 'ধান্যোপজীবী বাঙ্গালির জাতীয় মঙ্গলাচারণ—শ্লোক হইবার পক্ষে ইহা সম্পূর্ণ উপযুক্ত।'— এই মন্তব্য ড. সুকুমার সেনের।[২১]

৬.৬ 'শঙ্খ-পরা পালায় পার্বতীর স্বামীকে শাঁখা দেবার আবদার, শিবের স্ত্রীকে তিরস্কার—'ভিখারীর ভার্যা হৈয়া ভুষণের সাধ।' অভিমানিনী পার্বতীর দুই পুত্র গুহ- গজানন-সহ পিত্রালয়ে গমন। নারদের পরামর্শে শিবের যোগবলে একজোড়া 'বাইশঙ্খ' গড়ে শাঁখারির ছদ্মবেশে হিমালয়ে শ্বশুরালয়ে গমন, পার্বতীকে

শাঁখা-পরানো, শিব-শিবানীর শুভ মিলন ইত্যাদি লৌকিক কাহিনিতে বোঝা যায় শিব নিম্নবর্গীয় শাঁখারিদেরও উপাস্য দেবতা ছিলেন। এখানে প্রকাশ পেয়েছে কবির নবপুরাণ-সৃষ্টির সামর্থ্য। যাকে লোকসংস্কৃতির তাত্ত্বিক ভাষায় বলা যায় (Neo myth-making power)।

৬.৭ রামেশ্বরের কাব্যের আর একটি লৌকিক উপাদান 'প্রবচন' (Proverbial saying) সৃষ্টি। কয়েকটি উদাহরণ—

১. 'হাঁড়ির মুখের মত মিলি গোল সরা'।
২. 'পুঞ্জি আর প্রবঞ্চনা বাণিজ্যের মূল',
৩. 'দারিদ্র্য দোষের পর দোষ নাই আর',
৪. 'নামের নিমিত্তে লোকে নানা কর্ম করে',
৫. 'অনর্থের বীজ অর্থ মত্ততার ঘর' ইত্যাদি।

৭. বিনয়লক্ষ্মণ বা লক্ষ্মণদেবের 'শিবের গীত' এবং রতিদেবের 'মৃগলুব্ধে' পৌরাণিকেও লৌকিক উপাদান :

৭.১ ক. বিনয় লক্ষ্মণ বা লক্ষ্মণদেবের খণ্ডিত পুঁথিতে প্রাপ্ত 'শিবের গীত' লৌকিক 'শিবগীতিকা'। এর লোকায়ত কাহিনিতে দেখি, শিবের মালঞ্চে পুষ্পচয়নে এসে শিব-পার্বতীর গান্ধর্ব-মতে বিবাহের পর পার্বতী গৃহে ফিরলে মুনিগণ পার্বতীর সতীত্বে সন্দিহান হন। পার্বতী 'জতুগৃহ-পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে নিজ সতীত্ব প্রমাণ করেন। এটি লোককথার Fire Ordial Motif বা Chestity test-ও বলা যায়। এখানেও কবির Neo-myth বা 'নব পুরাণকথা' সৃষ্টির পরিচয় পাই।

৭.২ খ. রতিদেবের 'মৃগলুব্ধ' (১৬৭৪ খ্রি.) কাব্য অর্বাচীন কিছু উপপুরাণ অবলম্বনে রচিত শিবচতুর্দশী ব্রতকথার প্রসারণ; সুতরাং প্রকৃতিতে এটি লোককথার অন্তর্গত একটি স্বংরূপ Ritualistic tale বা ব্রতকথা। এর গঠন গল্পের মধ্যে গল্পের। গল্পটি বলেছেন হস্তিনাপুরীর রাজা মুচকুন্দকে তাঁর রানি রুক্মিণী। গল্পের বিষয় শাপভ্রষ্ট বিদ্যাধর চিত্রসেনের মর্ত্যে ব্যাধরূপে জন্মগ্রহণ এবং শিবচতুর্দশীর রাত্রে ঝড়-জলের মধ্যে বিল্ববৃক্ষে উঠে অজান্তেই হস্তচ্যুত 'বিল্বপত্রে বৃক্ষনিম্নস্থ শিবলিঙ্গের অর্চনায় তার শাপমুক্তি'। এই কাহিনি থেকে বোঝা যাচ্ছে আদর্শ শিব (Indo-Mongoloid) 'কিরাত', বা বাধ্যজাতিরও পূজিত দেবতা। এর অবশ্য জড় প্রাচীন 'অথর্ব বেদে' শিব 'কিরাত-রূপী' এবং 'তাণ্ড ব্রাহ্মণে' তিনি 'মৃগয়াধিপ'। মহাভারতেও শিব কিরাত-রূপে বর্ণিত। ভারবির (আ. ৫৫০ খ্রি.) 'কিরাতা- র্জুনীয়ম্' মহাকাব্যেও তো শিবকে কিরাত-রূপেই দেখা যায়।

<u>উৎসের সন্ধানে</u>

১. সুকুমার সেন : 'রুদ্র', ভারতকোষ, পঞ্চম খণ্ড, পৃ. ৪৩৯

২. রামকৃষ্ণ কবিচন্দ্র : 'শিবায়ন', পৃ. ১২৮
৩. ড. আশুতোষ ভট্টাচার্য : 'ধাঁধা', বাংলার লোকসাহিত্য, প্রথম খণ্ড, পঞ্চম সংস্করণ, পৃ. ৪৬০
৪. রামকৃষ্ণ কবিচন্দ্র : 'শিবায়ন', পৃ. ১৪৬-১৪৭
৫. তদেব, পৃ. ১৪৮
৬. তদেব, পৃ. ১৪৭
৭. তদেব, পৃ. ১৪৮
৮. তদেব, পৃ. ১৪৭
৯. তদেব, পৃ. ১৪৯
১০. তদেব, পৃ. ১৪৭
১১. তদেব, পৃ. ১৪৯
১২. ড. আশুতোষ ভট্টাচার্য : 'ধাঁধা', বাংলার লোকসাহিত্য, প্রথম খণ্ড, পঞ্চম সংস্করণ, পৃ. ৪৬৫
১৩. তদেব, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৬৭-৪৬৮
১৪. রামকৃষ্ণ কবিচন্দ্র : 'শিবায়ন', পৃ. ১৪৯-১৫০
১৫. তদেব, পৃ. ১৫০
১৬. শঙ্কর কবিচন্দ্র : 'শিবায়ন', বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ পুথি, পৃ. ২১২
১৭. ড. গুরুদাস ভট্টাচার্য : 'শিব ও শৈব সম্প্রদায়', ভারতকোষ, পঞ্চম খণ্ড, পৃ. ৪৮৮
১৮. শঙ্কর কবিচন্দ্র : 'শিবায়ন', উৎস : 'লোকসংস্কৃতি গবেষণা' পত্রিকায় 'মাছ, বাঙালি ও লোকসংস্কৃতি' বিশেষ সংখ্যায় ড. সনৎকুমার মিত্রের 'মাছ : দেশাচার/লোকাচার' প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য, পৃ. ৮৫
১৯. ড. পঞ্চানন চক্রবর্তী : 'শিবায়ন' বা 'শিবসংকীর্তন', রামেশ্বর রচনাবলী, পৃ. ১১২
২০. ড. সুকুমার সেন : 'বিচিত্র সাহিত্য', পৃ. ১৩০
২১. ড. সুকুমার সেন : 'বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস', প্রথম খণ্ড, ষষ্ঠ আনন্দ সংস্করণের ষষ্ঠ মুদ্রণ, পৃ. ২৩

শিব ঠাকুরের আদি-অন্ত এবং শিবায়ন ওরফে শিবমঙ্গাল

পল্লব সেনগুপ্ত

বাংলার জনজীবনে শিবঠাকুরের অবস্থান যতই ব্যাপক হোক না-কেন, তাঁকে নিয়ে দীর্ঘায়তন সাহিত্যে কিন্তু খুব বেশি নেই। শিবায়ন তথা 'শিবমঙ্গাল' কাব্য পাওয়া গেছে মাত্র দু'টি, কবিচন্দ্র এবং রামেশ্বরের লেখা। সে-দুটিও রচিত হয় ১৭শ শতাব্দীতে। যেখানে মনসা বা চণ্ডীকে নিয়ে ১৫শ শতাব্দীর আগে থেকেই মঙ্গালকাহিনির প্রচলন দেখা গেছে, সেখানে শিবকথার এত বিলম্বে আবির্ভাব কেন, এই জিজ্ঞাসার কিন্তু ঠিকঠাক জবাব পাওয়া কঠিন। অথচ, বাংলার গ্রামদেবতাদের বৃহত্তম অংশই কোনও-না-কোনও ভাবে শিবেরই রকমফের বলে জনমানসে বিবেচিত হয়। যেমন গ্রামদেবীরা অল্পবিস্তর মহাশক্তির রূপান্তর বলেই গৃহীত। এই পরিপ্রেক্ষিতে শিবের বিষয়ে আরও অনেক বেশি সাহিত্য সৃষ্টি হওয়া প্রত্যাশিত ছিল লৌকিক পরিমণ্ডলে। যেটা হয়নি।

আসলে শিব এমনই এক দেবতা, যিনি একই সঙ্গো পৌরাণিক এবং লৌকিক কৃষ্টির পরিপ্রেক্ষায় সমান গুরুত্বপূর্ণ। এমনকি প্রাক্-পৌরাণিক পর্বের সংস্কৃতিতেও অর্থাৎ হরপ্পা-সংস্কৃতি এবং ঋগ্বৈদিক-সংস্কৃতিতেও তাঁর আদিতর রূপগুলিকে খুঁজে পাওয়া কঠিন নয়। মহেঞ্জোদড়োতে পাওয়া কয়েকটি সিলমোহরে উৎকীর্ণ ত্রিশীর্ষ এক দেবমূর্তিকে জন মার্শাল 'আদি-শিব' বলে চিহ্নিত করেছেন। কোনও-কোনও আলোচক বৈদিক বৃত্তকেও ঋগ্বেদের বিভিন্ন শ্লোক এবং ঐ বিশেষ মূর্তি-মোহরটির সাহিত্যিক-পুরাতাত্ত্বিক বিবরণের সংশ্লেষণ-বিশ্লেষণ করে, শিবের সঙ্গো একীভূত করেছেন। তবে সেই আলোচনা এই ক্ষেত্রে প্রসঙ্গাভুক্ত নয়, যদিও বৈদিক রুদ্রদেবতা কালক্রমে প্রলয়েশ্বর শিবের সঙ্গো মিশে গেছেন।

শিবের সঙ্গো হরপ্পা সভ্যতার যে একটা অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ সম্পর্কই ছিল, ভাষাতত্ত্বগত দিক থেকেও সেটা বিবেচনা করা যায়। উত্তরকালে 'মহেঞ্জোদড়ো' শব্দটির অর্থ সিন্ধিভাষার মাধ্যমে গণ্য করা হয় 'মৃতের পুরী' হিসেবে। কিন্তু আনুমানিক ১৭৫০ খ্রিস্টপূর্বাব্দ অতিক্রান্ত হবার পর ঐ বিপুল নগরী মৃতের পুরীতে পরিণত হলেও, যখন বিধ্বস্ত হয়নি (প্রাকৃতিক বিপর্যয় এবং/অথবা বহিরাক্রমণ, যে-কারণেই হোক), তখন নিশ্চয় তার নাম 'মৃতের পুরী' ব্যঞ্জক ছিল না। 'জীবন্ত পুরী'-ই ছিল। যে-নামই থাক না-কেন তখন, সেটাই উত্তরকালে 'মহেঞ্জোদড়ো' হওয়া অসম্ভাব্য নয় ; এবং 'মহেন্দ্র দৃঢ়'/'মহেঞ্জোদড়ো'—এমনটা বিবর্তিত হওয়াও যথেষ্টই স্বাভাবিক। ঋগ্বেদে ইন্দ্রের নাম যা-যা, তার মধ্যে 'দৃঢ়হা' (দুর্গধ্বংসকারী এবং 'পুরন্দর' পুর অর্থাৎ নগর ধ্বংসকারী)—এ দু'টি খুব উল্লেখযোগ্য। ঋগ্বেদের সাক্ষ্য অনুযায়ী ইন্দ্র তাঁর বাহিনী নিয়ে 'অশ্মময় পুরী' (অর্থাৎ পাথরের দুর্গনগরী) দগ্ধ এবং ধ্বংস করেন। এই ব্যাপারটার সঙ্গো মহেঞ্জোদড়ো ধ্বংসের প্রত্নিনিদর্শন মেলানো যায়। আরও বলার কথা : (খুব সম্ভবত) ঐ নগরীর যা নাম ছিল অবিশ্লেষিত-লিপিময়- প্রত্ন-ঐতিহাসিক সেই সৈন্ধবী ভাষায়, সেটাই অনুদিত হয়েছিল 'মহেন্দ্রদৃঢ় > মহেঞ্জোদড়ো' রূপে। পরে

মানেটা পালটে যায়।

ঋগ্বেদে যজ্ঞাবতী নদীকূলস্থ 'হরিযূপীয়া' নগরীরও উল্লেখ আছে। এটাই ইরাবতী তীরের হরপ্পা। এই নামেও কিন্তু 'শিব' উপস্থিত, হর + আপ্পা। স্মরণ রাখা দরকার, আধুনিক গবেষণায় সিন্ধুলিপির 'স্ট্রাকচারাল ফর্ম'-এ দ্রাবিড় গোষ্ঠীর ভাষার অনুরূপ বিন্যাস খুঁজে পেয়েছেন কেউ-কেউ। আদি দ্রাবিড়দেরও একটা শাখা যে হরাপ্পীয় সভ্যতার বলয়ে ছিল—তার নজিররূপে এখন বালুচিস্থানে আশ্রয় নেওয়া ব্রাহুই ভাষার উল্লেখ করাই যায়। সুতরাং 'হর + আপ্পা', বিশেষ দূরান্বয়ীকল্পনা নয়। হর (শিব) + (পিতৃবাচক' দ্রাবিড় প্রত্যয় শব্দ) আপ্পা = 'হরপ্পা' মেনে নিতে অসুবিধে নেই। বালুচিস্থানেই 'শিবিস্তান' নামে একটি প্রত্নশহর মিলেছে। 'শিবি' জাতির হদিশ মেলে পশ্চিম সিন্ধু-পূর্ব বালুচিস্থানে। সব মিলিয়ে—'শিব' সিন্ধু সংস্কৃতিতে ছিলেন যে, এটা বলাই যায়। গৌরীপট্ট সন্নদ্ধ শিল্পশীর্ষ উপাসনার হদিশও সেখানে মেলে। ঋগ্বেদে সেটাকে গালমন্দও করা হয়েছে।

পুরাণগুলি যখন থেকে গড়ে উঠতে শুরু করে, তখন আর্যভাষীদের ধর্মবিশ্বাসে 'শত্রুপটের' শিব দেবতা এবং আত্মপক্ষের রুদ্রদেবতা মিশে যেতে থাকেন। লোকায়ত স্তরে বিবর্তিত হয়ে আসেন তিনি সর্বত্র উপাস্য মহামাতৃকার অচ্ছেদ্য সঙ্গীরূপে। পুরাণে শিব ও শক্তি রূপে, অর্ধনারীশ্বর রূপের মূর্তিতে এবং ব্যবহারিকভাবে শিবলিঙ্গ-গৌরীপট্ট প্রতীকে তাঁরা পূজিত হতে লাগলেন। পরমপুরুষ এবং পরমাপ্রকৃতির অন্যতম দৃষ্টিগণ্য অভিপ্রকাশ রূপেও তাঁদের দেখা গেল। এই সূত্রেই, এটাও মনে রাখতে হবে যে, এক অর্থে তিনি উর্বরতাতন্ত্রেরও দেবতা—শিবলিঙ্গ-গৌরীপট্টের সন্নদ্ধ উপাস্য প্রতীকটি তারই সুস্পষ্ট প্রমাণ। যৌনপ্রতীকায়ন ছাড়াও যে উর্বরতাতন্ত্র ওরফে ফার্টিলিটি কাল্‌টের আরও একটি দিক আছে, কৃষি—সেটাও আমাদের লোকপুরাণের শিবকথার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট হয়ে থাকতে দেখি।

২.

বাংলা শিবকথা (ওরফে শিবায়ন তথা শিবমঙ্গাল)-কেন্দ্রিক সাহিত্য প্রধানত যে-দু'টি বইকে অবলম্বন করে গড়ে উঠেছে, তাদের মধ্যে রামেশ্বরের বইটিকে মোটামুটিভাবে ঐতিহ্যময় পুরাণকথারই বাংলা কবিতা-নির্ভর একটি রচনা বলে গণ্য করতে পারা যায়। পক্ষান্তরে, রামেশ্বরের শিবায়নে অনেক বেশি লৌকিক জীবনের প্রতিভাস দেখতে পাই। ফলে, মঙ্গালকাব্যের যা অনিবার্য ভাবরূপ—জনজীবনের স্পন্দনকে ব্যক্ত করা, সেটা সেখানে স্পষ্টই অনুভব করা যায়।

প্রকৃতপক্ষে, অন্যান্য মঙ্গালকাব্যের কাহিনি স্তরে-স্তরে যেমন হারানো দিনের আর্থ-সামাজিক বিবর্তনের ইতিহাস লুকিয়ে থাকে, তেমনটাই দেখি রামেশ্বরের লেখায়। শিবঠাকুরকে নিয়ে বাংলার লোকায়ত সংস্কৃতিতে যত ধরনের কাহিনি প্রচলিত আছে, ছড়া-প্রবাদ রয়েছে—তাদের সমন্বয়ে যে-সামগ্রিক 'শৈব'-লোকসাহিত্য আমাদের সাংস্কৃতিক ঋক্‌থ, সে-সবের অনেকগুলিই আবার সঙ্কলিত করেছিলেন রামেশ্বর চক্রবর্তী। ইতিহাস

এমনকি, প্রাগৈতিহাসের স্মৃতিসঙ্কেতও তাদের মধ্যে অপ্রাপ্য নয়।

রামেশ্বরের এই 'শিবমঙ্গল' ওরফে 'শিবায়ন'-এ পুরাণকথা এবং লোকজীবনস্মৃতি যেভাবে সমান্তরাল গতিতে চলেছে, তাতে একটা বিচিত্র শিল্পরূপের সৃষ্টি হয়েছে সন্দেহ নেই। সাধারণভাবে মঙ্গলকাব্য ধারায় যে-সমস্ত ঘরোয়া জীবনযাত্রা চিত্রিত হতো, রামেশ্বরের এই বইও তার ব্যতিক্রম নয়। তবে এই গার্হস্থ্য ছবির সঙ্কলিত-বিন্যাসের মধ্যে-মধ্যেই পুরনো দিনের ইতিহাসেরও স্মৃতির 'ফসিল' ছড়িয়ে-ছিটিয়ে রয়েছে। এটা অল্পবিস্তর সমস্ত মঙ্গলকাব্যের মধ্যেই মিলবে। রামেশ্বরের বইও এর ব্যতিক্রম নয়। শিবকে নিয়ে বাংলার লোকসাহিত্যে যে-সব গল্প প্রচলিত আছে তাদের মধ্যে বেশ কয়েকটিতেই অলক্ষ্যে ইতিহাসের প্রতিভাস লুকিয়ে আছে। রামেশ্বরের 'শিবায়ন'-এ সেগুলি ব্যবহৃত হবার ফলে, ঐসব কাহিনির একটা করে স্থায়ী, লিখিত রূপ পাওয়া যায় এটা যথেষ্টই গুরুত্বপূর্ণ একটা কথা। শিবরাত্রির ব্রতকথা এবং স্থানীয়ভাবে প্রচলিত লোককাহিনিগুলির মধ্যে ঠিক সেগুলিকেই রামেশ্বর বেছে নিয়েছিলেন, যাদের মধ্যে সেই বিস্মৃত ইতিবৃত্ত রয়েছে! কেন, কে-জানে!

শিবরাত্রির ব্রতের ব্যাধ লুব্ধকের 'শিবপূজা'-র প্রচলিত কাহিনিটি রামেশ্বর তাঁর লেখা 'শিবায়ন' কাব্যের 'ষষ্ঠ দিবসীয় দিবা পালা'-তে যেভাবে সঙ্কলিত করে নূতনভাবে রচনা করেছেন, তার কথাবস্তু হল এই— সমস্ত দিন শিকারের সন্ধানে বনে-বনে ঘুরে সেই ব্যাধ রাতটুকু নিশ্চিন্তভাবে কাটানোর জন্যে একটি বেলগাছের উপরে উঠে ঘুমিয়ে পড়ে। ঘুমের ঘোরে ব্যাধ হাত নাড়ানোর ফলে শিশির-ভেজা কয়েকটি পাতা খসে গিয়ে গাছের নিচে পড়ে-থাকা শিবলিঙ্গরূপী একখণ্ড পাথরের উপরে পড়ে। এই কারণে 'আশুতোষ' মহাদেবের কৃপায় তার অক্ষয়পুণ্য লাভ হয়। পরদিন বনের মধ্যে আকস্মিকভাবে তার মৃত্যু হলে, যমদূতেরা হাজির হয়ে লুব্ধক ব্যাধের আত্মাকে নিয়ে যাবার উপক্রম করলে, শিবদূতেরাও সেখানে এসে পৌঁছায়; এবং তাদের সঙ্গে লড়াই করে হারিয়ে দিয়ে পুণ্যবান্ নিষাদের আত্মাকে শিবলোকে, অর্থাৎ কৈলাসে নিয়ে চলে যায়।

প্রাগৈতিহাসিক কালের শিকার-নির্ভর জীবনচর্যার যে-স্মৃতি পুরুষানুক্রমে প্রচলিত থেকেছে, এ-কাহিনির মধ্যে সেটিই লুকিয়ে আছে— শিকারের খোঁজে মানুষ জঙ্গলে-জঙ্গলে ঘুরে ঘুরে ক্লান্ত হয়ে পড়ছে; একটি বিশেষ গাছ 'পবিত্র' বলে গণ্য হচ্ছে; গাছের পাতা এবং শিশিরের জলে প্রস্তরখণ্ডরূপী দেবতা তুষ্ট হচ্ছেন; আর 'ইহলোকে' মৃত-শিকারের অধিকার নিয়ে দুই আদিম মানবগোষ্ঠীর দ্বন্দ্বের আদলেই 'পরলোকের' আধিদৈবিক-অতিলৌকিক সত্তারাও মরা-মানুষের আত্মাটার উপরে দাবি জানিয়ে যুদ্ধ করছে। বৃক্ষপূজা, প্রস্তরপূজা, অচেতন বস্তুতে চেতনার কল্পনা করা-ইত্যাদি সত্ত্বেও এই কাহিনির মধ্যে যে-সমাজস্তরটি শিলীভূত (ফসিলাইজড্) হয়ে আছে, সেটাকে চেনা কঠিন নয়। রামেশ্বর 'শিবায়ন'-এর 'ষষ্ঠ দিবসীয় নিশাপালা'-তে মেদিনীপুরের বিস্তীর্ণ অঞ্চলে প্রচলিত আর একটি কাহিনি সংযুক্ত করেছেন। এখানে প্রাসঙ্গিকভাবে উল্লেখযোগ্য যে, রামেশ্বরও ছিলেন ঐ জেলারই মানুষ। তাই তাঁর নিজের পারিপার্শ্বিক থেকেই সঙ্কলিত হয়েছিল শিবের

'মুনিষ' ভীমের চাষ করার গল্পটি। এই আঞ্চলিক মিথকথায় শিবঠাকুর ছিলেন কিঞ্চিৎ সম্পন্ন একজন চাষিগৃহস্থ। রামেশ্বরও তাঁকে সেইভাবেই রেখেছেন।

অজ্ঞাতবাসের সময়ে ভীম তাঁর মা কুন্তীঠাকুরানিকে নিয়ে না-কি ঐ এলাকায় আত্মগোপন করে লুকিয়েছিলেন এবং জীবনযাপনের জন্য রোজগারপাতি করার তাগিদে তিনি চাকরি নেন শিবুচাষির 'মুনিষ' (একালের অর্থনীতির পরিভাষায় যাকে বলা যায়, কৃষি-শ্রমিক/ভূমিহীন কৃষক/ভাগচাষি) হিসেবে। ঐ মিথে এরপর আছে যে, 'মুনিব' শিবের কথায় 'মুনিষ' ভীম মাঘী শুক্লা একাদশীতে বৃষ্টির জলে ভিজতে ভিজতে মাটিতে প্রথম লাঙল ঠেলে চাষবাসের পত্তন করেছিলেন। আর ঐ কারণেই সেই বিশেষ তিথিটি পরিচিত হয়েছে 'ভীম একাদশী' বলে। ঐ লোকপুরাণের গল্পের সূত্রে এটাও প্রচলিত যে ওখানে ঐ দিন নিরম্বু উপবাসে থেকে শিবের আদেশ পালন করার জন্যই ভীম কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের পরে দুর্যোধনের ঊরুভঙ্গ করতে সমর্থ হন। এ-গল্পের আরও একটি পাঠ ছিল, জরাসন্ধ বধের ব্যাপার নাকি সম্ভব হয়েছিল ঐ উপোষ করার বাবদে শিবের আর্শীবাদ পেয়ে!

শিবঠাকুরের নির্দেশে ভীম কেন কৃষিকর্মের সূত্রপাত করলেন তারও হদিশ মেলে এই মিথকথায়। রামেশ্বরের গ্রন্থে এখান থেকেই কাহিনি শুরু হয়েছে। অভাব এতই বেড়ে যায় যে, ফলমূল খেয়ে আর জীবন ধারণ সম্ভব হয় না শিবঠাকুরের পরিবারের পক্ষে। তখন পার্বতী নির্বন্ধে তিনি ইন্দ্রের কাছ থেকে চাষের জমি আর কুবেরের কাছ থেকে বীজধান চেয়ে নিয়ে ভীমকে দিয়ে চাষ শুরু করান। এবং গাছ কেটে জোয়াল আর ত্রিশূল ভেঙে হাল তৈরি করেন। চাষবাসের সুরাহা হল অতঃপর।

৩.

মূল মিথকথার যতটুকু অংশই রামেশ্বর ব্যবহার করে থাকুন না-কেন, ইতিহাসের সন্ধিৎসু ছাত্রেরা তারই মধ্যে বহু লুকোনো তথ্যের হদিশ পাবেন। ত্রিশূল ভেঙে হাল তৈরি করা তো গুরুত্বপূর্ণ প্রতীকী সঙ্কেত— শিকারজীবী মানুষ (শূল ওরফে বল্লম যার জীবিকাসংস্থানের উপকরণ) রূপান্তরিত হচ্ছে, কৃষিজীবীতে। শুধু তাই নয়, ফলমূল সংগ্রহ করে জীবনধারণ করা অসম্ভব হয়ে পড়াতেও কৃষির ওপর নির্ভরশীলতা অনিবার্য হয়ে উঠছে। সবটুকু মিলিয়ে, সম্পর্ক সুস্পস্ট হয়ে উঠছে এই লোকপুরাণবৃত্ত-নির্ভর কাহিনি এবং তার অনুসূত্রে লেখা রামেশ্বরের কাব্যের মধ্যে। শিব যে লৌকিক বিশ্বাসে কৃষির সঙ্গে সংশ্লিস্ট একজন দেবতা, এটাও আদি-শিবের যা অন্যতম পরিচয়—উর্বরতাতন্ত্রের সঙ্গে সংশ্লিস্ট দেবতা—সেটাও এখানে বুঝতে পারা যাচ্ছে অবশ্যই। আবার জরাসন্ধ বা দুর্যোধন বধের যে ঘটনা এই শিবের মুনিষ ভীমের কৃষিকর্মের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে, সেটাও একটা উল্লেখনীয় প্রত্ন-ঐতিহাসিক সঙ্কেত। কৃষিকর্মের সঙ্গে নরবলি দেওয়ার নব্যপ্রস্তরযুগীয় বিশ্বজনীন সংস্কারই এখানে প্রতিভাসিত। শূল ভেঙে হাল গড়ার মধ্যে প্রাচীন সময়ের আর্থ-সামাজিক রূপান্তর (কিংবা, ক্রম-স্তরায়ণ) স্মৃতিসঙ্কেত লুকিয়ে তো অবশ্যই ছিল। এরই পাশাপাশি অন্য আরও একটা ভাবনার প্রতিচ্ছায়াও যে নেই, এমনটাও বলতে পারছি না। রামেশ্বর যে সময়ের মানুষ তখন বাংলার পশ্চিম ও দক্ষিণ অঞ্চলে—বিশেষত মেদিনীপুর এলাকায় শস্ত্রজীবী শ্রেণির মানুষেরা বৃত্তি বদল করে চাষবাসের মাধ্যমে জীবিকা নির্বাহের চেস্টা করতে লেগেছিলেন— দ্রুত পরিবর্তনশীল একটা সামাজিক অবস্থার সঙ্গে

তাল মিলিয়ে চলবার তাগিদে। সৈনিকের, পাইকের, বরকন্দাজের কাজের মাধ্যমে খুনজখম, লুটপাট করে প্রভুর স্বার্থরক্ষা করতে-করতে ঐ সব মানুষের জীবনের অনিশ্চয়তা এবং অর্থনৈতিক অস্থিরতা, তাঁদেরকে ক্লান্ত এবং হতাশ করে তুলছিল ক্রমে ক্রমে। পার্বতীর পরামর্শে শিবের কৃষিতে মন দেবার ঘটনা তারও রূপক হওয়া কিছু অসম্ভব নয়। রামেশ্বর চিরাচরিতভাবে প্রচলিত লোককাহিনির ঐ বিশেষ উপলক্ষ্যটির সঙ্গো নিজের সমসাময়িককালের পরিপ্রেক্ষাকে মিলিয়ে নিয়েছিলেন তাঁর সুদক্ষ কবিপ্রতিভার জোরেই।

'শিবায়ন' কাব্যের মধ্যে সমসাময়িক সমাজের নানা প্রতিচ্ছবি, প্রত্যক্ষে-পরোক্ষে রামেশ্বর এঁকেছিলেন। বস্তুতপক্ষে, সমস্ত মঙ্গালকাব্যের মধ্যেই যেভাবে লোকজীবনের অতীত এবং সমকালের ইতিবৃত্ত যেমন স্তরে-স্তরে সঞ্চিত থাকে, রামেশ্বর চক্রবর্তীর কাব্যও সেই সুনির্দিষ্ট বৈশিষ্ট্যকেই প্রকাশ করেছে। তবে, মনসা-চণ্ডী-ধর্ম দেবতাদের নিয়ে তাঁর পূর্বসূরী সাহিত্যিকরা যে-কাহিনি ধারার সৃষ্টি করেছিলেন—এমনকি, তাঁর শিবায়ন-রচনার সহযাত্রী কবিচন্দ্রও যা লিখেছিলেন—সে সবের থেকে তাঁর লেখার একটা বড়ো পার্থক্য কিন্তু আছে। হরিদত্ত, মানিক দত্তের লেখা যেহেতু 'লুপ্ত হইল কালে'—তাই তুর্কি-আক্রমণ-উত্তরকালের ঐ দুই আদি-মঙ্গালকাব্য রচয়িতা ঠিক কীভাবে দেবদেবীদের চিত্রিত করেছিলেন জানি না। কিন্তু, বিজয় গুপ্ত, বিপ্রদাস পিপ্‌লাই, কেতকাদাস ক্ষেমানন্দ, নারায়ণ দেব, মুকুন্দ চক্রবর্তী, দ্বিজমাধব, ঘনরাম চক্রবর্তী, রূপরাম চক্রবর্তী প্রমুখ অগ্রগণ্য কোনও মঙ্গাল-সাহিত্যিকরাই দেবতাকে একেবারে শতকরা একশো ভাগ 'মানুষ' বানাতে চাননি! কিন্তু ঘনরামের শিব ও পার্বতী—পুরোদস্তুরভাবেই মধ্যযুগের বাংলার শেষ পর্বে গ্রাম্যচাষী-গৃহস্থদম্পতির মূর্তিতে দেখা দিয়েছেন তাঁদের দারিদ্র্য, সংসার, সুখ, দুঃখ, লোভ, আসক্তি, প্রেম এবং রাগ নিয়ে। সত্যিই যেন জনৈক 'শিবু ভট্টাচার্য' এবং তস্য পত্নী 'পার্বতী দেব্যাঃ' রূপেই তাঁদের উপস্থিতি এখানে! দেবতার এই পরিপূর্ণ মানবায়ন হয়তো ইতিহাসেরই সঙ্কেত, রামেশ্বর সেটাই দেখিয়েছেন।

রামেশ্বরের শিবায়ন-এ নিম্নবর্গের সমাজচিত্র

বিপ্লব মাজী

ভারতবর্ষের ইতিহাসে চোখ ফেরালে আমরা দেখতে পাই সে ইতিহাস এলিট শ্রেণির ইতিহাস। রাজা-রাজড়ার যুদ্ধ বিগ্রহের কাহিনি, বা সমাজের উচ্চবর্গের ইতিহাস। যাদের কাঁধের ঠেলায় ইতিহাসের চাকা ঘুরেছে, সেইসব নিম্নবর্গ, প্রান্তিক, আদিবাসী ও দলিত মানুষের স্থান সেখানে নেই। মিডিয়া-ডার্ক অঞ্চলের মানুষের স্থান নেই। ফলে ইতিহাস বলে আমরা যা জানি, সেইসব ইতিহাসের প্রতিটিই আংশিক ইতিহাস। প্রকৃত ইতিহাসের বেশিরভাগটাই কালের গর্ভে হারিয়ে গেছে।

বিগত শতকের আটের দশকে, ভারতেই সাবলটার্ণ বা নিম্নবর্গের মানুষকে নিয়ে চর্চা শুরু হয়। অকাদেমির পরিসরে ইতিহাসকার, গবেষক ও লেখকরা আঞ্চলিক ইতিহাসের দিকে চোখ ফেরান। পুরনো দলিল-দস্তাবেজ, পুথি, পঞ্জিকা ঘেঁটে হারিয়ে যাওয়া ইতিহাসের খোঁজ শুরু করেন। লোকসংস্কৃতি, জনজাতির-সংস্কৃতি, মুখফেরতা-সাহিত্য (ওর্যাল লিটারেচার), মহাকাব্য, পুরাণ ও নানা উপাখ্যানের মধ্যে মানবসভ্যতার অগ্রগতির ইতিহাস খোঁজা শুরু করেন। আমাদের মঙ্গালকাব্যগুলি পাঠ করে তাঁরা নিম্নবর্গ ও প্রান্তিক মানুষের সামজচিত্র খুঁজে পান। বিশেষ করে গ্রামীণ সমাজজীবনের ইতিহাস।

বিগত প্রায় হাজার বছরের সুলতানি আমল, মুঘল রাজত্ব, ব্রিটিশ ঔপনিবেশিকদের শাসনের ইতিহাস সমাজের উচ্চবর্গ, রাজা-রাজড়াদের ইতিহাস। বিগত দুশো থেকে তিনশো বছরের ইতিহাসও আজ বিস্মৃতির অন্ধকারে। ছড়া, ধাঁধা, প্রবাদ-প্রবচন, লোককথা, ধর্মচেতনামূলক বই, লোকসংস্কৃতি থেকে ইতিহাসে নিম্নবর্গের মানুষের স্বর আমরা খুঁজছি। ঔপনিবেশিক প্রভু ব্রিটিশরা তাদের নিজেদের স্বার্থে, এই দেশ শাসন করার জন্য প্রাচ্যবিদ্যা বা ওরিয়েন্টালিজম্ নির্মাণ করেছিল। যার ফলে বিগত দুশো পঞ্চাশ বছর পশ্চিমি-চোখে আমরা আমাদের ইতিহাসকে দেখেছি, এবং সাহিত্যে তার প্রতিফলন ঘটিয়েছি। যার ফলে চর্যাপদ থেকে মঙ্গালকাব্য পর্যন্ত আমাদের সাহিত্যের ইতিহাসে প্রায় এক হাজার বছর যে প্রবাহটি ছিল, ব্রিটিশ তত্ত্বাবধানে আমরা সে প্রবাহটিকে শুকিয়ে যেতে দিয়েছি। ব্রিটিশ শাসনকালে পশ্চিমি-চোখে সাহিত্যের বিচার-বিশ্লেষণ শুরু করি, আধুনিক বাংলা সাহিত্যের সূচনা বঙ্কিমচন্দ্র থেকে রবীন্দ্রনাথ ধরে, এই একুশ শতক পর্যন্ত সেই পশ্চিমি স্রোতেই গা ডুবিয়ে বসে আছি। কিন্তু বিগত শতকের আটের দশক থেকে সাবলটার্ণ চর্চার প্রেক্ষিতে বহুত্ববাদী ইতিহাস লেখা নিয়ে ভাবনাচিন্তা শুরু করেছি। আর সেই ভাবনা থেকেই রামেশ্বরের 'শিবায়ন'-পাঠ। ইতিহাসচর্চার এই বহুত্ববাদী নতুন প্রেক্ষিতটি মনে রেখে আমরা রামেশ্বরের 'শিব-সঙ্কীর্ত্তন' বা শিবায়ন কাব্যগ্রন্থটি নিয়ে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করবো। কেননা, প্রায় তিনশো পঞ্চাশ পৃষ্ঠার আয়তনের এই মূল্যবান বইটির বিস্তৃত আলোচনার পরিসর এখানে নেই। বইটিতে ১৭০টি অধ্যায় এবং ৭০৩০টি পংক্তি আছে। মেদিনীপুরের

অমর কবি রামেশ্বর ভট্টাচার্য। বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে 'শিব-সংকীর্তন পালা' ও 'সত্যনারায়ণের কথা' লেখার জন্য তাঁর নাম সোনার অক্ষরে লেখা থাকবে। শিবসংকীর্তন পালা, পরবর্তীকালে পণ্ডিতদের সংস্কারে যা 'শিবায়ন' নামে পরিচিত; বইটিতে আমরা প্রাক্-আধুনিক যুগের নিম্নবর্গের সমাজচিত্র পাই। যে সমাজ ছিল পল্লিজীবনকেন্দ্রিক সহজ সরল। আজ থেকে দুশো-তিনশো বছর আগের বাঙালি সমাজজীবনে অভাব অভিযোগ থাকলেও, প্রতিদিনের জীবন অসহনীয় ছিল না। সতেরো-আঠারো শতকে গ্রাম বাংলার অতি সাধারণ পরিবারেও মোটা ভাত, মোটা কাপড়ের কোনো অভাব ছিল না। টাকা পয়সার অভাব থাকলেও, মানুষ বিচলিত হত না। কেননা, খাবার-দাবার, মোটা কাপড়—সবই তাঁরা নিজেরা উৎপাদন করতে পারতেন। বাঙালি জীবনের জন্ম, বিবাহ উৎসবগুলি ব্যক্তিগত ঘটনার ক্ষুদ্র গণ্ডিতে বাঁধা থাকতো না, পাড়া-প্রতিবেশী সবাই সে উৎসবে যোগ দিত। সবার জন্য উৎসব-দুয়ার খোলা থাকতো। এইসব তথ্য আমরা রামেশ্বরের 'শিবায়ন' পাঠে পাই। যেমন গৌরীর জন্মে গিরিরাজ হিমালয়—

দেখিয়া কন্যার মূর্ত্তি হিমালয় কৃতকীর্ত্তি
আপনে জানিয়া করে দান।
লোচনে প্রেমের ধারা কহে কেহ মোর পারা
ত্রিভুবনে নাহি ভাগ্যবান॥[৪২৯]
লইয়া বান্ধব জনে বাদ্য গীত কোলাহলে
করিল কৌলিক মহোৎসব।...[৪৩০]

একুশ শতকে বিজ্ঞান-প্রযুক্তি, তথ্যপ্রযুক্তি, উন্নত যোগাযোগ ব্যবস্থা, ন্যানো-প্রযুক্তির যুগে পৌঁছে আমরা যেখানে লক্ষ লক্ষ কন্যা-ভ্রূণ হত্যা করি, আজ থেকে দুশো-তিনশো বছর পেছনে কিন্তু আমাদের সমাজজীবনে কন্যাজন্ম অভিশাপ ছিল না। সভ্যতার অগ্রগতি কী আমাদের অমানবিক, বর্বর করে তুলেছে? এ-প্রশ্ন 'শিবায়ন' পড়ে মনে জাগে। রামেশ্বরের 'শিবায়ন'-এ বিয়ের ঘটনা পাড়াপ্রতিবেশী সবার আনন্দ উৎসব। বিয়ে একটি নারী ও একটি পুরুষের ব্যক্তিগত মিলনের ঘটনা ছিল না। কন্যার বাবা বরযাত্রীদের বিয়ের সভায় সম্বর্ধনা জানিয়ে নিয়ে আসতেন। কন্যার মা এয়োতিদের নিয়ে 'জল সইতে' যেতেন। যেমন—

ক. বরযাত্রী শব্দ শুন্যা স্তব্ধ হিমালয়।
আপনি মধ্যস্থ সঙ্গে আগে হয়্যা লয়॥[৭১৯]
খ. আনন্দ দুন্দুভি কর‍্যা লয়্যা বন্ধুগণে।
গৌরী-অধিবাস গিরি করে শুভক্ষণে।।[৭২২]
গ. ওথা নৃত্য বাদ্যগীত কর‍্যা কোলাহল।
শত এয়ো সহিতে মেনকা সহে জল।।[৭৩৭]

'শিবায়ন'-এর এই তথ্য থেকে আমরা বুঝতে পারি সতেরো-আঠারো শতকের বাঙালি

সমাজজীবনে কৌলিক প্রথার বাড়াবাড়ি ছিল (এ-প্রথা আজও ভারতীয় সমাজজীবনে নানারূপে আছে—যার কিছু কিছু দৃশ্য আমরা ভারতীয় চলচ্চিত্রে দেখতে পাই, বিশেষত বলিউডি চলচ্চিত্রে)। কুলীনের ছেলেকে কন্যার মা নানাভাবে তুস্ট রাখার চেস্টা করতেন (বর্তমানে তুলনামূলক ধনী পরিবারের ছেলেকে তুস্ট রাখার চেস্টা করেন নানা উপঢৌকন, টাকাপয়সা দিয়ে)। সেইসময় কন্যার মা জামাইকে বলতেন—মেয়ে মোটা ভাত মোটা কাপড় পেলেই সুখী থাকবে। অন্য যে ভয়ঙ্কর প্রথাটি ছিল 'গৌরীদানে পুণ্য অর্জন'! কন্যার বাবার বয়সী কুলীন বরের সঙ্গে নয় বছর বয়সী কন্যার বিয়ে দিতে পারলে কন্যার বাড়ির লোক নিজেদের ভাগ্যবান মনে করতেন! অবশ্য এই গৌরীদান প্রথা বর্তমানে উঠে গেলেও মাঝে মাঝে সংবাদপত্র, পত্রিকায় এধরনের খবর চোখে পড়ে। তবে কন্যার বিয়ের আগে 'জল-সায়' বা 'গঙ্গাবরণ' প্রথাটি 'শিবায়ন' লেখার কালের মতো সাড়ম্বরে আজকাল অনুষ্ঠিত না হলেও, 'গায়ে হলুদ' প্রথাটি পরিবর্তিতরূপে আছে। অন্যদিকে 'শিবায়ন'-এ আমরা দেখি শিব-পার্বতীর সামান্যতম আবদার 'শাঁখা পরার সাধ' পূর্ণ করতে পারছেন না। বিষয়টি নিয়ে পার্বতীর সঙ্গে বচসা করছেন। অথচ স্ত্রী-পুত্র-কন্যাদের মুখে চব্য-চূষ্য-লেহ্য-পেয় খাবার তুলে দিচ্ছেন। এই খাবারের যে বর্ণনা 'শিবায়ন'-এ আছে, বর্তমানের কোনো উচ্চ-মধ্যবিত্ত পরিবারেও পরিবেশন করা সম্ভব না। শিব-পার্বতীর সংসারে নেই নেই করে সাত-আটজন খেত— শিব, পার্বতী, কার্তিক, গণেশ, ভীম নামে এক গৃহকর্মী, তিনজন দাসী—পদ্মা, জয়া, বিজয়া। ভিক্ষা করে আনা ধনে এতজনের সংসার চলে না। পার্বতী শিবকে চাষবাসে মন দিতে বললেন—

চষ ত্রিলোচন চাষ চষ ত্রিলোচন।
নহে দাসদাসী আদি ছাড় পরিজন।।[২০৯০]
চরণে ধরিয়া চণ্ডী চন্দ্রচূড়ে সাধে।
নরমে গরমে কয় ভয় নাই বাধে।।[২০৯১]

পার্বতীর অনুরোধে শিব চাষবাসে মন দিলেন। দেবরাজ ইন্দ্রের কাছ থেকে জমির পাট্টা নিলেন। নিজের শূল ভেঙে শিব লাঙল তৈরি করলেন। কিন্তু শুধু জমি চষলেই তো হবে না, বীজধান চাই। পার্বতীকে বললেন, কুবেরের কাছ থেকে বীজধান আনতে। পার্বতী রাজি হলেন না, কেননা মেয়ে হয়ে ঋণ করা মৃত্যুর অধিক।

কুবের পরপুরুষ!
চাষে বাসে কাজ নাই মাস্যা খাব ভিখ।
মায়্যার কবজ করা মরণ অধিক।।[২২২০]
মন্দ যায় গোঠে মাঠে মায়্যা থাকে ঘরে।
ভাঁড়াবার দায় নাই নিত্য দায় ধরে।।[২২২১]
মন্দের করজ হৈলে মায়্যা দেয় টাল্যা
কোণে থাকে কুলবধূ কথা কয় ছাল্যা।।[২২২২]

রামেশ্বরের 'শিবায়ন'-এ শিবের চেয়ে পার্বতীর মহিমা নানাভাবে বর্ণিত। এখানে

শিবঠাকুর কোনো দেবতা না। একজন সাধারণ কৃষক। কৃষক জীবনের দুঃখ-কষ্ট তাঁদের সংসার জীবনে। সেখানে অলৌকিকতার কোনো স্থান নেই। বরং লৌকিকতা আছে। দাম্পত্য জীবনে মাঝে মাঝে ঝড় আসে কিন্তু আবার সবকিছু শান্ত হয়ে যায়। পার্বতী সর্বংসহা। স্বামী-পুত্র নিয়ে তাঁর সুখের জীবন। কোনো বিলাসিতা নেই, কিন্তু পার্বতীর কল্যাণে আনন্দ আছে। কবি রামেশ্বরের নিজের দুঃখময় জীবনের ছবি যেন 'শিবায়ন'-এ প্রতিফলিত। কবিকঙ্কণ মুকুন্দরামের বারোমাস্যার করুণরস 'শিবায়ন'-এ আছে। বিশেষত শিব যখন পার্বতীর শাঁখা পরার শখ জেনে ক্রুদ্ধ হয়ে বলেন—

ভিখারীর ভার্য্যা হয়্যা ভূষণের সাধ।
কেন অকিঞ্চন সনে কর বিসম্বাদ॥[২৭৮২]
বাপ বটে বড়লোক বল গিয়া তারে।
জঞ্জাল ঘুচুক যাও জনকের ঘরে॥[২৭৮৩]
সেইখানে শঙ্খ পর্য়া সুখ পাবে মনে।
জানিয়া জনক যাগে যাও নাই কেনে।।[২৭৮৪]
শিবের কঠোর বাক্যে পার্বতী শেলাঘাত পেলেন
একথা ঈশ্বরী শূন্যা ঈশ্বরের মুখে।
শূন্য হৈল সব যেন শেলমাল্য বুকে।।[২৭৮৫]

শাঁখা পরার সাধ পার্বতীর মনে জেগেছিল। কেননা,

শঙ্খ হাতে থাকিলে সংসারে কারে ভয়।
রোগ শোক-সন্তাপ ত্রিলোক নাহি রয়।।[৩১০৪]

পার্বতী স্বামীকে প্রণাম করে, দুই পুত্র নিয়ে যখন পিতৃগৃহে যাত্রা করলেন, শিব বুঝতে পারলেন, অকারণে নিজের অভাব ঢাকতে গিয়ে তিনি পার্বতীর প্রতি রূঢ় ব্যবহার করেছেন। গৌরীর পেছন পেছন তিনি চললেন, চেষ্টা করলেন মিষ্টি কথায় ভুলিয়ে ঘরে ফিরিয়ে আনতে। স্বামী-স্ত্রীর এই মান-অভিমানের চিত্র আজ থেকে প্রায় একশো বছর আগেও গ্রামবাংলার চিত্র ছিল। 'শিবায়ন'-এ শিব-পার্বতীর জীবনকে রামেশ্বর কোনো ধর্মীয় অনুষঙ্গে জড়িয়ে দেননি। মানবজীবনের রক্তমাংসেই তাঁদের জীবনচরিতে প্রবেশ করিয়ে, 'শিবায়ন' মহাকাব্য বিনির্মাণ করেছেন। শিব-পার্বতী এখানে রক্তমাংসের মানুষ।

রামেশ্বরের 'শিবায়ন' পাঠে আমরা জানতে পারি সতেরো-আঠারো শতকের সমাজজীবনে কৃষিকাজ সম্মানজনক বৃত্তি ছিল। অভিজাত ব্রাহ্মণরাও চাষের কাজ করতেন। অভিজাত নিজে কৃষিক্ষেতে বসবাস করতেন; চাষবাস ঠিকমতো চলছে কিনা দেখভাল করতেন। বছরের কয়েকমাস স্ত্রী-পুত্র-কন্যার সঙ্গে সম্পর্ক থাকতো না। আজ থেকে সত্তর-পঁচাত্তর বছর আগেও বাঙালি সমাজ-জীবনে এই ছবিটা ছিল। জমির মালিক নিজে হালের গরুর যত্ন করতেন, তৃণভূমিতে চরাতেন। মানুষ যেহেতু কৃষিকাজকে দেবকাজ মনে করতেন, তাই কৃষিকাজে সম্মান যায় একথা ভাবতেন না। মাঘমাসের শেষভাগে বৃষ্টি হলে

কৃষিকাজের শুভক্ষণ মনে করা হতো। বিশ্বায়নের লোভের পৃথিবীতে আজকাল মানুষ এসব মানেন না, যখন খুশি চাষ-আবাদ শুরু করে দেন। কৃষিকাজ আজকাল মানুষের কাছে সম্মানহানির কাজ, অথচ দেশে কৃষিকাজ না হলে অর্থনীতির মানচিত্রে উন্নয়নের গ্রাফে ধস নামে। জলসেচের বিজ্ঞানসম্মত ব্যবস্থা, বা কৃষি-প্রযুক্তি হাতে না থাকলেও, সেইসময় মানুষ সাধারণত নদী, জলাশয়, খাল-বিলের ধারে-কাছে কৃষিকাজ করতো। জমিতে আল বেঁধে বৃষ্টির জল ধরে রাখতো। রামেশ্বরের 'শিবায়ন'-এ এসব চিত্র আমরা পাই। কৃষিকাজ সম্বন্ধে মানুষের সহজাত অভিজ্ঞতা ছিল। ঋতুনির্ভর সেই অভিজ্ঞতা। চৈত্রমাসের মধ্যে চাষ শেষ করে, মই দিয়ে মাটি সমান করা, জমির উত্তর দিক উঁচু আর দক্ষিণ দিক ঢালু রাখা হতো। বৈশাখ মাসের শুভক্ষণে বীজ বোনা হতো। ফসল ফললে সে ফসলের মায়ায় গৃহস্থ ঘরসংসার ভুলে যেত, কেননা নবীন ধানে জীবনে সুখের দিন এসে যাবে।

ধান্য দেখ্যা পুণ্যবতী ধন্য ধন্য করে।
সার্থক শিবের চাষ সাবাস শঙ্করে।।[২৫০৭]

সতেরো-আঠারো শতকে বাংলার নারীসমাজে যেসব সোনার অলঙ্কার—হার, কঙ্কণ, কিঙ্কিণী, নূপুর প্রচলিত ছিল তার বিশদ বর্ণনা শিবায়ন-এ আছে। বিয়ের সময় কনেকে হার, বালা, চুড়ি, কাঁচলি ছাড়াও শাঁখ, কুমকুম, সিঁদুর, কাজল দিতে হত। কনেকে সাজানো হত ফুলে ফুলে। তবে আজকাল বাঙালিমেয়েরা সাধারণত কাঁচলি পরেন না। কিন্তু রামেশ্বরের শিবায়নে শাঁখ ও কাঁচলির দীর্ঘ বর্ণনা আছে। যেমন—

ক. বিচিত্র শঙ্খের চিত্র বর্ণিবার নয়।
সোমসূর্য্য সহিত সকল রত্নময়।।[৩০২৬]

খ. কার কুচে করার্পণ কার কণ্ঠদেশে।
কোথাহ রমণী শ্রান্ত হৈল রাসরসে।।[৩৩৭০]

সেইসময় বুক ঢেকে রাখার জন্য মেয়েরা কাঁচলি ব্যবহার করতেন। আজকাল শালোয়ার কামিজের সঙ্গে মেয়েরা ওড়না ব্যবহার করেন। অতিসম্প্রতি কাঁচলি-র ব্যবহারও ফিরে আসছে। বিশেষত ফ্যাশন হিসেবে। 'চণ্ডীমঙ্গল', 'মনসামঙ্গল', 'ধর্মমঙ্গল'— কাব্যে যেমন যুদ্ধের দৃশ্য আছে, 'শিবায়ন'-এও আছে। এক্ষেত্রে রামেশ্বর ভট্টাচার্য 'রামায়ণ'-'মহাভারত'-এর যুদ্ধের দৃশ্য মাথায় রেখে যুদ্ধের বর্ণনা দিয়েছেন। যদিও দক্ষযজ্ঞ ধ্বংসে মঙ্গালকাব্যের পথই অনুসরণ করেছেন, কিন্তু অন্যান্য ক্ষেত্রে যুদ্ধ বর্ণনাগুলি পড়লে বোঝা যায় রামেশ্বরের বাল্মীকি 'রামায়ণ' ও ব্যাসদেবের মহাভারত পড়া ছিল। যুদ্ধে আগ্নেয়াস্ত্রের ব্যবহার ছিল। শিবায়ন-এর কবিকল্পিত আগ্নেয় অস্ত্রগুলির কাজ দেখে মনে হতে পারে প্রাচীনকালে ভারতীয়রা পরমাণু ও জীবাণু অস্ত্রের ব্যবহার জানতেন। 'শিবায়ন'-এ যে মাহেশ্বর জ্বর ও বৈষ্ণব জ্বরের যুদ্ধের কথা আছে—তা পড়লে মনে হবে প্রাচীনযুগে ভারতীয়রা জীবাণুযুদ্ধ জানত! প্রায় ৩৫২ পৃষ্ঠা আয়তনের 'শিবসংকীর্তন পালা' বা 'শিবায়ন'-এর বিষয় শিব ও পার্বতীর প্রেম-বিরহের কাহিনি। একদিন দেবতাদের সভায় প্রজাপতি দক্ষ এলে, শিব ছাড়া

অন্যান্য দেবতারা সসম্ভ্রমে উঠে দাঁড়িয়ে প্রজাপতিকে অভ্যর্থনা ও সম্মান জানান। অথচ প্রজাপতি দক্ষ শিবের শ্বশুর ছিলেন। দেবতারা শিব-কে যখন এই বিপরীত আচরণ নিয়ে প্রশ্ন করেন, শিব তাঁদের জানান, নারায়ণ ছাড়া অন্য কাউকে তিনি যদি সম্মান জানান, তিনি অল্পায়ু হয়ে যাবেন। এই ভয় থেকে তিনি প্রজাপতি দক্ষকে সম্মান জানানো থেকে বিরত থাকেন। শিবের উত্তরে প্রজাপতি সন্তুষ্ট হন না। নিজের বাড়িতে ফিরে তিনি শিবহীন মহাযজ্ঞ শুরু করেন। নারদ শিবহীন যজ্ঞের সংবাদ শিব ও পার্বতীকে জানিয়ে দেন। দুজনেই মর্মাহত হন। শিবের নিষেধ না মেনে সতী যজ্ঞ দেখার জন্য পিতৃগৃহে পৌঁছে যান এবং স্বামীকে প্রজাপতি নেমন্তন্ন না করার জন্য ভৎর্সনা করেন! সতী বিনা নিমন্ত্রণে যজ্ঞশালায় এসেছে দেখে প্রজাপতি দক্ষ শিবনিন্দায় পঞ্চমুখ হন। দক্ষের মুখে শিবনিন্দা শুনে দেবতারা কানে হাত দিলেন। আর স্বামীনিন্দা সহ্য করতে না পেরে সতী যোগবলে দেহত্যাগ করলেন।

সতী দেহত্যাগ করলে নন্দী মৃতদেহ নিয়ে কৈলাসে ফিরে গেলেন। নন্দীর মুখে সবকিছু শুনে শিব ক্রোধে অগ্নিশর্মা! জটাজাল ছিন্নভিন্ন করে, রূদ্রমূর্তিতে যজ্ঞশালায় অনুচরবৃন্দদের নিয়ে প্রবেশ করে যজ্ঞ লণ্ডভণ্ড করে দিলেন। বীরভদ্র দক্ষের মুণ্ডচ্ছেদ করলেন! দেবতারা শিবের স্তবস্তুতি করে দক্ষের প্রাণভিক্ষা চাইলেন। দেবতাদের স্তবে সন্তুষ্ট শিব শান্ত হলেন এবং একটি ছাগলের মুণ্ড কেটে দক্ষের কবন্ধে দেবতাদের বসিয়ে দিতে বললেন। দক্ষ প্রাণ ফিরে পেলেন কিন্তু মুণ্ডটি ছাগলের।

এবার শিবানীহারা শিব উন্মত্ত, পাগল। প্রাণহীন সতীর দেহ কাঁধে নিয়ে 'সতী জাগ', 'সতী জাগ' মর্মভেদী বিলাপ করতে করতে ভারত ভ্রমণে বেরিয়ে পড়লেন। সতীদেহ ছিন্ন হয়ে ৫১টি স্থানে পড়ল এবং ৫১টি পীঠস্থান হল। গলায় হাড়ের মালা, চিতাভস্ম মেখে শিব কঠোর তপস্যায় ধ্যানমগ্ন হলেন। অন্যদিকে গিরিরাজ হিমালয়ের ঔরসে মেনকার গর্ভে সতী গৌরীরূপে জন্ম নিলেন। পূর্বজন্মের সংস্কারবশত ছেলেবেলা থেকেই গৌরী শিবের পুজো করেন। শিব-ই গৌরীর প্রাণেশ্বর। একথা জেনে গিরিরাজ হিমালয় শিবের সঙ্গে গৌরীর বিয়ে সম্পন্ন করেন। গিরিরাজ হিমালয়ের প্রাসাদ ত্যাগ করে গৌরী কৈলাসে শিবের পর্ণকুটিরে বসবাস শুরু করেন। শিব দোরে দোরে ভিক্ষা করে যা আনেন, তা দিয়েই গৌরী অন্ন ও নানারকম তরকারি রেঁধে সংসার চালান। অভাবের সংসার। গৌরী শিবকে চাষবাসে মন দিতে বলেন। শিব রূপান্তরিত হনেল কৃষকে। জমিতে প্রচুর ফসল ফলল। ধান ভানতে ঢেঁকির প্রয়োজন হল। শিব নারদের কাছে ঢেঁকি চেয়ে আনলেন। শিবের অনুচর ভূতেরা ধান ভেনে প্রচুর চাল উৎপাদন করল। গৌরীর অভাবের সংসারে এল সুখ। কিন্তু সংসারী জীবের জীবনে শান্তি নিরবিচ্ছিন্ন থাকে না। মর্ত্যলোকে শিব চাষে এমনই উন্মত্ত যে ক্ষেতখামার ছেড়ে কৈলাসে আসেন না। অন্যান্য নারী সংসর্গে গৌরীর কথা ভুলে গেছেন। দীর্ঘদিন শিবের সঙ্গে বিচ্ছেদ সহ্য করতে না পেরে, গৌরী নারদের পরামর্শে একে একে মর্ত্যে উঙানি মশা, মাছি, ডাঁশ পাঠালেন। পরে ঝাঁকঝাঁক মশা পাঠালেন কিন্তু শিবের উপস্থিত বুদ্ধিতে সবই ব্যর্থ। জোঁক পাঠালেন, তাও মহেশ্বরের টনক নড়ে না। নুন দিয়ে জোঁক মারার উপায় বের করলেন। ফসলের লোভ আর অন্য

নারী সঙ্গো তিনি বিভোর। পরিযায়ী কৃষকদের জীবনে যেমনটি ঘটে। শেষ চেষ্টা হিসেবে পার্বতী রূপসী বাগ্‌দিনীর রূপ বা ছদ্মবেশ ধরলেন। মর্ত্যে এসে শিবের ধানজমিতে মাছ ধরা শুরু করলেন। শিবের ভৃত্যদের সঙ্গো শিবানীর ঝগড়া বাঁধল। কিন্তু বাগ্‌দিনীর অসামান্য রূপ-লাবণ্য দেখে শিব তাঁকে কোনো বাধা তো দিলেন না, বরং পরিচয় জানতে চাইলেন। শিবানী এমনভাবে পরিচয় দিলেন যে শিব শিবানীকে চিনতে পারলেন না। ওদিকে বাগ্‌দিনীর প্রতি শিব কামার্ত। বাগ্‌দিনীকে তাঁর চাই। বাগ্‌দিনীর মন পেতে ধানক্ষেতে জল ছেঁচে তার মাছ ধরার ব্যবস্থা করে দিলেন। শিব এবার বাগ্‌দিনীকে আংটি পরাতে চান। যে মুহূর্তে শিব ভেবেছেন বাগ্‌দিনী এবার তাঁর আলিঙ্গানে ধরা দেবে, শিবানী শিবকে অকথ্য কথা শোনাতে শুরু করলেন। তারপর গায়ের কাদা ধোওয়ার ছল করে কৈলাসে ফিরে গেলেন।

বাগ্‌দিনী ফিরছে না দেখে, শিব বুঝতে পারলেন বাগ্‌দিনী তাঁর সাথে প্রতারণা করে চলে গেছে। এসময় পার্বতীর জন্য শিবের মন চঞ্চল হয়ে ওঠে এবং তিনি কৈলাসে ফেরেন। কিন্তু নতুন বিপদ। বাগ্‌দিনীর প্রতি আসক্ত হয়ে শিব তাকে আংটি দিয়েছেন বলে শিবানী শিবকে গৃহে প্রবেশ করতে দিলেন না। শিবের এই বিপদের সময় নারদ এলেন। পার্বতী নারদের কাছে শিবের কীর্তি ফাঁস করে দিলেন। কলহ-প্রিয় নারদের মনে দুর্বুদ্ধি জাগলো। শিব-পার্বতীর ঝগড়া আরো ঘোরালো করে দেবার জন্য নারদ পার্বতীকে শিবের কাছে একজোড়া শাঁখা চাইতে বললেন। নারদের পরামর্শে গৌরী শিবের কাছে একজোড়া শাঁখা চাইলেন। অভাবী শিবের পক্ষে শাঁখা কেনা সম্ভব না। অক্ষমতার কথা পার্বতীকে জানাতে, অভিমানে পার্বতী পিতৃগৃহে চলে গেলেন। শিব প্রমাদ গুনলেন। নারদ তাঁকে পরামর্শ দিলেন শাঁখারির ছদ্মবেশে গিরিরাজের প্রাসাদে গিয়ে তিনি যেন গৌরীর হাতে শাঁখা পরিয়ে দেন। শাঁখা পেয়ে গৌরীর রাগ পড়ে যাবে। কৈলাসে তিনি শিবের সঙ্গো ফিরে আসবেন। ছদ্মবেশী শাঁখারি শিবকে দেখে গৌরীর মন আনন্দে ভরে গেল। মনের মতো একজোড়া শাঁখ বেছে নিয়ে যখন মূল্য কত জিজ্ঞাসা করলেন, শিব শিবানীকে বললেন—"অমূল্য শঙ্খের মূল্য আত্মসমর্পণ।"[৩০৮৯] শিব নিজের হাতে শিবানীকে শাঁখা পরিয়ে দিলেন। শিবানীর

রাগ-অভিমান দূর হল। সপরিবারে শিবের সঙ্গে কৈলাসে ফিরলেন।

রামেশ্বরের 'শিবসংকীর্তন', পরে যার শিরোনাম 'শিবায়ন' মঙ্গালকাব্য ধারার মহাকাব্য। মধ্যযুগে বাংলা সাহিত্যের যে দু'টি প্রধানধারা মেদিনীপুর জেলায় বিকশিত হয়েছিল তার একটি হল মঙ্গালকাব্য এবং অন্যটি 'বৈষ্ণবসাহিত্য'। বাংলা সাহিত্যের মানচিত্রে এ-সময় কলকাতার অস্তিত্বই নেই। মঙ্গালকাব্যের ক্ষেত্রে রাজতন্ত্রের পৃষ্ঠপোষকতা থাকলেও, বৈষ্ণব সাহিত্যের ক্ষেত্রে ছিল না। ১৬, ১৭ ও ১৮ শতকে মেদিনীপুর জেলায় শৈব ও শাক্তধর্ম বাংলা সাহিত্যের গতিপথ নিয়ন্ত্রণে প্রভাব ফেলে। এই জেলার মঙ্গালকাব্যগুলি প্রধানত শৈব ও শাক্তধর্মের আলোয় সম্পৃক্ত। শিব ও চণ্ডী জেলার মুখ্য দেবতা। ফলে রামেশ্বরের 'শিবায়ন' এ-জেলার সাহিত্যে ভাষা পেয়েছে। রামেশ্বরের 'শিবায়ন' থেকে উঠে এসেছে সতেরো-আঠারো শতকের নিম্নবর্গের সমাজজীবন। পুরাণের দেবতারা এখানে মানবের রূপ পেয়েছে। শিব সতেরো-আঠারো শতকের কৃষক। তাঁর সংসারচিত্র, যা রামেশ্বরের 'শিবায়ন' থেকে পাই, তা সতেরো-আঠারো শতকের কৃষক জীবনের চিত্র। ধর্মীয় আবহ থাকলেও, ধর্মের গোঁড়ামি স্থান পায়নি। রামেশ্বরের 'শিবায়ন'-এ শিব-দুর্গা অলৌকিক দেবদেবী না। শিব একজন কৃষক। লাঙল দিয়ে জমি চাষ করেন। সাধারণ কৃষকের জীবনের মতোই তাঁদের জীবনে সুখ-দুঃখ আসে। শিবের লৌকিক আখ্যান রামেশ্বরের হাতে উপন্যাসের রূপ পেয়েছে। আর রামেশ্বর ভট্টাচার্য বাংলা সাহিত্যে অমরতা পেয়েছেন।

রামেশ্বর ভট্টাচার্যের শিবায়ন কাব্যে কৃষি-নির্ভর বাঙালি জীবনের আলো-আঁধারের নানান বর্ণময় চিত্র

আদিত্যকুমার লালা

শিব প্রাগার্য দেবতা। সুপ্রাচীনকাল থেকে অনার্য অধ্যুষিত বাংলাদেশে শৈবধর্ম সাধারণ জনসমাজের মধ্যে প্রচলিত ছিল। উত্তরবঙ্গের কোচ কৃষক সমাজে বাংলার লৌকিক শৈবধর্মের প্রথম ভিত্তি স্থাপিত হয়েছিল বলে মনে করা যায়। আশুতোষ ভট্টাচার্য লিখেছেন,—

> বাংলার সর্বত্র প্রচলিত লৌকিক শিবের ছড়ায় কোচনী রমণীর প্রতি শিবের আসক্তির বিস্তৃত বর্ণনা পাওয়া যায়। অতএব মনে হয়, কোচ জাতীয় কৃষকদিগের সমাজেই পৌরাণিক শিব সর্বপ্রথম আসিয়া প্রবেশ লাভ করেন,...[১]

এরপর উত্তর বিহার বা মগধ দেশ থেকে উত্তরবঙ্গে আর্যসভ্যতার বিকাশকালে বৈদিক রুদ্র দেবতার নানা বৈশিষ্ট্য এই লৌকিক শিবের উপর আরোপিত হয়। তবে বৈদিক রুদ্রের সব সংস্কার এই লৌকিক শিব অবিকৃতভাবে গ্রহণ করতে পেরেছিলেন, তা নয়। উচ্চতর সমাজের সংস্কারগুলি নিজেদের মানসিকতার সঙ্গে সামঞ্জস্য করে এই অঞ্চলের লোকসমাজ তা গ্রহণ করেছিলেন। ফলত উচ্চকোটির রুদ্র বা শিব এই অনার্য সভ্যতার সংস্পর্শে এসে নতুন রূপ লাভ করলেন। আর্য সমাজের কৃষির প্রতি ঔদাসীন্য গুণ লৌকিক শিবের মধ্যে সন্নিবিষ্ট হওয়ায় তাঁর সংসারে অভাব-অনটন দেখা যায়। শিব কৃষিভূমি চাষের মতো কঠিন কাজ ছেড়ে দিয়ে সমকালীন সমাজে চোখের সামনে দেখা বৌদ্ধ-ভিক্ষুর ভিক্ষার আদর্শে উদ্বুদ্ধ হন। আর্য শিব ছিলেন নীলকণ্ঠ। বাংলার কৃষিনির্ভর সমাজ নীলকণ্ঠ শিবের তাৎপর্য বুঝতে না পেরে তাঁকে নিজেদের সংস্কারের সঙ্গে মিলিয়ে দিয়ে ভাঙ ও গাঁজায় আসক্ত করে ফেলেছেন। গ্রাম্যকবিগণ তাঁদের কাব্যে শিবের এই নেশাসক্তি রূপকে তুলে ধরে সমাজ-মানসিকতাকে বৈধতা দেন। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাই লিখেছেন—

> গ্রামের কবিপ্রতিভা এখানেই ক্ষান্ত হয় নাই। শিবকে গাঁজা ভাঙ প্রভৃতি নেশায় উন্মত্ত করিয়াছে।[২]

অর্থাৎ এভাবেই বৌদ্ধ ও আর্য সংস্কৃতির উত্তরবঙ্গের লৌকিক শিব বিভিন্ন বৈচিত্র্যে সমন্বিত হয়ে সমগ্র বাংলাদেশের কৃষিনির্ভর সমাজজীবনের উজ্জ্বল প্রতিভূরূপে নিজেকে প্রতিপন্ন করেছেন। শিবায়ন কাব্যের কবিগণ, বিশেষ করে রামেশ্বর ভট্টাচার্য তাঁর 'শিবায়ন' কাব্যের লৌকিক অংশে শিবের ভিক্ষাচিত্র, হরগৌরীর কলহ, শিবের কৃষিকাজ প্রভৃতি ঘটনা বর্ণনায় কৃষিনির্ভর মানুষের জীবনের সুখ-দুঃখের কথা তথা আলো-আঁধারের নানা চিত্র সুনিপুণভাবে তুলে ধরতে সমর্থ হয়েছেন। রামেশ্বর ভট্টাচার্যের 'শিবায়ন' সাত পালায় বিভক্ত কাব্য। এর প্রথম দু'টি পালা পুরোপুরি পৌরাণিক, তৃতীয় পালার মাঝামাঝি অংশ থেকে লৌকিক কাহিনি (শিবের ভিক্ষাচিত্র, ভিক্ষায় ব্যর্থ হয়ে স্ত্রীর সঙ্গে কলহ) শুরু হয়েছে। আর চতুর্থ পালা থেকে

শুরু হয়েছে শিবের কৃষক জীবনের সুখ-দুঃখের কাহিনি। সমাজের কুপ্রথার কারণে (কৌলিন্যপ্রথা) ধনীর কন্যা গৌরীর শিবের সঙ্গো বিবাহ হয়েছে। শিব সংসারের প্রতি উদাসীন, কর্মবিমুখ ব্যক্তি। তাঁর সংসার বেড়ে যাওয়ায় খরচের পরিমাণ বেড়ে গেছে। সংসারে আয়-ব্যয়ের হিসাব মিলাতে গৃহিণী গৌরীর তাই প্রাণান্তকর অবস্থা। আর্থিক অনটনের কারণে সংসারে স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্কের মধ্যে ভাঙন দেখা যায়, পারস্পরিক কলহের সূচনা হয়—

ভিখারীর ভার্য্যা হইলে ভূপতির ঝি।
দুঃখীর দুহিতা নহ দোষ দিব কি।।
দেবী বলে দেব দেব দোষ কেন দেও।
দিয়াছিলে যত দ্রব্য লেখ্যা কর‍্যা লও॥

গৃহকর্তা শিব প্রচুর পরিশ্রম করে যে ভিক্ষাদ্রব্য নিয়ে বাড়ি ফেরেন, সংসারে অধিক সদস্যের কারণে তা অল্পেই ফুরিয়ে যায়। গৃহিণী এরপর কর্তাকে আরও কিছু আনার জন্য তাড়া দিলে কর্তা অতি ক্রুদ্ধ হয়ে পড়েন। কিন্তু গৃহিণীর কীই-বা করার আছে। শিবের শিশু সন্তানেরা তো আর দ্রারিদ্র্য মানে না—

এখন বাপের কাছে বস্যা আছে পো।
ক্ষুধা পাইলে ক্ষেমঙ্করী খাতো দেনা গো।।
বাপের বৈভব নাঞি কি করিবে মায়।
স্বামীর সম্পদ বিনে শিশু পোষা যায়॥
বুভুক্ষিত বালক বচনে নাঞি বয়।
দুগ্ধপোষ্য ক্ষুব্ধ নাকি চুম্ব দিলে রয়॥
অতিথি অবনীপতি অবলা অবোধ।
বিশেষত বালক না পাইলে কবে ক্রোধ।।

কর্তার তিরস্কারের ভয়ে প্রতিবেশীর নিকট ঋণ নিয়ে গৃহিণী সংসার চালানোর চেষ্টা করেন। এতে সাময়িক স্বস্তি মিললেও সংসারে স্থায়ী শান্তি আসে না। তাছাড়া ঋণ-গ্রহণ করা সহজ, তারপর তার হ্যাপা অনেক। ঋণের যে মর্মান্তিক বেদনা তা সকলে বুঝতে পারে না—

গর্ভে ঋণে বিষয়ে কুক্কুর-রতি-রসে।
প্রবেশে পরম সুখ প্রাণ যায় শেষে॥

পুরুষ ঋণ-গ্রহণ করলে নানা অছিলায় এড়িয়ে যেতে পারেন কিন্তু নারী ঋণ-গ্রহণ করলে তার বিপদ অনেক—

মেয়্যার করজ করা মরণ অধিক॥
মর্দ যায় গোঠে মাঠে মেয়্যা থাকে ঘরে।
ভাড়াবার ভিত যাই নিত্য দায় ধরে॥

গৌরী তাই শিবকে বহু আবেদন নিবেদন করেন, বোঝান তিনি ভিক্ষাবৃত্তি ছেড়ে যেন কৃষিকাজ করেন। কৃষিতেই তাঁদের সংসারের সুরাহা মিলবে—

চরণে ধরিয়া চণ্ডী চন্দ্রচূড়ে সাধে।
নরমে গরমে কয় ভয় নাঞি বাধে।।
চষ ত্রিলোচন চাষ চষ ত্রিলোচন।

নহে উদাসীন হও ছাড় পরিজন॥

গৌরীর আবেদন-নিবেদন ও পরামর্শ শিবের মনে ধরলো। তিনি কৃষিকাজকে জীবনের বৃত্তিরূপে গ্রহণ করবেন বলে স্থির করলেন। কিন্তু কাজে নামতে গিয়ে দেখা গেল সমস্যা অনেক। প্রথম সমস্যা কৃষিভূমির। গৌরী সেই সমস্যা সমাধানে এগিয়ে এলেন। তিনি জানালেন, দেবসমাজে দেবরাজ ইন্দ্র সমস্ত ভূমির অধিকারী, তিনি ভূস্বামী। তাঁর নিকট ভূমি প্রার্থনা করলে তিনি নিশ্চয়ই কিছুটা ভূমি শিবকে ব্রহ্মোত্তর হিসেবে দেবেন। ব্রাহ্মণকে ইন্দ্র ফেরান না। গৌরীর এই পরামর্শ পেয়ে শিব দেবরাজ ইন্দ্রের কাছে উপস্থিত হয়ে তাঁকে মনের কথা জানালেন। ইন্দ্র শিবের যাঞ্চায় হর্ষ প্রকাশ করে বললেন—"যত পার জোত কর কাজ নাই কর্‌য়া।" কিন্তু শিব জমিদার ইন্দ্রের স্বভাব সম্বন্ধে সচেতন। ভূস্বামীগণ প্রথমে মিষ্ট কথা বলেন, পরে তা সময় সুযোগ বুঝে কটূ হয়ে যায়। তিনি অকপটে তাই ইন্দ্রকে জানিয়ে দিলেন শুধু মুখের কথায় তিনি জমি দখল করবেন না—

শিব বলে শত্রু কিছু চক্র বক্র আছে।
খন্দ হলে ক্ষেতে তুমি দ্বন্দ্ব কর পাছে॥
বিষয়ীর বচনে বিশ্বাস বিধি নয়।
পাটাটুকি পাল্যে পরিণাম শুদ্ধ হয়॥

ইন্দ্র তখন শিবকে বললেন, তাহলে শিবই বলুন তিনি কোন জমির কতটুকু অংশ লেখাপড়া করে নিতে চান—

হয় বাক্যে হরিহর হাস্যা কয় তবে।
আজ্ঞা কর কোনখানে কত ভূমি লবে॥

শিব ইন্দ্রের কথামতো উদ্দিষ্ট ভূমি চিহ্নিত করে দিলেন—

মাগে হর একান্তর কোচ পাশে পড়া।
দেববৃত্তি গোবৃত্তি বিপ্রের বৃত্তি ছাড়া॥

ইন্দ্র তখন পাট্টা-কবুলিয়ত তৈরি করে শিবকে ভূমিদান করলেন—

করে লয়্যা মসীপত্র কাশ্যপের বেটা।
দেব-দেবে লিখ্যা দিল দেবত্তর পাট্টা॥

শিব এর পরেও ইন্দ্রের জমিগ্রহণের ব্যাপারে সাবধানী। পোড় খাওয়া মানুষ শিব ভূস্বামীদের স্বভাব বিষয়ে সম্পূর্ণ ওয়াকিবহাল। অনুর্বর জমিতে বহু পরিশ্রম করে চাষযোগ্য ফসল ফলাবেন চাষি আর উৎপন্ন ফসলের উপর কর ধার্য্য করবেন ভূস্বামী। এই দেয় করের পরিমাণ প্রাকৃতিক দুর্যোগ, খামখেয়ালি আবহাওয়ায় ফসল নষ্ট হয়ে গেলে ভূস্বামী কমাবেন না। তাই অতিসাবধানী শিব ইন্দ্রকে ফসলের আগাম ক্ষতি বিষয়ে জানিয়ে দিয়ে নিজ অনুকূলে কিছু শর্ত পাট্টায় লিখিয়ে নিলেন—

বিশ্বনাথ বলে বাপু এই কালে কই।
দেখ আমি দুঃখী চাষী দ্রববান নই॥
অতিবৃষ্টি অনাবৃষ্টি হয়ে সাবধান।

অঙ্গীকার কৈল ইন্দ্র তবে নিল দান॥

কবি রামেশ্বর ভট্টাচার্য তাঁর 'শিবায়ন' কাব্যে ইন্দ্র ও শিবের জমি বণ্টনের এই চিত্রে সমকালীন বাংলাদেশের সামন্ততন্ত্র ও কৃষক সমাজের ভূমিসত্ত্বের ছবিকে সার্থকভাবে তুলে ধরেছেন। ব্রাহ্মণ তখন ভূস্বামীর কাছ থেকে নিষ্কর জমি পেতেন। কিন্তু লোভী ভূস্বামীগণ কখনও কখনও প্রদত্ত জমিতে যথাযোগ্য আবাদের কারণে বিস্তর ফসল ফললে কর ধার্য্য করে দিতেন। এতে দরিদ্র ব্রাহ্মণ যিনি প্রাণিপাত করে শ্রম দিয়ে খিল (পতিত) জমি লাল (আবাদি) জমিতে পরিণত করতেন, তাঁর শ্রম বিফলে যেতো। আর্থিক দিক থেকে লাভবান হতেন ভূস্বামী, ব্রাহ্মণ চাষি শুধু বেগার খাটতেন। সেজন্য তখন রায়তি পাট্টার প্রচলন ছিল। কৃষক শিব তাই ইন্দ্রের কাছে লিখিত পাট্টা নিয়েছেন। পাট্টায় ভূমির রকম (আবাদি না অনাবাদি), ভূমির পরিমাণ, অনাবৃষ্টি ও অতিবৃষ্টিতে শস্যহানি ঘটলে প্রজা কীরূপ কর মকুবের আওতায় আসবেন সেসব উল্লেখ করা থাকতো। এই পাট্টার বলেই কৃষক, জমিদারের কর্মচারীর অহেতুক উৎপীড়ন থেকে মুক্তি পেতেন। রামেশ্বর ভট্টাচার্যের শিব পাট্টায় সে সব কথা উল্লেখ করে সমকালীন কৃষিজীবি মানুষের ভূস্বামী ও প্রজার মধ্যে ভূমি বণ্টনের চিত্রকে তুলে ধরেছেন। পঞ্চানন চক্রবর্তী লিখেছেন—

> শিব ঠকবার পাত্র নন। একেবারে পাকা কাগজ চাই, পাট্টা চাই। তা না হলে বিশ্বাস নাই। শিবের এই মনোভাব তো বাংলার দরিদ্র রায়তেরই মনোভাব।[৩]

ইন্দ্রের কাছ থেকে কৃষিজমি পাওয়া গেল, বাড়িতে বলদ আছে। লোহার শূল ভেঙে কোদাল, ফাল, দা, উখুন, পার্শী, মই তৈরি করতে হবে, শিব গৌরীর সঙ্গে পরামর্শ শুরু করলেন। এবার ডাক পড়ল কৃষিসরঞ্জাম নির্মাতা স্বর্গের কামিল্যা বিশ্বকর্মার। বিশ্বকর্মা হাফর পেতে লোহা পিটে শিবকে সব কৃষিসরঞ্জাম তৈরি করে দিলেন। শিব ও গৌরী পুরো নির্মাণ প্রক্রিয়া পর্যবেক্ষণ করে ছোটোখাটো ভুলত্রুটি সংশোধন করিয়ে নিয়ে বিশ্বকর্মাকে উপযুক্ত পারিশ্রমিক দিয়ে বিদায় দিলেন—

হরগৌরী হর্ষ হৈয়া বৈসে একাসনে।
বিলাই বুঝিয়া কার্য্য করে সামধানে॥
জোলুই-এ নেজনা থুড়্যা থুড়্যা রাখে আল।
ঈষ ধর্যা পাশি মার্যা পরাইল ফাল॥
বাঁই দিয়া কোদালে জুয়ালে দিয়া মলি।
পুরস্কার পায়্যা চলে লৈয়া পদধূলি॥

কৃষিজমি, কৃষিসরঞ্জাম পাওয়ার পর শুরু হল বীজধান সংগ্রহের তোড়জোড়। শিব গৌরীকে কুবেরের কাছে গিয়ে বীজধান সংগ্রহ করে আনার কথা বললেন। 'শিবায়ন' কাব্যে কুবের শস্যবীজ ব্যবসায়ী। তিনি দরিদ্র চাষিদের শস্যবীজ কর্জ অর্থাৎ ঋণ হিসেবে দেন। আবার ফসল উঠলে ঐ কৃষকদের কাছ থেকে উৎপন্ন ফসল সংগ্রহ করে নিজ গৃহে মড়াইয়ের মধ্যে ভবিষ্যতের জন্য সংরক্ষণ করে রাখেন। শিব সদ্য ভিক্ষাবৃত্তি থেকে কৃষিকাজ করবেন

মনস্থ করেছেন। তাঁর মনে একারণে কুবেরের কাছে ধার করার ব্যাপারে একটা দ্বিধা কাজ করেছিল। ধনী সুদ ব্যবসায়ী ভিখারি নিঃস্ব শিবকে বীজধান দিয়ে নাও সাহায্য করতে পারেন, কিন্তু রাজনন্দিনী গৌরীকে তিনি শূন্য হাতে ফেরাবেন না। শিব এই অনুমানের কারণে স্ত্রী গৌরীকে কুবেরের কাছ থেকে বীজধান কর্জ (ঋণ) আনতে বলেছিলেন। কিন্তু কুবেরের ব্যবহার ও প্রশ্রয়পূর্ণ কথায় শিবের দ্বিধা কেটে যায়। তিনিই কুবেরের কাছে বীজধান ঋণ হিসেবে গ্রহণ করার কথা বলে ফেলেন। কুবের শিবকে প্রয়োজন মতো বীজধান সরবরাহ করেন।

সব শেষে শিব কৃষিক্ষেত্রে গমনের দিন স্থির করলেন। কৃষিক্ষেত্র শিবের গৃহ থেকে দূরবর্তী স্থান। প্রতিদিন পায়ে হেঁটে যাতায়াত করা সম্ভব নয়। ওখানে গিয়ে থাকতে হবে। কাঙ্খিত মুহূর্ত এগিয়ে আসছে, শিবের মন ক্রমশ ভারাক্রান্ত হতে শুরু করেছে। এমন সময় আকাশে মেঘের আনাগোনা শুরু হল। মাঘের বৃষ্টিতে মাটি রসসিক্ত হয়ে উঠল। এটাই চাষ করার উপযুক্ত সময় জেনে কবি লিখলেন—

মনে জান্যা মঘবান মহেশের লীলা।
মহীতলে মাঘশেষে মেঘরম দিলা॥

প্রবাদপ্রতিম পুরুষ খনাও চাষ বিষয়ে মন্তব্য করতে গিয়ে লেখেন—

যদি বর্ষে মাঘের শেষ
ধন্য রাজার পুণ্য দেশ।

শিবের সেকথা মনে পড়ে গেল। চাষের এই শুভক্ষণে শিব বুঝলেন, আর ঘরে বসে থাকা ঠিক হবে না। গৌরীর কাছে উপস্থিত হয়ে বিদায় প্রার্থনা করলেন। দু'জনের চোখের কোণে অশ্রু চিক চিক করতে লাগল। গদ্ গদ্ চিত্তে গৌরী বলে উঠলেন—

গদ গদ হয়্যা গৌরী গঙ্গাধরে বলে।
বসন ভিজিয়া গেল লোচনের জলে॥...
যত চাষ চষিব চাকরে দিবে চষ্যা।
ভার দিয়া ভীমকে ভবনে থাক বস্যা॥

গৌরীর নিকট শিবের চোখের জলের এই বিদায়দৃশ্য চিরকালীন বাঙালি কৃষক দম্পতির বিচ্ছেদ বেদনার রসে ভারাক্রান্ত হয়ে পাঠকচিত্তে ধরা পড়েছে। শিব ক্ষেত্রভূমিতে পৌঁছালেন। পুণ্যদিনে হলপ্রবাহ শুরু হল। দিনের সূচনায় শিব ক্ষেত্রকর্ষণ করলেন। দুপুরে মই দিয়ে জমিকে চৌরস করা হল। তারপর মই দিয়ে জমির উত্তর দিক উঁচু ও দক্ষিণ দিক নীচু করা হল। বিকেলে জমির আল বেঁধে জল আনার জন্য জমির নালা কাটা হল। তারপর রোজ সকালবেলা জমি চাষ করে দুপুরে মাটিকে রোদ লাগিয়ে বিকেলে মই দিয়ে সমান করে চাষের উপযোগী করে তোলার চেষ্টা হল। এতে শিবেরই শুধু নয় বলদগুলিরও পরিশ্রম বাড়ল। অল্পসময়ে অতিরিক্ত চাষ চষার কারণে বলদের ঘাড় হেলে (ফুলে) গেল। অভিজ্ঞ চাষা শিব বলদের শুশ্রূষায় লিপ্ত হলেন। শিব ধুতুরা ফল বেটে, তার রস দিয়ে বলদের ঘাড় মালিশ করে, ফল বাটার ক্বাথ গরম করে বলদের ঘাড়ে প্রলেপ দিলেন। কয়েকদিন

চাষ বন্ধ রাখলেন। এতে বলদের ঘাড়ও সারলো, মাটিতে জো (রস সংগৃহীত হওয়া) এল। শিব এবার মাটিতে বীজধান ছড়িয়ে দিয়ে হালকা করে মই দিয়ে দিলেন। বীজ থেকে অঙ্কুর বেরোল। যথারীতি বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ পেরিয়ে প্রথম আষাঢ়ের জল পেয়ে ধানগাছগুলি গা ঝাড়া দিয়ে উঠল। তবে বর্ষায় জমিতে নানা আগাছা, ঘাস, লতাপাতার জন্ম হল। কৃষক শিব নিড়ানি হাতে নিয়ে জমিতে নিড়ানি দিতে বসলেন—

আঁঠু পাড়্যা ঈশানেতে আরম্ভে নিড়ান।

বর্ষা যত বাড়ল ডাঁশ, মশা, জোঁক ইত্যাদির উৎপাত তত বাড়ল। অথচ চাষিকে এইসব বিষয় নিয়ে উৎগ্রীব হলে চলে না। এসব চাষেরই অঙ্গ বলে বিবেচনা করে চাষিদের এর থেকে পরিত্রাণের ব্যবস্থা করতে হয়। প্রায় সব চাষির মতো শিবও এইসব উপদ্রব থেকে পরিত্রাণের উপায় জানতেন। গায়ে তেল মাখলে উঙ্গানি পালিয়ে যায়, ঘি মাখলে মাছি গায়ে কামড় দিতে পারে না। মাছির কামড়ে গরুর ঘা বেশি হলে রসুন তেল গরম করে ঘায়ের উপর দিলে ঘা ভালো হয়। ধুঁয়োর কাছে মশা জব্দ। আর লবণ-চুনে জোঁক কাবু। রক্তবমি করে জোঁক পালিয়ে বাঁচে। রামেশ্বর ভট্টাচার্যের 'শিবায়ন' কাব্যে শিব এভাবে প্রকৃতির সঙ্গে লড়াই করে অভিজ্ঞ চাষির দায়িত্ব পালন করেছেন।

কবি তাঁর 'শিবায়ন' কাব্যে শিবকে দিয়ে চাষের খুঁটিনাটি বিষয়গুলিকে এভাবে পাঠকের কাছে নিপুণভাবে তুলে ধরেছেন। বর্ষা শেষ হয়ে গেলে ভাদ্র মাসের শুরু থেকে শিব জমির পরিচর্যা একটু অন্যভাবে শুরু করেন। ধানগাছের মূলটুকু যাতে জলে ভিজে থাকে তার জন্য জলের নালাগুলি খুলে দেন। ভাদ্র মাসে ক্ষেতে বেশি জল থাকলে আশানুরূপ শস্য হয় না, শস্যের নানারূপ ব্যাধি হয়। আশ্বিন ও কার্ত্তিক মাসে জমির পাশের নালায় জল কমে যায় বলে জমির জল যাতে সব বেড়িয়ে না যায় তার জন্য পা দিয়ে শিব নালামুখগুলি সব বন্ধ করে দিলেন। এর মধ্যে ডাকসংক্রান্তি এসে গেল। শিব চাষির সংস্কারবশত ক্ষেতে নল পুতে দিলেন—

যুক্তি করি জলকাট্যা জলরয়্যা যান।
অর্দ্ধভাদ্র-পদ মাসে রৌদ্র পাইল ধান।।
পিছু পরিপূর্ণ করি বান্ধিলেক জল।
ডুব্যা রয় খড় যত দেখ্যা যায় দল॥
আশ্বিন মাসেতে ভীম না করিল হেলা।
পদঘাতে যোগমার্য্যা যোগে দিল চেলা।।
ডাক-সংক্রমণ দিনে ক্ষেতে পুঁতে নল।
কার্ত্তিকের কত দিনে ক্যাটা দিল জল॥

আশ্বিনের শেষ দিনে জলবিষুব সংক্রান্তি তিথিকে কোথাও নল সংক্রান্তি, কোথাও ডাক সংক্রান্তি বলে। সংক্রান্তির পূর্বদিন সন্ধ্যায় একটি নলখাগড়া বা শরগাছ এবং লাল নটেগাছ ও একটি মানকচুর পাতায় আউস ধানের আতপ চাল, ডাঙ্গার ফল তালগজার, ওল, মানকচু, আদা, রাইসরষে, অশোকফুল বেঁধে স্নানের ঘাটে বড়ো চুপড়িতে করে জলে ডুবিয়ে রাখা

হয়। পরদিন সকালে স্নান করে চাষি ভিজে কাপড়ে পূর্বের দিনের উপকরণগুলি মাঠের মধ্যে নিয়ে গিয়ে প্রথমে নলখাগড়াটিকে জমির মধ্যে পুঁতে দিয়ে বাকি উপকরণগুলি তার পাশে রেখে ছড়া কেটে বলেন—

ওল কুট কুট মানো পাত
খাও লক্ষ্মী সাধ ভাত।

গ্রামবাংলার কৃষক সম্প্রদায় আজও এভাবে ডাক-সংক্রান্তি ব্রতসিব্রুয়া পালন করেন। তারপর হেমন্তের শেষে দরিদ্র বাঙালি কৃষকের উঠোন সারা বৎসরের পরিশ্রমের ফল সোনার ধানে পরিপূর্ণ হয়ে যায়। কৃষক পরিবার নতুন ধান্যোৎসব নবান্নর আনন্দে মাতোয়ারা হয়ে ওঠেন। বহু দুঃখকষ্টের পর সেদিন বাড়িতে প্রচুর খাওয়া-দাওয়া হয়। কৃষক পরিবারের সব সদস্যের মধ্যে যেন আনন্দের হিল্লোল বয়ে যায়। সেদিন গৃহিণী যেন হয়ে যান সাক্ষাৎ অন্নপূর্ণা। পতি-পুত্রকে ভালো খাওয়াতে পেরে গৃহিণীর মনে সেদিন অপরিসীম তৃপ্তি, পতি-পুত্রেরও অসীম আনন্দ। 'শিবায়ন' কাব্যে কবি সেসব ছবি অসাধারণ নৈপুণ্যে এঁকেছেন।

দেখ্যা দেখ্যা পদ্মাবতী বসি এক পাশে।
বদনে বসন দিয়া মন্দ মন্দ হাসে॥
সুক্তা খায়্যা ভোক্তা যদি হস্ত দিল শাকে।
অন্নপূর্ণা অন্ন আন রুদ্রমূর্তি ডাকে॥
কার্ত্তিক গণেশ ডাকে অন্ন আন মা।
হৈমবতী বলে বাছা ধৈর্য্য হয়্যা খা॥...
হাসিয়া অভয়া অন্ন বিতরণ করে।
ঈষদুষ্ণ সূপ দিল বেমারির পরে॥
লম্বোদর বলে শুন নগেন্দ্রের ঝি।
সূপ হল্য সাঙ্গ আন আর আছে কি॥
দড়বড় দেবী আন্যা দিল ভাজা দশ।
খাত্যে খাত্যে গিরিশ গৌরীর গান বল॥

কোনো রাজকীয় খাবার নয়, সুক্তো, কিছু ভাজা তরকারি ও শাক। এইসব সাধারণ খাবার খেয়েই দরিদ্র স্বামী-স্ত্রীর গুণগান শুরু করে দিলেন। দরিদ্র কৃষক পরিবারের এই অল্পেতেই তুষ্ট হওয়ার চিত্র, অপরিসীম আনন্দ উচ্ছ্বাস প্রকাশ কাব্যমধ্যে স্নিগ্ধ আনন্দময় উজ্জ্বল মধুর পরিবেশের সৃষ্টি করেছে। স্বামীর কঠোর কায়িক শ্রমে দরিদ্র সংসারে একটু সুখের আলোকরেখা ফুটে উঠেছে, গৃহিণী এই সুখের দিনে স্বামীর কাছে কোনো সোনা-রূপোর গহনা নয়, একজোড়া ('কুলুপী দুবাই শঙ্খ শ্রীরাম লক্ষ্মণ') শাঁখা চেয়ে বসলেন। আর যায় কোথায়, কর্তা তো তেলেবেগুনে জ্বলে আগুন—

ভিখারীর ভার্য্যা হয়্যা ভূষণের সাধ।
কেন অকিঞ্চন মনে কর বিবাদ॥
বাপ বটে বড়লোক বলুক গিয়া তারে।
জঞ্জাল ঘুচুক যাক জনকের ঘরে॥

গৃহিণী কর্তার এই তীব্র তিরস্কারে মেজাজ হারিয়ে ফেললেন। অপমানে, লজ্জায়, অশ্রুজলে দু'নয়ন ভাসিয়ে পুত্রদ্বয়কে দু'হাতে ধরে ক্রোধভরে পিতৃগৃহ অভিমুখে দ্রুত হাঁটা দিলেন। দরিদ্র কৃষিনির্ভর জীবনের প্রতিনিধি শিব স্ত্রীর এই চটজলদি সিদ্ধান্ত ও বিরূপ আচরণে ভ্যাবাচাকা হয়ে পড়লেন। অস্ফুট কণ্ঠে স্বগতোক্তি করলেন—"পাথারে ফেলিয়া গেল পর্বতের ঝি।" শিব এতদিন গৌরীকে সঙ্গে নিয়ে দারিদ্র্যের সঙ্গে লড়াই করে সবে সুখের মুখ দেখতে পেয়েছেন। আজ গৌরীই তাঁর কাছ ছাড়া। শক্তিদেবীর এই বিচ্ছেদ তাঁকে শক্তিহীন করে যে আকুল পাথারে ফেলবে তা বলাই বাহুল্য। বিমূঢ় শিব গৌরীকে ফেরানোর জন্য পেছন পেছন ছুটতে লাগলেন। বহু অনুনয়-বিনয় করলেন; কিছুতেই কিছু হল না। শেষে পথের মধ্যে আড় হয়ে মাটিতে শুয়ে গৌরীর পথ আটকানোর চেস্টা করলেন—

গোড়াইল গিরিশ গৌরীর পাছুপাছু।
শিব ডাকে শশিমুখি শুনে নাঞি কিছু।।...
ধায়্যা গিয়া ধুর্জ্জটি ধরিলা দুটী হাথে।
আড় হয়্যা পশুপতি পড়িলেন পথে।।
যাও যাও যত ভাব যত গেল বল্যা।
ঠেলিয়া ঠাকুরে ঠাকুরানী গেল চল্যা।।

শিব-গৌরীর এই মান-অভিমানের চিত্র কৃষক পরিবারের অন্দরমহলের বাস্তবচিত্রকে দ্যোতিত করেছে। ব্যর্থ বিমর্ষ শিব বাড়ি ফিরে আসার পথে প্রতিবেশী ভাগ্নে নারদের সামনে দিয়ে যাওয়ার সময় নারদ কুশল জিজ্ঞাসা করলে নির্বুদ্ধ শিব নারদকে সব কথা বলে দিলেন। নারদ পরবুদ্ধ শিবকে পরামর্শ দিলেন তিনি যেন শাঁখারির বেশে হিমালয়ে পৌঁছে গৌরীকে ছলনা করেন। শিব নারদের পরামর্শ গ্রহণ করে শাঁখা পরানোর ছলে শক্তিদেবীকে বুঝিয়ে তাঁর ক্রোধ জল করে দিলেন। শক্তিদেবী কৈলাসে ফিরে যেতে সম্মত হলেন। সম্মত না হয়ে বা কী অন্য উপায় আছে। বহুদিন পর পিতামাতা গৌরীকে কাছে পেয়ে উচ্ছ্বসিত হয়েছিলেন—

নগেন্দ্রনগরে মহোৎসব
অনেকদিনের পরে গৌরী আইল বাপঘরে
আকাশে উঠিল কলরব।

কিন্তু গৌরীর মা-বাবারও তো দারিদ্র্যের সংসার। তাঁরা মুখে কিছু না বললে তাঁদের কষ্টের কথা গৌরীর বুঝতে অসুবিধে হয় না। তাই মা মেনকা কন্যার সামনে শত উচ্ছ্বাস দেখালেও কন্যার বিদায়কালে জামাই শিবের কাছে বলে ফেলেন আসল কথা—

কুলীনের পোকে আর কি বলিব আমি।
বাছার অশেষ দোষ ক্ষমা কর তুমি।।
আঁঠু ঢাক্যা বস্ত্র দিয় পেট ভর্য়া ভাত।
প্রীত কর্য় যেমন জানকী রঘুনাথ।।

মেনকার এই কথায় সাধারণ দরিদ্র বাঙালি কন্যার জীবনের সারসত্য প্রকাশ পেয়েছে। দরিদ্র বিবাহিতা রমণীগণ স্বামীর কাছ থেকে কিছুই চান না, দু'বেলা দু'মুঠো অন্ন, পরনের কাপড় ব্যাস, এটুকুই চাহিদা, সঙ্গে স্বামীর ভালোবাসা। কিন্তু তাঁদের এই ন্যূনতম চাহিদা যখন সমাজ মেটাতে পারে না, তাঁরা ক্রুদ্ধ হয়ে বিসদৃশ আচরণ করেন। নতুবা সংসারের সব দুঃখকষ্ট মেনে নিয়ে সারাদিন হাড়ভাঙা পরিশ্রম করে নীরবে সকলের সেবা করে চলেন। 'শিবায়ন' কাব্যে কবি রামেশ্বর ভট্টাচার্য শিব, মেনকা, গৌরী ইত্যাদি চরিত্র এঁকে কৃষিনির্ভর চিরন্তন বাঙালি জীবনের এইসব সুখ-দুঃখের কথাকে আমাদের সামনে নিপুণভাবে হাজির করেছেন। 'লোকসাহিত্য' গ্রন্থের "গ্রাম্য সাহিত্য" প্রবন্ধে হরগৌরী বিষয়ক সংবাদ অংশে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের এই মূল্যায়ন—

> হরগৌরী কথা, ছোটোবড়ো সমস্ত বিঘ্নের উপর দাম্পত্যের বিজয়কাহিনী। হরগৌরী প্রসঙ্গে আমাদের একান্ন-পারিবারিক সমাজের মর্মরূপিনী রমনীর এক সজীব আদর্শ গঠিত হইয়াছে। স্বামী দীনদরিদ্র বৃদ্ধা বিরূপ যেমনই হউক, স্ত্রী রূপযৌবন-ভক্তিপ্রীতি- ক্ষমাধৈর্য-তেজগর্বে সমুজ্জ্বলা। স্ত্রীই দরিদ্রের ধন, ভিখারির অন্নপূর্ণা, রিক্ত গৃহের সম্মানলক্ষ্মী[৪]

এবং পঞ্চানন চক্রবর্তীর এই মূল্যায়ন—

> সমাজে গৃহস্থালির ইহা অপেক্ষা আর প্রকৃত চিত্র কি হইতে পারে? ইহাতে হয়ত ধার্মিক শ্রোতা কাব্যের খুঁৎ ধরিবেন এখানে দেবভাবের সাক্ষাৎ মিলে না, কিন্তু আমরা যে মানবভাব পাই, তাহা যে চাওয়ার অধিক। ইহাদের মধ্যে বাংলাদেশের গ্রাম্যকুটিরের প্রাত্যহিক দৈন্য ও ক্ষুদ্রতা সমস্তই প্রতিবিম্বিত।[৫]

এই প্রসঙ্গে আমাদের যথার্থ ও সার্থক বলে মনে হয়। 'শিবায়ন' কাব্য তাই কৃষিনির্ভর বাঙালির সুখ-দুঃখের কথা তথা আলো-আঁধারির বর্ণময় চিত্ররূপে দীপ্ত হয়ে উঠেছে।

<u>উৎসের সন্ধানে</u>

১. আশুতোষ ভট্টাচার্য : 'বাংলা মঙ্গলকাব্যের ইতিহাস', এ. মুখার্জী অ্যান্ড কোং প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, ২০০৯, পৃ. ১৪৪
২. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : 'লোকসাহিত্য', রবীন্দ্ররচনাবলী, ত্রয়োদশ খণ্ড (জ.শ), প.ব. সরকার, ১৩৬৮, পৃ. ৭১৯
৩. পঞ্চানন চক্রবর্তী : 'রামেশ্বর রচনাবলী', বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ, কলকাতা, ১৩৭১, ভূমিকা, পৃ. ১৮২
৪. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : 'লোকসাহিত্য', পৃ. ৭১৯

৫. পঞ্চানন চক্রবর্তী : 'রামেশ্বর রচনাবলী', পৃ. ১৯৬

শিবকথা : রামেশ্বর ও ভারতচন্দ্র

শ্যামাচরণ মণ্ডল

রামেশ্বর চক্রবর্তী (মৃত্যু ১৭৪৪) এবং ভারতচন্দ্র রায় (মৃত্যু ১৭৬০), দু'জনেই আঠারো শতকের কবি, এবং প্রবল শক্তিমান কবি। রামেশ্বর লিখেছেন পূর্ণাঙ্গ শিবকথা, আর ভারতচন্দ্রের অন্নদামঙ্গলের প্রথম খণ্ড প্রধানত শিবকথা। রামেশ্বরের কাব্যের মতোই ভারতচন্দ্রের কাব্যেও শিবকথা শুরু হচ্ছে দক্ষযজ্ঞ বর্ণনা দিয়ে। দক্ষযজ্ঞ বর্ণনায় মুকুন্দ চক্রবর্তী যে আদর্শ স্থাপন করেছিলেন, অনুজ কবিরা তাকেই ঘনিষ্টভাবে অনুসরণ করলেন। দক্ষের যজ্ঞের আগে ভৃগুর যজ্ঞ। সেই যজ্ঞস্থলে উপস্থিত অন্যান্য দেবতারা দক্ষরাজের সম্মানে উঠে দাঁড়ালেও শিব উঠে দাঁড়ান না, প্রণামও করেন না।[১] জামাই-এর কাছ থেকে এই অপমান মহামান্য দক্ষরাজ প্রত্যাশা করেন নি। ফলে তিনি যখন যজ্ঞ করেন তখন শিবকে নিমন্ত্রণ জানান না। এই পূর্বকথা রামেশ্বর বলেন নি, ভারতচন্দ্রও বলেন নি। ফলে তাঁদের দক্ষ হয়ে উঠেছেন ভিলেন।

রামেশ্বরে যেমন, তেমনি ভারতচন্দ্রেও দক্ষযজ্ঞ শুরু হচ্ছে দক্ষেরই যজ্ঞ দিয়ে। শিবকে অপমান করাই যেন এই যজ্ঞের একমাত্র উদ্দেশ্য। মুকুন্দ চক্রবর্তীর শিবনিন্দার ভাষ্যান্তর ভারতচন্দ্রের শিবনিন্দা। ভারতচন্দ্রের শিব-অনুচর নন্দী গুরুত্বহীন। দক্ষযজ্ঞ বিনাশকারী বীরভদ্র অনুপস্থিত। রামেশ্বরে সতীর সঙ্গেই কৈলাস থেকে এসেছে নন্দী। শিববিরোধী দক্ষকে শিব-মাহাত্ম্য কিছুটা বুঝিয়েছেন সতী। বাকিটা বোঝানোর দায়িত্ব দিয়েছেন নন্দীকে। নন্দী সেই সুযোগে লিঙ্গপূজার মাহাত্ম্য প্রচার করেছে। লিঙ্গ, শিশ্ন, যোনি ইত্যাদি শব্দ সতীর মুখে শোভনীয় হতো না। তাই নন্দীর মুখ দিয়ে কবি শোনালেন লিঙ্গপুরাণের আখ্যান।

আর এই সুযোগেই কবি আর একটি কাজ শুরু করলেন, তা হল শিব-বিষ্ণুর সমন্বয়। বহু ধর্মের দেশ ভারতবর্ষে ধর্মবিরোধ যেমন সত্য, তেমনি ধর্মসমন্বয়ের চেষ্টাও সত্য। শাক্ত শৈব-বিরোধেরই একটি কৌতুককর রূপ দেখি হর-গৌরীর কলহ অংশে। তবে এই বিরোধ ততটা তীব্র ছিল না, যতটা তীব্র ছিল শাক্ত-বৈষ্ণব এবং বৈষ্ণব-শৈবদের বিরোধ। নন্দীর বক্তৃতায় সমকালের এই বিরোধ-চিত্রই আঁকলেন রামেশ্বর। শিববিরোধী বৈষ্ণবদের সরাসরি বললেন—

গঙ্গাধরে নিন্দা করে গোবিন্দের দাস।
পরধর্ম কোথা তার পূর্বে ধর্মনাশ।।[২]

রামেশ্বর লিখেছেন শিবায়ম, শিবমাহাত্ম্যই তাঁর উপলক্ষ্য। শুধু গোবিন্দের দাসদের শিবনিন্দা করতে নিষেধ করলে মনে হতো কবি তাঁর উপলক্ষ্য দেবতার মাহাত্ম্যই প্রতিষ্ঠা করেছেন এবং সেটাই স্বাভাবিক। কিন্তু কবি হরি-হরের সঙ্গে শক্তিকেও মেশালেন—

হরি হর হৈমবতী তিন তনু এক।
ভজনার্থে মূর্তি কল্পনা অনেক।।

পরে উনিশ শতকে শুনবো একই কথা, অন্য ভাষায়—'যত মত, তত পথ'। ধর্ম বিষয়ে ভারতচন্দ্র দোলাচলচিত্ত। যখন তিনি বিশ্বাসী, তখন ধর্মসমন্বয়ে প্রয়াসী। আবার যখন তিনি অবিশ্বাসী তখন দেবতাদের নিয়ে ব্যঙ্গ-বিদ্রূপে মুখর। তাই ধর্মসমন্বয় করতে গিয়ে ভারতচন্দ্র আমাদের বৌদ্ধিক ও কাব্যিক ঐতিহ্যকে আঘাত করতে কুণ্ঠিত হন না। ব্যাসদেব তাঁর দৃষ্টান্ত। কিন্তু ধর্মসমন্বয়ের কথা বলতে গিয়ে রামেশ্বরকে কোনো দেবোপম চরিত্রে কালিমালেপন করতে হয় না। তাঁর শিব স্বয়ং গোবিন্দের নাম-গান গেয়ে ভিক্ষা করে, কোচ নগরে প্রবেশ করার সময় 'আনন্দে গোবিন্দগুণ গান পঞ্চানন।' 'হরিনাম পালা'য় পুরাণকথাকে সামনে রেখেই হরিনাম-মাহাত্ম্য ও রামনাম-মাহাত্ম্য তুলে ধরেন। তাঁর শিব কৃষ্ণের স্তুতিতে পঞ্চমুখ—

তুমি ব্রহ্ম পরজ্যোতি বাঙ্‌মনো নিগূঢ় অতি
স্থূল সূক্ষ্ম চরাচর সব।'
আবার বিষ্ণুও শিবের প্রশংসা করেন
আত্মা তুমি আমার আরাধ্য সভাকার।
তোমার তুলনা তুমি তুল্য নাঞি আর॥

আসলে কবি বিশ্বাস করেন পরমব্রহ্ম একজনই, আর

নিজ ইচ্ছা অভিলাষে সৃজন পালন নাশে
তিন মূর্তি হইলা আপনে।

শিবায়নে কামদেব-ভস্মের ঘটনা ঘটেছে শিব-পার্বতীর সাক্ষাতের পর। পার্বতীকে দেখে তৃপ্ত শিব চলে গেলেন তপস্যায়। পার্বতী তাঁর পরিচর্যায় রত। তারকাসুরকে বধের প্রয়োজনে শিবের ধ্যানভঙ্গ করতে হবে। পুরাণকথার অনুসরণ করলেন কবি। কিন্তু মদনকে শিবের সামনে আনলেন, ভস্ম করলেন মাত্র চারটি পংক্তিতে। রতিবিলাপের জন্য রাখলেন একটা পুরো পরিচ্ছেদ। রতির বিলাপ নিয়ে ভারতচন্দ্রের তেমন মাথাব্যথা নেই। তিনি প্রায় হুবহু কবিকঙ্কণকে অনুসরণ করলেন। দু'-একটি জায়গায় অলংকারে ভারতচন্দ্রত্ব দেখাতে গেলেন। শোককাতর রতির মুখে বসালেন এমন সংলাপ—

আহা আহা হরি হরি উহু উহু মরি মরি
হায় হায় গোঁসাই গোঁসাই॥[৩]

আসলে কবি কামভস্মের ঘটনাটাই জমিয়ে বলতে চান। তাঁর কাব্য ভোগের কাব্য, উপভোগেরও। তাঁকে পথ দেখাচ্ছেন আর এক সভাকবি, কালিদাস এবং তাঁর 'কুমারসম্ভব কাব্য'। কুমারসম্ভব থেকে নিলেন অকালবসন্ত, অনুবাদ নয়। 'জগতে লাগিল ধন্দ'— তারক অসুরকে প্রয়োজন নেই, কিন্তু এই ধন্দটা ভারতচন্দ্রের প্রয়োজন। আর প্রয়োজন কাম। শিবকে কামোন্মত্ত করতেই এত আয়োজন। অথচ কবিকঙ্কণ সেকথা ভুলে গেলেন, সভ্য ভব্য ভদ্র কাব্যের লেখক রামেশ্বরও মনে রাখতে চাইলেন না। কিন্তু ভারতচন্দ্র কামোন্মত্ত শিবের করুণ ছবি আঁকলেন। 'শিবায়ন'-এ শিব আছে, কামও আছে, কিন্তু কামোন্মত্ততা

নেই। তাই বলে কি কাব্যটি আদিরস মুক্ত? তা নয়। নবরসের প্রধানরস আদিরস। বৈষ্ণবপদলালিত মধ্যযুগের বাঙালি কবিরা আদিরসকে মধুররসের আবরণে প্রকাশ করার কৌশল রপ্ত করেছিলেন, কিন্তু উপেক্ষা করেননি। রামেশ্বরও আদিরস-এর কথা লিখেছেন। তার জন্য নিয়ে এসেছেন ঊষা-অনিরুদ্ধর আখ্যান।

ঊষা-অনিরুদ্ধ চরিত্র দু'টি 'মনসামঙ্গল' কাব্যের অতি সুপরিচিত চরিত্র। বিজয় গুপ্তর 'মনসামঙ্গল'-এ অনিরুদ্ধ ও ঊষা, লখিন্দর ও বেহুলা রূপে জন্মগ্রহণ করে। কবি 'যমযুদ্ধ পালা'য়[৪] সেই আখ্যান বিস্তৃতভাবে বর্ণনা করেছেন। এখানে শুরু থেকেই স্বর্গবাসী ঊষা-অনিরুদ্ধ দম্পতি হিসেবেই চিহ্নিত এবং অবশ্যই প্রণয়-আখ্যানের নায়ক-নায়িকা নয়। কিন্তু সতের শতকের কবিরা এই দম্পতিকে মর্ত্যভূমিতে নামিয়ে আনলেন। কেতকাদাস ক্ষেমানন্দের কাব্যে আখ্যানটি পূর্ণাঙ্গরূপে পাওয়া গেল।[৫] ঊষা হ'ল নল রাজার অনূঢ়া কন্যা। আর কৃষ্ণের নাতি অনিরুদ্ধ। কুমারী রাজকন্যার বিবাহ-বহির্ভূত প্রেম, গর্ভসঞ্চার, কোটালের হাতে ধরা পড়া, প্রেমিকপ্রবরের বন্ধন-বিদ্যাসুন্দর আখ্যানের এই চেনা ছকটির আদিকল্প বাংলা ঊষা-অনিরুদ্ধের আখ্যান। এই আদিরসাত্মক কাহিনিটিকে রামেশ্বর তাঁর দেবকাহিনির মধ্যে গ্রহণ করলেন, আর ভারতচন্দ্র অনুরূপ কাহিনিই লিখলেন মানব-মানবীর দেহ-সংরাগের আখ্যান হিসেবে।

রামেশ্বর লিখেছেন দেব-আখ্যান। তাই তাঁর হীরা মালিনীকে প্রয়োজন হয়নি। যোগিনী যোগবলে যদুনন্দন কৃষ্ণের নাতিকে তুলে নিয়ে গেছে ঊষার শয়নাগারে। আর বিনা প্রশ্নে, বিনা সংশয়ে 'সে রমণী রমণে রহিলা যদু রায়।' ব্যাস, এটুকু জানিয়েই কবি থেমে যান। খবর হিসেবে শুধু জানিয়ে দেন—'গুপ্ত গৃহে সখী মাঝে রমে অবিচ্ছেদ।' ভারতচন্দ্র শুধু খবর শোনান না, বিহার-বিপরীত বিহারেরও বিস্তৃত বর্ণনা দেন। কৃষ্ণচন্দ্রের সভাসদ হিসেবে নবাবী আমলের যুদ্ধে যুদ্ধে বিক্ষত সময়কে খুব কাছ থেকে দেখেছেন ভারতচন্দ্র। মানসিংহের আখ্যানও তাঁর সময় থেকে খুব দূরবর্তী নয়। সময়কে তিনি সরাসরি আনছেন মানসিংহ আখ্যানে। কিন্তু ঠিক ইতিহাস লিখছেন না। ইতিহাসে প্রায় গুরুত্বহীন ভবানন্দ মজুমদারকে তুলে আনছেন তাঁর এই ফরমায়েসি লেখায়। ঐতিহাসিক এক যুদ্ধ তাঁর বিষয়বস্তুতে সরাসরি এসে গেলেও তিনি এটাকে বাইরের ঘটনা হিসেবেই দেখতে চাইলেন। এমনকি প্রতাপের দিকেও বিশেষ নজর দিলেন না। ভবানন্দ মানসিংহের দিকের লোক। মানসিংহের হাতি-ঘোড়া লোক-লস্করের বর্ণনা দিলেন, প্রতাপেরও। কিন্তু যুদ্ধ জমলো না। যুদ্ধের শুরুতেই প্রতাপ বৈরাগ্যভাবে আক্রান্ত-'সংসার সব অনিত্য।' হাতি-ঘোড়া-পাইক-নৌবরহ-কামান-গোলা-আধুনিক যুদ্ধের এত আয়োজন থাকতেও কবি যুদ্ধকে বিস্তার দিলেন না। দুম করে বলে দিলেন-'বিমুখী অভয়াকে করিবে দয়া প্রতাপাদিত্য হারে।' ভারতচন্দ্র বরং অন্য ধরনের যুদ্ধবর্ণনায় বেশি আগ্রহী। এই যুদ্ধে একটাই পক্ষ। সেই পক্ষ প্রবল। অপ্রস্তুত 'দুর্বল'-এর ওপর প্রবলের অত্যাচার। এই প্রবল কখনো কালীরূপে, কখনো অন্নপূর্ণারূপে, কখনো ভূতনাথরূপে আবির্ভূত হয়ে সবকিছু লণ্ডভণ্ড করে দেয়। প্রতিরোধহীন এমন যুদ্ধ মধ্যযুগের বাঙালি বহু দেখেছে। বর্গি আক্রমণ টাটকা ঘটনা। এই

কারণেই দিল্লিতে অন্নপূর্ণার তাণ্ডব-বর্ণনায় ভারতচন্দ্র যতটা আগ্রহী, শিবের-তাণ্ডব বর্ণনায় যতটা কুশলী, প্রকৃত যুদ্ধ বর্ণনায় ততটা নয়। তাঁর যুদ্ধে বীররস পাওয়া কঠিন, বীভৎসরস অতি সুলভ।

অন্যদিকে যুদ্ধচিত্র বর্ণনায় অনেক বেশি কুশলী রামেশ্বর। আক্রমণ প্রতি আক্রমণে তিনি তাঁর যুদ্ধ সাজান। সতীর মৃত্যু দেখে ক্রুদ্ধ নন্দী প্রথম আক্রমণ করে। কিন্তু কবি ভোলেন না দক্ষরাজ আসলে প্রজাপতি। তিনি 'সৃষ্টিকারী মহামনা'। কাজেই প্রতি আক্রমণের জন্য অচিরেই তিনি সৈন্য সৃষ্টি করেন। কবি রামায়ণ, মহাভারত থেকে অস্ত্রসম্ভার নিয়ে সেই সৈন্যদের হাতে তুলে দেন। মহাকাব্যিক গাম্ভীর্য সৃষ্টি হয়—

অসুর নিশ্বাস ঝড়ে সকল পর্বত নড়ে
ডরে ক্ষিতি করে টলমল।
চৌদিকে অসুর গাজে বিজয় দুন্দুভি বাজে
উথলিল সমুদ্রের জল॥
বিনা মেঘে বজ্রাঘাত ঘন ঘন উল্কাপাত
ঝঞ্ঝাবাত রক্তবরিষণ।
তাহাতে নন্দীর কোপ ত্রিভুবন হয় লোপ
চতুর্দিকে শুনি ঝনঝন॥[৬]

মহাকাব্য তো নয়ই, কবি কোন বীররস-প্রধান কাব্যও লিখছেন না, তবু মহাকবির সাফল্য তাঁর আয়ত্ত, অন্তত যুদ্ধবর্ণনার ক্ষেত্রে। এই যুদ্ধে নন্দী হেরে যায়! তাই অবতীর্ণ হতে হয় শিবকে। শিবের জটা থেকে সৃষ্ট বীরভদ্র দক্ষযজ্ঞ নাশ করে। কিন্তু রীতিমতো প্রতিরোধ গড়ে তোলে দক্ষ সেনাদল— 'দুই দলে কাটাকাটি রক্তে নদী বয়'। তাণ্ডব নৃত্যের কথা রামেশ্বর বলেন নি, ভারতচন্দ্রও না।

ভারতচন্দ্র ভিখারি শিব এঁকেছেন, রামেশ্বরও তাই। বিজয় গুপ্ত হর-গৌরীর কোন্দলের

কথা বলেছেন, শিবের ভিক্ষার কথা বলেন নি। কেতকাদাসও না। শিবের ভিক্ষা মূলত কবিকঙ্কণ চণ্ডী থেকে বাংলার জনমানসে ঢুকেছে বলে অনুমান। ভারতচন্দ্রের ভিখারি শিব আর রামেশ্বরের ভিখারি শিবের পার্থক্য আছে। ভারতচন্দ্রের শিব মানুষের দয়ার ওপর পুরোপুরি নির্ভরশীল। কিন্তু রামেশ্বরের শিব অনেকখানি অধিকার সচেতন। ভিক্ষা পাওয়া যেন তাঁর অধিকার। তাঁর ভিক্ষা আসলে অনেকখানি তোলা আদায়। বস্তুত 'তোলা' শব্দটি রামেশ্বর নিজেই ব্যবহার করেছেন— 'মোদকের মন্দিরে মহেশ তুলে তোলা'। মর্ত্যভূমি যেন শিবের বসানো হাট। যতখুশি বিকিকিনি করো, মাঝে মাঝে শিবকে তোলা দাও। মাঝে মাঝে শিব দরাদরিও করবেন। দেখতে দেখতে তাঁর ঝুলি ভরে যাবে, তারপরও মরিচ, আফিম, হিং, গুয়া, হরিতকি, কর্পূর, চন্দন, সিঁদুর দরকার হয়। শিবঠাকুর এসবের পরিমাণটিও বলে দেন। আসলে ভারতচন্দ্রের শিব ভিক্ষা করতে এসেছেন যখন তাঁর ঘরে অন্ন নেই। মর্ত্যের অবস্থাও প্রতিকূল। স্বয়ং লক্ষ্মীও অন্নহীন। এই বাংলা তিন তিন বার বর্গি আক্রমণে বিধ্বস্ত বাংলা, 'ধান ফুরলো পান ফুরলো'র বাংলা। যারা নিজেরাই অন্নাভাবে কাতর, তারা ভিক্ষা দেবে কাকে? রামেশ্বরের শিব ক্ষুধাকাতর নয়। তখন মানুষের গোলাভরা ধান। ঘরে-বাইরে শস্যের স্বচ্ছলতা। সন্তানকে দুধেভাতে রাখার স্বপ্ন দেখতে হয় না, কেননা সেটাই বাস্তব।

দুই কবির শিবই আসলে শিবের সাজ-পোশাক পরা বহুরূপী। যে শিবকে রামেশ্বর পথে-ঘাটে দেখেছেন, কাব্যে সেই শিবকেই এঁকেছেন। রামেশ্বরই সাহস জুগিয়েছেন ভারতচন্দ্রকে। শিবকে নিয়ে রামেশ্বরের মর্ত্যবাসী রঙ্গ করেছে—

বেষ্ঠিত বালকবৃন্দ তরুণ তরুণী।
নাচ্যা গায়্যা ঘরে ঘরে ফিরে শূলপাণি॥
হরে হেরি হুলাহুলি হইলেক লোকে।
হরষিতে হরিধ্বনি সভাকার মুখে॥
করতালি দিয়া কেহ কৈল্যা সেত নই।
এক ভিক্ আন্যা কেহ তিনবার দেই॥[৭]

ভারতচন্দ্রের কাব্যে অন্নকাতর ত্রিভুবনবাসীর রঙ্গ করার মানসিকতা নেই। অন্যদিন ভালো লাগলেও 'ও দিন ওদন বিনা ভালো লাগে নাই।' তবু রঙ্গ ছাড়া ভারতচন্দ্রের চলে না। তিনি দেখালেন বড়োরা রঙ্গ না করলেও বালকবৃন্দ থেমে থাকলো না। 'শিব এল বলে ধায় যত রঙ্গাচিঙ্গা।' রামেশ্বরের কাব্যে শিব নিজেই ডমরু, শিঙা, গাল বাজিয়ে নাচগান করে লোকজনকে আকৃষ্ট করেছেন। আর ভারতচন্দ্রের ক্ষুধার্ত শিবকে 'রঙ্গাচিঙ্গা'র

দল ঐ কাজগুলিই করে দেখাতে বলেছে। 'ছাই মাটি কেহ গায় দেয় ফেলাইয়া'-এটা অবশ্য ভারতচন্দ্রের সংযোজন। ভিখারি শিব রামেশ্বরের কাব্যে যতটা সাধারণ মানুষের নিকটজন হয়ে উঠতে পেরেছেন, ভারতচন্দ্রের কাব্যে ততখানি নয়। অন্নহীন মানুষের অপরকে আত্মীয়জ্ঞানে কাছে টেনে নেওয়ার মানসিকতা না থাকাটাই স্বাভাবিক। অন্যদিকে রামেশ্বরের শিবকে ঘিরে ধরে তাঁরই সঙ্গো নাচে ছেলে-ছোকরার দল। কেউ কেউ তাঁকে বাড়িতে ডেকে নিয়ে যায়, কেউ পরের দিন আবার আসার আমন্ত্রণ জানায়, 'রহ রহ বলে কেহ কিরা দিয়া ডাকে।' কেউ আবার স্বামীকে সবল করার ওষুধ চেয়ে নেয়। সত্যিকারের বাংলা বেদিয়া। এ কথা ভাবার যথেষ্ট কারণ নেই যে ভারতচন্দ্র রামেশ্বরের কাব্য থেকে অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন। আবার প্রায় পঞ্চাশ বছর আগে লেখা অত্যন্ত জনপ্রিয় 'শিবায়ন' কাব্যটি ভারতচন্দ্র পড়েননি বা শোনেননি, এমনটিও বলা যায় না। আবার এটাও ঠিক যে উভয় কবিই প্রাচীন কাব্য-শাস্ত্রে সুপণ্ডিত। যেখানে তাঁরা কালিদাস-কবিকঙ্কণের মতো কবিদের অনুসরণ করেছেন, সেখানে উভয় কবির বর্ণনায় মিল দেখা গেছে অনিবার্যভাবে।

উৎসের সন্ধানে

১. সুকুমার সেন সম্পাদিত : 'কবিকঙ্কণ মুকুন্দ বিরচিত চণ্ডীমঙ্গাল', সাহিত্য অকাদেমি, ২০১৩, পৃ. ৮-৯
২. পঞ্চানন চক্রবর্তী সম্পাদিত : 'রামেশ্বর রচনাবলী', বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, ২০১৩, পৃ.
৩. ক্ষেত্র গুপ্ত বিষ্ণু বসু সম্পাদিত : 'ভারতচন্দ্র রচনাসমগ্র', ভৌমিক এণ্ড সন্স, ১৯৭৪, পৃ. ৪৬
৪. বিজয় গুপ্ত তারাপ্রসন্ন ঘোষ প্রকাশিত : 'পদ্মাপুরাণ', প্রকাশন সংস্থা অজ্ঞাত, তৃতীয় সংস্করণ, পৃ. ১০৫-১১১
৫. সনৎ কুমার নস্কর সম্পাদিত : 'কেতকাদাস ক্ষেমানন্দের মনসামঙ্গাল', প্রজ্ঞা বিকাশ, ২০১১, পৃ. ১৫৭-১৮৩
৬. রামেশ্বর রচনাবলী, পৃ. ৩৬৯
৭. রামেশ্বর রচনাবলী, পৃ. ৩৯৫

রামেশ্বরের শিবায়নে শঙ্খশিল্প প্রসঙ্গ

সৌগত চট্টোপাধ্যায়

ভারতীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতিতে শঙ্খের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা। দেবী-ভাগবত, ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণ, নন্দীকেশ্বরপুরাণ, মার্কণ্ডেয় চণ্ডী, রামায়ণ, মহাভারত প্রভৃতি বিভিন্ন প্রাচীন পুরাণ ও সাহিত্যে শঙ্খ ও শঙ্খধ্বনির তাৎপর্য অসীম। √শম্ + খ-যোগ করে হয়েছে 'শঙ্খ'। শঙ্খের দ্বারা অশুভ নাশ হয়। পুরাণে শঙ্খ ঘোষণার দ্বারা বিজয় ঘোষিত হয়েছে। এই শাঁখ এবং শঙ্খজাত দ্রব্য যাঁরা তৈরি করেন তারা 'শঙ্খবণিক' নামে খ্যাত। এই শঙ্খকার বা শাঁখারিরা দাক্ষিণাত্যে 'পারওয়া' নামে পরিচিত। কথিত হয়, বিশ্বকর্মা ও স্বর্গীয় অপ্সরা ঘৃতাচীর গর্ভে নয়টি সন্তান জন্মগ্রহণ করেন, যাঁরা নয়টি 'লোকসম্প্রদায়' (মালাকার, কুম্ভকার, চিত্রকর, কর্মকার ইত্যাদি) সৃষ্টির কারণ, এই শাঁখারি বা 'শঙ্খবণিক' সম্প্রদায় তার অন্যতম।

ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণের নজির থেকে জানা যায়, খ্রিস্টিয় ত্রয়োদশ শতক থেকেই শাঁখারিরা ভারতবর্ষে শ্রেণিবদ্ধভাবে বসবাস করে আসছেন। তা বলে শঙ্খশিল্পের ঐতিহ্য যে আরও সুপ্রাচীন তা বলার অপেক্ষা রাখে না। জেম্‌স হরনেল ১৯১২ খ্রিস্টাব্দে লেখা তাঁর একটি প্রবন্ধে[১] উল্লেখ করেছিলেন, 'তামিল অঞ্চলে খ্রিস্টিয় প্রথম শতাব্দী থেকেই এই শিল্প বিদ্যমান ছিল'। এছাড়াও বিভিন্ন পৌরাণিক কাহিনি যদি আমরা লক্ষ করি তাহলে এই শিল্প যে আরও প্রাচীন তা নিঃসংশয়ে প্রমাণ করা যায়।[২] তবু এ-কথা ঠিকই, শঙ্খের কারবারটা প্রধানত দাক্ষিণাত্যেই ছিল। ক্রমশ তা ছড়িয়ে পড়ে ঢাকায়। তা বলে ঢাকায় এই শিল্পের প্রসার যে চতুর্দশ শতাব্দী থেকে সূচিত হয়েছিল বলে কেউ কেউ[৩] অনুমান করেছেন, তা নস্যাৎ করে দিয়ে প্রয়াত দীনেশচন্দ্র সেন লিখেছেন—

> ঢাকায় এই শিল্প যে এত আধুনিক তাহা মনে হয় না। হাতের শাঁখা যে দূরদেশবাসী শিল্পীরা প্রস্তুত করিয়া দিত এমন মনে হয় না। প্রাচীন ছড়ায় শিবকে বাঙালি কবিরা শাঁখারী সাজাইয়া গৌরীর সহিত তাঁহার দাম্পত্যকলহেরও পরিকল্পনা করিয়াছেন।[৪]

এই পরিকল্পনারই একটি রূপায়ণ আমরা পাই রামেশ্বর চক্রবর্তীর 'শিবায়ন'-এ। রাঢ় অঞ্চলের লোকগীতিতেও এই শিবকথা বিশেষভাবে প্রচলিত ছিল।[৫] শিবের গৌরীকে শাঁখা পরানো নিয়ে এমন অনেক লোকশ্রুতির সন্ধান আমরা আজও গ্রামে গেলে শুনতে পাই। প্রয়াত গবেষক অমিয়কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় এবং গুরুসদয় দত্ত তাঁদের রচিত গ্রন্থেও এমন দু'টি জনশ্রুতি সংকলন করেছেন—

১. একদিন দেবসভায় আমন্ত্রিত শিবদুর্গা খুব সংকটে পড়লেন। ত্রিভুবনের সেরা অলংকারের হাট যেখানে বসবে সেখানে নিরাভরণা শিবজায়া যাবেন কীভাবে? বিব্রত শিব তখন স্মরণ করেন বিশ্বকর্মাকে। বিশ্বকর্মা বললেন, "বসুন্ধরার যাবতীয় রত্নরাজি তো ইতিপূর্বেই আহৃত হয়েছে, এবং সে-সব মণিময় আভরণে সজ্জিত হয়েই অন্যান্য দেবীরা দেবসভায় আসবেন, শুধু সিন্ধুতলের শঙ্খই এখনো অবশিষ্ট রয়েছে।" এরপর

তা থেকেই অপূর্ব অলংকার গড়িয়ে বিশ্বকর্মা উপহার দিলেন পার্বতীকে। এবং সেই আভরণের কাছে দেবসভার রাশি রাশি উজ্জ্বল মণিমাণিক্য সব ম্লান হয়ে গেল। সেই থেকে বিবাহিতা হিন্দু নারীর শ্রেষ্ঠ অলংকাররূপে পরিগণিত হল শ্বেত দু'গাছি শঙ্খবলয়।[৬]

২. পার্বতী একদিন একজোড়া শাঁখা পরার বাসনা প্রকাশ করলে চিরদরিদ্র শিব তাঁর অক্ষমতা জ্ঞাপন করেন। শোকে দুঃখে অভিমানিনী পার্বতী তখন আশ্রয় নেন পিতৃগৃহে। কিছুদিন থাকার পর সেখানে এক শাঁখারি শাঁখা বিক্রয় করতে এলে পার্বতী তার কাছে শাঁখা পরতে বসেন। কিন্তু পরবার সময় সব শাঁখাই এক এক করে ভেঙে যেতে থাকলে শাঁখারি বলেন "পতিভক্তির অভাব থাকলে এমনটি হয়।" ক্রুদ্ধা পার্বতী তখন এমন জ্বলন্ত দৃষ্টিতে শাঁখারির দিকে তাকান যে সামান্য শাঁখারি হলে তার ভস্মীভূত হয়ে যাওয়ার কথা। কিন্তু তা হল না দেখে বুদ্ধিমতী পার্বতীর বুঝতে বাকি রইল না যে ইনি আসলে ছদ্মবেশী শিবই। সেই থেকেই দাম্পত্যসুখবিধায়ক শাঁখার প্রচলন।[৭]

এইসব জনশ্রুতির সঙ্গো অল্প-বিস্তর মিল আছে রামেশ্বর চক্রবর্তীর 'শিবায়ন'-এ গ্রন্থিত 'গৌরীর শঙ্খপরিধান' পালার। তাহলে প্রশ্ন, জনশ্রুতিতে প্রচলিত কাহিনিকে আশ্রয় করেই কি রামেশ্বর তাঁর কাব্যে 'গৌরীর শঙ্খপরিধান পালা' সংকলন করেছেন, নাকি রামেশ্বরের 'শিবায়ন পালা'র কাহিনিসূত্রেই লোকসমাজে 'গৌরীর শঙ্খপরিধান' কেন্দ্রিক এতসব জনশ্রুতির আত্মপ্রকাশ?

আমাদের অনুমান, 'শিবায়ন' রচনার অনেক অনেক আগে থেকেই যখন হিন্দু নারীর কাছে 'শঙ্খপরিধান' একটি পবিত্র ব্যাপার বলে গণ্য হতো, 'চণ্ডীমঙ্গল'-এও যার উল্লেখ বিদ্যমান, তখন এমন অনুমান করা নিতান্ত অযৌক্তিক হবে না—

> প্রাচীনকালে ইহার যে ঘটা হইত, তাহাই অবলম্বন করিয়া রামেশ্বর তাঁর শিবায়নে শঙ্খপরিধান পালা লিখিয়াছেন।[৮]

এ-প্রসঙ্গো আরও উল্লেখ্য এই, 'শিব কর্তৃক গৌরীকে শাঁখা পরানো'র এই কাহিনিটি কিন্তু রামেশ্বর 'পৌরাণিক খণ্ডে' না রেখে কাব্যের 'লৌকিক খণ্ডেই' সংস্থাপন করেছেন। যদিও তার অর্থ এই নয় তা নিতান্ত 'লোকশ্রুতি', হতেও পারে তা কবির 'কল্পনা', কিন্তু আমরা মনে করি, 'শিবায়ন'-এর অনেক অনেক আগে থেকেই যখন হিন্দুনারীর কাছে 'শঙ্খপরিধান' তার সতীধর্মের আদর্শের সঙ্গো যুক্ত-জড়িত ছিল, তখন এর প্রচলনভিত্তিক গল্প-কাহিনিও নিশ্চয় লোকসমাজে প্রচলিত ছিল। প্রয়াত আচার্য সুকুমার সেনও তাই মনে করেছেন—

> রামেশ্বর তাঁহার রচনাকে চণ্ডীমঙ্গালের মতো 'অষ্টমঙ্গালা' (অর্থাৎ আটদিনের মঙ্গালগান) করিয়াছেন এবং সমসাময়িক 'চণ্ডীমঙ্গাল' পাঁচালীর মর্যাদা দিতে চেষ্টা করিয়াছেন। কৃষ্ণমঙ্গালের যৎকিঞ্চিৎ প্রভাবও অনুভূত হয় কয়েকটি পুরাণ কাহিনির অন্তর্ভুক্তিতে। বাগ্‌দিনীর পালা মনসামঙ্গাল হইতে নেওয়া বলিয়া মনে করি। শিবের চাষপালা ধর্মকথা হইতে গৃহীত। কিন্তু শঙ্খ-পরিধান পালা লোকপ্রচলিত গাথা।[৯]

অবশ্যই তাতে কবি নিজেরও কল্পনার রঙ চড়াতে পারেন সন্দেহ নেই। 'শিবায়ন'-এর নায়ক শিব। তাঁর পৌরাণিক মহিমা যাই থাক, রামেশ্বরের কৃতিত্ব এখানেই তিনি সেই দেবতাকে বাংলার হতদরিদ্র গ্রামীণ পরিবারের একজন করে তুলেছেন। দরিদ্র কৃষক পরিবারের প্রতিনিধি তিনি। তার আগে ছিলেন ভিক্ষুক। আর্থিক অনটনে পীড়িত হয়ে সাংসারিক উন্নতির আশায় তাঁর কৃষিকাজে মন দেওয়া। হালুয়া ভীমের সাহায্যে অতঃপর তাঁর কৃষিকাজ আরম্ভ হয়। শস্যক্ষেত্রে প্রচুর শস্যোৎপত্তিও হয়। কিন্তু কৃষিকর্ম নিয়ে ব্যস্ত শিব স্ত্রী-সন্তানদের ভুলে গেছেন ভেবে দেবী ব্যস্ত হয়ে ওঠেন এবং নারদের পরামর্শে উঙানি, মশা, মাছি, ডাঁশ প্রভৃতি পাঠিয়ে শিবকে উত্যক্ত করতে থাকেন। পরে এলো ক্ষেতের মাঝে ছিনে জোঁকের উপদ্রবও। কিন্তু একে একে সকল বাধাই শিব অতিক্রম করছেন দেখে দেবী স্বয়ং বাগ্‌দিনী রূপে ক্ষেত্রে উপস্থিত হয়ে শিবকে মোহিত করেন। শিব তখন তার কথায় জল সেচে মাছ পর্যন্ত ধরেন। শেষে ছলনা করে শিবের অঙ্গুরী নিয়ে দেবী কৈলাসে চলে যান। তখন শিবের জ্ঞান হল কে এই মায়াবিনী? তিনিও তখন কৃতকর্মের জন্য অধোমুখ হয়ে কৈলাসে চললেন। কিন্তু গৃহে দেবী ঢুকতে না দিলে শেষে নারদের মধ্যস্থতায় দাম্পত্যকলহের উপশম হল বটে কিন্তু নতুন করে শুরু হল কলহ। নারদ দেবীকে তাঁর পূর্ব অপমানের প্রতিশোধ নিতে মন্ত্রণা দিয়ে শিবের কাছে তাঁকে শাঁখা চাইবার পরামর্শ দিলেন। আর এভাবেই ধীরে ধীরে 'শিবায়ন'-এ অনুপ্রবেশ ঘটলো শিব কর্তৃক গৌরীকে শাঁখা পরানোর একটার পর একটা বৃত্তান্ত। দরিদ্র কৃষক-রমণীর কাছে শঙ্খপরিধান যে একটা উৎসব বিশেষ, গৌরীর শঙ্খপরিধান-কেন্দ্রিক কাহিনিতে নিপুণ শিল্পীর মতোই তা কবি এসব বৃত্তান্তে বর্ণনা করে কাব্যের এই অংশটিকে মনোরম করে তুলেছেন। কিন্তু সেই প্রসঙ্গে যাওয়ার আগে বরং একবার দেখে নেওয়া যেতে পারে কে এই নারদ, কাব্যে তার প্রাসঙ্গিকতাই বা কোথায়?

স্মরণে রাখতে হবে—

> কাব্যে কৃষকের কথা যখন আছে, তখন ঢেঁকিরও প্রয়োজন। গ্রাম্য গৃহস্থের ঘরে ঢেঁকি অতি প্রয়োজনীয় উপকরণ। তাই ঢেঁকিবাহন নারদেরও প্রয়োজন। ইনি কোন্দলের গোঁসাই। ইনি এক একবার আসিয়া হাস্যরসকে উজ্জীবিত করিয়া দিতেছেন। তাই কবি রামেশ্বর তাঁহার কাব্যে কৌতুকপ্রিয় দেবর্ষি নারদকে উজ্জ্বল চিত্ররূপে আঁকিয়াছেন।[১০]

কাব্যের প্রথমে দক্ষের যজ্ঞনাশের মূলে তিনি, শিববিবাহের ঘটক তিনি, বিবাহবাসরে রঙ্গরসের অধিকর্তা তিনি, শিব-পার্বতীর সকল কলহের মূল তিনি, আবার কলহের পর শান্তি স্থাপনেও তিনি। শিব কর্তৃক গৌরীকে শাঁখা পরানোর কাহিনিতেও শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত তাঁর উল্লেখযোগ্য ভূমিকা। 'শিবায়ন'-এ শিবের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক মামা-ভাগ্নের। তিনি শিবের ভাগিনেয় কীভাবে হলেন তা সংস্কৃত পুরাণে পাওয়া না গেলেও বাংলা সাহিত্যের 'ধর্মপুরাণ' ইত্যাদিতে তার সন্ধান মেলে। তো তিনিই মামীকে শিবের কাছে শাঁখা চাইবার পরামর্শ দিয়ে বললেন—

ব্রহ্মার ব্রহ্মাণী শঙ্খ পর‍্যা বিলক্ষণ।

বিমোহিনী ব্রহ্মার বান্ধিয়া রাখে মন॥
সর্ব্বাঙ্গে সুন্দরী সর্ব্বঅলংকার পরে।
শঙ্খ বিনে সে সকল শোভা নাঞি করে॥
শঙ্খ পর্‍্যা সভাই স্বামীকে করে বশ।
ভূভঙ্গে ভুবন ভুলায়ে চতুর্দ্দশ॥
শঙ্খ পর্‍্যা সকল সংসার করে আলো।
স্বামীর সুভাগা হয় সভাকার ভাল॥
শঙ্খ পর্‍্যা সভাই স্বামীর হয় ভাল।
অনঙ্গে অঙ্গনা সে আধার ঘরে আলো॥
তুমি মামী শঙ্খ পর হর হরচিত্ত।
নিকটে নিকটে নাথ থাকিবেন নিত্য॥
প্রাণাধিক প্রভুর হইবে প্রিয়তমা।
তোমাকে ত্যেজিবে নাঞি ত্রিলোচন মামা॥
যদি শঙ্খ পর তুমি যে রূপ গুণ্যা মায়্যা।
তিন চক্ষে ত্রিলোচন থাকিবেন চায়্যা॥[১১]

দেবী তখন শাঁখার এ-হেন মহিমা শ্রবণে উৎফুল্ল হয়ে শিবের কাছে ব্যক্ত করলেন তাঁর অভিলাষ। পতিব্রতা সতীর মতোই প্রভুর পদতলে তাঁর নিবেদন—

দুঃখিনীর হাথে শঙ্খ দেহ দুটি বাই।
কৃপা কর কান্ত আর কিছু নাঞি চাই॥[১২]

কিন্তু গৃহকর্তা জবাবে বলেন, তিনি ভিক্ষুক; নির্ধন, শঙ্খ ক্রয় করা তাঁর পক্ষে অসম্ভব। তার থেকে বরং গৌরী বাপের বাড়ি গিয়েই তার অভিলাষ পূর্ণ করুন—

ভিখারীর ভার্য্যা হৈয়া ভুষণের সাধ।
কেন অকিঞ্চন সনে কর বিসম্বাদ॥
বাপ বটে বড়লোক বল গিয়া তারে।
জঞ্জাল ঘুচুক যাহ জনকের ঘরে॥
সেইখানে শঙ্খ পর্‍্যা সুখ পাবে মনে।
জানিঞা জনকগৃহে যাও নাঞি কেনে॥[১৩]

ক্রুদ্ধ গৌরী তখন চললেন পিতৃগৃহে। শুরু হল দাম্পত্যকলহের আর একটি অধ্যায়—

দণ্ডবৎ হইয়া দেবের দুটি পায়।
কান্ত সনে ক্রোধ কর্‍্যা কাত্যায়নী যায়॥
কোলে কৈল কার্ত্তিক গমনে গজানন।
চঞ্চল চরণে হইল চণ্ডীর গমন॥
গোড়াইল গিরিশ গৌরীর পাছু পাছু।
শিব ডাকে শশিমুখী শুনে নাঞি কিছু॥[১৪]

শক্তিহীন শিব তখন চতুর্দিক অন্ধকার দেখেন। শত অনুনয়তেও যখন গৌরীকে ফেরানো হল না তখন শিবের মানসিক অবস্থা বোঝাতে গিয়ে কবি লেখেন—

চমৎকার চন্দ্রচূড় চারি পানে চায়।
নিবারিতে নারিয়া নারদ পাশে ধায়।।
রামেশ্বর বলে ঋষি আর দেখ কি।
পাথারে ফেলিয়া গেল পর্ব্বতের ঝি।।[১৫]

বাঙালি গৃহস্থালির এ-অপেক্ষা প্রকৃত চিত্র আর কি হতে পারে? যে বাঙালিগৃহে কর্তা-গিন্নির মিষ্টি-মধুর কলহ নেই, সেই গৃহ তো শ্মশান। সেই শ্মশান-গৃহ বাঙালির কোনোদিনই ছিল না। রবীন্দ্রনাথ সঠিকভাবেই দাম্পত্যের এই বিজয়কাহিনি বর্ণনা করতে গিয়ে লিখেছেন—

এ দেবাদিদেব মহেশ্বর এবং জগন্মাতা পার্ব্বতীর কৈলাস-জীবন নয়, এ যেন অতীত বাংলার কোন শিবদাস ভট্টাচার্য্য এবং তস্য ভার্য্যা পার্ব্বতী ঠাকুরাণীর জীবনকাহিনী।”[১৬]

শিবকে তখন বিপদ থেকে উদ্ধার করতে এগিয়ে এলেন নারদ। গৌরীকে ছলনা করতে তিনি শিবকে ব্যঘ্ররূপ ধারণ করতে পরামর্শ দিলেন—

তিঁহো হল্যা বাগ্‌দিনি তুমি হও বাঘা।
বড়বনে বাট আগুঁলিয়া দাও তুমি দাগা।।[১৭]

এইভাবে প্রথমে বাঘরূপে ছলনা, গমনপথে ঝড়বৃষ্টি, অনাথমণ্ডপে মাতাপুত্রের কথোপকথন, বৃদ্ধবেশী শিবের সঙ্গে গৌরীর সাক্ষাৎ, মায়ানদী উত্তরণ ইত্যাদির পর দেবী পিতৃগৃহে উপস্থিত হলেন। হিমালয়ে অনুষ্ঠিত হল শারদোৎসব। কিন্তু শিবের মনে সুখ নেই। শক্তিহীন শিব তখন শরণাপন্ন হলেন বিশ্বকর্মার। লোক- শ্রুতিতেও আমরা বিশ্বকর্মা কর্তৃক গৌরীর শাঁখা নির্মাণের কথা পাই। এও জানি শাঁখারি সমাজের একাংশ যেমন তাদের আদি পুরুষ বলে অগস্ত্যকে মানেন, তেমনি মানেন বিশ্বকর্মাকেও।[১৮] তো সেই বিশ্বকর্মার কাছে গিয়ে শিব বললেন—

বিশ্বকর্ম্মে বোলাইলে বিলম্ব হয় বাড়া।
তাবত কেমনে রব কাত্যায়নী ছাড়া।।
ঈশ্বরের ইচ্ছায় অশেষ সৃষ্টি হয়।
বিশ্বকর্মা বিনে তার কোন কর্ম্ম রয়॥
যোগেন্দ্র পুরুষ যোগপথে দিয়া দৃষ্টি।
দিব্য দুটি বাই শঙ্খ করিলেন সৃষ্টি।।[১৯]

শঙ্খ দেখে তুস্ট শিব এরপর মাধব-শাঁখারির ছদ্মবেশে চললেন শ্বশুরগৃহে। নারদ শিখিয়ে দিলেন মামী যেন চিনতে না পারে। পথে দেখা হল সহচরীর সঙ্গে। সেই শাঁখারিরূপী শিবকে নিয়ে উপস্থিত হলেন হিমালয়-গৃহে। বললেন—

আস্য আস্য শাঁখারী আমার সাথে যাবে।
পার্ব্বতী পরিলে শঙ্খ পুরস্কার পাবে॥

পরমেশ্বরের যদি পদধূলি পাবি।
তবে কত কালকে নেহাল হৈয়া যাবি॥
সহচরী বচনে শাঁখারী বলে কি।
তোরে বড় পার্ব্বতী সে পর্ব্বতের ঝি॥
ভাতার ভিখারী তার ভুঞ্জি ভাঙ্গা নাই।
দিব্য শঙ্খ দিতে বল দুঃখিনীর ঠাঞি॥[২০]

অতঃপর শঙ্খের নিমিত্ত নারীগণের আগ্রহ এবং মহামায়ার সঙ্গো শাঁখারির কথোপকথনও বর্ণিত হয়েছে। শাঁখারির আত্মপরিচয় জানতে চাইলে শাঁখারি বলেছে—

মাধব শাঁখারী নাম মধুপুরে ঘর।
সাধের সন্ততি দুই গুহ লম্বোদর॥
দুঃখের দেখিয়া দশা দোষ দিয়া মোরে।
গৌরী নামে গৃহিণী গিয়াছে বাপঘরে॥
এত কালে উপজিল এক জুড়ি শঙ্খ।
লক্ষ্মীকান্ত নিতে নারে নিব কোন রঙ্ক॥
মূল্য থাকে তবে সে মূল্যের নিরূপণ।
অমূল্য শঙ্খের মূল্য আত্মসমর্পণ॥[২১]

সঙ্গো সঙ্গো শুনিয়েছে তার অপূর্ব কারুকার্যমণ্ডিত শাঁখার মহিমার কথাও—

পরিলে আমার শঙ্খ পতি নাহি ছাড়ে।
ধনপুত্রবতী হয় পরমাই বাড়ে॥
ভুল্যা যায় ভুবন ভাবন হয় ভাল।
অনঙ্গা অঙ্গানা হয় আঁধার ঘর আল॥
জরা হন যুবতী যুবতী জন যে।
নিত্য নব-কিশোরী কান্তের কোলে সে॥
সৌভাগ্য সমান সকল কাল রয়।
পাথরে কাছার তবু ভাঙ্গিবার নয়॥
একবার শঙ্খ গিয়া সুন্দরীর ঠাঞি।
প্রবেশ করিলে পুনঃ নিঃসরিতে নাঞি॥
স্বামীর সৌভাগ্য হয় সদা রয় কোলে।
পরিহাসে ভালবাসে উঠে বৈস্যে বোলে॥
শঙ্খ হাতে থাকিলে সংসার করে ভয়।
রোগ শোক সর্ব্বথা সন্তাপ নাহি রয়॥[২২]

শঙ্খের মহিমা শুনে উৎফুল্ল পার্বতী তখন শঙ্খপরিধানের জন্য মাধব-শাঁখারির কাছে এলেন সজ্জিত বেশে। তাঁর পায়ে নূপুর, পদাঙ্গুলিতে পাশুলী, মুখে এলাচ সহযোগে তাম্বুল, অঙ্গো সুন্দর বস্ত্র। বিমোহিত শিব তখন পার্বতীকে পরাতে বসলেন শাঁখা। প্রথমে বাম

এবং তারপর দক্ষিণ হস্ত। বামহস্ত শাঁখা পরানোর বর্ণনায় রামেশ্বর লেখেন—

গঙ্গাজলে গিরিশ গৌরীর ধুয়্যা হাথ।
শঙ্খ নিল স্মরণ করিয়া জগন্নাথ॥
কতক কড়ের শঙ্খ করে দিতে তুল্যা।
ঝলকিল বদন মদন গেল ভুল্যা॥
চন্দ্রচূড় চঞ্চল চাহিয়া চান্দমুখ।
সমুদ্রে সম্বরে নাঞি শঙ্করের সুখ॥
ত্রিভাগ পরায়্যা ত্রিলোচন বপুহারা।
চণ্ডী পানে চায়্যা চিত্রপুতলীর পারা॥
সকল পরাইয়া শেষে উজাইতে বাই।
বিশ্ব বিমোহিত কৈল বিনোদিনী রাই॥[২৩]

দক্ষিণ হস্তে শাঁখা পরানোর বর্ণনায় পাই—

দক্ষিণ ভূজের ভূষা খসাইয়া রাখে।
যত্ন কর‍্যা জোখিয়া জোখার যোত্র দেখে॥
মাপ জোখ বুঝিয়া বলিল দৃঢ়তর।
দুটি গাছি শঙ্খ দুঃখ দিবেক বিস্তর॥
কহিলেন কাত্যায়নী কপর্দ্দীর কাছে।
অপকর্ম্ম করিলে অধর্ম্ম ভোগ আছে॥
দারুণ কর্ম্মের তরে দক্ষ হস্ত জড়।
বুঝিয়া করিবে কার্য বিচক্ষণ বট॥
ক্রমশঃ কড়ের শঙ্খ অকঠিন বল্যা।
দু দু গাছি গেল দুরু দুরু চল্যা॥
অনায়াসে অক্লেশে ত্রিভাগ হল্যা পার।
চিপ হল্যা চতুর্ভাগ চলে নাঞি আর॥
উরাতের উপরে উমার হস্ত রাখ্যা।
সহলে সললে মলে তৈল জলে মাক্ষা॥
একগাছি অনেক যতনে হল্য পার।
তিনগাছি আছে ত্রিভুবন অন্ধকার॥
দল্যা মল্যা টিপ টাপ কর‍্যা দণ্ড দুই।
একগাছি গেল আর দুটি গাছি বই॥
সেই দুটি গাছি শঙ্খ পরিবার কালে।
ভাসিলেন ভগবতী লোচনের জলে॥[২৪]

দেবী শাঁখা পরলেন কিন্তু মূল্য দিতে চাইলেন না। শাঁখারি তখন ক্রুদ্ধ হয়ে বললেন—

দিবে বলি যৌবন যতনে নিলে শঙ্খ।
ইবে ধন দেখাও ধনের নাই রঙ্ক॥

দেবী তখন 'কালীমূর্তি' ধারণ করলেন। অবশেষে নারদ এসে দু'জনের মিলন ঘটালেন। হিমালয়ে আনন্দের হাট বসে গেল। এইভাবে কাব্যের লৌকিক খন্ডের সমাপণ। কবির বর্ণনায়—

তৃপ্ত হল্য ত্রিভুবন স্তুতি করে দেবগণ।
নারদ আইলা হেন কালে॥
হরিদাস হৈয়া নুতি করিল বিস্তর স্তুতি।
পূর্ব্বরূপ হল্যা দুই জনে॥
সে দিন শ্বশুরাগারে রহিলেন সপরিবারে।
শাশুড়ীর রন্ধনে ভোজনে॥[২৫]

শাঁখারি জাতি দীর্ঘকাল সমাজে অন্ত্যজ বলে স্বীকৃত ছিলেন। এখনও তাদের ঘরের মেয়েকে বধূ বলে স্বীকৃতি দিতে তথাকথিত উচ্চসমাজ কুণ্ঠিত হন।[২৬] কোনো কোনো সমালোচক তাই এমন প্রশ্ন তুলেছেন—

> চাষের মর্যাদা, চাষীদের মর্যাদা বাড়াইবার জন্য কি কবি শিবকে দিয়ে চাষ করাইয়াছেন? গোয়ালার মর্যাদা, রাখালের মর্যাদা যেমন বাড়াইয়াছেন শ্রীকৃষ্ণ, তেমনি শিব কি গৌরীকে শাঁখা পরাইয়া শিবায়নে শাঁখারি জাতির মর্যাদা বাড়াইলেন?[২৭]

আমরা বিশ্বাস করি, শিবকে চাষ করানো নতুন কোনো ব্যাপার নয়। পুরাণেও কৃষকরূপী শিবের দেখা মেলে, মেলে ভারতের বিভিন্ন প্রাদেশিক সাহিত্যেও।[২৮] কিন্তু রামেশ্বরের কৃতিত্ব তিনি তাঁর আপন মৌলিক প্রতিভার স্পর্শে তাকে সম্পূর্ণ নিজস্ব করে নিয়েছেন। লোকায়ত শিবের মূর্তি নির্মাণে যেমন তিনি লোকশ্রুতির দ্বারস্থ হয়েছেন তেমনি কবিত্বের রঙ-ও লাগিয়েছেন। যার কাব্যমূল্য এবং সামাজিকমূল্য দুই-ই অনন্য। এখানেই 'শিবায়ন'-এ 'ভিক্ষুক', 'কৃষক', 'জেলে' এবং 'শাঁখারি' শিবের প্রাসঙ্গিকতা।

তথ্যের সন্ধানে

১. James Hornell, 'The Chank Bengal Industry : its Antiquity and Present condition', Memories of the Asiatic Society Journal, Vol 3, Calcutta, 1912, P. 410

২. সৌগত চট্টোপাধ্যায় : 'অথ শঙ্খশিল্প কথা', প্রথম প্রকাশ, কলকাতা, পুস্তক বিপণি, ২৫ বৈশাখ, ১৪১০ বঙ্গাব্দ, পৃ. ১৫ দ্রষ্টব্য।

৩. দীনেশচন্দ্র সেন : 'বৃহৎবঙ্গ', ২য় খণ্ড, তৃতীয় সংস্করণ, কলকাতা, দে'জ, ১৯৮৫, পৃ. ৪১৮

৪. দীনেশচন্দ্র সেন : প্রাগুক্ত গ্রন্থ, পৃ. ৪২৪

৫. পঞ্চানন চক্রবর্তী (সম্পাদনা) : 'রামেশ্বর রচনাবলী', দ্বিতীয় সংস্করণ, কলকাতা, বঙ্গীয়

সাহিত্য পরিষৎ, ২০১৩, পৃ. ৫৬০-৫৭২ দ্রষ্টব্য।

৬. অমিয়কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় : 'বঙ্গালক্ষ্মীর ঝাঁপি', দ্বিতীয় সংস্করণ, কলকাতা, দে'জ ১৯৭৯, পৃ. ১০২

৭. গুরুসদয় দত্ত : 'পটুয়া সঙ্গীত', প্রথম প্রকাশ, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৩৯, পৃ. ২০২

৮. ঈষাণচন্দ্র বসু : 'শিবায়ন', প্রথম প্রকাশ, কলকাতা, বঙ্গাবাসী প্রেস, ১২৯৩ বঙ্গাব্দ, পৃ. ১৮

৯. সুকুমার সেন : 'বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস', ২য় খণ্ড, আনন্দ সংস্করণ, তৃতীয় মুদ্রণ, কলকাতা, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, ১৪০২ বঙ্গাব্দ, পৃ. ৩৭১

১০. পঞ্চানন চক্রবর্তী : প্রাগুক্ত গ্রন্থ, পৃ. ১১৫

১১. তদেব, পৃ. ৪৭৪-৪৭৫

১২. তদেব, পৃ. ৪৭৫

১৩. তদেব, পৃ. ৪৭৫

১৪. তদেব, পৃ. ৪৭৬

১৫. তদেব, পৃ. ৪৭৬

১৬. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : 'লোকসাহিত্য', বিশ্বভারতী সংস্করণ ১৩৮৯, পৃ. ৪৬

১৭. তদেব, পৃ. ৪৭৬

১৮. সৌগত চট্টোপাধ্যায় : প্রাগুপ্ত গ্রন্থ, পৃ. ১৭ দ্রষ্টব্য

১৯. পঞ্চানন চক্রবর্তী : প্রাগুপ্ত গ্রন্থ, পৃ. ৪৮৪

২০. তদেব, পৃ. ৪৮৬

২১. তদেব, পৃ. ৪৮৭

২২. তদেব, পৃ. ৪৮৮

২৩. তদেব, পৃ. ৪৯৩

২৪. তদেব, পৃ. ৪৯৪

২৫. তদেব, পৃ. ৪৯৭

২৬. সৌগত চট্টোপাধ্যায় : প্রাগুপ্ত গ্রন্থ, পৃ. ১৮

২৭. পঞ্চানন চক্রবর্তী : প্রাগুক্ত গ্রন্থ, পৃ. ১৯৬

শিবায়ন : চাষপালা

দীপঙ্কর মল্লিক

মধ্যযুগের সবথেকে বিস্তীর্ণ পট জুড়ে রয়েছে যে আখ্যানধর্মী মঙ্গালকাব্য সেই মঙ্গালকাব্যগুলির মধ্যে কোথাও না কোথাও শিব-পার্বতীর প্রসঙ্গা এসেছে। প্রায় প্রত্যেকটি লোকায়ত মঙ্গালকাব্যে শিব হয়ে উঠেছেন সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ চরিত্র। তাঁকে বাদ দিয়ে পার্বতী, মনসা, ধর্ম ঠাকুর—কেউ-ই সম্পূর্ণতা পাননি। তাঁকে বাদ দিয়ে কোনো যজ্ঞ সম্পন্ন হতে পারে না। এই শিবকে নিয়ে প্রথম পূর্ণাঙ্গা কাব্য লেখার একক কৃতিত্বের দাবিদার হলেন কবি রামেশ্বর ভট্টাচার্য। একক কৃতিত্ব বলছি এই কারণে যে, তিনিই একমাত্র 'শিবায়ন' কাব্যের পূর্ণাঙ্গা আখ্যান লিখেছেন। পঞ্চানন চক্রবর্তী এমন দাবি করেছেন যে, "কবি কঙ্কণের কথা স্মরণে রাখিয়াও বলিতে পারা যায় যে, কবি রামেশ্বর যেন আধুনিক যুগের গণ-সাহিত্যের অগ্রদূত।" ('রামেশ্বর রচনাবলী' গ্রন্থের নিবেদন অংশ) 'গণ-সাহিত্য' কথাটি শুনতে ভীষণ ভালো লাগে। আসলে রামেশ্বর প্রথম মেহনতি মানুষের কথা কাব্যের মধ্যে তুলে ধরেছেন। মধ্যযুগের মঙ্গাল কবিরা অভিজাত, প্রভূত ক্ষমতাসম্পন্ন দেবতার আখ্যান শুনিয়েছেন। কিন্তু রামেশ্বর দেবতার পরিবর্তে কৃষকের কথা শুনিয়েছেন। শিবকে আমি কোনো ভাবেই দেবতা বলতে চাইনা। কেননা, তিনি কর্মে-ঘর্মে একাত্ম থেকেছেন। দুমুঠো খাওয়ার জন্যে বাড়ি বাড়ি মাধুকরী বৃত্তি করেছেন। সুতরাং, শিবায়ন কব্যের শিব হলেন কৃষি দেবতা। এই কাব্যের যদি লোকায়ত পাঠ করা যায়, তাহলে দেখা যাবে ষষ্ঠ দিবসীয় নিশাপালা আরম্ভ শীর্ষক চাষ পালাটি সম্পূর্ণ লৌকিক।

প্রাক্-ঔপনিবেশিক যুগে আমাদের অর্থনীতির মূল শিকড় নিহিত ছিল কৃষির মধ্যে। ড. অতুল সুর লিখেছেন, 'বাঙলা নদীবহুল ও পলিমাটির দেশ বলেই বাঙলার অর্থনীতিতে কৃষির প্রাধান্য ছিল বেশি।'[১] বাংলাদেশ মূলত কৃষিনির্ভর। কৃষকেরাই প্রকৃতপক্ষে আমাদের ভুবন প্রতিপালক।[২] বাংলার সমতল ভূমি কৃষিকাজের উপযুক্ত। বাংলার মাটি উর্বরাশক্তিতে ভরপুর। প্রয়োজনের অতিরিক্ত কৃষিসম্পদ এই বঙ্গে উৎপাদিত হয়। যার ফলে প্রাক্-ঔপনিবেশিক সময় থেকে চাল, পাট, তুলা সিংহল ও মালদ্বীপে প্রচুর পরিমাণে রপ্তানি হতো। কৃষিতে বাংলার প্রাচুর্য সপ্তদশ শতকে বার্নিয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল।[৩] ড. নীহাররঞ্জন রায় 'বাঙালির ইতিহাস' অনুসন্ধানে 'ভূমিনির্ভর কৃষিজীবন' সম্পর্কিত আলোচনায় জানান—

> অষ্টম শতক হইতে... আদিপর্বের শেষ পর্যন্ত বাঙালি জীবন একান্তই ভূমি ও কৃষিনির্ভর। ...বাঙলাদেশের ঐকান্তিক কৃষি ও ভূমি-নির্ভরতা কখনও ঘুচে নাই।[৪]

বাঙালি জীবন মূলত পল্লিকেন্দ্রিক। বাঙালির সভ্যতা, সংস্কৃতির সামগ্রিক রূপায়ণ পল্লিসমাজকে কেন্দ্র করেই আবর্তিত। কৃষিজীবনকে আশ্রয় করেই পল্লিগ্রামের যা কিছু সমৃদ্ধি। পল্লি গোষ্ঠীচেতনাকে পুষ্টিদান করে। মধ্যযুগে বিশেষত অষ্টম শতাব্দীতে

পল্লিকেন্দ্রিকতা বৃদ্ধি পায় এবং পল্লির নিজস্ব আচার-প্রথা-বিশ্বাস-সংস্কার গোষ্ঠীজীবনে প্রতিষ্ঠা পায়।

পল্লি অঞ্চলে কৃষিজ দ্রব্যাদির মধ্যে ধান ছিল প্রধান। বস্তুত, শস্য বলতে ধানকে বোঝানো হতো। ধানের সঙ্গে উর্বরা ভূমি, পর্যাপ্ত বৃষ্টিপাত, রৌদ্র, উৎকৃষ্ট বীজ ও কৃষিজ যন্ত্রপাতির যোগসূত্র রয়েছে। ধান্যোপজীবীরা কৃষিদেবতা মহাদেবকে যুক্ত করে নিজেদের পাল্লা ভারি করে নিয়েছেন। লক্ষণীয় যে—

> এই ধান্য একান্তভাবে বারিনির্ভর; সেইজন্য অগণিত নদনদী খালবিল থাকা সত্ত্বেও এ দেশের ছড়ায়, গানে, পল্লীবচনে নানা লোকায়ত ব্রত ও পূজানুষ্ঠানে মেঘ ও আকাশের কাছে বারিপ্রার্থনার বিরাম নাই; অতীতে ছিল না, আজও নাই।[৫]

এভাবে ধানচাষের সঙ্গে লৌকিক দেবতা ও লোকসংস্কার, যাদু, লোককথা মিশ্রিত হয়েছে। গ্রামবাংলার মানুষ নিজেদের মতো করেই কৃষিসংক্রান্ত ধর্মীয় অনুষ্ঠানগুলি পালন করে থাকে। নগর সংস্কৃতির প্রভাব লোকায়ত বাংলার নিজস্ব ধর্মীয় ঐতিহ্যকে গ্রাস করতে পারে না। একালের বহুখ্যাত লোকসংস্কৃতিবিদের মনে হয়েছে—

> লোকসংস্কৃতি বা গ্রামীণসংস্কৃতি অংশত রক্ষণশীল। গ্রামবাসী অভ্যস্ত জীবনধারা সহজে ত্যাগ করে না। এখানকার জীবনের সহিতও বাইরের জগতের যোগাযোগ অল্প। কৃষি-নির্ভর স্বয়ংসম্পূর্ণ জীবনে তা আরও সীমিত।[৬]

মঙ্গলকাব্যের সর্বাধিক জনপ্রিয় দেবতা শিব মূলত লৌকিক দেবতা। তিনি প্রাগ্‌বৈদিক দেবতা। আবার কবিদের কল্পনায় তিনি কৃষিদেবতা। রামেশ্বর ভট্টাচার্যের 'শিবায়ন' কাব্যের শিবকে কৃষিদেবতারূপেই কল্পনা করেছেন বাঙালি কৃষকেরা। একথা অবশ্যই স্বীকার্য যে—

> কৃষি ও কৃষক ছাড়া বাঙালির কাছে গৌরবের বিষয় আর কিছুই ছিল না। সেজন্য কবিদের কাছে শিব ছিলেন কৃষক, আর কবিরা ছিলেন কৃষকের কবি।[৭]

শিবকে বাঙালি কৃষকেরা নিজেদের স্বভাব ও চিন্তা-চেতনার সঙ্গে একাত্ম করে নিয়েছেন। তাই শিব হয়ে উঠেছেন কৃষকের ঘরের পরিচিত দেবতা। বস্তুত, 'রামেশ্বরের শিব হচ্ছে বাঙালির নিজস্ব কল্পনা।'

তবে স্মরণীয় যে, রামেশ্বরের শিব আর্থিকভাবে দুর্বল। অনেকটা পিছিয়ে পড়া অন্ত্যজ শ্রেণির মানুষের মতোই বিত্তহীন। তিনি নিতান্তই নিঃস্ব বাঙালি ব্রাহ্মণ। তাঁর একমাত্র অবলম্বন ভিক্ষা। দিনের পর দিন ভিক্ষাই করে যান। কিন্তু উদ্‌বৃত্ত কিছু হয় না। তাঁর জীবন নিরানন্দেই কাটে। মাঝে-মধ্যে শরীর দেয় না। মন চায় না ভিক্ষা করতে। কিন্তু মুখরা গৃহিণী হাজারতর কথা শোনান।

প্রায় খুঁটিনাটি বিষয়ে শিব-পার্বতীর দ্বন্দ্ব হয়। শিবকে অলস, অকর্মণ্য বলে গালমন্দ করেন পার্বতী। শিবের পৌরুষত্বে আঘাত লাগে। তিনি কর্মহীন জীবন ত্যাগের কথা ভাবতে থাকেন। তিনি কর্মযোগী হওয়ার সিদ্ধান্ত নেন। ভিক্ষাবৃত্তির পরিবর্তে কৃষিভিত্তিক জীবনযাপনের পরিকল্পনা নেন। শিবায়নের ষষ্ঠদিবসীয় পালার প্রসঙ্গ হল কৃষিকাজ। কৃষিকর্মের জন্যে প্রয়োজন হয়—

১. চাষের জমি
২. চাষের সরঞ্জাম
৩. উৎকৃষ্ট বীজধান
৪. বিশ্বস্ত কর্মচারী

এই বিষয়গুলি কীভাবে রামেশ্বরের কাব্যে এসেছে তা দেখা যাক—

১॥ চাষের জমি

পার্বতীর অভিলাষ পূরণার্থে কৃষিকর্মের সঙ্গে যুক্ত হতে ইচ্ছুক শিব দেবতাদের রাজা ইন্দ্রের কাছে চাইলেন চাষ করবার জন্যে উর্বরা জমি। স্বামী-স্ত্রী, দুই পুত্র, অতিথি—এমনকি দাস-দাসীর ভরণ-পোষণের মতো চাষের জন্যেও চাষের অর্থ চাই। তাই ঠিকমত হিসেব করে শিব জমি চাইলেন। জমি নেওয়ার সময় অভিজ্ঞ কৃষকের মতো দুটি শর্তও আরোপ করলেন। শর্ত দুটি গুরুত্বপূর্ণ—

১. প্রথম শর্ত : লিখিত পাট্টা দিতে হবে। না হলে পরবর্তীতে রাজায়-প্রজায় বিবাদ হওয়ার সম্ভাবনা থাকতে পারে। শিবের বক্তব্য অত্যন্ত স্পষ্ট—

শিব বলে শক্র কিছু চক্র বক্র আছে।
ক্ষেতে খন্দ দেখ্যা তুমি দ্বন্দ্ব কর পাছে॥
বিষয়ীর বচনে বিশ্বাসী বিধি নয়।
পাটাটুকি হল্যা পর কাল শুদ্ধ হয়॥[৮]

২. অন্য শর্তটি : অতিবৃষ্টি কিংবা অনাবৃষ্টির মতো প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের সময় বিশেষ সুবিধা দিতে হবে। শিব বর্ষার ওপর নির্ভরশীল ধানচাষের সমস্যার কথা উল্লেখ করে কৃষকের বাস্তব অবস্থার পরিচয়টি দিয়েছেন। শিবের দ্বিতীয় শর্তটি প্রকৃতির করুণায় নির্ভরশীল কৃষকেরই বক্তব্য—

বিশ্বনাথ বলে বাপু এই কালে কই।
দেখ আমি দুঃখী চাষী জট জেট নাই॥
অতিবৃষ্টি অনাবৃষ্টি হবে সাবধান।
অঙ্গীকার কৈল ইন্দ্র তবে নিল দান॥[৯]

শিব পল্লিগ্রামস্থ প্রজাদের মধ্যে অপেক্ষাকৃত সংগতিসম্পন্ন কৃষকের মতো নন। তাঁর সাফ্ কথা : 'দেখ আমি দুঃখী চাষী।' 'দুঃখী চাষী' বলেই তাঁর কোনোরূপ 'জট জেট নাই।' সুতরাং সহজ, সরল জীবন-যাপন করতে চেয়েছেন মধ্যযুগের দরিদ্র চাষি শিব। "ইন্দ্রের নিকট শিবের চাষভূমি গ্রহণ" নামাঙ্কিত কাব্যাংশে দেখা যায় ইন্দ্র যেন গ্রাম বাংলার ভূস্বামী; আর শিব হলেন ভূমিহীন অতি সাধারণ কৃষক। কবি রামেশ্বর 'ভূমিস্বামী' কথাটি ব্যবহার করেছেন। স্বয়ং ইন্দ্র শিবকে উদ্দেশ্য করে বলেছেন, শিব তাঁর পছন্দ

মতো জমি চাইতে পারেন। দেবরাজ ইন্দ্র শিবকে জমি দান করলে শিব সেই জমি ফসলের লভ্যাংশের বিনিময়ে কিনে নেওয়ার অঙ্গীকার করেন। অর্থাৎ শিব এখানে গ্রাম বাংলার সহজ-সরল ও অত্যন্ত সৎ একজন কৃষক।

২॥ চাষের সরঞ্জাম

কৃষির জন্যে প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতির প্রয়োজন। "চাষের সজ্জার নিমিত্ত শূলভঙ্গের চেস্টা" নামাঙ্কিত কাব্যাংশে শিব পার্বতীর কথা মতো ত্রিশূল ভেঙে চাষের বিপুল জিনিসপত্র তৈরি করেছেন। চাষের সজ্জা প্রস্তুতকরণ নামাঙ্কিত কাব্যাংশে চাষের প্রস্তুতি দেখা যায়। শিব চাষের জন্যে কী কী জিনিসপত্র তৈরি করেছেন তার বর্ণনায় রামেশ্বর একটি দীর্ঘ তালিকা দিয়েছেন। যেমন—লাঙ্গল, জোয়াল, কোদাল, দা, উখুন, পাশী ইত্যাদি। এইসব যন্ত্রপাতি নির্মাণের জন্যে প্রযুক্তিবিদ্যায় সর্বাপেক্ষা অভিজ্ঞ ও বিশ্বস্ত দেবশিল্পী বিশ্বকর্মাকে ডাকালেন শিব। বিশ্বকর্মা বিশ্বনাথের ইচ্ছানুসারে চাষের সরঞ্জাম নির্মাণ করলেন। রামেশ্বর বিশ্বকর্মার এই বিশাল কর্মযজ্ঞের বিবরণ দিয়ে জানালেন—

পাঁচ মণে পাশী করি আশি মণে ফাল।
দু মণের দু জলই অর্ধেকে কোদাল॥
দশ মণের দা আট মণের উখুন।
দশ দশ মণ দেখ করিয়া একুন॥[১০]

'শিবায়ন' কাব্যে ব্যবহৃত এই চাষের সরঞ্জামসমূহ লোকসমাজের কাছে বহুল পরিচিত। অষ্টাদশ শতাব্দীর কৃষিনির্ভর জীবন-জীবিকার অনুপুঙ্খ বর্ণনা দিয়েছেন শিব।

৩॥ উৎকৃষ্ট বীজধান

যক্ষরাজ কুবেরের অর্থের অভাব নেই। শিব গেলেন কুবেরের কাছে। কুবের সাগ্রহে তাঁর বক্তব্য শুনলেন। সানন্দে তাঁকে বীজধান দিলেন। উপরন্ত কৃতজ্ঞতার সুরে বিনয়ী কুবের বললেন—

যক্ষরাজে রক্ষা কর্য়া আছ নিজ ধনে।
যত ধান্য চাও নেও ধার মাগ কেনে॥
ধূর্জ্জটি বলেন ধান্য ধার চাই কেন।
ধারিয়া শুধিব ধার রহে নাই যেন॥[১১]

'ধারিয়া শুধিব ধার' বক্তব্য অকপট সারল্যে ভরা। এ যেন নির্লোভ কৃষকের স্বতঃস্ফূর্ত বক্তব্য।

৪॥ বিশ্বস্ত কর্মচারী

শিব বিশ্বস্ত ও কর্মে নিপুণ কর্মচারীরূপে ভীমকে কাছে পেলেন। ভীম যেমন বিশ্বস্ত, তেমনি মেজাজীও। ফলে তার কর্ম ও আস্ফালনে কাজ যে হবে এ বিষয়ে সন্দেহ থাকে না। 'কুবের মানেন ভয় ভীমের আস্ফালনে' বক্তব্য ভীমের স্বভাবকেই প্রমাণিত করে।

হতে পারে শিবের দারিদ্র্যলাঞ্ছিত জীবন। তবু দরিদ্রের ঘরে চাঁদের স্নিগ্ধ আলো অনির্বাণ থাকে। কৃষকদেবতা শিব বৃষে চেপে চলেন। পিছনে ভীম। চাষের সরঞ্জাম তাঁর কাছে। অভাবের সংসারে কত কথা না শুনিয়েছেন পার্বতী। গালমন্দ করেছেন। কিন্তু বাস্তবিকই স্বীকার করতে হয় শিব-পার্বতী অর্ধনারীশ্বর। রামেশ্বরের ভাষায় 'জলহীন যেন মীন শিবহীন শিবা।' শিবকে দূরে চাষকর্মে যেতে দেখে অশ্রুমুখী পার্বতী। তাঁকে প্রবোধ দেন শিব। অতঃপর ভীমকে সঙ্গে নিয়ে চলেন কৃষি-জমির উদ্দেশ্যে। কৃষকজীবনের খণ্ডচিত্র উঠে আসে রামেশ্বরের অন্তরঙ্গ বর্ণনায়—

মনে জান্যা মাঘবান্ মহেশের লীলা।
মহীতলে মাঘশেষে মেঘ বরষিলা॥
দিন সাত বরষিয়া দিলেক ঈশানে।
হৈল হাল প্রবাহ শিবের শুভক্ষণে।।[১২]

'শুভক্ষণে' দেখে শিবের 'হলপ্রবাহ' শুরু হল। কৃষিনির্ভর গ্রামবাংলায় লোকবিশ্বাস ও লোকসংস্কার কীভাবে শুভ ও অশুভ—এই দুয়ের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে থাকে তার তথ্যবহুল দৃষ্টান্ত দিয়েছেন ড. বরুণকুমার চক্রবর্তী। তিনি 'কৃষি সংক্রান্ত' লোকবিশ্বাস ও লোকসংস্কারের বাইশটি সূত্র তুলে ধরেছেন। তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য চারটি হল—

- অমাবস্যায় হলকর্ষণ নিষিদ্ধ।
- অম্বুবাচীর সময় অর্থাৎ ৭ই আষাঢ় থেকে ৯ই আষাঢ় এই তিনদিন বীজবপন, ভূমিকর্ষণ নিষিদ্ধ।
- সোমবার ধান লাগালে ধানের ফলন বাড়ে।
- সোম ও শুক্র যাত্রা করার পক্ষে যেমন ভালো, তেমনি ভালো চাষ-বাসের ব্যাপারে—'সোম শুক্রে চাষবাস/যথা ইচ্ছে তথা যাস।'[১৩]

শুভক্ষণ দেখে শিবের 'হলপ্রবাহ'-এর মধ্যে লোকসমাজের 'Taboo' সংক্রান্ত ধারণার প্রকাশ দেখেছেন কবি রামেশ্বর। দিনক্ষণ স্থির না করে চাষাবাদ করলে শেষপর্যন্ত কৃষক যে লক্ষ্মীছাড়া হন, তা জানিয়েছেন কবি। শিবের উপলব্ধিজাত বক্তব্য তাই লোকসমাজের কৃষি-সংক্রান্ত বিশ্বাস ও সংস্কারের প্রতিফলন—

হাল্যার দেখিয়া দুঃখ হরে হল্যা (হইল) মো।
কালে কালে কৈল হাল কামাঞের যো॥
সেই সেই কালে যার হয় হাল-যোগ।
ধরা শস্য হরে ধানে ধরে নানা রোগ॥
বৃষ কান্দে বাসব বরিষে নাই বাড়া।
তেঞি হাভাতিয়া চাষী হয় লক্ষ্মীছাড়া।।[১৪]

চাষের জমি প্রস্তুত করবার পদ্ধতি আছে। লাঙল সহযোগে জমি চাষ করা হয়। বাসুই দিয়ে ঢেলা মাটি ভেঙে টুকরো টুকরো করে সমান করা হয়। আল বেঁধে জল রাখা হয়। তারপর মাটি জো হলে বীজধান ফেলা হয়। মাসখানেকের মধ্যে চারা বার হলে

ধান রোওয়া হয়। ধান রোপনের সময় জমিতে বেশ জল থাকে। জমি তৈরির সময় উত্তর থেকে দক্ষিণে ঢালু রাখা হয় জল নিষ্কাশনের সুবিধার্থে। শিব পল্লির কৃষকের ধান চাষের এই নিয়মগুলিকে যথাযথ মর্যাদা দিয়েছেন। রামেশ্বর লিখছেন—

চৈত্রমাস গেল সব চাষ হল্য পূর্ণ।
মাঠ কর্য়া মই দিয়া মাটি কৈল চূর্ণ॥
উঁচু নিচু চালিয়া সকল কৈল সম।
উত্তরে উন্নত কৈল দক্ষিণ দিগভ্যম॥
বৈশাখে বিছাতি কৈল শুভক্ষণ দিনে।
সার দিয়া সার্য়া সব ভূমি বাতে বুনে॥[১৫]

চাষাবাদ ভালোই চলছিল। শিব কৃষিকাজে যথেষ্ট মনোযোগ দিয়েছিলেন। তবে মাঝে-মধ্যে এখানে-সেখানে গল্প-গুজব করেন। প্রবাদ আছে 'ঘরের শত্রু বিভীষণ'। নারদ এক কথায় তাই। এমন ঘর-ভাঙা মুনি ত্রিজগতে আর নেই। গৌরীর কাছে শিবের প্রণয়-সম্ভোগের সংবাদটি দিয়ে নারদ কলহ লাগিয়ে দেন। গৌরী নারদের কথা মতো মাছি, মশা, জোঁকের উৎপাতের ব্যবস্থা করেন। অবশ্য গাঁজার ধোঁয়ায় ও নুনের ছিটায় মশা ও জোঁকের পরাভব ঘটে। চাষে মনোযোগী শিব ডাক-সংক্রান্তির দিনে কৃষি-সংক্রান্ত কর্ম সম্পাদন করেন—

ডাক-সংক্রান্তি দিনে ক্ষেতে পুতে নল।
কার্ত্তিকের কত দিনে কাট্যা দিল জল॥
ধরণী সুধন্যা হৈল ধান্য আল্য ফুল্যা।
ভোলানাথ রহিলেন ভবানীকে ভুল্যা॥[১৬]

ভৃত্য ভীমের উৎসাহে ও শিবের নিরলস পরিশ্রমে বসুন্ধরা ধন-ধান্যে-পুষ্পে ভরে উঠল। পার্বতী অবাক বিস্ময়ে চেয়ে দেখলেন বসুন্ধরার সবুজায়নের দিকে। সশ্রদ্ধ ধন্যবাদ দিলেন পরিশ্রমী কৃষক শিবকে—

ধান্য দেখ্যা পুণ্যবতী ধন্য ধন্য করে।
সার্থক শিবের চাষ সাবাস শঙ্করে॥[১৭]

"শিবের ক্ষেত্রে শস্যোৎপত্তি" শীর্ষক কাব্যাংশে কৃষক শিবের পরিচয় পাওয়া যায়। এই শিব গ্রামবাংলার নিত্য মাঠে পরে থাকা সেই কৃষক, যিনি সারা দিন শ্রমদান করেন। এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই যে, কবি রামেশ্বর দেবতা শিবকে স্বর্গ থেকে নামিয়ে গ্রামবাংলার ধানক্ষেতের সর্বক্ষণের কর্মী করেছেন। আবার পাশাপাশি এটাও দেখতে হয় যে, শিব যখন বুঝেছেন, তিনি জমির মালিক; তখন তিনি ভীমকে ঠকিয়েছেন। "শিবের কৃষি" নামাঙ্কিত কাব্যাংশে দেখা যায়, সারাদিন কাজ করেও ভীম অভুক্ত থাকে। শিবের কাছে ক্ষুধিত ভীম অনেক অনুনয়-বিনয়-প্রার্থনাবাক্য উচ্চারণ করেও এক মুষ্টি অন্ন পায়নি। অর্থাৎ এখানে শিব হয়েছেন জমিদার বা জোতদার শ্রেণির প্রতিনিধি। আর ভীম হয়েছে শ্রমজীবী ও ভূমিজীবী মানুষের প্রতিনিধি। তবে একটা কথা বলে রাখি, মঙ্গালকাব্যে শিব

হলেন একমাত্র দেবতা, যিনি দেবত্বের অভিমান ত্যাগ করে অতিসাধারণ দরিদ্র মানুষের মতো জীবনযাপন করেছেন। পাশাপাশি এটাও বলতে হয় যে, ভীমকে বঞ্চনা করার অর্থ হল এই শিব ভবিষ্যতে যে আর্থিকভাবে সম্পন্ন হবেন তারই পূর্বাভাস।

'আঞ্চলিক ঐতিহ্য অনুসারে শিব নিজেই একজন কৃষিজীবী।'[১৮] পরোপকারী এই দেবতা শ্রমজীবী মানুষের পক্ষে। রবীন্দ্রনাথ এই দেবতাকে হয়তো দেখেছিলেন 'দীনের সঙ্গী' রূপে। 'শিবায়ন'-এর অন্যতম অনুসন্ধিৎসু সম্পাদক শ্রীপঞ্চানন চক্রবর্তীর অভিমত এ প্রসঙ্গে স্মরণীয়—

> কবির শিব ক্ষেত্রপতি কৃষক। তাঁহার কাব্যের শেষাংশে বাংলাদেশের কৃষকের জীবনের কাহিনী বর্ণিত হইয়াছে।[১৯]

সুতরাং আমাদের সিদ্ধান্ত, ক্ষেত্রপতি শিব নামেই দেবতা। কৃষকের সমস্ত গুণ, অভিজ্ঞতা, সংস্কার তাঁর মধ্যে নিহিত। রামেশ্বরের 'শিবায়ন' কাব্যে তাঁর একটাই এবং একমাত্র পরিচয়, তিনি একজন দরিদ্র কৃষক। কবি হতশ্রী কৃষক পরিবারের শ্রম ও নিষ্ঠার মধ্যে সংগতি ও শ্রী ফিরে পাওয়ার বাস্তব কাহিনিটি শুনিয়েছেন। ড. ক্ষেত্র গুপ্ত যথার্থই বলেছেন—

> মঙ্গলকাব্যের শিব বাংলাদেশের লোককল্পনা থেকে উদ্ভূত দরিদ্র, গৃহস্থ, ভিক্ষাজীবী, নেশাখোর, চরিত্রে শিথিল।[২০]

ভিক্ষাজীবী মঙ্গলকাব্যের লোকদেবতা শিব 'শিবমঙ্গল' বা 'শিবায়ন' কাব্যে হয়েছেন কৃষিজীবী। তিনি বোহেমিয়ান জীবন ত্যাগ করে সুখী পরিবার গঠনের সংকল্পে কৃষিজমিকেই একান্ত আপন করে নিয়েছেন। এই শিব কর্মভোলা নন, তিনি কর্মযোগী। আশুতোষ নন; কর্তব্যপ্রিয় গৃহস্থ ও রীতিমতো সংসারী। সংসারের সমৃদ্ধির কারণেই তাঁর কৈলাস ত্যাগ করে চাষের জমিতে সর্বক্ষণ পড়ে থাকা। কর্মে ও ঘর্মে একাকার হওয়া। বন্ধ্যা ধরিত্রীর বুকে তিনি ফসল ফলিয়েছেন। আরণ্যক জীবন থেকে ভূমিনির্ভর জীবনে এসেছেন। তিনি কর্মে ও ঘর্মে একাত্ম হয়েছেন। কৃষিনির্ভর অর্থনীতির নিয়ন্ত্রক হলেন গ্রাম-ভারতের চাষিরা। শিব সেই অহল্যা-ভূমিতে ফসল ফলানো চাষিদের পূর্ব-প্রতিনিধি। রামেশ্বর শিব এককথায় লোকায়ত বাংলার খাঁটি লোকদেবতা। তিনি স্বর্গবাসী দেবতা নন, ভূমিনির্ভর গ্রামবাংলার দরিদ্র এক কৃষকমাত্র। এই কৃষক সুগৃহিণীর পরামর্শে শেষপর্যন্ত সংসারের হাল ধরেছেন। তাঁর অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি হয়েছে। প্রমাণ করেছেন, রাত-দিন জমিতে পড়ে থাকলে কৃষক কখনো না খেয়ে মরেন না। শিবের সাংসরিক সমৃদ্ধি গ্রামবাংলার কৃষিনির্ভর মানুষের আর্থিক অবস্থার পরিবর্তনকেই চিহ্নিত করে।

তথ্যনির্দেশ

১. ড. অতুল সুর : 'বাঙলা ও বাঙালির সমাজ ও সংস্কৃতি', ১৯৯০ খ্রি., পৃ. ৪১
২ অক্ষয়কুমার দত্ত : 'তত্ত্ববোধিনী' পত্রিকায় প্রকাশিত 'পল্লীগ্রামস্থ প্রজাদের দুরবস্থার বর্ণন' প্রবন্ধ।
৩. ড. এ. এ. রহিম : 'বাংলার সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাস', বাংলা একাডেমী, ১৯৯৫ খ্রি., পৃ. ৩৫৩
৪. ড. নীহাররঞ্জন রায় : 'বাঙালির ইতিহাস', আদি পর্ব, ১৪০২ খ্রি., পৃ. ৬৯৭
৫. ঐ, পৃ. ১৩৮
৬. ড. ওয়াকিল আহমেদ : 'বাংলার লোকসংস্কৃতি', ঢাকা, ১৯৭৪ খ্রী., পৃ. ১৪
৭. ড. অতুল সুর : 'বাঙলা ও বাঙালির সমাজ ও সংস্কৃতি', ১৯৯০ খ্রি., পৃ. ৪০১
৮. শ্রীযোগীলাল হালদার সম্পাদিত : 'রামেশ্বরের শিবায়ন', ক.বি. ১৯৫৭ খ্রি., পৃ. ২২৩
৯. ঐ, পৃ. ২২৪
১০. ঐ, পৃ. ২২৫
১১. ঐ, পৃ. ২৩১
১২. ঐ, পৃ. ২৩৩-৩৪
১৩. বরুণকুমার চক্রবর্তী : 'লোক-বিশ্বাস ও লোক-সংস্কার', ১৯৯৫ খ্রি., পৃ. ১২৭-২৯
১৪. শিবায়ন, পূর্বোক্ত সম্পাদনা, পৃ. ২৩৭
১৫. ঐ, পৃ. ২৩৭-৩৮
১৬. ঐ, পৃ. ২৫৫
১৭. ঐ, পৃ. ২৫৬
১৮. আশুতোষ ভট্টাচার্য্য : 'বাংলার লোকসংস্কৃতি', ১৯৮৬ খ্রি., পৃ. ৩৫
১৯. শ্রীপঞ্চানন চক্রবর্তী : 'রামেশ্বর রচনাবলী', বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ, ১৯৬৪ খ্রি., পৃ. ১৭১
২০. ক্ষেত্র গুপ্ত : 'বাংলা সাহিত্যের সমগ্র ইতিহাস', গ্রন্থনিলয়, কলকাতা, ১৯৯৬ খ্রি., পৃ. ১৪৫

অন্নদামঙ্গল
দুধে ভাতের স্বপ্ন

'অন্নদামঙ্গাল' কাব্যের ব্যাসদেব : যুগান্তের বার্তাবহ

তরুণ মুখোপাধ্যায়

আড়াইশ' বছর আগে রায়গুণাকর ভারতচন্দ্র তাঁর 'অন্নদামঙ্গাল' কাব্য ১৭৫২ খ্রিস্টাব্দে রচনা করেন। খ্যাতি-অখ্যাতির পথ পেরিয়ে আজও তা অম্লান, ভাস্বর। বিদগ্ধ মনীষী থেকে বিশিষ্ট কবি-সাহিত্যিক— সকলেই অন্নদামঙ্গালের (প্রথম দুটি খণ্ডের) অনুরাগী এবং তাঁরা এই কাব্য সম্পর্কে তাঁদের মুগ্ধতা প্রকাশ করেছেন। অশ্লীলতাদোষ কিংবা অতিশয় শব্দপ্রীতি নিয়ে যেটুকু অভিযোগ আছে, তাও অনেকে নস্যাৎ করেছেন। তাঁরা দেখেছেন, এই কাব্যে আছে শিল্পীর উপস্থিতি। সেকাল থেকে একালের আলোচকদের কিছু মন্তব্য উৎকলন করা যায়।

১। ভারতের বিরচিত কাব্য এ পর্যন্ত পুরাতন হইল না, চিরকাল নূতন রহিল, সকল সময়েই নূতন বোধহয়, প্রত্যেক বিষয়েই মনকে মোহিত করে। (ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত)

২। রায়গুণাকরের রচনার এমনই মোহিনী শক্তি যে, উহার কোনো অংশের কোনো দোষ নেত্রগোচর হয় না। (রামগতি ন্যায়রত্ন)

৩। ভারতচন্দ্রের ছন্দের পারিপাট্য, পরিহাস-রসিকতা, গল্প সাজাইবার ক্ষমতা, এই সকলে সহজেই মন আকৃস্ট হয়। (বলেন্দ্রনাথ ঠাকুর)

৪। Bharatchandra as a supreme literary craftsman will ever remain a master to us writers of the Bengali lenguage. (প্রমথ চৌধুরী)

৫। রাজসভাকবি রায়গুণাকরের অন্নদামঙ্গাল গান রাজকণ্ঠের মণিমালার মতো, যেমন তাহার উচ্ছ্বলতা, তেমনি তাহার কারুকার্য। (রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর)

৬। ভারতচন্দ্রের শ্রেষ্ঠ কৃতিত্ব তাঁহার ভাষায়। এমন মার্জিত, তীক্ষ্ণ, ব্যঙ্গোজ্জ্বল ভাষা, প্রাচীন সাহিত্যে তো দূরের কথা, বর্তমান সাহিত্যেও বিরল। ...তাঁহার ভাষার প্রধান গুণ—তাহা মডার্ন। (প্রমথনাথ বিশী)

এই ষড়ঙ্গাসূত্রে আমরা দেখি, সকলেই ভারতচন্দ্রের কাব্যকলা মুখশ্রীতে মুগ্ধ। ছন্দ-অলংকার এবং ভাষার উজ্জ্বলতায় সকলের চোখ জুড়িয়ে গেছে। কাহিনি বয়নে তাঁর কৃতিত্ব আভাসিত হলেও, চরিত্রসৃজনে তিনি দক্ষ কিংবা সার্থক তা সেইভাবে কেউ বলেননি। বিদ্যাসুন্দর পালার হীরামালিনীর নাম অনেকেই করেছেন; কিন্তু অন্নদামঙ্গালকাব্যের প্রথম খণ্ডের চরিত্রগুলি উপেক্ষিত। এমনকি যে অন্নদার নামে এই কাব্যের নামকরণ তিনিও সমালোচকদের আরাধ্য হতে পারেননি। রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের কুলদেবীরূপেই তাঁকে দেখা হয়েছে। ভাবা হয়েছে,

অর্থ ও খ্যাতি-প্রতিষ্ঠার জন্য ভারতচন্দ্র সেই অন্নদার স্তাবকতা করেছেন। একে আমরা বিচারমূঢ়তা বলতে পারি। কেননা, অবস্থা বিপর্যয়ের জন্য ভারতচন্দ্র আশ্রয়দাতার গুণগান গাইতেই পারেন; ঈশ্বরে তাঁর আস্থা নিয়েও প্রশ্ন তোলা যায়। কিন্তু যুগের তাপমাত্রা নির্ধারণে তিনি যে অভ্রান্ত কবিরাজ ছিলেন, তা নিয়ে সংশয় নেই। অন্নদা-চরিত্র পরিকল্পনায় সেই যুগের তাপ লেগেছে। রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের আজ্ঞায় তাঁর কুলদেবীর সর্বজনীন প্রতিষ্ঠা দিতে রাজসভার কবি এগিয়ে এলেও, অষ্টাদশ শতকের ছিন্নমস্তারূপটি ভোলেননি। তৎকালীন অন্নাভাবে পীড়িত, বর্গী-উপদ্রুত বঙ্গাদেশে অন্নহীন মানুষের অন্নপূর্ণা তিনি। তাই এই দেবী নিষ্ঠুর, ক্রূর, খল নন। তিনি স্নেহময়ী, বাৎসল্যময়ী, খেয়ালী, কৌতুকময়ী। যে কৌতুকে মানুষের ইচ্ছা-শক্তি বিপর্যস্ত হয়। আবার তিনিই পরিচালিকা শক্তি হয়ে ওঠেন। যেমন, রবীন্দ্রনাথের 'চিত্রা' কিংবা 'অন্তর্যামী' অন্নদার উত্তরসূরি মনে হয়।

মানবচরিত্রাঙ্কনে কবিকঙ্কণ মুকুন্দের কৃতিত্ব তুলনাহীন। সেক্ষেত্রে ভারতচন্দ্র ঈশ্বরী পাটনী বা হীরা মালিনীতে সীমাবদ্ধ। কিন্তু পৌরাণিক চরিত্রকে আধুনিক করে তোলার বিরল দক্ষতা মধ্যযুগে ভারতচন্দ্র ছাড়া আর কেউ-ই দেখাতে পারেননি। তাঁর হাতে পৌরাণিক শিব নিরন্ন বাংলার ভিক্ষুক চাষি মাত্র। অন্যদিকে পুরাণপুরুষ বেদব্যাস অন্নদামঙ্গালকাব্যে একই সঙ্গো যুগের সৃষ্টি ও যুগন্ধর হয়ে উঠেছেন। আপাত দৃষ্টিতে ব্যাস-কে টাইপ চরিত্র মনে হলেও, কোনো ভাবের বাহন তিনি নন। বরং রায়গুণাকরের ব্যক্তি-অভিজ্ঞতার ছায়া সেখানে পড়েছে। কমলাকান্তের দপ্তরে যেমন বঙ্কিমচন্দ্রকে পাই, ব্যাসচরিত্রে তেমনি ভারতচন্দ্রের আদল মেলে। স্কন্দপুরাণের কাশীখণ্ড থেকে ব্যাসকাহিনির প্রথমাংশ গৃহীত হলেও, উত্তরাংশে কবি-কল্পনার অভিনবত্ব প্রকাশ পেয়েছে। এই অনুসরণ ও মৌলিকতা দৃষ্টান্ত দিয়ে দেখানো যেতে পারে।

অন্নদামঙ্গাল কাব্যে ব্যাসপ্রসঙ্গো বলা হয়েছে তিনি বিষ্ণুভক্ত। নৈমিষারণ্যে শৌনকাদি ঋষিদেরকে ব্যাস বলেছেন—

> সত্য সত্য এই সত্য আরো সত্য করি।
> সর্বশাস্ত্রে বেদ মুখ্য সর্বদেবে হরি॥

একই কথা কাশীখণ্ডেও পাই— 'আদিমধ্যাবসানেষু হরিরেকোহত্রনাপরঃ'। আবার শিবনিন্দার কারণে ব্যাসের নন্দীকর্তৃক ভুজস্তম্ভ, বাক্‌স্তম্ভও কাশীখণ্ডের অনুসারী। এরপর স্বয়ং বিষ্ণু এসে ব্যাসকে শিবের ভজনা করতে বললে— (ইদানীং স্তুহিতং সাম্ভুং...) 'তদবধি শিবভক্ত হইলেন ব্যাস।' কিন্তু হরি-হরে ভেদ করায় শিবও ব্যাসের প্রতি তুষ্ট হননি। কাশীখণ্ডে পাই— 'যথা শিবস্তথা বিষ্ণুর্যথা বিষ্ণুস্তথা শিবঃ'। আবার বিষ্ণুপুরাণ বলে— 'সব এবাহং মহাদেবঃ স এবাহং জনার্দনঃ' ব্যাস এই গূঢ়তত্ত্ব অনুধাবন না করতে পারায় অভিশপ্ত হন। নিজেও কাশীকে অভিশাপ দেন। ফলে শিব তাঁকে বলেন, 'এইক্ষণে বারাণসী হইতে দূর হও।' বিতাড়িত, ক্ষুব্ধ ব্যাসের অতঃপর ব্যাসকাশী নির্মাণ ও তার করুণ পরিণতি ভারতচন্দ্রের স্বকপোলকল্পিত। কারো মতে 'কাশীপরিক্রমা' গ্রন্থের অনুসরণ এখানে আছে।

যদিও পাথুরে প্রমাণ নেই।

ব্যাসকাহিনিতে যা চোখে পড়ে তা মূলত ব্যাসের চিত্তচাঞ্চল্য ও বিশ্বাসের ভিত্তিহীনতা। সমগ্র মধ্যযুগের সাহিত্য যেখানে দৈবাহত ও দৈবচালিত, সেখানে ব্যাসদেব মূর্তিমান প্রতিবাদ। তাঁর কাজে ও কথায় ঐক্য নেই। তাঁকে মহাভারতকার কিংবা পুরাণকার রূপে দেখলে চলবে না। ভারতচন্দ্র তাঁকে মহাজ্ঞানী রূপে চিত্রিত করেছেন। আর জ্ঞানের স্বভাবই যুক্তিবাদী ও সংশয়ী হওয়া। জানার যেহেতু শেষ নেই, তাই ব্যাস কোথাও নোঙর ফেলতে পারেন না। 'অন্য কোথা, অন্য কোনখানে' যেতে চান তিনি। এই অন্বেষা আধুনিকতারই স্মারক। মধ্যযুগের আর কোনো চরিত্রকে আমরা এতোখানি অস্থির ও দোলাচলসম্পন্নরূপে দেখি না। ঈশ্বরে অনাস্থা এখানে বড়ো কথা নয় (সে তো মনসামঙ্গলে-র চাঁদ সগাদরও মনসাকে প্রত্যাখ্যান করেছিলেন); এখানে বড়ো কথা এক প্রাজ্ঞ ব্যক্তির 'স্থির বিষয়ের দিকে' যাত্রা। অথচ গন্তব্যে তাঁর পৌঁছানো হচ্ছে না। এক অনিকেত (Rootless) চরিত্র যেন তিনি। পৌরাণিক ধর্মবিশ্বাসে আস্থা নেই, আবার আধুনিক মানসকেও সম্পূর্ণ গ্রহণ করেছেন এমনও নয়। 'ঘরেও নহে পারেও নহে যেজন আছে মাঝখানে' তারই ট্র্যাজিক উদাহরণ ব্যাসদেব। কবি অবশ্য এই বিরোধে-বিবাদে তাঁর মনোভাব জানান—

যে জানে দুই রূপে　　সে ভজে মোহকূপে
ভারতে নাহি এই খেদ।

শিবনিন্দা করায় নন্দীর ক্রোধে ব্যাসের ভুজস্তম্ভ বাক্‌রোধ হয়। অবশেষে বিষ্ণু এসে বিপন্ন ভক্তকে উদ্ধার করেন ও তিরস্কার করে বলেন, 'যেই শিব সেই আমি যে আমি সে শিব।' আরো বলেন, 'শিবস্তব কর তবে উদ্ধার পাইবে।' শিবস্তুতিতে নন্দীও খুশি হয়। ব্যাস বুঝতে পারেন আদিদেব শিবই শক্তিমান। কাজেই যাঁকে আশ্রয় করলে কাজ হবে তাঁকেই তিনি বরণ করবেন। তুলসি কণ্ঠী ছিঁড়ে, নামাবলী মুছে ফেলে 'শিবভক্ত হইলেন ব্যাস'। এখানেই কবি ব্যাসচরিত্রে যুগলক্ষণ ও যুগান্তের বার্তা এনেছেন। বিপর্যস্ত অষ্টাদশ শতকে মানুষ যখন রামপ্রসাদের ভাষায় কলুর বলদ মাত্র, তখন পান বেচে খাওয়া কৃষ্ণপান্তিও জমিদার হয়। যে সুযোগ-সন্ধানী সেই হয় লাভবান। ব্যাস সেই যুগের দায় বহন করেছেন। পাশাপাশি, 'নূতনমঙ্গাল' কাব্য লিখতে গিয়ে ভারতচন্দ্র দেবতার প্রতি অন্ধ আনুগত্য দেখাতে চাননি। 'সকলি তোমার ইচ্ছা, ইচ্ছাময়ী তারা তুমি'—এমন আস্থা তাঁর ছিল না। তাই ব্যাসও অনায়াসে হরি থেকে হরে মন দেন। আরো পরে যান অন্নদার কাছে। কাশীতে ভিক্ষা না পেয়ে তিনি ক্রুদ্ধ হয়ে কাশীবাসীকে অভিশাপ দেন। অন্যদিকে মহর্ষি ব্যাসদেবকে কাশীবাসীরা বলে—

সবে বলে ব্যাস তুমি বড় লক্ষ্মীছাড়া।
অন্ন উড়ি যায় তুমি যাহ যেই পাড়া॥

ক্ষুৎপিপাসাকাতর ব্যাসকে দেবী অন্নদা অন্নদান করেন। তবে ছদ্মবেশী শিবের সঙ্গো তর্ক করতে গিয়ে ক্রোধের শিকার হন। তাঁকে কাশী ত্যাগ করতে হয়— 'শিষ্যসহ ব্যাসদেব

গেল কাশী ছাড়ি।' এতখানি অপমান সহ্য করা তাঁর পক্ষে কঠিন। তিনি ভাবেন—

বড় রহিল শোক কলঙ্ক ঘুষিবে লোক
ব্যাস হইল কাশী হইতে দূর।
নাম ডাক ছিল যত সকলি হইল হত
ভাঙ্গাড় করিল দর্প চূর॥

মৃত্যুঞ্জয়ী হওয়ায় আত্মহত্যা করেও মরা যাবে না। এখানে ব্যাসের ক্ষোভ ও আত্মচিন্তা তাঁকে অ-মধ্যযুগীয় চরিত্র করেছে। দেবতার শাপ ও আশিস্ সমানভাবে মেনে নিতে তিনি পারেননি। চাঁদসদাগর চরিত্রের সঙ্গে ব্যাস চরিত্রের তফাৎ এখানেই। চাঁদ শৈব; মনসাকে পূজা করতে চান না। ব্যাসের সংকট অন্যত্র। তিনি তাঁর আত্মবিশ্বাস ও অহংকার নিয়েই তৃপ্ত। অন্য কোনো কিছুতেই আস্থাশীল নন। তবু স্বার্থচিন্তায় যখন হরি-হর ভজনা করেন এবং সেখানে আঘাত পান, তখন তাঁর আত্মসম্মান আহত হয়। ব্যক্তিত্বের এই প্রকাশ, ব্যক্তির এই যন্ত্রণা মধ্যযুগীয় গোষ্ঠীচেতনা থেকে ব্যাসকে স্বতন্ত্র করেছে। তাঁর অহংবোধের পরিচয় আমরা পাই গঙ্গার সঙ্গে কলহপর্বে।

কাশী থেকে বিতাড়িত ব্যাস প্রতিজ্ঞা করেন তিনি দ্বিতীয় কাশী নির্মাণ করবেন। তবে তাঁর অপমান ও কলঙ্ক দূর হবে। সেই সঙ্গে শিবের ভজনাও তিনি পরিত্যাগ করেন। কার কাছে গেলে লাভ হবে সেই হিসাব তিনি কষেন। এ যেন কবিকঙ্কণের ভাঁড়ুদত্ত-র মার্জিত রূপ (কখনো কলিঙ্গারাজ, কখনো বা কালকেতুর আনুগত্য স্বীকার করেছে ভাঁড়ু)।

প্রসঙ্গত কবি ভারতচন্দ্রের জীবনকথার কিছু ঘটনা এখানে বলা দরকার। ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত প্রণীত 'কবিবর ৺ভারতচন্দ্র রায়গুণাকরের জীবনবৃত্তান্ত' পাঠে আমরা জানতে পারি, জমিসংক্রান্ত বিবাদে ভারতচন্দ্রের পিতার সঙ্গে বর্ধমানরাজের মহিষীর সংঘাত হয় এবং এর ফলে বালক-কবিকে মাতুলালয়ে পালিয়ে আশ্রয় নিতে হয়। সেখানেই অভিধান, ব্যাকরণ, শাস্ত্রাদি তিনি শিক্ষা করেন। কিন্তু তাঁর অগ্রজেরা সংস্কৃত ভাষা-সাহিত্য শিক্ষাকে অকেজো বলে উপহাস করেন। জীবিকার জন্য ফার্সি শিখতে বলেন, কাজেই ভারতচন্দ্রকে রামচন্দ্র মুন্সির কাছে ফার্সি ভাষা শিখতে হয়। সংস্কৃত ও ফার্সিতে তিনি ব্যুৎপত্তি লাভ করেন। লক্ষণীয়, এই জীবনের শুরুতেই ভারতচন্দ্র নিরাশ্রয়, অসহায় এবং ভ্রাম্যমান। পর যদিবা কাছে টেনে নেয়, আপনজনেরা দূরে ঠেলে দেয়। ভাষাশিক্ষার ক্ষেত্রেও প্রীতি নয়, প্রয়োজন বড়ো হয়ে উঠেছে। এই দুই তথ্যই ব্যাসচরিত্রে যুক্ত করা যায়। ব্যাসও স্থির ভূমি পান না এবং প্রয়োজনকে প্রাধান্য দেন। এরপর ভারতচন্দ্র অগ্রজদের পরামর্শে বর্ধমানে গেলে, ঘটনাচক্রে কারারুদ্ধ হন। বুদ্ধিবলে কারামুক্তি ঘটলে তিনি কটকে আসেন ও শিব ভট্ট নামে সুবাদারের আশ্রয় গ্রহণ করেন। এখানে থাকার সময় তিনি ভাগবত পাঠ শুনতেন, বলরামের আটকে প্রসাদ পেতেন ও বৈষ্ণব-সঙ্গ করতেন। ক্রমে বৈষ্ণবধর্ম ও আচারে অভ্যস্ত হলে তিনি বেশভূষা পরিবর্তন করে বৈষ্ণব হন। এই বৈষ্ণবদলের সঙ্গে তীর্থভ্রমণে বেরিয়ে তিনি খানাকুলে এলে শ্বশুরবাড়ির লোকেরা তাঁকে চিনে ফেলে ও বৈষ্ণব-বেশ ঘুচিয়ে তাঁকে সংসারী করে তোলে। তীর্থভ্রমণ, যোগসাধন পরিত্যাগ করে ভারতচন্দ্র নতুন মানুষ

হয়ে ওঠেন। এই জন্মান্তর ব্যাসদেবের স্বভাবধর্মের সঙ্গে বেশ মেলে। এরপর রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের অনুগ্রহ লাভ ও তাঁর অনুরোধে অন্নদামঙ্গাল রচনা ইতিহাসের বিষয়। তাঁর জীবনবৃত্ত অনুসরণে আরো জানা যায়, তিনি যেমন সত্যপীরের পাঁচালি রচনা করেছেন, তেমনি চণ্ডীনাটকও রচনা করেছেন। আবার তিনিই অন্নদার মহিমা ব্যাখ্যা করেন। একই মানুষের এই বহুদেবতার উপাসনা ব্যাসচরিত্রের ও কর্মের সঙ্গে সঙ্গাতি-সাধক। এই কারণে বলা যায়, ব্যাসচরিত্রে ভারতচন্দ্রের আত্মপ্রক্ষেপ ঘটেছে।

'অন্নদামঙ্গাল'-এর প্রথমখণ্ডে ভারতচন্দ্র তাঁর অন্নদাতার গুণগান গেয়ে, অন্নদার মাহাত্ম্য প্রচারে প্রস্তুত হয়েছেন। ব্যাস কাহিনি তার অন্যতম মাধ্যম। শুরুতেই ভক্তিভরে লিখেছেন—

ব্যাস নারায়ণ অংশ ঋষিগণ অবতংস
যাঁহা হইতে আঠার পুরাণ।
ভারত পঞ্চম বেদ নানা মত পরিচ্ছেদ
বেদভাগ বেদান্ত বাখান।।

কবি জানান, ব্যাসের পিতা পরাশর মুনি, মা সত্যবতী। তাঁর পাকা গোঁফ-দাড়ি, হাঁটু পর্যন্ত জটাভার প্রলম্বিত। সর্বাঙ্গে হরিনামের তিলকছাপ আঁকা। গলায় পরেন তুলসির মালা। এসবই ভারতচন্দ্রের স্বাভিজ্ঞতা প্রসূত বর্ণনা। সশিষ্য ব্যাস ঘুরে বেড়ান। শাস্ত্র নিয়ে তর্ক করেন, তবে জগতের মঙ্গাল চান। এইভাবে ঘুরতে ঘুরতে একদিন নৈমিষারণ্যে গিয়ে সেখানে শৌনকাদি ঋষিদের শিবপূজারত দেখে ব্যাসদেব বলেন, 'কি কর নর হরি ভজ রে'। ঋষিরা এই কথায় বিরক্ত হয়ে বলেন, ব্যাস যদি কাশী গিয়ে শিবের বিরুদ্ধে বলেন, তবে তাঁরা শিব ছেড়ে বিষ্ণু ভজনা করবেন। শুনে ব্যাস কাশীযাত্রা করেন ও কাশীতে হরিনাম সংকীর্তন শুরু করেন। সেখানে তিনি সকলকে বোঝাতে চেষ্টা করেন, 'হর আদি যত ভোগের গোঁসাই।' শুধু হরিই শ্রেষ্ঠ। অসাধ্য সাধনের জন্য ব্যাসদেব ভাবেন—

মোরে খেদাইল শিব তার সেবা না করিব
বর না মাগিব তার ঠাঁই।
বিষ্ণুর দেখেছি গুণ নন্দী করেছিল খুন
কিঞ্চিৎ যোগ্যতা তার নাই।।
বিধাতা সবার বড় তাঁহারে করিব দড়
যাঁহা হইতে সকলের সৃষ্টি।

সুতরাং এই ছক কষেই ব্যাসদেব যান গঙ্গার কাছে। সেইসঙ্গে তাঁর গর্ব—

গঙ্গা গঙ্গা মোক্ষধাম জানিত কে তার নাম
আমা হইতে তাহার প্রকাশ।

গঙ্গার কাছে গিয়ে তিনি বলেন—

তুমি নারায়ণী পতিত পাবনী
কামনা পুরাও মোর।

সেই সঙ্গে প্রভূত শিবনিন্দা করেন। শুনে গঙ্গা বলেন, শিবহীন কাশী হতে পারে না।

শিবনিন্দা ব্যাসের পক্ষে গর্হিত কর্ম। এতে ব্যাস অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হন এবং গঙ্গার জন্ম ও জীবনের কুৎসা শুরু করেন। সেই সঙ্গে এও জানিয়ে দেন—

আমি যারে প্রকাশিনু আমি যারে বাড়াইনু
সেও মোরে তুচ্ছ করি কহে।

সংসারের সারসত্যটি অবশ্য এর মধ্যে প্রকাশ পেয়েছে। গঙ্গাও ব্যাসের জন্ম-বৃত্তান্ত নিয়ে কুকথা শুনিয়ে দেন। সমস্ত ব্যাপারটি নিঃসন্দেহে ইতরতায় পর্যবসিত হয়েছে। কিন্তু সেই সঙ্গে এটাও প্রমাণিত হয়েছে, ভারতচন্দ্র ভক্তিরসের মঙ্গলকাব্য লিখছেন না; যুগোচিত বাস্তব পরিবেশ, মানুষই তাঁর লেখায় উঠে এসেছে।

এ যুগের মানুষ সুবিধাবাদী। যখন যেদিকে ঘুরলে স্বার্থসিদ্ধি হবে, মানুষ সেদিকেই ঘোরে। নীতি, বিবেক, আদর্শ সেখানে তুচ্ছ হয়ে যায়। সেই একালীন মানুষের প্রতিনিধি ব্যাসদেব। গঙ্গার কাছে প্রত্যাখ্যাত হয়ে তিনি যান বিশ্বকর্মার কাছে। কিন্তু সেখানেও শিবহীন কাশীগড়া অসম্ভব জেনে ব্যাস রুষ্ট হন। বিশ্বকর্মাকে অভিশাপ দেন—

তোর গুণধর যত কারিকর
হইবে দুঃখী বেগার।

এরপর ব্রহ্মার কাছে যান। কিন্তু সেখানেও হতাশ হন। শেষে ব্যাস স্থির করেন তাঁকে বাঁচাতে পারেন একমাত্র অন্নদা। শিবকে অমান্য করার শক্তি একমাত্র তাঁরই আছে। তাঁর মনে পড়ে যায়, কাশীতে শিবের জন্য তিনি অন্নাভাবে দিন কাটালে— 'শিবে না মানিয়া তিনি মোরে অন্ন দিলা।' কাজেই—

তদবধি জানি তিনি সকলের বড়।
অতএব তাঁর উপাসনা করি দড়॥

শরীর পাত করে ব্যাসদেব অন্নদার তপস্যায় রত হন। ঘরের কর্তাকে গিন্নীই যে চালনা করতে পারেন, এই সত্য তাঁর অজানা নয়। সুতরাং সাপ ও সাপুড়ের উপাসনা একই সঙ্গে চলে। কিন্তু অসময়ে অন্নদাকে বিরক্ত করায় তিনি ক্রুদ্ধ হন এবং শিবকে বলেন, 'শাপ দিব বর দিয়া'। জরতীর বেশে তিনি হাজির হন ব্যাসদেবের কাছে। ছদ্মবেশিনী দেবীকে ব্যাস চিনতে পারেন না। উপরন্তু তাঁর একঘেয়ে কথায়, আচরণে ও দীনহীন অবস্থা দেখে বিরক্ত হন। ব্যাসকাশীতে মরলে মুক্তি হয় শুনেও অন্নদা শোনেন না। বরং বৃদ্ধাকে মরতে বলার জন্য ছদ্ম ক্রোধ দেখান। ব্যাস বিব্রত হন। আবার অন্নদা কিছুটা শান্ত হয়ে বলেন 'বুড়া বয়সের ধর্ম্ম অল্পে হয় রোষ।' সুতরাং, স্পষ্ট করে জানতে চান এই দ্বিতীয় কাশীর

মাহাত্ম্য কী। ব্যাসদেব বলেন— 'সদ্য মোক্ষ হইবেক এখানে মরিলে।' বধিরতার ভান করে দেবী ছ'সাতবার একই কথা শুনতে চাইলে ব্যাসের ধৈর্যচ্যুতি ঘটে। তিনি অন্নদার কানের কাছে মুখ নিয়ে গিয়ে বলেন— 'গর্দ্দভ হইবে বুড়ী এখানে যে মরে।' কার্যসিদ্ধি হওয়ামাত্র দেবী অন্তর্ধান করেন। শিবের কাশীর মহিমা অক্ষুণ্ণ থেকে যায়।' আর ব্যাসদেব দেবীর ছলনা বুঝতে পেরে হাহাকার করে ওঠেন—

শরীর করিনু ক্ষয় তোমারে ভাবিয়া।
কি গুণ বাড়িল তব ব্যাসেরে ছলিয়া।।

দৈববাণীতে ব্যাস জানতে পারলেন, শিবের সঙ্গে বিবাদে অন্নদা খুশি হননি। তাঁর স্বামীকে অপমান করাও তিনি মেনে নেননি। তাই ব্যাসকাশী গর্দভকাশীতে পরিণত হয়েছে। ব্যাসের দুঃসাহস-কে তিনি অযোগ্যের স্পর্ধা বলেছেন—

অযোগ্য হইয়া কেন বাড়াও উৎপাত।
খুঁয়ে তাঁতি হয়ে দেহ তসরেতে হাত।।

ব্যাসদেব স্থানান্তরে যেতে বাধ্য হলেন। এক মহাজ্ঞানী, আত্মাভিমানীর ট্রাজিক পরিণতি ঘটল।

পুরাণের শর্ত মেনে ভারতচন্দ্র ব্যাসকে দৈবাহত পুরুষ করেছেন। যেমন হয়েছিলেন চাঁদ সদাগর। তবু চাঁদ চরিত্রের সঙ্গে ব্যাসের পার্থক্য আছে। পুরুষকারের মূর্ত প্রতীক যদিও ভাবা হয় চাঁদ সদাগরকে, তবু তিনি যেভাবেই হোক শেষপর্যন্ত মনসার পূজা করেছেন। অন্যদিকে ব্যাসদেব ভয়ে বা ভক্তিতে যতটা নত হয়েছেন ভাবা যায়, তা সত্য নয়। সর্বদা স্বার্থসিদ্ধি ও কার্যোদ্ধার তাঁর লক্ষ্য। সেই উদ্দেশ্য সাধনে শরীরপাত করতে পারেন। আবার দেবতার পায়েও পড়তে পারেন। এছাড়াও তিনি দেবমহিমার অলৌকিকত্ব ভেঙেছেন। গঙ্গার মহিমা প্রচারে তাঁরই যে ভূমিকা ছিল তা বলেছেন। আবার দেবী অন্নদার ছলনাকে 'সকলি তোমার ইচ্ছা' বলে মেনে নিতে পারেননি। অভিযোগ- অনুযোগ-অভিমান তিনে মিলে এই প্রশ্নই সোচ্চার হয়েছে— 'কি গুণ বাড়িল তব ব্যাসেরে ছলিয়া'? যে অন্নদা ক্ষুধার্ত ব্যাসকে স্বেচ্ছায় অন্ন দেন, হরিহোড়কে করুণা করেন, তিনি এতখানি অকরুণ হবেন ভাবা যায় না। তাঁর জরতীবেশ ধারণে যতই হাস্যরস সৃষ্টি হোক না কেন, পাঠক বা শ্রোতা জানে, এই হাসির পিছনে আছে মর্মান্তিক আঘাত। যাকে দেবতার লীলা বলেও মনকে শান্ত করা যায় না। ব্যাসদেব আগাগোড়া আত্মসচেতন, আত্মসম্মানযুক্ত জ্ঞানী মানুষ হয়ে থাকতে চেয়েছেন—যে জ্ঞান তাঁকে মধ্যযুগীয় ভাবাবেগ থেকে মুক্ত করেছে। তাই হরি থেকে হরে এবং অন্নদায় তিনি যেতে পারেন। যাঁর ক্ষমতা আছে তাঁকেই ভজনা করা শ্রেয়, তিনি বুঝেছেন। মধ্যযুগের পক্ষে এই মানসিকতা বৈপ্লবিক এবং যুগান্তের বার্তাবাহী। শেষপর্যন্ত ব্যাসচরিত্রে কবি ভারতচন্দ্র তাঁর কথা, একালের মানুষের কথাই বলতে চেয়েছেন। বিদ্যাসুন্দর পালার একটি বিষ্ণুপদে সেই ভাবী সত্য উচ্চারিত হয়েছে—

নিত্য তুমি খেল যাহা নিত্য ভাল নহে তাহা
আমি যা খেলিতে চাই সে খেলা খেলাও হে।

এই অস্মিতাবোধেই ব্যাসদেব স্বভাবত স্বতন্ত্র চরিত্র হয়ে উঠেছেন।

অন্নদা-আখ্যানের অন্দরমহল : পুরাণেতিহাস ও কল্পব্যাখ্যানের বিন্যাসবিধির সন্ধানে

দিব্যতনু দাশগুপ্ত

স্তবনীয় দেবী রূপে অন্নপূর্ণাকে আর প্রেক্ষাপট রূপে রাজন্য-সংশ্লিষ্ট বস্তুগত ইতিহাসকে 'অন্নদামঙ্গালের' বিষয়ীভূত করে গোড়াতেই রায়গুণাকর ভারতচন্দ্র মঙ্গালকাব্যধারার নিষ্প্রশ্ন অনুবর্তনের দায় থেকে প্রকারান্তরে নিজেকে মুক্ত করে নিয়েছিলেন। অন্নবিধাত্রী দেবী এবং অন্নদাতা রাজার সমন্বিত মহিমাখ্যাপনের অন্য কোনো সাহিত্যভঙ্গি আদর্শস্বরূপ না-থাকায় স্বভাবতই এই শৈল্পিক মুক্তিটি নিরঙ্কুশ ছিল না। এ কথা অন্তত বলবার অপেক্ষা রাখে না যে, ভারতচন্দ্রকে অন্নদাবৃত্তান্ত রচনার ব্রতগ্রহণের আদেশ দেওয়ার সময় আখ্যান কথনের কোনো অভিনব বা বিকল্প আদল ব্রতপতি রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের মেধাবাহিত হয়ে রায়গুণাকরের কাছে আসেনি। তবু, ভারতচন্দ্র যে নিছক মঙ্গালকাব্যধারার ব্যাকরণবিধির অন্ধ অনুসারকের ভূমিকায় বদ্ধ থাকলেন না শেষপর্যন্ত, তার পেছনে রাজপৃষ্ঠপোষকের অবদান কোনোভাবেই উপেক্ষণীয় নয়। এমনকি একটু তলিয়ে দেখলে বোঝা যাবে, ঐতিহাসিক এই ব্যক্তিত্বের বহুমাত্রিক উপস্থিতিই অন্নদামঙ্গাল-এর আখ্যানরীতিতে ঘরানা-ভাঙা স্তরান্তর বহন করে এনেছে। প্রস্তাবিত কাব্যটির উপস্থাপ্য দেবী রূপে দেবী অন্নপূর্ণার নির্বাচনে যেমন রাজপৃষ্ঠপোষকের প্রভাব রয়েছে, তেমনই পূর্বপুরুষের সুকৃতির বাহকরূপে স্থানকালের ঐতিহাসিকতায় সুচিহ্নিত রাজা কৃষ্ণচন্দ্রও মূল কাহিনির বৃত্তপরিপূরণের পরিকল্পনায় লগ্ন হয়ে গিয়ে কার্যত আখ্যানশরীরের প্রয়োজনীয় অঙ্গে পরিণত হয়েছেন। মূল গল্প-কাঠামোয় পৃষ্ঠপোষকের এহেন গৌরবী অংশগ্রহণ মঙ্গালকাব্যের অন্য কোনো বিন্যস্ত আখ্যানেই লভ্য নয় বলে মনে হয়। অন্যদিকে, অনেকটা বাল্মীকির মতো, রচয়িতা হয়েও আখ্যানশরীরে মিশে গেছেন রায়গুণাকর নিজেও। অন্নদামঙ্গালের পুষ্পিকা অংশের অব্যবহিত আগে, ভবানন্দ মজুন্দার ও দেবী অন্নদার কথোপকথনে কৃষ্ণচন্দ্র-সভাসদ ভারতচন্দ্র নিজেও একজন চরিত্র হিসেবে উল্লেখিত। কাজেই, অন্নদামঙ্গালের ঐশী কিংবা মানবীয় কাহিনি যে-নূতন মঙ্গালের আখ্যান সংগঠনে বাঁধা পড়েছিল তার নবীনতা নিছক রায়গুণাকরের ব্যক্তিক কলাবুদ্ধির প্ররোচনাজাত— একথা বললে সৃষ্টি-রহস্যের অনেক আঁতের কথাকেই অতিসরলীকরণের চৌহদ্দিতে ঢুকিয়ে চিরতরে লুপ্ত করা হবে। প্রাথমিকভাবে, কাব্যটির তৈরি হয়ে ওঠার বিচিত্র অনুষঙ্গ যা এর গল্পগঠনে স্থান পেয়ে গেছে, তা-ই মঙ্গালকাব্যের প্রথানুগ কাব্যগুলির থেকে গোত্রচ্যুত করে দিয়েছে একে।

লিখিয়ের আত্মজীবন ও সেই জৈবনিক বাস্তবতার প্রত্যক্ষ উপস্থিতি ভণিতা, আত্মজীবনী ও সূচনার পথবাহিত হয়ে নানা মাত্রায় ফিরে আসে প্রাক্-আধুনিক বাংলা চরিতকাব্য, মঙ্গালকাব্য, আখ্যানসাহিত্য এবং এমন কি আখ্যানবিস্তারের দায়মুক্ত পদাবলীতেও। শেষতম ক্ষেত্রে অর্থাৎ পদাবলীতে কবি নিজধর্মবুদ্ধিতে বক্ষ্যমান দৈবী লীলাকণিকার সঙ্গো নিজের

সম্পর্ক অনুসারে সংযুক্ত হয়ে যান ভণিতায়। এই সংযোগ উপলক্ষ্য মাত্র। অন্যদিকে, চরিতসাহিত্য, ঈশী চরিত্রের সংশ্রব-শূন্য আখ্যানসাহিত্য কিংবা দেবদেবী অধ্যুষিত মঙ্গলকাব্য সর্বত্রই। বাঙালি কবিরা পৃষ্ঠাপোষকের দাক্ষিণ্যলাভের কাহিনি থেকে শুরু করে কাব্যরচনার আদিকথার সমস্তটাই মূল কাব্যশরীরের প্রতিপাদ্য লোকাতিচারী ভক্তিরসের অনুকূলে অলৌকিকতার মোড়ক দিয়ে উপস্থিত করেন। কবির কাব্যরচনার প্রেক্ষাপটে স্বপ্নাদেশ লাভের প্রায়-সর্বত্র লভ্য কাহিনিটি আসলে কাব্যটির পাঠযোগ্যতা বা সর্বস্তরের গ্রহণযোগ্যতাকে এককভাবে কবির সাহিত্যিক সাফল্যের নিরিখের ওপর নির্ভরশীল না-রেখে— প্রাসঙ্গিক কাব্যটির চর্চাকে দেবানুগ্রহ লাভের অন্যতম পথরূপে চিহ্নিত করতে চায়। মোট কথা, কবির আত্মপরিচায়ণ ও গ্রন্থারম্ভের ইতিকথা মূলগতভাবে কাব্যপ্রথা হলেও কেন্দ্রীয় প্রতিপাদ্যের সঙ্গে কবিজীবন ও কবির অভিপ্রায়ের সংলগ্নতার নানা দিক বহন করে এই অংশটি। কাব্যের আখ্যানকে একটা পরিবেশনযোগ্য পরিপ্রেক্ষিত সরবরাহের কাজেও এ অংশের ভূমিকা কম নয়। কবিজীবনের অমিত্বের এই শৈলীবাহিত বস্তুনিষ্ঠ প্রকাশ ভারতচন্দ্রীয় নির্মাণে কিন্তু, পুচ্ছানুগ্রাহিতার প্রথাপরিসরকে ছাড়িয়ে আখ্যানযোজনা ও ঘটনাসংস্থাপনের বিস্তৃত অবয়বে স্বাতন্ত্র্য আনতে সমর্থ হয়েছে। সংগঠনবাদী আখ্যানতত্ত্বের সুপ্রতিষ্ঠিত মানকে বিচার করলেও বোঝা যাবে, 'অন্নদামঙ্গল'-এর কবির ঐতিহাসিক প্রমাণসিদ্ধ জীবন ও পরিপাশ— এই ঐতিহ্যবর্জিত ও উত্তরাধিকারহীন অন্নদাকথার নান্দী মাত্র নয়, অত্যন্ত স্পষ্টভাবেই তা পরিবেশিত গল্পের বিষয়ের মর্যাদা লাভ করেছে। ভারতচন্দ্রের কাব্য কোনো অর্থেই ইতিহাস মিশ্রিত চরিতাখ্যান নয়। চরিতমালা রচনার ছদ্ম-চেষ্টাও প্রাপ্য নয় সেখানে। যদি সে চেষ্টা থাকত তবে, কাব্যটি অনায়াসেই হয়ে উঠতে পারত বিরল প্রজাতির এক প্রাগাধুনিক আত্মকথার উদাহরণ। সেটা হয়নি বলেই, কবিজীবন যখন আখ্যানবিষয় তখন কবির 'আমি' অনিবার্যভাবেই কোনো এক চরিত্রেরই 'আমি'। আগেই দেখা গেছে, 'অন্নদামঙ্গলে'র সর্বজ্ঞ কথক কাব্যের উপান্তে কৃষ্ণচন্দ্রের সভাসদ রূপে ভারতচন্দ্রের আবির্ভাবের নির্ভরযোগ্য ভবিষ্যৎ ভাষ্য রচনা করেছেন দেবী অন্নদার উচ্চারণে। রচনার কালমুহূর্তে দাঁড়িয়ে রচয়িতা ভারতচন্দ্র যেন অনুভূত এক অতীতচর্বণার মধ্য দিয়ে রচনা নামক ক্রিয়াটিকে এবং তাঁর নিজের অস্তিত্বের বাস্তবতাকে দৈবানুমোদিত এক পূর্বপরিকল্পিত ইতিহাসপ্রবাহের অঙ্গরূপে স্বীকৃতি দিতে চাইছেন। কবি এভাবে কাব্যের বহিরঙ্গের সূত্রধার থেকে কাব্যবিষয়ের কালিক ধারাবাহিকতায় স্থান করে নিয়ে নিজেই আখ্যানের উপজীব্য হয়ে উঠেছেন। এর ফলে বাস্তবতা, ঐতিহাসিক সময়ের অনুক্রম ও দৈবী কাব্যবিষয় সমস্তটা মিলে একটা বিচ্ছেদহীন মায়াময়তা তৈরি হয়ে উঠেছে। এই মায়া কিন্তু অন্যকালের পাঠকের কাছে পাঠযোগ্য এক আখ্যানের সমগ্রতার দাবি নিয়েই দেখা দেয়, ইতিহাসের সংশ্রব সেখানে প্রাথমিক মনোযোগেরও বিষয় হয়ে ওঠে না। ঐহিকের যে ভবিষ্যৎবাণী শুনি পারমার্থিক শক্তিসত্তা দেবী অন্নদার শ্রীমুখে, সেখানে যে-ভারতচন্দ্রকে পাই তাঁর সঙ্গে রাজসভাকবি কাব্যকলাকুতূহলী ঐতিহাসিক চরিত্র ভারতচন্দ্রের অভিন্নতা স্পষ্টভাবে ঘোষিত হওয়ায়, পাঠকের ইতিহাসবুদ্ধি নয়, ভয়ভক্তিমিশ্রিত আখ্যানলিপ্সাই

চরিতার্থ হয়। মধ্যযুগের কবি হিসেবে আখ্যানবিষয়ে নিজের আমিত্বের প্রথানুগ দাবি পূরণে ভারতচন্দ্রের কুণ্ঠা ছিল না। বৈষ্ণব মহাজন-সম্মিত ভণিতাভঙ্গি নিয়ে টিপ্পনীকার বা ভাষ্যকারের 'আমি'কে কীভাবে আখ্যানে অনুপ্রবিষ্ট করাতে হয় তা তিনি ভালোভাবেই রপ্ত করেছিলেন, অন্নদামঙ্গলেই আগাগোড়া তার উদাহরণ অবিরলভাবে পাই; যেমন—

১. হৈমবতী হাসিছেন বদনে অঞ্চল।
ভারত কহিছে আর ছাঁকিয়া কি ফল। (সিদ্ধিঘোটন)

২. কহিছে ভারতচন্দ্র রায়গুণাকর।
দক্ষযজ্ঞ মনে করি নিন্দহ শঙ্কর। (কন্দল ও শিবনিন্দা)

কিংবা,

৩. ভারত কহিছে শুন ভারতী গোঁসাই।
পেয়েছ মনের মতো ভিক্ষা ছেড়ো নাই।। (সুন্দরের স্বদেশ গমন প্রার্থনা)

বহুপঠিত মঙ্গলকাব্য মুকুন্দ চক্রবর্তীর 'চণ্ডীমঙ্গলে' কবির 'আমি' ইতিহাসের এক দূষিতকালের ধারাবিবরণীকার ও সেই প্রেক্ষিতে আখ্যান উপস্থাপনের একটি উপলক্ষ্য, চণ্ডীর লীলাসূচনার সঙ্গে সঙ্গেই যে আখ্যানের বিষয় থেকে একেবারে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। অন্য দিকে, সেকালের শ্রীচৈতন্যচরিত সাহিত্যে দেখি, কবির 'আমি' মুখ্য প্রতিপাদ্য চৈতন্যজীবনের উপস্থাপনের সূচনাতে অবিকল মঙ্গলকাব্যের কবির মতো দৈবী স্বপ্নাদেশের সাক্ষ্য হয়েও ঐতিহাসিক চৈতন্যলীলায় নিজের 'আমিত্ব'কে মহিমান্বিতভাবে সংযুক্ত করবার স্বাভাবিক প্রলোভনের পথে পথে পা বাড়ান না। কবি কেবল সংক্ষেপে তাঁর গুরু পরম্পরাকে শ্রীচৈতন্য পরিকর সমুদ্রে বিলীন করে দিয়ে আত্মসংস্থাপনের পথ থেকে চিরতরে নিজেকে প্রত্যাহার করে নেন। তাঁর হয়ে কথা বলে চৈতন্যচরিত চিন্তনে তাঁর অবলম্বিত পন্থা ও তত্ত্ববুদ্ধি। সে দিক থেকে দেখতে গেলে, আবিষ্কৃত প্রাগাধুনিক আখ্যানসাহিত্যের পরিচিত প্রবাহে ভারতচন্দ্রের অন্নদাতাই একমাত্র সাহিত্যরূপ যেখানে লেখক বিজল্পিত কল্পকথাবস্তুর দাপুটে অস্তিত্বের মাঝে ইতিহাসের নিরিখে কবির 'আত্মজৈবনিক আমি' আখ্যানের কল্পকথা ও ইতিহাসের মিশ্রিত কাঠামোয় বৃত্তপূরণে সরাসরি অংশগ্রহণ করে। এই নিবিড় সংশ্লেষ সত্ত্বেও কবির এই 'আমি'ও আত্মজীবনীর আমিত্বের মত সাহিত্যিক সন্দর্ভ-বহির্ভূত থাকে না। বিশ্বাসের সে মর্মগত ভিত্তিকে স্বতঃসিদ্ধ ধরে নিয়ে মঙ্গলকাব্যের প্রকাশ ও প্রতিষ্ঠা তার অলৌকিক আবহে কবি মিশে যান, সত্য-অসত্যের নীরস বাস্তববিধুর প্রশ্নের প্রতিস্পর্ধা সেখানে নেহাতই উপেক্ষার যোগ্য।

তাত্ত্বিক সুসি থারু (Susie Tharu) তাঁর 'Oral History', Narrative Strategy, and the Figures of Autobiography' প্রবন্ধে জানান, আত্মজীবনীর চরিত্র নির্মিত সন্দর্ভের (Discourse) মতো হয় না।[২] এই সব লেখার নির্ভরযোগ্যতা পাঠ্যের ওপরে নয়, পাঠ্যবহির্ভূত বাস্তবের ওপরেই দাঁড়িয়ে থাকে। আত্মজীবনী এবং আত্মজীবনী-নয় এমন রচনার মধ্যেকার এই সাম্প্রতিক বিভেদনটি মধ্যযুগীয় বাংলার মঙ্গলকাব্য ধারায় মোটামুটি

রক্ষিত হলেও, ভারতচন্দ্রের কলমে এসে তা যে এক জটিল ও মিশ্র চরিত্র গ্রহণ করেছিল তার একটি কারণ বোধহয় আখ্যানের বুননের মধ্যে অনতিঅতীতকে মিশিয়ে মিলিয়ে দেবার কাজে ভারতচন্দ্র প্রায়ই ইতিহাস, পুরাণ ও কল্পইতিহাসকে অভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার ও ব্যবহার করতেন। ঐতিহাসিক ঘটনাক্রমকে কল্পব্যাখ্যানের মধ্য দিয়ে পুরাণসুলভ আখ্যানে বেঁধে তোলা আর কল্প-ইতিহাসের কুশলী ব্যবহারে তাঁর ব্যক্তিজীবন ও পেশাগত পরিচিতির যে-দায় ছিল তা-ই কার্যত অন্নদাবৃত্তান্তের বিন্যাস বিধিকে বিচিত্র স্তর সম্পন্ন করে তুলেছে।

দুই

'ইহার প্রথম খণ্ডে দেবতা, দ্বিতীয় খণ্ডে মানুষ ও তৃতীয় খণ্ডে অতীত ইতিহাস প্রাধান্য লাভ করিয়াছে'[৩]—বিষয়সারকে গাণিতিক স্পষ্টতায় চিহ্নিত করে 'অন্নদামঙ্গাল'-এর আখ্যানপ্রবাহকে এই সূত্রটিতে পরিচায়িত করতে চেয়েছিলেন মঙ্গালকাব্যচর্চার প্রবাদপুরুষ অধ্যাপক আশুতোষ ভট্টাচার্য। আঙ্গিক বর্গীকরণে বিশেষ্যের ছাঁচে ঢালাই হতে গিয়ে কাব্যবিষয়ের যে-স্তর সম্পন্ন বিরুদ্ধ মেরুগুলি অবর্ণিত ও প্রান্তিকায়িত হয়ে গেছে এই বীজবাক্যে, আমরা মনে করি অন্নদাকথার সাংগঠনিক রহস্য অনেকটাই নিহিত সেখানে। মঙ্গালকাব্যের গল্পগঠনে দেবখণ্ড ও নরখণ্ডের মোটাদাগের বহুপ্রচলিত বিভাজিকাটি ভারতচন্দ্রে বিশুদ্ধতার সঙ্গো রক্ষিত হয়নি একেবারেই। হিন্দুশাস্ত্রের পরিভাষায় যাকে বলে 'প্রত্যাহার' অর্থাৎ কর্তব্য কর্ম পালন না-করা জনিত পাপ—বন্দনীয় দেবতার চাতুরীতে সেই পাপে লিপ্ত হয়ে পরিণতিতে স্বর্লোকবাসীর মর্ত্যে আগমন ও বহু বিরোধ আর বিপন্নতার মধ্য দিয়ে ঐশীকৃপায় উদ্ধার হওয়ার প্রেক্ষিতে দেবতার মাহাত্ম্য স্থাপন করে পরিশেষে, দেবানুগ্রহেই স্বর্গপ্রত্যাবর্তনের যে-মোটিফটিকে মঙ্গাল-আখ্যানের কেন্দ্রীয় নির্মাণ-রহস্য বলা যেতে পারে— ভারতচন্দ্র তাকে নিজের প্রয়োজন মতো পরিবর্তিত ও অরৈখিক এবং খানিকটা অপ্রথাগত আদলে ব্যবহার করেছেন। মঙ্গালকাব্যের দৈবানুগৃহীত মানবমুখ্য মর্ত্যকাহিনিকে তাঁর পৃষ্ঠপোষকের পূর্বজের শ্রুত ইতিহাসের সঙ্গো যুক্ত করবার সন্তোষক কাজটি করতে গিয়ে তিনি যেমন পুরাণের সঙ্গো কল্পপুরাণ তেমনই ইতিহাসের সঙ্গো কল্পইতিহাস নির্মাণ করতে করতে এগিয়ে গেছেন। ইতিহাসের ঘটনার বোধ্যতা সম্পাদনে ইতিহাসের পৌরাণিক ভাষ্য রচনার যে-প্রবণতা প্রাক্-উপনিবেশী বাঙালির প্রতিভাশক্তির অঙ্গা—ভারতচন্দ্রের মননেও তার উপস্থিতি বিশেষভাবে লক্ষ করবার মতো। 'অন্নদামঙ্গাল'-এর গ্রন্থসূচনা অংশেই দেখি ঐতিহাসিক ঘটনার নিশ্ছিদ্র পৌরাণিক কারণ সন্ধান করে রায়গুণাকর ইতিহাসকে অলক্ষ্যগোচর ঘটনার পুরাণের আবহমান ধাঁচায় সুনিপুণভাবে সংযুক্ত করে দিচ্ছেন। ইতিহাসকে এবং যে-ইতিহাসের কথা ধারণ করে আছে যে-আখ্যান তাকে, সাংস্কৃতিক ও ধর্মীয় বৈধতা দেবার এও এক ভক্তিসম্ভাবিত কৌশল। অবশ্য এরই মধ্যে মিশে আছে লিখিয়ের স্বপ্নপূরণের সারস্বত চেষ্টাও। মুরাদ বাখর ও আলিবর্দির ভাইপো সৌলদজঙ্গোর ঐতিহাসিক যুদ্ধে সৌলদজঙ্গা পরাভূত ও বন্দি হলে আলিবর্দির সমর্থক মহাবদজঙ্গা মুরাদ বাখরকে আক্রান্ত ও পরাভূত করে বন্দি সৌলদজঙ্গাকে

মুক্ত করলে, ভুবনেশ্বরে সাড়ম্বর বিজয়োৎসব পালিত হয়। এই যবনিক উচ্ছ্বাসটি তীর্থপ্রিয় ভারতচন্দ্রের না-পসন্দ ছিল। তাই, 'দুরাত্মা মোগল'-এর এই 'দৌরাত্ম্যের ক্ষালন' তিনি 'ঘটিয়ে' নেন বর্গি আক্রমণের ফলে মুসলমান দর্পের বিনাশের মধ্যে দিয়ে। নিঃসম্পর্কিত এই ঐতিহাসিক ঘটনা দুটিকে Poetic Justice- এর পরম্পরায় যুক্ত করে একটি নিখুঁত-নক্শার আকার দিতে কবি তাই দ্বারস্থ হয়েছেন পুরাণের। সেই কল্পপুরাণে দেখি, ভুবনেশ্বরে মুসলিম শাসকের মোচ্ছবে কৈলাশে শিবানুচর নন্দীর 'মনে ক্রোধ উপজিল'। কারণ, শিবধন্য ভুবনেশ্বর বিশেষভাবে উমা-মহেশ্বরের অধিষ্ঠানভূমি, সেখানে বিজাতীয় শক্তির স্পর্ধিত আস্ফালন অবাঞ্ছিত। ক্রোধ রিপুর বশীভূত নন্দী সৃষ্টি বিনাশে উদ্যত হলে স্বয়ং দেবাদিদেব নন্দীকে প্রতিহিংসা নিবৃত্তির একটি বিকল্প পথের সন্ধান দিয়ে বলেন— 'আছয়ে বর্গির রাজা গড় সেতারায়।/ আমার ভকত বড় স্বপ্ন কহ তায়।।/সেই আসি যবনেরে করিবে দমন।'[৪] ইতিহাসের বৈনাশিক পাঠকে এভাবে পৌরাণিক প্রলয়ের অনুকল্প রূপে প্রতিস্থাপিত করে ভারতচন্দ্র কি মুসলমান উচ্ছৃঙ্খলতা আর বর্গীর নৃশংসতায় বিপর্যস্ত বাস্তবকে দৈবে আস্থাশীল ছাপোষা মঙ্গালকাব্যের মরমী শ্রোতা বাঙালির পক্ষে একটু সহনযোগ্য করে তুলতে চেয়েছিলেন? পুরাণ ও ইতিহাসের এহেন বৃত্তবন্ধ পরস্পরস্পর্শিতা সমাজমনের অবচেতনে বয়ে চলা সাম্প্রদায়িক উষ্মা যে নিজেকে চরিতার্থ করে ছিল তা একালের পাঠকের কাছে আর নতুন করে বলবার প্রয়োজন হয় না। স্রষ্টা ও সমাজমনের যে রহস্যই নিহিত থাকুক না কেন, বিন্যাস-কৌশলে পুরাণ ও ইতিহাসের এই কার্যকারণসম্পর্কবন্ধ সমস্তরিক ব্যবহারকে রাজতোষক কবি ভারতচন্দ্রের কাহিনি নির্মাণের একটি মৌল বিধি বলে চিনে নেওয়া যায় এই সূচনাপর্বেই।

স্বর্গ ও মর্ত্যের স্বতন্ত্র ভূগোলের মেরুবিষম বৈপরীত্যে বাঁধা দেবখণ্ড ও নরখণ্ডের বিভাজিকাটিকে লুপ্ত করে, ভারতচন্দ্র স্বর্গ, পৌরাণিক পৃথিবী এবং ঐতিহাসিক বাংলার তিন পরস্পর নিঃসম্পর্কিত কল্পচিত্র ও মানচিত্রকে আখ্যানসূত্রে গেঁথেছেন কাব্যের প্রথমখণ্ডে। পূর্ববর্তী মঙ্গালকাব্যগুলির মতো ঘটনার সরলতা ও এককত্ব, স্তরশূন্যতা ও বিস্তারের মধ্য দিয়ে সম্পূর্ণতার দিকে যাত্রা— এখানে প্রাপ্য নয়। আখ্যানবিদ্ তোদরভ বৈশ্বিক ব্যাকরণের সর্বব্যাপিতার কথা স্মরণে রেখে যেভাবে আখ্যানের চরিত্রকে বাক্যসংগঠনের মধ্যেকার নামবাচক বিশেষ্যরূপে এবং সংঘটন বা ক্রিয়াকে (Action) ক্রিয়াপদ (Verb) রূপে দেখবার প্রস্তাব করেছেন[৫] তার পরিপ্রেক্ষিতে ভারতচন্দ্রের অন্নদাকাহিনির এই সূচনাখণ্ডটি পাঠ করলে দেখা যাবে, সামগ্রিকভাবে এই পর্বটি কার্যত অনেকখানি সংক্ষিপ্ত কিন্তু সম্পূর্ণ বাক্যের সমাহার ছাড়া আর কিছুই নয়।

কাব্যে পুরাণে ও পূর্ববর্তী চণ্ডীমঙ্গালে বস্তুত হরগৌরীর দাম্পত্য লীলার পূর্বাপর বিস্তৃত কাহিনির মধ্যেই কবি ভারতচন্দ্র গৌরীর অন্নদা হয়ে ওঠার বিশিষ্ট সংকটটিকে স্থাপন করেছেন। এই বৃত্তান্তের কেন্দ্রস্থ সংকট—হরগৌরীর কোন্দলের প্রেক্ষিতে সখী জয়ার পরামর্শে গৌরী কর্তৃক অন্নপূর্ণামূর্তিধারণ ও দেবাদিদেবের ভিক্ষাহরণ। ভারতীয় কথানির্মিতির বৈশিষ্ট্যগত প্রথানুগত্য ও মেদবাহুল্যের যে-অনুসরণটুকু করেছেন ভারতচন্দ্র তা ঝরিয়ে

দিলে দেখা যাবে প্রথম খণ্ডের অন্নদামাহাত্ম্যকথার প্রতিষ্ঠাতা 'বাক্য'গুলি (তোদরভীয় অর্থে) পরস্পরস্পৃষ্ট হয়ে আছে ভিক্ষাহীনতা ও নিরন্নতার প্রসঙ্গে। অন্নপূর্ণার গৃহিণীসুলভ সকৌতুক দাক্ষিণ্যে শিবের ক্ষুধানিবৃত্তি এবং তৃপ্ত দেবাদিদেব কর্তৃক কাশী প্রতিষ্ঠা, অন্নদার অধিষ্ঠান ইত্যাদি নিয়ে যে-পূর্ণাঙ্গ অখ্যানটি নির্মিত হয়েছে, পরবর্তী ব্যাসকেন্দ্রিক পালাটির সঙ্গে তার আখ্যানগত ধারাবাহিকতার যোগ নেই বললেই চলে। কাহিনি এখানে সরে এসেছে কৈলাস স্বর্গভূমি থেকে পুরাণের পৃথিবীতে, কাশীতে। তবে, দেবচরিত্র এবং অতিলৌকিক তপশ্চরণ ও মন্ত্রসিদ্ধির অনুষঙ্গ এ পর্বে ফিরে এসেছে বারবার। কিন্তু, এ অংশে দেবী-মাহাত্ম্য প্রতিষ্ঠায় ঐশী পরিকল্পনার ক্রীড়নক হলেন ব্যাসদেব, যিনি পুরাণ রচয়িতা হয়েও পুরাণেরই চরিত্র, কিংবদন্তি ও অপ্রমাণিত ইতিহাসের জগতেও যাঁর অবাধ বিচরণ। এবারেও পুনরাবৃত্ত সেই ভিক্ষাহীনতা। হরগৌরীর আখ্যানে শিবের নিরুদ্যম তপোবিলাস থেকে কোন্দলের পথ ধরে যে-ভিক্ষাহরণের কাহিনি জন্ম নিয়েছিল, এখানে তা-ই এসেছে আত্মাভিমানী বিদ্যাদর্পিত ব্যাসের ক্ষমতানুবর্তী থাকবার দ্বিচারী রাজনীতির শাস্তি হিসাবে। একটু বিচার করলে দেখি, লোকোত্তর চরিত্র মহাদেব এবং পুরাকথার মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাস উভয়েই যা করেছেন তা হল পূর্বোক্ত প্রত্যবায় বা অকর্তব্য। এই অকর্তব্যই সম্ভাবিত করেছে পরিণতির অন্নপূর্ণামাহাত্ম্য বিশ্লেষক ভ্লাদিমির প্রপের পরিভাষায় 'Function' আর শ্রুতকীর্তি তাত্ত্বিক রোলাঁ বার্তের ভাষায় 'ক্রিয়ার বীজ'—যা পরিপক্ক হতে হতে ঘটনাধারণাকে পরিণতির দিকে নিয়ে যায়। তাঁর 'Morphology of Folktale' প্রবন্ধে প্রপ জানান 'function' হল 'an act of dramatic personae, which is defined from the point of view of it's significance for the course of action of the tale as a whole'.[৬] ভারতচন্দ্র- পরিকল্পিত ও প্রার্থিত এই আখ্যান দুটিতে 'dramatic personae' যথাক্রমে শিব ও ব্যাসদেব। যেহেতু, দেবী অন্নদা অন্নদানের একমাত্র কর্ত্রী, তাই এই দু'জনের 'act'-ই একটি ভিক্ষাহীনতা ও ক্ষুৎকাতরতার পথ ধরে অন্নদার মহিমা প্রদর্শনের প্রেক্ষিত তৈরি করেছে। এভাবে বিবেচনা করলে বোঝা যায়, পরপর চলে আসা প্রায় অসংলগ্ন আখ্যান দুটি Metatale বা অতিকাহিনি রূপে অভিন্ন এবং এ নিরিখে এক সঙ্গে পড়বার যোগ্য। প্রপের অবলম্বিত Syntagmatic বা ক্রমিক বিবর্তনের পন্থা থেকে সরে এসে সাংস্কৃতিক নৃবিজ্ঞানী লেভি স্ত্রোসের অবলম্বিত ব্যাখ্যাকৌশল অনুসরণ করলে এ কথা স্পষ্ট হবে যে, শিব ও ব্যাসের মধ্যে একটি Paradigmatic বা প্রতিকল্প প্রতিস্থাপনগত[৭] সম্পর্কও বিদ্যমান। সংগঠনের এই মৌল কাঠামোটিকে দুটি স্বতন্ত্র ভূগোলে বিন্যস্ত করে দেবী-মাহাত্ম্যকে আনুভূমিক বিস্তার দেওয়া হয়েছে, আর ঠিক সেই কারণেই মঙ্গলকাব্যের মতো সনাতনী পাঠ্যেও প্রতিকল্প হিসেবে দেবাদিদেব আর প্রায়-সমস্ত মানবিক সীমাবদ্ধতা নিয়ে ব্রহ্মজ্ঞ ব্যাসদেব পরস্পর পাশাপাশি উল্লেখের বিষয় হয়ে উঠেছেন।

কিন্তু, ভারতীয় মূল্যমানের কাঠামোটি তাতে বিপর্যস্ত হয়নি একটুও। শিব-বৃত্তান্তের সমাপ্তিতে ভব-ভবানীর ইচ্ছার মধ্যে কোনো বিরোধ থাকেনি। নেহাত অবমাননার যোগ্য বৃদ্ধ অকর্মণ্য লৌকিক শিব অন্নপূর্ণা-পরিকল্পনার অলোক ধ্রুপদিয়ানার স্পর্শেই হয়তো

ফিরে পেয়েছেন আপন ঈশীত্ব। কিন্ত ব্যাসকাহিনির শেষে অনিঃশেষ দুর্গতির পর নিস্তার পেলেও মানবিক ত্রুটিপূর্ণ আবেগ ও অভিমানে সংরক্ত ব্যাসদেব কিন্তু, তার অভিলষিত মর্যাদা থেকে অনেক দূরে নিক্ষিপ্ত হয়েছেন। শিবের অবিমুক্ত আনন্দকানন কাশীধামের ঠিক বিপরীতে চূড়ান্ত ব্যর্থ হয়েছে তাঁর ব্যাসকাশীর পরিকল্পনা, যার কারণ নিছক দৈবী চাতুরী। অতিকাহিনির বাইরে গিয়ে যেখানে ব্যাসবৃত্তান্ত অনুষঙ্গের নিজস্বতায় বিশিষ্ট, সেখানে দেখি ব্যাসের ঔদ্ধত্য ও বিরোধিতা। কিন্তু এই বিরোধের দেবী-পরিকল্পিত দমনলীলার শেষে এই দম্ভী তপস্বীর পরিস্থিতির কাছে পরাভূত এক ট্র্যাজিক মূর্তিই জেগে থাকে পাঠকের মনে। সারা মঙ্গালকাব্যটিতে দৈব ও পুরুষকারের বিরোধিতার এমন সৃজনী বিকাশ ইতিহাসের তির্যক ভঙ্গি ও ব্যঞ্জনা নিয়ে আর কোথাও প্রকাশিত হয়েছে বলে মনে হয় না।

তিন

'Desire' বা 'বাসনা'— মধ্যযুগের তাবৎ ইউরোপীয় আখ্যান সাহিত্যের মতোই বাঙালির মঙ্গালকাব্যেরও অন্তর্গঠনের চরিত্র নিরূপণকারী প্রধানতম শক্তি। সমস্ত মঙ্গালকাব্যের মধ্যেই বাসনা-রূপ এই 'The Sole characterological principle'[৮] টি কাজ করেছে পূজার্হ দেবতার মনের গভীরে মানুষের পৃথিবীতে পূজিত হওয়ার এষণা ও তার পরিপূরণের মধ্য দিয়ে। সুতরাং, সংগঠনবাদী তাত্ত্বিক গ্রেইমাস (Greimas) আখ্যানের বিশ্লেষণে যাকে বলেন 'Sujet' বা বাসনাকারী (desirer), মঙ্গালকাব্যের বিষয় সংস্থাপনের বিচারে সেই বাসনাকারী হলেন লোকাতীত যোগ্যতাবিশিষ্ট দেবতা স্বয়ং। আর সেই কারণেই বাস্তবের গহন সন্নিধি সত্ত্বেও মূলগত অলৌকিকতা, আখ্যানের ধারাবাহিকতাগত ত্রুটি কিংবা আকস্মিকতা ইত্যাদি সমস্ত কিছুরই একটা জবাবদিহি তৈরিই থাকে সবসময়। দৈবী ইচ্ছার বশে স্বর্গের দেবতার অজ্ঞানকৃত পাপের শাস্তিতে স্বর্গভ্রষ্ট হওয়ার যে-কাহিনিবৃত্তটি সমস্ত মঙ্গালকাব্যেই পুনরাবৃত্ত মোটিফ (Leit motif) —'অন্নদামঙ্গাল'-এর ব্যাসবৃত্তান্তের পর অর্থাৎ আখ্যানসূচনার থেকে বেশ কিছুটা দূরে গিয়ে কবি প্রথম সেই প্রথাপূরণে প্রবৃত্ত হয়েছেন। ব্যাসের পৌরাণিক কাশীর ভূগোল থেকে কাহিনি আবার ফিরে গিয়েছে স্বর্গীয় প্রতিবেশে। স্বর্গচ্যুতির আখ্যানগত পরিণাম-সন্ধানী কাহিনি বুনতে বসে ভারতচন্দ্র দুটি পৃথক শাপবৃত্তান্তের অবতারণা করেছেন। পরস্পরের সমান্তরালে বয়ে-চলা আখ্যানের দিক দিয়ে নিঃসম্পর্কিত এই দুটি শাপবৃত্তান্তের পাত্রপাত্রীরা হলেন যথাক্রমে—বসুন্ধর ও বসুন্ধরা এবং নলকূবর ও তাঁর দুই স্ত্রী চন্দ্রিণী ও পদ্মিনী। শিব ও ব্যাসের দুর্গতির কাহিনির সঙ্গো এই দুটি শাপভ্রষ্টতার বৃত্তান্তের সাংবিধানিক মিল শুধু এইটুকুই যে, প্রতিটি কাহিনিরই মূলে আছে পূর্বকথিত 'প্রত্যবায়' বা কর্তব্য-কর্মে অবহেলা। এ প্রসঙ্গো লক্ষণীয় বিষয় হল, 'কর্তব্য-কর্মে অবহেলা' দেবাদিদেব থেকে মানুষ সকলেই করেছেন, কিন্তু অকর্তব্য সম্পাদন করেছে কেবল সাধারণ দেবলোকবাসী দেবযোনি এবং মর্ত্যচারী মানুষ। এই সাধারণ কাঠামোটির ন্যূনতম সাদৃশ্য ছাড়া শিব থেকে ব্যাসে কাশীকে কেন্দ্র করে ধারাবাহিকভাবে প্রবাহিত হয়েছে যে-কাহিনিটি, তার সঙ্গো অন্য কোনো যোগই নেই মঙ্গালকাব্যের

মূলধারানুসারী এই শাপভ্রষ্টতার যুগলবৃত্তান্তের।

সাধারণভাবে সমস্ত মঙ্গলকাব্যেই শাপ কাহিনির সূচনা হয় পৃথিবীতে। এই ঐশী অঘমোচন ও স্বর্গে প্রত্যাবর্তনের মধ্য দিয়ে দেবখণ্ড ও নরখণ্ড মিলে যে-বৃত্তটি সম্পূর্ণ হয়— মঙ্গালকাব্যধারার সমন্বিত পাঠের নিরিখে তার মৌল সংগঠন-বিশিষ্টতা সেখানেই, এ কথা আগেই বলা হয়েছে। সে-বিচারে মঙ্গালকাব্য হয়ে-ওঠার অখ্যানগত সমস্ত শর্ত 'অন্নদামঙ্গাল'-এর কবি পূরণ করেছেন কাব্যটির প্রথম খণ্ডেই। কিন্তু, তার পরেও যে অন্নদামঙ্গাল কাব্য আরও দুটি বিস্তৃত খণ্ডে কীর্তিত হয়েছে তার কারণ নিছক কবির অসংযমিত বাগ্‌বাহুল্য নয়, অনেকটাই রাজতোষণজীবী কবির প্রকৃতিগত রাজনীতিও। শিব ও ব্যাস কাহিনির সঙ্গে শাপ কাহিনি দুটি যেমন সংযোগশূন্য ও প্রবহমানতাহীন—'অন্নদামঙ্গাল'-এর প্রথম খণ্ডের সঙ্গো পরবর্তী খণ্ড দুটি কিন্তু ঠিক তেমনভাবে নিঃসম্পর্কিত নয়। প্রথম খণ্ডের সঙ্গো পরবর্তী খণ্ড দুটির ধারাবাহিকতা বজায় রাখার কাজে শাপবৃত্তান্ত দুটির ভূমিকা এক নয়। এই ভূমিকার ভিন্নতাতেই তাদের সাংগঠনিক পার্থক্যের সূচনা।

বসুন্ধর আর বসুন্ধরা—অর্থাৎ মরজীবনের হরিহোড় ও সোহাগীর জীবনকথা কোনোভাবেই মঙ্গালকাব্যের মানবখণ্ডের তথাকথিত দেবপূজাপ্রবর্তক চরিত্রের বৃত্তান্তের অনুরূপ নয়। এই কাহিনিতে দেবীমাহাত্ম্য কোনোরূপ বিরোধ বিক্ষোভের ইতিবাচক অবসানের প্রেক্ষিতে নয়, সরাসরি দৈবী করুণাতেই প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেছে। স্বর্গভ্রষ্ট যুগল নয়, দেবতার অহৈতুকী কৃপার ভাজন হয়েছে এ পর্বের নায়ক হরিহোড়ের পিতামাতা। এই দেবযুগল দেবীর প্রসাদবঞ্চিত হয়ে মর্ত্যে এসেও এমন কোনো কাজেই প্রবৃত্ত হয়নি যা ঐশী আনুকূল্য লাভের সহায়ক। বরং জীবজীবনেও কৃপাবঞ্চিত হয়েই মৃত্যু হয়েছে তাদের। তাই, মঙ্গালকাব্যের আবহমান বিন্যাসবিধির ব্যতিক্রম রূপে এই প্রথম শাপকাহিনিটি অন্নদাকথার একটি উপক্রমমাত্র হয়ে রয়েছে। দেবীর প্রতিপত্তি প্রমাণ ও ব্যাখ্যানের জন্য প্রয়োজন হয়েছে অপর একটি শাপবৃত্তান্ত যার নায়ক-নায়িকা হল নলকূবর ও তার দুই পত্নী—যারা ইহলীলায় যথাক্রমে ভবানন্দ মজুন্দার এবং চন্দ্রমুখী ও পদ্মমুখী নামে কীর্তিত। কাজেই মঙ্গালকাব্যের আখ্যান-অন্বয়ে (Narrative syntax) ব্যতিক্রমহীনভাবে শাপভ্রষ্ট দম্পতির যে-কাহিনি এককটি পাওয়া যায় তার ভূমিকার অনুরূপে আলোচ্য প্রথম শাপবৃত্তান্তটি দৈবী 'desire'-এর পরিপূরণে, গ্রেইমাসের পরিভাষার Adjuvant বা helper হয়ে উঠতে পারেনি। অথচ এই উপযোগের টানেই মঙ্গালকাব্যে শাপবৃত্তান্তের অবতারণা হয়ে থাকে। তাই, এই কাব্যধারার সমন্বিত আখ্যানের অন্বয়শরীরে হরিহোড়ের বৃত্তান্ত বাড়তি মেদের মতোই উদ্বৃত্ত। কাহিনির পথ ধরে যখন পাঠক এসে পৌঁছায় নলকূবরের মর্ত্যলীলা অর্থাৎ ভবানন্দ মজুন্দারের প্রসঙ্গো, তখন হরিহোড়ের বিড়ম্বিত জীবনের কথা মনে রাখবারই প্রয়োজন হয় না আর। এমন কি স্বাদের ভিন্নতাও তার উপস্থিতিকে প্রগাঢ় করে তুলতে সক্ষম হয়নি। আসলে, ভারতচন্দ্রের আঙ্গিক সচেতনতার সিংহভাগটাই অধিকার করেছিল শব্দযোজনা ও বিষয়কল্পনার প্রতি আসক্তি—কাব্যের অনুপুঙ্খ মণ্ডনকলার দুর্মোচ্য টান

কাটিয়ে আগাগোড়া পরিকল্পনার নিরিখে উপকাহিনির প্রাসঙ্গিকতা নিয়ে ভারতীয় কথা-প্রবণতার উত্তরাধিকার বহনকারী রায়গুণাকর তেমন ভাবিত ছিলেন না, যেমনটি ছিলেন চণ্ডীমঙ্গলকার মুকুন্দ চক্রবর্তী। ভবানন্দকে কেন্দ্রে রেখে যে 'ইতিহাস-ক্লিস্ট কাহিনির অবতারণা হয়েছে প্রথমখণ্ডে এবং যে-কাহিনি পরিব্যাপ্ত হয়ে আছে পরবর্তী দুটি খণ্ডে, সেখানেই ভারতচন্দ্রের অপ্রসঙ্গাবিলাস সবচাইতে বেশি। ভবানন্দের জোবানে 'বিদ্যাসুন্দর কথারম্ভ'-এ এর সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য প্রমাণ আছে।

অন্নদাকৃপায় ভবানন্দের 'কানগোই ভার' লাভ ও প্রতাপাদিত্য-কেন্দ্রিক নরখণ্ডের যথার্থ সূচনাপর্বেই মূলধারার প্রত্যাশিত কাহিনিবর্ণন থেকে সরে গিয়েছেন রায়গুণাকর। শুধু তাই নয়, মূল পরিকল্পনার সঙ্গে অসংসক্ত সেই উপকাহিনিতে দেবী অন্নদাও হারিয়েছেন তাঁর প্রাসঙ্গিকতা। বিদ্যাসুন্দরের লোকপ্রচল কাহিনিতে দেবী কালিকাই প্রধানা। তাই এই নরখণ্ডের নাম কালিকামঙ্গলও বটে। আসলে প্রথমখণ্ডের পর দেবী অন্নপূর্ণা তাঁর প্রার্থিত গুরুত্ব আর কখনো পাননি ভারতচন্দ্রের কলমে। সময়ের রাজনীতিতে দষ্ট কবির পরিপাশজাত উদ্দেশ্যমূলকতা এভাবেই কাব্য পরিকল্পনাটিকে কেন্দ্রচ্যুত করে পরস্পর অসংযুক্ত একটি বিস্রস্ত কাঠামো দান করেছে। বিদ্যাসুন্দরের সর্বভারতীয় প্রাচীন গল্পটিতে বর্ধমানের রাজবংশের প্রসঙ্গে কবি তাঁর ব্যক্তিগত প্রতিহিংসা চরিতার্থ করেছেন মাত্র। তেমনই আপতিকভাবে অন্নপূর্ণাস্তুতির অঙ্গ হলেও 'মানসিংহ' অংশের রচনার মৌল উদ্দেশ্যও হল—'কৃষ্ণচন্দ্রের পূর্বপুরুষ ভবানন্দ মজুমদারের মহিমা-কীর্তন; এমন কি অন্নদার মাহাত্ম্য বর্ণনাও নহে, কিংবা ইতিহাসেরও মর্যাদারক্ষা নহে।'[৯] আখ্যান সাহিত্যের নির্মাণ-পারিপাট্যের পক্ষে ভারতচন্দ্রীয় উদ্দেশ্যমূলকতার বহুত্ব কাব্যটিকে স্বগোত্রের অন্যান্য রচনা থেকে পৃথক করেছে। এই পার্থক্য সবসময় যে-প্রশংসনীয়, সে কথা বলা চলে না। অন্নদামঙ্গলগানের ঘোষিত উদ্দেশ্যের সমান্তরালে রাজতোষণের ও বিপর্যস্ত ব্যক্তিজীবনের প্রতিশোধের এষণা সিদ্ধ করতে গিয়ে না শিল্পে, না জীবনে— কোথাও ভারতচন্দ্র অবলম্বনীয় কেন্দ্র খুঁজে পাননি। কেন্দ্রভ্রষ্ট কালের কবির কেন্দ্রবর্জিত আখ্যান সেকালের গল্পলিপ্সু শ্রোতার পক্ষে কিন্তু কোনোভাবেই দুঃসহ ছিল না। কেননা, প্রসঙ্গাচ্যুত বিদ্যাসুন্দরের কাহিনিতে লোকলোভন আদিরস ও ঘটনাবাহুল্যের দ্রুতি সযত্নে বিন্যস্ত করেছিলেন প্রাক্-উপনিবেশের চটুল বিদগ্ধ নাগরিকতার কবি ভারতচন্দ্র। ইংরেজি চেতনা প্রতিষ্ঠার আগে পর্যন্ত এই রুচির ধারাবাহিকতা ছিল বলেই উপনিবেশের কলকাতায় জনতার কৃপাদৃষ্টিধন্য বটতলাতেও সবচাইতে বেশি কাটতি ছিল বিদ্যাসুন্দরের সর্বত্র সুলভ বইগুলির। একালের বাঙালির পাঠকস্বভাব বিকাশের একেবারে গোড়ার দিকের ইতিহাসে অন্নদাকাহিনির এই পর্বটির যে মূল্যই থাকুক না কেন, সংগঠনবাদী পাঠতত্ত্বের সৃষ্টিতে এই অংশটি কিন্তু, 'অন্নদামঙ্গল'-এর প্রতিপাদ্যের নিরিখে উদ্বৃত্ত বিবেচিত হতে বাধ্য। কাব্যের গল্পগঠনের ভেতরকার এই পূর্ণাঙ্গ ও অতিবিস্তৃত আখ্যানটি না থাকলেও অন্তত সাংগঠনিক দিক দিয়ে এই মঙ্গলকাব্যটির কোনো ক্ষতি হত না। সাংগঠনিক আখ্যানতত্ত্ব যে-অতিকাহিনির কথা বলে, সেই অতিকাহিনিতে action-এর নিগড়ে-বাঁধা পরস্পরস্পৃষ্ট উপকাহিনিগুলির

যেমন স্পষ্ট ভূমিকা থাকে, বিদ্যাসুন্দর কোনোভাবেই তা পূরণ করতে পারেনি। তাই, 'অন্নদামঙ্গাল'-এর আখ্যান বিন্যাসবিধির পর্যালোচনায় একেবারে অসংযুক্ত এই কাহিনির নিজস্ব গঠনক্রমের আলোচনা খুব বেশি প্রাসঙ্গিক হবে বলে মনে হয় না।

উনিশ শতকের বহুস্তুত 'বিদ্যাসুন্দর'-কে সাংগঠনিক কারণে একটি বহুপঠিত মঙ্গালকাব্যের শরীর থেকে ব্যবচ্ছিন্ন করতে চাইলে, তার একটু বিস্তৃত কৈফিয়তের প্রয়োজন। বিদ্যাসুন্দরের সূচনার ঠিক আগের অংশে এবং সমাপ্তির অব্যবহিত পরবর্তী অংশে মূল আখ্যানের সঙ্গো এর সংযোগের শিল্পবর্জিত কৌশলের দিকে নজর দিলে বোঝা যায় বিদ্যাসুন্দরের আকর্ষক প্রেমকথার জগত সর্বার্থেই কথাবিন্যাসের লীলা মাত্র। কাব্যের মূল 'action'-র প্রসঙ্গাচ্যুতি হিসেবে স্পষ্টত আলাদা করে না দিয়ে, কাব্যের অন্তর্গত ধারাবাহিকতায় মিশিয়ে দিতে গিয়েই ভারতচন্দ্র পাঠককে নিরবিচ্ছন্নতার বোধ থেকে ভ্রষ্ট করেছেন, আদি-অন্তে জোড়ার জোর-করা চিহ্নগুলিই প্রকট করে তুলেছে এর নিষ্প্রয়োজনীয়তাকে। বক্তা ভবানন্দের মুখ থেকে এই হৃদ্য কাহিনিটি শুনে রাজপুরুষ মানসিংহ তাঁকে পুরস্কৃত করেছেন। এই পরিতোষিক দেওয়ার ঘটনাটিও কোনোভাবেই অন্নদাকথাকে সামনের দিকে ধাক্কা দিয়ে এগিয়ে দেয়নি। ভবানন্দ যদি বিদ্যাসুন্দরের সুদীর্ঘ কাহিনির অবতারণা না করে একেবারে স্বল্প পরিসরেই অন্য কোনো কাহিনি উপস্থাপন করতেন তবে, 'অন্নদামঙ্গাল'-এর সাংগঠনিক বিন্যাসে তা একই ভূমিকা নিত। হরিহোড় বৃত্তান্তের মতোই মঙ্গালকাব্যের অন্তর্লীন জ্বালানি 'desire'-র প্রবাহে বিদ্যাসুন্দর কোনো ঢেউ তুলতে পারেনি।

এই সব যুক্তি সত্ত্বেও, বাঙালির সমালোচনাচর্চার ধারায় বিদ্যাসুন্দরের কথাবস্তু নানা সময়েই আলোচনা ও তর্কবিতর্কের মধ্য দিয়ে সুধীজনের মনোযোগ আকর্ষণ করেছে। বিশেষ করে, সমালোচনায় নীতিবাগীশতার নিগড় কাটিয়ে ওঠবার পর থেকে এই আখ্যানের মানবিক সংরাগের বর্ণিলতা ভাবুক পাঠককে মায়াগ্রস্ত করেছে। এই কাহিনিতে ভারতচন্দ্রের জীবনবাদিতার সাহিত্যিক প্রকাশ লক্ষ করে কোনো সমালোচক একথাও বলেছেন যে, 'এই কাব্যটিতে ভারতচন্দ্রের জীবনবোধের অস্ত্যর্থক দিকটি পূর্ণভাবে পাঠ করা যায়।'[১০] আখ্যানতত্ত্বের ব্যাকরণবিধিকে পাশ কাটিয়ে এই বিশেষ দৃষ্টিকোণকে অবলম্বন করলে বোঝা যায়, ভারতচন্দ্রের আত্মজৈবনিক আমিত্বের প্রকাশ এই শিল্পিত বাহুল্যটি। অবশ্য এই আমিত্বকে নিয়ে কবি এইপর্বে একটু আখ্যানগত নিরীক্ষাও করেছেন যেন। এই মঙ্গালকাব্যের কবির বহুস্তরন্যস্ত আমিত্বের পূর্বালোচিত সূত্র ধরে বলা যায়, 'বিদ্যাসুন্দর' অংশে এসে কবি-কথকের 'আমি', আখ্যান বয়নের কৌশলে, আরও একটু স্তরসম্পন্ন হয়ে উঠেছে। মঙ্গালকাব্যের কবি যতই বস্তুবন্ধ নিষ্ঠাবান 'authorial Narrator' হোন না কেন, বিপরীত প্রক্রিয়ায় প্রথানুগ আত্মকথনেই সূচিত হয় এই শ্রেণির রচনা। কবি ছন্দের বিধান মেনে নিয়ে যে-গল্প বলতে বসেন তা একেবারেই পুরালোকের সৃজিত বাস্তবের ঘটনাধারায় পূর্ণ হলেও কবি যে মাঝে মাঝেই সে কাহিনিতলে স্বয়ং উপনীত হন পূর্বে ভণিতার তালিকাতেই তা দেখেছি আমরা। গীতিকবির সত্তালীন মনোময় আমিত্বের স্পর্শমাত্র না থাকলেও,

ভারতচন্দ্রে দেখি লেখকের দুর্মর আমিত্ব, বিদ্যাসুন্দরকে গল্পের ভেতর গল্প (Story within a story device) বলতে চরিত্রকথিত গল্পের উপস্থাপনরীতিতে বা 'যৌগিক আত্মকথনের বিগর্ভিত রীতিতে একজন কথক কাহিনির অন্য ভূমিকা বা চরিত্রের আত্মকথনকে সচেতনভাবে ব্যবহার করে।'[১১] এখানে মূলকথক ভারতচন্দ্র আখ্যানের ঐতিহাসিক চরিত্র ভবানন্দ মজুন্দারের[১২] উত্তমপুরুষীয় কথনে বিদ্যাসুন্দর-কথা পরিবেশন করলেও বিদ্যাসুন্দর-অংশের ভণিতাগুলিতেও কিন্তু উপস্থিত থাকেন মূল কথক ভারতচন্দ্রই। কাজেই আখ্যানতত্ত্বের অন্যতম পথিকৃৎ যাকে বলেন 'Narrative Agent'[১৩] বিদ্যাসুন্দরের আখ্যানের ক্ষেত্রে, তার ভূমিকায় ভবানন্দ কতখানি তাৎপর্যপূর্ণ সে বিষয়ে তাত্ত্বিক সন্দেহ প্রকাশ করা যেতেই পারে। তাই, সাংগঠনিক আখ্যানতাত্ত্বিকদের মতোই ধ্রুপদী আখ্যানতাত্ত্বিকরাও 'বিদ্যাসুন্দর'-এ কিছু বিধিগত দূষ্যতা আবিষ্কার করতে পারেন অতি সহজেই। 'শুন রাজা সাবধানে পূর্ব্বে ছিল এই স্থানে/ বীরসিংহ নামে নরপতি'— এই ভাবে মানসিংহকে প্রত্যক্ষ সম্বোধনের ফলে ভবানন্দের কথক-চরিত্র যেভাবে স্পষ্ট হয়ে ওঠে বিদ্যাসুন্দরের সূচনাতে, তাকে আখ্যান-কথনের বাস্তবতার নিরিখে আগাগোড়া বজায় রাখবার সচেতনতা যেমন ভারতচন্দ্রের না-থাকাই স্বাভাবিক ছিল, তেমনি এজাতীয় আখ্যান প্রযুক্তিতে বাস্তবতাচর্চার কোনো ধারাও সে কালে গড়ে ওঠেনি। সে কারণেই মঙ্গলকাব্যের প্রতিষ্ঠিত নীতিতে এ পর্বেও মূলকথক কবিই ফিরে ফিরে আসেন ভণিতায়। ভণিতার 'আমিত্ব'-এর প্রথা মেনেই চরিত্রের অধিকার জন্মাতে পারে না কখনই, তাই, গল্পের ভেতরের যে-গল্প তার কথকেরও নেপথ্যে সুস্পষ্টভাবে জেগে থাকেন কাব্যসংসারের প্রজাপতি-কবি স্বয়ং।

চার

বিদ্যাসুন্দরের অ্যাডভেঞ্চারময় প্রণয় কিস্‌সায় মজে পাঠক যখন ভুলতে বসেছেন মঙ্গলকাব্যের গোত্রভুক্ত একটি সৃষ্টি হিসেবে 'অন্নদামঙ্গল'-এর মূলগত 'desire'টি, ঠিক তখনই তৃতীয় খণ্ডের একেবারে গোড়ায়, সমস্ত মঙ্গলকাব্যেরই মানবখণ্ডের আখ্যানগতির রহস্যবীজ উচ্চারণ করেছেন দেবী অন্নপূর্ণা : 'দুঃখ দিয়া সুখ দিলে তবে পূজা পাই।' এই অংশেই 'অন্নদামঙ্গল'-এর নরখণ্ডের যথার্থ সূচনা। এই কাহিনিকে বুনে তোলা হয়েছে সুপরিচিত ইতিহাসের চরিত্র এবং বাংলার বাস্তব মানচিত্রের ফ্রেমে। এই ইতিহাসে তথ্যভিত্তির সমর্থন কতটা রয়েছে সেই বহু আলোচিত প্রসঙ্গটি এড়িয়ে একে নিছক ইতিহাসস্পর্শ-পুষ্ট আখ্যান হিসেবে বিবেচনা করলে রায়গুণাকরের সমকালের সমাজবাস্তবতার এক অপূর্ব কাণ্ডজ্ঞানসম্পন্ন প্রয়োগ লক্ষ করি আখ্যানের কেন্দ্রগত সমস্যার প্রকৃতি নির্বাচনে। আগে, ভুবনেশ্বরের বিপর্যয়কে যেভাবে শিবপরিকর নন্দীর কণ্ঠে সাম্প্রদায়িক ভঙ্গিতে স্থাপন করে ব্যবহার করেছিলেন কবি, এখানেও সেভাবেই সাম্প্রদায়িক বিরোধ থেকেই জন্ম নিয়েছে দৈবী ইচ্ছা পূরণের প্রধান সহায়ক— ভবানন্দ মজুমদারের 'দুঃখ',[১৫] যার কৃপাসাপেক্ষ (পুরুষকার সাপেক্ষ নয়) প্রশাসনের মধ্য দিয়েই ঘটেছে এ কাব্যের সমাপ্তি। মানসিংহকে লক্ষ করে 'পাতশাহ' জাহাঙ্গীরের হিন্দুনিন্দনের কাল্পনিক বক্তৃতাটির পরিপ্রেক্ষিতে

উত্তেজিত প্রতিবাদের ফলেই পীড়িত হতে হয়েছে ভবানন্দকে। প্রথমখণ্ডের ব্যাসকাহিনিতে শৈব-বৈষ্ণবের চিরাগত দলাদলি ও কোন্দলের প্রাকৃত যুক্তিগুলিকে সাজিয়ে দিয়েছিলেন ভারতচন্দ্র আর এই অংশে নথিবদ্ধ করেছেন হিন্দু-মুসলমানের সাম্প্রদায়িকতার পেছনে কাজ করে যাওয়া অনম্য যুক্তিশৃঙ্খলাকে, পারস্পরিক উষ্মা চরিতার্থতাই যার উদ্দিষ্ট। এই বিরোধ নিরসনে যে-ভূমিকা নিয়েছেন ভবানন্দ মজুন্দার তা নিষ্ক্রিয় স্তবকারীর। সেই স্তবের ফলেই কৃপাময়ী অন্নদা যিনি মূলত আদ্যাশক্তির ঐশ্বর্যমূর্তি, তিনি আবির্ভূতা হয়েছেন শ্রীশ্রীচণ্ডীর অনুরূপ পৌরাণিক যুদ্ধের রক্তপ্লাবনের নায়িকারূপে। এর পরে সমস্তটাই ইচ্ছাপূরণের গল্প। বাদশাহ জাহাঙ্গীরের দেবীদর্শন ও তা থেকে জেগে-ওঠা ভক্তিভাব, নিজের যবনসত্তার ক্ষুদ্রতার প্রতি সচেতনতা এবং বিনয়, হিন্দুদেবতার সন্তোষ বিধানের মধ্য দিয়ে আত্মক্ষালন এই সমস্ত কল্পনাবিলাস আসলে হিন্দুর সেকালীন সমূহমনের অন্তর্গঠনের ইতিহাসকেই তির্যকভাবে তুলে ধরেছে একালের পাঠকের কাছে। এমনও হতে পারে, সমাজমুখিনতা থেকে রাজনীতিকেন্দ্রিকতায় বাঙালির মেরুবদলের দিনে দেবী-পূজনকে রাজনৈতিক ক্ষমতাধারীর আত্মরক্ষণের উপায় হিসেবে দেখিয়ে, নিজের কাব্যকে যুগানুগ মাত্রা দিতে চেয়েছিলেন রায়গুণাকর। কল্প-ইতিহাস নির্মাণের এও এক উদ্দেশ্য। ইতিহাস যে ভাবেই কল্পনার সঙ্গে অচিন্ত্যভেদাভেদের তত্ত্বে জড়িত, সে কথা জানিয়েছিলেন Hugh Brackenridge তাঁর 'Modern Chivalry'গ্রন্থে। এই বইয়ের একটি কথোপকথনে ইতিহাসের চরিত্রকে কাল্পনিক এবং উপন্যাসকে সত্য বলে নির্দেশ করেছিলেন তিনি। সেদিক দিয়ে দেখতে গেলে কল্প-ইতিহাসও আসলে ইতিহাসের কথাই বলে। কল্প-ইতিহাসের যে-জ্বালানি 'অন্নদামঙ্গল'-এর ঘটনাধারাকে দৈবকৃপার মাহাত্ম্যপ্রতিষ্ঠায় বিশেষভাবে সহায়তা করেছে, তা আসলে ইতিহাসের কোষাগার থেকেই সংগ্রহ করা।

সাংগঠনিক আখ্যানশাস্ত্র ও ধ্রুপদি আখ্যানতত্ত্বের আড়ালে বয়ে-চলা ইতিহাস ও সত্তাবোধের নিত্যবৃত্ত প্রভাবের প্রেক্ষিতে অন্নদামঙ্গল-এর পাঠপ্রস্তাবের একটি সম্ভাব্য খসড়া নির্মাণ করতে গিয়ে এই আলোচনা বস্তুত দেখতে চেয়েছে যে, অতিকাহিনির তত্ত্বগত বীজ-শরীরের চারপাশে গল্পের অনুপুঙ্খ ইত্যাদি যা-কিছু মেদমাংসের মতো জমে উঠে আখ্যানের লাবণ্য ফোটায় ভারতচন্দ্রের অভিনিবেশ বার বার সে দিকে ধাবিত হওয়ায় এই কাব্যে ক্লাসিকাল আদ্যমধ্যান্তবিশিষ্ট ধারাবাহিক ঘটনাপ্রবাহ পাঠের সুস্বাদ একালের পাঠক পাবেন না। কখনো রাজসভার আবার কখনো জনসভার মনোরঞ্জন করতে করতে তিনি একদিকে যেমন বিদ্যাসুন্দরের মতো অ-সংলগ্ন সুবিস্তৃত আখ্যান বর্ণনা করেছেন দ্বিতীয়

খণ্ডে, তৃতীয় খণ্ডে তেমনই সামান্যতম প্রসঙ্গের অবকাশ তৈরি করে নিয়ে কবি অবতারণা করেছেন—গঙ্গাপ্রসঙ্গ, রামায়ণকথা ইত্যাদির মতো প্রয়োজনহীন আখ্যানাংশেরও। মনে হয় পাঠকমুখী পপুলার সাহিত্য পরিবেশনের একটা যুগোচিত আদল তৈরি হতে শুরু করেছিল ভারতচন্দ্রের সময় থেকেই। ধ্রুপদী সংগঠনের কৌলীন্যকে তাই আদৌ পাত্তা দেননি আজীবন কেন্দ্র বদলাতে থাকা এই রাজসভার ভাগ্য-বিড়ম্বিত কবি। যার ফলে পদে পদে প্রসঙ্গচ্যুত হয়ে মঙ্গলকাব্য গঠনের প্রভুসম্মিত পরম্পরাকে পদানত করে যে-কাব্যশরীর তিনি নির্মাণ করলেন সে-কাব্যের 'নৌতন মঙ্গল' হয়ে-ওঠার জন্য দায়ী বিশেষত্বপুঞ্জ সবসময় প্রশংসাসূচক হয়নি। অভিনব মানেই গুণপনাযুক্ত এমন মনে করাটা সমালোচনার ক্ষেত্রে বাঙালির দীর্ঘচর্চিত সাংস্কৃতিক অভ্যাস। এ প্রসঙ্গে একটু নির্মোহ হয়ে বিবেচনা করলেই বোঝা যায় 'অন্যরকম' মানেই উচ্চতর কিছু এই সিদ্ধান্তটিই অতিসামান্যীকরণের দোষে দুষ্ট। এই প্রথাবদ্ধ চিন্তার পথ থেকে একটু দুঃসাহসী হয়ে সরে দাঁড়ালে এ কথা মেনে নিতে অসুবিধা হয় না যে, একমাত্র বিষয়বস্তুর অনন্যপূর্ব নির্বাচনটুকু ছাড়া 'অন্নদামঙ্গল'কে 'নৌতনমঙ্গল' রূপে বিজ্ঞাপিত করবার মধ্যে কবির যে-আত্মশ্লাঘা মিশে আছে তা প্রাপ্ত কাব্যটির গঠনগৌরবের সঙ্গে সমানুপাতিক নয়। আখ্যানের কোলাজ নির্মাণের ভারতচন্দ্রীয় কৌশলের মধ্যবর্তিতায় প্রসঙ্গচ্যুতির প্রশংসার পথ ধরে উত্তরকালের আমপাঠকের প্রসাদধন্য যে-যুগশৈলীর জন্ম হচ্ছিল ভারতচন্দ্রের কলমে, মঙ্গলকাব্যের গড়পড়তা আখ্যান পারিপাট্যের ধারায় তা অনেকটাই বিসদৃশ— এই বৈসাদৃশ্য আরামদায়ক নয়। পাঠক যদি রায়গুণাকরের আত্মজৈবনিক তথ্য না-ও জানেন, তবু পুরাণ-প্রসঙ্গের নিখুঁত সাঙ্গীকরণ, শব্দযোজনা ও সংস্কৃতছন্দের অনুসরণ তাঁর ধ্রুপদি সংস্কৃত সাহিত্যে দীক্ষার কথা জানিয়ে দেয়। সেই পাঠ-অভিজ্ঞতা সত্ত্বেও কবি যে, শিথিল-বিন্যস্ত কাব্য পরিবেশন করেছেন তা জনরুচির অনুগত হওয়ারই পরিণাম মনে করি আর ঠিক সেই কারণেই, আখ্যানের অন্তরে অনুস্যূত এবং দেবীকণ্ঠে বিঘোষিত ঐশী desire, কবির কল্পনার সামনে সারি দিয়ে জড়ো হওয়া আসরপ্রেমিক জনতার desire-এর চাপে প্রত্যাশিত তীব্রতা ও প্রতিষ্ঠা লাভ করতে পারেনি। সংগঠনের অপ্রথানুগতা অন্নদা-আখ্যানকে এক চির অমীমাংসিত স্থানাঙ্কে বেপথু করে রেখেছে।

সূত্রনির্দেশ ও মন্তব্য

১। অন্নদা অষ্টাহগীত রচিবারে নিয়োজিত
কৈলা রাজা কৃষ্ণচন্দ্র রায়।
দ্র. ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় সজনীকান্ত দাস (সম্পাদিত), ভারতচন্দ্র গ্রন্থাবলী, বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ, তৃতীয় সং, কলকাতা ১৩৬৯ পৃ. ৩৪৯

২। Susie Tharu, Oral History, Narrative Strategy, and the figures of Autobiography (প্রবন্ধ)
দ্র. Sudhakar Marathe, Meenakshi Mukherjee (ed), Narrative : Forms and

transformations, Chanakya Publications, Delhi, p. 181

৩। আশুতোষ ভট্টাচার্য, বাংলা মঙ্গলকাব্যের ইতিহাস, দশম পুনর্মুদ্রণ, এ মুখার্জী অ্যন্ড কোম্পানি প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা ২০০২, পৃ. ৮২৩

৪। ভারতচন্দ্র গ্রন্থাবলী, পূর্বোক্ত, পৃ. ১১

৫। Jonathan Culler, Structuralist Poetics : Structuralism, Linguistics and the Study of literature, Routledge & Kegan Paul, London, p. 215-26

৬। ibid, p. 208 (Quoted)

৭। পরিভাষাগুলির অনুবাদের জন্য এবং সংগঠনবাদী বিশ্লেষণের বিষয়ে মূল্যবান আলোচনার জন্য ফ্রাঁস ভট্টাচার্যের ‘ঠাকুরমা ও ঠাকুরদাদার ঝুলি : একটি পাঠ’ প্রবন্ধটি পঠনীয়। দ্র. ফ্রাঁস ভট্টাচার্য, রবীন্দ্রনাথ ও মোপাসাঁ ও অন্যান্য প্রবন্ধ, এবং মুশায়েরা, কলকাতা, ২০১১, পৃ. ৫৫-৮১

৮। Evelyn Birge Vitz, Medieval Narratives and Modern Narratology : Subjects and Objects of Desire. New York University Press, USA, 1989, p. 3

৯। আশুতোষ ভট্টাচার্য, পূর্বোক্ত গ্রন্থ, পৃ. ৮২৪

১০। ক্ষেত্র গুপ্ত, প্রাচীন কাব্য : সৌন্দর্য জিজ্ঞাসা ও নবমূল্যায়ন, তৃতীয় পরিবর্তিত সংস্করণ, পুস্তক বিপণি (পরিবেশক), ১৪০৮ বঙ্গাব্দ, পৃ. ২০৬

১১। অমিতাভ দাস, আখ্যানতত্ত্ব, ইন্দাস, ২০১০, পৃ. ৮৫

১২। ভবানন্দ মজুন্দার ইতিহাসসম্মত কিনা সে-নিয়ে ঐতিহাসিকদের মনে সংশয় রয়েছে। তবে, ভারতচন্দ্র তাঁকে ঐতিহাসিক চরিত্র হিসেবেই প্রত্যয়ের সঙ্গে ব্যবহার করেছেন, তা না হলে উত্তরপুরুষ রূপে রায়গুণাকরের পৃষ্ঠপোষক রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের গৌরবের দাবিটাই ভিত্তিহীন হয়ে পড়ে। এ বিষয়ে আলোচনা পাওয়া যাবে অধ্যাপক ভবতোষ দত্ত লিখিত ‘কবি ভারতচন্দ্রের জীবনে ও কাব্যে ইতিহাস প্রসঙ্গ’ প্রবন্ধে।
দ্র. আলপনা রায়, সোমেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় (সম্পাদিত), উপেন্দ্রকুমার দাস স্মরণে, দে’জ পাবলিশিং (পরিবেশক), কলকাতা, ২০১০, পৃ. ১২৯

১৩। অমিতাভ দাস, পূর্বোক্ত, পৃ. ৬৯

১৪। ভারতচন্দ্র গ্রন্থাবলী, পূর্বোক্ত গ্রন্থ, পৃ. ২৯১

১৫। অতিকাহিনি বা Meta tale-এর নিরূপণে action, suffering ইত্যাদি বিষয়গুলোকে গুরুত্ব দিয়ে একটা ধারাবর্তী পৃথক সাহিত্যের মধ্যে গঠনিক সম্পর্ক স্থাপন করার পদ্ধতিটি একেবারে স্বতন্ত্রভাবে স্বতন্ত্র পরিপ্রেক্ষিতে আবিষ্কার করেছিলেন রবীন্দ্রনাথ। সমাজ পরিবর্তনের নৃতাত্ত্বিক দ্বান্দ্বিকতার নিরিখে তিনি সব মঙ্গলকাব্যের আখ্যানকে কীভাবে একই বিন্যাসবিধির সূত্রে পাঠ করতে চেয়েছিলেন তার প্রমাণ মিলবে ‘বাতায়নিকের পত্র’-সহ আরো কিছু রচনায়।

অন্নদামঙ্গাল : 'নৌতুন মঙ্গাল'

দেবারতি মল্লিক

বাংলা মঙ্গলকাব্যের ইতিহাসে রায়গুণাকর ভারতচন্দ্র সার্থক কবিমাত্র নন, নতুনতর দৃষ্টিভঙ্গির ব্যাখ্যাকারও। তাঁর 'অন্নদামঙ্গল' কাব্যটি মঙ্গলকাব্যধারায় ব্যতিক্রমী। ভাব ও ভাবনায়, চিন্তা ও চেতনায়, আঙ্গিকে ও শব্দনির্মাণ কুশলতায় 'অন্নদামঙ্গল' মধ্যযুগের কাব্যভুবনে স্বতন্ত্র। কবি হিসেবে ভারতচন্দ্র বহুজনের সঙ্গে তুলনীয় হয়েও একক। তিনি অনেকখানি দুঃসাহসিক, সমাজসচেতন কবি। সময় সচেতনও। সমাজের নানাবিধ অসংগতি, অবক্ষয়, অমানবিকতা তাঁকে স্পর্শ করেছিল। অসুস্থ কালবেলার ক্ষয়রোগ দেখে আতঙ্কিত হয়েছিলেন তিনি। আত্মতৃপ্তি অনুভব করতে পারেননি বলে এই সত্যে অবিচল ছিলেন দেবতার নয়; মানুষের ভাগ্য পরিবর্তন করবার জন্যে মানুষকেই সচেতন হতে হবে। মঙ্গলকাব্যের কবি হয়েও ভারতচন্দ্র ছিলেন যুগসচেতন। তাঁর অন্নদামঙ্গলে অতীতযুগের ঐতিহ্য, বর্তমানের সংশয় ও ভবিষ্যতের পরিবর্তনমুখী প্রগতিশীল যুক্তি-বুদ্ধির একত্র সমাবেশ লক্ষ করা যায়। তিনি ছিলেন মঙ্গলকবিদের সৃষ্ট ঐতিহ্যধারার উত্তরসূরী ও আধুনিক মানবতাবাদী কবিদের যথার্থ পূর্বসূরী অর্থাৎ প্রবীণ ও নবীনের দ্বিবিধ লক্ষণ ভারতচন্দ্রের অন্নদামঙ্গলকে নতুনত্ব দান করেছে।

আলোচনা : ১

ঐতিহ্যের রক্ষণ

১. দেবী-মাহাত্ম্য কীর্তন : ত্রয়োদশ শতক থেকে অষ্টাদশ শতক পর্যন্ত যে দেব-মাহাত্ম্যমূলক কাব্যসমূহে অলৌকিক শক্তিসম্পন্ন ও মঙ্গলবিষয়ক দেব-দেবীর আখ্যান কাহিনি রচিত হয়েছিল সেই কাব্যসমূহের সাধারণ অভিধা হল 'মঙ্গলকাব্য'। 'অন্নদামঙ্গল' কাব্যে দেবী অন্নদার মাহাত্ম্য কীর্তিত হয়েছে। ক্ষুধার্ত ও পীড়িত মানুষকে তিনি অন্ন ও সাহস যোগান। বসুন্ধরাকে ধন-ধান্যে-পুষ্পে ভরিয়ে রাখেন। মঙ্গলকবিরা যেমন কাব্যনামের সঙ্গে যুক্ত দেবদেবীদের বন্দনা ও মাহাত্ম্য প্রচার করেছেন; কবি ভারতচন্দ্রও অনুরূপে লিখেছেন— "আগম পুরাণ বেদ/না জানে তোমার ভেদ/তুমি দেবী পুরুষ প্রধান।" 'বিধি বিষ্ণু ত্রিলোচন/আদি দেব ঋষিগণ' দেবী অন্নদার গুণগান কীর্তন করেন। তাঁর আশীর্বাদে—

১. সমস্ত দারিদ্র্য, শারীরিক-মানসিক-আর্থিক দুর্গতি ও সমস্ত বিপত্তি দূরীভূত হয়।
২. দেবী অন্নদার কৃপায় ভক্তের গৃহ অন্নে পূর্ণ হয়।
৩. রাজা বা প্রশাসকের সর্বাঙ্গীণ মঙ্গল হয়।

৪. প্রজাদের যাবতীয় সংকট; আপদ-বিপদ কেটে যায়।

৫. দেবীর প্রশস্তি-কীর্তনকারী বা গায়কের মনের বাসনা পূরণ হয়।

২. মঙ্গলকাব্যের প্রথাগত বৈশিষ্ট্য : প্রত্যেক সাহিত্যকৃতি সুনির্দিষ্ট কতকগুলি বৈশিষ্ট্যের পরিপ্রেক্ষিতে অন্য সাহিত্যকৃতি থেকে পৃথক রূপ ধারণ করে। এই পার্থক্যের কারণ বিষয়বস্তুগত ভিন্নতা। মঙ্গলকাব্যেরও এমন কতকগুলি শরীরী-সত্তা রয়েছে, যার ফলে মধ্যযুগের অন্যান্য কাব্য থেকে মঙ্গলকাব্য পৃথক। 'চণ্ডীমঙ্গল', 'মনসামঙ্গল', 'শিবমঙ্গল' 'শীতলামঙ্গল', 'রায়মঙ্গল' প্রভৃতি কাব্যগুলির কতকগুলি নির্দিষ্ট সূত্র থাকে। যেমন—

১. গণেশ, শিব, সূর্য, বিষ্ণু, কৌশিকী, লক্ষ্মী, সরস্বতী প্রমুখ দেব-দেবীর বন্দনা।

২. গ্রন্থোৎপত্তির কারণ বর্ণনা।

৩. হর-গৌরীর পারিবারিক সুখ-দুঃখানুভূতিপূর্ণ জীবনযাপন প্রণালীর বিবরণ।

৪. বিবাহাচারের বিস্তৃত বিবরণ।

৫. সপত্নী বিদ্বেষ ও সতীন কোন্দল ইত্যাদি।

মঙ্গলকাব্যের এই বৈশিষ্ট্যগুলি, মূলত যা পুচ্ছকারিতা, তা 'অন্নদামঙ্গল' কাব্যেও বৈচিত্র্য-হীনভাবে এসেছে।

৩. আদেশ, উপদেশ ও স্বপ্নাদেশ : আদেশ, উপদেশ ও স্বপ্নাদেশ প্রসঙ্গটি মঙ্গলকাব্যে এসেছে একই উদ্দেশ্যের তিনটি কাব্যকৌশল রূপে। মূল উদ্দেশ্য ছিল পূজা আদায় করা। এই উদ্দেশ্যকে বাস্তবায়িত করবার মাধ্যম তিনটি— ১. আদেশ, ২. উপদেশ, ৩. স্বপ্নাদেশ। কবি মুকুন্দ চক্রবর্তীর 'অভয়ামঙ্গল' কাব্যানুযায়ী দেখা যায়—

১. আদেশ : দেবী চণ্ডীর নির্দেশ ছিল কবি মুকুন্দ চক্রবর্তী চণ্ডীর মাহাত্ম্যমূলক কাব্য রচনা করুক।

২. উপদেশ : কালকেতু বন কেটে গুজরাট নগর পত্তন করুক।

৩. স্বপ্নাদেশ : অঙ্গুরীয়ের যথার্থ মূল্য দেওয়ার জন্যে মুরারি শীলকে স্বপ্নাদেশ; যার মূল বক্তব্য কালকেতু প্রাপ্য অর্থ লাভ করুক।

৪. আকাশবাণী: কালকেতুকে মুক্ত করার জন্যে কলিঙ্গরাজের প্রতি আকাশবাণী; কলিঙ্গরাজ যেন কালকেতুকে গুজরাট নগরে প্রতিষ্ঠিত করেন।

প্রতিস্পর্ধী শক্তির কাছে দেবসমাজ যখন পরাভূত তখন তাঁকে আদেশ, উপদেশ, স্বপ্নাদেশ কিংবা আকাশবাণীর শরণাপন্ন হতে হয়। আর তার প্রভাবে অবচেতন মনে বিকাশপ্রাপ্ত কোনো বিষয় স্বপ্নাদেশরূপে প্রকাশিত হয়। 'অন্নদামঙ্গলকাব্য'-তেও এই স্বপ্নাদেশ প্রসঙ্গ এসেছে—

স্বপনে রজনীশেষে বসিয়া শিয়রদেশে
কহিলা মঙ্গল রচিবারে।

সেই আজ্ঞা শিরে বহি নূতন মঙ্গল কহি
পূর্ণ কর চাহিয়া আমারে॥

৪. দেবীর রূপ ও বেশ-বদল : দেবীর জরতী বা বৃদ্ধার বেশধারণ ও রূপবদল করা বহু আলোচিত একটি বিষয়। 'অন্নদামঙ্গল' কাব্যে দেখা যায়, দেবী অন্নদা জরতীবেশে যাত্রা করেছেন ব্যাসকে ছলনা করতে—

মায়া করি মহামায়া হইলেন বুড়ী।
ডানি করে ভাঙ্গা লড়ি বাম কক্ষে ঝুড়ি॥

ব্যাসদেব দেবী অন্নদার মোহিনীমায়া অনুধাবনে ব্যর্থ হয়ে শেষে তাঁর নির্মিত কাশীর নিষ্ফল অমরতাকে প্রমাণ করলেন—'গর্দ্দভ হইবে বুড়ী এখানে যে মরে।' আবার ভবানন্দ-ভবনে যাত্রা করবার সময় অন্নদা এমনভাবে বেশ বদল করেছিলেন যে, সহজ-সরলা পল্লিবাংলার লোকায়ত নারী ঈশ্বরী পাটনীর মনে হয়েছে—মেয়েটি কোন্দলপরায়ণ কুলীন ঘরের কোনো বধূ। পাটনী জানিয়েছে—

পাটুনী বলিছে আমি বুঝিনু সকল।
যেখানে কুলীন জাতি সেখানে কোন্দল॥

৫. দেব-দেবীর অভিশাপ ও স্বর্গভ্রষ্ট হওয়া : কুবেরের অনুচর বসুন্ধর-পত্নী বসুন্ধরা দেবী অন্নদার জন্যে সংগৃহীত পুষ্প নিজেদের কাজে লাগালে ক্রোধান্বিতা দেবী তাদেরকে অভিশপ্ত করলেন। ফলে দেবী অন্নদার শাপে বসুন্ধর হরিহোড় নাম নিয়ে ভূমিষ্ঠ হলেন। স্বর্গভ্রষ্ট দেবতাদের মানবশিশুরূপে ভূমিষ্ট হওয়ার বিষয়টি মঙ্গলকাব্যের কায়া গঠনের অন্যতম উপাদান। ভারতচন্দ্র এই বিষয়টিকেই পুনরাবৃত্ত করেছেন।

৬. হরগৌরী কাহিনির বিশদ বিবরণ : মঙ্গলকাব্যের দেবখণ্ডে হর-পাবর্তীর কাহিনিকে লৌকিক ভাবমণ্ডলে পরিবেশন করেন মঙ্গলকবিরা। হর-পার্বতীর কাহিনিসূত্রে লক্ষ্ম ী-গণেশ, সরস্বতী-কার্তিকের আগমন। আবার হরের সূত্রে গঙ্গা ও মনসার আগমন ঘটে থাকে কোথাও। যেমন, প্রথম ক্ষেত্রে 'অন্নদামঙ্গল' এবং দ্বিতীয় ক্ষেত্রে বিজয় গুপ্তের 'পদ্মাপুরাণ' কাব্যের কথা স্মরণীয়।

আলোচনা : ২

নব-ঐতিহ্যের পত্তন

মঙ্গলকাব্যের ধারাবাহিক পুচ্ছগ্রাহিতার প্রতি প্রচণ্ড অনীহা ভারতচন্দ্রের শিল্পীচিত্তকে সংহতি দান করেছিল। সংশয়, জিজ্ঞাসা, যুক্তি তাঁর ব্যক্তিমানসকে ধর্মীয় অনুশাসনের মধ্যে বন্দি করতে পারেনি। দেবতার মিথ্যাস্তুতি করা তাঁর স্বভাবধর্ম নয়। এই কবি সুস্থির মানসিকতা হারিয়েছিলেন যুগের বিক্ষিপ্ত পদচারণার ফলে। তাঁর শিল্পীমনের গভীরে প্রোথিত ছিল সত্যান্বেষী প্রজ্ঞাবান এক বিচারক। ফলে রায়গুণাকর ভারতচন্দ্র ঐতিহ্য আত্তীকরণের পাশাপাশি উত্তরপুরুষ কবিদের সামনে নব-ঐতিহ্যের পত্তন করেছিলেন।

১. কাহিনি নির্বাচনে কবির মৌলিকতা : কথাসাহিত্য বা নাট্যসাহিত্যে কাহিনি নির্বাচন সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। প্লেটো-শিষ্য অ্যারিস্টটল বৃত্ত বা প্লটকে বলেছিলেন কাব্যের আত্মা। কাব্যের আত্মা হিসেবে কাহিনির গুরুত্ব অদ্যাবধি সর্বাধিক তাৎপর্যপূর্ণ। মঙ্গলকাব্য-সমূহের মূল প্রতিপাদ্য বিষয় হল দেবসমাজের সঙ্গে মানবসমাজের স্বার্থ-পূরণের দ্বন্দ্ব ও পরিণামে দেবসমাজের বিজয় ঘোষণা। কিন্তু ভারতচন্দ্র এই 'সিম্পল প্যাটার্ন' (simple pattern) থেকে সরে এলেন। তিনি দেবতার সঙ্গে মানুষের সম্পর্ক খাদক-খাদ্যের পর্যায়ে দাঁড় করালেন না। অষ্টাদশ শতকের দুর্ভিক্ষ ও মন্বন্তরে দেবী কখনও সুখ ও শান্তি প্রত্যাশা করতে পারেন না, সর্বস্বান্ত প্রজাদের কাছ থেকে পূজা আদায়ের জন্যে রুদ্র মূর্তিতে দাঁড়িয়ে অযথা যন্ত্রণা দিতে চান না। বরং ক্ষুধিত ও দুর্ভিক্ষ পীড়িতকে তিনি অন্নদানে অকুণ্ঠ থাকেন। অহংকারীর অকারণ গর্ব (ব্যাস) নাশ করেন; অন্নহারার (ঈশ্বরী পাটনী) পরিবারকে অন্নদানের প্রতিশ্রুতি দেন।

২. চরিত্র চিত্রায়ণ

২.১ 'অন্নদামঙ্গল'-এর শিবকে ভারতচন্দ্র অনার্য সংস্কার তথা লোকসমাজের চেনা-জানা জীবন থেকে গ্রহণ করেছেন। এই শিব কামজ প্রবৃত্তির দ্বারা বশীভূত। একাধিক পত্নী ও সন্তান-সন্ততি নিয়ে তাঁর দারিদ্র্যের সংসার। তিনি দেবসমাজে প্রভাব-প্রতিপত্তিহীন। নিজের কর্মহীন জীবনের আর্থিক সহায়-সম্বলহীনতার জন্যে স্ত্রীকেই দোষী করেন—

কিবা শুভ ক্ষণে হৈল অলক্ষণা ঘর।
খাইতে না পানু কভু পূরিয়া উদর॥

২.২ রবীন্দ্রনাথ দেবী চণ্ডীর বাৎসল্যের পরিণতি দেখতে পেয়েছিলেন অন্নদা চরিত্রের মধ্যে। ভারতচন্দ্রের অন্নদা আত্মমর্যাদাবোধসম্পন্ন বাঙালি বধূ। কোনো ঈর্ষা, রাগ-দ্বেষ তাঁর নেই বরং প্রসন্নময়ী তিনি। কৌতুকপরায়ণা ও শুভঙ্করী তিনি। সমদৃষ্টির অধিকারিণী। একই সঙ্গে দর্পনাশিনী। আবার অন্নদাত্রী অন্নদা।

প্রতি ঘরে ফিরি ভিক্ষা নাহি পায় যেই।
অন্নপূর্ণা বিনা তারে অন্ন কেবা দেই॥

২.৩ গঙ্গা অনেকাংশই ব্যক্তিত্বশালিনী। কিন্তু মুখরা। শিব সম্পর্কে গর্বিণী।

২.৪ ব্যাস মোহাচ্ছন্ন, অসহিষ্ণু ও অনুদার। তিনি শাস্ত্রজ্ঞানী অথচ ভেদবুদ্ধিসম্পন্ন। ধর্মীয় আনুষ্ঠানিকতাকে সর্বাধিক গুরুত্ব দিতে ব্যস্ত। অনেকখানি আদর্শচ্যুত ও অহংকারী।

২.৫ ঈশ্বরী পাটনী জীবনপ্রেমিক। সে স্বপ্নদর্শী নয়; বস্তুবাদী। প্রকৃতই নির্লোভী। চরম অভাব-অনটনের মধ্যে থেকেও প্রবল আত্মসচেতন। সন্তান সম্পর্কে সচেতন; তবে সুবিধাভোগী নয়। অল্পে আত্মতুষ্ট থাকার মতো মানসিক দৃঢ়তা ও ঔদার্য তার ছিল।

ভারতচন্দ্র মাটির কাছাকাছি মানুষের কথা বলেছেন। দেবতাকে লৌকিক চরিত্রের পর্যায়ে এনেছেন, তবে হেয় করেননি, বিশ্বস্ত করেছেন। দেবতা ও মানুষ এই প্রথম একই সঙ্গে ধূলিময় ধরণীতে পদচারণা করেছেন।

৩. আধুনিক জীবনজিজ্ঞাসা : শিল্পীর 'personality' প্রকাশ পায় তাঁর সৃষ্টির মধ্যে।

হার্বাড রীড প্রত্যাশা করেন 'What we may really expect in a work of art is a certain personal elements.' যখন কাব্যের ক্ষেত্রে 'realities of life' একান্তই প্রয়োজন, তখন অযথা কালবিলম্ব কেন। ভারতচন্দ্র বস্তুনিষ্ঠ জীবন-অভিজ্ঞতাকে বাস্তবায়িত করতে চাইলেন, করলেনও। কিন্তু মঙ্গলকাব্যের ভক্তিরসের বিস্তৃত ক্ষেত্রে তা কীভাবে সম্ভব! যেখানে আশ্রয়দাতা কৃষ্ণচন্দ্রের আদেশ ও দেবী অন্নদার আজ্ঞা মানতেই হবে, ভারতচন্দ্র সেখানে বিকল্প পথের অন্বেষণ করলেন। তিনি প্রাচীনের নবীকরণ করলেন। প্রচলিত ঐতিহ্যের শাসনকে অস্বীকার করে নতুন ঐতিহ্যকে প্রতিষ্ঠিত করার মতো সক্ষমতা তাঁর ছিল। বাস্তব জীবনপ্রত্যয়, নৈরাশ্য, হতাশা, ব্যঙ্গপ্রবণতা, শ্লেষ, মানবতা, কাব্যশৈলীতে পরিবর্তন—ভারতচন্দ্রে লক্ষ করা গেল। তবে তা সূক্ষ্মভাবে; অস্পষ্টাকারে। মন্বন্তর, দুর্ভিক্ষ, রক্তপাত, হানাহানি, বিদ্রোহ সবকিছুকে দেব-দেবীর ইচ্ছার ফল না ভেবে তাকে যুক্তির আলোকরাশিতে বিচার করতে চেয়েছেন তিনি। অধ্যাপক বিমলকুমার মুখোপাধ্যায় ভারতচন্দ্র সম্পর্কে যথার্থই বলেছেন—

> সংশয় ও জিজ্ঞাসা তাঁকে মধ্যযুগের দেবাশীর্বাদপূত নীরন্ধ্র ভক্তিপ্রাকারে সন্দেহের চোরা লণ্ঠন নিক্ষেপে উত্তেজিত করেছিল।[৩]

ভারতচন্দ্রের সংশয়ী মন উপলব্ধি করেছিল রাষ্ট্রীয় সংঘাত ও বিপর্যয়ের কালে উচ্চ-নীচ, ধনী-নির্ধন কেউ-ই রক্ষা পায় না। সমাজ-সংস্কার অনুযায়ী দেবতার কৃপাদৃষ্টির প্রতি অযথা বিশ্বাস আরোপিত হলে ভারতচন্দ্র প্রশ্ন উত্থাপন করেন 'নগর পুড়িলে কি দেবালয় এড়ায়?' শ্লেষ-বক্রোক্তি অলংকারে রাখা এ প্রশ্নে ভারতচন্দ্র স্পষ্টই জানিয়ে দেন, নগর যদি দগ্ধ হয়, তবে দেবালয় বাদ যায় না। এই শ্লেষাত্মক ছুরিকাঘাত ভারতচন্দ্রের রচনাশৈলীর অনন্যতাকে প্রমাণিত করে।

৪. **যুগের প্রতিচ্ছবি :** স্বদেশ ও সমকাল সম্পর্কে মঙ্গলকাব্যের কবিদের মধ্যে বিস্ময়করভাবে সচেতন ছিলেন কবি ভারতচন্দ্র। বস্তুত, রচনাকাল ও রচয়িতার মধ্যে পিতা-পুত্রের সম্পর্ক যেন। দেশ-কালকে উপেক্ষা করতে পারেন না স্রষ্টা কিংবা শ্রোতা, রচয়িতা কিংবা রসভোক্তা—কেউই। সমাজজীবনের ভাঙনের ছবি আঁকতে হয় স্রষ্টাকে, মঙ্গলকাব্যের কবিদের মধ্যে ভারতচন্দ্র এই দুর্লভ কর্মটি করলেন এবং তা সার্থকভাবে।

পরিবর্তনোন্মুখ রাষ্ট্রব্যবস্থায় ভারতচন্দ্র প্রত্যক্ষ করেছিলেন রাজানুকূল্যে অথবা রাজা ও ঈশ্বরের থেকেও সেই সময়ের শক্তিশালী শ্বেতাঙ্গবণিকের কৃপায় অযোগ্য ব্যক্তিও সৌভাগ্যের শীর্ষে উঠেছেন। হতদরিদ্র ব্যক্তি রাতের অন্ধকার শেষ না হতেই পরিণত হয়েছে ধর্নাঢ্য ব্যক্তিতে। নবাবী শাসনের ভগ্নস্তূপে দাঁড়িয়ে প্রথমে মারাঠা, পরে ইংরেজরা লুঠেরার ভূমিকা নিয়েছে। প্রাক্তন নবাবী শাসন ও নব্য ইঙ্গ-বঙ্গ বাবুদের সঙ্গে বিরোধ, ধর্মের মধ্যে পারস্পরিক বিরোধ, বিলাস-বিশৃঙ্খলা, পীড়ন-নিধন ও মানসিক অবনমন সমাজদেহকে তখন পঙ্গু করেছিল। ভোগবিকৃতির কুশ্রীতা, জীবনের অন্তঃসারশূন্যতা, ভারতচন্দ্রকে ভাবালুতার চোরামোহ ত্যাগে অনুপ্রাণিত করে। ভারতচন্দ্র এই মর্মান্তিক সত্য উপলব্ধি করেন—"বড়র পিরিতি বালির বাঁধ।/ ক্ষণেকে হাতে দড়ি ক্ষণেকে চাঁদ॥"

৫. কাব্যদেহ সম্পর্কিত বক্তব্য : অপূর্ববস্তুনির্মাণ-ক্ষমতা, বামনাচার্য যাকে বলেছেন 'কবিত্ববীজ', সেই কবিত্ববীজের অধিকারী ব্যক্তিই পারেন বর্ণনীয় বিষয়কে 'মানসপ্রত্যক্ষ' করাতে। আর যদি তা সম্ভব হয়, তাহলে সেই ব্যক্তি নিঃসন্দেহে কান্ট বর্ণিত 'genius', আর 'genius' ব্যক্তির মৌলিক সম্পদ হল তাঁর 'originality'—'Hence originality must be its first property'[৪] এই 'ওরিজিন্যালিটি' যাকে চিহ্নিত করা যায় 'প্রগতিলক্ষণাক্রান্ত মৌলিকতা' রূপে, তা ভারতচন্দ্রের ছিল। ভারতচন্দ্র মঙ্গলকাব্যধারার প্রথম কবি, যিনি পণ্ডিতদের অনুসরণ করে জানিয়েছিলেন—'যে হৌক সে হৌক ভাষা কাব্যরস লয়ে।' কাব্যরসের এই যে মাহাত্ম্য ভারতচন্দ্রের মুখে উচ্চারিত, তা পরবর্তীতে রবীন্দ্রনাথও স্বীকার করেছেন। 'সাহিত্য দর্পণ' প্রণেতা বিশ্বনাথ কবিরাজ রসাত্মক বাক্যকেই কাব্য বলে উল্লেখ করেছেন—'কাব্যং রসাত্মকং বাক্যং'। 'ইন্দ্রিয়-প্রত্যক্ষ' বক্তব্যই কবির অভিপ্রেত। কবি ভারতচন্দ্র যখন লেখেন—

কমল পরিমল লয়ে শীতল জল
পবনে ঢলঢল উছলে কুলে।
বসন্ত রাজা আনি ছয় রাগিনী রানী
করিলা রাজধানী অশোক মূলে॥

তখন অসাধারণ চিত্ররূপময়তা অনুভূত হয়। প্রয়োজনমত শব্দ-প্রয়োগে বিশ্বাসী ভারতচন্দ্র বলেন—

না রবে প্রসাদগুণ, না হবে রসাল।
অতএব কহি কথা যাবনী মিশাল॥

যে ভারতচন্দ্র সংস্কৃত, আরবি, ফারসি ভাষায় পণ্ডিত, তাঁর পক্ষে ইচ্ছেমত কাব্যদেহ সজ্জিত করা সহজসাধ্য। কডওয়েল ছন্দ-তরঙ্গিত কাব্যভাষার কথা বলেছিলেন, যে

'ভাষায় যৌথ জীবনের ছাপ পড়ে।'[৫] কডওয়েল জানান, 'The language of collective speech, is the language of public emotion'[৬] যৌথ জীবনের আবেগময়তাকে প্রকাশ করতে ভারতচন্দ্র 'যাবনী মিশাল' ভাষার কথাও উল্লেখ করেছেন।

৬. নির্মল হাস্যরস : কোনো ব্যঙ্গের উদ্দেশ্যে নয়, তবে আদিরসের উপস্থিতিতে হাস্যরসের একচ্ছত্র ছাড়পত্র দিলেন ভারতচন্দ্র। নাট্যকার, বিশেষ করে প্রহসন-নির্মাতা, বিশেষত যদি Satirist হন, তাহলে নির্মম শল্যচিকিৎসকের ভূমিকায় হাস্যরসের মধ্যে বিদ্রুপের অস্ত্রাঘাত করেন তিনি। কিন্তু একজন সংবেদনশীল কবি ততখানি অনুদার হন না। তাঁকে মঞ্চসাফল্য সম্পর্কে ভাবতে হয় না বলে ততখানি নির্মমতা প্রকাশ না করলেও চলে। ভারতচন্দ্র নাগরিক বাগবৈদগ্ধ্যের অধিকারী শূন্যগর্ভতাকে আঘাত করেছেন; কিন্তু Satirist- এর মতো Humour-এর বিশুদ্ধতাকে নষ্ট করে দিয়ে নয়। বৃদ্ধ থেকে শিশু— প্রত্যেককে হাসানোর প্রচ্ছন্ন দায়িত্ব যেন তিনি নিয়েছেন। 'শিবের ভিক্ষা যাত্রা' বর্ণনায় ভারতচন্দ্র লিখেছেন—

কেহ বলে ওই এল শিব বুড়া বাপ।
কেহ বলে বুড়াটি খেলাও দেখি সাপ॥
কেহ বলে জটা হৈতে বার কর জল।
কেহ বলে জ্বাল দেখি কপালে অনল॥

এর মধ্যে ভাগ্যের পরিহাস বা করুণ হাসির অন্তর্মথিত দীর্ঘশ্বাস কিংবা অপরকে আঘাত হানার প্রচ্ছন্ন চেষ্টা আছে কিনা জানি না; তবে নির্মল হাস্যরসেরই প্রাধান্য পেয়েছে বলে মনে হয়। কেননা, ভারতচন্দ্র অঙ্কিত শিব দেবাদিদেব মহাদেব নন, লৌকিক শিব। ব্যঙ্গরস এ কাব্যে 'বাক্যের সুপ্রখর হীরকদ্যুতি সৃষ্টি'তে মুখর; তবু নির্মল হাস্যরস কোথাও এসেছে স্বতঃস্ফূর্ত রূপ নিয়ে।

৭. 'রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের আদেশে' তাৎপর্য : 'গ্রন্থসূচনা' অংশে মধ্যযুগের মঙ্গলকাব্যের অন্যান্য কবিদের মতো গ্রন্থ উৎপত্তির কারণ বিশ্লেষণ করেছেন ভারতচন্দ্র। মঙ্গলকাব্যের অন্যান্য কবিরা দু'টি 'inspiraion'-এর কথা বলেন—ক) দৈবী আজ্ঞা এবং খ) রাজসভার পাত্র-মিত্রদের উৎসাহ প্রদান। ভারতচন্দ্র 'গ্রন্থসূচনা'য় কিন্তু তা বললেন না, তিনি বাংলার নবাব আলিবর্দির শাসনের বিভিন্ন বিরূপ কর্মের সমালোচনা করে 'শুদ্ধ শান্তমতি' কৃষ্ণচন্দ্রের নবাবের আদেশে বন্দি হওয়ার কথা শোনালেন। নবাব কৃষ্ণচন্দ্র কীভাবে অন্নদার কৃপায় রক্ষা পেলেন, তা জানিয়ে, অন্নদার মুখ থেকেই বক্তব্য পরিবেশন করলেন। অন্নদা রাজাকে স্বপ্নাদেশে জানালেন—

শুন রাজা কৃষ্ণচন্দ্র না করিহ ভয়।
এই মূর্তি পূজা কর দুঃখ হবে ক্ষয়॥

তাহলে, ভারতচন্দ্র দেবীর স্বপ্নাদেশের কথা বললেন না, রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের আদেশের প্রসঙ্গ উল্লেখ করলেন। পাঠককে এ বক্তব্যও জ্ঞাত করালেন—

১. সভাসদ ভারতচন্দ্র রায় 'মহাকবি' এবং তিনি দেবীর 'মহাভক্ত'।

২. কৃষ্ণচন্দ্র তাঁকে 'রায়গুণাকর' উপাধি দেন।
৩. কৃষ্ণচন্দ্র স্বয়ং কবিকে দেবীর কীর্তি-মাহাত্ম্যজ্ঞাপক গীত রচনার কথা বলেন—'রচিতে আমার গীত সাদরে কহিও'। অর্থাৎ কৃষ্ণচন্দ্রকে দিয়ে দেবী তাঁর অভিলাষ ব্যক্ত করেছেন।
৪. এতদ্‌ব্যতীত, দেবী-অন্নদা কবিকে মাতৃমূর্তিতে স্বপ্নে দেখা দিয়ে কাব্যরচনার নির্দেশ দেন।

এই বক্তব্য থেকে প্রমাণিত হয় দেবী অন্নদার আদেশে নয়, আশ্রয়দাতা কৃষ্ণচন্দ্রের আদেশে কবি 'অন্নদামঙ্গল' কাব্যটি রচনা করেছেন। পুনশ্চ, কবি যে তাঁর পৃষ্ঠপোষকের আজ্ঞায় কাব্য রচনায় ব্রতী হয়েছিলেন, তা একাধিকবার স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন। যেমন—

১. কবি রায় গুণাকর খ্যাতি নাম দিয়া।
ভারতেরে আজ্ঞা দিলা গীতের লাগিয়া॥

২. কৃষ্ণচন্দ্র ভক্তি আশে ভারত সরস ভাষে
রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের আদেশে।

৩. নূতন মঙ্গল আশে ভারত সরস ভাষে
রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের আজ্ঞায়।

কাব্যের ভণিতায় পৃষ্ঠপোষকের প্রতি এই আনুগত্য মঙ্গলকাব্যের অন্যান্য শাখার তুলনায় ব্যতিক্রম সন্দেহ নেই। এভাবে শুভঙ্করী ও অন্নদাত্রী দেবী অন্নদাকে নিয়ে ভারতচন্দ্র কাব্যের আঙ্গিকগত নৈপুণ্য, অস্থির সময়ের পালাবদল, বস্তুনির্ভরতা, মানবিকতা, ঐতিহ্য বিরোধিতা ইত্যাদি বিষয়কে এনে যেভাবে কাব্যটিকে অভিনবত্ব দান করেছিলেন তা ভারতচন্দ্রের 'Originality'-কেই প্রমাণ করে। কবি-দৃষ্টির প্রতিফলন ঘটে থাকে শৈলীতে। এলিয়ট এই শৈলীর কথা জানান এজরা পাউন্ড প্রসঙ্গে : 'True originality lies in development' —ভারতচন্দ্রের এই 'Originality' রক্ষিত হয়েছে 'অন্নদামঙ্গল' কাব্যে।

অপ্রধান মঙ্গলকাব্য

মানুষই দেবতা গড়ে

কবি কৃষ্ণরামের রায়মঙ্গল : সম্প্রীতির সন্ধান

জয়িতা দত্ত

কৃষ্ণরাম বিরচিল রায়ের মঙ্গাল।
বসু শূন্য ঋতুচন্দ্র শকের বৎসর।।

অর্থাৎ বইখানা লেখা হয়েছিল ১৬৮৬-৮৭ সালে। কবির তখন মধ্যবয়স। ১৬৫৬-৫৭-তে কৃষ্ণরামের জন্ম। কলকাতার কাছেই থাকতেন কবি। গ্রামের নাম নিমতা। তাঁর লেখা কালিকামঙ্গালের পুঁথিতে (আত্মবিবরণী অংশ) জন্মভূমির বেশ মনোহর বর্ণনা পাওয়া যায়।

গ্রাম নিমিতা গঙ্গার পূর্বকূল।
সাবর্ণ চৌধুরী সব যাহাতে অতুল।।
গো মহিষ পশুপক্ষ বৃক্ষপর টাট।
রম্য সরোবরতীর সানবান্ধা ঘাট।।
নগর রাজার হাট দেখিতে সুন্দর।
কৈলাশ শিখরে যেন দেব পুরন্দর।।
ভগবতী দাস নাম তথায় বসতি।
কৃষ্ণরাম বিরচিল তাহার সন্ততি।

সমাজ-পরিবেশ সুখের ছিল বোঝা যাচ্ছে। ভাগীরথীর পূর্বতীরে বর্ধিষ্ণু ওই জনপদ। উচ্চাশয় সেখানকার সাবর্ণ-জমিদারি বংশ। প্রশংসায় পঞ্চমুখ কবি। অতিরঞ্জনের মিশেল নিয়ে ভাববার দরকার নেই। যদি ধরে নিই কবির কথাই ঠিক—নিরুদ্বেগ, সহাবস্থানপূর্ণ, সম্পন্ন গ্রামীণ কাঠামোয় কৃষ্ণরামের কাব্যরচনার ইচ্ছে-মুকুলটি ফুটে ওঠা, তবে দেবতার কাছে মঙ্গালভিক্ষের ঐ কবিতা কেন! খুব বেশি দিনের পুরোনোও নয়। বাংলা সাহিত্যই বা কতদিনের প্রাচীন। মাত্র হাজার বছর। কালের দিক থেকে পৃথিবীর অন্যান্য সাহিত্যের তুলনায় ছেলেমানুষ। তার ওপর কৃষ্ণরাম দাস তো সপ্তদশ শতাব্দীর শেষার্ধের কবি। আধুনিক যুগের প্রায় ঘনিষ্ঠ সময়ের। অথচ কী পশ্চাৎ-অভিমুখিতা কাব্যদেহের সর্বাঙ্গো!

কেন এমন? এ কি বাঙালির রক্তে মিশে থাকা আবহমান আদিমতার টান? পুরোনোকে আঁকড়ে রাখবার প্রবণতা? বাঙালি বুঝতে চায় না আদিমকালে আদিমতাই ধর্ম—অকালে তা অধর্ম! ‘কালান্তর’ বইয়ের ‘বাতায়নিকের পত্র’ প্রবন্ধে যেমনটা বলেছিলেন রবীন্দ্রনাথ। ‘কবিকঙ্কণ চণ্ডী অন্নদামঙ্গাল, মনসার ভাসান প্রকৃতপক্ষে অধর্মেরই জয়গান।’ সত্যিই কি তাই! একসময় যা ছিল জাতির শিশু-আত্মার প্রাণের অবলম্বন, Soul life of the People,

কাল অতিক্রমণের সঙ্গে সঙ্গে তাকে ফেলে এগিয়ে যাওয়াতেই তার প্রাণ-চৈতন্যের অগ্রগতি। কবি কৃষ্ণরামের 'রায়মঙ্গল' পশ্চাদ্‌পদতাকে ফেলে সত্যিই কতটা সমানের গন্তব্যে এগোতে পেরেছিল— প্রতিভাসিত করতে পেরেছিল সম্ভাবিত বাস্তব জীবনসত্যকে তা ভাববার। এমনিতে তো এদেশে, মধ্যযুগে, বাংলা সাহিত্যের বাইরের চেহারায় গতানুগতিক ছবি। কবেকার কোন আদিম ভাবনা, বিশ্বাস, মিথ, টোটেম, ট্যাবু-র হাত ধরে ধরে কল্পিত দেবদেবীর দাক্ষিণ্য প্রার্থনা। তাঁদের শ্রীচরণে নৈবেদ্য চড়ানো। কোনোদিনই কোনো বিশ্বাস, সংস্কার, কিংবদন্তি তাদের কাছে মজাদার রসালো গল্প হয়ে ওঠেনি। বরং আদিম অত্যাচারী অন্ধ অবোধ শক্তি হয়ে ঘাড়ে চেপে বসেছে। মানুষের খিদে-তেস্টা, আকাঙ্ক্ষা, লোভ আর ভয়ের সঙ্গে সরীসৃপ পিচ্ছিলতায় মিশে গেছে। হয়েছে তাদের যাবতীয় হীনমন্যতার আশ্রয়। বাস্তব-বিমুখতার প্রলোভন। আত্মসমর্পণের ওষধি। বুকের ওপরকার জগদ্দল ভার।

ফলে বাঙালি গোড়া থেকেই, দেবতার পায়ে সভয়ে নতজানু। কারণ পান থেকে চুন খসলেই আরাধ্য দেব-দেবীর প্রলয় ক্রোধে সর্বনাশা পদক্ষেপ গ্রহণ। 'মঙ্গল' নামের আড়ালে আপাত অমঙ্গলের শক্তি প্রয়োগে তাঁরা কুণ্ঠাহীন। কৃষ্ণরামের 'রায়মঙ্গল' কাব্যের দেবতা দক্ষিণরায়ও গ্রন্থের গোড়ায় এমন মূর্তিমান ক্রোধী এবং কালান্তক যম হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেছেন। বড়দহের বিখ্যাত বণিক দেবদত্ত বাণিজ্যে গিয়ে নিরুদ্দেশ। তাঁর সন্ধানে দেবদত্তের একমাত্র পুত্র, সদ্য-কিশোর পুষ্পদত্ত সাধু জলযাত্রায় বেরোবেন। বাউল্যা রতাইকে কাঠ কেটে আনতে বলা হল। ছয় ভাই আর প্রধান পুত্রকে সঙ্গে নিয়ে রতাই জঙ্গলে গেল কাঠ কাটতে।

এদিকে—

দক্ষিণরায়ের এক বৃক্ষ পূজা মানি।
সেইত বনেতে আছে কেহ নাহি জানি।।

ভুলবশত রতাই কেটে ফেলল দক্ষিণরায়ের বৃক্ষ। আর সেই অনিচ্ছাকৃত অপরাধের দণ্ড দিতে ক্রুদ্ধ দেবতার নির্দেশে ওই ছয় ভাইকে ছটি বাঘ খেয়ে ফেলল।

মামুদা কুমুদা সুদা বাঘ টঙ্গাভাঙ্গা।
বজ্রদণ্ডখান দাউড়া চক্ষু যার রাঙ্গা।।
সম্মুখে রহিল তারা করিয়া প্রণাম।
হইল রায়ের আজ্ঞা বলে কৃষ্ণরাম।।

কী আজ্ঞা দিলেন রায়?

রতাই বাউল্যা আর পুত্র না মারিয়া তার
ছয় ভাই বধ এইক্ষণে।

আশ্চর্য দৈবীলীলা! অসহায় মানুষের সঙ্গে আপোষহীন শক্তি প্রদর্শনের কী অসম দ্বৈরথ!

অন্যদিকে দেবতার এ হেন ক্ষমতার রাজনীতিকে ধনে-প্রাণে টিকিয়ে রাখবার ঠিকেদারি নিয়ে বসে আছেন যে কবিরা কিংবা তাঁদের মুখ চেয়ে সন্ত্রস্ত ভক্তির বদান্যতায় কুণ্ঠ আমজনতা, তারা কিন্তু এহেন নির্বিবেক 'মাফিয়ারাজ'-কে ভগবানের লীলা বলে মানল। আর এটাই হয়ে গেল দেব-মানবের সম্পর্কের দীর্ঘ যাপিত অভ্যাস আর পরম্পরা। কেন্দ্র থেকে প্রান্তে ধ্বনিত হয়ে চলল দৌরাত্ম্যকামী এবং কাণ্ডজ্ঞানহীন দেবতার আধিপত্যের হুঙ্কার। রতাইয়ের ছ' ভাইকে যখন বাঘে খেল 'বাঘ তারা বড় রাঢ়/ ছয় জনার ভাঙ্গি ঘাড়/ রক্তমাত্র পূরিল উদরে' —তখন কান্নায় আর শোকে ভেঙে পড়া ছাড়া বেচারার আর কী করার! মান্যতা, আনুগত্য, সমর্পণের বিপরীতে দেবতার পৈশাচিক উল্লাসের এহেন নির্ভরযোগ্য দলিলের নাম মঙ্গালকাব্য। "ছলনা, অন্যায় এবং নিষ্ঠুরতা কেবল যে মন্দির দখল করল তা নয়, কবিদের দিয়ে মন্দিরা বাজিয়ে চামর দুলিয়ে আপন জয়গান গাইয়ে নিলে। লজ্জিত কবিরা কৈফিয়ত দেবার ছলে মাথা চুলকিয়ে বললেন, 'কী করব, আমার ওপর স্বপ্নে আদেশ হয়েছে।' এই স্বপ্ন একদিন আমাদের সমস্ত দেশের ওপর ভর করেছিল।" এ ভাবনাও রবীন্দ্রনাথের। ওই একই প্রবন্ধে। স্বপ্ন দেখেছিলেন কৃষ্ণরামও। নিঝুম রাত্রির ঘন সুষুপ্তি-মাখা সে স্বপ্ন-প্রসঙ্গ আছে কাব্যের প্রায় গোড়ায়।

> শুনহ সকল বীর অপূর্ব্ব-কথন।
> যেমতে রচিল এই কবিতা রচন।।
> খাসপুর পরগণা নামে মনোহর।
> বড়িষ্যা তাহার এক তপা বিশ্বম্ভর।।
> তথায়ে গেলাম ভাদ্রমাস সোমবারে।
> নিশিতে শুইলাম গোয়ালার গোলাঘরে।।
> রজনীর শেষে এই দেখিলাম স্বপন।
> বাঘপৃষ্ঠে আরোহণ এক মহাজন।।
> করে ধনুঃশর চারু সেই মহাকায়।
> পরিচয় দিলা মোরে দক্ষিণের রায়।।
> পাঁচালি প্রবন্ধে কর মঙ্গল আচার।
> আঠারোভাটীর মাঝে হইব প্রচার।।

'আঠারোভাটী'র ভৌগোলিক সত্যতার মধ্যেও স্বপ্নের ভোজবাজির ভেতর কবর খোঁড়া হল বাস্তবের।

এই 'আঠারোভাটী' কোথায়? বাংলাদেশের দক্ষিণাঞ্চলে। মূলত গঙ্গার ব-দ্বীপ অববাহিকায়। জলমগ্ন, অরণ্য অধ্যুষিত, ব্যাঘ্র-সঙ্কুল সুন্দরবন। সেখানকার লোকজীবন থেকে উঠে এসেছেন এই দেবতা। এ গল্পের স্বপ্নভুবনটিতে তাঁর অধিকার। বস্তুগ্রাহ্য জীবনের যত কার্যকারণাত্মক বোধ আর চেতনাকে ক্রমশ ঘোলাটে করে দিতে যেন তাঁর আবির্ভাব। আর এখানেই আসল প্রশ্ন। যে কবি কাব্য রচনা করছেন বা যে মানুষ চণ্ডীমণ্ডপের চাতাল ঘিরে বসে সে সব শুনছে তারা সত্যিই কতখানি সরল! একে সারল্য বা নির্বুদ্ধিতা

বলব, নাকি যুগের অভিঘাতে ঘনিয়ে ওঠা ব্যক্তি-ছলনা বা সমাজ-বঞ্চনার মুখোমুখি দাঁড়ানোর নেপথ্য চাতুর্য হিসেবে অন্য মর্যাদা দেব! মোহন মিথ্যে দিয়ে সাজানো প্রশস্তির আকাশকুসুম ঢাকনার নীচে আসলে হয়তো ধুক্‌ধুক্‌ করে স্পন্দিত হচ্ছে নিরাপদে বেঁচে থাকবার কামনা। যে বেঁচে থাকা স্বাধীনভাবে। আপন ইচ্ছে খুশিমতো। পরিবার-সন্তান নিয়ে সামান্য দুধে-ভাতে। তাই বুঝি স্বপ্নকথার বেসাতি। টনটনে বাস্তব বুদ্ধির দাবিতে দৈবী স্বপ্নাদেশের পুনঃপুনঃ প্রচার। বাস্তববোধের ওপরে গাঢ় ভক্তির মাখন প্রলেপ। আনুগত্য, আকুতি আর সভয় সম্ভ্রম থেকে সে ভক্তির উদ্‌গম। প্রেমনির্ভর ভক্তিবাদ থেকে যা শত যোজন দূরে। এ পুজোর সমস্ত নিবেদন কেবল জীবনের টানে। বেঁচে থাকবার টানে। বাঁচিয়ে তোলবার টানে। তাই এর আখ্যান বাচ্যার্থে ব্যাঘ্রদেবতা দক্ষিণরায়ের মহিমা প্রচারমূলক হয়েও ব্যঞ্জনায় দেবতার হাত ধরে মানুষের পথ-অতিক্রমণের গাথা। ছোট্ট একটা ছেলে, পুষ্পদত্ত, এ কাহিনির কাণ্ডারী। পরিব্রাজক সে-ই। তার সমুদ্রযাত্রা বাণিজ্যের লোভে নয়— আজন্ম না-দেখা বাবাকে খুঁজে আনবার গভীর আর্তিতে। বাবাকে কোনোদিন দেখেনি সে। এই শোক তার নিজের জন্য যতো তার চেয়েও বেশি অভাগিনী মায়ের মুখ চেয়ে—

মরণে নাহিক দুঃখ নাহি তাহে তাপ।
জনম অবধি আমি না দেখিনু বাপ।।
জনম দুঃখিনী মোর সুশীলা জননী।
অবিরত মনস্তাপ দিবস রজনী।।

ব্যক্তিস্বার্থ-সিদ্ধির ক্ষুদ্র গণ্ডিকে কাটিয়ে ওঠবার এই মূল আখ্যান মঙ্গলকাব্যের গৎবন্দি হিসেবকে আপনমনে ভাঙচুর করতে করতে এগোয়। সঙ্গে সঙ্গে এগোয় জলযান। বড়দহের বিখ্যাত সদাগর, নিরুদ্দেশ দেবদত্তের একমাত্র উত্তরাধিকারী পুষ্পদত্তের চোদ্দডিঙা মধুকর। ছত্রভোগ ছেড়ে মগরা, মগরা অতিক্রম করে গঙ্গাসাগর। ক্রমে মার্তণ্ড রাজার রাজ্য ছুঁয়ে উড়িষ্যা উপকূল ধরে কামেশ্বর হয়ে শ্রীহদ্যাদহ, বাঁকড়াদহ, জোকাদহ... এবং অবশেষে সমুদ্র-মধ্যবর্তী রাজদহ। অনেকান্ত এই যাত্রায় ক্রমশ পরিণত হয়েছেন পুষ্পদত্ত। তীব্রতর হয়েছে তার পিতৃসন্ধানের এষণা। অপ্রতিরোধ্য তার গতি। শেষপর্যন্ত সিদ্ধিলাভ। রাজা সুরথের রাজ্য তুরঙ্গাপাটনে হল পিতৃ-সম্মিলন। গল্পের এই একমুখী গতিকে কারুতায়, বিস্তারে, আড়ম্বর জুগিয়েছেন দেবতা দক্ষিণরায়। তবু উপলক্ষ্য তিনি। ঐকান্তিক লক্ষে স্থির প্রোজ্জ্বল একজন মানব-সন্তান। তাঁর প্রশ্নের সামনে দাঁড়িয়ে স্বয়ং দেবতাও একসময় যেন বিভ্রান্ত হন। সেই সময়ে, যখন সমুদ্র-বক্ষে এক বিচিত্র নগরী জলের ওপর ভাসমান দেখে পুষ্পদত্ত তুরঙ্গারাজকে সংবাদ দেয়। অভিভূত সুরথ তার দর্শনে যান। অদর্শনজনিত ক্রোধে কারারুদ্ধ করেন পুষ্পদত্তকে। সেই তখন দক্ষিণরায়ের স্তব বলে সাধারণ্যে যা প্রচারিত তার ভেতর থেকে উদ্‌গীর্ণ হল অগ্নিগর্ভ শ্লেষ আর জিজ্ঞাসা।

বয়সে না দেখি বাপ বসতি বিদেশ।

বিঘ্ন বিনাশন প্রভু হও কৃপালেশ।।
ভরিয়া আইলাম ভরা ভবন হইতে।
ভরসা তোমার পদ ভাবিতে ভাবিতে।।
মমতা না কর যদি দক্ষিণের রায়।
মরিলে মহিমা আর রহিবে কোথায়।।

'মানুষই দেবতা গড়ে, তাহারই কৃপার পরে, করে দেবমহিমা নির্ভর'—একথাই যেন প্রকারান্তরে শুনিয়ে দেওয়া। মানুষের এহেন উজ্জীবনে চিন্তিত দেব-পরিবার। দক্ষিণরায়ের স্ত্রী লীলাবতী তাই সময় থাকতে সাবধান করে দেন স্বামীকে :

পুরাও মনের আশ সঙ্কটে রাখহ দাস
বিপাকে পড়িয়া কাটা যায়।
কি লাগি না হর দুখ কেমনে তুলিবে মুখ
লাজ পাবে দেবতা সভায়।।
দয়ামায়া কিছু নাই কুলিশ সমান এই
হেন বুঝি তোমার হৃদয়।
শরণ লইবে কেবা কে আর করিবে সেবা
যদি মরে সাধুর তনয়।।

দক্ষিণরায়ের অস্তিত্বের সংকট এখন। আর পুষ্পদত্তের আত্মার সংকট। একজন যে কোনো মূল্যে কব্জায় রাখবে নিজের ইমেজ, অন্যজন পৌঁছোবে পিতৃসমীপে— চিনবে তার শিকড়। পরস্পরের চাহিদা পৃথক কিন্তু সংকট সমান। সমান বলেই উভয়ের মধ্যে সম্প্রীতি অনিবার্য। কারারুদ্ধ পুষ্পদত্ত স্তব করলেন দেবতার—অভয়ও পেলেন। পরদিন তাঁকে শিরশ্ছেদের জন্য মশানে নিয়ে যাওয়া হলে সমস্ত শহর জুড়ে বাঘের ভয়ঙ্কর আক্রমণ, সুরথরাজের মৃত্যু ও পুনর্জন্ম আবারও প্রমাণ করল দেবমহিমার অমোঘতা। এমন অমোঘতা চণ্ডীমঙ্গালের ধনপতি উপাখ্যানেও। নিখোঁজ ধনপতির একমাত্র পুত্র শ্রীমন্তের পিতৃসন্ধান এবং দেবী চণ্ডিকার অস্তিত্ব সন্ধান। শেষপর্যন্ত দেবে-মানবে অভিন্ন সখ্য আর 'মধুরেণ সমাপয়েৎ'-এ যবনিকা পতন।

যবনিকা এভাবে পড়তেই হবে। নতুবা প্রশ্নহীন আনুগত্যে ছেদ পড়বে। ছেদ পড়লে তো চলবে না। উপর্যুপরি বিধর্মী শক্তির দাপটের সামনে চুরমার হয়ে গেছে মধ্যযুগের বাঙালির শিরদাঁড়া। বুঝেছে, বিশেষ করে ব্রাহ্মণ গোষ্ঠীপতিরা বুঝেছেন, ছোঁয়াচ-বাঁচানো অব্রাহ্মণের সঙ্গো সম্মিলন সেদিনের ঝড়-ওঠা আকাশের নীচে কী অসম্ভব জরুরি। তাই চণ্ডীপূজা অনার্য ব্যাধ সমাজ ছাড়িয়ে প্রসারিত হয়েছে ব্রাহ্মণ গৃহস্থের অন্তঃপুরে। ব্যাধকে দিয়ে প্রচারিত হয়েছে চণ্ডীপূজা। ইন্দ্রপুত্র নীলাম্বর মর্ত্যে এসেছেন কালকেতু হয়ে। গোপনে আর্যধর্মটি রক্ষা করেও শক্তির মায়ায় ধরিত্রী শুনেছে অবমানিত সম্প্রদায়ের উত্থানের ইতিহাস। অর্থাৎ শক্তিই পারে। শান্ত সমাহিত ধ্যানগম্ভীর ভাবাকাশ বঙ্গীয় জীবন থেকে যত উধাও হয়েছে ততই অন্নভূত হয়েছে শক্তিকেন্দ্রিক দেব-আরাধনা।

রায়মঙ্গাল কাব্যের দক্ষিণরায় শক্তির প্রতীক। কেবল নারীমূর্তির বদলে পুরুষমূর্তি। নতুবা আখ্যানাংশ প্রায় এক। সে অবশ্য কাব্যের দ্বিতীয়াংশে। ধনপতি-শ্রীমন্ত আর পুষ্পদত্ত-দেবদত্ত প্রসঙ্গো সাধর্ম্য গভীর। কিন্তু স্বাতন্ত্র্য ধরা পড়েছে প্রথম অংশে। চণ্ডীমঙ্গালের